মারুফ

হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

১

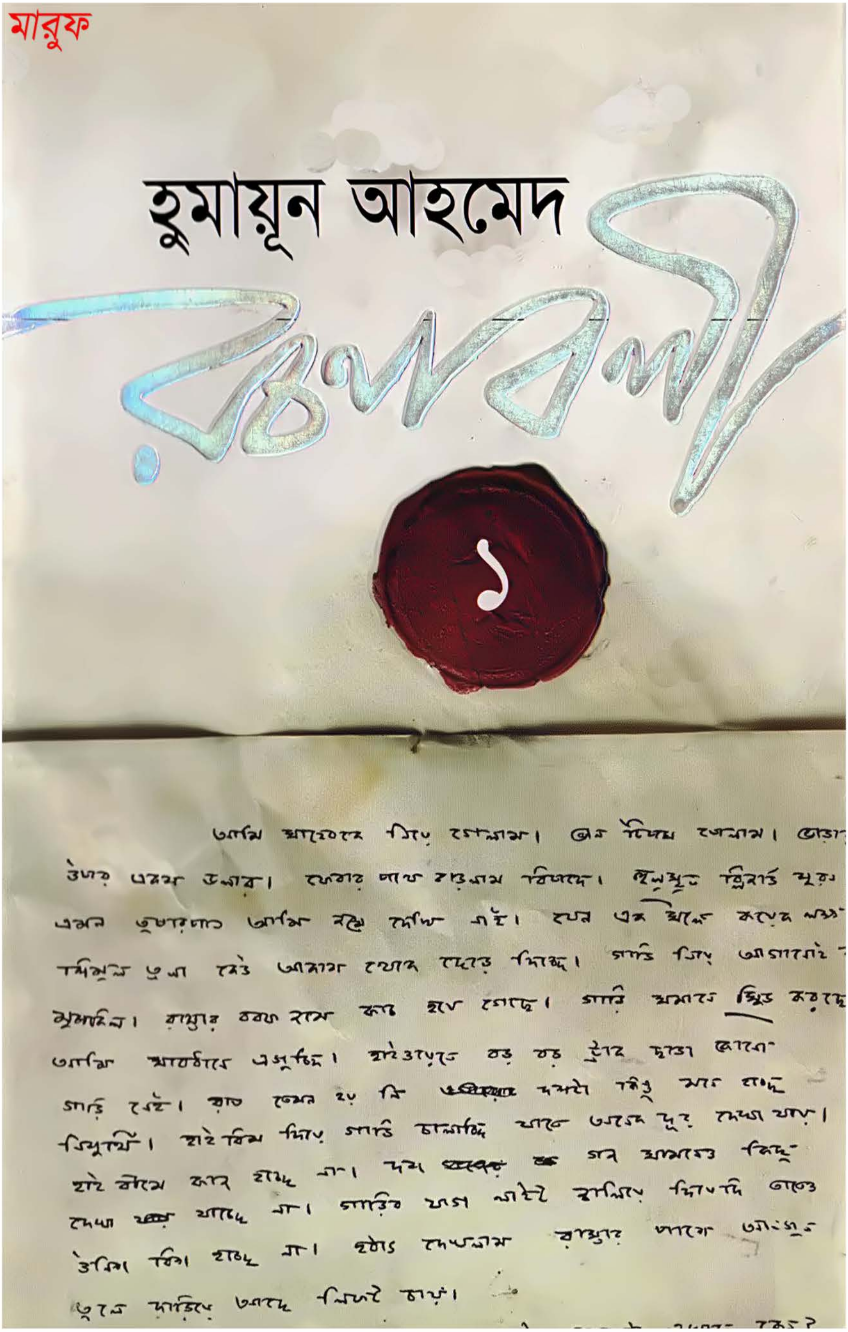

হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

১

অন্যপ্রকাশ

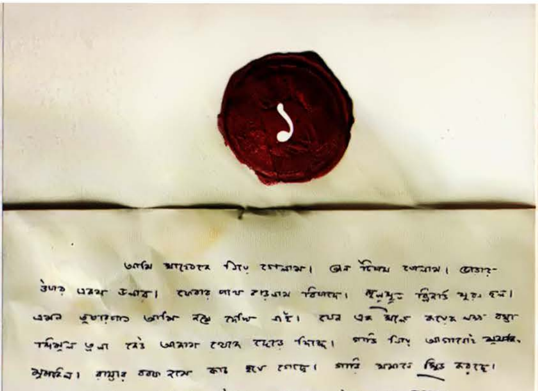

উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা ও গান সাহিত্যের যে শাখায়ই হাত দিয়েছেন অর্জন করেছেন ঈর্ষণীয় সাফল্য আর অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা। চলচ্চিত্র আর নাট্য পরিচালনায়ও তিনি সমান কৃতিত্বের অধিকারী। সব পরিচয়ের বড় পরিচয়, তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ লেখক। ষাট বছর জীবনের চার দশকেরও বেশি ব্যয় করেছেন লেখালেখিতে। জমে উঠেছে সাহিত্যের বিচিত্র আর বিপুল সম্ভার। সঙ্গতভাবেই সময় এসেছে বরেণ্য এ লেখকের রচনাবলী একসঙ্গে গ্রন্থিত করে তোলার।

এ প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই হুমায়ূন রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ। লেখকের ষাটতম জন্মদিনে প্রকাশিত রচনাবলী-র প্রথম খণ্ডে থাকছে : নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, শ্যামল ছায়া, নির্বাসন, অচিনপুর, সৌরভ, নিশিকাব্য, তোমাদের জন্য ভালোবাসা, আমার ছেলেবেলা, নৃপতি, নীল হাতি।

এই খণ্ডের বিশেষ আকর্ষণ দশম শ্রেণীর ছাত্র হুমায়ূন আহমেদের লেখা একটি প্রবন্ধ 'কেন বই পড়ি ?' এবং পত্রিকায় প্রকাশিত 'নন্দিত নরক'-এর প্রথম পাঠ।

প্রচ্ছদ :: মাসুম রহমান

বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত পঁয়ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, নয় নম্বর বিপদ সংকেত, আমার আছে জল...* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। তাঁর বেশ কটি উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। একটি উপন্যাস 'গৌরীপুর জংশন' সাতটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এই উপন্যাসের ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি ও ফার্সি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।

আলোকচিত্র :: মাজহারুল ইসলাম

য় ভালবাসে। [illegible] ছোট ছে

ই নুইকে দেখতে ইচ্ছা করে।

গাড়িতে চড়তে ভালবাসে। আমাদের

র কাজ না করে তাকাতে দে

দে পার্সিয়ান হাঁটতে যেতে হয়

গাছের ভালে পাখিরা চালি

:।

রাতে ভাত খেয়ে

ড়ে। আমার প্রিয় [illegible] মা

র টেবিল পছন্দ করে।

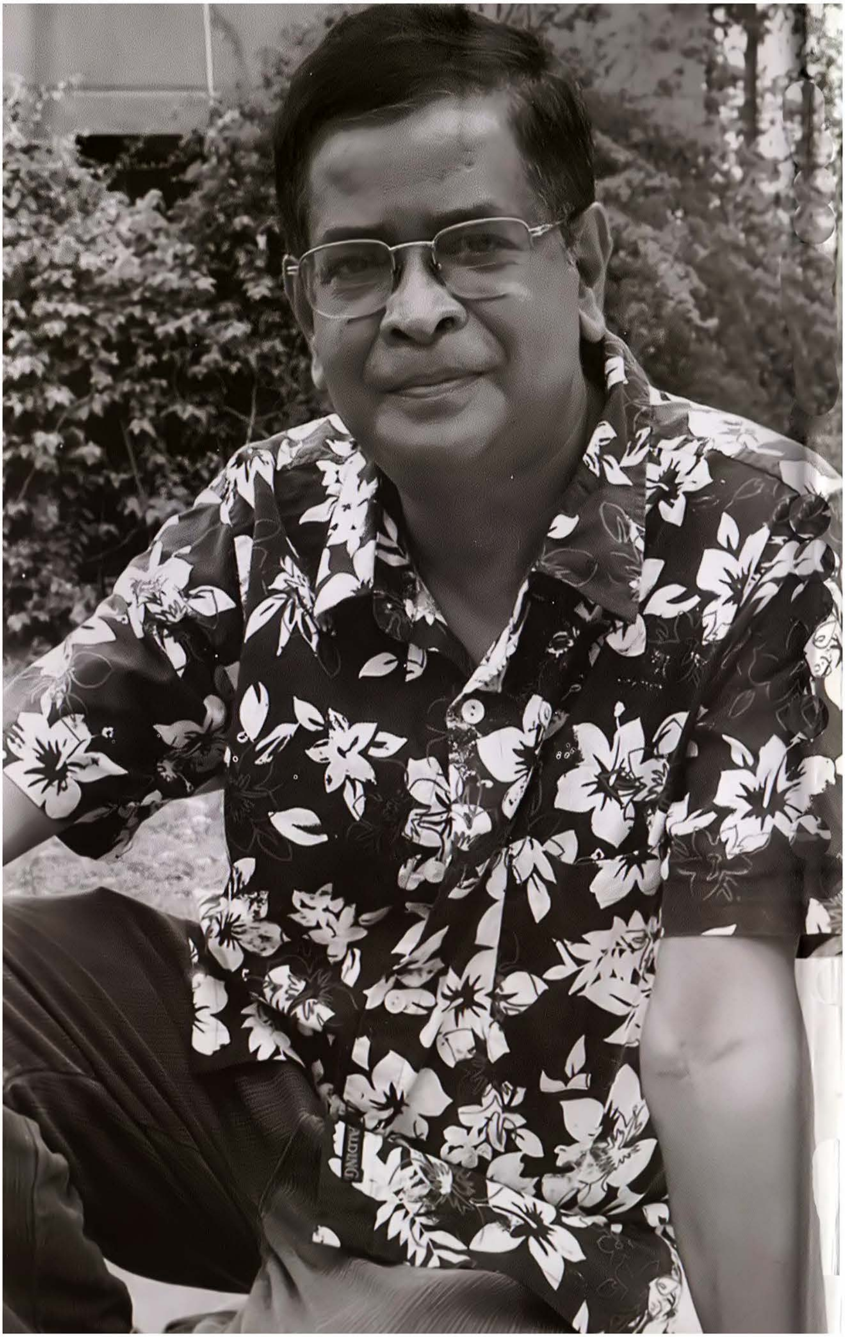

হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

১

Maruf

২০/০৪/২০১৫

সালেহ চৌধুরী
সম্পাদিত

অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ | ১৩ নভেম্বর ২০০৮

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ৫০০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

কানাডা পরিবেশক | এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস
২৯৭০ ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরেন্টো

Humayun Ahmed
Rachanabali Vol. I | edited by Saleh Choudhury
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price Tk. 500 only

ISBN 984 868 503 0

ভূমিকা

> *হুমায়ূন আহমেদ অনেকগুলো উপন্যাস রচনা করেছেন এবং ইতোমধ্যে তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং কেউ কেউ বাঁকা উক্তিও করে ফেলেন। কিন্তু দেখা গেছে অনেক উৎকৃষ্ট রচনাই অত্যন্ত জনপ্রিয়। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের শস্তা চতুর্থশ্রেণীর লেখকদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি, সন্দেহ নেই, বিশাল পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করেছেন, যা সাহিত্যের পক্ষে উপকারী। এ কথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, তিনি, ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবদন্তির মর্যাদা পাবেন।'*
>
> — *শামসুর রাহমান*

হুমায়ূন আহমেদের পঞ্চাশ বছর পূর্তির প্রাক্কালে একটি সংক্ষিপ্ত রচনায় (*হুমায়ূন আহমেদ একটি রেখাচিত্র, হুমায়ূন ৫০* সংকলনে গ্রন্থিত) আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠকবি শামসুর রাহমান এভাবেই হুমায়ূন আহমেদের মূল্যায়ন করেছিলেন, ব্যক্ত করেছিলেন উচ্চ আশাবাদ— 'হুমায়ূন *আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবদন্তির মর্যাদা পাবেন*।' কবির এ উক্তিকে আর যাই হোক 'কাব্যিক উচ্ছ্বাস' বলে খাটো করে দেখার উপায় নাই। আদতে হুমায়ূন আহমেদ ইতোমধ্যেই কিংবদন্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সে কেবল বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে যেখানেই বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠনের চল আছে, হুমায়ূন সমান জনপ্রিয়। বিদেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে হুমায়ূন-চর্চা শুরু হয়েছে। অনূদিত হতে শুরু করেছে ইংরেজি, রুশ, জার্মান, ফরাসি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায়। আর দেশের কথা যদি বলি, বই পড়ার অভ্যাস আছে অথচ সংগ্রহে হুমায়ূনের কোনো বই নাই, এদেশে এমন ঘর আজ অকল্পনীয়। সঙ্গতভাবেই অনুরাগী পাঠক, পাঠাগার আর গবেষকদের মাঝে সমগ্র হুমায়ূন-সাহিত্য সংগ্রহ করার আগ্রহ বেড়ে চলেছে। বিপুলসংখ্যক বই (যা এরই মাঝে দু'শ ছাড়িয়ে গেছে) আলাদা আলাদাভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কষ্টকর। ফলে অনিবার্য হয়ে উঠেছে রচনাবলি প্রকাশ। অন্যপ্রকাশ-এর এ উদ্যোগ সকল মহলে প্রশংসিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এবার (১৩.১০.০৮) হুমায়ূন রচনাবলির প্রথম দু'খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। এরপর প্রতিবছর দুই বা ততধিক খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে সমগ্র রচনাবলির প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে।

রচনাবলির বিন্যাস মূলত উপন্যাসভিত্তিক হলেও এতে বহুমাত্রিক লেখক হুমায়ূন আহমেদের যাবতীয় রচনা গ্রন্থিত হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকাশের কালানুক্রম অনুসরণ করা হলেও প্রতিখণ্ডেই ভিন্নধর্মী কিছু রচনা (নাটক, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, শিশু-কিশোর সাহিত্য, কবিতা, গান ইত্যাদি) সংকলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালানুক্রম কিছুটা বিঘ্নিত হলেও রচনা-বৈচিত্র্যের চারিত্র্য স্পষ্টতা পাবে বলেই মনে করি।

রচনাবলির প্রতিখণ্ডের ভূমিকায় হুমায়ূন-সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক কোনো একটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। যার লক্ষ্য থাকবে পাঠকদের কৌতূহল নিরসন এবং রসাস্বাদনে সহায়তা করা। স্বভাবতই প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় 'নন্দিত নরক' তথা আবির্ভাবের চমক এবং লেখকের প্রস্তুতি প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে।

আবির্ভাবের চমক আর অগ্রযাত্রার সূচনা

১৯৭২-এ 'নন্দিত নরকে' নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে হুমায়ূন আহমেদ-এর আবির্ভাব। আজ আমরা সকলেই জানি, এ এক বিস্ময়কর অভ্যুদয়। সাহিত্যজগতে পূর্বপরিচয়হীন, বলতে গেলে সদ্য কৈশোর ছাড়ানো তরুণ বরিত হন *'সূক্ষ্মদর্শী শিল্পী' 'কুশলী স্রষ্টা' 'প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টা'* হিসেবে। যিনি *'বয়েসে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবন রসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার।'*

উদ্ধৃত বিশেষণগুলো ড. আহমদ শরীফ লিখিত 'নন্দিত নরকে'-এর ভূমিকা থেকে নেয়া। ড. শরীফ অনুরূপ উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, '*ভবিষ্যতে তিনি* (হুমায়ূন আহমেদ) *বিশিষ্ট জীবনশিল্পী হবেন— এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।*' প্রাজ্ঞ অধ্যাপকের এ আস্থা আর আশাবাদ ব্যর্থ হয় নি, গোটা বাংলা সাহিত্যের এ এক পরম প্রাপ্তি।

পত্র-পত্রিকায় হাত মকশ না করে (বেনামিতে একটি কবিতা ছাড়া হুমায়ূনের অপর কোনো লেখা এর আগে কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। কবিতাটির নাম ছিল 'সুখ'। প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক পাকিস্তান-এর মহিলা পাতায়। মেজো বোনের ছদ্মনামে) সরাসরি একটি উপন্যাস নিয়ে হাজির হয়ে এমন সাফল্য অর্জনের নজির বিরল। বিরল নবাগতের পক্ষে প্রবীণ অধ্যাপকের এমন প্রশংসা অর্জনের ঘটনাও। ব্যাপারটা তাই কৌতূহল জাগানিয়া।

উনিশ'শ সত্তরে হুমায়ূন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী। মোহসিন হলে ৫৬৪ নং কক্ষের বাসিন্দা। বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে পড়তেই তিনি উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। তৈরি হয়ে যায় তিনটে পাণ্ডুলিপি। যার একটি

'নন্দিত নরকে'। অগ্রজপ্রতীম বন্ধু আহমদ ছফা পাণ্ডুলিপিটি দেখে মুগ্ধ হন। তাগিদ দেন প্রকাশের।

ইচ্ছে থাকলেও তখন বই প্রকাশে উদ্যোগী হওয়া সম্ভব হয়নি। দেশ তখন এগিয়ে চলেছে এক উন্মাতাল সময়ের মাঝ দিয়ে, রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং পরিণামে মহান প্রাপ্তি স্বাধীনতার দিকে। এ সময় হুমায়ূন আহমেদ ও তার পরিবারকেও বিপর্যস্ত হতে হয়। পিতা ফয়জুর রহমান আহমেদ শহীদ হন পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে, নানা এবং এক মামা হন নিহত। তরুণ প্রভাষক হুমায়ূনকে ধরতে হয় পরিবারের হাল।

বাহাত্তরের শুরুর দিকে আহমদ ছফা আবার এগিয়ে আসেন। উদ্যোগ নেন *'নন্দিত নরকে'* প্রকাশের।

স্বাধীনতার পর তরুণ ওবায়দুল ইসলাম (পরে কবি ও বাংলা একাডেমী কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাত) ও তার বন্ধু হাবিবউল্লাহ (প্রয়াত, বাংলা একাডেমী কর্মকর্তা) স্বাধীন দেশের প্রথম সাহিত্য পত্রিকা *'মুখপত্র'* প্রকাশে উদ্যোগী হন। আহমদ ছফা ওদের *'নন্দিত নরকে'*-এর খবর দিয়ে মুখপত্রে প্রকাশের অনুরোধ জানান। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই *'নন্দিত নরকে'* প্রকাশিত হয়। একই সংখ্যায় ড. আহমদ শরীফ-এর একটি নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। হয়তো নিজের লেখা দেখতে গিয়েই *নন্দিত নরকে*-র প্রতি তার নজর পড়ে। তিনিও মুগ্ধ হন এবং ওবায়দুল ইসলামকে অনুরোধ করেন, হুমায়ূন আহমেদকে একদিন তার কাছে নিয়ে আসতে।

এভাবেই স্থাপিত হয় প্রবীণ-নবীনের যোগসূত্র। ড. শরীফ নিজের থেকেই প্রস্তাব করেন *'নন্দিত নরকে'*র ভূমিকা লিখে দেয়ার। ড. শরীফ লিখিত বহুল উল্লেখিত ভূমিকার এই হচ্ছে পটভূমি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বিদগ্ধজনের ভূমিকা কিংবা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সাময়িক খ্যাতি দিলেও সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে না। ওটা একজন লেখককে নিজ শক্তি আর শ্রম দিয়েই অর্জন করতে হয়। হুমায়ূন আহমেদকেও তাই করতে হয়েছে। তবে আলোচ্য ভূমিকাটি যে এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে তা-ও অনস্বীকার্য।

মুখপত্র-তে *নন্দিত নরকে* প্রকাশের পর আহমদ ছফাই হুমায়ূনকে খান ব্রাদার্স-এ নিয়ে যান। তার অনুরোধেই খান ব্রাদার্স *'নন্দিত নরকে'* প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে (বই-এর কলেবর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে প্রকাশকের অনুরোধ মোতাবেক হুমায়ূনকে অতিরিক্ত কয়েকটি পৃষ্ঠা নতুন করে লিখে দিতে হয়)।

ওবায়দুল ইসলামের উদ্যোগ এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে কর্মীদের ধন্যবাদ। তাদের চেষ্টায় মুখপত্রের সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি উদ্ধার করা গেছে। ওখান থেকে নন্দিত নরকে-এর প্রথম পাঠ পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত থাকলো। পাঠকদের কৌতূহল

মেটাতে এবং তরুণ লেখকের প্রস্তুতি কেমন পাকা ছিল তা বোঝাতে এ সংযোজন সহায়ক হবে।

এ পর্যায়ে একটি ব্যক্তিগত স্মৃতির উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক গণ্য করি। এক দুপুরে হুমায়ূন তার এক আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে (আমার সহযোদ্ধা নজরুল ইসলাম) এসে এক কপি *'নন্দিত নরকে'* উপহার দিয়ে যান। ওর বন্ধু অনুরোধ করেন 'দৈনিক বাংলা'য় বইটির একটি সমালোচনা প্রকাশের।

ক্ষীণ কলেবর, নিম্নমানের ছাপা, সাদামাটা প্রচ্ছদের বইটি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ড. শরীফের ভূমিকায় নজর আটকে যায়। এমন একটি বই-এ ড. শরীফ অত উচ্ছ্বাসের কী পেলেন, ভেবে অবাক হই। পাতা ওল্টাতে শুরু করি। আর এক নিঃশ্বাসেই পড়ে শেষ করি *'নন্দিত নরকে'*। এর পরবর্তী মনের অবস্থা লিখে বোঝানোর নয়। আমি এক ছুটে তিনতলায় সহকারী সম্পাদকদের কামরায় ছুটে যাই। ওখানে তখন হাসান হাফিজুর রহমানকে কেন্দ্র করে শামসুর রাহমান, আহমেদ হুমায়ূন, সানাউল্লাহ নূরী প্রমুখের জোর আড্ডা চলছিল। আমি বারবার এ কথা বলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকি যে, হাসান ভাই, আমাদের কথাসাহিত্যে এক নতুন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে। একটা অসাধারণ বই বেরিয়েছে।

আড্ডায় বাধা পড়ায় হাসান ভাই বিরক্ত হন। একসময় বলেন, কী এমন ভ্যাজর ভ্যাজর শুরু করেছেন? তেমন কোনো বই বেরোলে দিয়েন। পড়ে দেখব।

পড়বেন? বলেই আমি আবার নিজ কামরার দিকে ছুটে যাই। বইটি এনে হাসান ভাইর হাতে তুলে দিই। হাসান ভাইও ভূমিকার উচ্ছ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে আড্ডার মাঝেই পড়তে শুরু করেন। শেষ করার পর তাকেও একই উচ্ছ্বাসে পেয়ে বসে। 'নন্দিত নরকে' ওদের সেদিনকার আড্ডা দখল করে নেয়।

সেদিন শামসুর রাহমানের ছিল কলাম লেখার দিন। দীর্ঘ আড্ডায় পড়ে লেখার বিষয় নিয়ে ভাববার অবকাশ হয়নি। হঠাৎ নতুন চিন্তা এলো। *নন্দিত নরকে* টেনে নিয়ে কিছু পাতা ওল্টাতে থাকলেন। হাসান ভাইর কাছ থেকে শুনে নিলেন আরো কিছু। আর এভাবেই *'নন্দিত নরকে'* নিয়ে লেখা হয়ে গেল একটা উপসম্পাদকীয়! (কলামটি মৈনাক নামের আড়ালে বের হতো) পরে আহমেদ হুমায়ূনও সাহিত্য সাময়িকী পাতায় একটা আলোচনা লেখেন। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহও একটি সমালোচনা লিখেছিলেন।

পরদিন দেখা হতেই হাসান ভাই বললেন, হুমায়ূন আহমেদকে একদিন নিয়ে আসুন। আমি ওকে চাইনিজ খাওয়াবো।

দৈনিক বাংলা ছিল তখন দেশের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা। সঙ্গতভাবেই হুমায়ূন আহমেদ ও তার *নন্দিত নরকের* খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রকাশক আগ্রহী হয়ে উঠলেন তরুণ এই লেখকের বই আরো প্রকাশ করতে। দ্রুতই প্রকাশিত হলো *'শঙ্খনীল কারাগার'*।

*নন্দিত নরকে*র সঙ্গে প্রয়াত আহম্মদ ছফার আরো একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ছফা এসময় লেখক শিবির নামে একটি সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। আর *নন্দিত নরকে*-কে বছরের সেরা উপন্যাস হিসেবে লেখক শিবির পুরস্কারে ভূষিত করেন।

এরপর হুমায়ূন আহমেদকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। উপন্যাস থেকে শিশুসাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান, নাটক, ভ্রমণ-সাহিত্য— বিচিত্র রচনা সম্ভারে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তার সকল রচনাই হয়ে চলেছে বিপুলভাবে পাঠকনন্দিত। সাহিত্যজগতের কোন স্তরে আজ তার অবস্থান বক্ষ্যমান নিবন্ধের শুরুতেই তার ইঙ্গিত রাখা আছে। বাহ্যত-প্রস্তুতিহীন এক নতুন লেখকের এ সাফল্য অবশ্যই বিস্ময়কর। তবে দুর্বোধ্য বা কাকতালীয় কিছু না। এ রহস্য উন্মোচন বা অনুধাবনের জন্যে তার রচনাবলি এবং জীবনের প্রতি নজর ফেরানো আবশ্যক।

হুমায়ূন আহমেদের এই প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়া অবিমিশ্র ছিল না। বিরূপ সমালোচকদের বলতে শোনা গেছে, এই উড়ে এসে জুড়ে বসা লেখকের খ্যাতি সাময়িক হতে বাধ্য। প্রস্তুতিহীন হালকা লেখা স্থায়িত্ব পেতে পারে না। হুমায়ূন শস্তা জনপ্রিয় লেখকের অতিরিক্ত কিছু নন, ইত্যাদি।

যদিও এ জাতীয় অপপ্রচার আজ অপসৃয়মাণ, বিরুদ্ধকণ্ঠ স্তিমিত, তবু ঐতিহাসিক কারণেই নিরাবেগ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন আবশ্যিক। এ পর্যায়ে নিবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত শামসুর রাহমানের উক্তির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি। কবির সাহিত্য ও রসবোধ নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নাই। কার্যত এই উক্তিতে তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনার সুস্পষ্ট জবাবই রেখে গেছেন। জনপ্রিয়তা দোষ নয়, গুণ এবং হুমায়ূন আমাদের *'শস্তা চতুর্থশ্রেণীর লেখকদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন'* এমন মন্তব্য তার মতো বোদ্ধাকেই মানায়।

আদতে সাহিত্যের আলোচনায় 'জনপ্রিয়' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক এবং এই দ্ব্যর্থতা পরস্পরবিরোধী। এক অর্থে শস্তা নিম্নরুচির পরিবাহক, অন্য অর্থে পাঠক নন্দিত। হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা এই দ্বিতীয় ইতিবাচক অর্থেই সত্য। শস্তার হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তাকে আর যাই হোক, 'শস্তা' বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কোন গুণ বা শক্তির বলে হুমায়ূনের পক্ষে এমন ঈর্ষণীয় পাঠকপ্রিয়তা অর্জন সম্ভব হলো?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমই আমাদের এ ধারণা পরিহার করতে হবে যে, হুমায়ূন আহমেদ কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই নেহাত প্রতিভা বলে আকস্মিক আবির্ভাবে পাঠকচিত্ত জয় করেছিলেন। শিল্পসাহিত্যে সাফল্যের পেছনে অবশ্যই প্রতিভার একটা স্থান আছে। তবে জর্জ বার্নার্ডশ এক্ষেত্রে প্রতিভার অবদান পাঁচ শতাংশ বলে নির্ধারিত করে গেছেন। বাকি পঁচানব্বই শতাংশ নিশ্চিত করে শ্রম। এই শ্রমের বহুলাংশ যে প্রস্তুতিতেই ব্যয় হয় এ কথা সম্ভবত উল্লেখ না করলেও চলে।

হুমায়ূন বই নিয়ে হাজির হওয়ার আগে তেমন কিছু প্রকাশ না করলেও তার স্মৃতিকথামূলক রচনাগুলোর পাঠকদের অন্তত অজানা নেই, তার আশৈশব সাহিত্যপ্রীতি ও পাঠাভ্যাসের কথা। এই পঠনই ছিল কার্যত তার প্রস্তুতির প্রথম পর্ব। সেই সঙ্গে সুযোগ পেলেই ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আর পিতার বদলির চাকরির সুবাদে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস তাকে দিয়েছিল জীবন ও জগৎ পর্যবেক্ষণের অনন্য সুযোগ। হুমায়ূন প্রতিটি সুযোগকেই কাজে খাটিয়েছেন নিজ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায়ই তার প্রস্তুতির একটা নজির আমাদের হাতে এসেছে। দশমশ্রেণীর ছাত্র হুমায়ূন বই পড়ার উপর একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন (কেন বই পড়ি *?*) তার সাহিত্যানুরাগী পিতা রচনাটির সাহিত্যগুণে মুগ্ধ হয়ে রচনাটি প্রকাশিত হোক দেখতে চেয়েছিলেন। হুমায়ূন কিন্তু তাতে রাজি হননি। তার মতে, রচনাটি মৌলিক নয়, এতে অনেকের সাহায্য নেয়া হয়েছে। তাই প্রকাশের অর্থ নাই। এই মন্তব্যটিও কিশোর হুমায়ূনের সাহিত্যবোধের পরিপক্কতাই নির্দেশ করে।

মুগ্ধ পিতা কিন্তু থেমে থাকেননি। একটি চিঠিসহ নিবন্ধটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার বন্ধু সিলেটের 'আল-ইসলাহ' সম্পাদক মুহাম্মদ নূরুল হকের কাছে। অনেক পরে আল-ইসলাহ পিতার পত্রসহ *'কেন বই পড়ি'*, নিবন্ধটি প্রকাশ করে। পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পরিশিষ্ট আকারে পিতার পত্রসহ নিবন্ধটি গ্রন্থিত হলো।

হুমায়ূন আহমেদ-এর উপন্যাসগুলোর দিকে নজর দিলেই দেখা যাবে প্রথম আট/দশটি বইয়েই তিনি উপন্যাসের প্রচলিত শিল্পরূপের প্রায় সবগুলোই প্রয়োগ করেছেন। আত্মকথন, চরিত্র কথন, বর্ণনামূলক, নাট্যরীতি তথা সংলাপ প্রাধান্যের কোনোকিছুই বাদ দেননি। ব্যাপক প্রস্তুতি ছাড়া যা অকল্পনীয়।

ঘুলঘুলি গলে আসা জোছনার ফুল হাতে ধরার আকুতি (দ্রষ্টব্য *ছেলেবেলা*) হুমায়ূন-সাহিত্যের প্রতীক-সদৃশ। জীবনের সৌন্দর্য অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠাই যার সারকথা। আর এই বৈশিষ্ট্যের পথ ধরেই অনায়াসে তিনি পাঠককে বর্ণিত উপাখ্যানের সঙ্গে একাত্ম করে নেন। এখানেই তার জয়।

অনবদ্য সংলাপ হুমায়ূনের আরেকটি বড় অবলম্বন। সংলাপ বর্ণিত চরিত্রকে এমনভাবে জীবন্ত করে তোলে যে বর্ণনার ভারে পাঠককে পীড়িত করে তোলার প্রয়োজন করে না। বরং বর্ণনার বাহুল্য এড়িয়ে হুমায়ূন পাঠককে তার কল্পনা বিস্তারের এমন অবাধ সুযোগ করে দেন যে নিজের অজান্তেই পাঠক নিজেকে পঠিত কাহিনীর অংশে পরিণত করে নেন।

আমরা যদি 'নন্দিত নরকে'-কেই উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করি দেখতে পাব বই-এর নামকরণেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বিধৃত। নরক হয়েও নিরঙ্কুশ নিন্দিত নয়— নন্দিতও বটে। দুঃখ-যন্ত্রণা, অনভিপ্রেত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে

জীবন বা জগত নরক সদৃশ, মানবিক স্নেহমমতা আর অনাবিল আবেগের দ্যুতিময় বিচ্ছুরণে তা নন্দিত— জীবনের সৌন্দর্যেরই এ এক জয়গাথা।

উপন্যাস শ্রেণী বিচারে কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গতভাবেই এতে কথা বা গল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কথাকে অবলম্বন করেই প্রকাশ পায় লেখকের বক্তব্য। ঔপন্যাসিককে তাই কথকতা বা গল্প বলায় পারদর্শী হতে হয়। শিল্পের এ দিকটির উপর হুমায়ূন আহমেদের দখল, তার পাঠকদের কাছে অন্তত, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

হুমায়ূন যেমন বলতে জানেন, তেমনি জানেন কোথায় থামতে হবে। আশ্চর্য সংযমের ফলেই তার কাহিনী কখনো অরুচিকর কিংবা ক্লান্তিকর হতে পারে না। হুমায়ূন সাহিত্যে সার্থক কথকতার এ দিকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখযোগ্য যে, ব্যতিক্রমধর্মী বা চেতনাশ্রয়ী যেসব উপন্যাসে কাহিনীকে প্রাধান্য দেয়া হয় না তাও কোনো ঘটনা বা গল্পের বীজকে অবলম্বন করেই পল্লবিত হয়।

হুমায়ূন আহমেদ তার অনন্য সৃষ্টির জগতে আজো নিরলসযাত্রী। নতুন নতুন অবদানে তিনি আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। উন্মোচিত হচ্ছে নতুনতর অধ্যায়। হুমায়ূন আহমেদ রচনাবলির প্রথম খণ্ডে যার সূচনাপর্ব গ্রন্থিত হলো। রচনাবলি মহান এই সাহিত্য-স্রষ্টাকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।

অন্যপ্রকাশের মাজহারুল ইসলাম এই রচনাবলি সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন। এ সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নিরলস সহযোগিতা দিয়ে আবদুল্লাহ্ নাসের আমার কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন মোমিন রহমান। সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম দিককার বইগুলোর প্রথম সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। ফলে গ্রন্থপঞ্জিতে কিছু তথ্যগত ঘাটতি থেকে গেল। পরবর্তী সংস্করণে এ ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হবে বলেই আশা রাখি।

সালেহ চৌধুরী

সূচি

উপন্যাস

নন্দিত নরকে ১৭
শঙ্খনীল কারাগার ৬৭
অচিনপুর ১৩৫
নির্বাসন ১৭৯
শ্যামল ছায়া ২১৭
সৌরভ ২৫৩

ছোটগল্প

নিশিকাব্য ৩২৫

সায়েন্স ফিকশন

তোমাদের জন্য ভালোবাসা ৩৮৫

স্মৃতিকথা

আমার ছেলেবেলা ৪৩৫

নাটক

নৃপতি ৫১৫

শিশুতোষ রচনা

নীল হাতি ৫৫৩

পরিশিষ্ট ৫৭৯

উপন্যাস

নন্দিত নরকে

রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা ক'টিই বারবার বলছিল।

রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখলাম তার ফরসা কান লাল হয়ে উঠেছে। সে তার জ্যামিতি খাতায় আঁকি-ঝুকি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 'দাদা, একটু পানি খেয়ে আসি' বলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। রুনু বারো পেরিয়ে তেরোতে পড়েছে। রাবেয়ার অশ্লীল কদর্য কথা তার না বোঝার কিছু নেই। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠেছিল। হয়তো সে কেঁদেই ফেলত। রুনু অল্পতেই কাঁদে। আমি রাবেয়াকে বললাম, ছিঃ, রাবেয়া, এসব বলতে আছে ? ছিঃ! এগুলি বড় বাজে কথা। তুই কত বড় হয়েছিস।

রাবেয়া আমার এক বৎসরের বড়। আমি তাকে তুই বলি। পিঠাপিঠি ভাই বোনেরা একজন আরেকজনকে তুই বলেই ডাকে। রাবেয়া আমাকে তুমি বলে। আমার প্রতি তার ব্যবহার ছোটবোন সুলভ। সে আমার কথা মন দিয়ে শুনল। কিছুক্ষণ ধরেই বালিশের গায়ে চাদর জড়িয়ে সে একটা পুতুল তৈরি করছিল। আমার কথায় তার ভাবান্তর হলো না। পুতুল তৈরি বন্ধ রেখে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পা নাচাতে নাচাতে সেই নোংরা কথাগুলি আগের চেয়েও উঁচু গলায় বলল। আমি চুপ করে রইলাম। বাধা পেলেই রাবেয়ার রাগ বাড়বে। গলার স্বর উঁচু পর্দায় উঠতে থাকবে। পাশের বাসার জানালা দিয়ে দু'একটি কৌতূহলী চোখ কী হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করবে।

রাবেয়া বলল, আমি আবার বলব।

বেশ।

কী হয় বললে ?

আমি কাতর গলায় বললাম, সে ভারি লজ্জা রাবেয়া। এটা খুব একটা লজ্জার কথা।

তবে যে ও আমাকে বলল ?

কে ?

আমি বুঝতে পারছি রাবেয়া নিশ্চয়ই কথাগুলি বাইরে কোথাও শুনে এসেছে। কিন্তু রাবেয়াকে, যার বয়স গত আগস্ট মাসে বাইশ হয়েছে, তাকে সরাসরি এমন একটি কদর্য কথা কেউ বলতে পারে ভাবিনি।

আমি বললাম, কে বলেছে ?

আজ সকালে বলেছে।

কে সে ?

ঐ যে লম্বা ফরসা।

রাবেয়া সেই ছেলেটির আর কোনো পরিচয়ই দিতে পারবে না। আবারও রাবেয়া বেড়াতে বেরোবে, আবার হয়তো কেউ এমনি একটি ইতর অশ্লীল কথা বলে বসবে তাকে।

খোকা, তোর দুধ।

মা দুধের বাটি টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। কাল রাতে তাঁর জ্বর এসেছিল। বেশ বাড়াবাড়ি রকমের জ্বর। বাবা মাঝ রাত্তিরে আমার দরজায় ঘা দিয়েছিলেন। আমার ঘুমের ঘোর না কাটতেই শুনলাম, তোর কাছে অ্যাসপিরিন আছে খোকা ?

স্বপ্ন দেখছি এই ভেবে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই মায়ের কান্না শুনলাম। মা অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অল্প জ্বর, মাথাব্যথা, এতেই কাহিল।

বাবা আবার ডাকলেন, খোকা, তোর কাছে অ্যাসপিরিন আছে ?

তোশকের নিচে আমার ডাক্তারখানা। অ্যাসপিরিন, ডেসপ্রোটেব এই জাতীয় ট্যাবলেট জমানো আছে। অন্ধকারেই আমি মাঝারি সাইজের ট্যাবলেট খুঁজতে লাগলাম। এ ঘরে আলো নেই। কোথাও যেন তার জ্বলে গেছে। রাতে হারিকেন জ্বালানো হয়। ঘুমোবার সময় রুনু হারিকেন নিবিয়ে দেয়। আলোতে রুনুর ঘুম হয় না। বাবা বললেন— খোকা, পেয়েছিস ?

হুঁ। কী হয়েছে ?

তোর মা'র জ্বর।

জ্বরে অ্যাসপিরিন কী হবে ?

খুব মাথাব্যথাও আছে।

অ।

তিনটি ট্যাবলেট হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই বারান্দায় লাগানো পঁচিশ পাওয়ারের বাল্বের আলো এসে পড়ল। কী বাজে ব্যাপার। একটিও অ্যাসপিরিন নয়। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, ঘরে দেশলাই রাখতে পারিস না ?

মনে পড়ল ড্রয়ারে একটি নতুন দেশলাই আর তিনটি ব্রিস্টল সিগারেট রয়েছে। সারাদিনে পাঁচটার বেশি খাব না ভেবেও সাতটা হয়ে গেছে। আর এখন এই মধ্যরাতে একটা তো জ্বালাতেই হবে। কিছুক্ষণের ভেতরই একটা সিগারেট ধরাব, এতেই মনটা ভরে উঠল। বাবা অ্যাসপিরিন নিয়ে চলে গেলেন। দেশলাই জ্বালাতেই চোখে পড়ল রাবেয়া বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। প্রায় সমস্তটা শাড়ি পাকিয়ে পুঁটলি বানিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছে। শীতের সময় মশা থাকে না, মশারির আব্রুও সেই কারণেই অনুপস্থিত। বাবার গলা শোনা গেল, নাও শানু, খেয়ে ফেল ট্যাবলেটটা।

আশ্চর্য! বাবা এমন আদুরে গলায় ডাকতে পারেন। আমার লজ্জা করতে লাগল। বাবা আবার ডাকলেন, শানু, শানু।

শাহানা নামটাকে কী সুন্দর করে ভেঙে শানু ডাকছেন বাবা। আমার আর বাবার ঘরের ব্যবধানটা বাঁশের বেড়ার ব্যবধান। উপরের দিকে প্রায় দুহাত খানিক ফাঁকা। সামান্যতম শব্দের কথাও আমার ঘরে ভেসে আসে। আমি একটা চুমুর শব্দও শুনলাম।

আমার মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া হয়। আমার তোশকের নিচে চারটা ভেলিয়াম-টু ট্যাবলেট আছে। কিন্তু আমি কখনো ভেলিয়াম খাই না। ঘুমের ওষুধ হার্ট দুর্বল করে। আমার বন্ধু সলিল ঘুমানোর জন্য দুটি মাত্র বড়ি খেয়ে মারা গিয়েছিল। তার হার্টের অসুখ ছিল। আমারও হয়তো আছে। আমার মাঝে মাঝে বুকের বাম পাশে চিনচিনে ব্যথা হয়।

আমি হাজার ইনসমনিয়াতেও ঘুমের ওষুধ খাই না। মাঝে মাঝে এ জন্যে আমার বেশ অসুবিধা হয়। মাঝরাতে বাবা যখন 'শানু শানু এই শাহানা' বলে ডাকতে থাকেন, তখন আমার কান গরম হয়ে ওঠে। নাক ঘামতে থাকে। হার্টের স্পন্দন দ্রুত ও স্পষ্ট হয়। রাতের নাটকের সব ক'টি কথা আমার জানা। মা বলেন, আহা কর কী ? ছি!

বাবা ফিসফিস করে কী বলেন। তাঁর গলা খাদে নেমে আসে। মা জড়িত কণ্ঠে হাসেন। আমি দু' হাতে আমার কান বন্ধ করে ফেলি। নিজের বুকের শব্দটা সে সময় বড় বেশি স্পষ্ট মনে হয়। কিছুক্ষণের ভিতরই আবার সব নীরব হয়। রুনু আর রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বিজবিজ করে। টেবিল ঘড়ির টক টক টক টক শব্দ আবার ফিরে আসে। আমি টেবিলে রাখা জগে মুখ লাগিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই।

বারান্দার এক পাশে দুটি হাস্নুহেনা গাছ আছে। মা বলেন হাছনা হেনা। দুটোই প্রকাণ্ড। রাতেরবেলায় তার পাশে এসে দাঁড়ালে ফুলের গন্ধে নেশার মতো হয়। হাস্নুহেনার গন্ধে নাকি সাপ আসে। মন্টু এই গাছের নিচেই একবার একটা মস্ত সাপ মেরেছিল। চন্দ্রাবোড়া সাপ। মা দেখে আঁতকে উঠে বলেছিলেন, কী করলি রে মন্টু, এর জোড়াটা যে এবার তোকে খুঁজে বেড়াবে।

আমি যদিও এসব বিশ্বাস করতাম না তবু আমারও ভয় লাগছিল, আমি তন্নতন্ন করে অন্য সাপটাকে খুঁজলাম। বাড়ির চারপাশে কার্বলিক এসিড দেয়া হলো। মাস্টার চাচা বললেন, 'যে সাপটা রয়ে গেছে সেটা পুরুষ সাপ।' সাপ দেখে তিনি স্ত্রী-পুরুষ বলতে পারতেন। ক'দিন সবাই খুব ভয়ে ভয়ে কাটালাম। যদিও সেই পুরুষ সাপটিকে কখনো দেখা যায়নি।

রাবেয়া বলল, মা, আমি দুধ খাব।

মা'র কাল রাতে জ্বর এসেছিল। তাঁর মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। রাবেয়ার কথা শুনে মা'র মুখ আরো শুকিয়ে গেল। তাঁকে বাচ্চা খুকির মতো দেখাতে লাগল। আমি জানি আমরা কেউ যখন কোনো একটা জিনিসের জন্যে আবদার করি এবং মা যখন সেটি দিতে পারেন না তখন তাঁর মুখ এমনি লম্বাটে হয়ে বাচ্চা খুকিদের মতো

দেখাতে থাকে। তাঁর নাকের পাতলা চামড়া তিরতির করে কাঁপতে থাকে। ছোট বয়সে মা'র এই ভঙ্গিটাকে আমার খুব খারাপ লাগত। আমি একটি জিনিস চেয়েছি মা সেটি দিতে পারছেন না। তাঁর মুখ বাচ্চা খুকিদের মতো হয়ে গিয়েছে। নাকের ফরসা পাতলা পাতা তিরতির করে কাঁপছে। মায়ের এই ভঙ্গিটাকে আমার অপরাধীর ভঙ্গি বলে মনে হতো। আমি মাকে কী করে কষ্ট দেয়া যায় তা ভাবতে থাকতাম। মা'র গায়ে একটি টিকটিকি ছুড়ে দিতে ইচ্ছে হতো। মা টিকটিকিকে বড় ভয় পান। মুখে বলেন ঘৃণা কিন্তু আমি জানি এ তাঁর ভয়। একবার মা ভাত খেতে বসেছেন, হঠাৎ ছাদ থেকে একটি ছোট টিকটিকির বাচ্চা এসে পড়ল তাঁর মাথায়। তিনি হড়হড় করে বমি করে ফেললেন। মা'র উপর রাগ হলেই আমি টিকটিকি খুঁজতাম। কিন্তু টিকটিকি খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। পেলেও ধরা যেত না। কাপড়ের বল বানিয়ে ছুড়ে ছুড়ে মারতাম দেয়ালে টিকটিকির গায়। টুপ করে তার ল্যাজ খসে পড়ত। সেই ল্যাজও মা ঘেন্না করতেন। মা কখনো আমাদের কিছু বলতেন না। মা বড় বেশি ভালো মানুষ। বাবা মারতেন প্রায়ই। ভীষণ মার। মা বলতেন, আহা কী কর। আহা ব্যথা পায় না ? বাবা বলতেন, যাও, সরে যাও সামনে থেকে। আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ তুমি। মাকে তখন বড় বেশি অসহায় মনে হতো। আর আমার ইচ্ছে হতো কাল ভোরেই বাড়ি থেকে পালাব। আর কখনো আসব না।

মা, আমাকে দুধ দাও!

রাবেয়া জিদ করতে লাগল। আমি বাটিটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মা মৃদু কণ্ঠে বললেন, আহা, খা না তুই, তোর পরীক্ষা।

দুধের বিলাসিতাটুকু আমার জন্যেই। সামনেই এমএসসি ফাইনাল, রাত জেগে পড়ি। নয়টার দিকে মা দুধ নিয়ে আসেন। আমি দুধে চুমুক দিতেই মা নীরবে রাবেয়ার শাড়ি থেকে একটি একটি করে সেফটিপিন খুলতে থাকেন। রাবেয়ার শাড়িতে গোটা দশেক সেফটিপিন সারাদিন লাগানো থাকে। সমস্ত দিন সে ঘুরে বেড়ায়। তার অনাবৃত শরীর ভুলেও যেন কারুর চোখে না পড়ে এই ভয়েই মা এটা করেন। রাবেয়াকে ঘরে আটকে রাখা যাবে না— তাকে সালোয়ার কামিজও পরানো যাবে না। তার সে বয়স নেই। অথচ সবাই রাবেয়ার দিকে অসঙ্কোচে তাকাবে। বয়স হলেই ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকায়। সেই তাকানোয় লজ্জা থাকে, দৃষ্টিতে সঙ্কোচ থাকে। কিন্তু রাবেয়ার ব্যাপারে সঙ্কোচ বা লজ্জার কোনো কারণ নেই। রাবেয়াকে যে কেউ অতি কুৎসিত কথা বললেও সে হাসিমুখে সে কথা শুনবে। বাড়ি এসে অনায়াসে সবাইকে বলে বেড়াবে।

মা রাবেয়ার পাশে বসে রাবেয়ার মাথায় হাত রাখলেন। আমি একটি ছোট কিন্তু স্পষ্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। রাবেয়া ঢকঢক করে দুধ খাচ্ছে। রাবেয়া হয়তো ঠিক রূপসী নয়। কিংবা কে জানে হয়তো রূপসী। রঙ হালকা কালো। বড় বড় চোখ, স্বচ্ছ দৃষ্টি, সুন্দর ঠোঁট। হাসলেই চিবুক আর গালে টোল পড়ে। যে সমস্ত মেয়ে হাসলে টোল পড়ে তারা কারণে অকারণে হাসে। তারা জানে হাসলে তাদের ভালো

দেখায়। রাবেয়া তা জানে না, তবু সে হাসে। ছোট বেলায় চৌকাঠে পড়ে গিয়েছিল। দুধ শেষ করে রাবেয়া বলল, বাজে দুধ। ছিঃ!

মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, শুভাপুরের পীর সাহেবের কাছে যাবি একবার ? শুভাপুরে এক পীর সাহেব থাকেন। পাগল ভালো করতে পারেন বলে খ্যাতি। শুভাপুর এখান থেকে আট মাইল। সাইকেলে ঘণ্টাখানেক লাগে। কিন্তু আমি জানি পীর ফকিরে কিছু হবে না। বড় ডাক্তার যদি কিছু করতে পারে। কিন্তু আমাদের পয়সা নেই। আমার ছোট হয়ে যাওয়া শার্ট মন্টু পরে। আমরা কাপড় কিনি বৎসরে একবার, রোজার ঈদে।

রুনু আসল একটু পরেই। আড়চোখে দু'তিন বার তাকাল রাবেয়ার দিকে। না, রাবেয়া সেই কুৎসিত কথাগুলি আর বলছে না। রুনু হাই তুলল। তার ঘুম পাচ্ছে। চোখ ফুলে উঠেছে। রাবেয়ার নোংরা কথা শুনে রুনুর কেমন লেগেছিল কে জানে। রুনুর বয়স এখন তেরো। আগামী নভেম্বরে চৌদ্দতে পড়বে। রুনুর বৃশ্চিক রাশি। আমার যখন এমন বয়স ছিল তখন এ ধরনের কথা শুনে বেশ লাগত। সেই বয়সে মেয়েদের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগত। টগর ভাইয়ের বাসায় সন্ধ্যাবেলা অঙ্ক বুঝতে যেতাম। নিলু বলে তার একটা ছোট বোন ছিল। বড় হয়ে এই মেয়েটিকে বিয়ে করব ভেবে বেশ আনন্দ হতো আমার। নিলুর সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা লাগত, কথা বেঁধে যেত মুখে। নিলু যখন আমার হাত ধরে টেনে বলত, আসুন না দাদুভাই, লুডু খেলি— তখন অকারণেই আমার কান লাল হয়ে উঠত। গলার কাছটায় ভার ভার লাগত।

রুনুরও কি কোনো ছেলেকে ভালো লাগে ? রুনুও কি কখনো ভাবে বড় হয়ে আমি এই ছেলেটিকে বিয়ে করব ? কে জানে। হয়তো ভাবে, হয়তো ভাবে না। রুনু বড় লক্ষ্মী মেয়ে। এত লক্ষ্মী আর এত কোমল যে আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কেন জানি না আমার মনে হয় এ ধরনের মেয়েরা সুখ পায় না জীবনে। আমি রুনুকে অনেক বড় করব। রুনু ডাক্তার হবে বড় হলে। স্টেথোসকোপ গলায়, কালো ব্যাগ হাতে মেয়ে ডাক্তারদের বড় সুন্দর দেখায়। রুনু অঙ্ক ভালো পারে না। আমি তাকে নিজের পড়া বন্ধ রেখে অ্যালজেবরা বোঝাই। ডাক্তারি পড়তে অবশ্যি অঙ্ক লাগে না।

সেদিন রুনুর অঙ্ক খাতা উল্টে চমকে গিয়েছিলাম। বেশ গোটা গোটা করে লেখা— 'আমি ভালোবাসি'। পরের কথাগুলি পড়ে অবশ্যি আমি লজ্জাই পেলাম। সেটি একটি ছেলেমানুষি কবিতা। আমি পৃথিবীর এই সৌন্দর্য ভালোবাসি, গাছ-পালা-গান ভালোবাসি— এই জাতীয়। আমি বললাম, সুন্দর কবিতা হয়েছে রুনু।

রুনু লজ্জায় গলদা চিংড়ির মতো লাল হয়ে বলল, যাও ভারি তো। এটা মোটেই ভালো হয়নি। আমি বললাম, তাহলে তো মনে হয় অনেক কবিতা লিখেছিস ?

উঁহু!

রুনু মাথা নিচু করে হাসতে লাগল। আমি বললাম, দেখা রুনু, লক্ষ্মী মেয়ে তুই।

রুনু আরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে আমার ট্রাঙ্ক খুলল। তার যাবতীয় গোপন সম্পত্তি আমার ট্রাঙ্কে থাকে। এই বয়সে কত তুচ্ছ জিনিস অন্যের চোখের আড়াল করে রাখতে হয়। কিন্তু রুনুর নিজস্ব কোনো বাক্স নেই। আমার ট্রাঙ্কের এক পাশে তার দুটি বড় বড় চারকোনো বিস্কুটের বাক্স থাকে। আর কিছু খাতাপত্রও থাকে দেখেছি। রুনু হাতির ছবি আঁকা একটা দু'নম্বরি খাতা নিয়ে এসে লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল।

আমি বললাম, তুই পড়ে শোনা আমাকে।

না, তুমি পড়।

দে তাহলে আমার হাতে।

রুনু খাতাটা গুঁজে দিয়ে দৌড়ে পালাল। দেখলাম সব মিলিয়ে বারোখানা কবিতা। দুটি মায়ের উপর, একটি পলার উপর। (পলা আমাদের পোষা কুকুর। এক দুপুরে কোথায় যে চলে গেল!) একটি মন্টুর সাপ মারা উপলক্ষে—

'মন্টু ভাই তো মারলেন মস্ত বড় সাপ
চার হাত লম্বা সেটি কী তার প্রতাপ।'

মনে মনে ভাবলাম, রুনুকে একটি ভালো খাতা কিনে দেব। রুনু খাতা ভর্তি করে ফেলবে কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে বাচ্চামেয়ের একটি চরিত্র আছে। মেয়েটি লিখতে শিখে অব্দি ঘরের দেয়াল, বইয়ের পাতা, মা'র হিসেবের খাতায় যা মনে আসত তাই লিখে বেড়াত। মেয়েটির দাদা তাকে একটি চমৎকার খাতা দিয়েছিল, যা তার জীবনে পরম সখের সামগ্রী হয়েছিল। কিন্তু আমার হাতে টাকা ছিল না। তবু আমি মনস্থির করে ফেললাম রুনুকে একটা খুব ভালো খাতা কিনে দেব। আমার মনে পড়ল হাতি মার্কা যে খাতাটায় রুনু কবিতা লিখেছে, রুনু সেটি আমার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছিল। যেখানে আমার নাম ছিল সেটি কেটে রুনু বড় বড় করে নিজের নাম লিখেছে। দিনে ক'ঘণ্টা পড়ছি তার হিসাব রাখার জন্যে খাতাটি কিনেছিলাম। সপ্তাহ দুয়েক যাবার পরও যখন কিছু লেখা হয়নি তখন একদিন রুনু সঙ্কুচিতভাবে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। সাপের মতো এঁকেবেঁকে বলল, দাদা, খাতাটা আমাকে দাও না!

কোন খাতা ?

এইটে।

যা, নিয়ে যা।

রুনু খাতা হাতে চলে গেল। তার মুখে সেদিন যে খুশির আভা দেখেছি আমি আবার তা দেখব। সাড়ে তিন টাকা দিয়ে প্লাস্টিকের সুদৃশ্য কাভারের চমৎকার একটি খাতা কিনে দেব তাকে।

আমার হাতে যদিও টাকা ছিল না তবু আমি রুনুকে খাতা কিনে দিয়েছিলাম। রুনুকে বড় ভালোবাসি আমি। বড় ভালোবাসি। রুনুকে দেখলেই আমার আদর করতে ইচ্ছে হয়। রুনু বড় লক্ষ্মী মেয়ে। রুনুর ভালো নাম সালেহা। রুনু নামটা

আমারই দেয়া। রুনুর জন্যে রুনু নামটাই মানানসই। রুনু নামে কেমন একটা বাজনার আমেজ আসে। আবার যখন দীর্ঘ স্বরে ডাকা হয় রু ˷˷˷ নু ˷˷˷ তখন কেমন একটা আমেজ আসে।

রুনু বলল, দাদা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

মা মশারি খাটিয়ে দিয়ে গেছেন। বেশ মশা এখন। রাতের সঙ্গে সঙ্গে মশাও বাড়তে থাকবে। আমার কানের কাছে গুনগুন করবে তারা। পড়ায় মন দিতে পারছি না, এমএসসি-তে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে আমার। একটা ভদ্র ভালো বেতনের চাকরির আমার বড় প্রয়োজন। রুনু গুটিসুটি মেরে রাবেয়ার পাশে শুয়ে পড়েছে। অবশ্যি সে এখন ঘুমোবে না। যতক্ষণ ঘরে আলো জ্বলে ততক্ষণ রুনু ঘুমোতে পারে না।

আমার পাশেই রাবেয়া আর রুনু শুয়ে আছে। এত পাশে যে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। রাবেয়াটা শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে। এক একবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদে। সে কান্না বিলম্বিত দীর্ঘ সুরের কান্না। পলাও মাঝে মাঝে এমন কাঁদত। মা বলতেন, দুর দুর! কুকুরের কান্না নাকি অমঙ্গলের চিহ্ন। গৃহস্থদের বিপদ দেখলেই কুকুর বেড়াল এই জাতীয় পোষা জীবগুলি কাঁদে। রাবেয়ার কান্নার উৎস আমরা জানি না। হয়তো সারা দিনের অবরুদ্ধ কান্না রাতে অঝোর ধারার মতোই নেমে আসে। রাবেয়ার কান্নায় রুনু ভয় পায়। বলে, দাদা, আপা কাঁদছে কেমন, দেখ।

আমি বলি, ভয় কি রুনু! উঁচু গলায় ডাকি, এই এই রাবেয়া, কাঁদো কেন ? কী হয়েছে ?

কোনো কোনো রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। জানালা গলে নরম আলো এসে পড়ে আমাদের গায়। জোছনায় নাকি হাস্নুহেনা খুব ভালো ফোটে। নেশা ধরানো ফুলের গন্ধে ঘর ভরে যায়। আমি ডাকি, রুনু ঘুমিয়েছিস ?

উঁহু।

গল্প শুনবি ?

বলো।

কী গল্প বলব ভেবে পাই না। গল্পের মাঝখানে থেমে গিয়ে বলি, এটা নয় আরেকটা বলি। রুনু বলে, বলো। সে গল্পও শেষ হয় না। আচমকা মাঝপথে থেমে গিয়ে বলি, তুই একটা গল্প বল রুনু।

আমি বুঝি জানি ?

যা জানিস তাই বল। বল না।

উঁহু, তুমি বলো দাদা।

রুনুকে আমার টমাস হার্ডির 'এ পেয়ার অব ব্লু আইস'-এর গল্প বলতে ইচ্ছে হয়। আমার মনে হয় রুনুই যেন 'এ পেয়ার অব ব্লু আইসে'র নায়িকা। কিন্তু রুনু আমার ছোট বোন। সামনের নভেম্বরে সে চৌদ্দ বৎসরে পড়বে। এমন প্রেমের গল্প

তাকে কী করে বলি! রুনু বলে, থেমে গেলে কেন দাদা? শেষ কর না!

আমি গল্প বন্ধ করে জিজ্ঞেস করি, রুনু, তোর কাকে সবচে' ভালো লাগে?

তোমাকে।

হয়তো আমাকে তার সত্যি ভালো লাগে। বাইরে তীব্র জোছনা, ফুলের অপরূপ সৌরভ, মশারি উড়িয়ে নেবার মতো বাতাস। বুকের কাছটায় গভীর বেদনা অনুভব করি।

এই আপা, এই!

কী হয়েছে রুনু?

দাদা, আপা আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিয়েছে।

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে পা তুলে দিয়েছে রুনুর গায়ে। বেশ স্বাস্থ্য রাবেয়ার। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের হয়তো ভরা যৌবনের মেয়ে বলে। ভরা যৌবন কথাটায় কেমন একটা অশ্লীলতার ছোঁয়া আছে। আমার কাছে যুবতী কথাটা তরুণীর চেয়ে অনেক অশ্লীল মনে হয়। কে জানে কেন!

পাশের বাসার লোকজনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত যত বাড়ে আশেপাশের শব্দ ততই স্পষ্ট হয়। দিনে কখনো থানার ঘড়ির ঘণ্টা শুনি না। রাত ন'টার পর থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশের বাসায় কে যেন কাশল। কিছুক্ষণ পর খিলখিল করে হাসির শব্দ শুনলাম। হাসির স্বরগ্রাম বেশ উঁচু। নিশ্চয়ই নাহার ভাবি। নাহার ভাবি উঁচুগলায় কথা বলেন। 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে'— নাহার ভাবি রেকর্ড চড়িয়েছেন। প্রায় রাতেই তিনি গান শোনেন। এই গানটি তাঁর ফেবারিট। আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়' সবচে ভালো লাগে। এই রেকর্ডটি তারা খুব কম বাজান। 'বিধি ডাগর আঁখি' বড় করুণ। নাহার ভাবি তো খুব হাসিখুশি। অথচ এমন একটি করুণ গান তার পছন্দ কেন কে জানে। 'যারা খুব হাসি-খুশি, করুণ সুর তাদের খুব মুগ্ধ করে'— কোথায় যেন পড়েছি। রুনু হঠাৎ ডাকল, দাদা, ঘুমিয়েছ?

না।

নাহার ভাবি গান বাজাচ্ছে।

হুঁ।

এরপর কোন গানটা বাজবে জানো?

না, কোনটা?

আধুনিক। 'জোনাকি ঝিকিমিকি জ্বালো আলো'।

সত্যি সত্যিই তাই বাজল। রুনু শব্দ করে হাসল।

আমি বললাম, তুই জানলি কী করে?

আমিই তো আজ দুপুরে সাজিয়ে রেখেছি। তোমার গান সবার শেষে।

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বলল, না না, বললাম তো যাব না।

হারুন ভাই যদি সত্যি সত্যি রাবেয়াকে বিয়ে করে ফেলত তবে আর মাঝরাতে গান শোনা হতো না। রাবেয়ার গান ভালো লাগে না। কে জানে কী তার ভালো লাগে। হারুন ভাইদের বাসার সবাই রাজি হলেও এ বিয়ে হতো না।

রাবেয়া যদি কোনোদিন ভালো হয়ে ওঠে তবে তাকে খুব একজন হৃদয়বান ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব। হারুন ভাইয়ের মতো একটি নিখুঁত ভালো ছেলে। সে-ও গভীর রাতে রেকর্ড বাজাবে। চাঁদের আলো এসে পড়বে তাদের দুজনার গায়। ভদ্রলোক রাবেয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলবেন, তোমার কপালে কিসের দাগ রাবেয়া ?

পড়ে গিয়েছিলাম চৌকাঠে।

তিনি সেই কাঁটা দাগের উপর অনেকক্ষণ হাত রাখবেন। তারপর চুমু খাবেন সেখানটায়।

রুনু আমায় ডাকল, দাদা, তোমার গান হচ্ছে।

আমি শুনলাম 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায় নিত্য হাসে কি উচ্ছ্বাসে'। আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠল। গানটি আমার বড় ভালো লাগে।

গান শুনতে শুনতে আমি নাহার ভাবির মুখ মনে আনতে চেষ্টা করলাম। মাঝে মাঝে খুব পরিচিত লোকদের মুখও আমি কিছুতেই মনে আনতে পারি না। নাহার ভাবির মুখটা ত্রিভুজ আকৃতির। হারুন ভাইয়ের বাসার সবার মুখ আবার লম্বাটে, ডিমের মতো। তারা সবাই ভারি সুন্দর। কয় পুরুষ ধনী থাকলে চেহারায় একটা আলগা লালিত্য আসে কে জানে। ভাবতে ভালো লাগে এই পরিবারটিতে কোনো দুঃখ নেই। মাসের পনেরো তারিখের পর থেকে খরচ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা এ পরিবারের মায়ের করতে হয় না। ইচ্ছে হলেই ইংরেজি ছবির মতো মোটরে করে এরা আউটিং-এ চলে যায়। স্বাধীনতা দিবসে এ পরিবারের মেয়েরা রাইফেল শুটিং-এ ফার্স্ট সেকেন্ড হয়।

তারা কবে এসেছিল শান্তি কটেজে আমার মনে নেই। তবে খুব বৃষ্টি সেদিন। আমি, রাবেয়া আর রুনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। জিপ থেকে ভিজতে ভিজতে নামল সবাই। প্রথমে রুনুর বয়সী একটি মেয়ে। নাম শীলা। বাবা আদর করে ডাকেন শীলু মা, মা শুধু বলেন শীলু। তারপর বড় ভাই, চোখে বুড়ো মানুষের চশমা হলেও একেবারে ছেলেমানুষি চেহারা। গাড়ি থেকে নেমেই চেঁচিয়ে উঠল, কী চমৎকার বাড়ি শীলু! বাবা নামলেন, মা নামলেন, চাকরবাকর নামল। আজিজ সাহেবদের চলে যাওয়ার অনেকদিন পর বাড়িটা ভরল। বর্ষা গিয়ে শীত আসল। ব্যাডমিন্টন কোর্ট কেটে হৈ হৈ করে দুই ভাইবোন লাভ ইলেভেন, লাভ টুয়েলভ করে খেলতে লাগল।

রুনু বড় লাজুক, নয় তো সে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারত। আমার খুব ইচ্ছে হতো মেয়েটির সঙ্গে রুনুর ভাব হোক। আমি দেখতাম সন্ধ্যা হলেই শীলু তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কবুতর উড়াত। তাদের দু'টি লোটন

পায়রা ছিল। কারণে অকারণে যেত রাবেয়া। তাকে আমরা বাধা দিতাম না। বাধা পেলেই রাবেয়ার মেজাজ বিগড়ে যেত। চিটাগাং-এ বড় খালার ভাসুর মস্ত ডাক্তার। তিনি বলেছিলেন, যা ইচ্ছে হয় তাই করতে দেবেন একে। দেখবেন যা এবনরমালিটি আছে তা আপনি সেরে যাবে। আমাদের চিকিৎসার টাকা ছিল না। নিখরচার চিকিৎসা তাই আমরা প্রাণপণে করতাম। একদিন মা কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার টেবিলে একটি কী যেন নামিয়ে রাখলেন। দেখি চমৎকার একটি কলমদানি। ধবধবে সাদা দু'টি পেঙ্গুইন পাখি কলমদানির দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পেঙ্গুইন দুটোর মাঝামাঝি একটি বাচ্চা পেঙ্গুইন হা করে শূন্যে তাকিয়ে। সেই হা করা মুখেই কলম রাখার জায়গা। আমার এ জাতীয় জিনিসের দাম সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবু মনে হলো এ অনেক দামি। মা কাঁপা গলায় বললেন, রাবেয়া এনেছে ও বাড়ি থেকে।

আমার প্রথমেই যা মনে হলো তা হলো রাবেয়া না বলেই এনেছে। কিন্তু রাবেয়া পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলতে লাগল, আমি আনিনি, ওরা আপনি দিয়েছে।

মিথ্যা রাবেয়া বলে না। কিন্তু ওরাই বা কেন দেবে ? এমন একটা সৌখিন জিনিস হঠাৎ করে দিতে হলে যে দীর্ঘ পরিচয় প্রয়োজন তা কি আমাদের আছে ? খবরের কাগজে কলমদানিটি মুড়ে রুনু প্রথমবারের মতো ও বাড়ি গেল। রাবেয়া নাকি সুরে বলতে লাগল, আমার জিনিস রুনু যে বড় নিয়ে চলল, ভেঙে ফেললে আমি মজা না দেখিয়ে ছাড়ব ?

জানা গেল রাবেয়া আনেনি, ওরাই দিয়েছে। না, ঠিক ওরা নয়, হারুন বলে যে ছেলেটি শিগগিরই বিদেশে যাবে, শুধু একটি পাসপোর্ট-এর অপেক্ষা— সে দিয়েছে। শীলু আর তার মাও ঠিক জানতেন না ব্যাপারটা। তারাও একটু অবাক হয়েছেন। শীলুর সঙ্গে এই অল্প সময়েই খুব ভাব হয়ে গেল রুনুর। একটি লম্বাটে মিমি চকলেট আর বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টি প্রদীপ' সে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, ওরা কেমন লোক রুনু ?

খুব ভালো।

চকলেট পেয়ে গলে গেছিস, না ?

যাও! শীলু কিন্তু সত্যি ভালো। জানো, শীলু মোটর চালাতে পারে।

যাহ্! এতটুকু বাচ্চামেয়ে!

সত্যি! ওদের মোটর সারাতে দিয়েছে। যখন আসবে তখন সে দেখাবে চালিয়ে।

আর কী গল্প হলো ?

কত গল্প, ওদের অনেক রেকর্ড আছে।

অনেক ?

হুঁ, হিসাব নেই এত। আমাকে রোজ যেতে বলেছে।

শুধু তুই যাবি। ও আসবে না ?

আসবে না কেন ? নিশ্চয়ই আসবে।

শীলু অবশ্যি এসেছে কালে-ভদ্রে। যখন তার রুনুর সঙ্গে দরকার পড়ত তখনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকত, রুনু রুনু। রুনু সব কাজ ফেলে ছুটে যেত। আমি মনে মনে চাইতাম মেয়েটা ঘনঘন আসুক আমাদের কাছে। তার সাথে গল্প করার ইচ্ছা হতো আমার। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম তার সঙ্গে যদি আলাপ হয় তবে কী বলব। দু'রাতে তাকে স্বপ্নেও দেখেছি।

একটি স্বপ্নে সে শাড়ি পরে এসে খুব পরিচিত ভঙ্গিতে বসেছে আমার টেবিলে। আমি বললাম, টেবিলে কেন শীলু, চেয়ারে বসো। শীলু হাসতে হাসতে বলল, টেবিলে বসতেই যে আমার ভালো লাগে। হাতে একটা চামচ নিয়ে টুং টাং করে চায়ের কাপে জলতরঙ্গের মতো একটা বাজনা বাজাতে লাগল সে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখেছি দিনেদুপুরে। অনুরোধের আসর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখলাম শীলু আসল। আগের মতোই শাড়ি পরা। আমি বলছি, শীলু এত দেরি কেন, কী চমৎকার গান হচ্ছিল।

আমার নাম তো শীলা, আপনি শীলু ডাকেন কেন ?

শীলুর সঙ্গে আমার কথা হতো এই ধরনের, হয়তো বিকেলে বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ শীলু ডাকল, শুনুন, একটু রুনুকে ডেকে দেবেন ?

বাবা পেঙ্গুইন পাখির কলমদানি দেখে খুব রাগ করলেন। বাবার পয়সা ছিল না বলেই হয়তো অহঙ্কার ছিল। শীলুদের পরিবারকে তাঁর একটুও পছন্দ হতো না। নিজে আজীবন কষ্ট পেয়েছেন, অন্যের সুখ সে কারণে সহজভাবে নেয়ার মানসিকতা তাঁর ছিল না। প্রথম জীবনে ছিলেন স্কুলমাস্টার। প্রাইভেট স্কুল। মাইনের ঠিক ছিল না। আমরা সব তাঁর মাইনের উপর নির্ভর করে আছি দেখে মাস্টারি ছেড়ে ঢুকলেন ফার্মে। বারো বছরে ক্যাশিয়ার থেকে অ্যাকাউন্টেন্ট হলেন। মাইনে সাড়ে তিনশ'। কলমদানিটা ফিরিয়ে দেবার জন্য বাবা পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু রুনু বা মা কেউ সে নিয়ে আগালো না। কলমদানির পেঙ্গুইন পাখিটি ধ্যানী মূর্তির মতো বসে রইল আমার টেবিলে। রাবেয়া শুধু মাঝে মাঝে আমায় বলে, তোমার টেবিলে বলে এটা তোমার মনে করো না খোকা। আচ্ছা, ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে কলম রেখো।

ঘুমের ঘোরে রুনু বলল, না, পানি খাব না। তারপর আরো খানিকক্ষণ 'উঁহু উঁহু' করল। থানার ঘড়িতে ঢং করে শব্দ হলো একটা। সাড়ে-বারো, এক কিংবা দেড় যে-কোনোটা হতে পারে। আমার আরেকটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কে যেন বলেছিল সিগারেটের আনন্দটা আসলে সাইকোলজিকেল। তুমি একটা কিছু পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছ তার আনন্দ। অনেকে আবার বলেন, নিঃসঙ্গের সঙ্গী। এই মধ্যরাতে আমি একলা জেগে আছি, নিঃসঙ্গ তো বটেই! সিগারেটের একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম সিনেমায়। সমস্ত পর্দা অন্ধকার। আবছা আলোয় হলে দেখা গেল বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে কে একজন। চারপাশে কেউ নেই, ভুতুড়ে আবহাওয়া,

থমথম করছে অন্ধকার। পর্দায় দেখা হলো 'সে কি নিঃসঙ্গ ?' লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। পর্দায় লেখা হলো— 'না, নিঃসঙ্গ নয়। এই তো তার সঙ্গী।' চমৎকার বিজ্ঞাপন। আমার মনে হয় সিগারেটের নেশার মূল্যের চেয়ে বন্ধুত্বের মূল্য অনেক বেশি।

খুট করে দরজা খোলার শব্দ হলো। আমি কান পেতে রইলাম। কে হতে পারে ? বাবা নিশ্চয়ই নন, তিনি ওঠেন সাড়াশব্দ করে, দরজা খোলেন ধুমধাম শব্দ করে। মন্টু অথবা মাস্টার কাকা হবেন। টিউবওয়েলে পানি তোলার শব্দ হলো অনেকক্ষণ। ছড় ছড় করে পানি পড়ার আওয়াজ। কুলি করে পানি ছিটাতে ছিটাতে এদিকেই যেন আসছে। হ্যাঁ, মাস্টার কাকাই। তাঁর মাঝে মাঝে অনেক রাতে ফুল গাছের কাছে চেয়ার পেতে গুনগুন করে গান গাওয়ার শখ আছে। পলা বেঁচে থাকলে প্রথমটায় অপরিচিতজন ভেবে ঘেউ ঘেউ করত। তারপর গরগর করে পরিচিতজনের অভ্যর্থনা। মাস্টার কাকা বলতেন, কী-রে পলু, তোরও বুঝি ঘুম নেই ?

আমি বললাম, কে ?

মাস্টার কাকা বললেন, আমি, খোকা।

কী করেন ?

এই বসেছি একটু! যা গরম। তুই ঘুমুসনি এখনো ?

জি-না।

আসবি নাকি বাইরে ?

দরজা খুলে বেরুতেই চোখে পড়ল কাকা বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। বললাম, চেয়ারে বসেন। চেয়ার নিয়ে আসি।

না, থাক।

আমি তাঁর পাশে বসলাম। গরম কোথায় ? আশ্বিনের শেষাশেষি একটু শীত শীতই করছে। মাঝে মাঝে ঠান্ডা বাতাসও বইছে। মাস্টার কাকারও বোধকরি মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া হয়। কাকা বললেন, ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। তারপর আর হাজার চেষ্টাতেও ঘুম আসছে না।

আমি বললাম, প্রথম রাত্রিতে ঘুম ভাঙলে এরকম হয়।

কাকা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা মৃদু দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম।

কাকা খুব নিচু গলায় বললেন, কী মিষ্টি গন্ধ দেখেছিস ? আমি যখন শিউলিতলা থাকতাম তখন স্কুলে যাওয়ার পথে একটা কাঁঠাল-চাঁপার গাছ পড়ত, ভারি গন্ধ।

কাকা, কাঁঠাল-চাঁপার গন্ধ আমার বাজে লাগে। বড় বেশি কড়া।

কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি। এখন প্রায় রাত দুটো।

আমিও আকাশের দিকে তাকালাম। খুব পরিষ্কার আকাশ। ঝক্‌ঝক্ করছে তারা। কাকা বললেন, দেখেছিস কত তারা? খুব যখন তারা ওঠে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয় শুনেছি।

আমার শীত করছে। তবু বেশ লাগছে বসে থাকতে। মাস্টার কাকাকে খুব ভালো লাগে আমার। অদ্ভুত মানুষ। বয়সে বাবার সমান। বিয়ে-টিয়ে করেননি। দুই যুগের বেশি আমাদের সঙ্গে আছেন। কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। বাইরের কেউ যদিও তা বুঝতে পারে না। বাইরের কেন, আমি নিজেই অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে বাবার আপন ভাই বলেই ভেবেছি। তিনি যে বাবার বন্ধু এবং শুধুমাত্র বন্ধু হয়েও আমাদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছেন তা আঁচ করতে কষ্ট হয় বৈকি! বাবার সঙ্গে মাস্টার কাকার পরিচয় হয় আনন্দ মোহন কলেজে। অনেক দিন আগের কথা সে সব। মা'র কাছ থেকে শোনা। সরাসরি তো আমরা বাবার কাছ থেকে কিছু জানতে পারতাম না। বাবা মাকে যা বলতেন মা তাই শোনাতেন আমাদের। মাস্টার কাকাকে বাবা অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন বলেই হয়তো খুঁটিনাটি সমস্ত বলেছেন মাকে।

খুব চুপচাপ ধরনের ছেলে ছিলেন মাস্টার কাকা। ক্লাসে জানালার পাশে একটি জায়গা বেছে নিয়ে সারাক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। তেমন চোখে পড়ার মতো ছেলে নয়। একটু কুঁজো, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে রয়েছে, শুকনো দড়ি পাকানো চেহারা। ক্লাসের সবাই ডাকত 'শকুন মামা' বলে। তবু বাবা তার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সমস্ত ব্যাপারে তার অদ্ভুত নির্লিপ্ততা আর অঙ্কে অস্বাভাবিক দখল দেখে। তাদের ভেতর প্রগাঢ় বন্ধুত্বও হয়েছিল অতি অল্প সময়ে। মাস্টার কাকা বলতেন, দুটি জিনিস আমি ভালোবাসি— প্রথমটি অঙ্ক, দ্বিতীয়টি এস্ট্রলজি। সেই অল্প বয়সেই মাস্টার কাকা নিখুঁত কুষ্টি তৈরি করতে শিখেছিলেন।

পরীক্ষার ঠিক আগে আগে মাস্টার কাকাকে কলেজ ছেড়ে দিতে হলো। তিনি একটি বিশেষ ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় খুব কম মেয়েই সায়েন্স পড়তে আসত আনন্দ মোহনে। এডভোকেট রাধিকা রঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে অনিলা চৌধুরী ছিলেন সব কটি মেয়ের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম।

খুব আকর্ষণীয় চেহারা ছিল, খুব ভালো গাইতে পারতেন, ছাত্রী হিসেবেও অত্যন্ত মেধাবী। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। কেউ সেধে বলতে এলে ঠান্ডা গলায় জবাব দিতেন। হয়তো কিছুটা অহঙ্কারী ছিলেন। তাঁকে জব্দ করার জন্যই ছেলেরা হঠাৎ করে অনিলা নাম পালটে 'শুকুনি মামি' বলে ডাকতে শুরু করল। 'শুকুন মামা ও শুকুনি মামি' এই নামে পদ্য লিখে বিলি করা হলো। মাস্টার কাকা তাঁকে 'শকুন মামা' ডাকায় কিছুই মনে করতেন না। কিন্তু এই ব্যাপারটিতে হকচকিয়ে গেলেন। অসহ্য বোধ হওয়ায় অনিলা চৌধুরী আনন্দ মোহন কলেজ ছেড়ে দেন। তার কিছুদিন পরই সপরিবারে তাঁরা কোলকাতায় চলে যান স্থায়ীভাবে।

অনিলার প্রতি হয়তো মাস্টার কাকার প্রগাঢ় দুর্বলতা জন্মেছিল। কারণ তিনিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলেজ ছেড়ে দেন। এরপর আর বহুদিন তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

প্রায় ছ'বছর পর বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো কুমিল্লার ঠাকুর পাড়ায়, বাবার নিজের বিয়েতে। বাবা চিনতে পারেননি। মাস্টার কাকা বাবার হাত ধরে যখন বললেন, আমি শরীফ আকন্দ, চিনতে পারছ না? তখন চিনলেন। সময়ের আগেই বুড়িয়ে গেছেন। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, আরো কুঁজো হয়ে পড়েছেন। বাবা অবাক হয়ে বললেন, কী আশ্চর্য, আবার দেখা হবে ভাবিনি। এখানে কোথায় থাক তুমি?

তুমি যে বাড়িতে বিয়ে করেছ আমি সে বাড়িতেই থাকি। বাচ্চাদের পড়াই।

বাবা বললেন, আসবে আমার সঙ্গে?

মাস্টার কাকা খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজি হলেন। সেই থেকেই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। বাবা স্কুলের মাস্টারি যোগাড় করে দিয়েছেন, তাঁর একার বেশ চলে যায় তাতে। তিনি জন্ম থেকেই আমাদের স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা। ছোটবেলার কথা যা মনে পড়ে তা হলো মাদুর বিছিয়ে বসে বসে পড়ছি তাঁর ঘরে, রাবেয়াটা হৈচৈ করছে, মাস্টার কাকা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলছেন, খোকা হাত মেলে ধর আমার সামনে, দু'হাত।

কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার অন্যমনস্কতা, বিড়বিড় করে কথা বলা। কান পাতলেই শোনা যায় বলছেন, সব ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। বৃত্ত দিয়ে ঘেরা। এর বাইরে কেউ যেতে পারবে না। আমি না, খোকা তুইও না।

বাবার সঙ্গে বিশেষ কথা হতো না তাঁর। বাবা নিজে কম কথার মানুষ, মাস্টার কাকাও নির্লিপ্ত প্রকৃতির।

মাস্টার কাকাকে বাইরে থেকে শান্ত প্রকৃতির মনে হলেও তাঁর ভেতরে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল। যখন স্কুলে পড়তাম তখন তিনি এস্ট্রলজি নিয়ে খুব মেতেছেন। কাজ-কর্মেও তাঁর মানসিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। গভীর রাতে খড়ম পায়ে হেঁটে বেড়াতেন। খটখট শব্দ শুনে কতবার ঘুম ভেঙে গেছে, কতবার মাকে আঁকড়ে ধরেছি ভয়ে। মা বলেছেন, ভয় কী খোকা, ভয় কী? ও তোর মাস্টার কাকা। বাবা ভারি গম্ভীর গলায় ডাকতেন, ও মাস্টার, মাস্টার, শরীফ মিয়া, ও শরীফ মিয়া।

খড়মের খটখট শব্দটা থেমে যেত। মাস্টার কাকা বলতেন, কী হয়েছে?

ছেলে ভয় পাচ্ছে, কী কর এত রাত্রে?

তারা দেখছিলাম। এত তারা আগে আর ওঠেনি। দেখবে?

পাগল। যাও ঘুমাও গিয়ে।

যাই।

মাস্টার কাকা খড়ম পায়ে খটখট করে চলে যেতেন।

আমাদের সবার পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছে তাঁর কাছে। আমি তাঁর প্রথম ছাত্র, তারপর মন্টু। পড়াশোনায় মন নেই বলে রাবেয়ার তো পড়াই হলো না। রুনু এখন পড়ে তাঁর কাছে। বাড়িতে তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই তাঁর। থাকলেও যাবার উৎসাহ পান না। অবসর সময় কাটে এস্ট্রলজির বই পড়ে। অঙ্কের মাস্টার হিসেবে এস্ট্রলজি হয়তো ভালোই বোঝেন। মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে বই এনে পড়ি আমি। বিশ্বাস হয়তো করি না। কিন্তু পড়তে ভালো লাগে। আমি জেনেছি মীন রাশিতে আমার জন্ম। মীন রাশির লোক দার্শনিক আর ভাগ্যবান হয়। তাদের জীবন চমৎকার অভিজ্ঞতার জীবন। প্রচুর সুখ, সম্পদ, বৈভব। বেশ লাগে ভাবতে। কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঐ যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখছ না ? ওর ডান দিকের ছোট্ট তারাটি হলো কেতু। বড় মারাত্মক গ্রহ। আমার জন্মলগ্নে কেতুর দশা চলছিল।

জানি না হয়তো জন্মলগ্নে কেতুর দশা থাকলেই আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়। গভীর রাতে অনিদ্রাতপ্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহগুলি পরখ করতে হয়। কাকাকে আমার ভালো লাগে। তার ভিতরে প্রচণ্ড জানবার আগ্রহটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সামান্য বেতনের সবটা দিয়ে এস্ট্রলজির বই কিনে আনেন। দেশ-বিদেশের কথা পড়েন। মাঝে মাঝে বেড়াতে যান অপরিচিত সব জায়গায়। কোথায় কোন জঙ্গলে পড়ে আছে ভাঙা মন্দির একটি, কোথায় বাদশা বাবরের আমলে তৈরি গেটের ধ্বংসাবশেষ। সামান্য স্কুলমাস্টারের পড়াশোনার গণ্ডি আর উৎসাহ এত বহুমুখী হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি মানুষ হিসেবে তত মিশুক নন। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি রকমের। কোনোদিন মায়ের সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে দেখিনি। খালি গায়ে ঘরোয়াভাবে ঘরে বসে রয়েছেন এমনও নজরে আসেনি।

স্কুলে কাকা আমাদের ইতিহাস আর পাটীগণিত পড়াতেন। ইতিহাস আমার একটুও ভালো লাগত না। নিজের নাম হুমায়ূন বলেই বাদশা হুমায়ূনের প্রতি আমার বাড়াবাড়ি রকমের দরদ ছিল। অথচ আমাদের ইতিহাস বইয়ে ফলাও করে শেরশাহের সঙ্গে তাঁর পরাজয়ের কথা লেখা। শেরশাহ আবার এমনি লোক যে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড করিয়েছে, ঘোড়ার পিঠে ডাক চালু করিয়েছে। কিন্তু এত করেও ক্লাস সেভেনের একটি বাচ্চা ছেলের মন জয় করতে পারেনি। পরীক্ষার খাতায় তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে আমার বড় রকমের গ্লানি বোধ হতো। সেই থেকেই সমস্ত ইতিহাসের উপরই আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কাকা তা জানতেন। একদিন আমায় বললেন, খোকা তোর প্রিয় বাদশা হুমায়ূনের কথা বলব তোকে, বিকেলে ঘরে আসিস।

সেই দিনটি আমার খুব মনে আছে। কাকা আধশোয়া হয়ে তাঁর বিছানায়, আমি পাশে বসে, রুনু মন্টু সেই ঘরে বসে বসে লুডু খেলছে। কাকা বলে চলেছেন, হুমায়ূন সম্পর্কে কে একজন ছোট্ট একটি বই লিখেছিলেন 'হুমায়ূন নামা।' বইটিতে হুমায়ূনকে তিনি বলেছেন দুর্ভাগ্যের অসহায় বাদশা। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্যবান বাদশা

হতে পারলে আমি বিশ্ববিজয়ী সিজার কিংবা মহাযোদ্ধা নেপোলিয়ানও হতে চাই না। যুদ্ধ বন্ধ রেখে চিতোরের রানির ডাকে তাঁর চিতোর অভিমুখে যাত্রা, ভিসতিওয়ালাকে সিংহাসনে বসানোর পিছনে কৃতজ্ঞতার অপরূপ প্রকাশ। গান, বই আর ধর্মের প্রতি কী আকর্ষণ! আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। যেখানে আযান শুনে হুমায়ূন লাইব্রেরি থেকে দ্রুত নেমে আসছেন নামাজে শামিল হতে, নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন, সে জায়গায় আমার চোখ ছলছল করে উঠল। কাকা বললেন, বড় হৃদয়বান বাদশা, সত্যিকার কবি-হৃদয় তাঁর। আমার মনে হলো আমিই যেন সেই বাদশা। আর আমাকে বাদশা বানানোর কৃতিত্বটা কাকার একার।

আজ এই আশ্বিনের মধ্যরাত্রি, কাকা বসে আছেন ঠান্ডা মেঝেতে। অল্প অল্প শীতের বাতাস বইছে। জোছনা ফিকে হয়ে এসেছে। এখনি হয়তো চাঁদ ডুবে চারদিক অন্ধকার হবে। আমার সেই পুরনো কথা মনে পড়ল। আমি ডাকলাম, কাকা, কাকা!

কী ?

অনেক রাত হয়েছে, ঘুমোতে যান।

যাই।

কাকা মন্থর পায়ে চলে গেলেন। আমি এসে শুয়ে পড়লাম। রাবেয়া ঘুমের মধ্যেই চেঁচাল, আম্মি আম্মি!

আমার মনে পড়ল রাবেয়া একদিন হারিয়ে গিয়েছিল। চৈত্র মাস। দারুণ গরম। কলেজ থেকে এসে শুনি রাবেয়া নেই। তার যাবার জায়গা সীমিত। অল্প কয়েকটি ঘর-বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় সে। দুপুরের খাবারের আগে আসে। খেয়ে দেয়ে অল্প কিছুক্ষণের ঘুম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়া। সেদিন সন্ধ্যা উৎরেছে রাবেয়া আসেনি। মা'র কান্না প্রায় বিলাপে পৌঁছেছে। মন্টু দুপুর থেকেই খুঁজছে। বাবা হতবুদ্ধি। একটি অপ্রকৃতিস্থ সুন্দরী যুবতী মেয়ের হারিয়ে যাওয়াটা অনেক কারণেই বেদনাদায়ক। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাকে কি আবার ফিরে পাওয়া যাবে ? রুনু চুপচাপ শুয়ে আছে তার বিছানায়। তার দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিটা বড় নীরব। এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা রুনুর ছোট শরীরটা একটা অসহায়তারই প্রতীক। আমায় দেখে রুনু উঠে বসল। বলল, কী হবে দাদা ?

তার চোখের কোণে চব্বিশ ঘণ্টাতেই কালি পড়েছে। আমি বললাম, পাওয়া যাবে রুনু, ভয় কী ?

কিন্তু ও যে ঠিকানা জানে না। কেউ যদি ওকে খুঁজে পায় ও কি কিছু বলতে পারবে ?

সে কিছুই বলতে পারবে না। তার বড় বড় চোখে সে হয়তো অসহায়ের মতো তাকাবে। মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট খুকির মতো শুধুই বলবে, আমি বাড়ি যাব। আমি বাড়ি যাব। সে বাড়ি যে কোথায় তা তার জানা নেই। রুনু আবার বলল, দাদা,

ও যদি কোনো বাজে লোকের হাতে পড়ে ?

রুনু বুঝতে শিখেছে। মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয় ছেলেদেরও আগে। তারা তাদের কচি চোখেও পৃথিবীর নোংরামি দেখতে পায়। সে নোংরামির বড় শিকার তারাই। তাই প্রকৃতি তাদের কাছে অন্ধকারের খবর পাঠায় অনেক আগেই।

রাবেয়া ফিরে এলো রাত আটটায়। সঙ্গে মাস্টার কাকা। বুকের উপর চেপে বসা দুশ্চিন্তা নিমিষেই দূর হলো। মাস্টার কাকা বললেন, ওকে আমি স্কুলের কাছে পাই, হারিয়ে গেছে আমি জানতাম না। এসব শোনার উৎসাহ আমার ছিল না। পাওয়া গেছে এই যথেষ্ট। স্কুল ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। মাস্টার কাকাকে দেখে দৌড়ে রাস্তা পার হলো, আরেকটু হলেই গাড়িচাপা পড়ত। এসবে এখন আর আমাদের উৎসাহ নেই। বাবা পর পর দুদিন রোজা রাখলেন।

খোকা ও খোকা!

কী ?

বাতি জ্বালো।

কেন ?

আমার বাথরুম পেয়েছে।

রাবেয়া মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। আমি বললাম, বাতি জ্বালাতে হবে না। আয়, বারান্দায় আলো আছে।

না, জ্বালো।

দেশলাই খুঁজে হারিকেন জ্বালালাম। দরজা খুলতেই ওঘর থেকে মা বললেন, কে ? শেষ রাতের দিকে মায়ের ঘুম পাতলা হয়ে আসে।

আমরা মা, রাবেয়া বাথরুমে যাবে।

বারান্দায় এসে রাবেয়া হাই তুলল। বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, কী চনমনে গন্ধ ফুলের, না ?

হুঁ। ফুলের গন্ধ তোর ভালো লাগে রাবেয়া ?

না, বাজে।

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, পলা কবে আসবে খোকা ?

পলার সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। মাঝে মাঝেই পলার কথা জানতে চায়। কে জানে কুকুরটা যে কিসের দুঃখে বিবাগী হলো।

আজ রাতেও একফোঁটা ঘুম হবে না। দু' মাস পরেই পরীক্ষা, এক রাত্রি ঘুম না হলে পরপর দুদিন পড়া হয় না। বুঝতে পারছি কোন ফাঁকে মশা ঢুকছে কয়েকটা। কেবলি গুনগুন করছে কানের কাছে। কান অথবা মুখের নরম মাংস থেকে এক ঢোক করে রক্ত না খাওয়া পর্যন্ত এ চলতেই থাকবে। পাখা করে মশা

তাড়াবার ইচ্ছে হচ্ছে না। বালিশে মাথা গুঁজে ঘুমের জন্যে প্রাণপণে আমার সমস্ত ভাবনা গুলিয়ে ফেলতে চাইলাম।

হঠাৎ করেই অনেকটা আলো এসে পড়ল ঘরে। শীলুদের বারান্দার একশত ওয়াটের বাল্বটা জ্বালিয়েছে কেউ। কে হতে পারে ? শীলুর বাবা না নাহার ভাবি ? শীলু কিংবা তার মাও হতে পারে। শীলুর মা চমৎকার মহিলা। একবার এসেছিলেন আমাদের ঘরে।

শীলুর মা যিনি সন্ধ্যায় লনে বসে শীলুর বাবার সঙ্গে হেসে হেসে চা খান, বিকেলে প্রায়ই হারুন ভাইয়ের পার্টনার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যাডমিন্টন খেলেন, যার একটি গাঢ় সবুজ শাড়ি আছে, যেটি পরলে তাঁর বয়স দশ বৎসর কম মনে হয়, তিনি একদিন এসেছিলেন আমাদের বাসায়। সেদিন ছিল শুক্রবার। রুনুর স্কুল বন্ধ ছিল, বাবা ছিলেন অফিসে। শীলুর মা লালবুটি দেওয়া হালকা নীল শাড়ি পরেছিলেন। সোনালি ফ্রেমের চশমায় তাঁকে কলেজের মেয়ে প্রফেসরের মতো দেখাচ্ছিল। আমার মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কী করে যত্ন করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আর শীলুর মা ? তিনি মূর্তির মতো অনেকক্ষণ বসে থেকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি থেমে থেমে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলেছিলেন, হারুনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে রাবেয়াকে বিয়ে করতে চায়।

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। তিনি বলে চললেন, আপনার মেয়েকে পাঠাবেন না ওখানে। কী করে সে ছেলের মন ভুলিয়েছে। মাথার ঠিক নেই একটা মেয়ে। ছি!

মা লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন।

রাবেয়া অকারণে মার খেল সেদিন। সব শুনে বাবার মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। কেন সে যাবে হ্যাংলার মতো ? রাগলে বাবার মাথার ঠিক থাকে না। বয়স্কা আধপাগলা একটা মেয়েকে তিনি উন্মাদের মতোই মারলেন। রাবেয়া শুধু বলছিল, আমি আর করব না। মারছ কেন ? বললাম আর করব না।

কী জন্যে মার খাচ্ছিল তা সে নিশ্চয়ই বুঝছিল না। বারবার তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। মা নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। আর আশ্চর্য, কান্না শুনে প্রথমবারের মতো হারুন ভাই আসলেন আমাদের বাসায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অল্প অল্প কাঁপছিলেন। তাঁর চোখ লাল। তিনি থেমে থেমে বললেন, ওকে মারছেন কেন ?

বাবা তাকালেন হারুন ভাইয়ের দিকে। আমিও ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম। হঠাৎ তাঁর আমাদের এখানে আসা আমাদের ঠাট্টা করার মতোই মনে হলো। রাবেয়া বলল, দেখুন না, আমাকে মারছে শুধু শুধু।

হারুন ভাইয়ের ফ্যাকাসে মুখে আমি স্পষ্ট গভীর বেদনার ছায়া দেখেছিলাম। তবু কঠিন গলায় বললাম, আপনি বাসায় যান। আপনি এসেছেন কেন ?

শীলুদের বাসার জানালায় শীলু আর তার মা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রাবেয়াকে ক'দিন চাবি বন্ধ করে রাখা হলো। তার দরকার ছিল না। হারুন ভাইয়ের বিয়ে হলো নাহার ভাবির সঙ্গে। তাঁর খালাতো বোন, হোম ইকনমিক্সে বিএ পড়তেন। হারুন ভাই জার্মানি চলে গেলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি নিতে। আগেই সব ঠিক হয়েছিল।

নাহার ভাবি সমস্তই জেনেছিলেন। বিয়ের সাতদিন না পেরোতেই তিনি আমাদের বাসায় এসে সবার সঙ্গে গল্প করলেন। রাবেয়াকে নিয়ে গেলেন তাদের বাসায়। রাবেয়া হাতে হলুদ রঙের একটা প্যাকেট নিয়ে হাসতে হাসতে বাসায় ফিরল।

মা দ্যাখো, ঐ মেয়েটি আমায় কী সুন্দর একটা শাড়ি দিয়েছে। আমি চাইনি, ও আপনি দিলে।

রাবেয়া নীল রঙের একটা শাড়ি আমাদের সামনে মেলে ধরল।

চমৎকার রঙ। অদ্ভুত সুন্দর।

কাক ডাকল। ভোর হচ্ছে বুঝি। কোমল একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আযান হলো। মাঠের ওপারে ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছের জমাটবাঁধা অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। বাঁশের বেড়ার উপর হাত রেখে নাহার ভাবি খালি পায়ে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। খুব সকালে ঘুম ভাঙে তো তার! আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন অল্প, বললেন, আজ দেখি খুব ভোরে উঠেছেন।

আমি চুপ করে রইলাম, হাঁ-বাচক মাথা নাড়লাম একটু। নাহার ভাবি বললেন, রাতে আপনার গান বাজিয়েছিলাম, শুনেছেন?

জি, শুনেছি।

রুনুর পছন্দ করা গান। সে-ই সাজিয়ে দিয়েছিল। রুনু ঘুমুচ্ছে এখনো?

জি।

ডেকে দিন একটু, খালি পায়ে বেড়াবে শিশিরের উপর। চোখ ভালো থাকে।

রুনু রাবেয়ার গলা জড়িয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আমি ডাকলাম, রুনু রুনু!

কদিন ধরেই দেখছি মা কেমন যেন বিমর্ষ। বড় ধরনের কোনো রোগ সারবার পর যেমন সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছায়া পড়ে তেমনি। বয়স হয়েছে, ভাঙা চাকার সংসার টেনে নিতে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, দেহ-মন শ্রান্ত তো হবেই। তবু তাঁর এমন অসহায় ভাবটা আমার ভালো লাগে না। খুব শিগগিরই হয়তো আমি একটি ভালো চাকরি পাব। আমি সবাইকে পরিপূর্ণ সুখী করতে চাই। মাকে নিয়ে একবার সীতাকুণ্ড বেড়াতে যাব। কলেজে যখন পড়ি তখন ক'বন্ধুকে নিয়ে একবার গিয়েছিলাম। এত সুন্দর, এত আশ্চর্য। চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে দূরের সমুদ্র দেখা যায়। মা নিশ্চয়ই

চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠতে পারবেন না। মা আর বাবাকে নিচে রেখে আমরা সবাই উপরে উঠব। বাবাও হয়তো উঠতে চাইবেন। ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে উঠতে পারলে সূর্যাস্ত দেখা যাবে। রেকর্ড প্লেয়ার নেব, অনেক রেকর্ডও নিয়ে যাব।

খোকা, ও খোকা!

কী মা ?

কিছু না। গল্প করি তোর সাথে আয়।

বসেন, সারাদিন তো কাজ নিয়েই থাকেন।

কই আর কাজ ?

আপনার স্বাস্থ্য খুব ভেঙে গেছে মা।

আর স্বাস্থ্য!

মা বসলেন আমার সামনে। তাঁর চোখের কোণে গাঢ় কালি পড়েছে।

তিনি থেমে থেমে বললেন, কাল রাতেও আমার ঘুম হয়নি খোকা।

আমায় ডাকলেন না কেন ? ওষুধ ছিল তো আমার কাছে।

দু'বার ডেকেছি, তুই ঘুমুচ্ছিলি।

মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আমার খুব ঘুম বেড়েছে দেখছি। রাত ন'টা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ি, উঠি পরদিন আটটায়। মা বললেন, রাবেয়াকে নিয়ে তোর বড় খালার কাছে একবার যাব।

হঠাৎ কী ব্যাপার ?

এমনি, ঘুরে আসি একটু।

কোনো পীরের খোঁজ পেয়েছেন বুঝি ?

মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আমি দেখলাম মা'র নাকের পাতলা চামড়া তিরতির করে কাঁপছে। মাকে আমার হঠাৎ খুব ছেলেমানুষ মনে হলো। বললাম, রাত দিন কী এত ভাবেন ?

কই কিছু ভাবি না তো! চা খাবি এককাপ।

এই দুপুরে ?

খা না। আগে তো খুব চা চাইতি।

মা উঠে চলে গেলেন। মা'র ভিতর একটা স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। শরীর সুস্থ নয় নিশ্চয়ই! মাকে একজন বড় ডাক্তার দেখালে হতো। রুনুর স্কুল ছুটি হয় সাড়ে চারটায়। আজ সে দুপুরেই হাজির। হাসতে হাসতে বলল, স্কুল ছুটি হয়ে গেল দাদা।

সকাল সকাল যে ? কী ব্যাপার ?

মর্নিং স্কুল আজ থেকে। সকাল সাতটায় স্কুলে গেলাম। তুমি তো তখন ঘুমে। বাব্বাহ, এত ঘুমোতেও পার।

মা চা নিয়ে ঢুকলেন। রুনু বলল, আমায় এক কাপ দাও না মা!

আরেকটা কাপ এনে ভাগ করে নে।

না, তা হলে থাক। দাদা খাক।

আহা, নে না।

রুনু চা নিয়ে বসল একপাশে। চুমুক দিতে কী ভেবে হাসল খানিকক্ষণ। বলল, মা ক্ষিধে পেয়েছে, কী রান্না মা আজকে ?

মাছ। ক্ষিধে নিয়ে চা খেতে আছে ?

ওতে কিছু হবে না মা। আচ্ছা আপাকে দেখলাম বাবার সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছে, কোথায় ?

কী জানি কোথায়। তোর আম কাঁঠালের বন্ধ কবে রুনু ?

দেরি আছে, সামনের মাসের পনেরো তারিখ থেকে।

আমি তোর খালার বাসায় যাব বেড়াতে। তুই তাহলে থাকবি ?

সে-কী, তোমার সঙ্গে কে কে যাবে মা ?

আমি, রাবেয়া আর তোর আব্বা।

বেশ তো। আমি বুঝি বাতিল ?

রুনুর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম সবাই। রুনু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা, তোমার চাকরি হলে আমায় নিয়ে বেড়াতে যাবে ?

নিশ্চয়ই।

আমি কিন্তু কক্সবাজার যাব। শীলুরা গিয়েছিল গতবার।

বেশ তো।

আর যেদিন প্রথম বেতন পাবে সেদিন...

সেদিন কী রুনু ?

সেদিন আমাকে দশ টাকা দিতে হবে। দেবে তো ?

হ্যাঁ, কী করবি ?

এখন বলব না।

রুনু লম্বা হয়েছে একটু, চোখের তারাও যেন মনে হয় আরো গভীর কালো। চাঞ্চল্যও এসেছে একটু। সেদিন দেখলাম অনেকক্ষণ ধরেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল। সে কি বুঝতে পারছে তার চোখের পাতায়, তার হলুদ গালে, বরফি কাটা মসৃণ চিবুকে রূপের বন্যা নামছে ? যৌবনের সেই লুকানো চাবি দিয়ে প্রকৃতি একটি একটি করে অজানা ঘর খুলে দিচ্ছে তার সামনে। সে দেখছি প্রায় রাতেই শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ে। পড়তে পড়তে এক একবার চোখে রুমাল দিয়ে কেঁদে ওঠে। আমি বলি, কী হয়েছে রুনু ?

কই, কিছু তো হয় নি!

কাঁদছিস কেন ?

কাঁদছি না তো।

কী বই পড়ছিলি দেখি ?

রুনু উঁচু করে বই দেখায়। কেঁদে ভাসবার মতো কিছু নয়। জীবনে একটি সময় আসে যখন তীব্র অনুভূতিতে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। প্রথম বেতন পেলে রুনুকে একটা চমৎকার শাড়ি কিনে দেব আমি। সবুজ জমিনের উপর সাদা ফুলের নকশা। রোল নাম্বার থার্টিন পরত দেখতাম।

অনেক দিন পর শীলুকে দেখলাম। সবাই মিলে চাঁটগাঁয় গিয়েছিল বেড়াতে। বেশ কিছুদিন পর ফিরল। এতদিন শান্তি কটেজকে কী বিষণ্ণই না লাগছিল। দেখতাম সন্ধ্যা হতেই শান্তি কটেজের বুড়ো দারোয়ান বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে একা একা বসে চুপচাপ। খালি বাড়ি পেয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলতে হাজির হচ্ছে সকাল-বিকাল।

ফুলগাছ নষ্ট করো না গো ও লক্ষ্মী ছেলেমেয়েরা।

প্রতিবাদের সুরও যেন খালি বাড়ির মতোই বিষণ্ন। মাঝে মাঝেই ঝড়ের মতো হাজির হতো রাবেয়া। গেটের বাইরে থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাত, এই দারোয়ান এই, এই বুড়ো।

কী খুকি আপা ?

এরা কোথায় গেছে ?

বেড়াতে।

কেন বেড়াতে গেল ?

দারোয়ান হাসত কথা শুনে। আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলত, আবার আসবে আপামণি।

কবে আসবে ? কাল ?

ষোল তারিখে আসবে।

না, কালকেই আসতে হবে। তুমি ওদের আনতে যাবে ইস্টিশনে ?

জি, আপামণি।

আমিও সঙ্গে যাব।

আচ্ছা।

তুমি নিয়ে যাবে তো আমাকে ?

জি, আপনাকে নিয়ে যাব, ঠিক যাব আপামণি।

পেয়ারা পেড়ে দাও আমাকে।

লম্বা আঁকশি নিয়ে খুশি মনে পেয়ারা খুঁজে বুড়ো। গ্যারেজের উপর ঝুঁকে পড়া গাছে ঝেপে পেয়ারা হয়েছে।

খালি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমিও রাবেয়ার মতো আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কবে আসবে শীলু, যাকে আমি 'করুণা' বলে নিজের মনেই ডাকি। করুণা ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে বাগানে, নিজের খেয়ালে গান গেয়ে উঠবে আচমকা। আমাদের বাসার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় ডাকবে, রুনু, রুনু বাসায় আছ ?

এর জন্যে আমি অপেক্ষা করেছিলাম। ভালোবাসা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু আমি বুকের ভেতর গোপন ভালোবাসা পুষেছি।

কতদিন পর দেখলাম শীলুকে।

গাড়ি থেকে নামতেই আমার সঙ্গে দেখা। খুব কোমল কণ্ঠে বলল, আপনারা সব ভালো ছিলেন তো ? রুনু ভালো ?

তেমনি লম্বাটে মুখ, কপালের দিকে টানা ভুরু, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থমকে অন্যদিকে তাকাল। আমার হৃদপিণ্ড দুলে উঠল, শীলুর চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে গিয়ে অদ্ভুত কষ্ট হলো। আমি বললাম, তোমরা ভালো তো শীলু ?

জি।

শীলুর মা মালপত্র নামাতে নামাতে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। বুড়ো বয়সেও ঠোঁটে আর মুখে রঙ মেখেছেন। বয়স অগ্রাহ্য করে পরা চকচকে শাড়িতে তাঁকে হাস্যকর লাগছিল, কিন্তু তবু তিনি শীলুর মা, আমি বিনীত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

সবার শেষে নামলেন নাহার ভাবি। ভারী সুন্দর হয়েছেন তিনি। গায়ের মসৃণ চামড়া ঝকঝক করছে। নাকের উপর জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করছে রোদ লেগে। নাহার ভাবি আমাকে দেখে ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনাদের কথা যা ভেবেছি!

আমিও ভেবেছি আপনারা কবে বা আসবেন।

রুনু আর রাবেয়া কোথায় ?

রুনু স্কুলে। রাবেয়া বেড়াতে বের হয়েছে।

রুনুর জন্যে আমি অনেক গল্পের বই এনেছি। অনেক নতুন রেকর্ড কিনেছি।

শীলুর মা ঠান্ডা গলায় বললেন, রোদে তোমাদের মাথা ধরবে, ভেতরে গিয়ে বস মেয়েরা।

শীলু তোমাকে আমি গোপনে করুণা বলে ডাকি। তোমার জন্যে আমার অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হয়। প্রতি রাতে তোমাকে নিয়ে কত কী ভাবি! যেন তোমার কঠিন অসুখ করেছে। শুয়ে শুয়ে দিন গুনছো মৃত্যুর। হঠাৎ একদিন আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তোমার বিছানার পাশে। তুমি ছেলেমানুষের মতো বললে, এতদিন পরে এলেন ?

আমি বললাম, তুমি তো কখনো ডাকনি শীলু। ডাকলেই আসতাম।

তুমি বিবর্ণ ঠোঁটে হাসলে। আমি বসলাম তোমার পাশে। জানালা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসছে। হাওয়ায় কাঁপছে তোমার লালচে চুল। আমি তোমার মাথায় হাত রাখলাম। তুমি বললে, জানেন আমার যে একটি ময়না ছিল সেটি ঠিক মানুষের মতো শিস দিত, খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে।

কী হাস্যকর ছেলেমানুষি ভাবনা। কতদিন ভাবতে ভাবতে রাত হয়ে যেত। রাস্তায় নিশি পাওয়া কুকুর চেঁচাত। ঘুম ভেঙে মাস্টার কাকা উঠে আপন মনে কথা বলতেন।

আমার বন্ধু রমিজ এক বিবাহিতা ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটি তার স্বামী ও দুটি বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল রমিজের সঙ্গে। ভদ্রমহিলার স্বামী দুঃখে লজ্জায় এনড্রিন খেয়ে মরেছিল। ঘটনাটি শুনে রমিজের প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হয়েছিল। এর অনেকদিন পর যখন শীলুরা ঘর অন্ধকার করে বাইরে বেড়াতে গেল তখন কেন যেন মনে হলো রমিজ কোনো দোষ করেনি।

ভালোবাসার উৎস কী আমি জানি না। আশফাক বলত, ভালোবাসা হচ্ছে নিছক কামনা, যৌন আকর্ষণের পরিভাষা। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার গলা জড়িয়ে শীলু কখনো ঘুমিয়ে থাকবে— এ ধরনের কল্পনা তো কখনো মনে আসে না।

একদিন শীলুর বয়স হবে। পাক ধরবে তার চুলে, পোকায় কাটা অশক্ত দাঁতে কালো ছোপ পড়বে, ছানি পড়া চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে তখন কি সে দেখতে পারবে বছর ত্রিশেক আগে একটি অনুভূতিপ্রবণ তরুণ ছেলে কান পেতে আছে কখন সেই কোমল কণ্ঠ শোনা যাবে, দাদু ভাই, রুনু বাসায় আছে?

আমি ইদানীং কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছি। মা আমাকে মাঝে মাঝে বুঝতে চেষ্টা করেন। রুনু প্রায়ই অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো আমার বোঝার ভুল। তবু তার হাবভাব যেন কেমন। যেন কিছু জানতে চেষ্টা করছে। সেদিন অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে বসল, শীলুকে কি তোমার খুব বুদ্ধিমান মনে হয় দাদাভাই?

আমি নিজেকে যথেষ্ট স্বাভাবিক রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে বললাম, হ্যাঁ।

তোমার কাছে ওকে ভালো লাগে?

তা লাগে।

কিন্তু ও কী বলে জানো?

কী বলে?

বলে তোমার দাদাভাইকে দেখলেই মনে হয় বোকা, তাই না?

বলা বাহুল্য আমি সেদিন দুঃখিত হয়েছিলাম। আমাকে কেউ বোকা বলছে সেই জন্যে নয়। আমার গভীর আবেগের কথা সে জানছে না এই জন্যে। আমার ধারণা, শীলু যখন সমস্ত কিছু জানবে তখন নিশ্চয়ই আমাকে অন্য চোখে দেখবে। আমি বললাম, শুনে তোর খারাপ লেগেছে রুনু?

হ্যাঁ।

শীলু কি তোর খুব ভালো বন্ধু ?

হ্যাঁ ভালো বন্ধু।

আমাদের সংসারে কী একটা পরিবর্তন এসেছে। সুর কেটে গেছে কোথাও। শীলু আমার সমস্ত চেতনা এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমি ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। মা ভীষণ রকম নীরব হয়ে পড়েছেন। শঙ্কিতভাবে চলাফেরা করছেন। তাঁর হতাশ ভাবভঙ্গি, নিচু স্বরে টেনে কথা বলা সমস্তই বলে দেয় কিছু একটা হয়েছে। বাবা এসে প্রায়ই আমার ঘরে বসেন। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দু'একটি কথাবার্তা বলেন।

কেমন পড়াশুনা চলছে ? বাজারে জিনিসপত্রের যা দাম!

আমি তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারি তিনি কিছু একটা বলতে চান। এলোমেলো কথা বলতে বলতে এটি সেটি নাড়তে থাকেন, তারপর হঠাৎ করে উঠে চলে যান। কী বলতে চান তা বুঝে উঠতে পারি না। বাবাকে আমরা বড় ভয় পাই, নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাই না। মাকে যখন জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে মা ?

মা অবাক হবার ভান করে বলেন, হবে আবার কী রে খোকা ?

মা মিথ্যা বলতে পারেন না, কিছু লুকোতে পারেন না। আমি জোর দিয়ে বলি, বলো কী হয়েছে ?

মা মেঝের দিকে তাকিয়ে টানা সুরে কাঁপা গলায় বললেন, কোথায় কী হয়েছে ?

অথচ প্রায়ই দেখছি বাবা আর মা ফিসফিস করে আলাপ করছেন। বিরক্তিতে বাবার ভ্রু কুঁচকে উঠছে ঘনঘন। অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বসে থাকছেন। পরশু রাতে মা গুনগুন করে কাঁদছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিল কে যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে গান গাইছে। রাবেয়া বলল, ও খোকা, ও ঘরে মা কাঁদছে রে।

রুনু বলল, সত্যি দাদা, মা কাঁদছে, আমি ভেবেছি বুঝি বেড়াল।

রাবেয়া গলা উঁচু করে ডাকল, মা ও মা, কাঁদছ কেন ?

মা চুপ করে গেলেন। রাবেয়া আবার ডাকল, মা ও মা।

মা ধরা গলায় বললেন, কী ?

তুমি কাঁদছিলে কেন ?

আমি সমস্ত কিছু বুঝতে চাই। আমি সবাইকে ভালোবাসি। যে সংসার বাবা গড়ে তুলেছেন সেখানে আমার যা ভূমিকা আমি তারচে' অনেক বেশি করতে চাই। যদি কোনো জটিলতা এসেই থাকে তবে সে জটিলতা থেকে আমি দূরে থাকতে চাই না। আমি চাই সবাই সুখী হোক। রুনু শীলুর মতো একটি ময়না এনে পুষুক যেটি সময়ে-

অসময়ে মানুষের মতো সুখের শিস দিয়ে উঠবে।

দুপুরবেলা ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ রাবেয়া আমায় ডেকে তুলল। উত্তেজনায় তার চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে।

ও খোকা শুনছ, আমার বিয়ে।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। রাবেয়া খিলখিল করে হেসে বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না ? আল্লার কসম, সত্যি বিয়ে, আম্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

কখন বিয়ে ?

আজ বিকেলে। এখন আমি গোসল করে সাজব। তুমি আবার সবাইকে বলে বেড়িও না খোকা, আমার বুঝি লজ্জা নেই ?

মাকে জিজ্ঞেস করতেই মা বললেন, বরপক্ষের ওরা বিকেলে দেখতে আসবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, পাগল-মেয়েকে বিয়ে করবে কে ?

মা বললেন, পাগল কোথায় রে, ঐ একটু যা আছে তা সেরে যাবে।

বরপক্ষের লোকজন জানে ?

মা ভীত কণ্ঠে বললেন, আমি ঠিক বলতে পারি না তোর আব্বা বলেছে কি-না। তুই আপত্তি করিস না খোকা।

কিন্তু হঠাৎ বিয়ের কী হলো ?

আমি জানি না। তোর আব্বা সব ঠিক করেছেন। তোর আব্বাকে জিজ্ঞেস কর।

দেখতে আসবে পাঁচটায়, চারটার ভিতরেই সব তৈরি হয়ে গেল। মা ঘামতে ঘামতে খাবার তৈরি করলেন। বসবার ঘরে নতুন পর্দা লাগানো হলো। ট্রাঙ্কে তোলা টেবিল ক্লথ বিছিয়ে দেয়া হলো টেবিলে। মন্টু সাইকেলে করে দূর কোথাও থেকে ফুল এনে ফুলদানি সাজাল। রুনু রাবেয়ার একটি শাপলা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাবেয়া ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, মা, রুনু যে বড় আমার শাড়ি পরেছে, ময়লা করে ফেলবে তো।

ময়লা হলে ইস্ত্রি করিয়ে দেব।

যদি ছিঁড়ে ফেলে ?

কী ভ্যাজর ভ্যাজর করছিস।

হুঁ, আমি তো ভ্যাজর ভ্যাজর করছি। আমার যদি আজ বিয়ে না হতো দেখতে রুনুর চুল ছিঁড়ে ফেলতাম না!

রাবেয়া পরেছে বেশ দামি আসমানি রঙের শাড়ি। সাধারণ সাজগোজের বেশি কিছু করেনি। এতে তাকে যে এত সুন্দরী লাগবে কে ভেবেছে। বড় বড় ভাসা চোখ, বরফি কাটা চিবুক, শিশুর মতো চাউনি। সব মিলিয়ে রূপকথার বই-এ আঁকা বন্দি রাজকন্যার ছবি যেন।

মাস্টার কাকা একটা ফরসা পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন,

বরপক্ষীয়দের অভ্যর্থনার জন্য। পাঁচটায় তাদের আসার কথা, ছ'টা পর্যন্ত কেউ এলো না। ঠিকানা নিয়ে মাস্টার কাকা খুঁজতে গেলেন। জানা গেল কেউ আসবে না। একটি পাগল মেয়ে গছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র তারা কী করে যেন জেনেছে।

লজ্জায় আমার চোখে পানি এসে পড়ল। কী দরকার ছিল এসবের! নাই হতো বিয়ে। মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, দরকার ছিল রে।

কী জন্যে ?

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় খোকা!

কী সন্দেহ ?

কাল তোর বাবা রাবেয়াকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে, তখন জানবি।

বাবা নামলেন রিকশা থেকে। রাবেয়া ধীরে সুস্থে নামল। মুখ কালো করে বলল, মা, ডাক্তার আমাকে বেশি পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন শুধু বিশ্রাম। তাই না বাবা ?

বাবা মা'র দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, এখন কী করবে ?

ব্যাপারটা আমি জানলাম, রুনু জানল, মন্টু ফুটবল খেলতে বাইরে গেছে, শুধু সে-ই জানল না। রাবেয়ার নির্বিকার ঘুরে বেড়ানোর ফল ফলেছে। ডাক্তার তাকে পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন রাবেয়ার প্রয়োজন শুধু বিশ্রাম।

রাবেয়ার মাথার ঠিক নেই। ছোটবেলা থেকেই সে ঘুরে বেড়াত চারদিকে। সব বাড়িঘরই তার চেনা। চাচা খালু দাদা বলে ডাকে আশেপাশের মানুষদের। তাদের ভিতর থেকেই কেউ তাকে ডেকে নিয়েছে। এমন একটি মেয়েকে প্রলুব্ধ করতে কী লাগে ? মা'র রাত্রে ঘুম হয় না। তার চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। রুনু আর শীলুদের বাসায় গান শুনতে যায় না। নাহার ভাবি বেড়াতে এসে বললেন, কী ব্যাপার, তোমরা কেউ দেখি আমাদের ওখানে যাও না, রাবেয়া পর্যন্ত না।

রুনু কথা বলে না। মা নিচু গলায় বলেন, রাবেয়ার অসুখ করেছে মা।

কী অসুখ, কই জানি না তো ?

এমনি শরীর খারাপ।

বলতে গিয়ে মায়ের কথা বেঁধে যায়। অসহায়ের মতো তাকান।

ব্যাপারটার উৎস রাবেয়ার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করলাম আমি। সন্ধ্যায় যখন রুনু মাস্টার কাকার কাছে পড়তে যায়, ঘরে থাকি আমি আর রাবেয়া, তখনই আমি কথা শুরু করি।

রাবেয়া!

কী ?

কোথায় কোথায় বেড়াতে যাস তুই ?

কত জায়গায়। চেনা বাড়িতে।

খুব ভালো লাগে ?

হুঁ।

কাকে কাকে ভালো লাগে ?

সবাইকে।

ছেলেদের ভালো লাগে ?

হুঁ।

নাম বল তাদের।

একটানা নাম বলে চলে সে। তাদের কাউকেই সন্দেহভাজন মনে হয় না আমার। সবাই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে। রাবেয়াকে বড় আপা ডাকে।

তারা তোকে আদর করে রাবেয়া ?

হুঁ।

কী করে আদর করে ?

আমার সঙ্গে খেলে, আর...

আর কী ?

গল্প করে।

কিসের গল্প ?

ভূতের।

ইতস্তত করে বলি, তোকে কেউ চুমু খেয়েছে রাবেয়া ?

যাহ্! তাই বুঝি খায় ?

মা'র কথাগুলি হয় আরো স্পষ্ট, আরো খোলামেলা। আমার লজ্জা করে। মা আদুরে গলায় বলেন, রাবেয়া, কে তোর শাড়ি খুলেছিল ? বল তো নাম ?

যাও মা, তুমি তো ভারি...

মা রেগে যান। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, তাহলে এমন হলো কেন ? বল তুই হারামজাদি ?

রাবেয়া বলে না কিছু, মা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদেন। রাবেয়া বড় বড় চোখে তাকায়। বলে, কাঁদো কেন মা ?

বল, কার সঙ্গে তুই শুয়েছিলি ?

রাবেয়া চুপ করে থাকে। কথাই হয়তো বুঝতে পারে না। বাবা পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন। মেজাজ হয়েছে খিটখিটে, অল্পতেই রেগে বাড়ি মাথায় তোলেন। রুনু স্কুল থেকে ফিরতে দেরি করেছে বলে মার খেল সেদিন। একদিন দেখি বাবা গণক নিয়ে এসেছেন, পাড়ার যুবকদের নাম লিখে কী সব মন্ত্র পড়ছে সে।

রাবেয়ার অসুখের প্রত্যক্ষ চিহ্ন ধরা পড়ল একদিন ভোরে। চা খেয়েই ওয়াক

ওয়াক করে বমি করল সে। যদিও তার শারীরিক অস্বাভাবিকতা নজরে আসার সময় এখনো হয়নি তবু তার শরীরে আলগা শ্রী আসছিল। একটু চাপা গাল ভরাট হয়ে উঠছে, ভুরু মনে হচ্ছে আরো কালো, চোখ হয়েছে উজ্জ্বল, চলাফেরায় এসেছে এক স্বাভাবিক মন্থরতা। স্কুলের হেডমাস্টারের বউ একদিন বেড়াতে এসে বললেন, দেখ ও বউ, তোমার মেয়ে কেমন হাঁটছে ঠিক যেন পোয়াতি।

কথাগুলি আমার বুকে ধক্ করে বিঁধেছে। কিছু একটা করতে হবে এবং খুব শিগগিরই। সবার জানবার ও বুঝবার আগে। একটি করে দিন যাচ্ছে, অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সবাই। কিন্তু কী করা যায় ? বাবা নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছেন। একবার ইচ্ছা হয় তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। বাবাকে বড় ভয় করি আমরা।

সেদিন রাতে শুনলাম বাবা চাপা কণ্ঠে বলছেন, বিষ খাইয়ে মেরে ফেল মেয়েকে। মা বললেন, ছিঃ ছিঃ, বাপ হয়ে এই বললে ? বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আমার মাথার ঠিক নেই শানু, তুমি কিছু মনে করো না। পাগল মেয়ে আমার। বাবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনলাম। অনেক রাত অবধি ঘুম হলো না আমার। এক সময় রাবেয়া ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। কাতর গলায় বলল, খোকা!

কী ?

বাথরুমে যাবি ?

উঁহু।

কী হয়েছে ? খারাপ লাগছে ?

হ্যাঁ।

বমি করবি ?

না।

স্বপ্ন দেখেছিস ?

হুঁ।

কী স্বপ্ন ?

মনে নেই।

ঘুমিয়ে পড়, ভালো লাগবে।

আচ্ছা।

রাবেয়া শুয়ে পড়ল আবার। মুহূর্তেই উঠে বসে বলল, খোকা!

কী ?

পলা এসেছে।

কে এসেছে ?

পলা, দোর খুলে দ্যাখ। বারান্দায় বসে আছে। আমি ডাক শুনলাম।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসলাম দু'জনেই। কোথায় কী ? খাঁ খাঁ করছে চারদিক। রাবেয়া ডাকল, পলা, পলা!

মা বললেন, কে কথা বলে ?

আমি আর রাবেয়া, মা।

বাবা ধমকে উঠলেন, যাও যাও, ঘুমোতে যাও। কী কর এত রাত্রে ?

শব্দ শুনে মাস্টার কাকা বাইরে আসেন।

কী হয়েছে খোকা ?

রাবেয়া বলে, পলাকে ডাকছিলাম কাকা।

যাও শুয়ে পড়, পলা কোত্থেকে আসবে এত রাত্তিরে ?

শুতে শুতে রাবেয়া বলল, খোকা পলাকে একটা চামড়ার বেল্ট কিনে দেবে ? গলায় বেঁধে দেব।

আচ্ছা।

আর একটা লম্বা শিকল কিনে দেবে ?

দেব।

আচ্ছা আর একটা জিনিস দেবে ?

কী জিনিস ?

নাম মনে নেই আমার, দেবে তো ?

আচ্ছা দেব।

কবে ? কাল ?

না, চাকরি হোক আগে।

বাবা বলে উঠলেন, কী ভ্যাজর ভ্যাজর করছিস তোরা। ঘুমো। সারাদিন খেটে এসে শুই, তাও যদি শান্তি পাওয়া যায়।

বহু আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটি আসল। সরকারি সিল থাকা সত্ত্বেও কিছুই বুঝতে পারিনি। আর দশটা খাম যেমন খুলি তেমনি আড়াআড়ি খুলে ফেললাম। আমাকে তারা ডেকেছেন। রসায়ন শাস্ত্রের লেকচারারশিপ পেয়েছি একটি কলেজে। প্রাথমিক বেতন সাড়ে চারশ' টাকা, ইয়ারলি পঁচিশ টাকা ইনক্রিমেন্ট। লেখাগুলি কেমন অপরিচিতি মনে হচ্ছিল। খুব খুশি হয়েছি এমন একটা অনুভূতি আসছিল না। অথচ আমি সত্যি খুশি হয়েছি এবং সবাইকে খুশি করতে চাই। সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাই, রুনুকে গাঢ় সবুজ একটি শাড়ি দিতে চাই, রোল নাম্বার থারটিন-এর গায়ে যেমন দেখেছি। এখন হয়তো সমস্তই আমার মুঠোয়, তবু সেই অগাধ সুখ, সমস্ত শরীর জুড়ে উন্মাদ আনন্দ কই ? আমরা বহু কষ্ট পেয়ে মানুষ হয়েছি। আমাদের ছেলেমানুষি কোনো সাধ কোনো বাসনা আমার বাবা-মা মেটাতে পারেন নি। আমাদের বাসনা তাদের দুঃখই দিয়েছে। আজ আমি সমস্ত বেদনায় সমস্ত দুঃখে

শান্তির প্রলেপ জুড়োব। আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছি, শক্তিমান দৈত্যটা হাতের মুঠোয়।

মা, আমার চাকরি হয়েছে।

মা দৌড়ে এলেন। বহুদিন পর তার চোখ আনন্দে ছলছল করে উঠল। বললেন, দেখি। আমি চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম। মা পড়তে জানেন না, তবু উল্টে পাল্টে দেখলেন সেটি। এমনভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন যেন খুব একটা দামি জিনিস হাতে। মা বললেন, বেতন কত রে ?

সাড়ে চারশ।

বলিস কী, এত ?

আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললাম, বেশি আর কোথায় ? বলেই আমি লজ্জা পেলাম। ভালো করেই জানি টাকাটা আমার কাছে অনেক বেশি। মা বললেন, এবার বিয়ে করাব তোকে।

কী যে বলেন!

বেশ একটি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে আনতে হবে। রূপবতী কিন্তু সাধাসিধা, নাহার মেয়েটির মতো।

মা কল্পনায় সুখের সাগরে ডুব দিলেন।

শহরে তুই বাসা করবি ?

তা তো করতেই হবে।

বেশ হবে, মাঝে মাঝে তোর কাছে গিয়ে থাকব।

মাঝে মাঝে কেন, সব সময়ে থাকবেন।

না রে বাপু, সংসার ফেলে যাব না।

মা ছেলেমানুষের মতো হাসলেন। আমি বললাম, প্রথম বেতনের টাকায় আপনাকে কী দেব মা ?

তোর বাবাকে একটা কোট কিনে দিস, আগেরটা পোকায় নষ্ট করেছে।

বাবারটা তো বাবাকেই দেব, আপনাকে কী ?

মা রহস্য করে বললেন, আমায় একটা টুকটুকে বউ এনে দে।

মাস্টার কাকাও খবর শুনে খুশি হলেন। তাঁর খুশি সব সময়ই মৌন। এবার একটু বাড়াবাড়ি ধরনের আনন্দ করলেন। নিজের টাকায় প্রচুর মিষ্টি কিনে আনলেন। অনেক মিষ্টি। যার যত ইচ্ছে খাও। কাকা বললেন, সুখ আসতে শুরু করলে সুখের বান ডেকে যায়, দেখো খোকা, কত সুখ হবে তোমার।

রুনু স্কুল থেকে এসে বলল, দাদা তোমার নাকি বিয়ে ?

কে বলেছে রে ?

মা, হি হি।

খুব হি হি, না ? তোকে বিয়ে দি যদি ?

যাও খালি ঠাট্টা। কাকে তুমি বিয়ে করবে দাদা ?

দেখি ভেবে।

আমি জানি কার কথা ভাবছ।

কার কথা ?

শীলার কথা নয় ?

পাগল তুই!

অবহেলায় উড়িয়ে দিলেও বুঝতে পারছি আমার কান লাল হয়ে উঠছে। অস্বস্তি বোধ করছি। শীলুকে কেন যে হঠাৎ ভালো লাগল। যতবার তাকে দেখি ততবার বুক ধক করে ওঠে। একটা আশ্চর্য সুখের মতো ব্যথা অনুভব করি। সমস্ত শরীর জুড়ে শীলু শীলু করে কারা বুঝি চেঁচায়। আমি একটু হেসে বলি, কে ভাবে তোর শীলুর কথা ?

না, এমনি বলছিলাম। বড় ভালো মেয়ে শীলু।

হুঁ। তুই কাকে বিয়ে করবি রুনু ?

যাও দাদা, ভালো হবে না বলছি।

আমার একজন বন্ধু আছে, খুব ভালো ছেলে...

দাদা, আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব এবার।

আনন্দ অনুষ্ঠান থেকে মন্টু বাদ পড়ল। বড় নানার বাড়িতে গিয়েছে সে, আগামীকাল আসবে। বাবা আসলেন রাত ন'টার দিকে। মা খবরটা না দিয়ে মিষ্টি খেতে দিলেন বাবাকে।

মিষ্টি কিসের ?

আছে একটা ব্যাপার।

বাবা আধখানা মিষ্টি খেলেন, ব্যাপার জানার জন্যে উৎসাহ দেখালেন না। মা নিজের থেকেই বললেন, খোকার চাকরি হয়েছে। সাড়ে চারশ' টাকা মাইনে।

বাবা খুশি হলেন। থেমে থেমে বললেন, ভালো হয়েছে। আমি চাকরি ছেড়ে দেব এবার। বয়স হয়েছে, আর পারি না। রাবেয়া, রাবেয়া কোথায় ?

ঘুমিয়েছে, শরীর খারাপ।

ভাত খায়নি তো ?

না, একটা মিষ্টি খেয়েছে শুধু।

আহ্! বললাম খালিপেটে রাখতে, মিষ্টিই বা দিলে কেন ?

সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম সেদিন। রাত একটার দিকে মা পাগলের মতো ডাকলেন, খোকা ও খোকা! শিগগির ওঠ। ও খোকা, খোকা।

খুব ছোটবেলায় গভীর রাতে একবার মা এমন ব্যাকুল হয়ে ডেকেছিলেন। ভূমিকম্প হচ্ছিল তখন। আমাদের বাসা থেকে চল্লিশ গজের ভিতর নন্দী সাহেবদের ছেড়ে যাওয়া পুরনো বাড়ি ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল। আজকের এই গভীর রাতে মায়ের আতঙ্কিত ডাক আমাকে ভূমিকম্পের কথা মনে করিয়ে দিল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই মা বললেন, আয় আমার ঘরে, আয় তাড়াতাড়ি।

কী হয়েছে ?

মা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। দরজা খোলা, চোখে পড়ল মায়ের বিছানায় রাবেয়া শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে বাবা গরুর মতো চোখে তাকিয়ে আছেন। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। এবরশান নাকি ? কাকে দিয়ে কী করালেন ? নাকি নিজে নিজেই কিছু খাইয়ে দিয়েছেন ?

বাবা ধরা ধরা গলায় বললেন, খোকা, তুই মাথায় একটু হাওয়া কর, আমি একজন বড় ডাক্তার নিয়ে আসি। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।

ডাক্তার আসলেন একজন। গম্ভীর হয়ে ইনজেকশন করলেন। আপনার মেয়েকে আমি চিনি।

বাবা ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন, বড় দুঃখী মেয়ে, মেয়েটিকে আপনি বাঁচান ডাক্তার।

ডাক্তার সেন্টিমেন্টের ধার দিয়েও গেলেন না। একগাদা ওষুধ দিয়ে গেলেন। সকালে আরো দুটো ইনজেকশন করতে বললেন। দশটার দিকে তিনি আসবেন।

বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কেউ জানবে না তো ডাক্তার ?

ডাক্তার বললেন, মান ইজ্জত পরের ব্যাপার, আগে মেয়ে বাঁচুক।

রাবেয়া চিঁ চিঁ করে বলল, মা আমার কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি, সেরে যাবে। চুপ করে শুয়ে থাক।

বুকটা খালি খালি লাগছে কেন ?

সেরে যাবে মা, দুধ খাবে একটু ?

না।

আমি আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘরে লম্বালম্বি একটা ছায়া পড়ল। তাকিয়ে দেখি মাস্টার কাকা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। একটু কাশলেন তিনি। বাবা হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, শরীফ মিয়া, আমার মেয়েটাকে বাঁচাও।

মাস্টার কাকা মৃদু গলায় বললেন, শহর থেকে খুব বড় ডাক্তার আনব আমি। খোকা, তোর সাইকেলটা বের করে দে।

আমি বললাম, আমি যাই কাকা ?

না, তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে না। তুমি থাক।

বাবা ধমকে উঠলেন, ওর কথা শুনো না। ও একটা পাগল ছাগল। তুমি যাও। নিজেই যাও।

রুনু কখন বা এসেছে। আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। ঘরময় নষ্ট রক্তের একটা দম আটকানো অস্বস্তিকর গন্ধ। রাবেয়া চোখ বুজে শুয়ে। তার মুখটা কী ফরসাই না দেখাচ্ছে। বাবা বললেন, মা রাবু, একটু দুধ খাও।

না।

মাথায় পানি দেব মা?

না বাবা।

রাবেয়া চোখ মেলে বাবার দিকে তাকাল। বলল, বাবা।

কী মা?

আমার বুকটা খালি খালি লাগছে কেন?

সেরে যাবে মা।

তুমি আমার বুকে হাত রাখবে একটু? এইখানে?

এমনি করেই ভোর হলো। মন্টু এলো ছ'টায়। সে হতভম্ব হয়ে গেল। বাবা গিয়েছেন ইনজেকশন দেবার লোক আনতে। রাবেয়া মন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, মন্টু, আমার অসুখ করেছে।

মন্টু বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল। রাবেয়া আবার বলল, মন্টু আমার বুকটা খালি খালি লাগছে।

মন্টু রাবেয়ার মাথায় হাত রাখল। মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। রুনু আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে জমাট বাঁধা কালো রক্তে। রাবেয়া আমাকে ডাকল, খোকা, ও খোকা!

আমি তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। নীল রঙের চাদরে ঢাকা রাবেয়ার শরীর নিস্পন্দ পড়ে আছে। একটা মাছি রাবেয়ার নাকের কাছে ভনভন করছে। রাবেয়া হঠাৎ করেই বলে উঠল, পলাকে তো দেখছি না। ও খোকা, পলা কোথায় রে? আমাদের চারদিকে উদ্বিগ্ন হয়ে পলাকে খুঁজল সে। আর কী আশ্চর্য, বেলা ন'টায় চুপচাপ মরে গেল রাবেয়া! তখন চারদিকে শীতের ভোরের কী ঝক্‌ঝকে আলো।

গত বৎসর আমরা বড় খালার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বড় খালার মেয়ে নিনাও এসেছিল মায়ের কাছে। প্রথম পোয়াতি মেয়ে। মা নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। নিনা আপা কী প্রসন্ন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। প্রথম সন্তান জন্মাবে, তার কী প্রগাঢ় আনন্দ চোখেমুখে। যদি ছেলে হয় তবে তার নাম দেব কিংশুক, মেয়ে হলে রাখী। হেসে হেসে বলে উঠেছিলেন নিনা আপা। আর তাতেই উৎসাহিত হয়ে রাবেয়া বলেছিল, আমিও আমার ছেলের নাম কিংশুক রাখব। আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রাবেয়া, নীল রঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে তুই শুয়ে আছিস! হলুদ রোদ এসে পড়েছে

তোর মুখে। কিংশুক নামের সেই ছেলেটি তোর বুকের সঙ্গে মিশে গেছে। যে বুক একটু আগেই খালি খালি লাগছিল।

বারোটার দিকে ফিরে এলেন মাস্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড় ডাক্তার। আর মন্টু, দিনেদুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালাফালা করে ফেলল মাস্টার কাকাকে একটা মাছকাটা বটি দিয়ে। পানের দোকান থেকে দৌড়ে এলো দু'তিন জন। একজন রিকশাওয়ালা রিকশা ফেলে ছুটে এলো। ওভারশিয়ার কাকুর বড় ছেলে জসীম দৌড়ে এলো। ডাক্তার সাহেব চেঁচাতে লাগলেন, হেল্প! হেল্প! চিৎকার শুনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমি দেখলাম, বটি হাতে মন্টু দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরে আছে কজন মিলে। রক্তের একটা মোটা ধারা গড়িয়ে চলেছে নালায়। মন্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা, ওকে আমি মেরে ফেলেছি।

আমার মনে পড়ল হাস্নুহেনা গাছের নিচে মন্টু একদিন পিটিয়ে একটা মস্ত সাপ মেরেছিল।

রাবেয়াকে ঘিরে সবাই বসেছিল। আমি ঢুকতেই নাহার ভাবি বললেন, বাইরে এত গোলমাল কিসের ?

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। মা, এইমাত্র মন্টু মাস্টার কাকাকে খুন করেছে। আপনি বাইরে আসেন। মন্টুকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে সবাই।

হাস্নুহেনা গাছের নিচে মন্টু একটা চন্দ্রবোড়া সাপ মেরেছিল। সাপের মাথায় গোল বেগুনি রঙের চক্র। চার হাতের উপরে লম্বা। মন্টু মরা সাপটাকে লাঠির আগায় নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ছোট বাচ্চারা উল্লাসে লাফাতে লাগল। রাবেয়া খুশিতে হেসে ফেলে বলল, মন্টু, লাঠিটা আমার হাতে দে।

পলা আনন্দে ঘেউ ঘেউ করছিল। মাঝে মাঝে লাফিয়ে সাপটাকে কামড়াতে গিয়ে ফিরে আসছিল। রাবেয়া পলার দিকে তাকিয়ে শাসাল, এই পলা এই, মারব থাপ্‌পড়।

সাপটাকে সবাই মিলে পুকুরপাড়ে কবর দিতে নিয়ে গেল। মিছিলের পুরাভাগে রাবেয়া। তার হাতের লাঠিতে সাপটা আড়াআড়ি ঝুলছে। মন্টু পলাকে নিয়ে দলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। সাপের জন্য লম্বা করে কবর খোঁড়া হলো। মন্টু পুকুরপাড়ে বিষণ্নভাবে বসেছিল।

কাকাকে মেরে ফেলবার পর মন্টুকে সবাই জাপটে ধরে রেখেছিল। জসীম মন্টুর হাত শক্ত করে ধরে চেঁচাচ্ছিল, পুলিশে খবর দিন। পুলিশে খবর দিন। মাছ কাটার বটিটা কাত হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে। সেখানে একটুও রক্তের দাগ নেই। কাকা যেখানে পড়েছিলেন সেখান থেকে একটা মোটা রক্তের ধারা ধীরে ধীরে নালার দিকে নেমে যাচ্ছিল। মন্টু আমায় দেখে বলল, দাদা, ওকে আমি মেরে ফেলেছি। মন্টু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। আশেপাশে প্রচুর লোক জমা হয়ে গিজগিজ করছিল। মোটা

ডাক্তার ভাঙা গলায় প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিলেন, হেল্প! হেল্প! একটা পাংশুটে রঙের কুকুর মরা লাশটার কাছে ভিড়বার চেষ্টা করছিল।

মন্টুর কুকুরের রঙ ছিল সাদা। গলার কাছে কালো একটা ফুটকি। মন্টু কাঞ্চনপুর থেকে এনেছিল কুকুরটাকে। অল্প দিনেই ভীষণ পোষ মেনেছিল। মন্টু তাকে টুলকাঠ দিয়ে একটি চমৎকার ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। আমি কুকুরটার নাম দিয়েছিলাম পলা। রাবেয়া মন্টুর কাছ থেকে আটআনা দিয়ে কিনে নিয়েছিল। মন্টুর বিক্রির ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রাবেয়া পীড়াপীড়ি করছিল, মন্টু পলাকে আমি কিনব।

না আপা, আমি পলাকে বেচব না।

আহা দে না মন্টু! আটআনা পয়সা দেব আমি। দে না।

বললাম তো আমি বেচব না।

মন্টু দিয়ে দে, এমন করছিস কেন?

রাবেয়া সবসময় পলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। পরিচিত ঘর বাড়িতে গিয়ে বলত, খালাম্মা, আমার পলাকে একটু দুধ দিন। আহা চিনি দিয়ে দিন। শুধু শুধু দুধ বুঝি কেউ খায়?

মন্টু একদিন একটা টিয়া পাখির বাচ্চা আনল কোথা থেকে। সেটি বাচ্চা হলেও খুব চমৎকার ছিল দেখতে। বারান্দায় খাঁচা ঝুলিয়ে পাখিটিকে রাখা হতো। ঠাণ্ডা লেগে একদিন সেটি মারা গেল। মন্টু পাখির শোকে একবেলা ভাত খেল না।

মন্টু আর মাস্টার কাকা সবচে' ছোট ঘরটায় থাকতেন। ঘরটায় আলো আসত না ভালো। গরমের সময় গুমোট গরম। বাতাস আসার পথ নেই। মন্টুর হাজতবাসের দিনগুলি এখন কেমন কাটছে? মন্টুর বয়স এখন উনিশ, সাত বাদ দিলে হয় বারো। বারো বৎসর সে আর মাস্টার কাকা এক সঙ্গে একটি ঘরে কাটিয়েছে। মাস্টার কাকার অভাব সে অনুভব করছে কি? খুনের পর শুনেছি অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। দিন রাত্তির খুন করা লোকের চেহারা, খুনের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে। মন্টুর সে-রকম হবে না। তার বড় শক্ত নার্ভ। মন্টুর মা, আমাদের বড় মা যেদিন মারা গেলেন মন্টু সেদিন নিতান্ত সহজভাবেই কাটাল। পরদিন শিমুলতলা গাঁয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেল বাসায় কাউকে না বলে। বয়স অল্প ছিল। শোক বুঝবার বুদ্ধিই হয়তো হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় কম বয়সের জন্যে নয়। বড় মা'র মতো তারও ইস্পাতের মতো শক্ত নার্ভ ছিল। মন্টু দেখতে অনেকটা বড় মা'র মতো। তার চাইবার ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, সমস্ত বড় মায়ের মতো। বাবার শোবার ঘরে বড় মা আর বাবার একটা যৌথ ছবি আছে। বিয়ের ছবি। সেই ছবির দিকে তাকালেই মন্টুকে চেনা যায়। ছবির কাচে ময়লা জমে ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু বড় মা'র বালিকা বয়সের ছবি আমাদের আকর্ষণ করে। চৌঠা আগস্ট আমাদের বাসায় একটা উৎসব

হয়। ভুল বললাম, শোকের আসর হয়। বাদ মাগরেব মিলাদ পড়ানো হয়। বাবা মায়ের কবর জিয়ারত করেন। দু'একটি ফকির মিসকিনকে খাওয়ানো হয়। হাউমাউ করে বাবা মায়ের মৃত্যুদিন স্মরণ করে কিছুক্ষণ কাঁদেন। তাঁর শোকটা নিশ্চয়ই আন্তরিক, তবু সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর লাগে। বিশেষ করে এই দিনটিতে মা মুখ কালো করে ভয়ে ভয়ে ঘুরে বেড়ান। তাঁর ভাব দেখে মনে হয় চৌঠা আগস্টের এই শোকের দিনটির জন্যে মা নিজেই দায়ী। বাবা সেদিন অতি সামান্যতম, অতি তুচ্ছতম ব্যাপারেও মায়ের উপর ক্ষেপে যান। আমার কষ্ট হয়। বড় মা আমাদের সবারই অতি শ্রদ্ধার মানুষ। রাবেয়া আর আমি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমোতে পারিনি। যখন বয়স হয়েছে, তাঁর কোলে এসেছে মন্টু। আমি আর রাবেয়া দক্ষিণের ঘরে নির্বাসিত হয়েছি, তখনো তিনি মাঝে মাঝে এসে বলতেন, খোকা, আজ তুই শুবি আমার সাথে। আগে আমার সঙ্গে ঘুমুবার জন্যে এত হৈচৈ করতিস, এখন যে বড় চুপচাপ ?

বড় হয়েছি যে।

ওহ্, কী মস্ত বড় ছেলে!

বড় মা'র গলা জড়িয়ে তাঁর বরফি কাঁটা ছাপের ব্লাউজে নাক ডুবিয়ে প্রতি সন্ধ্যার আবদার, গল্প বলেন বড় মা। ভূতের গল্প।

বড় মা কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে গল্প বলতেন— আমরা তখন ছোট। বারো তেরো বৎসরের বেশি বড় নয়। নানার বাড়ি যাচ্ছি সবাই। ভাদ্র মাস, নদী কানায় কানায় ভরা। সারাদিন নৌকা চলল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাঝিরা পুরনো এক তালগাছের সঙ্গে নৌকা বেঁধে রান্না বসিয়েছে। এমন সময় রুস্তম বলে যে বুড়ো মাঝিটা ছিল তার সে কী বিকট চিৎকার, কর্তা তালগাছে এটা কী ? আমি শুনেই বাবাকে জাপটে ধরেছি। তালগাছের দিকে চাইবার সাহস নেই।... বলতে বলতে বড় মা থামতেন। আমরা ফুঁসে উঠতাম, থামলে কেন, বলো শিগগির।

গল্প শুনে আতঙ্কে জমে যেতাম। কী অদ্ভুত তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি! বড় মা'র মৃত্যুর দিনটিতে বাবার হৈচৈ আমার তাই ভালো লাগত না। আমার মনে হতো আড়ম্বরের চেয়ে মৌন দুঃখানুভূতিই হয়তো ভালো হতো। আমি মনে মনে বললাম, বড় মা, তোমার ছেলের আজ বড় বিপদ।

হ্যাঁ, আজ মন্টুর বড় বিপদ। বড় ভয়ঙ্কর বিপদ। মন্টু কি বড় মাকে ডাকছে ? ফুটবলের খুব নেশা ছিল মন্টুর। খেলতে গিয়ে পা ভেঙে ছেলেদের কাঁধে চড়ে বাসায় এলো। হাঁটুর নিচে আধহাত খানেক জায়গা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। হৈচৈ শুনে বড় মা বেরিয়ে আসতেই মন্টু বলল, মা, আমি পা ভেঙে ফেলেছি।

বড় মা বললেন, সেরে যাবে।

মন্টুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। এক্স-রে করে দেখা গেল, ভেতরে হাড়ের একটা ছোট ছুঁচালো কণা ভেঙে রয়ে গেছে। কেটে বের করতে হবে।

মন্টুকে সাদা বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। এনেসথেসিয়া করার বড় চৌকা ধরনের যন্ত্রটা ডাক্তার মন্টুর মুখের কাছে নামিয়ে আনলেন। ছোট্ট মন্টু আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, বলো খোকা বলো, এক দুই তিন চার। মন্টু বলল, মা, মা, মা, মা।

আজ মন্টুর বড় বিপদ। দুর্গন্ধ কম্বলে মাথা চাপা দিয়ে আজও কি সে 'মা মা' জপছে ? না, মন্টু বড় শক্ত ছেলে। ইস্পাতের মতো তার নার্ভ। দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আকন্দকে খুন করেছ ?

জি।

কী দিয়ে ?

বটি দিয়ে, মাছ কাঁটা বটি।

ক'টা কোপ দিয়েছিলে ?

মনে নেই।

মরবার সময়ে তিনি কিছু বলেছিলেন ?

জি।

কী বলেছিলেন ?

বাবা মন্টু!

আর কিছু বলেননি ?

না।

তিনি কি তোমাদের খুব শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন ?

জি ছিলেন।

তুমি কী কর ?

বিএ পড়ছিলাম।

দারোগা সাহেব কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। এবার শুরু করলেন 'আপনি' করে। কী জন্যে খুন করেছেন তাকে ?

মন্টু চুপ করে রইল। দারোগা সাহেব বললেন, আমাকে বলতে কোনো অসুবিধা নেই। কোর্টে অন্যকথা বললেই হলো। বাঁচার অধিকার তো সবারই আছে ? ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক কোনো স্ক্যান্ডাল...

ছিঃ!

আমার মনে হয় আপনি মিথ্যা বলছেন।

আমি মিথ্যা বলি না।

মন্টু খুব স্পর্ধার সঙ্গে বলল, আমি মিথ্যা বলি না। বলতে গিয়ে বুক টান করে দাঁড়াল।

দারোগা সাহেবের মাথার উপর একটা ফ্যান ঘুরছিল। ফ্যানের বাতাসে মন্টুর

চুল কাঁপছিল। আমি কাঁচুমাচু হয়ে ভদ্রলোকের সামনে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। মন্টু কি কখনো মিথ্যা বলে না ? মন্টুর সঙ্গে কথাবার্তা হয় না। সে জন্ম থেকেই নীরব। তাকে বুঝা হয়ে ওঠেনি আমার। রুনু সম্বন্ধে আমি যেমন বলতে পারি, রুনুর একটু মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে। যখন সে মিথ্যা বলে তখন সে মাথা নিচু করে অল্প অল্প হাসে। মন্টু সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে পারছি না আমি।

আপনি কি খুব ভেবে-চিন্তে খুন করেছেন ?

না, খুব ভাবিনি।

আমার মনে হয় আপনি খুব অনুতপ্ত ?

না।

তাকে খুন করার ইচ্ছে কি হঠাৎ আপনার মনে জেগেছে, না আগে থেকেই ছিল ?

হঠাৎ জেগেছে।

তিনি কোন ধরনের লোক ছিলেন ?

ভালো লোক। বিদ্বান, অনেক জানতেন।

আপনাদের সঙ্গে তার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল ?

ভালো। আমাদের খুব স্নেহ করতেন।

তাকে খুন করা কি খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ?

জানি না। আমার রাগ খুব বেশি।

হ্যাঁ, মন্টুর রাগ বেশি। ভয়ঙ্কর উন্মাদ রাগ। আমি জানি, এ সম্বন্ধে ভালো করেই জানি। দু'বৎসর হয়নি এখনো। অনার্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেছি, সময়ও মনে আছে পৌষ মাস। দারুণ শীত। আমাদের সামনের বাসায় থাকতেন এক ওভারশিয়ার সাহেব। তাঁর মেয়ে এবং ছেলে সব মিলিয়েই একর্জন, মীনা। বয়স আমার সমান কিংবা আমার চেয়ে দু'এক বৎসরের বড়। ওভারশিয়ার ভদ্রলোকের ভারী আদরের মেয়ে, সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। মেয়েটি বেশির ভাগ সময়ই কাটাত বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে। ওভারশিয়ার ভদ্রলোক একদিন হাতে একটি চিঠি নিয়ে চড়াও হলেন আমাদের বাসায়। আমি বাইরেই বসেছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই চিঠি তুমি লিখেছ ?

নামহীন একটা চিঠি তিনি আমার সামনে ফেলে দিলেন।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

কী বলছেন আপনি ?

নিশ্চয়ই তুমি, এত বড় সাহস তোমার, এমন নোংরা কথা আমার মেয়েকে লিখেছ!

ভদ্রলোক গর্জাতে লাগলেন। আমি হতভম্ব এবং লজ্জিত। এমনিতেই আমি একটু লাজুক ধরনের ছেলে। এ ধরনের অভিযোগে একেবারে বোকা বনে গেলাম।

তুমি কি মনে করেছ আমি ছেড়ে দেব ? হ্যাঁ। ভদ্রলোকের মেয়েছেলের মান-ইজ্জত।

কথা শেষ হবার আগেই মন্টু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। শান্ত গলায় বলল, যান, আপনি বাড়ি যান।

বললেই হলো, যা ইচ্ছে তা লিখে বেড়াবে আর আমি বসে বসে কলা চুষব ?

মন্টু নিমিষের মধ্যে, আমার কিছু বুঝবার আগেই ভদ্রলোকের কলার চেপে ধরল। হুঙ্কার দিয়ে বলল, চুপরাও ছোটলোক।

মা বেরিয়ে এলেন। আশেপাশে লোক জমে গেল। আমি তটস্থ। মন্টু চেঁচাতে লাগল, দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে তোমার মেয়ের কারবার আর তুমি এসেছ দাদার কাছে ?

ওভারশিয়ার ভদ্রলোক বদলি হয়ে গেছেন রাজশাহী। মেয়েকে নিশ্চয়ই কোথাও বিয়ে দিয়েছেন। তিনি এখানে থাকলে মন্টুর উন্মাদ রাগের পরিণতি দেখে খুশি হতেন হয়তো।

মাস্টার কাকার বাড়ি থেকে লোক এলো একজন। দড়ি পাকানো চেহারা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, ছুঁচাল দাড়ি। চোখে নিকেলের চশমা।

শরীফ আকন্দের ভাই আমি। বড় ভাই। তার জিনিসপত্র টাকা-পয়সা যা আছে নিতে এসেছি।

আমি বললাম, জিনিসপত্র বিশেষ নেই, তবে অনেক বই আছে।

টাকা-পয়সা কী আন্দাজ আছে ?

দুশ পনেরো টাকা ছিল।

মাত্র! তবে যে শুনলাম বহু টাকা। টাকার জন্যেই খুন করা হয়েছে।

লোকটি কুতকুতে চোখে তাকাচ্ছিল। পান চিবানো ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়া লালা টেনে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, আপনারা যা বলবেন এখন তো তাই সত্যি। তা সে টাকা ক'টাই দিন। আসতেই আমার পঁচিশ টাকা খরচ।

তাঁর সব কিছুই থানায়। আপনি সেখানে যান।

কই ?

থানায়।

অ।

ভদ্রলোক বিমর্ষ হয়ে চলে গেলেন। রুনু বলল, দাদা, ও কি সত্যি মাস্টার কাকার ভাই ?

হুঁ।

কী করে বুঝলে ?

এক রকম চেহারা।

মাস্টার কাকার চেহারা আমার মনে আছে। গত পরশু শেষ রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। বড় মাকেও দেখেছি। বড় মা অবাক হয়ে বলছেন, তুই এই হলুদ রঙের শাড়ি

আনলি আমার জন্যে খোকা ? এই শাড়ি পরার বয়স কি আছে রে বোকা ?

বেতন পেয়ে সবার জন্যেই কিছু-না-কিছু কিনেছি। আপনি নেন এটা।

সবার জন্যেই কিনেছিস ?

জি।

কী কী কিনলি ?

আমি নাম বলে চললাম। বড় মা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, সবার জন্যেই কিনলি, মাস্টারের জন্য কিনলি না ? সে বাদ পড়ল বুঝি ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, জানেন না, মাস্টার কাকা তো মারা গেছেন।

আহা, কী করে মারা গেল ? বড় ভালো লোক ছিল।

বড় মা মাস্টার কাকাকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। প্রায়ই আলাপ করতেন তাঁর সাথে। মাস্টার কাকা বড় মাকে বড় বোনের মতো দেখতেন। আমার মাকে ভাবি বলে ডাকলেও বড় মাকে ডাকতেন বড় বুবু বলে। বড় মা প্রায়ই বলতেন, ও মাস্টার, আমার ভাগ্যটা গুনে দিলে না ?

বড় বুবু, আপনাদের সবার ভাগ্যই আমি গুনে রেখেছি।

ছাই গুনেছেন। বলুন আমার ভাগ্য।

আপনার জন্মলগ্নে মঙ্গল আর রবির প্রভাব। সৌভাগ্যবান আপনি। ভাগ্যবান ছেলে হবে আপনার।

বড় মা হো হো করে হেসে উঠতেন।

মাথার ঠিক নাই তোমার। এই তোমার ভাগ্য গণনা ? এইসব বুঝি লেখা বই-এ! পুড়িয়ে ফেল তোমার বই। না হয় আমাকে দিও, আমি আগুন করে তোমাকে চা বানিয়ে দেব।

কাকা বিমর্ষ হয়ে বইয়ের পাতা উল্টাতেন। এইখানেই তাঁর গণনা মিলত না। বাবা বড় মা'র ছেলে হওয়ার কোনো আশা না দেখেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন।

আশ্চর্যভাবে কাকার গণনা মিলে গেল এক সময়। রুনুর জন্মের পাঁচ বৎসর আগেই বড় মা'র কোলে এলো মন্টু। বড় মা ভীষণ অবাক হয়েছিলেন কাকার নির্ভুল গণনা দেখে। কাকাকে ডেকে বললেন, আমার ছেলের ভাগ্যটা একটু দেখ মাস্টার। আশ্চর্য! এসব শিখলে কী করে ? আমার শিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মাস্টার কাকা হেসে বলেছিলেন, এও এক ধরনের বিজ্ঞান বুবু। অন্ধকার বিজ্ঞান। আপনি যদি শিখতে চান...

বড় মা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিলেন, আগে আমার ছেলের ভাগ্য বলো। তারপর তোমার অন্ধকার বিজ্ঞান।

কাকা বললেন, জন্ম হয়েছে মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে। জন্ম সময় আকাশে কুন্তলান। জাতক শনির ক্ষেত্রে রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে

শুক্রের সপ্তমাংসে...

আহা, কী আবোলতাবোল শুরু করলে, ফলাফলটা বলো।

ছেলে বুদ্ধিমান, সাহসী, শক্তিমান আর প্রেমিক। সৌভাগ্যবান ছেলে আপনার। তাকে একটা গোমেদ পাথর দেবেন বুবু। খুব কাজে লাগবে।

বড় মা মন্টুকে এগারো বৎসরের রেখে মারা গেলেন। মন্টুর জন্যে গোমেদ পাথর আর নেওয়া হলো না। সেই পাথর যদি থাকত তবে কি এই বিপদ এড়াতে পারত মন্টু!

আদালতে কৌতূহলী মানুষের ভিড়। সিগারেটের ধোঁয়া, ঘামের গন্ধ, লোকজনের মৃদু কথাবার্তা সব মিলিয়ে অন্যরকম পরিবেশ। গুমোট গরম, যদিও মাথার উপর দু'টি নড়বড়ে রঙ ওঠা ফ্যান কঁ্যা কঁ্যা করে ঘুরছে। কালো গাউন পরা উকিলরা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। মন্টু সরাসরি তাকিয়ে আছে সামনে। বাবা, আমি আর রুনু বসে আছি জড়োসড়ো হয়ে। মন্টুকে দেখলাম মুখে হাত চাপা দিয়ে কয়েকবার কাশল।

আপনি বলছেন খুন করার ইচ্ছে হঠাৎ হয়নি, কিছুদিন থেকেই মনে ছিল।

হ্যাঁ।

কত দিন থেকে?

কত দিন থেকে আমার মনে নাই।

কিন্তু কী কারণে ঠান্ডা মাথায় খুন করার ইচ্ছে হলো?

কারণ আমার মনে নেই।

আপনি অসুস্থ?

না, আমি সুস্থ।

ক্রস একজামিনেসনের শুরুতেই বাবা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ তিনি শব্দ করে কেঁদে ফেললেন। সবাই তাকাল তাঁর দিকে। আদালতে মৃদু গুঞ্জন সরব হয়ে উঠল। জজ সাহেব বললেন, অর্ডার অর্ডার। তার কিছুক্ষণ পরই আদালত সেদিনের মতো মুলতবি হয়ে গেল। মা কাঁপা গলায় বললেন, বিচার শেষ হবে কবে খোকা?

চারদিকে বড় বেশি নির্জনতা। বড় বেশি নীরবতা। মন্টুর ঘরে বাবা একটা তালা লাগিয়েছেন। রুনুর বিছানায় রুনু একা একা অনেক রাত অবধি জেগে থাকে। বাতি জ্বালানো থাকলে আগে ঘুমুতে পারত না সে। এখন সারা রাত বাতি জ্বলে। হারিকেনের আবছা আলোয় সমস্তই কেমন ভুতুড়ে দেখায়। ঘরের দেয়ালে আমার মাথার একটা প্রকাণ্ড কালো ছায়া পড়ে। মাঝে মাঝে বাবা গোঙানির মতো শব্দ করে কাঁদেন। রুনু আঁতকে উঠে বলে, কী হয়েছে দাদা?

আমি চুপ করে থাকি।

রুনু আবার বলে, দাদা, কী হয়েছে?

বাবা কাঁদছেন।

বাবা গোঙানির মতো শব্দ করে কাঁদেন। বারান্দায় কী অপরূপ জ্যোৎস্না হয়। হাস্নুহেনার সুবাস ভেসে আসে। রুনু বলে, মরার পর কী হয় দাদা?

আমি উত্তর দেই না। মনে মনে বলি, কিছুই হয় না। সব শেষ। সে জীবন দোয়েলের হরিণের হয়নি কো দেখা...। অসংলগ্ন কত কথাই মনে আসে।

দাদা, মন্টু ভাইয়ের কী হবে?

জানি না।

ঘরের দেয়ালের লম্বা ছায়াগুলির দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতর হুহু করে। নাহার ভাবি মৃদু ভল্যুমে গান শুনেন, 'বিধি ডাগর আঁখি যবে দিয়েছিলে, মোর পানে কেন পড়িল না।' কান পেতে শুনি।

মাঝে মাঝে নাহার ভাবি আসেন আমার ঘরে। বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকেন। সেদিনও এসেছিলেন। আমি জানালা বন্ধ করে বসেছিলাম। বাইরে কী তুমুল বৃষ্টি! বিকেলের আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে আগে ভাগে। নাহার ভাবি রুনুর বিছানায় এসে বসলেন।

আমি পরশু চলে যাচ্ছি।

আমি চমকে বললাম, কোথায়?

প্রথমে বাবার কাছে যাব। সেখান থেকে বাইরেও যেতে পারি দাদার সঙ্গে, ও চিঠি লিখেছে যেতে।

আমি চুপ করে রইলাম। নাহার ভাবি বললেন, আপনাদের কথা খুব মনে থাকবে আমার। আপনাদের সবাইকে আমার বড় ভালো লেগেছে। রাবেয়ার কথা খুব মনে হয় আমার।

নাহার ভাবি চোখ মুছলেন। রুনু চা নিয়ে আসল দু'কাপ। নাহার ভাবি চায়ে চুমুক দিয়ে ধরা গলায় হঠাৎ করেই বললেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, মন্টু এমন কাজ কেন করল বলবেন? অনেকে অনেক কথা বলে। আমার খারাপ লাগে শুনে। আপনাদের আমি বড্ড ভালোবাসি।

আমি বললাম, রাবেয়ার মৃত্যুর কারণটা তো আপনি জানেন ভাবি।

জানি।

কাকাই হয়তো দায়ী ছিলেন, মন্টু জেনেছিল। অবশ্যি মন্টু বলেনি কিছুই।

মন্টুর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, আমি সব সময় তার জন্যে দোয়া করব। তাকে আমি ভালো করে দেখিওনি কোনোদিন।

ভাবি, মন্টু বড় চুপচাপ ছেলে।

আমার দোয়ায় কিছু হবে না। তবু আমি তার জন্যে দোয়া করব।

নাহার ভাবি মাথা নিচু করে বসেছিলেন। আমার মনে হলো নাহার ভাবি আমাদের বড় আপন। বড় পরিচিত।

রাবেয়ার একটা ছবি দেবেন আমাকে ?

ছবি ?

জি। আমি সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ও খুশি হতো দেখলে। রাবেয়াকে তার খুব ভালো লেগেছিল।

ওর তো কোনো ছবি নেই। আমাদের সবার শুধু একটা গ্রুপ ছবি আছে, মন্টুর জন্মের পর তোলা।

অ।

নাহার ভাবি চলে গেলেন। ট্রাঙ্ক খুলে ছবি বের করলাম আমি। পুরনো ছবি। হলুদ হয়ে গেছে। তবু কী জীবন্তই না মনে হচ্ছে! রাবেয়া হাসি মুখে বসে আছে মেঝেতে। রুনু বাবার কোলে। মন্টু চোখ বুজে বড়মা'র কোলে শুয়ে। বুকে গভীর বেদনা অনুভব করছি। স্মৃতি সে সুখেরই হোক বেদনারই হোক সব সময় করুণ।

সারা রাত খুব বৃষ্টি হলো। আষাঢ়ের আগমনি বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। রুনু বলল, মনে আছে দাদা, এক রাতে এমনি বৃষ্টি হয়েছিল, তুমি একটা ভূতের গল্প বলেছিলে ?

আমি কথা বললাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে হারিকেনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবা হঠাৎ করে বিকৃত গলায় ডাকলেন, খোকা, ও খোকা।

কী বাবা ?

আয়, তুই আমার কাছে আয়। মন্টুর জন্যে বুকটা বড় কাঁদে রে। তিমিরময়ী দুঃখ। প্রগাঢ় বেদনার অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। বাইরে গাছের পাতায় বাতাস লেগে হা হা হা হা শব্দ উঠল।

সতেরোই আগস্ট মন্টুর ফাঁসির হুকুম হলো। মন্টু, যার জন্ম হয়েছিল মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে, রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে। কাকা বলেছিলেন এ ছেলে হবে সাহসী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক।

মন্টুর জীবন ভিক্ষা চেয়ে আমরা মার্সি পিটিশন করলাম। আমার মনে পড়ল ফাঁসির হুকুম হওয়ার আগের দিনটিতে রোগা, শ্যামলা একটি মেয়ে আমাদের বাসায় এসেছিল। তার মুখটা নিতান্তই সাদা-সিধা, ছেলেমানুষি চাহনি। মেয়েটি রিকশা থেকে নেমেই থতমত খেয়ে বাসার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমায় দেখে ঢোক গিলল। বললাম, কার খোঁজ করছেন ?

মেয়েটি মাথা নিচু করে কী ভাবছিল। হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে বলল, আমার নাম ইয়াসমীন। আমি আপনার ভাইয়ের সাথে পড়ি।

মন্টুর সঙ্গে ?

জি।

আস ভেতরে আস। তুমি করে বললাম, কিছু মনে করো না।

মেয়েটি হেসে বলল, আমি কত ছোট আপনার, তুমি করেই তো বলবেন।

বাবা, মা আর রুনু মন্টুকে দেখতে গিয়েছিল। আমি মেয়েটিকে আমার ঘরে এনে বসালাম।

বসো।

এখানে কে শোয় ?

আমি আর রুনু।

রুনু কোথায় ?

মন্টুকে দেখতে গিয়েছে। বাবা আর মা-ও গিয়েছেন।

আরো আগে আসলে আমিও রুনুর সঙ্গে যেতে পারতাম, না ?

তুমি যেতে চাও ?

জি-না। ওর খারাপ লাগবে।

মেয়েটি চুপ করে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘর দেখতে লাগল।

আমি বললাম, চা খাবে ?

জি-না।

কোথায় থাক তুমি ?

ওইখানে।

মেয়েটি হয়তো বলতে চায় না সে কোথায় থাকে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে বলল, আমি সব জানতাম, অনেক ভেবেছি আসি। কিন্তু সাহস হয়নি।

এসে কী করতে ?

না, কী আর করতাম! তবু হঠাৎ ইচ্ছে হতো। আমি আপনাদের সবাইকে চিনি। ও আমাকে বলেছে।

কী বলেছে ?

মেয়েটি মুখ নিচু করে হাসল। বলল, আপনাদের একটা কুকুর ছিল, পলা।

হ্যাঁ, শুধু পলাতক হতো তাই তার নাম পলা।

আচ্ছা, ওর কি সাজা হবে ?

বারো-তেরো বৎসরের সাজা হবে হয়তো।

ফাঁসি হবে না তো ?

না। উকিল বলেছেন কম বয়স, আর রাগের মাথায় খুন।

ওর বুঝি খুব রাগ ?

তোমার কী মনে হয় ?

মেয়েটি হাসল কথা শুনে। বলল, জানি না। আমি যাই।

আবার এসো।

আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল আমার।

কেন ?

ও আপনাকে খুব ভালোবাসত। আমার কাছে সব সময় বলত আপনার কথা।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ, ও তো মিথ্যা বলে না।

মেয়েটি চলে গেল। মন্টু হয়তো আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত। বড় চাপা ছেলে, বুঝবার উপায় নেই, তবে শ্রদ্ধা করত ঠিকই। না শ্রদ্ধা নয়, ভালোবাসা বলা যেতে পারে।

মনে পড়ল একদিন সন্ধ্যায় রুনু এসে আমায় বলল, দাদা, মন্টু আজ বাসায় আসবে না, আমায় বলে দিয়েছে। সে কাঁঠাল গাছে বসে আছে।

কেন রে ?

ও শার্ট ছিঁড়ে ফেলেছে মারামারি করে। তাই আমায় বলেছে তুমি যদি ওকে আনতে যাও তবেই আসবে।

প্রবল ভালোবাসা না থাকলে সন্ধ্যাবেলা বসে কেউ প্রতীক্ষা করে না কখন বড় ভাই এসে গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবে।

মন্টুর চলে যাবার পরপরই বাবা মন্টুর ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন।

কতদিন আর হলো মন্টু গিয়েছে, তবু মনে হয় অনেক দিন ধরেই এই ঘরে একটি মাস্টার লক ঝুলে আছে। একটু আগে যে মেয়েটি এসেছিল সে মন্টুর ঘর দেখতে চায়নি। কে জানে সে-ঘরের কোথাও হয়তো এই মেয়েটির লেখা দু-একটা চিঠি মলিন হয়ে পড়ে আছে। আমি মন্টুর ঘরের তালা খুলে ফেললাম। পশ্চিম দিকের জানালা খুলতেই এক চিলতে হলুদ রোদ এসে পড়ল ঘরে। পাশাপাশি দু'টি চৌকি। কাকার জিনিসপত্র কিছু নেই। সমস্তই পুলিশ সিজ করে নিয়েছে। মন্টুর বিছানা, কভার ছাড়া বালিশ, দড়িতে ঝুলানো শার্ট-প্যান্ট সব তেমনি আছে। বাঁশের তৈরি ছাপড়ায় সুন্দর করে খবরের কাগজ সাঁটা। ঝুঁকে পড়ে তাকাতেই নজরে পড়ল টিপ কলম দিয়ে লিখে রেখেছে 'দিন যায় দিন যায়।' কী মনে করে লিখেছিল কে জানে।

সতেরো তারিখ মন্টুর ফাঁসির হুকুম হলো। ঠান্ডা মাথায় খুন, অনেক আই উটনেস। কলেজে পড়া বিবেক বুদ্ধির ছেলে। জজ সাহেব অবলীলায় হুকুম করলেন।

সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ মার্সি পিটিশন অগ্রাহ্য হলো। আমি জানলাম আঠারো তারিখ ভোর রাতে তার ফাঁসি হবে। তার লাশ নিতে হলে সেই সময় জেল গেটের সামনে জেলারের চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

বাবা, মা আর রুনুকে নিয়ে মন্টুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

রোগা হয়ে গিয়েছে মন্টু। আমাদের দেখে অপ্রকৃতস্থের মতো হাসল। বলল, দাদা, মার্সি পিটিশনটার কোনো জবাব এসেছে ?

ওকে বুঝি সে-কথা জানানো হয়নি ? ভালোই হয়েছে। আমি বললাম, না রে এখনো আসেনি।

মা, রুনু আর বাবা কাঁদছিলেন। মন্টু বলল, কাঁদেন কেন আপনারা ? আমি জানি আমার ফাঁসি হবে না। কাল রাতে মাকে স্বপ্নে দেখেছি। মা বলছেন, খোকা ভয় পাস কেন ? তোর ফাঁসি হবে না।

আমি বললাম, মন্টু, তোর কাছে একটি মেয়ে এসেছিল, রোগা লম্বা মতো।

মন্টু বলল, ও ইয়াসমিন, আমার সঙ্গে পড়ে।

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। মন্টু নীরবতা ভঙ্গ করে রুনুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, রুনু মিয়া, মরতে ইচ্ছে হয় না।

বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, তোকে কী খেতে দেয় রে ?

ভালোই দেয় বাবা। আগে আজেবাজে দিত। ক'দিন ধরে রোজ জানতে চায়, আজ কী দিয়ে খেতে চান ? এ জেলের জেলার খুব ভালো মানুষ বাবা, আমাকে শিবরামের একটা বই পাঠিয়েছেন, যা হাসির!

মা বললেন, মন্টু, বাসার কোনো জিনিস খেতে ইচ্ছে হয় তোর ?

না মা, এখানে এরা বেশ রাঁধে।

সেপাই এসে বলল, অনেকক্ষণ হয়েছে তো, আরো কথা বলবেন ?

বাবা বললেন, না। বাবা মন্টুর হাতে চুমু খেলেন কয়েকবার। মন্টু কাশল বারকয়। সে মনে হলো একটু লজ্জা পাচ্ছে। বের হয়ে আসছি হঠাৎ মন্টু ডাকল, দাদা, তুমি একটু থাক।

আমি ফিরে এসে মন্টুর হাত ধরলাম। মন্টু কিছু বলল না। আমি বললাম, কিছু বলবি ?

না।

ইয়াসমিনের কথা কিছু বলবি ?

না না।

তবে ?

মন্টু অল্প হাসল। বলল, তোমাদের আমি বড় ভালোবাসি দাদা।

গাছের নিচে ঘন অন্ধকার। কী গাছ এটা ? বেশ ঝাঁকড়া। অসংখ্য পাখি বাসা বেঁধেছে। তাদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি। পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠে ম্লান জ্যোৎস্নার আলো। কিছুক্ষণের ভিতরই চাঁদ ডুবে যাবে। জেলখানার সেন্ট্রি দুজন সিগারেট খাচ্ছে। দুটি

আগুনের ফুলকি উঠানামা করছে দেখতে পাচ্ছি। তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ছায়া ছায়া মূর্তি মনে হয়। জেলখানার মাথার গেটের ঠিক উপরে একশো পাওয়ারের বাতি জ্বলছে একটা। বাতির চারপাশে অনেক পোকা ভিড় করেছে। বাবা বললেন, খোকা ক'টা বাজে ? বলতে বলতে বাবা বুকে হাত রাখলেন। তাঁর বুক পকেটে জেলারের চিঠি রয়েছে। সেটি দেখালেই তারা মন্টুকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন। মন্টুকে আমরা ঘরে ফিরিয়ে নেব। ঘরে, যেখানে মা আজ সারারাত ধরে কোরান শরীফ পড়ছেন।

বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না হয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতরে চাঁদ ডুবে যাবে। আমি আর বাবা ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে আছি সিমেন্টের বেঞ্চিতে। মাথার উপর ঝাঁকড়া অন্ধকার গাছ। বাবা নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর দ্রুত শ্বাস নেয়ার শব্দ পাচ্ছি। তিনি একটু আগেই জানতে চাচ্ছিলেন ক'টা বাজে।

আমরা সবাই মাঝে মাঝে এমনি ঠান্ডা মেঝেতে বসে বাইরের জ্যোৎস্না দেখতাম। হাস্নুহেনা গাছে কী ফুলই না ফুটত! আমাদের বাসার সামনে মাঠে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। সেখানে অসংখ্য জোনাকি জ্বলত আর নিবত। 'জোনাকি ঝিকিমিকি জ্বালো আলো' গান বাজিয়েছিলেন নাহার ভাবি।

আমাদের পলার নাকটা ছিল সিমেন্টের মেঝের মতোই ঠান্ডা। মন্টু বলেছিল, দাদা, কুকুরের নাক এত ঠান্ডা কেন ?

মাস্টার কাকা বাইরে বসে বসে আকাশের তারা দেখতেন। বলতেন, খোকা, আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি।

রাবেয়া একদিন রাগ হয়ে বলেছিল, মা, আমি সবার বড় কিন্তু কেউ ঈদের দিন আমাকে সালাম করে না।

আমি আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে আছি। আমার শীত করছে। বাবা ভারী গলায় ডাকলেন, খোকা, খোকা।

কী বাবা ?

ক'টা বাজে রে ?

আমি বাবার হাত ধরলাম। কী শীতল হাত! বাবা থরথর করে কাঁপছেন। আমাদের মাথার উপরের ঝাঁকড়া গাছ থেকে আচমকা অসংখ্য কাক কা কা করে ডেকে জেলখানার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

ভোর হয়ে আসছে। দেখলাম চাঁদ ডুবে গেছে। বিস্তীর্ণ মাঠের উপরে চাদরের মতো পড়ে থাকা ম্লান জ্যোৎস্নাটা আর নেই।

শঙ্খনীল কারাগার

বাস থেকে নেমে হকচকিয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে সব। রাস্তায় পানির ধারা-স্রোত। লোকজন চলাচল করছে না, লাইটপোস্টের বাতি নিবে আছে। অথচ দশ মিনিট আগেও যেখানে ছিলাম সেখানে বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। শুকনো খটখট করছে চারদিক। কেমন অবাক লাগে ভাবতে, বৃষ্টি এসেছে, ঝুপ ঝুপ করে একটা ছোট্ট জায়গা ভিজিয়ে চলে গেছে। আর এতেই আশৈশব পরিচিত এ অঞ্চল কেমন ভৌতিক লাগছে। হাঁটতে গা ছম ছম করে।

রাত নয়টাও হয়নি, এর মধ্যেই রশীদের চায়ের স্টল বন্ধ হয়ে গেছে। মডার্ন লন্ড্রিও ঝাপ ফেলে দিয়েছে। একবার মনে হলো হয়তো আমার নিজের ঘড়িই বন্ধ হয়ে আছে, রাত বাড়ছে ঠিকই টের পাচ্ছি না। কানের কাছে ঘড়ি ধরতেই ঘড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে মন্টুর গলা শোনা গেল।

রাস্তার পাশে নাপিতের যে সমস্ত ছোট ছোট টুল কাঠের বাক্স থাকে, তারই একটায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। আলো ছিল না বলেই এতক্ষণ নজরে পড়েনি। চমকে বললাম, মন্টু, কী হয়েছেরে?

কিছু হয়নি।

স্পঞ্জের স্যান্ডেল হাতে নিয়ে মন্টু টুল বাক্স থেকে উঠে এলো। কাদায় পানিতে মাখামাখি। ধরা গলায় বলল, পা পিছলে পড়েছিলাম, স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে গেছে।

এত রাতে বাইরে কী করছিলি?

তোমার জন্যে বসেছিলাম, এত দেরি করেছ কেন?

বাসায় কিছু হয়েছে মন্টু?

না, কিছু হয়নি। মা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, বলেছে ভিক্ষে করে খেতে।

মন্টু সার্টের লম্বা হাতায় চোখ মুছতে লাগল।

টুনুদের বাসায় ছিলাম, টুনুর মাস্টার এসেছে সে জন্যে এখানে বসে আছি।

কেউ নিতে আসেনি?

রাবেয়া আপা এসে চার আনা পয়সা দিয়ে গিয়েছে, বলেছে তুমি আসলে তোমাকে নিয়ে বাসায় যেতে।

মন্টু আমার হাত ধরল। দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে সন্ধ্যা থেকে বসে আছে বাইরে, এর ভেতর ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে, বাতি-টাতি নিবিয়ে লোকজন ঘুমিয়েও পড়েছে। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতরই বেশ খানিকটা নির্মমতা আছে। অথচ মাকে এ নিয়ে কিছুই বলা যাবে না। বাবা রাত দশটার দিকে ঘরে ফিরে যখন সব শুনবেন তখন তিনি আরো চুপ হয়ে যাবেন। মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াবেন এবং একদিন ক্ষতিপূরণ

হিসেবে চুপি চুপি হয়তো একটি সিনেমাও দেখিয়ে আনবেন।

দাদা, রুনুকেও মা তালাবন্ধ করে রেখেছে, ট্রাঙ্ক আছে যে ঘরটায় সেখানে।

রুনু কী করেছে ?

আয়না ভেঙেছে।

আর তুই কী করেছিলি ?

আমি কিছু করিনি।

ঝুনু বারান্দায় মোড়া পেতে চুপচাপ বসেছিল। আমাদের দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

দাদা, এত দেরি করলে কেন ? যা খারাপ লাগছে।

কী হয়েছে ঝুনু ?

কত কী হয়েছে, তুমি রাবেয়া আপাকে জিজ্ঞেস কর।

গলার শব্দ শুনে রাবেয়া বেরিয়ে এলো। চোখে ভয়ের ভাবভঙ্গি প্রকট হয়ে উঠেছে। চাপা গলায় বলল, মা'র ব্যাথা শুরু হয়েছেরে খোকা, বাবা তো এখনো আসল না, কী করি বল তো ?

কখন থেকে ?

আধঘণ্টাও হয়নি। মা'র কাছ থেকে চাবি এনে দরজা খুলে দেব রুনুর, সেই জন্যে গিয়েছি, দেখি এই অবস্থা।

ভেতরের ঘরে পা দিতেই রুনু ডাকল, ও দাদা শুনে যাও, মা'র কী হয়েছে দাদা ?

কিছু হয়নি।

কাঁদছে কেন ?

মা'র ছেলে হবে।

অ! দাদা তালাটা খুলে দাও, আমার ভয় লাগছে।

একটু দাঁড়া, রাবেয়া চাবি নিয়ে আসছে।

এখান থেকে মায়ের অস্পষ্ট কান্না শোনা যাচ্ছে। কিছু কিছু কান্না আছে যা শুনলেই কষ্টটা সম্বন্ধে শুধু যে একটা ধারণাই হয় তাই না, ঠিক সেই পরিমাণ কষ্ট নিজেরও হতে থাকে। আমার সেই ধরনের কষ্ট হতে থাকল।

রাবেয়া এসে রুনুর ঘরের তালা খুলে দিল। রাবেয়া বেচারি ভীষণ ভয় পেয়েছে।

তুই এত দেরি করলি খোকা, এখন কী করি বল ? ওভারশীয়ার কাকুর বউকে খবর দিয়েছি, তিনি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে আসছেন। তুই সবাইকে নিয়ে খেতে আয়, শুধু ডালভাত। যা কাণ্ড সারাদিন ধরে, রাঁধব কখন ? মা'র মেজাজ এত খারাপ আগে হয়নি।

হড়বড় করে কথা শেষ করেই রাবেয়া রান্নাঘরে চলে গেল। কলঘরে যেতে হয় মা'র ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে। চুপি চুপি পা ফেলে যাচ্ছি, মা তীক্ষ্ণ গলায় ডাকলেন, খোকা!

কী মা ?

তোর বাবা এসেছে ?

না।

আয় ভেতরে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

ব্যথাটা বোধহয় কমেছে। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। মা'র মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম আর ফ্যাকাশে ঠোঁট ছাড়া অসুস্থতার আর কোনো লক্ষণ নেই।

খোকা, মন্টু এসেছে ?

এসেছে।

আর রুনুর ঘর খুলে দিয়েছে রাবেয়া ?

দিয়েছে।

যা, ওদের নিয়ে আয়।

রুনু, ঝুনু আর মন্টু জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল সামনে। কিছুক্ষণ চুপ থেকেই মা বললেন, কাঁদছ কেন রুনু ?

কাঁদছি না তো।

বেশ, চোখ মুছে ফেল। ভাত খেয়েছ ?

না।

যাও, ভাত খেয়ে ঘুমাও গিয়ে।

মন্টু বলল, মা, আমি বাবার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব ?

না না। ঘুমাও গিয়ে। রুনুমা, কাঁদছ কেন তুমি ?

কাঁদছি না তো।

আমার কিছু হয়নি, সবাই যাও ঘুমিয়ে পড়। যাও, যাও।

ঘর থেকে বেরিয়েই কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগল আমার। আমাদের এই গরিব ঘর, বাবার অল্প মাইনের চাকরি, এর ভেতর মা যেন সম্পূর্ণ বেমানান।

বাবার সঙ্গে তার যখন বিয়ে হয়, তিনি তখন ইতিহাসে এমএ পরীক্ষা দেবেন। আর বাবা তাদের বাড়িরই আশ্রিত। গ্রামের কলেজ থেকে বিএ পাশ করে চাকরি খুঁজতে এসেছেন শহরে। তাঁদের কী যেন আত্মীয় হন।

বিয়ের পর এই বাড়িতে এসে ওঠেন দু'জন। মা'র পরীক্ষা দেয়া হয়নি। কিছু দিন কোনো এক স্কুলে মাস্টারি করেছেন। সেটি ছেড়ে দিয়ে ব্যাংকে কী একটা চাকরিও নেন। সে চাকরি ছেড়ে দেন আমার জন্মের পর পর। তারপর একে একে

রুনু হলো, ঝুনু হলো, মন্টু হলো— মা গুটিয়ে গেলেন নিজের মধ্যে।

সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মা আমাদের গরিব ঘরে এসেছেন বলেই তাঁর সামান্য রূপের কিছু কিছু আমরা পেয়েছি। তাঁর আশৈশব লালিত রুচির কিছুটা (ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলেও) সঞ্চারিত হয়েছে আমাদের মধ্যে। শুধু যার জন্যে তৃষিত হয়ে আছি সেই ভালোবাসা পাইনি কেউ। রাবেয়ার প্রতি একটি গাঢ় মমতা ছাড়া আমাদের কারো প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। মা'র অনাদর খুব অল্প বয়সে টের পাওয়া যায়, যেমন আমি পেয়েছিলাম। রুনু-ঝুনুও নিশ্চয়ই পেয়েছে। অথচ আমরা সবাই মিলে মাকে কী ভালোই না বাসি।

উকিল সাহেবের বাসায় টেলিফোন আছে। সেখান থেকে ছোট খালার বাসায় টেলিফোন করলাম। ছোট খালা বাসায় ছিলেন না, ফোন ধরল কিটকি।

কী হয়েছে বললেন খোকা ভাই?

মা'র শরীর ভালো নেই।

কী হয়েছে খালার?

কী হয়েছে বলতে গিয়ে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল, এদিকে উকিল সাহেব আবার কানখান খাড়া করে শুনছেন কী বলছি। কোনোরকমে বললাম, মা'র ছেলে হবে কিটকি।

আপনাদের তো ভারী মজা, কতগুলি ভাইবোন। আমি একদম একা।

কিটকি, খালাকে সকাল হলেই বাসায় একবার আসতে বলবে।

হ্যাঁ বলব। আমিও আসব...।

মা'র বাড়ির লোকজনের ভেতর এই একটি মাত্র পরিবারের সঙ্গে আমাদের কিছুটা যোগাযোগ আছে। ছোট খালা আসেন মাঝে মাঝে। কিটকির জন্মদিন, পুতুলের বিয়ে এই জাতীয় উৎসবগুলিতে দাওয়াত হয় রুনু-ঝুনুর।

বাসায় ফিরে দেখি বাবা এসে গেছেন। ওভারশীয়ার কাকুর বউ এসেছেন, ধাই সুহাসিনিও এসেছে। রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে। রাবেয়া ব্যস্ত হয়ে এঘর-ওঘর করছে। বাবা ভেতরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে ঘনঘন সিগারেট খাচ্ছেন। আমাকে দেখে যেন একটু জোর পেলেন।

তোর ছোট খালাকে খবর দিয়েছিস খোকা?

জি দিয়েছি। আপনি কখন এসেছেন?

আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তোর আজিজ খাঁকে মনে আছে? ঘড়ির দোকান ছিল যে, আমার খুব বন্ধু মানুষ। সে হঠাৎ মারা গেছে। গিয়েছিলাম তার বাসায়।

বাবা যেন আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন, এমন ভাব-ভঙ্গি করতে লাগলেন।

আজিজ খাঁর বউ ঘনঘন ফিট হচ্ছে। একবার মনে করলাম থেকেই যাই। ভাগ্য ভালো থাকি নি, নিজের ঘরে এত বড় বিপদ।

বিপদ কিসের বাবা ?

না। বিপদ অবশ্যি নয়। কিন্তু রাতে এমন একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছি। যতবারই মনে হয় হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। কিছুক্ষণ আগে রাবেয়াকে বলেছি সে কথা।

কী স্বপ্ন ?

না না, রাতেরবেলা কেউ স্বপ্ন বলে নাকিরে ? যা তুই, রাবেয়ার কাছে গিয়ে বস একটু।

ঘরে যদিও অনেকগুলি প্রাণী জেগে আছি তবু চারদিক খুব বেশি রকম নীরব। রান্নাঘরে দু'একটি বাসন-কোশন নাড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বাবা অবশ্যি মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। তাঁর একা একা কথা বলার অভ্যাস আছে। মাঝে মাঝে যখন মেজাজ খুব ভালো থাকে তখন গুনগুন করে গানও গান। কথা বোঝা যায় না, 'ও মন মনরে' এই লাইনটি অস্পষ্ট শোনা যায়। রাবেয়া বলে, 'বাবার নৈশ সঙ্গীত'। রাবেয়াটা এমন ফাজিল।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখি একটা মস্ত এলুমিনিয়ামের সসপ্যানে পানি ফুটছে। রাবেয়ার ঘুম ঘুম ফোলা মুখে আগুনের লাল আঁচ এসে পড়েছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে কী ভেবে অল্প হাসল। আমি বললাম, হাসছিস যে ?

এমনি। সুহাসিনি মাসির আমি কী নাম দিয়েছি জানিস ?

কী নাম ?

কুহাসিনি মাসি। ওর হাসি শুনলেই আমার গা জ্বলে। একটু আগে কী বলেছে জানিস ?

কী বলেছে ?

থাক, শুনে কাজ নেই।

বল না ?

বলে, আজ তোমার মা'র জন্যে এসেছি, একদিন তোমার জন্যেও আসব খুকি।

বলতে বলতে রাবেয়া মুখ নিচু করে হাসল। মনে হলো কথাটা বলে ফেলে সে বেশ লজ্জা পেয়েছে। হঠাৎ করে ব্যস্ত হয়ে কী খুঁজতে লাগল মিটসেফে।

আমি বললাম, তোর ভাবভঙ্গি দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ খুশিই হয়েছিস শুনে।

তুই একটা গাধা।

লজ্জায় রাবেয়া লাল হয়ে উঠল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, লজ্জা পাওয়ার কী হয়েছে ?

যা! লজ্জা পেলাম কোথায়, তোর যে কথা! যাই, দেখে আসি রুনু ঝুনুরা মশারি ফেলে ঘুমিয়েছে কি না, যা মশা!

রাবেয়া আমার পাঁচ বৎসরের বড়। এই বয়সে মেয়েরা খুব বিয়ের কথা ভাবে। তাদের অন্তরঙ্গ সখীদের সাথে বিয়ে নিয়ে হাসাহাসি করে। রাবেয়ার একটি বন্ধুও নেই। আমিই তার একমাত্র বন্ধু। সুহাসিনি মাসির সে-কথাটি হয়তো এই জন্যেই বলেছিল আমাকে। আর আমি এমন গাধা তাকে উল্টো লজ্জা দিয়ে ফেললাম। মেয়েরা লজ্জা পেলে এত বেশি অপ্রস্তুত হয় যে, যে লজ্জা দিয়েছে তার অস্বস্তির সীমা থাকে না।

ঘরে খুব হৈ হৈ করে বেড়ালেও রাবেয়া ভীষণ লাজুক। কলেজে যাওয়া বন্ধ করার ব্যাপারটি ধরা যাক। তিন বছর আগে হঠাৎ একদিন এসে বলল, বাবা, আমি আর কলেজ করব না।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, কেন মা ?

এমনি।

মা বললেন, রাবেয়া তোমাকে কি কেউ কিছু বলেছে ?

না মা, কেউ কিছু বলেনি।

কোনো চিঠি ফিটি দিয়েছে নাকি কোনো ছেলে ?

না মা। আমাকে চিঠি দেবে কেন ?

তবে কলেজে যাবে না কেন ?

এমনি।

না এমনি না, বলো তোমার কী হয়েছে ?

রাবেয়া হঠাৎ ফুপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, মা, ছেলেরা আমাকে মা-কালী বলে ডাকে।

আমাদের ভেতর রাবেয়াই শুধু মা'র রং পায়নি। যতটুকু কালো হলে মায়েরা মেয়েদের শ্যামলা বলেন রাবেয়া তার চেয়েও কালো। কিন্তু ছেলেরা শুধু গায়ের রংটাই দেখল।

ও ছেলে!

তাকিয়ে দেখি সুহাসিনি মাসি, ধবধব করছে গায়ের রং, ফোলা ফোলা চোখে এক বেমানান চশমা। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

খামাখা তোমার বাবা আমার ঘুম ভাঙিয়ে এনেছে, এখনো অনেক দেরি। ন'টার আগে নয়।

আমি চুপ করে রইলাম। সুহাসিনি মাসি বললেন, মেয়েটি কই ? লম্বামতো মেয়েটি ?

আসবে এক্ষুণি, কেন ?

এক কাপ চা করে দিতে বলতাম। এই যে ও খুকি, মাসিকে চা করে দাও না এক কাপ।

রাবেয়া হাসি মুখে বলল, দেই, আপনি বসবেন এখানে ?

না, আমি একটু শোব ভেতরের ইজি চেয়ারে।

রাবেয়া তাকাল আমার চোখে চোখে, তোর লাগবে না কি এক কাপ ?

দে।

তাহলে পাঁচ কাপ দি। বাবাকে এক কাপ, আমার নিজের দু'কাপ।

রাবেয়া চায়ের সরঞ্জাম সাজাতে লাগল। অভ্যস্ত নিপুণ হাত, দেখতে ভালো লাগে। আমি বললাম, মাসির বয়স কত রে ?

অনেক। আমি ছাড়া সবই তো তাঁর হাতে। দেখলে মনে হয় না, তাই না ?

হুঁ। মা'র ব্যথাটা একটু কম মনে হয়।

ছ'বার মা এমন কষ্ট পেলেন। তোরা তো সুখে আছিস, কষ্ট যা তা তো মেয়েদেরই। পেটে ছেলে-মেয়ে আসা মানেই এক পা কবরে রাখা।

আমি বললাম, কষ্টটা যদি পুরুষরাও পেত তাহলে তুই খুশি হতি ?

জানি না।

বলেই রাবেয়া হঠাৎ কী মনে করে হাসতে লাগল। হাসির উচ্ছ্বাসে পেয়ালার দুধ গেল উল্টে, আঁচল খসে পড়ল মেঝেয়। অবাক হয়ে বললাম, হাসির কী হয়েছে ? এত হাসছিস কেন ?

একটা গল্প মনে পড়ছে, তাই হাসছি।

কী গল্প ?

বাজে গল্প, তবে খুব মজার। শুনলে তুই নিজেও হাসবি। শুনবি ?

বল।

একদল মেয়ে আল্লাহর কাছে নালিশ করল। তাদের বক্তব্য, ছেলেমেয়ে হওয়ার ব্যথাটা শুধু মেয়েদের হবে কেন ? এবার থেকে ছেলেদেরও হতে হবে, ব্যথার ভাগও সমান সমান। আল্লাহ বললেন, 'ঠিক আছে তাই হবে।' তারপর হলো কী শোন। মেয়েদের এই দলটির যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাঁর ব্যথা শুরু হলো। কিন্তু কী আশ্চর্য, স্বামী বেচারা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো ব্যথা ফ্যতা নেই। এদিকে তাদের গাড়ির ড্রাইভার ছুটির দরখাস্ত করেছে, তার নাকি হঠাৎ ভীষণ ব্যথা শুরু হয়েছে পেটে।

তারপর ?

তারপর আবার কী ? মেয়েরা বলল, 'আল্লাহ, তোমার পায়ে পড়ি। ব্যথার ভাগাভাগি আর চাই না। আমাদের কষ্ট আমাদেরই থাক।' তুই হাসলি না একটুও, আগে শুনেছিস নাকি ?

না।

তবে ?

নোংরা গল্প, তাই হাসলাম না।

ও।

রাবেয়া চায়ের পেয়ালা হাতে বেরিয়ে গেল। সে খুব অপ্রস্তুত হয়েছে। চোখ লজ্জায় ভিজে উঠেছে। আমার খারাপ লাগতে লাগল। অন্যসময় হলে ঐ গল্পেই প্রচুর হাসতাম। আজ পারিনি। হয়তো মায়ের কথা ভাবছিলাম বলে। চায়ের পেয়ালা হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখি মন্টু গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে এসেছে।

কী-রে মন্টু ?

ঘুম আসছে না দাদা।

কেন ?

রুনু ঝুনু ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার একা একা ভয় লাগছে।

কিসের ভয় ?

ভূতের।

রাবেয়া রান্নাঘরে ফিরে যাচ্ছিল। মন্টু ডাকল, আপা, আমি চা খাব।

এক ফোঁটা ছেলের রাত তিনটার সময় চা চাই। সিগারেটও লাগবে নাকি বাবুর ? দেই বাবার কাছ থেকে এনে ?

আপা, ভালো হবে না বলছি।

ও ঘর থেকে কাপ নিয়ে আয় একটা। দেখিস ফেলে দিয়ে একাকার করিস না।

ভোর হয়ে আসছে, কাক ডাকছে। মুরগির ঘরে মুরগিগুলি সাড়াশব্দ দিচ্ছে, চাঁদের আলোও ফিকে হয়ে এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া দেখছি। ভেতরের ঘর থেকে বাবা বেরিয়ে এলেন। ভীত গলায় ডাকলেন, খোকা।

জি।

তোর মাকে মনে হয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

কেন ? হঠাৎ করে...?

না মানে, সুহাসিনি বলল, এখন বয়স হয়েছে কি না। তা ছাড়া...।

তা ছাড়া কী ?

না, মানে কিছু নয়। আমার কেন যেন খারাপ লাগছে স্বপ্নটা দেখার পর। দেখলাম যেন আমি একটা ঘরে...।

একটা ঘরে কী ?

না না, রাতেরবেলায় স্বপ্ন বলে নাকি কেউ।

বাবা থতমত খেয়ে চুপ করলেন। মায়ের সেই ভয় ধরানো চিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। কোথা থেকে দু'টি বেড়াল এসে ঝগড়া করছে। অবিকল শিশুদের কান্নার মতো আওয়াজ। বাবা বললেন, খোকা, আমি হাসপাতালে গিয়ে এম্বুলেন্স খবর দেই।

আপনার যেতে হবে না, আমি যাই। বরং পাশের বাড়ি থেকে ফোন করে দেই।

না না, ফোন করলে কাজ হবে না। আসতে দেরি করবে, বাসা চিনবে না, অনেক ঝামেলা। তুই থাক।

বাবা চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এত রাতে রিকশা-টিকশা কিছু পাওয়া যাবে না, হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। আমি ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসে রইলাম। যে শিশুটি জন্মাবে সে এত আয়োজন, এত প্রতীক্ষা ও যন্ত্রণার কিছুই জানছে না, এই জাতীয় চিন্তা হতে লাগল। অন্ধকার মাতৃগর্ভের কোনো স্মৃতি কারো মনে থাকে না। যদি থাকত তবে কেমন হতো সে স্মৃতি কে জানে। জন্মের সমস্ত ব্যাপারটাই বড় নোংরা।

রাবেয়া এসে দাঁড়াল আমার কাছে। নিচু গলায় বলল, খোকা, বাবা কি হাসপাতালে গেছেন?

হ্যাঁ।

বাবা খুব ভয় পেয়েছেন, নারে?

হুঁ পেয়েছেন।

আমারও ভয় লাগছে খোকা।

ভয় কিসের?

আমি কিছুতেই বিয়ে করব না দেখিস তুই। মাগো কী কষ্ট!

মায়ের কাছে গিয়েছিলি রাবেয়া?

হ্যাঁ।

মা কী করছে?

চিৎকার করছেন না। চিৎকার করার শক্তি নেই। খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

কী বাজে ব্যাপার!

হুঁ।

মাসি কী করছে?

ঘুমাচ্ছে। বাজানার মতো নাক ডাকছে। মেয়ে মানুষের নাক ডাকা কী বিশ্রী। বাঁশির সরু আওয়াজের মতো তালে তালে বাজছে। ঘেন্না লাগে।

মসজিদ থেকে ফজরের আজান হলো, ভোর হয়ে আসছে।

এম্বুলেন্স আসল ছ'টার দিকে। ড্রাইভারটা মুশকো জোয়ান। সঙ্গের হেল্পার দু'টিরও গুণ্ডার মতো চেহারা। হৈচৈ করে স্ট্রেচার বের করল তারা। সাত সকালেই অনেক

লোকজন জড়ো হয়ে গেল। পাড়ার মেয়েদের প্রায় সবাই এসেছে। উকিল সাহেবের বউ আমাকে ইশারায় ডাকলেন, খোকা, তোর মা'র অবস্থা নাকি খুব খারাপ ? হেড ক্লার্কের বউ বললেন।

না, তেমন কিছু নয়। দেখে আসুন না গিয়ে।

এই যাচ্ছি! বলে তিনি এম্বুলেন্সের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। হেড ক্লার্কের বউও এসেছেন, তার সঙ্গে একটি সুন্দর মতো মেয়ে। কম বয়সী কয়েকজন ছেলেমেয়ে দেখি হৃষ্ট চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্টু ভীষণ ভয় পেয়েছে, আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। মাঝে মাঝে সে যে কাঁপছে তা বুঝতে পরছি। রুনু আর ঝুনুকে দেখছি না। রাবেয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একা একা।

মন্টু বলল, দাদা, তোমাকে ডাকছে।

কে ?

ওভারশিয়ার কাকু।

মন্টুর হাত ধরে ওপাশে গেলাম। হয়তো হাজারো কথা জিজ্ঞেস করবেন। পুরুষ মানুষের মেয়েলি কৌতূহল বড় খারাপ লাগে। ওভারশিয়ার কাকু খালি পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমাকে দেখে বললেন, খোকা, তোমাকে একটু ডাকছিলাম।

কী জন্যে চাচা ?

না, মানে তেমন কিছু নয়, ঘুম থেকে উঠেই এম্বুলেন্স দেখে, মানে ইয়ে... ধর তো খোকা... মাসের শেষ কতরকম দরকার হয়, লজ্জা করো না... সোনা, রাখো।

কথা বলবার অবসর না দিয়ে চাচা সরে গেলেন। ঐদিকটায় হৈচৈ হচ্ছে। স্ট্রেচারে করে মাকে তুলছে গাড়িতে, ছুটে গেলাম।

বাবা, সঙ্গে কে যাচ্ছে ?

আমি আর তোর সুহাসিনি মাসি।

রাবেয়াকে নিয়ে যান।

না না, ও ছেলেমানুষ। খোকা, তোর ছোট খালাকে খবর দিস।

গাড়ি স্টার্ট নিতেই বাবা আবার ডাকলেন, খোকা ও খোকা, তোর মা ডাকছে, আয় একটু।

গাড়ির ভেতর আবছা অন্ধকার। গলা পর্যন্ত চাদর জড়িয়ে মা পড়ে আছেন। সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে এক একবার। মা নরম স্বরে বললেন, খোকা, আয় এদিকে।

অস্পস্ট আলোয় চোখে পড়ল যন্ত্রণায় তাঁর ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। অদ্ভুত ফর্সা মুখের অদৃশ্য নীল শিরা কালো হয়ে ফুলে উঠছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সারা মুখে।

মা, কী জন্য ডেকেছেন ? কী ?

মা কোনো কথা বললেন না। বাবা বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে, খোকা তুই নেমে যা।

আমিও সঙ্গে যাই বাবা ?

না না, তুই থাক। বাসায় ওরা একা। নেমে যা, নেমে যা।

মাসি গলা বাড়িয়ে বললেন, পানের কৌটা ফেলে এসেছি, কেউ আসে তো সঙ্গে দিয়ে দিও।

গাড়ি ছেড়ে দিল। মন্টু গাড়ির পেছনে পেছনে বড় রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফিরে এলো। রুনু-ঝুনুকে নিয়ে আমি বসে রইলাম বারান্দায়। জন্ম বড় বাজে ব্যাপার। মৃত্যুর চেয়েও করুণ।

বুকের উপরে চেপে থাকা বিষণ্নতা দেখতে দেখতে কেটে গেল। আবহাওয়া তরল হয়ে আসল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। ছোট খালা আসলেন নয়টায় তাঁর মস্ত কালো রঙের গাড়িতে করে, সঙ্গে মেয়ে কিটকি। রাবেয়া ঢাউস এক কেটলি চায়ের পানি চড়িয়ে দিল। রুনু-ঝুনু স্কুলে যেতে হবে না শুনে আনন্দে লাফাতে লাগল।

সারারাত অঘুমা থাকায় মাথা ব্যথা করছিল। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। ইউনিভার্সিটিতে এক দফা যেতে হবে। স্যার কাল খোঁজ করছিলেন, পাননি। আতিক কী জন্যে যেন তার বাসায় যেতে বলেছে। খুব নাকি জরুরি। চার্লি চ্যাপলিনের 'দি কিউ' ছবিটি চলছে গুলিস্তানে। আজ দেখব কাল দেখব করে দেখা হয়নি। দু'দিনের ভেতর দেখতে হবে। সামনের সপ্তায় কী এক বাজে ছবি যেন।

কী-রে খোকা, শুয়ে ?

মৃদু সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে খালা ঢুকলেন। খালার সঙ্গে মায়ের চেহারার খুব মিল। তবে খালা মোটা-সোটা, মা ভীষণ রোগা। খালা পাশের চেয়ারে বসলেন।

জ্বর নাকিরে ?

জি-না, এই শুয়েছি একটু।

দেখি ?

খালা মাথায় হাত রাখলেন।

না, মোটেও জ্বর নেই। ডাক্তারের বউ হাফ ডাক্তার হয়, জানিস তো ?

জানি। জ্বর টর নয়, এমনি শুয়ে আছি।

খারাপ লাগছে ? তা তো লাগবেই, বুড়ো বয়সে মায়েদের যদি মেটারনিটিতে যেতে হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। দরজার আড়াল থেকে কিটকি উঁকি দিল। খালা ডাকলেন, আয় ভেতরে।

কিটকি লজ্জিতভাবে ঢুকল। যখন অন্য কেউ থাকে না তখন আমার সঙ্গে কিটকির ব্যবহার খুব সহজ ও আন্তরিক। বাইরের কেউ থাকলেই কিটকি সংকোচ ও লজ্জায় চোখ তুলে তাকায় না। শৈশবের একটি ছোট্ট ঘটনা থেকেই কিটকির এমন হয়েছে।

সে তখন খুব ছোট, ছয়-সাত বৎসর বয়স হবে। মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে বাসায়। রুনু ঝুনুর সঙ্গে সারা দুপুর হৈচৈ করে খেলল। মা যখন সবাইকে খেতে ডাকলেন, তখন তার হঠাৎ কী খেয়াল হলো কী জানি, মাকে গিয়ে বলল, খালা আমি আপনাকে একটা কথা বলব, কাউকে বলবেন না তো ?

না মা, বলব না।

আল্লার কসম বলুন।

আল্লার কসম।

তা হলে মাথা নিচু করুন, আমি কানে কানে বলি।

মা মাথা নিচু করলেন এবং কিটকি ফিস ফিস করে বলল, বড় হয়ে আমি খোকা ভাইকে বিয়ে করব। আপনি কাউকে বলবেন না তো ?

মা কিটকির কথা রাখেননি। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে বলে দিয়েছেন। যদিও সুদূর শৈশবের ঘটনা, তবু স্থানে অস্থানে এই প্রসঙ্গ তুলে বেচারিকে প্রচুর লজ্জা দেয়া হয়। মা তো কিটকির সঙ্গে দেখা হলে একবার হলেও বলবেন, আমার বউ-মেয়েকে কেউ দেখি যত্ন করছে না ?

কিটকি তার মায়ের পাশে বসল। সে আজ হলুদ রঙের কামিজ পরেছে, লম্বা বেণিতে মস্ত বড় বড় দু'টি হলুদ ফিতের ফুল। অল্প হাসল কিটকি। আমি বললাম, কী কিটকি, আজ কলেজ নেই ?

আছে, যাব না।

কেন ?

এমনি। কলেজ ভীষণ বোরিং। তা ছাড়া খালার অসুখ।

থাকবি আজ সারাদিন ?

হ্যাঁ। আজ রাতে আপনাকে ভূতের গল্প বলতে হবে।

ভূতের গল্প শুনে কাঁদবি না তো আবার ?

ইস্, কাঁদব ? ছোটবেলায় কবে কেঁদেছিলাম এখনো সেই কথা।

ছোটবেলায় তো তুই আরো কত কী করেছিস।

ভালো হবে না কিন্তু। বলতে বলতে কিটকি লজ্জায় মাথা নিচু করল।

খালা বললেন, আমি হাসপাতালে যাই খোকা। কিটকি, তুই যাবি আমার সঙ্গে ?

না মা, আমি থাকি এখানে।

খালা চলে যেতেই রাবেয়া চায়ের ট্রে হাতে ঢুকল। বেশ মেয়ে রাবেয়া। এর ভেতর সে গোসল সেরে নিয়ে চুল বেঁধেছে। রান্না শেষ করেছে, এক দফা চা খাইয়ে আবার চা এনেছে। রাবেয়া হাসতে হাসতে বলল, কী কিটকি ? না না ভিটকি বেগম, এই ঘরে কী করছ ? পূর্বরাগ নাকি ? সিনেমার মতো শুরু করলে যে ?

যান আপা, আপনি তো ভারী ইয়ে... মা ডাকলেন তাই।

বেশ বেশ, তা এমন গলদা চিংড়ির মতো লাল হয়ে গেছ যে ? গরমে না হৃদয়ের উত্তাপে ?

যান আপা, ভাল্লাগে না।

নিন নিন ভিটকি বেগম, চা নিন।

কী সব সময় ভিটিকি ডাকেন! জঘন্য লাগে।

কিটকির কি কোনো মানে আছে ? তাই ভিটকি ডাকি।

যেন ভিটকির কত মানে আছে।

আছেই তো। ভিটকি হচ্ছে ভেটকি মাছের স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থাৎ তুই একটি গভীর জলের ভেটকি ফিস, বুঝলি ?

বেশ আমি গভীর জলের মাছ। না, চা খাব না।

কাঁদো কাঁদো মুখে উঠে দাঁড়াল কিটকি। কাউকে কিছু বলার অবসর না দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। রাবেয়া হেসে উঠল হো হো করে। বলল, বড় ভালো মেয়ে।

হুঁ।

একটু অহংকার আছে, তবে মনটা ভালো।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, আমার ভীষণ ভালো লাগে। আর আমার মনে হয় কি জানিস ?

কী মনে হয় ?

মনে হয় মেয়েটির শৈশবে তোর দিকে যে টান ছিল তা যে এখনো আছে তাই নয়, চাঁদের কলার মতো বাড়ছে।

তোর যত বাজে কথা।

রাবেয়া বলল, মেয়েটির কথা ছেড়ে দেই, তোর যে ষোল আনার উপর দু'আনা, আঠারো আনা টান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কান-টান লাল করে একেবারে টমেটো হয়ে গেছিস, আচ্ছা গাধা তো তুই !

রাবেয়া হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। রুনু এসে ঢুকল খুব ব্যস্তভাবে, হাতে একটা লুডুবোর্ড।

কী-রে রুনু ?

কিটকি আপার কী হয়েছে।

কেন ?

চুপচাপ বসে আছে। আগে বলেছিল লুডু খেলবে, এখন বলছে খেলবে না।

রাবেয়া উঁচু গলায় হাসল আবার।

রুনুকে বললাম, রুনু, মন্টু কোথায় ? মন্টুকে দেখছি না তো।

মন্টু হাসপাতালে গেছে।

হাসপাতালে কার সঙ্গে গেল, খালার সঙ্গে ?

না, একাই গেছে। তার নাকি খুব খারাপ লাগছিল। তাই একাই গেছে।

কোন হাসপাতালে চিনবে কী করে ?

চিনবে, তার স্কুলের কাছেই।

চা-টা খেয়ে গিয়েছে ?

না, খায়নি।

রাবেয়া শুয়ে শুয়ে পা দোলাচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে করে উঠে বসল, খোকা, তুই বাজি রাখতে চাস আমার সঙ্গে ?

কী নিয়ে বাজি ?

মা'র ছেলে হবে কি মেয়ে হবে এই নিয়ে।

রাবিশ।

আহ্, রাখ না একটা বাজি। তোর কি মনে হয়, ছেলে হবে ?

আমার কিছু মনে হয় না।

আহ্, বল না একটা কিছু।

ছেলে।

আমার মনে হয় মেয়ে। যদি ছেলে হয় তবে আমি তোকে একটা সিনেমা দেখার পয়সা দেব। আর মেয়ে হলে তুই কী দিবি আমাকে ?

কী বাজে বকিস। ভাল্লাগে না।

আহা বল না কী দিবি ? প্লিজ বল ?

ক্লাশ শেষ হলো দেড়টায়।

আতিক ছাড়ল না। টেনে নিয়ে গেল তার বাসায়। একটি মেয়ে নাকি প্রেমপত্র লিখেছে তার কাছে। সত্যি মেয়েটিই লিখেছে, না কোনো ছেলে ফাজলামি করেছে— তাই ভেবে পাচ্ছে না। তার আসল সন্দেহটা আমাকে নিয়ে, আমি কাউকে দিয়ে লেখাইনি তো। যতবার বলছি— আজ ছেড়ে দাও আরেকদিন কথা হবে, আমার একটু কাজ আছে— ততই সে চেপে ধরে। উঠতে গেলেই বলে, কী এমন কাজ বল ? কী যে কাজ তা আর বলতে পারি না লজ্জায়। অস্বস্তিতে ছটফট করি।

বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকেল। আমাকে দেখেই ওভারশিয়ার কাকু দৌড়ে এলেন, খোকা, তোমার মা'র অবস্থা বেশি ভালো নয়। সবাই হাসপাতালে গেছে। তুমি কোথায় ছিলে ? যাও, তাড়াতাড়ি চলে যাও। রিকশা ভাড়া আছে ?

আমার পা কাঁপতে লাগল। আচ্ছন্নের মতো রিকশায় উঠলাম। সমস্ত শরীর টলমল করছে।

কালোমতো একটি মেয়ে কাঁদছে। কী হয়েছে তার কে জানে। রাবেয়া বাবার হাত ধরে রেখেছে। রুনু-ঝুনুকে দেখছি না। বাচ্চা বোনটা কাঁদছে ট্যা ট্যা করে। খালা কোলে করে আছেন তাকে। খালা বললেন, দেখ খোকা, কী সুন্দর ফুলের মতো বোন হয়েছে।

হ্যাঁ, খুব সুন্দর ফুলের মতো বোন হয়েছে একটি। আর আমাদের আশ্চর্য ফর্সা ভীষণ রোগা মা হাইফোরসেপ ডেলিভারিতে অপারেশন টেবিলে চুপচাপ মারা গেছেন।

২

তেইশ বছর আগে মা এসেছিলেন আমাদের ঘরে। তেইশ বছরে একটি বারের জন্য নিজের বাবার প্রকাণ্ড বাড়িতে যাননি। কতইবা দূর, বাসে চার আনার বেশি লাগে না। এত কাছাকাছি থেকেও যেন তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরের থেকে তেইশ বছর কাটিয়ে দিলেন।

হাসপাতালে মা'র চারপাশে তাঁর পরিচিত আত্মীয় স্বজনেরা ভিড় করলেন। নানাজানকে প্রথম দেখলাম আমরা। সোনালি ফ্রেমের হালকা চশমা, ধবধবে গায়ের রং। 'শাজাহান' নাটকে বাদশা শাজাহানের চেহারা যেমন থাকে ঠিক সে-রকম চেহারা। নানাজান বাবাকে বললেন, মেয়েকে আমি আমার বাড়ি নিয়ে যাই, তোমার আপত্তি আছে ?

বাবা চুপ করে রইলেন। নানাজান কথা বলছিলেন এমন সুরে যেন তাঁর বাড়ির কোনো কর্মচারীর সঙ্গে বৈষয়িক কথা বলছেন। তিনি আবার বললেন, সেখানে মেয়ের মা'র কবর আছে, তার পাশেই সেও থাকবে।

তেইশ বছর পর মা আবার তাঁর নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। একদিন যেমন সব ছেড়ে ছুড়ে এসেছিলেন, কোনো পিছুটান ছিল না, ফিরেও গেলেন তেমনি।

সুর কাটলো না কোথাও। ঘরসংসার চলতে লাগল আগের মতোই। বয়স বাড়তে লাগল আমাদের। রুনু-ঝুনু আর মন্টু ব্যস্ত থাকতে লাগল তাদের পুতুলের মতো ছোট্ট বোনটিকে নিয়ে। যার একটি মাত্র দাঁত উঠেছে। মুখের নাগালের কাছে যাই পাচ্ছে তাই কামড়ে বেড়াচ্ছে সেই দাঁতে। সে সময়ে— অসময়ে থ থ থ থ বলে আপন মনে গান গায়। আর রাবেয়া ? অপূর্ব মমতা আর ভালোবাসায় ডুবিয়ে রেখেছে আমাদের। সমুদ্রের মতো এত স্নেহ কী করে সে ধারণ করেছে কে জানে ?

বাবা রিটায়ার করেছেন কিছুদিন হলো। দশটা-পাঁচটা অফিসের বাঁধা জীবন শেষ হয়েছে। ফেয়ারওয়েলের দিন রুনু-ঝুনু বাবার সঙ্গে গিয়েছিল। অফিসের কর্মচারীরা বাবাকে একটি কোরআন শরীফ, একটি ছাতা আর এক জোড়া ফুলদানি উপহার দিয়েছে। এতেই বাবা মহাখুশি।

মা'র অবর্তমানে যতটা শূন্যতা আসবে মনে করেছিলাম তা আসেনি, সমস্তই আগের মতো চলছে। সব মৃত্যু সম্বন্ধেই এ কথা হয়তো খাটে। 'অতি প্রিয়জন যদি পাশে না থাকে তবে কী করে বেঁচে থাকা যাবে'— ভাবনাটা অর্থহীন মনে হয়। মৃত্যুর জন্যে মানুষ শোক করে ঠিকই, কিন্তু সে শোক স্মৃতির শোক, এর বেশি কিছু নয়।

কোনো কোনো রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মা'র কথা মনে পড়ে। তখন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। কিটকির কথা প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করি তখন। যেন সে এসে বসেছে আমার পাশে। আমি বলছি, কী কিটকি, এত রাতে আমার ঘরে! ভয় করে না?

কিসের ভয়, ভূতের? আমি বুঝি আগের মতো ছেলেমানুষ আছি।

না, তুই কত বড় হয়েছিস, সবাই বড় হচ্ছি আমরা।

হ্যাঁ, দেখেছেন আমার চুল কত লম্বা হয়েছে?

তোকে বব চুলে এরচে' ভালো দেখাত।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কাঁচি আছে আপনার কাছে?

কী করবি?

বব করে ফেলি আবার।

রাতে এ জাতীয় অসংলগ্ন ভাবনা ভাবি বলেই হয়তো কিটকিকে দিনেরবেলায় দেখলে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করি। যেন একটা অপরাধ করে ধরা পড়েছি। কিটকি অবশ্যি আগের মতোই আছে। হৈচৈ করার নেশাটা একটু বেড়েছে মনে হয়। রুনু-ঝুনুর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। প্রায়ই এদের দু'জনকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়।

আমার নিজের স্বভাব-চরিত্রে বেশ পরিবর্তন এসেছে। যখন ছাত্র ছিলাম রাত জেগে পড়তে হতো, আর দু'চোখে ভিড় করত রাজ্যের ঘুম। কষ্ট করে রাত জাগা। এখন ঘুমুবার অবসর আছে কিন্তু চেপে ধরেছে ইনসমনিয়ায়। থানার ঘড়িতে বড় বড় ঘণ্টা বেজে ছোটগুলিও বাজতে শুরু করে, ঘুম আসে না এক ফোঁটা। বিছানায় গড়াগড়ি করি। ভোর হয়। সকালের আলো দু'চোখে পড়তেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আটটা বাজার আগেই রুনু ঝাঁকায়।

দাদা ওঠো, চা জুড়িয়ে পানি হয়ে গেল।

হোক, তোরা খা। শরীর খারাপ আমার, আরেকটু ঘুমুই।

রুনু চলে যেতেই রাবেয়া আসে। প্রবল ঝাঁকুনিতে চমকে উঠে শুনি, তিন মিনিটের মধ্যে না উঠলে দিচ্ছি মাথায় পানি ঢেলে। এক-দুই-তিন-চার... এই দিলাম এই দিলাম...। রাবেয়াকে বিশ্বাস নেই, উঠে পড়তে হয়।

বারান্দায় মুখ ধুতে ধুতেই বাবা সকালের দীর্ঘ ভ্রমণ সেরে ফিরে আসেন। খুশি খুশি গলায় বলেন, তুই বড় লেটরাইজার। স্বাস্থ্য খারাপ হয় এতে। দেখ না আমার স্বাস্থ্য আর তোর স্বাস্থ্য মিলিয়ে।

সত্যি চমৎকার স্বাস্থ্য-বাবার। রিটায়ার করার পর আরো ওজন বেড়েছে। আমি সপ্রশংস চোখে তাকাই বাবার দিকে। বাবা হেসে হেসে বলেন, এত রোগা তুই! কলেজের ছেলেরা তোর কথা শুনে ?

তা শুনে।

রাবেয়া রান্নাঘর থেকে চ্যাঁচায়, না বাবা, মোটেই শুনে না।

বাবা খুব খুশি হন। অনেকক্ষণ ধরে আপন মনে হাসেন। বেশ বদলে গেছেন তিনি। বাবা ছিলেন নিরীহ, নির্লিপ্ত মানুষ। সকালে অফিসে যাওয়া, বিকেলে ফেরা। সন্ধ্যায় একটু তাস খেলতে যাওয়া, দশটা বাজতে না-বাজতে ঘুমিয়ে পড়া। খুবই চুপচাপ স্বভাব। আমাদের কাউকে কোনো কারণে সামান্য ধমক দিয়েছেন এও পর্যন্ত মনে পড়ে না। সংসারে বাবার যেন কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের নিয়ে আর মাকে নিয়েই আমাদের সংসার। বাবার ভূমিকা নেপথ্য কোলাহলের।

কেউ আমাদের দাওয়াত করতে এলে মাকেই বলত। বাড়িওয়ালা ভাড়া নিতে এসে বলত, খোকা, তোমার মাকে একটু ডাক তো। অথচ বাবা হয়তো বাইরে মোড়ায় বসে মন্টুকে অংক দেখিয়ে দিচ্ছেন।

এখন বাবা ভীষণ বদলেছেন। সবার সঙ্গে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে আলাপ চালান। সেদিন ওভারশিয়ার কাকুর সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে এসেছেন। খবরের কাগজ রাখেন দু'টি। প্রতিটি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। রাজনীতি নিয়েও আলোচনা চলে।

খোকা, তোর কী ধারণা ? আওয়ামী লীগ পপুলারিটি হারাবে ?

আমার ? না, আমার কোনো ধারণা নেই।

ভালো করে পেপার পড়া চাই, না পড়লে কি কিছু বুঝা যায় ? রাজনীতি বুঝতে হলে চোখ-কান খোলা রাখা চাই, বুঝলি ? কী, বিশ্বাস হলো না, না ?

হবে না কেন ?

বিশ্বাস যদি না হয় কাগজ কলম নিয়ে আয়, তিন বৎসর পর পার্টির কী অবস্থা হবে লিখে দিই, সিল করে রেখে দে। তিন বৎসর পর অক্ষরের সাথে অক্ষর মিলিয়ে দেখবি।

বাবার রূপান্তর খুব আকস্মিক। আর আকস্মিক বলেই বড় চোখে পড়ে। প্রচুর মিথ্যে কথাও বলেন বানিয়ে বানিয়ে। সেদিন যেমন শুনলাম। ওভারশিয়ার কাকুর ছেলের বউয়ের সঙ্গে গল্প করছেন পাশের ঘরে। এ ঘর থেকে সমস্ত শোনা যাচ্ছে।

কাউকে যেন বলো না মা, গতকাল রাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে।

কী ব্যাপার চাচাজান ?

অনেক রাত তখন। আমি বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছি। হঠাৎ ফুলের গন্ধ পেলাম। বকুল ফুলের গন্ধ। অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। দেখি কী, খোকার মা হালকা হলুদ রঙের একটা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে আম গাছটার নিচে।

বলেন কী চাচা!

হ্যাঁরে মা, মিনিট তিনেক দেখলাম।

রাত কত তখন ?

বারোটার মতো হবে।

গল্পটি যে সম্পূর্ণই মিথ্যা এতে কোনো সন্দেহ নেই। গতরাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। সারারাতই আমি বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে কাটিয়েছি।

অথচ যে বাবা কোনোদিন অপ্রয়োজনের সত্য কথাটিও বলেননি তিনি কেন এমন অনর্গল মিথ্যা বলে চলেন ভেবে পাই না।

রাবেয়া একদিন বলেছিল, মা মারা যাবার পর বাবা খুব ফ্রি হয়েছেন।

তার মানে ?

মানে আর কী, মনে হয় বাবা মা'র সঙ্গে ঠিক মানিয়ে নিতে পারেননি।

তুই কী সব সময় বাজে বকিস ?

আহা এমনি বললাম। কে বলেছে বিশ্বাস করতে।

বিশ্বাস না করলে অবশ্যি চলে, কিন্তু বিশ্বাস না করাই বা যায় কী করে ? মা'র মতো মেয়ে তেইশ বছর কী করে মুখ বুজে এখানে কাটিয়ে দিয়েছেন ভেবে পাই না। বাবা মা'র সঙ্গে হাস্যকর আচরণ করতেন। যেন মনিবের মেয়ের সঙ্গে দিয়ে দেয়া প্রিয় খানসামা একজন। ভালোবাসার বিয়ে হলে এরকম হয় না। সেখানে অসামঞ্জস্য হয়, অশান্তি আসে কিন্তু মূল সুরটি কখনো কেটে যায় না। অথচ যতদূর জানি ভালোবেসেই বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। কিছুটা খালা বলেছেন, কিছু বলেছেন বাবা, রাবেয়াও বলেছে কিছু কিছু (সে হয়তো শুনেছে মা'র কাছ থেকেই)। সব মিলিয়ে এ ধরনের চিত্র কল্পনা করা যায়।

শিরিন সুলতানা নামের উনিশ বছরের একটি মেয়ে সূর্য উঠার আগে ছাদে বসে হারমোনিয়ামে গলা সাধতো ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মে। সাতটার দিকে গানের মাস্টার শৈলেন পোদ্দার আসতেন গান শেখাতে। তিনি আধঘণ্টা থাকতেন। এই

সমস্ত সময়টা আজহার হোসেন নামের একটা গরিব আশ্রিত ছেলে কান পেতে অপেক্ষা করত ছাদের চিলেকোঠার ঘরটায়। সেখানেই সে থাকত। একদিন মেয়েটি কী একটি গান গাইল যেন, খুব ভালো লাগল ছেলেটির। বেরিয়ে এসে কুণ্ঠিতভাবে বলল, আরেকবার গান না। মাত্র একবার।

শিরিন সুলতানা গান তো গানইনি, ছাদের গান বন্ধ করে দিয়েছেন তারপর থেকে। লজ্জিত ছেলেটি অপরাধী মুখে আরো দু'বছর কাটিয়ে দিল চিলেকোঠার ঘরটায়। এই দুবছরে শিরিন সুলতানার সঙ্গে তার একটি কথাও হয়নি। শুধু দেখা গেল দু'জনে বিয়ে করে দেড়শ' টাকা ভাড়ার একটা ঘুপচি ঘরে এসে উঠেছেন।

কী করে এটা সম্ভব হলো তা আমার কাছে একটি রহস্য। রাবেয়ার কাছে জানতে চাইলে সে বলত, আমি জানি কিন্তু বলব না।

কেন?

এমনি। কী করবি শুনে?

জানতে ইচ্ছে হয় না?

বলব তোকে একদিন। সময় হোক।

সেই সময়ও হয়নি। জানাও যায় নি কিছু। অথচ খুব জানতে ইচ্ছে করে।

ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের সঙ্গে দুপুর বারোটায় একটা ক্লাস ছিল। একটার দিকে শেষ হলো। দুপুরে রিকশা পাওয়ার আশা কম। সব রিকশাওয়ালা একসঙ্গে খেতে যায় কি না কে জানে। অল্প হাঁটতেই ঘামে সার্ট ভিজে ওঠার যোগাড়। ভীষণ রোদ। রাস্তায় পিচ গলে সেন্ডেলের সঙ্গে আঠার মতো এঁটে যাচ্ছিল। ছায়ায় দাঁড়িয়ে রিকশার জন্যে অপেক্ষা করব কি না যখন ভাবছি তখনি মেয়েলি গলা শোনা গেল, খোকা ভাই, ও খোকা ভাই।

তাকিয়ে দেখি কিটকি। সিনেমাহলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবাইকে সচকিত করে বেশ জোরেসোরেই ডাকছে। কানে পায়রার ডিমের মতো দুটো লাল পাথর। চুলগুলো লম্বা বেণি হয়ে পিঠে দুলছে। কামিজ সালোয়ার সবই কড়া হলুদে লাল নকশা কাটা। সুন্দর দেখাচ্ছিল, মুখটা লম্বাটে, পাতলা বিস্তৃত ঠোঁট। আমি বললাম, কী-রে তুই সিনেমা দেখবি নাকি?

হুঁ, ইয়েলো স্কাই।

একা এসেছিস?

না, আমার এক বন্ধু আসবে বলেছিল, এখনো আসল না। দেড়টা বেজে গেছে, এখুনি শো শুরু হবে।

টিকিট কেটে ফেলেছিস?

হ্যাঁ।

দে আমার কাছে বিক্রি করে দে একটা। তুই দেখ একা একা।

আপনি দেখেন না আমার সঙ্গে, আপনার তো কোনো কাজ নেই। আসেন না ?

আরে পাগল নাকি ? বাসায় গিয়ে গোসল করব, ভাত খাব।

আহা একদিন একটু দেরি হলে মরে যাবেন না। একা একা ছবি দেখতে আমার খুব খারাপ লাগে। আসেন না দেখি। খুব ভালো ছবি। প্লিজ, বলুন হ্যাঁ।

কিটকির কাণ্ড দেখে হেসে ফেলতে হলো। বললাম, চল দেখি, ছবি ভালো না হলে কিন্তু মাথা ভেঙে ফেলব।

দু'জন সিঁড়ি দিয়ে উঠছি দোতলায়, কিটকি হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, দেখুন তো কী মুশকিল হলো।

আবার কী ?

আমার বন্ধুটা এসে পড়েছে। ঐ যে নামে রিকশা থেকে।

খাটো ঐ মেয়েটি নাকি ? লাল ওড়না ?

হুঁ।

ভালোই হয়েছে। দেখ তোরা দু'জনে, আমায় ছেড়ে দে।

না না, আসেন এই পোস্টার বোর্ডটার আড়ালে চলে যাই। না দেখলেই চলে যাবে।

তুই যা আড়ালে, আমাকে তো আর চেনে না।

আহা আসেন না। কোন দিকে গেছে ?

দোতলায় খুঁজতে গেছে হয়তো।

কেমন গাধা মেয়ে দেখেছেন ? সাড়ে বারোটায় আসতে বলেছি, এসেছে দেড়টায়।

ছবিটা সত্যি ভালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে গেলাম। তবে ইটালিয়ান ছবি যেমন হয়— করুণ রসের ছড়াছড়ি। ছবির সুপুরুষ ছেলেটি বিয়ে করেছে তার প্রেমিকার বড় বোনকে। খবর পেয়ে প্রেমিকা বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। তাই দেখাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখি, কিটকি নিজেই মুখে আধখানা রুমাল গুজে কান্নার দুরন্ত বেগ সামলাচ্ছে। চোখের পানিতে চিক চিক করছে গাল। পাশে বসা এক গোবেচারা তরুণ পর্দা ছেড়ে কিটকিকেই দেখছে অবাক হয়ে। আমি বললাম, কী-রে কিটকি, কী ব্যপার ?

কিছু না।

আয় আয়, ছবি দেখতে হবে না। কী মুশকিল। কান্নার কী হলো! তোর তো কিছু হয়নি।

কিটকির হাত ধরে হল থেকে বেরিয়ে আসলাম। আলোয় এসেই লজ্জা পেয়ে গেল সে।

তুই একটা পাগল।

বলেছে আপনাকে।

আর একটা বাচ্চা খুকি।

আর আপনি একটা বুড়ো।

তুই ভারী ভালো মেয়ে কিটকি। তোর কান্না দেখে আমার এত ভালো লেগেছে।

ভালো হবে না বলছি।

আইসক্রিম খাবি কিটকি ?

না না।

না না, খেতেই হবে। আয়, তুই সিনেমা দেখালি— আমি আইসক্রিম খাওয়াই।

দেখলেন তো কুল্লে সিকিখানা সিনেমা।

আচ্ছা তুই সিকিখানাই খাস।

কিটকি সুন্দর করে হাসল। সবুজ রুমালে নাক ঘষতে ঘষতে বলল, ছবিটি বড় ভালো, তাই না ?

হ্যাঁ।

ইস্, সবটা যদি দেখতাম!

গরমে মন্দ লাগল না আইসক্রিম। বড় কথা পরিবেশটি ভালো। সুন্দর করে সাজানো টেবিলে সাদা টেবিলক্লথ। বয়গুলি কেতাদুরস্ত। অসময় বলেই ভিড় নেই। কিটকি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল, চলুন উঠি।

বস আরেকটু, আইসক্রিম আরো একটা নে।

ছেলেমানুষ পেয়েছেন আমাকে, না ?

সবুজ রুমাল বের করে নাক ঘসল কিটকি।

আমার ভীষণ নাক ঘামে। খুব বাজে।

না, খুব ভালো, যাদের নাক ঘামে তারা—

জানি জানি, বলতে হবে না, যত সব মিথ্যে কথা। আপনি বিশ্বেস করেন ?

না।

আমিও না। আচ্ছা যে-সব মেয়ের গালে টোল পড়ে তাদের হ্যাসব্যান্ড নাকি খুব কম বয়সে মারা যায় ?

কই, তোর তো টোল পড়ে না ? নাকি পড়ে ? হাসি দে একটা।

আহা আমার জন্যে বলছি না। আপনি ভারি বাজে।

বাসায় যাবি কিটকি ? চল যাই।

না, আজ থাক। আরেকদিন যাব।

শুক্রবারে কলেজ খোলা যে, আচ্ছা সন্ধ্যাবেলা আসব।

রাতে থাকবি তো ?

উঁহু।

কিটকি রিকশায় উঠে হাত নাড়ল।

রোদের তেজ কমে আসছে। চারটা বেজে গেছে প্রায়। প্রচুর ঘেমেছি। বাসায় গিয়েই একটা দীর্ঘ গোসল সারব। অবেলায় ভাত আর খাব না। চা-টা খেয়ে দীর্ঘ ঘুম দেব। রাবেয়া ক'দিন ধরেই সিনেমা দেখার জন্যে ঘ্যানরঘ্যানর করছে। তাকে নিয়ে একদিন দেখলে হয় 'ইয়োলো স্কাই'।

বাসায় এসে দেখি গেটে তালা ঝুলছে। তালার সঙ্গে আটকানো ছোট্ট চিরকুট।

'খোকা, সবাই মিলে ছোট খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছি।
সন্ধ্যার আগে ফিরব না। তুইও এসে পড়। —রাবেয়া।'

ক্লান্তি লাগছিল খুব, কোথাও গিয়ে চা-টা খেলে হতো।

এই চিঠিটি সম্ভবত তোমাকেই লেখা ?

তাকিয়ে দেখি, বেশ লম্বা নিখুঁত সাহেবি পোশাকে এক ভদ্রলোক আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। কপালের দু'পাশের চুলে পাক ধরলেও এখনো বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা।

তুমি বলেছি বলে কিছু মনে করনি তো, ছেলের বয়সী তুমি।

না না, কিছু মনে করিনি আমি। আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।

চিনবে কী করে, আমি তো পরিচিত কেউ না। রাবেয়া বলে এই বাড়িতে একটি মেয়ে আছে না ?

জি, আমার বোন।

ছোটবেলায়, সে যখন স্কুলে পড়ত তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাকে দেখলেই আমি গাড়িতে করে লিফট দিতাম।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, বড় ভালো মেয়ে। অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলাম। কিছুদিন হলো এসেছি, ভাবলাম মেয়েটিকে দেখে যাই। এসে দেখি তালা বন্ধ। তালার সঙ্গের চিঠিখানা পড়ে দেয়াশলাই কিনতে গিয়েছি আর তুমি এসেছ।

আপনাকে বসাই কোথায়— আসেন, চা খান এক কাপ।

না, আমার ডায়াবেটিস, চা থাক। তুমি মেয়েটিকে এই চকোলেটগুলি দিয়ে দিও, আচ্ছা ?

ভদ্রলোক কালো ব্যাগ খুলে চকোলেট বের করতে লাগলেন।

বিদেশে থাকাকালীন প্রায়ই মনে হতো মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়নি তো ? হলে কোথায় হলো ?

না, বিয়ে হয়নি এখনো।

আচ্ছা তাহলে যাই, কেমন ?

রাবেয়া বেশ মেয়ে তো! পথের লোকজনদের সঙ্গে ছোট বয়সেই কেমন খাতির জমিয়েছে। এমন খাতির যে একেবারে বিদেশ থেকে চকোলেট এনেছেন তিনি। চকোলেট খাওয়া মেয়েটি কত বড় হয়েছে জানলে আর চকোলেট আনতেন না নিশ্চয়ই। রাবেয়ার এমন আরো কয়েকজন বন্ধু আছে। একজন ছিল আবুর মা। কী যে ভালোবাসত রাবেয়াকে! রোজ একবার খোঁজ নেওয়া চাই। রাবেয়ার যেবার অসুখ হলো, টাইফয়েড, আবুর মা তার ঘরসংসার নিয়ে আমাদের বারান্দায় উঠে এলো। পনেরো দিনের মতো ছিল অসুখ, সেই ক'দিন বুড়ি এখানেই ছিল। মা ভারী বিরক্ত হয়েছিলেন। মেয়ের অমঙ্গল হবে ভেবে তাড়িয়েও দিতে পারেননি। হঠাৎ একদিন আবুর মা আসা বন্ধ করে দিল। হয়তো চলে গিয়েছিল অন্য কোথাও কিংবা মারাটারা গিয়েছে গাড়ি চাপা পড়ে। রাবেয়াকে ঠাট্টা করে সবাই 'আবুর মার সখী' ডাকত। বাবা ডাকতেন 'আবুর নানী'। রাবেয়া রাগত না মোটেই। আবুর মার সঙ্গে রাবেয়া হেসে হেসে কথা কইছে, ছবির মতো ভাসে চোখে।

ও বুড়ি, আজ কত পেয়েছ ?

দুইসের চাউল, আর চাইর আনা পয়সা। এই কাপড়টা দিছে পুরানা পল্টনের এক বেগম সায়েব।

দেখি কী কাপড়!

রাবেয়া গম্ভীর হয়ে কাপড় দেখত, ভালো কাপড়।

ছাপটা বালা ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো ছাপ।

রাবেয়াটা বেশ পাগলাটে। ছোট বয়স থেকেই।

৩

ও! ইনি আবিদ হাসেন।

রাবেয়া হাসি মুখে বলল। চকোলেটের প্যাকেট পেয়ে সে খুব খুশি হয়েছে।

কোথায় দেখা হয়েছে তার সাথে ?

বাসায় এসেছিলেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ হলো। ছোটবেলা তোকে নাকি লিফট্ দিতেন গাড়িতে ?

হ্যাঁ। স্কুলটা অনেক দূরে পড়ে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় বাবা সঙ্গে যেতেন, আসবার সময় প্রায়ই এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হতো। আমাদের দু'জনের মধ্যে খুব খাতির হয়েছিল। দাঁড়া সবটা বলি। চা বানিয়ে আনি আগে।

ঘরে আলো জ্বলছিল না। বাইরে ভীষণ দুর্যোগ। অল্প একটু ঝড় বাদলা হলেই এখানকার কারেন্ট চলে যায়। ঘরে যে একটি মাত্র হারিকেন ছিল সেটি জ্বালিয়ে লুডু খেলা হচ্ছে। বাবাও খেলছেন বেশ সাড়াশব্দ করেই। রুনুর গলা সবচে' উঁচুতে।

সে কী বাবা, তোমার চার হয়েছে পাঁচ চাললে যে?

পাঁচই তো উঠল।

হুঁ, আমার বুঝি চোখ নাই! এবার থেকে তোমার দান আমি মেরে দেব।

অন্ধকার ঘরে বসে বৃষ্টি পড়া দেখছি। দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামছে। টিনের চালে বাজনার মতো বৃষ্টি অপূর্ব লাগে। রাবেয়া চা নিয়ে খাটে উঠে এলো। দু'জনে চাদর গায়ে মুখোমুখি বসলাম। রাবেয়া বলল, গোড়া থেকে বলি?

বল।

থ্রিতে পড়ি তখন। মর্নিং স্কুল। এগারোটায় ছুটি হয়ে গেছে। আমি আর উকিল সাহেবের মেয়ে রাহেলা বাসায় ফিরছি, এমন সময় ঐ ভদ্রলোক কী মনে করে লম্বা পা ফেলে আমাদের কাছে এলেন। আমাকে বললেন, তোমরা কোথায় যাবে? চলো তোমাদের পৌঁছে দেই। গাড়ি আছে আমার। ঐ দেখ, দাঁড়া করিয়ে রেখেছি।

রাহেলা বলল, আমরা হেঁটে যেতে পারব।

না না, হেঁটে যাবে কেন, এসো এসো গাড়িতে এসো। মিষ্টি খাবে তোমরা? নিশ্চয়ই খাবে। কি বলো?

ভদ্রলোক আমাদের দিকে না তাকিয়ে ড্রাইভারকে বললেন, তুমি নেমে যাও, একটা রিকশা করে জিনিসগুলো নিয়ে যাও, আমি বাচ্চাদের নিয়ে একটু ঘুরে আসি।

আমরা কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। গাড়িতে চড়ার লোভ ষোলআনা আছে। আবার ভয় ভয়ও করছে। রাহেলা ফিস ফিস করে বলল, ও কেরে ভাই?

আমি মিথ্যা করে বললাম, আমাদের একজন চেনা লোক, চল বেড়িয়ে আসি।

রাহেলা বলল, ছেলেধরা না তো?

তখন চারদিকে খুব ছেলেধরার কথা শোনা যেত। ছেলেধরারা নাকি ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে হোটেলে বিক্রি করে দেয়। সেখানে মানুষের মাংস রান্না হয়। কে আবার মাংস খেতে গিয়ে একটি বাচ্চা মেয়ের কড়ে আঙুল পেয়েছে। এই জাতীয় গল্প। রাহেলার কথা শুনে ভয় পেলেও হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছি, ছেলেধরা এমন হয় বুঝি?

ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে আমাদের ডাকলেন। উঠে বসলাম দু'জনেই।

মিষ্টির দোকান দেখে তো আমি হতভম্ব। মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে দেয়ালে ছোট ছোট লম্বা মাদুরে অদ্ভুত সব ছবি, টেবিলের চারপাশে ধবধবে প্লাস্টিকের চেয়ার, প্রতিটি টেবিলে সবুজ কাচের ফুলদানিতে টাটকা ফুল। ঘরের মাঝখানটায় কাচের

জারে রং বেরংয়ের মাছ। রাহেলা পাংশু মুখে বলল, আমার বড় ভয় করছে ভাই।

বলো খুকিরা, কী খাবে? কোনো লজ্জা নেই, যত ইচ্ছে আর যা খুশি। আমি নিজে মিষ্টি খাই না। তোমরা খাও।

ভদ্রলোক হড়বড়িয়ে কথা বলতে বলতে সিগারেট ধরালেন। রাহেলার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কী নাম খুকি?

রাহেলা। পাংশু মুখে বলল রাহেলা।

খাও খাও, লজ্জা করো না।

রাহেলা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমার ভয় করছে, আমি বাসায় যাব।

অল্প দিনেই ভয় ভেঙে গেল আমাদের। ভদ্রলোকের সঙ্গে রোজ দেখা হতে লাগল। তিনি যেন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন আমাদের জন্যেই। দেখা হলেই বলতেন, গাড়িতে করে বেড়াতে ইচ্ছে হয় খুকি? ড্রাইভার, মেয়ে দু'টিকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আস।

শুধু রাহেলাই নয়, মাঝেমাঝে অন্য মেয়েরাও থাকত। তারা বলত, রাবেয়া, কেউ যদি দেখে ফেলে তবে?

এর মধ্যে আমি অসুখে পড়লাম। এক মাসের মতো স্কুলে কামাই। হাড় জিরজিরে রোগা হয়ে গেছি। পায়ের উপর দাঁড়াতে পারি না এমন অবস্থা, মাথার সব চুল পড়ে গেছে, আঙুল ফুলে গেছে। অফিস থেকে ফিরেই বাবা আমাকে কোলে নিয়ে বেড়াতেন। একদিন এমন বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ দেখি ঐ লোকটি গট্ গট্ করে ঢুকছে গেট দিয়ে, মুখে সিগারেট, ঘনঘন ধোঁয়া ছাড়ছেন। বাবা অবাক হয়ে বললেন, কী চান আপনি?

মেয়েটির অসুখ করেছে?

হ্যাঁ।

কী অসুখ?

লিভার ট্রাবল।

আপনি যদি বলেন তবে আমি একজন বড় ডাক্তার পাঠাতে পারি, আমার একজন বন্ধু আছেন।

বাবা একটু রেগে বললেন, মেয়েকে বড় ডাক্তার দেখাব না টাকার অভাবে, এই ভেবেছেন আপনি?

ভদ্রলোক বললেন, কাকে দেখিয়েছেন, আপনি যদি দয়া করে—

শরাফত আলীকে।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে গেলেন। আমি শরাফতের কথাই বলছিলাম।

বাবা বললেন, আপনি চলে যান। কেন এসেছেন এখানে?

না মানে—

আর আসবেন না।

ভদ্রলোক খুব দ্রুত চলে গেলেন। কথাবার্তা শুনে মা বেরিয়ে বললেন, কী হয়েছে ? কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?

আবিদ হোসেন এসেছিল।

যদিও আমি তখন খুব ছোট, তবু বাবা মা দু'জনের ভাবভঙ্গি দেখেই আঁচ করেছিলাম এই লোকটি তাঁদের চেনা এবং দু'জনের কেউই চান না সে আসুক। তারপর আর দেখিনি তাঁকে। এই এতদিন পর আবার এসেছেন চকোলেট নিয়ে।

লোকটি কে রে রাবেয়া ?

রাবেয়া জবাব দেবার আগেই বাবা ঢুকলেন, ভাত দিয়ে যাও মা। সকাল সকাল খেয়ে শুড়ে পড়ি।

আগে চকোলেট খাও বাবা। এই নাও।

কে এনেছে চকোলেট ? খোকা, তুই নাকি ?

না বাবা, আবিদ হোসেন এনেছেন।

বাবা একটু অবাক হয়ে বললেন, দেশে ফিরেছে জানি না তো। এক জার্মান মেয়েকে বিয়ে করেছিল শুনেছিলাম। সেখানেই নাকি থাকবে।

আমি বললাম, আবিদ হোসেন কে বাবা ?

আমার একজন বন্ধুমানুষ। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার, খুব ভালো সেতার বাজাতে জানে।

সকাল সকাল খাওয়া সারা হলো। একটি মাত্র হারিকেনে চারদিক ভৌতিক লাগছে। আমাদের বড় বড় ছায়া পড়েছে দেয়ালে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। ঝড় উঠেছে হয়তো, শোঁ শোঁ আওয়াজ দিচ্ছে। মন্টু বলল, বাবা গল্প বলো।

কিসের গল্প, ভূতের ?

নিনু বলল, না আমি ভয় পাচ্ছি, হাসির গল্প বলেন।

বাবা বললেন, রাবেয়া, তুই একটা হাসির গল্প বল।

রাবেয়ার হাসির গল্পটা তেমন জমল না। বাবা অবশ্যি অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন।

রুনু বলল, মনে পড়ে আপা, মা একদিন এক কানা সাহেবের গল্প বলছিল ? সেদিনও এমন ঝড়-বৃষ্টি।

কোন গল্পটার কথা বলছিস ?

ঐ যে, সাহেব বাজারে গেছে গুড় কিনতে।

মনে নেই তো গল্পটা, বল তো!

রুনু চোখ বড় বড় করে গল্প বলে চলল। রুনুটা অবিকল মায়ের চেহারা পেয়েছে। এই বয়সে হয়তো মা দেখতে এমনই ছিলেন। কেমন অবাক লাগে—একদিন মা যে গল্প করে গেছেন সেই গল্পই তাঁর এক মেয়ে করছে। পরিবেশ বদল হয়নি একটুও, সেদিন ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল, আজও হচ্ছে।

গল্প শেষ হতেই বাবা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। টানা গলায় বললেন, শুয়ে পড় সবাই।

শুয়ে শুয়ে আমার কেবলই মায়ের কথা মনে পড়তে লাগল, বেশ কিছুদিন আগেও একদিন এরকম মনে পড়েছিল। সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস নিচ্ছি, হঠাৎ দেখি বারান্দায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন গল্প করছে। দেখামাত্র ধক্ করে উঠল বুকের ভেতর। অবিকল মায়ের মতো চেহারা। তেমনি দাঁড়াবার ভঙ্গি, বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরা। আমি এত বেশি বিচলিত হলাম যে, ক্লাসে কী বলছি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। ক্লাস শেষ হলেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করব এই ভেবে প্রাণপণে ক্লাসে মন দিতে চেষ্টা করলাম। ক্লাস এক সময় শেষ হলো, মেয়েটিকে খুঁজে পেলাম না। সেদিনও সমস্তক্ষণ মায়ের কথা ভেবেছিলাম। সে রাতে অনেক দিন পর স্বপ্ন দেখলাম মাকে। মা ছোট্ট খুকি হয়ে গেছেন। ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘরময়। আমি বলছি, মা, আপনি এত হৈচৈ করবেন না, আমি ঘুমুচ্ছি।

মা বললেন, বারে আমি বুঝি এক্কা-দোক্কাও খেলব না?

খেলুন, তবে শব্দ করে নয়।

তুই খেলবি আমার সঙ্গে, খোকা?

না, আমি কত বড় হয়েছি দেখছেন না? আমার বুঝি এসব খেলতে আছে?

খুব অবাক হয়েছিলাম স্বপ্নটা দেখে। এমন অবাস্তব স্বপ্নও দেখে মানুষ।

মায়ের চারদিকের রহস্যের মতো স্বপ্নটাও ছিল রহস্যময়। চারদিকে রহস্যের আবরণ তুলে তিনি আজীবন আমাদের চেয়ে আলাদা হয়ে ছিলেন। শুধু কি তিনিই? তাঁর পরিবারের অন্য মানুষগুলিও ছিল ভিন্ন জগতের মানুষ, অন্তত আমাদের কাছে।

মাঝে-মাঝে বড় মামা আসতেন বাসায়। বাবা তটস্থ হয়ে থাকতেন সারাক্ষণ। দৌড়ে মিষ্টি আনতে যেতেন। রাবেয়া গলদঘর্ম হয়ে চা করত, নিমকি ভাজত। বড় মামা সিকি কাপ চা আর আধখানা নিমকি খেতেন। যতক্ষণ থাকতেন অনবরত পা নাচাতেন আর সিগারেট ফুঁকতেন। আমাদের দিকে কখনো মুখ তুলে তাকিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। বাবা অবশ্যি এক এক করে আমাদের নিয়ে যেতেন তাঁর সামনে। আমরা নিজেদের নাম বলে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মামা ভীষণ অবাক হয়ে বলতেন, এরা সবাই শিরিনের ছেলেমেয়ে? কী আশ্চর্য!

আশ্চর্যটা যে কী কারণে তা বুঝতে না পেরে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতাম। মামা রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলতেন, বুঝলেন আজহার সাহেব, শিরিন

ছোটবেলায় মোটেই ছেলেমেয়ে দেখতে পারত না, তারই কিনা এতগুলি ছেলেমেয়ে!

এই যে, এইটিই কি বড় ছেলে ?

মামা আঙুল ধরে রাখতেন আমার দিকে। আমি ঘাড় নাড়তাম।

মামা বলতেন, কী পড়া হয় ?

নাইনে পড়ি।

বাবা অতিরিক্ত রকমের খুশি হয়ে বলতেন, খোকা এইটের বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। স্কুল থেকে একটা মেডেল দিয়েছে। গোল্ড মেডেল। রাবেয়া, যাও তো মা, মেডেলটা তোমার মামাকে দেখাও। ছোট ট্রাংকে আছে।

ব্লেডের মতো পাতলা মেডেলটা মামা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন। আবেগশূন্য গলায় বলতেন, শিরিনের মতো মেধাবী হয়েছে ছেলে। শিরিন মেট্রিকুলেশনে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল।

বলতে বলতে মামা গম্ভীর হয়ে যান। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলেন, আমাদের পরিবারটাই ছিল অন্য ধরনের। হাসিখুশি পরিবার। বাড়ির নাম ছিল ‘কারা কানন’। দেয়ালের আড়ালে ফুলের বাগান। শিরিন নিজেই দিয়েছিল নাম।

মা আসতেন আরো কিছু পরে। খুব কম সময় থাকতেন। আমরা বেরিয়ে আসতাম সবাই। এক সময় দেখতাম মুখ কালো করে মামা উঠে যেতেন। মা শুয়ে শুয়ে কাঁদতেন সারা দুপুর। আমরা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। কিছুই ভালো লাগত না। সেই অল্প বয়সেই মাকে কী গভীর ভালোই না বেসেছিলাম! অথচ তিনি ছিলেন খুবই নিরাসক্ত ধরনের। কথাবার্তা বলতেন কম। নিঃশব্দে হাঁটতেন। নিচু গলায় কথা বলতেন। মাঝে মাঝে মনে হতো বড় রকমের হতাশায় ডুবে গেছেন। তখন সময় কাটাতেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। প্রয়োজনের কথাটিও বলতেন না। ঘরের কাজ রাবেয়া আর একটা ঠিকে ঝি মিলে করত। বিষণ্নতায় ডুবে যেত সারা বাড়ি। বাবা অফিস থেকে এসে চুপচাপ বসে থাকতেন বারান্দায়। রাবেয়া চা এনে দিত। বাবা ফিসফিস করে বলতেন, তোর মাকে দিয়েছিস ?

না, মা খাবে না।

আহা, দিয়েই দেখ না।

ভাতই খায়নি দুপুরে।

অ।

রুনু-ঝুনু সকাল সকাল বই নিয়ে বসত। গলার সমস্ত জোর দিয়ে পড়ত দু'জনে। বাবা কিছুক্ষণ বসতেন তাদের কাছে আবার যেতেন রান্নাঘরে রাবেয়ার কাছে। কিছুক্ষণ পরই আবার উঠে আসতেন আমার কাছে। ইতস্তত করে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার উত্থাপন করতেন।

খোকা, তোদের কলেজে মেয়ে প্রফেসর আছে ?

আছে।

বিয়ে হয়েছে নাকি ?

হয়েছে কারো কারো।

সবগুলির নিশ্চয়ই হয়নি। কলেজের মেয়ে প্রফেসরদের বিয়ে হয় না।

কিংবা হয়তো জিজ্ঞেস করেন, তোর কোনোদিন রাতেরবেলা পানির পিপাসা পায় ?

পায় মাঝে মাঝে।

কী করিস তখন ?

পানি খাই, আর কী করব ?

খালি পেটে পানি খেতে নেই, এর পর থেকে বিস্কুট এনে রাখবি। আধখানা খেয়ে এক ঢোক পানি খাবি, বুঝলি তো ?

বুঝেছি।

কথা বলবার জন্যেই কথা বলা। মাঝে মাঝে মা'র উপর বিরক্ত লাগত। কেন, আমরা কী দোষ করেছি ? এমন করবেন কেন আমাদের সাথে ?

অবশ্যি বিপরীত ব্যাপারও হয়! অদ্ভুত প্রসন্নতায় মা ভরে ওঠেন। বেছে বেছে শাড়ি পরেন। লম্বা বেণি করে চুল বাঁধেন। মন্টু অবাক হয়ে বলে, মা, তোমাকে অন্য বাড়ির মেয়ের মতো লাগছে।

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী বললি মন্টু ?

বললাম তোমাকে অন্যরকম লাগছে। তুমি যেন বেড়াতে এসেছ আমাদের বাড়ি। রুনু বলে উঠে, মন্টুটা বড় বোকা, তাই না মা ?

মা হেসে হেসে রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করেন, ও রাবেয়া, তোর গান ভালো লাগে ?

হ্যাঁ মা, খুউব।

আমার বড়দাও ভারী গানপাগল ছিলেন। রোজ রাতে আমরা ছাদে বসে রেকর্ড বাজাতাম। চিন্ময়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত যা ভালোবাসত বড়দা!

মা, তুমিও তো গান জানো। তোমার নাকি রেকর্ড আছে গানের ?

মা রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসেন, খুশি খুশি গলায় বলেন, স্কুলে যখন পড়ি তখন রেকর্ড হয়েছিল। মেসবাহ্উদ্দিন ছিলেন তখন রেডিওর রিজিওনাল ডাইরেক্টর। তিনিই সব করিয়েছিলেন। এক পিঠে আমার, এক পিঠে পিনু হকের। পিনু হককে চিনিস না ? এখন তো সিনেমায় খুব প্লেব্যাক গায়। খুব নাকি নাম-ডাক। তখন এতটুকু মেয়ে, আমার চেয়েও ছোট।

যদিও আমরা সবাই জানতাম গানের একটা রেকর্ড আছে তবু গানটি শুনিনি কেউ। পুরনো রেকর্ড বাজারে পাওয়া যেত না। নানার বাড়িতে যে কপিটি আছে সেটি আনার কথা কখনো মনে পড়েনি। মা কিন্তু কোনোদিন গান গেয়ে শোনাননি,

এমনকি ভুল করেও না।

মা'র প্রসন্ন দিনগুলির জন্যে আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করতাম। কী ভালোই না লাগত। বাবা নিজে তো মহাখুশি, কী যে করবেন ভেবেই যেন পাচ্ছেন না। অফিসের কোন কলিগ কী করেছে তাই কমিক করে দেখিয়ে হাসাতেন আমাদের। বাবা খুব ভালো কমিক করতে পারতেন। অফিসের ছোট বাবু কেমন করে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বড় বাবুর চেম্বারে হাজিরা দিতেন— তা এত সুন্দর দেখাতেন! হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তাম আমরা। মা বলতেন, আর নয়, পেট ব্যথা করছে আমার। ঝুনু চোখ বড় বড় করে বলত, রাবেয়া আপা, বাবা খুব ভালো জোকার, তাই না?

রাবেয়া রেগে গিয়ে বলত, মারব থাপ্পড়। বাবাকে জোকার বলছে, দেখছ বাবা— মেয়ের কেমন ফিচলে বুদ্ধি হয়েছে? বাবা বলতেন, ঝুনুর আমার এই এতটা বুদ্ধি, যাও তো রুনু ঝুনু একটু নাচ দেখাও।

কিটকির কাছে শেখা আনাড়ি নাচ নাচত দু'জনে। মা মুখে মুখে তবলার বোল দিতেন। বাবা বলতেন, বাহারে বেটি বাহা। কী সুন্দর শিখেছে, বাহ্ বাহ্! এবার মন্টু সোনা, একটি গান গাও।

বলবার অপেক্ষা মাত্র, মন্টু যেন তৈরি হয়েই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে শুরু— 'কাবেরী নদীজলে... ।' শুধু এই গানটির সে ছয় লাইন জানে। ছয় লাইন শেষ হওয়া মাত্র বাবা বলতেন, ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে।

মন্টু ঘুরে ফিরে একই কলি বারবার গাইত। ভালো গানের গলা ছিল। ছেলেমানুষ হিসেবে গলা অবশ্যি মোটা চড়ায় উঠতে পারত না, তবে চমৎকার সুরজ্ঞান ছিল।

মাঝামাঝি সময় দেখা যেত রাবেয়া এক ফাঁকে চা বানিয়ে এনেছে। বিশেষ উপলক্ষ বলেই রুনু-ঝুনু মন্টু আধ কাপ করে চা পেত সেদিন। সুখের সময়গুলি খুব ছোট বলে অসম্ভব আকর্ষণীয় ছিল। ফুরিয়ে যেত সহজেই, কিন্তু সৌরভ থাকত অনেক অনেক দিন।

ভাবতে ভাবতে রাত বেড়ে গেল। মানুষের চিন্তা যতই অসংলগ্ন মনে হোক কিন্তু তলিয়ে দেখলে সমস্ত কিছুতেই বেশ একটা ভালো মিল দেখা যায়। বৃষ্টির রাতে গল্প বলা থেকে ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে এসেছি। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। চারদিকে ভিজে আবহাওয়া, ঠান্ডা বাতাস বইছে। বিদ্যুৎ চমকানিতে ক্ষণিকের জন্য নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাগো, এত ঘুমুতেও পারেন?

কিটকি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে সামনে।

কাল সারারাত ঘুমাননি, না?

দেরিতে ঘুমিয়েছি। তুই যে এত সকালে ? শাড়ি পরেছিস, চিনতে পারছি না মোটেই। রীতিমতো ভদ্রমহিলা।

আগে কী ছিলাম ? ভদ্রলোক ?

না, ছিলি ভদ্রবালিকা। বেশ লম্বা দেখাচ্ছে শাড়িতে, কত লম্বা তুই ?

পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি।

বস, মুখ ধুয়ে আসি।

কলঘরে যাওয়ার পথে রাবেয়ার সঙ্গে দেখা, চায়ের ট্রে নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে।

ও খোকা, কিটকি বেচারি কখন থেকে বসে আছে, ঘুম ভাঙে না তোর। রাতে কি চুরি করতে গিয়েছিলি ?

হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসলাম কিটকির সামনে। সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে। ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিক, কপালে জ্বলজ্বল করছে নীল রঙের টিপ। কিটকি বলল, বলুন তো কী জন্যে এই সাত সকালে এসেছি ?

কোনো খবর আছে বোধহয় ?

বলুন না কী খবর ?

দল বেঁধে পিকনিকে যাবি, তাই না ?

কিছুটা ঠিক। আমরা ম্যানিলা যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছিস ?

ম্যানিলা। পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে আব্বা যাচ্ছেন এই ডিসেম্বরে। কী যে ভালো লাগছে আমার!

খুশিতে ঝলমল করে উঠল কিটকি। বুকে ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগল আমার।

খুব খুশি লাগছে তোর ?

হ্যাঁ, খুব।

আমাদের জন্যে খারাপ লাগবে না ?

লাগবে না কেন, খুব লাগবে। আমি চিঠি লিখব সবাইকে।

কিটকি, দেখি তোর হাত।

হাত কী দেখবেন ?

ইতস্তত করে হাত বাড়িয়ে দেয় কিটকি। লাল টুকটুকে এতটুকু ছোট্ট হাত।

হাত দেখতে জানেন আপনি ? এতদিন বলেননি তো ? ভালো করে দেখবেন কিন্তু। সব বলতে হবে।

কিটকির নরম কোমল হাতে হাত রেখে আমি আশ্চর্য যাতনায় ছটফট করতে থাকি।

কী দেখলেন বলুন ? বলুন না ?

ও এমনি, আমি হাত দেখতে জানি না।

তবে যে দেখলেন ?

কী জন্যে দেখলাম বুঝতে পারিসনি ? তুই তো ভারী বোকা।

কিটকি হাসি মুখে বলল, বুঝতে পারছি।

কী বুঝতে পারলি ?

বুঝতে পারছি যে আপনিও বেশ বোকা।

কিটকিরা ডিসেম্বরের ন'তারিখে চলে গেল। এ্যারোড্রামে অনেক লোক হয়েছিল। রাবেয়াকে নিয়ে আমিও গিয়েছিলাম সেখানে। কিটকির যে এত বন্ধু আছে তা জানতাম না। হেসে হেসে সবার সঙ্গেই সে কথা বলল। কিটকিকে মনে হচ্ছিল একটি সবুজ পরী। সবুজ শাড়ি, সবুজ জুতো, সবুজ ফিতে এমনকি কাঁধের মস্ত ব্যাগটাও সবুজ। রাবেয়াকে বললাম, কিটকিকে কী সুন্দর মানিয়েছে দেখেছিস ? তুই এমন মিল করে সাজ করিস না কেন ?

সাজ দেখে যদি তোর মতো কোনো পুরুষ-হৃদয় ভেঙে যায় সেই ভয়ে।

খালা লাউঞ্জের এক কোনায় বসেছিলেন। ইশারায় কাছে ডাকলেন। চললাম রে তোদের ছেড়ে।

ফিরবেন কবে ?

কে জানে কবে! কর্তার মর্জি হলেই ফিরব। পাঁচ বছরের মেয়াদ। কী-রে রাবেয়া, হাসছিস কী দেখে ?

রাবেয়া হাত তুলে দেখাল, এক মেম সাহেব তার বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে বিষম বিব্রত হয়ে পড়েছেন। বাচ্চাটা দমাদম ঘুসি মারছে মাকে। কিছুতেই শান্ত করানো যাচ্ছে না।

সবাই হাসি মুখে দেখছে ব্যাপারটা। খালা বললেন, তুই তো বড় ছেলেমানুষ রাবেয়া। বয়স কত হলো তোর ? আমি যখন সেভেনে পড়ি তখন তোর জন্ম হলো। তার মানে— সে-কী, তোর যে ত্রিশ পেরিয়েছে! কী ব্যাপার ? বুড়ি হয়ে গেলি যে, বিয়ে এখনো হলো না ? কী মুশকিল।

রাবেয়া স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি চোখ তুলে রাবেয়ার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। এমন অবিবেচকের মতো কথা বুঝি শুধু মেয়েদের পক্ষেই বলা সম্ভব। রাবেয়ার চোখ চকচক করছে, কে জানে কেঁদে ফেলবে কি না। আমি হাত ধরলাম রাবেয়ার।

আমরা যাই খালা, খালুজান কোথায় ?

বুকিং-এ কী যেন আলাপ করছেন।

তাঁকে সালাম দিয়ে দেবেন। খোদা হাফেজ।

কিটকির সঙ্গে গেটে দেখা, তার এক বান্ধবীর সঙ্গে হো হো করে হাসছিল।

যাই কিটকি।

সে-কী ? প্লেন ছাড়তে এখনো চল্লিশ মিনিট।

নারে— একটু সকাল সকাল যেতে হবে, কাজ আছে।

রাবেয়া আপা এমন মুখ কালো করে রেখেছেন কেন ?

রাবেয়া থতমত খেয়ে বলল, তুই চলে যাচ্ছিস তাই! চিঠি দিবি তো ?

রাবেয়া আমার ছ'বছরের বড়। এ বছর একত্রিশে পড়েছে। অথচ কী বাচ্চা মেয়ের মতো হাত ধরে আসছে আমার পিছে পিছে। মাথায় আবার মস্ত ঘোমটাও দিয়েছে। রিকশায় উঠে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল সে।

রাবেয়া, চুপ করে আছিস যে ?

তুই নিজেও তো চুপ করে আছিস।

তুই মুখ কালো করে রাখলে বড় খারাপ লাগে। তুই কি মনে কষ্ট পেয়েছিস ?

রাবেয়া ফিস ফিস করে বলল, আমি কখনো কারো কথায় কষ্ট পাই না। আজ খালার কথা শুনে বড় খারাপ লাগছে।

নির্জন রাস্তায় রিকশা দ্রুত চলছে। রিকশার দুলুনিতে রাবেয়াটা কাঁপছে অল্প অল্প। মাথায় গন্ধ তেল দিয়েছে বুঝি, তার মৃদু সুবাস পাচ্ছি। রাস্তায় কী ধুলো! রাবেয়ার বাঁ হাত অবসন্নভাবে পড়ে আছে আমার কোলে।

খালার কথা এখনো মনে গেঁথে রেখেছিস, খালার কি মাথার ঠিক আছে ?

না, তা নয়। যাই হোক বাদ দে, অন্য কথা বল।

কী কথা ?

কিটকির জন্য তোর খারাপ লাগছে ?

তা লাগছে। যতটা ভাবছিস ততটা নয়।

রাবেয়া অল্প হেসে চুপ করল। তার যে এতটা বয়স হয়েছে মনেই হয় না। এই তো সেদিন যেন কারা দেখতে আসল। বুড়ো ভদ্রলোক মাথা দুলিয়ে বললেন, মেয়ে আপনার ভালো, লক্ষ্মী মেয়ে, দেখেই বুঝেছি। বয়সও বেশি নয়, তবে কিনা আজকালকার আধুনিক ছেলে, তাদের কাছে রূপ মানেই হলো ধবধবে ফর্সা। বলেই ভদ্রলোক হায়নার মতো হে হে করে হাসতে লাগলেন।

গান জানো মা ? কোনো বাজনা ? এই ধর গিটার ফিটার ? আজকাল আবার এ সবের খুব কদর।

জি-না, জানি না।

এবার বরের এক বন্ধু এগিয়ে এলেন।

আপনি কি মডার্ন লিটারেচার কিছু পড়েছেন ?

না, পড়িনি।

ইবসেনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

জি-না, শুনিনি।

বিয়ে ভেঙে গেল। আরো একবার সবকিছু ঠিক ঠাক। ছেলেটিও ভালো, অথচ রাবেয়াই বেঁকে বসল।

ও ছেলে বিয়ে করব না।

কেন বল তো ? ছেলে দেখে পছন্দ হচ্ছে না ?

না না, পছন্দ হবে না কেন, বেশ ভালো ছেলে।

তবে বেতন কম পাচ্ছে বলে ?

ছিঃ সেজন্য কেন হবে ? আর বেতন কমই বা কী ?

ঠিক করে বল তো, অন্য কোনো ছেলেকে ভালো লাগে ?

গাঁধা! সিনেমা দেখে দেখে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কী জন্যে বিয়ে করবি না বল।

ছেলেটা বড় বাচ্চা। বয়সে ওর দেড়গুণ বড় আমি। আমার ভীষণ লজ্জা করছে। তাছাড়া একটা কথা তোকে বলি খোকা—

বল।

বিয়ে-টিয়ে করতে আমার একটুও ইচ্ছে হয় না। ওটা একটা বাজে ব্যাপার! অজানা অচেনা একটা ছেলের সঙ্গে শুয়ে থাকা, ছিঃ!

রিকশা দ্রুত চলছে। রাবেয়া চুপ করে বসে। রোদের লালচে আঁচে রাবেয়ার মুখটাও লালচে হয়ে উঠেছে! কী ভাবছে সে কে বলবে।

৪

রুনু টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে কী যেন একটা লিখছিল। আমাকে দেখেই হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াল। লেখা কাগজটা সন্তপর্ণে আড়াল করে বলল, কী দাদা ?

কোথায় কী ? কী করছিলি ?

রুনু টেনে টেনে বলল, অংক করছিলাম। বলতে গিয়ে যেন কথা বেঁধে গেল মুখে। একটু বিস্মিত হয়েই বেরিয়ে আসলাম। রুনু কি কাউকে ভালোবাসার কথা লিখছে ? বিচিত্র কিছু নয়। ওর যা স্বভাব অকারণেই একে-ওকে চিঠি লিখে ফেলতে বাঁধবে না। রুনু-ঝুনু দু'জনেই মস্ত বড় হয়েছে। আগের চেহারার কিছুই অবশিষ্ট নেই। স্বভাবও বদলেছে কিছুটা। দু'জনেই অকাতরে হাসে। সারাদিন ধরেই হাসির শব্দ শুনি। কিছু-না-কিছু নিয়ে খিলখিল লেগেই আছে।

ও মাগো, ঝুনুকে এই শাড়িতে কাজের বেটির মতো লাগছে! হি হি হি!

ও রুনু দেখ দেখ, রাবেয়া আপা কী করছে, হি হি হি!

আপা শুন আজ সকালে কী হয়েছে, আমি— হি হি হি, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি— হি হি হি...

আবার অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া। মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কিছুক্ষণের ভেতর আবার মিটমাট। লুকিয়ে লুকিয়ে ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখা। সাজগোজের দিকে প্রচণ্ড নজর। সব মিলিয়ে বেশ একটা দ্রুত পরিবর্তন। আগের যে রুনু ঝুনুকে চিনতাম এরা যেন সেই রুনু-ঝুনু নয়। বিশেষ করে এই গোপন চিঠি লেখার ভঙ্গিটা খট করে চোখে লাগে।

রাবেয়া মোড়ায় বসে সুয়েটার সেলাই করছিল। তাকে বললাম, আচ্ছা কোনো ছেলের সঙ্গে কি রুনুর চেনা জানা হয়েছে নাকি?

রাবেয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কিটকির কথা রাত দিন ভেবে ভেবে তোর এমন হয়েছে। কিটকির চিঠি পাসনি নাকি?

না, আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। শরীফ সাহেবের ছেলেটা দেখি প্রায়ই আসে, মনসুর বোধহয় নাম।

আসে আসুক না। যখন ন্যাংটা থাকত তখন থেকে এ বাড়িতে এসে খেলেছে রুনু ঝুনুর সঙ্গে।

যখন খেলেছে তখন খেলেছে। এখন রুনু ঝুনুও বড় হয়েছে, ও নিজেও বড় হয়েছে।

কী বাজে ব্যাপার নিয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করছিস। বেশ তো, যদি ভালোবাসাবাসি হয় বিয়ে হবে। মনসুর চমৎকার ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কোথায় যেন চাকরিও পেয়েছে।

এক কথায় সমস্যার সমাধান করে রাবেয়া সেলাই-এ মন দিল।

মন্টুটারও ভীষণ পরিবর্তন হয়েছে। মস্ত জোয়ান। পড়াশোনায় তেমন মন নেই। প্রায়ই অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। কী এক কায়দা বের করেছে— বাইরে থেকেই টুকুস করে বন্ধ দরজা খুলে ফেলে।

পত্রিকায় নাকি মাঝে মাঝে তার কবিতা ছাপা হয়। যেদিন ছাপা হয় সেদিন লজ্জায় মুখ তুলে তাকায় না। যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে এমন হাব-ভাব। চমৎকার গানের গলা হয়েছে। গানের মাস্টার রেখে শিখালে হয়তো ভালো গাইয়ে হতো। মাঝে মাঝে আপন মনে গায়। কোনো কোনো দিন নিজেই অনুরোধ করি, মন্টু একটা গান কর ত।

কোনটা?

'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে।'

রবীন্দ্রসঙ্গীত না, একটা আধুনিক গাই শোন।

বাতি নিবিয়ে দে, অন্ধকারে গান জমবে।

বাতি নিবিয়ে গান গাওয়া হয়। এবং গানের গলা শুনলেই বাবা টুক টুক করে হাজির। বাবার শরীর ভীষণ দুর্বল হয়েছে। হাঁপানি বাত সব একসঙ্গে চেপে ধরেছে। বিকেলবেলায় একটু হাঁটেন, বাকি সময় বসে বসে কাটে। রাবেয়া রাত আটটা বাজতেই গরম তেল এনে বুকে মালিশ করে দেয়। তখন বাবা বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলেন। রাবেয়া বলে, একা একা কী বলছেন বাবা ?

না মা, কিছু বলছি না, কী আর বলব।

একটু আরাম হয়েছে ?

হবে না কেন মা ? তোর মতো মেয়ে যার আছে তার হাজার দুঃখ-কষ্ট থাকলেও কিছু হয় না। লক্ষ্মী মা আমার। আমার সোনার মা।

আহ্, বাবা কী বলেন, লজ্জা লাগে।

তাহলে থাক। মনে মনে তোর গুণ গাই।

বাবা চুপ করেন।

সবচে' ছোট যে নিনু সেও দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। মা'র চেয়েও রূপসী হয়েছে সে। পাতলা ঠোঁট, একটু থ্যাবড়া নাক, বড় বড় ভাসা চোখ সব সময় ছল ছল করছে। ঐ তো সেদিনও হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত। থ থ থ বলে আপন মনে গান করত, আর আজ একা একা স্কুলে যায়, সাবলীল গর্বিত হাঁটার ভঙ্গি। একটু পাগলাটে হয়েছে সে। স্কুল থেকে ফিরে এসেই বই-খাতা ছুড়ে ফেলে মেঝেতে, তারপর জাপটে ধরে রাবেয়াকে।

ছাড় ছাড়, কী করিস ? ছাড়!

না, ছাড়ব না।

কী বাজে অভ্যেস হয়েছে তোর।

হোক।

হাত-মুখ ধুয়ে চা খা।

পরে খাব, এখন তোমাকে ধরে রাখব।

বেশ থাক ধরে !

রাবেয়া আপা।

কী ?

কোলে নাও।

এত বড় মেয়ে, কোলে নেব কী-রে বোকা!

না না, নিতেই হবে।

তারপর দেখি নিনু রাবেয়ার কোলে উঠে লাজুক হাসি হাসছে। আমার সঙ্গেও

বেশ ভাব হয়েছে তার। রাতের খাওয়া হয়ে গেলে আমার বিছানায় উঠে এসে বালিশ নিয়ে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে।

কী হচ্ছে রে নিনু ?

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছি।

দাদা।

কী ?

গল্প বলবে কখন ?

আরো পরে, এখন পড়াশুনা কর।

না, আমি পড়ব না, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলব।

বেশ খেল।

তুমি খেলবে দাদা ?

না।

আস না ? এই বালিশটা তুমি নাও, হ্যাঁ এবার মার তো দেখি আমাকে ?

রাবেয়ার আগের হাসি-খুশি ভাব আর নেই। সারাক্ষণ দেখি একা একা থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে বাতি জ্বলে। রাত জেগে সে কী করে কে জানে। রাবেয়াটার জন্যে ভারি কষ্ট হয়। বিয়ে করল না শেষ পর্যন্ত। মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম হয়নি। আমি মনে প্রাণে চাই তাকে হাশি খুশি রাখতে। মাঝে মাঝে বলি, রাবেয়া, সিনেমা দেখবি ?

না।

চল না যাই সবাই মিলে। কতদিন ছবি দেখি না।

তুই যা রুনু ঝুনুদের নিয়ে, কত কাজ ঘরের।

যা কাজ রুনু ঝুনুই করতে পারবে। আয় তুই আর আমি দু'জনে যাই।

নারে, ইচ্ছে করছে না।

তাহলে চল একটু বেড়িয়ে আসি।

কোথায় ?

তুই যেখানে বলিস।

আজ থাক।

আমি অস্বস্তিতে ছটফট করি। রাবেয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও লজ্জা হয়। যেন তার মানসিক দুঃখ-কষ্টের অনেকটা দায়ভাগ আমার। একদিন রাবেয়া নিজেই বলল, চল খোকা বেড়িয়ে আসি।

আমি খুশি হয়ে বললাম, চল, সারাদিন আজ ঘুরব। বল, কোথায় কোথায় যাবি ?

প্রথম যাব আমার এক বন্ধুর বাসায়। একটা রিকশা নে।

রিকশা যে বাড়ির সামনে থামল তা দেখে চমকালাম। রাজপ্রাসাদ নাকি! বাড়ির সামনে কী প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। আমি বললাম, রাবেয়া তুই ঠিক জায়গায় এসেছিস তো ? কার বাড়ি এটা ?

আবিদ হোসেনের, ঐ যে ছোটবেলায় আমাকে গাড়িতে করে স্কুলে পৌঁছে দিত।

বাসা কী করে চিনলি ?

এসেছিলাম তো তার সঙ্গে বাসায়।

আবিদ হোসেন বাসায় ছিলেন না। একজন বিদেশিনী মহিলা খুব আন্তরিকভাবে আমাদের বসতে বললেন। কী দরকার বারবার জিজ্ঞেস করলেন। চমৎকার বাংলা বলেন তিনি।

রাবেয়া বলল, কোনো প্রয়োজন নেই। এমনি বেড়াতে এসেছি। ছোটবেলায় তিনি আমার খুব বন্ধু ছিলেন।

ভদ্রমহিলা কফি করে খাওয়ালেন। বেরিয়ে আসবার সময় মস্ত বড় বড় ক'টি গোলাপ তুলে তোড়া করে দিলেন রাবেয়ার হাতে। একজন অপরিচিত বিদেশিনীর এমন ব্যবহার সত্যিই আশা করা যায় না।

রাবেয়া বেরিয়ে এসে বলল, চল খোকা, এই ফুলগুলি মা'র কবরে দিয়ে আসি। এই তিনটা দিবি তুই, বাকি তিনটা দিব আমি। আয় যাই।

বেশ কেটে যাচ্ছে দিন। কিটকির চিঠি হঠাৎ মাঝে মাঝে এসে পড়ে। 'কেমন আছেন ভালো আছি' গোছের। একঘেয়ে জীবনের মধ্যে এইটুকুই যেন ব্যতিক্রম। হঠাৎ করে একদিন সবার একঘেয়েমি কেটে গেল। মনসুরের বাবা এক সন্ধ্যায় বেড়াতে এসে অনেক ভণিতার পর বাবাকে বললেন, আপনার মেয়ে রুনুকে যদি দেন আমাদের কাছে, বড় খুশি হই। মনসুরের নিজের খুব ইচ্ছা। মনসুরকে আপনি ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন। চাকরিও পেয়েছে চিটাগাং স্টিল মিলে, নয়শ' টাকার মতো বেতন, কোয়ার্টার আছে। তা ছাড়া আপনার মেয়েরও মনে হয় কোনো অমত নেই।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বারোই আশ্বিন বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। এক মিনিটে বদলে গেল সারাটা বাড়ি। বাবার সমস্ত অসুস্থতা কোথায় যে পালাল! বিয়ে নিয়ে এর সঙ্গে আলাপ করা ওর কাছে যাওয়া, বাজারের হাল অবস্থা দেখা, মেয়েকে কী দিয়ে সাজিয়ে দেবেন সে সম্বন্ধে খোঁজ নেয়া— এক মুহূর্ত বিশ্রাম রইল না তাঁর।

মন্টু তার বন্ধুদের নিয়ে এসে সারাক্ষণই হৈচৈ করছে। গেট কোথায় হবে, ইলেকট্রিকের বাল্বে সাজানো হবে কিনা, কার্ড কয়টি ছাপাতে হবে, নিমন্ত্রণের ভাষাটা কী রকম হবে এ নিয়ে তার ব্যস্ততা প্রায় সীমাহীন। রাবেয়াকে নিয়ে আমি কেনাকাটা করতে প্রায় প্রতিদিনই বেরিয়ে যাই। ঝুনুটা সারাক্ষণ আহলাদী করে বেড়ায়। শীতের

শুরুতে ঠান্ডা আবহাওয়াতে এমনিতেই একটা উৎসবের ছোঁয়াচ থাকে, বিয়ের উৎসবটা যুক্ত হয়েছে তার সাথে।

রুনুর চাঞ্চল্য কমে গেছে। হৈচৈ করার স্বভাব মুছে গেছে একবারে! সারাদিন শুয়ে শুয়ে গান শুনে। একটু যে কোথাও যাবে আমাদের সঙ্গে কিংবা বাইরের বারান্দায় এসে বসবে তাও নয়। দুপুরটা কাটায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। বড় ভালো লাগে দেখে। যদি বলি, কী-রে রুনু, বিয়ের আগেই বদলে গেছিস দেখি।

যাও দাদা, ভালো লাগে না।

তোর চিটাগাং-এর বাড়িতে বেড়াতে গেলে খাতির-যত্ন করবি তো ?

না, করব না। তোমাকে বাইরে দাঁড়া করিয়ে রাখব।

রুনুর চোখ জ্বলজ্বল করে। সারা শরীরে আসন্ন উৎসবের কী গভীর ছায়া। মনসুর দেখি প্রায়ই আসে। একদিন সিনেমার টিকিট নিয়ে এলো রুনু-ঝুনুর জন্যে। রুনু কিছুতেই যাবে না। রুনু বলে, নিনুকে নিয়ে যাক।

নিনুও যাবে না।

আমার জন্যে তো আনেনি। আমি কেন যাব ?

এই বয়সেই পাকা পাকা কথা!

একদিন যে মনসুরের সঙ্গে হেসে হেসে সারা দুপুর গল্প করেছে, আজকে তার সাড়া পেলেই রুনু বন্দি হয়ে যায় নিজের ঘরে। রাবেয়া হেসে হেসে বলে, বেচারা বসে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়ে ফেলেছে। রুনু যা, বেচারাকে দর্শন দিয়ে আয়।

থাকুক বসে, আমি যাচ্ছি না।

কেন যাবি না ?

রোজ রোজ বেহায়ার মতো আসবে, লজ্জা লাগে না বুঝি ?

ঝুনু আর নিনুকে নিয়ে গল্প করে বেচারা সময় কাটায়।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে পড়ল। বাবার দু'জন ফুফু আসলেন, তার চাচাতো ভাইও ছেলেমেয়ে নিয়ে আসলেন। বাড়ি লোকজনে গমগম করতে লাগল। মন্টু কোত্থেকে একটি রেকর্ড প্লেয়ার এনেছে। সেখানে তারস্বরে রাতদিন আধুনিক গান হচ্ছে। ফুপুর ছেলেমেয়ে ক'টির হল্লায় কান পাতা যাচ্ছে না, আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়রাও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। পাড়ার ছেলেরা নিজেরাই বাঁশ কেটে ম্যারাপ বাঁধার যোগাড় করছে। বেশ লাগছে। উৎসবের নেশা ধরানো আমেজ। কলেজ থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে এলাম।

তিনদিন পর বিয়ে। দম ফেলার ফুরসৎ নেই। দুপুরের ঘুম বিসর্জন দিয়ে কীসের যেন হিসেব কষছি। রাবেয়া পাশেই বসে। রুনু-ঝুনু আর ফুফুর দু'মেয়ে লুডু খেলছে

বসে বসে। বাবা গেছেন নানার বাড়ি। নিনুটা আসল এমন সময়। হাসি মুখে বলল, দাদা, তোমাকে ডাকে।

কে ?

নতুন দুলাভাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

রুনু লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। রাবেয়া বলে বসে, আহা, বেচারার আর তর সাইছে না। আমি স্যান্ডেল পায়ে নিচে নামি। বসার ঘরে মনসুর মুখ নিচু করে বসে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

কী ব্যাপার ভাই ? কিছু বলবে ?

ঝুনু দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে লাগল। মনসুর বলল, আপনি যদি একটু বাইরে আসেন, খুব জরুরি।

আমি চমকে উঠলাম। কিছু কি হয়েছে এর মধ্যে ?

ঘরে না আসেন ঐ চায়ের দোকানটায় বসি।

মনসুরের মুখ শুকনো। চোখের নিচে কালি পড়েছে। অপ্রকৃতস্থের মতো চাউনি। চায়ের দোকানে বসে সে কাশতে লাগল। আমি বললাম, কী ব্যাপার খুলে বলো।

এই চিঠিটা পড়েন একটু।

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। আধপাতার একটা চিঠি। সবুজ নামে একটি ছেলেকে লেখা। সবুজের সঙ্গে সে সিনেমায় যেতে পারবে না। বাসার সবাই সন্দেহ করবে। রুনুই লিখেছে মাস তিনেক আগে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কই পেয়েছ এই চিঠি ?

সবুজ কাল রাতে আমাকে দিয়ে গিয়েছে।

ও।

কথা বলতে আমার সময় লাগল। আর বলবই বা কী ?

শুকনো গলায় বললাম, আমাকে কী করতে বলো ? বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চাও ?

না মানে, এত আয়োজন, এত কিছু, মানে...

তুমি কি রুনুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে চাও ?

না না, কী বলব আমি ?

তবে ?

আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে ঝুনুকে আমি বিয়ে করতে পারি।

সে কী করে হয়। সব করা হয়েছে রুনুর নামে। আজ হঠাৎ করে...

আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন, তা হলে সব দিক রক্ষা হয়।

সবদিক রক্ষার তেমন দরকার নেই। একটা মেয়ে একটা চিঠি লিখে ফেলেছে। এই বয়সে খুব অস্বাভাবিক নয় সেটা।

সবুজ আমাকে আরো বলেছে—

কী বলেছে ?

না, সে আমি আপনাকে বলতে পারব না।

সে তো মিথ্যা কথাও বলতে পারে।

আপনি বরং ঝুনুর সঙ্গে...

না।

আমি তাহলে রুনুর সঙ্গে একটু কথা বলি।

না। রুনুকে আর কী বলবে। যা বলবার আমিই বলব।

আমি রুনুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। আসন্ন উৎসবের আনন্দ তার চোখে মুখে। সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে রুনুকেই দায়ী করা উচিত। কিন্তু কিছুতেই তা পারছি না। রুনুকে আমি বড় ভালোবাসি। এ ঘটনা তাকে এক্ষুণি জানানো উচিত। কিন্তু কী করে বলব ভেবে বুক ভেঙ্গে গেল। রাবেয়াকেই জানালাম প্রথম। রাবেয়া প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। শেষটায় কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। রাবেয়া বড় শক্ত ধাঁচের মেয়ে, তার চোখে পানি দেখেছি খুব কম।

রাবেয়া বলল, তুই রুনুকে সমস্ত বল। ওকে নিয়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে যা। বাবাকে আমি বলব।

রুনুকে এক চাইনিজ রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলাম। ফ্যামিলি কেবিনে তার মুখোমুখি বসে আমার গভীর বেদনা বোধ হচ্ছিল। রুনুই প্রথম কথা বলল।

দাদা, তুমি কি কিছু বলবে ? না, শেষবারের মতো ভালো খাওয়াবে ?

নারে, কিছু কথা আছে।

বুঝতে পারছি তুমি কী বলবে।

বল তো ?

তুমি কিটকির কথা কিছু বলবে, তাই না ?

না। কিটকির কথা নয়। আচ্ছা রুনু ধর— তোর বিয়েটা যদি ভেঙ্গে যায় কোনো কারণে ? মনে কর, বিয়েটা হলো না।

এসব বলছ কেন দাদা, কী হয়েছে ?

তুই সবুজ নামে কোনো ছেলেকে চিঠি লিখেছিলি ?

রুনু বড় বড় চোখে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

ধীরে ধীরে বলল, হ্যাঁ লিখেছিলাম। তার জন্য কিছু হয়েছে ?

হ্যাঁ, মনসুর তোকে বিয়ে করতে চাইছে না।

কী বলে সে ?

সে ঝুনুকে বিয়ে করতে রাজি।

রুনু চেষ্টা করল খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে। কিন্তু মানুষের মন ভেঙে গেলে সে আর যাই পারুক, স্বাভাবিক হতে পারে না। খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে রুনু সিনেমার কথা তুলল, তার কোনো বন্ধু এক কবিকে বিয়ে করে রোজ রাতে এক গাদা আধুনিক কবিতা শুনছে সে-কথা খুব হেসে হেসে বলতে চেষ্টা করল, ঝুনু কেন যে এত মোটা হয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল। এবং এক সময় ‘খাবারটা এত ঝাল’ বলে রুমাল বের করে চোখ মুছতে লাগল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। রুনু ধরা গলায় বলল, দাদা, তুমি মন খারাপ করো না, তোমার মন খারাপ দেখলে আমি সত্যি কেঁদে ফেলব।

আমি বললাম, কোথাও বেড়াতে যাবি রুনু ?

কোথায় ?

সীতাকুণ্ডু যাবি ? চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে দূরের সমুদ্র খুব সুন্দর দেখা যায়।

রুনু কাতর গলায় বলল, যাব দাদা, কবে নিয়ে যাবে ?

চল, কালই যাই।

না, ঝুনুর বিয়ের পর চল।

ঝুনুর সঙ্গে এই ছেলের বিয়ে আমি হতে দেব না।

তুমি বুঝতে পারছ না দাদা—

খুব বুঝছি।

বিয়ে হলে ঝুনু খুশি হবে।

হোক খুশি, এই নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না রুনু।

রুনুকে নিয়ে বের হয়ে আসলাম। তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। রাতের নিয়ন আলো জ্বলে গেছে দোকানপাটে। ঝকঝক করছে আলো। রুনু খুব ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে লাগল। আমি তাকে কী আর বলি।

বারোই আশ্বিন ঝুনুর বিয়ে হয়ে গেল মনসুরের সঙ্গে।

বাবা আর রাবেয়ার প্রবল মতের সামনে টিকতে পারলাম না। ঝুনু বেশ অবাক হয়েছিল। তাকে কিছু বলা হয়নি, তবে সে যে আঁচ করতে পেরেছে তা বুঝা যাচ্ছিল। ঝুনু যতটা আপত্তি করবে মনে করেছিলাম ততটা করেনি দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছি। আত্মীয়স্বজনরা কী বুঝল কে জানে, বিশেষ উচ্চবাচ্য করল না। শুধু মন্টু বিয়ের আগের দিন বাসা ছেড়ে চলে গেল। তার নাকি কোথায় যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, বিয়ের পর ফিরবে। বাবা স্থবির আলস্যে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন।

বিয়েতে রুনুটা আহলাদী করল সবচেয়ে বেশি। গান গেয়ে গল্প বলে আসর জমিয়ে রাখল। তার জন্যে ফুফুর ফাজিল মেয়েটা পর্যন্ত ঢং করার সুযোগ পেল না।

আসর ভাঙল অনেক রাতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েরা আড়ি পেতেছে বাসরঘরে। বরযাত্রীরা হৈ চৈ করে তাস খেলছে। সারা দিনের পরিশ্রমে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে রুনুর ঘরে এসে দাঁড়ালাম। টেবিল ল্যাম্পে শেড দিয়ে রেখেছে। ঘরে আড়াআড়িভাবে একটা লম্বা ছায়া পড়েছে আমার। রুনুর মুখ দেখা যাচ্ছে না। এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা তার অবসন্ন শরীর চুপচাপ পড়ে আছে। আমি নিঃশব্দে বসলাম রুনুর পাশে। রুনু চমকে উঠে বলল, কে ? ও দাদা। কখন এসেছ ? কী হয়েছে ?

না, কিছু হয়নি। ভাবলাম তোর সঙ্গে একটু গল্প করি।

রুনু অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। হঠাৎ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, তোর গা ছুঁয়ে বলছি দাদা, আমার একটুও খারাপ লাগছে না। আমি বেশ আছি।

সবুজকে বিয়ে করবি রুনু ?

না না। ছিঃ।

না কেন ?

না, কক্ষণো না, ওটা একটা বদমাশ।

তবে যে চিঠি লিখেছিলি ?

এমনি, তামাসা করতে, ও যে লিখত খালি খালি।

আয় রুনু, বাইরে হাঁটি একটু, দেখ কী জোছনা।

রুনু জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সত্যি অপরূপ জোছনায় সব যেন ভেসে যাচ্ছে। চারদিক চিকচিক করছে নরম আলোয়। আপনাতেই মনের ভেতর একটা বিষণ্নতা জমা হয়। আমি বললাম, এটা কি মাস বল তো রুনু ?

অক্টোবর মাস।

বাংলা বল।

বাংলাটা জানি না। ফাল্গুন ?

না, আশ্বিন। আশ্বিন মাসে সবচেয়ে সুন্দর জোছনা হয়। আয় বাইরে গিয়ে দেখি।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই মন জুড়িয়ে গেল। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। ফুটফুটে জোছনা চারদিকে। সব কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। বড় ভালো লাগে।

ওটা কে দাদা, ঐ যে চেয়ারে বসে ?

তাকিয়ে দেখি কে যেন ইজিচেয়ারে মূর্তির মতো বসে আছে। একটা হাত অবসন্নভাবে ঝুলছে। অন্য হাতটি বুকের উপর রাখা। বসে থাকার সমস্ত ভঙ্গিটাই কেমন দীন-হীন, কেমন দুঃখী। আমি বলালাম, ও হচ্ছে রাবেয়া, চিনতে পারছিস না ?

না তো। চল আপার কাছে যাই।

না, ও থাকুক একা একা। আয়, এদিক আয়।

রুনু হাঁটতে হাঁটতে আমার একটা হাত ধরল। ছোটবেলায় যেমন করত তেমনিভাবে হাতের আঙ্গুলি নিয়ে খেলা করতে করতে হালকা গলায় বলল, দাদা, তোমরা কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ?

কেন?

চিঠি লিখেছি বলে?

তোর কী মনে হয়?

রুনু কথা বলল না। চুপচাপ হাঁটতে থাকল। আমি বললাম, রুনু, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

কোন কথা?

তুই যে একদিন পালিয়েছিলি।

ও, মনে আছে। ঝুনু একটা কাপ ভেঙে ফেলেছে। ভেঙেই দৌড়ে পালাল, আর আম্মা এসে আমার গালে ঠাস করে এক চড়।

রুনু বলতে বলতে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, তারপর কী ঝামেলায় পড়লাম সবাই। তোর কোনো খোঁজ নেই। সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যা গিয়ে রাত, তবু তোর খবর নেই। বাসায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। বাবা সারাদিন খুঁজছেন এখানে-ওখানে। আড়ালে আড়ালে চোখের পানি ফেলেছেন। আমি থানায় খবর দিতে গেছি। মা কিন্তু বেশ স্বাভাবিক, যেন কিছুই হয়নি। আর ঝুনুটা করল কী, সন্ধ্যাবেলায় রাবেয়াকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে সে-কী কান্না। কোনো মতে বলল, আপা, আমিই ভেঙেছি কাপটা, রুনু ভাঙ্গেনি।

তোর সব মনে আছে রুনু?

খুব মনে আছে। আমি চুপচাপ বসে আছি ছাদে। তোমরা তো কেউ ছাদে খুঁজতে আসনি। সারাদিন একা একা বসেছিলাম। রাত হতেই ভূতের ভয়ে নেমে এসেছি।

তারপর কী হলো বল তো রুনু?

আরেকটা চড় খেলাম।

চড়টা কে দিয়েছিল মনে আছে?

হ্যাঁ, তুমি।

সশব্দে দু'জন হেসে উঠলাম।

কে? কে হাসছে?

তাকিয়ে দেখি রাবেয়া টলতে টলতে আসছে।

ও তোরা! বেশ ভয় পেয়েছি। হঠাৎ করে হাসলি। ধক্ করে উঠেছে বুকটা।

বস রাবেয়া, গল্প করি।

না, ভোর হয়ে আসছে দেখছিস না। সবাই চা-টা খাবে। এত মানুষের ব্যাপার, আমি রান্নাঘরে যাই।

চল আপা, আমিও যাই।

আমি একা একা বসে রইলাম।

ভোরের কাকের কা কা শোনা যাচ্ছে। আকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

বুঝতে পারছি মনের ভেতর জমে থাকা অবসাদ কেটে যাচ্ছে। ঠিক ভোর হবার মুহূর্তে মনের গ্লানি কেটে যায়। সুন্দর সুখের স্মৃতিগুলি ফিরে আসে। কিটকি লিখেছে, গতকাল নৌকায় করে ৬ মাইল উত্তরের 'ক্যানসি' সিটিতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। ওমা, আমাদের দেশের ময়লা ঘিঞ্জি চাঁদপুরের মতো দেখতে। এটিকে আবার বাহার করে বলা হচ্ছে সিটি। শহরটা বাজে, বমি আসে। কিন্তু শহর থেকে বেরুলেই চোখ ভরে ওঠে। নীল সমুদ্র, নীল-নীল পাহাড়, ঘন নীল আকাশ। উহ্ কী অদ্ভুত! আপনি যদি আসতেন তাহলে খুব ভালো লাগত আপনার, সত্যি বলছি।

আইএ পরীক্ষায় রুনু ফেল করল।

বেশ অবাক হলাম আমরা। পড়াশুনায় আমরা সব ভাইবোনই ভালো। রুনু নিজে সাতশ'র উপর নম্বর পেয়ে মেট্রিক পাশ করেছিল। অংকে আর ভূগোলে লেটার মার্ক ছিল। পরীক্ষায় একেবারে ফেল করে ফেলবে এটা কখনো ভাবা যায় না। কাগজে তার রোল নম্বর যখন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না এবং রোল নম্বরটি পাওয়া যাবে না এটিও ধারণা করতে পারছি না তখন রুনু বলল, খুঁজে লাভ হবে না দাদা, আমি ফেল করেছি।

ফেল করবি কেন ?

খাতায় যে কিছুই লিখিনি। ইতিহাসের খাতায় সম্রাট বাবরের ছবি এঁকে দিয়ে এসেছি।

কার ছবি ?

সম্রাট বাবরের।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। রুনু অবশ্যি বদলে যাচ্ছিল। কিন্তু পরিবর্তনটা এত ধীর গতিতে হচ্ছিল যে আমি ঠিক ধরতে পারিনি। হয়তো বই নিয়ে পড়তে বসেছে, আমি যাচ্ছি পাশ দিয়ে— হঠাৎ ডাকল, দাদা শোন একটু।

কী ?

মানুষের গোস্ত যদি বাজারে বিক্রি হতো তাহলে তোমার গোস্ত হতো সবচে' সস্তা, তুমি যা রোগা।

এই জাতীয় কথাবার্তা রুনু আগে বলত না। কিংবা আরেকটি উদাহরণ ধরা যাক।

একদিন রাবেয়াকে গিয়ে সে বলছে, আপা, একটা কথা শুনবে ?

বল।

তোমার মাথাটা কামিয়ে ফেলবে ?

রাবেয়া বিস্মিত হয়ে বলল, কেন রে ?

এমনি বলছি। ঠাট্টা করছি।

রুনুর এ জাতীয় কথাবার্তা কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। রুনু বদলে যাচ্ছিল। কথাবার্তা কমিয়ে দিচ্ছিল। অথচ তার মতো হৈ হৈ করা মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। বাসায় যতক্ষণ আছে গুনগুন করে গান গাইছে। রেডিও কানের কাছে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। সিনেমার তো কথাই নেই। প্রতি সপ্তায় দেখা চাই। আর হাতে টাকা পড়তে না পড়তে ধোঁয়ার মতো উড়ে যাচ্ছে। যখনই দেখতাম রাতের খাওয়ার পর রুনু আমার ঘরে ঘুরঘুর করছে কিংবা আমার পরিষ্কার করে সাজানো বিছানা আবার নতুন করে ঝাড়ছে, তখনি বুঝতাম তার কিছু টাকার প্রয়োজন।

কী-রে রুনু, টাকা দরকার ?

না না।

সেদিন যে দশ টাকা দিলাম, খরচ করে ফেলেছিস ?

হুঁ।

আরো চাই ?

না না।

আচ্ছা আচ্ছা, প্যান্টের পকেটে হাত দে, মানিব্যাগ পেয়েছিস ? খোল। নে, একটা নোট নিয়ে যা। আরে আরে, দশ টাকারটাই নিলি। ডাকাত একেবারে! রুনু খিলখিল হেসে পালিয়ে যেত দ্রুত।

সেই রুনু এমন বদলে গেল। আমরা কেউই বুঝতে পারলাম না। পরীক্ষার রেজাল্ট শুনে তার কোনোই ভাবান্তর নেই। সেদিন শুনি জানালা দিয়ে মুখ বের করে ওভারশিয়ার চাচাকে বলছে, ও চাচাজি, শুনছেন ?

কী মা ?

আমার পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে।

কী রেজাল্ট ?

আমি ফেল করেছি চাচাজি!

একমাত্র বাবাই রুনুকে ধরতে পেরেছিলেন। প্রায়ই বলতেন রুনুটার কি কোনো অসুখ করেছে ? এমন দেখায় কেন ? একদিন রুনুকে আসমানি রঙের একটা চমৎকার শাড়ি এনে দিলেন। সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মন ভালো থাকবে বলে পাঠালেন ঝুনুর কাছে।

ঝুনুর বাসা থেকে ফিরে এসেই রুনু অসুখে পড়ল। প্রথমে একটু জ্বর জ্বর ভাব, সর্দি, গা ম্যাজ ম্যাজ। শেষটায় একেবারে শয্যাশায়ী।

একদিন দু'দিন করে দিন পনেরো হয়ে গেল, অসুখ আর সারে না। ডাক্তার কখনো বলে দুর্বলতা, কখনো বলে রক্তহীনতা, কখনো বা লিভার ট্রাবল। সঠিক রোগটা আর ধরা পড়ে না।

রাতে সে বড় ঝামেলা করে। নিজে একটুও ঘুমোয় না, কাউকে ঘুমুতেও দেয় না। রাবেয়া প্রায় সারা রাত জেগে থাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, গল্প পড়ে শোনায়, পিঠ চুলকে দেয়। অনেক রাতে যখন রাবেয়া বলে, আমি একটু শুই রুনু ?

না না, শুলেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে।

তোর বালিশে একটু মাথা রাখি, ভীষণ মাথা ধরেছে।

উঁহু, তুমি বরং এককাপ চা খেয়ে আস। ঘুমুতে পারবে না।

খোকাকে ডাকি, ও বসবে তোর পাশে।

না, তুমি বসে থাকবে।

কলেজ থেকে ফিরে আমি এসে বসি রুনুর পাশে।

কী-রে জ্বর কমেছে ?

হ্যাঁ, কমেছে।

কপালে হাত দিয়েই প্রবল জ্বরের আঁচ পাই। রুনু ঘোলাটে চোখে তাকায়।

আমি বলি, বেশ জ্বর তো। কী-রে খারাপ লাগে ?

না, লাগে না।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ?

দাও।

চিটাগাং ভালো লেগেছিল রুনু।

হুঁ।

সমুদ্র দেখতে গিয়েছিলি ?

না।

আচ্ছা একবার তোদের সবাইকে নিয়ে সমুদ্র দেখতে যাব। কক্সবাজারে হোটেল ভাড়া করে থাকব। খুব ফুর্তি করব, কী বলিস ?

হুঁ, করব।

জ্বরের ঘোরে রুনু ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে উঠল, দাদা, ঝুনু এখন আর আমাকে একটুও দেখতে পারে না।

কেন দেখতে পারে না ?

কী জানি কেন ? আমার সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু আমার কী দোষ ?

রুনুর জ্বর বাড়তেই থাকে। মন্টু চলে যায় ডাক্তার আনতে। রুনু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। ভাত খেতে খেতে রাবেয়া বলে, খোকা শোন, তোকে একটা কথা বলি।

কী কথা ?

রুনুটা বাঁচবে না রে।

কী বলছিস আবোলতাবোল।

আমার কেন জানি শুধু মনে হচ্ছে। কাল রাতে রুনুর জন্যে গরম পানি করে নিয়ে গেছি, দেখি ওর মাথার পাশে কে একজন মেয়ে বসে আছে।

কী বলছিস এসব ?

হ্যাঁ সত্যি। কে যে বসে ছিল ঠিক বলতে পারব না, তবে আমার মনে হয় তিনি মা। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে দেখেছি।

যতসব রাবিশ।

নারে ঠিকই। আমি ভয় পেয়ে বাবাকে ডেকে আনি।

বাবাকে বলেছিস কিছু ?

না, বলিনি।

দেখতে দেখতে রুনুর জ্বর খুব বাড়ল। ছটফট করতে লাগল সে। ডাক্তার এসে দু'টি ইনজেকশন করলেন। মাথায় পানি ঢালতে বললেন। জ্বরের ঘোরে রুনু ভুল বকতে লাগল, বেশ করেছেন আপনি! হ্যাঁ বেশ তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে!

কী বলছিস রুনু ?

রুনু স্বাভাবিক মানুষের মতো বলল, কই দাদা, কিছু বলছি না তো। রাবেয়াকে বলল, আপা, এক গ্লাস পানি আন। কানায় কানায় ভরা থাকে যেন। আমি সবটা চুমুক দিয়ে খাব।

রুনু এক চুমুক পানি খেল। খুব স্বাভাবিক গলায় ডাকল, বাবা।

এই তো আমি। কী মা ?

একটু কোলে নেন না।

বাবা রুনুকে কোলে নিলেন। বাবার পা কাঁপছিল। আমি বাবার একটা হাত ধরলাম। রুনুটা এই ক'দিনে ভীষণ রোগা হয়েছে। বাবার পিঠের উপর তার দু'টি শীর্ণ হাত আড়াআড়ি ঝুলছে। রুনু বলল, বাবা বাইরে চলেন। বাইরে যাব।

সবাই বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সে রাতে খুব জোছনা হয়েছিল। জাম গাছের পাতা চিকচিক করছিল জোছনায়। উঠোনে চমৎকার সব নকশা হয়েছিল গাছের পাতার ছায়ায়। রুনু ফিসফিস করে বলল, বাবা, কাল রাতে আমি মাকে দেখেছি। মা আমার মাথার পাশে এসে বসেছিলেন। আমি কি মারা যাচ্ছি বাবা ?

না মা, ছিঃ! মারা যাবে কেন ?

তোমরা কি রাগ করেছ আমার উপর ?

রাগ করব কেন ? মিষ্টি মা আমার !

বাবা চুমু খেলেন রুনুর পিঠে।

রুনু বলল, আমি যে আরেকটি ছেলেকে চিঠি লিখেছিলাম।

রাবেয়া রুনুকে কোলে নিয়ে বসে আছে। বাবা আর মন্টু গেছেন ডাক্তার ডেকে আনতে। রুনু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তার ফর্সা সরু আঙুল থরথর করে কাঁপছে। সবাই বুঝতে পারছি রুনু মারা যাচ্ছে...।

৫

রুনু মারা যাবার পর আমার মনে হলো মায়ের মৃত্যু আমি ঠিক অনুভব করতে পারিনি। মা যখন মারা যান তখন অনেক রকম দুশ্চিন্তা ছিল— নিনুকে কে মানুষ করবে, ঘর সংসার কী করে চলবে ? কিন্তু এখন কোনো দুশ্চিন্তা নেই। রুনুর জন্যে কোনো কিছুই আটকে থাকবার কথা ওঠে না, কিন্তু সমস্তই যেন আটকে গেল। রুনুর কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না। মনে হয় গভীর শূন্যতায় ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছি। অসহ্য বোধ হওয়ায় লম্বা ছুটি নিয়েছি। দীর্ঘ অবসর সময়ও কাটে না কিছুতেই। একবার ভাবলাম বাইরে কোথাও যাই। কতদিন রুনুকে নিয়ে বাইরে যেতে চেয়েছি, সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়, কক্সবাজার, দিনাজপুরের পঁচাগড়; কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজ একা একা কী করে যাব ?

কিছুই ভালো লাগে না। শুয়ে শুয়ে দীর্ঘ সময় কাটে। বাবা তাঁর ছোট্ট ঘর থেকে কখনো বের হন না। তাঁর হাঁপানি বড্ড বেড়েছে। মন্টু যে কখন আসে কখন যায়, বুঝতে পারি না। শুধু নিনুর দাপাদাপি শোনা যায়। সে খেলে আপন মনে। পাগলের মতো কথা বলে একা একা।

একদিন রুনুর ছোট্ট ট্রাঙ্কটা খুলে ফেললাম। কত কী সাজিয়ে রেখেছে সেখানে। প্রথম বেতন পেয়ে তাকে দশ টাকার নোট দিয়েছিলাম একটা। নোটের উপর লিখে দিয়েছিলাম— 'প্রিয় রুনুকে ইচ্ছেমতো খরচ করতে।' রুনু সেটি খরচ করেনি। যত্ন করে রেখে দিয়েছে। একটি অতি চমৎকার মোমের পুতুল। আগে কখনো দেখিনি। কোত্থেকে এনেছে কে জানে। তার নিজের ফটো কয়েকটি, কিটকির ক্যামেরায় তোলা। স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাওয়া দু'টি ছোট কাপ। একটি কবিতার বই, তাতে লেখা, 'রাবেয়া আপাকে— রুনু।' পাঁচ ছয়টি সাদা রুমাল। প্রতিটির কোনায় ইংরেজি R লেখা, তার নিজের নামের আদ্যক্ষর। পুরনো ডাইরি পেলাম একটা, পড়তে পড়তে চোখ ভিজে ওঠে।

১৭-১-৭১

আজ রাবেয়া আপা আমাকে বকেছে। মিটসেফ খোলা রেখেছিলাম আর বেড়ালে দুধ

খেয়ে গিয়েছে। প্রথম খুব খারাপ লাগছিল। আপা সেটি বুঝতে পারল। বিকেলে আমাকে ডেকে এমন সব গল্প বলতে লাগল যে হেসে বাঁচি না। একটি গল্প এইরকম— এক মাতাল রাতের বেলা মদ খেয়ে উল্টে পড়েছে নর্দমায়। বিরক্ত হয়ে বলছে— ওরে ব্যাটা নর্দমা, তুই দিনের বেলা থাকিস রাস্তার পাশে আর রাত হলেই এসে যাস রাস্তার মাঝখানে। আপাটা কী হাসাতেই পারে!

১৪-২-৭১

কিটকি আপা আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন যে আমি অবাক। সবাইকে সে কথাটি বলতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু বলা যাবে না। আপা আল্লার কসম দিয়ে দিয়েছেন।

৩০-৩-৭১

আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। দুপুরে আমি শুয়ে আছি, বাবা চুপি চুপি এসে ঘরে ঢুকে বলতে লাগলেন— রাবেয়া, রুনুটার কী হয়েছে ? ও এমন মন মরা থাকে কেন ? আমি উঠে বললাম, আপা তো এখানে নেই বাবা। আর কই, আমার তো কিছু হয়নি। বাবার মুখের অবস্থা যা হয়েছিল না!

২২-৫-৭১

আজ দুপুরে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ও আল্লা, গিয়ে দেখি সিনেমাহলের লবিতে দাদা ঘুরছে। আমাকে দেখে বলল, কী রুনু মিয়া, সিনেমা দেখবে নাকি ? তারপর নিজেই টিকিট কাটল। ছবিটা বড় ভালো।

৫-৬-৭১

মন্টুটা তলে তলে এত। আমাকে বলছে তিন তিনটা ডি.সি.-তে সিনেমা দেখাবে। যদি না দেখায় তাহলে সব ফাঁস করে দেব। তখন বুঝবে। মন্টুর একটা কবিতা ছাপা হয়েছে। কবিতাটি সে শুধু আমাকেই দেখিয়েছে। খুব অশ্লীল কিনা, তাই কাউকে দেখাতে সাহস হয়নি।

৯-৬-৭১

আজ সন্ধ্যাবেলা দেখি রাবেয়া আপা শুয়ে কাঁদছে। খুব চাপা মেয়ে। কাউকে বলবে না তার কী হয়েছে। আমার যা খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

৯-৭-৭১

নিনুটার কাণ্ড দেখে শুনে অবাক হয়েছি। সেদিন স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছে। আমি বললাম, কী হয়েছে ? কাঁদছিস কেন ?

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, জানো না তুমি, আজ ছেলেরা এক প্রফেসরকে মেরে ফেলেছে! আপামণি বলেছে ক্লাসে।

তাতে তোর কী হয়েছে ?

দাদাকে যদি মেরে ফেলে; সেও তো প্রফেসর।

শুনে আমি হেসে বাঁচি না। ওর যত টান দাদার জন্যে।

হতাশা আর বিষণ্নতায় যখন সম্পূর্ণ ডুবেছি তখনি কিটকির চিঠি পেলাম, 'দেশে ফিরছি, কবে বলতে পারছি না। প্লেনের টিকিট পেলেই।'

বদলে গেছিস কিটকি।

লম্বা হয়েছি, না?

হুঁ, আর রোগাও হয়েছিস।

আপনিও বদলেছেন। কী বিশ্রী গোঁফ রেখেছেন!

বিশ্রী?

হ্যাঁ, বিশ্রী আর জঘন্য, দেখলেই সুড়সুড়ি লাগে।

ম্যানিলার কথা বল।

সে তো চিঠিতেই বলেছি।

মুখে শুনি।

রাবেয়া ট্রেতে চা সাজিয়ে আনল। কিটকি হাসতে হাসতে বলল, রাবেয়া আপা আগের মতোই আছেন!

নারে স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, এই দেখ হাতে কত জোর।

উঁহু উঁহু আমার ঘাড় ভেঙে ফেলেছেন। বোন ফ্রাকচার হয়েছে নির্ঘাৎ।

বোন ফ্রাকচার হয়নি, হার্ট জখম হয়েছে কি না বল।

রাবেয়া হাসতে হাসতে চলে গেল। কিটকি বলল, রুনুর কথা বলেন।

না, রুনুর কথা থাক।

মন্টুর নাকি একটা কবিতার বই বেরিয়েছে?

হ্যাঁ, 'কিছু কিংশুক' নাম। তোমাকে নিশ্চয়ই দেবে এক কপি।

কেমন হয়েছে?

আমি কবিতার কী বুঝি! তবে সবাই ভালো বলেছে।

আপনার প্রফেসরির কী খবর?

খবর নেই কোনো। বেতন বেড়েছে। ব্যাঙ্কে কিছু জমেছে। খরচপত্তর তো বিশেষ কিছু নেই।

রাবেয়া আপা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলেন না?

না।

কেন?

রাবেয়া করতে চাইল না, বাবা খুব চেষ্টা করেছিলেন।

কিটকি অনেকক্ষণ থাকল বাসায়। দুপুরে আমাদের সঙ্গে ভাত খেল। বিকেলে চা খেয়ে চলে গেল। কিটকিকে অন্যরকম লাগছিল। ছেলেমানুষি যা ছিল ধুয়ে মুছে গেছে। ভারী সুন্দর হয়েছে দেখতে। চোখ ফেরানো যায় না এমন।

সারা সন্ধ্যা কিটকির কথা ভাবলাম। ছোটবেলা কিটকি আমার জন্যে এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করত। এখনো করে কিনা কে জানে! তাকে সরাসরি কিছু বলার মতো সাহস আমার নেই, কিন্তু বড় জানতে ইচ্ছে করে। রাত দশটার দিকে রাবেয়া আমার ঘরে আসল।

কী-রে, জেগে আছিস?

রাবেয়া চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে খাটে বসল। চিরুনি কামড়ে ধরে বেণি পাকাতে লাগল।

খুব লম্বা চুল তো তোর!

হুঁ। একটা বেণি কেটে নিয়ে যে কেউ ফাঁস নিতে পারবে।

প্রেমের ফাঁস বল।

কিটকিকে দেখে খুব রস হয়েছে না! মন পেয়েছিস কিটকির?

'রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন।'

তোর সাধনাই বা কম কী, পাঁচ বৎসর অনেক লম্বা সময়।

রাবেয়া চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, খোকা, তোর কাছে একটা কাজে এসেছি।

কী কাজ?

আমাকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দে, কিছু পড়াশুনা করি।

এতদিন পর হঠাৎ?

এমনি ইচ্ছে হলো। আর একটা মাস্টার রেখে দিস, কিছু তো ছাই মনেও নেই।

আচ্ছা দেব। আবার ছেড়ে দিবি না তো?

না, ছাড়ব না।

৬

ঝুনুর ছেলে হবে। যাতে কেউ গিয়ে তাকে নিয়ে আসে সে-জন্য সে সবার কাছে চিঠি লিখেছে। তারা আসতে দেবে কিনা কে জানে! মোটেই ভালো ব্যবহার করছে না তারা। রুনু মারা যাবার পরও আসতে দেয়নি। তবু বাবা যাচ্ছেন আনতে। সঙ্গে রাবেয়াও যাবে। যদি ঝুনু আসে তবে বেশ হয়। অনেকদিন দেখি না ওকে। খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

রাবেয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। উৎসাহ নিয়ে রাত জেগে পড়ে। ছুটির দিনগুলি ছাড়া তাকে পাওয়াই যায় না। রোববারে ফুর্তি হয় এই কারণেই। সবাই রোববারের

জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করি।

মন্টু এক দৈনিক পত্রিকা অফিসের সহ-সম্পাদক হয়েছে। বেশ ভালো বেতন, বিএটাও পাশ করেনি। কিন্তু বেশ গুছিয়ে ফেলেছে। অবাক হওয়ারই কথা। তার দ্বিতীয় বই 'শুধু ভালোবাসা' সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছে। মন্টু এখন নামি ব্যক্তি। অনেকেই তার কাছে আসে। মন্টু তো বাসাতে থাকে কমই, বাবা গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। এ ব্যাপারে বাবার উৎসাহ প্রায় সীমাহীন। কোন পত্রিকায় কী লিখল তা তিনি অসীম ধৈর্য নিয়ে খোঁজ রাখেন। সযত্নে পেপার কাটিং জমিয়ে রাখেন। মন্টুর কাছেই শুনেছি একদিন বাবা নাকি কোন বই-এর দোকানে ঢুকে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনার এখানে 'কিছু কিংশুক' কবিতার বইটি আছে ?

দোকানি জবাব দিয়েছে, না নেই।

তাহলে 'শুধু ভালোবাসা' বইটি আছে ?

না, সেটাও নেই।

বাবা রেগে গিয়ে বলেছেন, ভালো ভালো বই-ই নেই, আপনারা কেমন দোকানদার ?

মন্টুর সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলাপ করতেও তাঁর খুব উৎসাহ। মন্টু এ ব্যাপারে অত্যন্ত লাজুক বলেই তিনি সুযোগ পান না।

সত্য মিথ্যা জানি না, শুনেছি বাবা ওভারশিয়ার কাকুর বড় ছেলের বউকে প্রায়ই মন্টুর কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। এই মেয়েটিকে বাবা খুব পছন্দ করেন। মেয়েটির চেহারা অনেকটা রুনুর মতো। পেছন থেকে দেখলে রুনু বলে ভ্রম হয়।

নিনুও অনেক বড় হয়েছে। সেদিন তাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোতেই দু'টি ছেলে শিস দিল। নিনুকে বললাম, নিনু, কোনো বদ ছেলে তোমাকে চিঠি ফিটি লিখলে না পড়ে আমাকে দিয়ে দিবে, আচ্ছা ? নিনু লজ্জায় লাল হয়ে ঘাড় নেড়েছে।

সেদিন রবিবার। সবার বাসায় থাকার কথা কিন্তু বাসায় নেই কেউ। বাবা আর রাবেয়া গেছে ঝুনুকে আনতে, মন্টু তার পত্রিকা অফিসে। পত্রিকা অফিসের কাজ নাকি পুলিশের কাজের মতো। ছুটির কোনো হাঙ্গামাই নেই। বাসায় আমি আর নিনু। আমি ভেতরে বসে কাগজ পড়ছি। নিনু বলল, দাদা, একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

কী রকম ভদ্রলোক ?

বুড়ো। চোখে চশমা।

বেরিয়ে এসে দেখি বড় মামা। অনেকদিন পর দেখা কিন্তু চিনতে অসুবিধা হলো না। বড় মামা বললেন, আমাকে চিনতে পারছ ?

জি, আপনি তো বড় মামা।

অনেকদিন পর দেখা। চেনার কথা নয়। তুমিও বড় হয়েছে, আমিও বুড়ো। কী কর এখন ?

এখানকার এক কলেজে প্রফেসরি করি।

বেশ বেশ! বাসায় আর কেউ নেই ? খালি খালি লাগছে!

জি-না। বাবা এবং রাবেয়া গেছেন চিটাগাং। আমার এক বোনের সেখানে বিয়ে হয়েছে।

মামা চুপ করে শুনলেন। তাঁকে দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছি। হঠাৎ করে কেনই বা আসলেন। মা বেঁচে নেই যে আসবার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তা ছাড়া মামাকে কেমন যেন লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত মনে হচ্ছিল। মামা বললেন, আমার আব্বা, মানে তোমাদের নানা মারা গিয়েছেন দিন সাতেক হলো।

কী হয়েছিল ?

তেমন কিছু নয়। বয়স তো কম হয়নি তাঁর, নব্বইয়ের কাছাকাছি। আজকালকার দিনে এত বাঁচে না কেউ।

মামা বলতে বলতে অল্প হাসলেন, কী ভেবে বললেন, আমাকে আসতে দেখে অবাক হয়েছ, না ?

না না অবাক হবো কেন ? আপনি চা খাবেন ?

চা ছেড়ে দিয়েছি, ডায়াবেটিসে ভুগছি। আচ্ছা দাও এক কাপ, চিনি ছাড়া।

নিনুকে চায়ের কথা বলে এসে বসতেই মামা বললেন, বাবা শেষের দিকে তোমাদের কথা কেন জানি খুব বলতেন। তিনি সিলেটে আমার ছোট ভাইয়ের কাছে ছিলেন। অসুখের খবর শুনে আমি গিয়েছিলাম। বাবা প্রায়ই বলতেন ঢাকা গিয়েই তোমাদের এখানে আসবেন। আগে কখনো এমন বলেননি।

মামা চশমার কাঁচ ঘষতে ঘষতে বললেন, বয়স হলে অনেক Values বদলে যায়। তাই না ?

জি।

শিরিন খুব আদরের ছিল সবার। তবে বড় গোঁয়ার ছিল। জানো তো, মেয়েদের দু'টি জিনিস খুব খারাপ— একটি হচ্ছে সাহস, অন্যটি গোয়ার্তুমি।

আমি কোনো কথা বললাম না। মামা বললেন, শিরিনের অনেক গুণ ছিল। সাধারণত মেয়েদের থাকে না। যখন সে এখানে চলে আসল তখন সবাই দুঃখিত হয়েছিলাম। গুণ বিকাশে পরিবেশের প্রয়োজন হয় তো।

নিনু চা নিয়ে ঢুকল। মামা চায়ে চুমুক দিয়ে চমকালেন, এ-কী খুকি, চিনি দিয়ে এনেছ যে!

নিনু আধহাত জিভ বের করে ফেলল। মামা বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। একদিন একটু অনিয়ম হোক না হয়। তোমার এক ভাই শুনেছি খুব নাম করেছে। আমি ঠিক চিনতাম না। কিটকি আমাকে বলল। কিটকি আমার ভাগ্নি, চিনেছ ?

জি।

তোমার বাবা আসলে সবাইকে নিয়ে যাবে আমাদের বাসায়। আমিই নিয়ে যাব। তোমার মা'র অনেক গয়না ছিল। সব ফেলে এসেছিল, সেগুলিও নিয়ে আসবে।

মামা নিনুকে কাছে ডেকে আদর করতে লাগলেন, ফুলের মতো মেয়ে। তুমি যাবে মা আমার বাসায়? তোমাকে একটা জিনিস দেব।

কী জিনিস?

একটা ময়ূর। হিলট্রাকটে থাকে এক বন্ধু, আমাকে দিয়েছিল।

পেখম হয়?

হয় বোধকরি। আমি অবশ্যি পেখম হতে দেখিনি।

আমি বললাম, মামা, মা'র একটা পুরনো রেকর্ড ছিল নাকি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে এখনো। তুমি চাও সেটি?

শুনতে ইচ্ছে হয় খুব।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। গান শুনতে ইচ্ছে তো হবেই। পাইয়ে দেব আমি, আমার মনে থাকবে।

ঝুনুকে শেষ পর্যন্ত আসতে দিল তারা।

তিন বৎসর পর দেখছি। মা হতে যাবার আগের শারীরিক অস্বাভাবিকতায় একটু যেন লজ্জিত। ছেলেবেলার উচ্ছলতা ঢাকা পড়েছে অপরূপ কমনীয়তায়। মোটা হওয়াতে একটু যেন ফর্সা দেখাচ্ছে।

দুপুরবেলা সে যখন এসেছে তখন আমি কলেজে। মন্টু পাশের বাড়ি থেকে ফোন করল আসতে। পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরি মিটিং ছিল, আসতে পারলাম না। সারাক্ষণই ভাবছিলাম কেমন না জানি হয়েছে ঝুনুটা। সেদিনও একটা চিঠি পেয়েছি—

> তুমি তো মনে কর বিয়ে করে ঝুনু বদলে গেছে। বাসার কারো সঙ্গে কোনো যোগ নেই। তাই বাসার কোনো খবরই আমাকে দাও না। রাবেয়া আপার যে জ্বর হয়েছিল, সে তো তুমি কিছু লেখনি। বাবার চিঠিতে জানলাম। আর আমি এত কেঁদেছি তোমরা সবাই আমাকে পর মনে করছ এই জন্যে। মন্টুর কবিতার বই বেরিয়েছে, মন্টু আমায় পাঠায়নি। আমি নিজে যখন একটা কিনেছি তার দশদিন পর সে বই পাঠিয়েছে। কেন, আগে পাঠালে কী এমন ক্ষতি হতো? মন্টু তার বইয়ে পেন্সিল দিয়ে লিখেছে, 'সুক্রন্দসী বন্ধু— ঝুনুকে।' আমি বুঝি সুক্রন্দসী! মন্টুকে হাতের কাছে পেলে কাঁদিয়ে ছাড়ব...।

সন্ধ্যাবেলা বাসায় এসে শুনি ঝুনু পাশের বাড়ি বেড়াতে গেছে। চায়ের পেয়ালা হাতে বারান্দায় একা একা বসে পেপার দেখছি এমন সময় সে এলো। কী একটা ব্যাপারে ভীষণ খুশি হয়ে হাসতে হাসতে আসছে। আমায় লক্ষ করেনি দেখে নিজেই

ডাকলাম, ঝুনু, আয় এদিকে।

ঝুনু প্রথমে থতমত খেল। তারপর কিছু বুঝবার আগেই তার হাতের ধাক্কায় আমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা ছিটকে পড়ল। এবং প্রথমেই যা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে ঝুনুটা আমায় জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। প্রথম উচ্ছ্বাসটা কাটল অল্পক্ষণেই, কান্না থামল না। অনেকদিন পর প্রিয় জায়গায় ফিরে আসা, রুনুর মৃত্যু, নিজের জীবনের অশান্তি সব মিলিয়ে যে কান্না তা একটু দীর্ঘস্থায়ী তো হবেই। আমি বললাম, ঝুনু নে চা খা, তারপর আবার কান্না শুরু কর। মন্টু তোকে সুক্রন্দসী কি আর শুধু শুধু লিখেছে!

কাঁদুক, ঝুনু কাঁদুক। অনেকদিন এ বাড়িতে কেউ কাঁদে না। সেই কবে রুনু মারা গেল। খুব কাঁদল সবাই। বাবা গলা ছেড়ে কাঁদলেন, মন্টু আর রাবেয়া ছেলেমানুষের মতো কাঁদল। নিনু চুপি চুপি আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর আর এ বাড়িতে কান্না কই! নিনু পর্যন্ত ভুলেও কাঁদে না। রাবেয়া হয়তো কাঁদে, আমার তা কখনো চোখে পড়ে না। কাঁদুক ঝুনু। আমি দেখি তাকিয়ে তাকিয়ে সুক্রন্দসী ঝুনুকে।

ঝুনুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো পুরনো দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে। আগের মতো হৈ হল্লা হতে লাগল। নিনুর চুল ঘন হয়ে উঠবে বলে একদিন ঝুনু মহা উৎসাহে নিনুর মাথা মুড়িয়ে দিল। নিনু তার কাটা চুল লুকিয়ে রাখল তার পুতুলের বাক্সে। এই নিয়ে ফুর্তি হলো খুব। মন্টু ছড়া লিখল একটা— 'নিনুর চুল'। নিজের পত্রিকায় ছবি দিয়ে ছাপিয়ে ফেলল সেটি। নিনুও মন্টুর খাতায় গোপনে লিখে রাখল— 'মন্টু ভাই একটা বোকা। রোজ খায় তেলাপোকা।' ঝুনু সবাইকে একদিন সিনেমা দেখাল। রোববার পিকনিক হলো আম গাছের তলায়। সময় কাটতে লাগল বড় সুখে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে শুয়ে আছি। ঝুনু এসে বলল, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব দাদা?

না, এমনি সারবে।

আহা, দিই না একটু।

ঝুনু বসল মাথার কাছে। মনে হলো কিছু বলবে। চুপ করে অপেক্ষা করছি। ঝুনু ইতস্তত করে বলল, আচ্ছা দাদা, হাসপাতালে নাকি ছেলে বদল হয়ে যায়?

ছেলে বদল! কী রকম?

অবাক হয়ে তাকাই আমি।

ওভারশিয়ার চাচার ছেলের বউ বলছিল, হাসপাতালে নাকি ছেলেমেয়েদের নম্বর দিয়ে সব এক জায়গায় রাখে। নম্বরের গণ্ডগোল হলেই একজনের ছেলে আরেকজনের কাছে যায়।

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, এই দুশ্চিন্তাতেই মরছিস? পাগল আর কী!

না দাদা, সত্যি। ওর এক বন্ধুর নাকি টুকটুকে ফর্সা এক ছেলে হয়েছিল। রিলিজের সময় যে ছেলে এনে দিল সেটি নিগ্রোর চেয়েও কালো।

হাসপাতালে যেতে না চাস, বাসায় ব্যবস্থা করা যাবে। তবে এগুলো খুব বাজে কথা ঝুনু।

দু'জনেই চুপচাপ থাকি। বুঝতে পারছি ঝুনুর ছেলের কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। নিজেই জিজ্ঞেস করি, ছেলে হলে কী নাম রাখবি ঝুনু ?

যাও।

বল শুনি, একটা তো ভেবেছিস মনে মনে।

আমি যেটা ভেবেছি সেটা খুব বাজে, পুরনো।

কী সেটি ?

উঁহু।

বল না ? শুনি কেমন নাম।

কিংশুক।

এই বুঝি তোর পুরনো নাম।

যাও দাদা, শুধু ঠাট্টা।

মেয়ে হলে কী রাখবি ?

মেয়ে হলে রাখব রাখী।

চমৎকার।

রাখী নামে আমার এক বন্ধু ছিল। এত ভালো মেয়ে, এখন ডাক্তার। আমিও আমার মেয়েকে ডাক্তারি পড়াব দাদা।

আমার অসুখবিসুখ হলে আর চিন্তাই নেই। ভাগ্নিকে খবর দিলেই হলো।

আচ্ছা দাদা, ইরিত্রা নামটা তোমার কেমন লাগে ?

নতুন ধরনের নাম। আধুনিক।

মন্টু বলেছে ইরিত্রা রাখতে। দু'টি নামই আমার ভালো লাগে। কী করব বলো তো দাদা ?

দু'নম্বর মেয়ের নাম ইরিত্রা রাখ।

না, দু'নম্বর মেয়ের নাম রাখব রুনু।

রুনু ?

হ্যাঁ। তাহলে রুনুর মতো লক্ষ্মী মেয়ে হবে। একটুক্ষণ থেমে ঝুনু কাতর গলায় বলল, রুনুর কথা বড় মনে হয় দাদা। ওকে দেখতে ইচ্ছে করে।

রুনুকে আমারও বড় দেখতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে রুনুর ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকি। পাতলা ঠোঁট চেপে হাসির ভঙ্গিমায় তোলা ছবি। বড় বড় চোখ।

বাচ্চা ছেলেদের চোখের মতো দৃষ্টি। সব মিলিয়ে কেন যেন ভারী করুণ মনে হয়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বুকের ভেতর ব্যথা বোধ হয়।

মায়ের গানের রেকর্ডটা একটা লোক এসে দিয়ে গেল। খুব যত্ন করে কাগজে মোড়া। রেকর্ডের লেবেলে মায়ের নাম 'মিস শিরিন সুলতানা' খুব অস্পষ্টভাবে পড়া যায়। হিজ মাস্টার ভয়েসের কুকুরের ছবিটার উপর আবার লাল কালিতে কাঁচা হাতে ইংরেজিতে মায়ের নাম লেখা। হয়তো তিনিই লিখেছেন।

বাসায় একটা সাড়া পড়ে গেল। ঝুনু তার ছেলে কোলে নিয়ে পুরনো দিনের মতোই লাফাতে লাগল। বাজিয়ে শোনার মতো গ্রামোফোন নেই দেখে শুধু কাঁদতে বাকি রাখল।

মন্টু রেকর্ড প্লেয়ার আনতে বেরিয়ে গেল তখনি। রাবেয়া কলেজে। সেখানে কী একটা ফাংশন নাকি। মন্টু তাকেও খবর দিয়ে যাবে। বাবাকে দেখে মনে হলো তিনি আমাদের এই হৈচৈ দেখে একটু লজ্জা পাচ্ছেন। নিনুও এতটা উৎসাহের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বাবাকে বললাম, আজ একটা উৎসবের মতো করা যাক বাবা। খুব ঘরোয়াভাবে। সন্ধ্যার পর মায়ের কথা আলোচনা হবে। তারপর ঘুমুতে যাবার আগে রেকর্ড বাজানো হবে। বাবা সংকুচিতভাবে বললেন, এসবের চেয়ে তো মিলাদ টিলাদ...। ঝুনু সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে বলল, সে পরে হবে, আজ দাদা যা বলছে তাই হোক।

বাবা জুতো পরে ফুল আনতে চলে গেলেন। ফুলের মালায় মায়ের ছবি সাজানো হবে। ঝুনু বলল, বাবা একটু ধূপ এনো। না পেলে আগরবাতি।

আমি রেকর্ডটা লুকিয়ে ফেললাম যাতে আগেভাগে কেউ শুনে ফেলতে না পারে। কিটকিকে টেলিফোন করলাম পাশের বাসা থেকে।

হ্যালো কিটকি ? আমি...

বুঝতে পারছি আপনি কে। কী ব্যাপার ?

খালাকে নিয়ে আয় না বাসায় একবার।

কী ব্যাপার ?

এসেই শুনবি।

আহা, বলেন না ?

একটা ছোটখাট ঘরোয়া উৎসব।

কিসের উৎসব ?

আসলেই দেখবি।

বলেন না ছাই!

মায়ের গাওয়া রেকর্ডটা বাজানো হবে। তাছাড়া তার স্মৃতিতে একটা ঘরোয়া আলোচনা। এই আর কী!

বাহ, সুন্দর আইডিয়া তো! আমি আসছি।

আচ্ছা কিটকি, মায়ের সঙ্গে তোলা খালার কোনো ছবি আছে ?

দেখতে হবে।

যদি পাস তো

হ্যাঁ, নিয়ে আসব। কখন আসতে বলছেন ?

রাত আটটায়।

সন্ধ্যাবেলা রাবেয়া রিকশা থেকে পাংশু মুখে নামল। ভীত গলায় বলল, বাসায় কিছু হয়েছে ?

না, কী হবে ?

আরে মন্টুটা এমন গাধা! কলেজে আমার কাছে স্লিপ পাঠিয়েছে, বাসায় এসো, খুব জরুরি। আমি তো ভয়ে মরি। না জানি কার কী হলো।

না, কী আর হবে। মায়ের রেকর্ডটা দিয়ে গেছে।

তাই নাকি, বলবি তো ?

বাবা দামি দু'টি জরির মালা নিয়ে এলেন।

ফুলের মালা পেলাম নারে। অনেক খুঁজেছি।

মালা দু'টি অনেক বড় হলো। ফটোতে দিতেই ফটো ছাড়িয়ে নিচ অব্দি ঝুলতে লাগল।

বসার ঘরটা সুন্দর করে সাজানো হলো। চেয়ার-টেবিল সরিয়ে মেঝেতে বিছানা করা হলো। ধূপ পোড়ানো হলো। স্মৃতি হিসেবে মায়ের পার্কার কলমটা রাখা হলো। এটি ছাড়া তাঁর স্মৃতি বিজড়িত আর কিছুই ছিল না বাসায়।

ঠিক আটটায় কিটকি আসল। সঙ্গে খালাও এসেছেন। বেশ কতকগুলি ছবিও এনেছে কিটকি।

উৎসবটা কিন্তু যেমন হবে ভেবেছিলাম তার কিছুই হলো না। খালার সঙ্গে তোলা মায়ের ছোটবেলাকার ছবিগুলো দেখলাম সবাই।

মা'র কথা কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করতেই খালা তাঁর নিজের কথাই বলতে লাগলেন। ছোটবেলায় কেমন নাচতে পারতেন, কেমন অভিনয় করতে পারতেন, তাঁর করা 'ইন্দ্রানী'র পার্ট দেখে কোন ডাইরেক্টর তাঁকে ছবিতে নামার জন্য ঝোলাঝুলি করছিল, এই জাতীয় গল্প। খরাপ লাগছিল খুব। খালার থামার নাম নেই। শেষটায় কিটকি বলল, আপনি একটু রেস্ট নিন মা, আমরা খালুজানের কথা শুনি।

বাবা থতমত খেয়ে বললেন, না না, আমি কী বলব ? আমি কী বলব ? তোমরা বলো মা, আমি শুনি।

না খালুজান, আপনাকে বলতেই হবে। আমরা ছাড়ব না।

বাবা বিব্রত হয়ে বললেন, তোমাদের মা খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিল। আমাকে সে নিজে ইচ্ছে করেই বিয়ে করেছিল। তখন তার খুব দুর্দিন। আমি খুব সাহস করে তাকে বললাম আমাকে বিয়ে করতে। হ্যাঁ, আমি তাকে খুব পছন্দ করতাম। সে খুব অবাক হয়েছিল আমার কথা শুনে। কিন্তু রাজি হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। না, আমি তার কোনো অযত্ন করিনি। হ্যাঁ, আমার মনে হয় সে শেষ পর্যন্ত খুশিই হয়েছিল। যাক, কী আর জানি আমি। তোমরা বরং গানটা শুন। চোখে আবার কী পড়ল। কী মুশকিল!

বাবা চোখের সেই অদৃশ্য জিনিসটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মন্টু রেকর্ড চালিয়ে দিল। পুরনো রেকর্ড, তবু খুব সুন্দর বাজছিল। আমরা উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। অল্প বয়সী কিশোরীর মিষ্টি সুরেলা গলা, 'এই তো এত পথ এত যে আলো...'। অদ্ভুত লাগছিল! ভাবতেই পারছিলাম না আমাদের মা গান গাইছেন। ফ্রক পরা পরীর মতো একটি মেয়ে হারমোনিয়ামের সামনে বসে দুলে দুলে গান গাইছে এমন একটি চিত্র চোখে ভাসতে লাগল।

বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর চোখের সেই অদৃশ্য বস্তুটি ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুকণা হয়ে ঝরে পড়ছে মেঝেতে।

৭

বাবার হঠাৎ কেন জানি শখ হয়েছে রান্নার বই লিখবেন একটি। রকমারি রান্নার কায়দা কানুন নোট বইয়ে লিখে রাখছেন। বাজার থেকে অনেক বইপত্রও কিনে এনেছেন। পুরনো 'বেগম' থেকে ঘেঁটে ঘেঁটে 'নারকেল ইলিশ' বা 'ছানার ডালনা'র রন্ধন প্রণালি অসীম আগ্রহে খাতায় তুলে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করছে নিনু আর ওভারশিয়ার কাকুর ছেলের বউ। মাঝে মাঝে দু'একটি রান্না বাসায়ও রাঁধা হয়। সেদিন যেমন 'নোয়াপাতি মিষ্টি' বলে একটি মিষ্টি তৈরি হলো। খেতে ভালো হয়েছে বলায় সে কী ছেলেমানুষি খুশি।

ভালোই হয়েছে, কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকছেন। রাবেয়াও তার পড়াশুনা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তার দেখা পাওয়াই মুশিকিল। যদি বলি, আয় রাবেয়া একটু গল্প করি। রাবেয়া আঁতকে ওঠে, দু'দিন পরেই আমার পরীক্ষা— এখন তোর সাথে আড্ডা দেই! পাগল আর কাকে বলে।

মন্টু রাতে বাসায় ফেরাই বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েকজন বন্ধু মিলে নাকি এক ঘর ভাড়া করেছে। সেখানে গল্প-গুজব হয়। কাজেই বাসায় তার বড় একটা আসা হয় না। হঠাৎ এক আধদিন আসে। মেহমানের মতো ঘুরে বেড়ায়, বাবাকে গিয়ে বলে, মোট ক'রকম রান্নার যোগাড় হলো বাবা ?

একশো বারো।

ও বাবা, এত! একটা রান্না কর না আজ, খাই। কী কী লাগবে বলো, আমি বাজার থেকে নিয়ে আসি।

বাবা মন্টুকে নিয়ে মহা উৎসাহে রান্না শুরু করেন।

ঝুনু চলে যাবার পর পরই আমি একলা পড়ে গেছি।

সবাই সবার কাজ নিয়ে আছে। বাসায় আমার তেমন কোনো কাজ নেই। শুয়ে বসে সময় কাটাতে হয়। কাজেই আমি দেরি করে বাসায় ফিরি। সেদিন রাত এগারোটার দিকে ফিরেছি, দেখি রাবেয়া মুখ কালো করে বসে আছে আমার ঘরে।

কী হয়েছে, রাবেয়া ?

কিছু হয়নি। তুই হাত্‌-মুখ ধুয়ে আয়, বলছি।

বল, শুনি কী ব্যাপার।

তুই কলেজে যাবার পর পরই খালা এসেছিলেন।

কী জন্যে ?

তুই জানিস না কিছু ?

না তো!

কিটকির বিয়ে। আগামীকাল রাতেই সব সেটেল হবে। খালা সবাইকে যেতে বলেছেন। গাড়ি পাঠাবেন।

অ।

এক রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক জজের ছেলে। ফরেন সার্ভিসে আছে। ফ্রান্সে পোস্টেড। ছুটিতে এসেছে, বিয়ে করে ফিরবে। ম্যানিলাতেই নাকি কিটকির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ছেলে গিয়েছিল সেখানে কী কারণে যেন। কিটকির সঙ্গে জানা-জানি হয়। কিটকিরও ছেলে খুব পছন্দ!

এসব আমাকে শুনিয়ে কী লাভ রাবেয়া ?

কোনো লাভ নেই ?

না।

এরকম হলো কেন ? চুপ করে আছিস যে ?

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কী করার আছে ? আমি কী করতে পারতাম। রাবেয়া এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কেঁদে ফেলবে কি না কে জানে। রাবেয়া ফিস ফিস করে বলল, আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। আমি পাশ করলেই বাইরে কোথাও চলে যাব। থাকব একা একা। আর খোকা শুন—

বল।

তুই একটা গাধা, ইডিয়ট। আমি তোর মুখে থুতু দেই।

আমি গায়ের সার্ট খুলে কল ঘরের দিকে যাই। রাবেয়া আসে আমার পিছনে পিছনে। এক সময় ধরা গলায় বলে, খোকা তুই রাগ করলি ? ছিঃ রাগ করবি না। আমার কথায় রাগ করতে আছে বোকা ?

৮

খোকা,

গত পরশু সন্ধ্যাবেলা পৌঁছেছি এখানে। স্টেশনে স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট এসেছিলেন নিজেই। ভারী ভালো মানুষ। সারাক্ষণ 'মা মা' বলে ডাকছেন। তাঁর নিজের টাকার স্কুল, নিজের জমির উপর দোতলা স্কুল ঘর। নিজের সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে দিয়েছেন বলেই প্রতিটি জিনিসের উপর অসাধারণ মমতা। আর যেহেতু আমি স্কুলের একজন, কাজেই তাঁর ভালোবাসার পাত্রী।

ট্রেন থেকে খুব ভয়ে ভয়ে নেমেছিলাম। নতুন জায়গা, কাউকে চিনি না, জানি না। কিন্তু তাঁকে দেখে সব ভয় কেটে গেল। কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয় যেন অনেক দিন আগে তার সঙ্গে গাঢ় পরিচয় ছিল, ঠিক সে-রকম। তিনি প্রথমে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। বাসায় তিনি আর সুরমা এই দু'টি মাত্র প্রাণী। সুরমা তাঁর মেয়ে। রাতের খাওয়া সেরে তিনি আমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিলেন। সতেরোজন ছাত্রী থাকে সেখানে। আমি হয়েছি তাদের হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট। ছোট্ট একটা লাল ইঁটের দালান। সামনে গাঁদা ফুলের এক টুকরো বাগান। পেছনেই পুকুর। সমস্ত মন জুড়িয়ে গেছে আমার।

খোকা, তোদের সঙ্গে যখন থাকতাম তখন এক ধরনের শান্তি পেয়েছি, এ অন্যধরনের। এখানে মনে হচ্ছে জীবনের সমস্ত বাসনা কামনা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। আর বেশি কিছু চাইবার নেই। কাল রাতে ছাদে বসেছিলাম একা একা। কেন যেন মনে হলো একটু কাঁদি নির্জনে। মা'র কথা ভেবে, রুনুর কথা ভেবে দু'এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলি। কিন্তু একটুও কান্না আসল না! কেন কাঁদব বল? প্রচুর দুঃখ আছে আমার। এত প্রচুর যে কোনো দিন কেউ জানতেও পারবে না। কিন্তু তবুও আমি খোকার মতো ভাই পেয়েছি, কিটকির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শুনে যে ভাই আমাকেই সান্ত্বনা দিতে আসে। রুনু, ঝুনু, মন্টু, নিনু এরা আমার পারুল বোন চম্পা ভাই। চারদিকে এমন চাঁদের হাটে কি কোনো দুঃখ থাকে? মন্টু একটি কবিতার বই উৎসর্গ করেছে আমাকে। সবগুলি কবিতা হতাশা আর বেদনা নিয়ে লেখা। আমার ভেতরের সবটুকু সে কী করে দেখে নিল ভেবে অবাক আমি। সেই যে দু'টি লাইন—

'দিতে পারো একশো ফানুস এনে?

আজন্ম সলজ্জ সাধ একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই।'

যেন আমার বুকের ভেতরের সুপ্ত কথাটিই সে বলে গেছে। দোয়া করি মস্ত বড় হোক সে।

এমন কেন হলো খোকা ? সব এমন উল্টে পাল্টে গেল কেন ? রুনুটার স্মৃতি কাঁটার মতো বিঁধে আছে। আমাদের হোস্টেলের একটি মেয়ে সুশীলা পুরকায়স্থ, অবিকল রুনুর মতো দেখতে। তাকে কাল ডেকে অনেকক্ষণ আদর করেছি, মন্টুর কবিতার বই পড়তে দিয়েছি। সে বেচারি ভারি অবাক হয়েছে। সে তো জানে না, তাকে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে সারারাত কাঁদবার কী প্রচণ্ড ইচ্ছাই না হচ্ছে !

নিনুটার কথাও মনে হয়। এত অল্প বয়সে কী ভারিক্কি হয়েছে দেখেছিস ? আমি যেদিন চলে আসব সেদিন দুপুরে সে গম্ভীর হয়ে একটা সুটকেস আমার বিছানায় রাখল। আমি বললাম, কী-রে নিনু, সুটকেসে কী ?

কিছু নয়। আমার কাপড়-চোপড় আর বই। এটিও তুমি সঙ্গে নেবে।

সে-কী! এটা নিয়ে কী করব ?

বাহ্, আমিও তো থাকব তোমার সঙ্গে।

কাণ্ড দেখলি মেয়ের ? কাউকে কিচ্ছু বলেনি। নিজে নিজে সমস্ত গুছিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে। আমার সঙ্গে যাবে। এ সমস্ত দেখলেই মন জুড়িয়ে যায়। মনে হয় কিসের দুঃখ কিসের কী ? মমতার এমন গভীর সমুদ্রে দুঃখ তো টুপ করে ডুবে যাবে। হাসছিস মনে মনে, না ? আমিও কবি হয়ে গেলাম কি না ভেবে। সব মানুষই তো কবিরে বোকা। বাবার কথাই মনে কর না কেন। রাতেরবেলা একা একা কলতলায় বসে গান গাইতেন— 'ও মন মনরে...।' আমি ঠাট্টা করে বলতাম 'নৈশ সঙ্গীত'।

কাজেই আমি বলি সব মানুষই কবি। কেঁউ কেউ লিখতে পারে, কেউ পারে না।

তোর খুব বড়লোক হবার শখ ছিল, তাই না খোকা ? ঠিক ধরেছি তো ? আমি তোকে বড় লোক করে দি, কেমন ? রেজিস্ট্রি করে একটা চেক পাঠাচ্ছি। দু'এক দিনের ভেতরে পেয়ে যাবি। কত টাকা আন্দাজ কর তো ? তুই যত ভাবছিস তারচে' অনেক বেশি। চেক পেয়েই জানবি। নারে ঠাট্টা করছি না। আগের মতো কি আর আছি ? ঠাট্টা-তামাশা একটুও পারি না এখন। টাকাটা আমি তোকে

দিলাম খোকা। আমার আর দেবার মতো কী আছে বল ? তোর খুব ধনী হওয়ার শখ ছিল। সেই শখ মিটাতে পারছি বলে ভারি আনন্দ হচ্ছে। খুব যখন ছোট ছিলি তখন একবার ফুটবল কেনার শখ হলো তোর। মা'র কাছে সাহস করে তো কিছু চাইতি না। আমাকে এসে বললি কানে কানে। আমি টাকা পাব কোথায় ? যা কষ্ট লাগল। এখন পর্যন্ত বাচ্চা ছেলেদের ফুটবল খেলতে দেখলে বুক ব্যথায় টনটন করে। তোর নিশ্চয়ই মনে নেই সে-সব। সোনা ভাই, আমার এ টাকাটা সমস্তই তোর, যেভাবে ইচ্ছে খরচ করিস। নিনু, ঝুনু, মন্টু আর বাবাকে ভাগ করে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু তাদের দেয়া আর তোকে দেয়া একই ভেবে দেইনি। কোত্থেকে পেয়েছি ? তুই কী ভাবছিস আগে বল ?

নারে চুরি করিনি! আমাকে কেউ ভিক্ষেও দেয়নি। এ আমার নিজের টাকা। মা'র কথা সময় হলে তোকে বলব বলেছিলাম না ? এখন বলছি, তাহলেই বুঝবি কী করে কী হয়েছে। বাবার সঙ্গে বিয়ের আগে তাঁর আবিদ হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের একটি মেয়েও হয়েছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কী জন্যে তা তোর জানার দরকার নেই। বাবা মাকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন পরপরই। বুঝতেই পারছিস আমি হচ্ছি সেই মেয়ে। খুব অবাক না ? আমার সেই বাবা ভদ্রলোক এতদিন ঢাকাতেই ছিলেন। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কিছুদিন হলো বাইরে চলে গেছেন। যাবার আগে এই টাকাটা দিয়ে গেছেন আমাকে। সেই লোকটিও ভালো ছিলরে। আসত প্রায়ই আমাদের বাসায়। দেখিসনি কোনো দিন ? নীল রঙের কোট পরত, গলায় টকটকে লাল রঙের টাই। আমাকে ডাকত 'ইমা' বলে। গল্পের মতো লাগে, না ?

এগারো বছর বয়স থেকেই আমি জানি সব। কেমন লাগে তখন বল তো ? তোদের যিনি বাবা, আমি নিজে তাঁকে বাবা বলেই ভেবেছি আর তিনি একটুও বুঝতে দেননি কিছু। সেই যে একবার কলেজে আমাকে 'মা কালী' ডাকল, তোরা সবাই দুঃখিত হলি, বাবা কী করলেন বল তো ? তিনি রাতেরবেলা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। ইতস্তত করে বললেন, ইয়ে মা, রাখ তো এটা।

কী বাবা ?

না ইয়ে, একটা ক্রিম, খুব ভালো, বিশ টাকা দাম।

তাকিয়ে দেখি চ্যাপ্টা মুখের বোতল একটা। মুখের উপর লেখা Seven day beauty programme. চোখে পানি এসে গেল

আমার। সেই কৌটাটা এখনো আছে আমার কাছে, ভারি মূল্যবান সেটি, যেন বাবা বিশ টাকায় এক কৌটা ভালোবাসা কিনে এনেছেন। জন্মে জন্মে এমন লোককেই বাবা হিসেবে পেতে চাই আমি। মানুষ তো কখনো খুব বেশি কিছু চায় না, আমি নিজেও চাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয়— না চাইতেই তো অনেক পেয়েছি।

কিটকি ভুল করল। কী করবি বল ? ভুলে যেতে বলি না। ভুলবি কেন ? ভালোবাসা কি ভুলবার জিনিস ? রুনুকে কি আমরা ভুলতে পারি ? না ভোলা উচিত ? কিটকি ভারী ভালো মানুষ। মেয়েটি যেন সুখী হয়। এখনো তো তার বয়স হয়নি, বুঝতেও শিখেনি কিছু। কষ্ট লাগে ভেবে।

মা'র কথা তোর মনে পড়ে খোকা ? চেহারা মনে করতে পারিস ? আমি কিন্তু পারি না, স্বপ্নেও দেখি না বহুদিন। খুব দেখতে ইচ্ছে হয়। জানি মা'র প্রতি তোদের সবার একটা অভিমান আছে। তোদের ধারণা মা কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। হয়তো সত্যি, হয়তো সত্যি নয়। ছোট খালা একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, শিরিন, তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের একটুও দেখতে পার না!

মা জবাবে হেসে বলেছেন, এদের এমন করে তৈরি করে দিচ্ছি যাতে ভালোবাসার অভাবে কখনো কষ্ট না পায়।

মা বড় দুঃখী ছিলরে খোকা! মেয়েমানুষের দুঃখ তো বলে বেড়াবার নয়, ঢেকে রাখবার, চিরদিন তিনি তাই রেখে গেছেন। তোরা জানতেও পারিসনি। এত গান পাগলা মা তেইশ বছরে একটি গানও গাইল না। প্রথম স্বামীকে ভুলতে পারেনি। যদি পারত তবে জানত সুখের স্বাদ কত তীব্র। যাই হোক, যা চলে গেছে তা গেছে। যারা বেঁচে আছে তাদের কথাই ভাবি।

কিছুক্ষণ আগে নিচে ঘণ্টা দিয়েছে, খেতে যাবার সংকেত। আমার খাবার ঘরেই দিয়ে যায়। তবু নিচে গিয়ে একবার দেখে আসি। আজ আর খাব না। শরীরটা ভালো নেই। একটু যেন জ্বর জ্বর লাগছে। মাঝে মাঝে অসুখ হলে মন্দ লাগে না। অসুখ হলেই অনেক ধরনের চিন্তা আসে যেগুলি অন্যসময় আসে না।

হোস্টেলের খুব কাছ দিয়ে নদী বয়ে গিয়েছে। সুন্দর নাম। এই মুহূর্তে মনে আসছে না। রাতেরবেলা সার্চ লাইট ফেলে ফেলে লঞ্চ যায়, বেশ লাগে দেখতে। দেখতে পাচ্ছি লঞ্চ যাচ্ছে আলো ফেলে। তোরা ঢাকায় থেকে তো এসব দেখবি না।

আজ এই পর্যন্ত থাক। শরীরের দিকে লক্ষ রাখিস। বাজে সিগারেট টানবি না। কম খাবি, কিন্তু দামি হতে হবে। টাকার ভাবনা তো নেই। ছোটবেলা চুমু খেতাম তোর কপালে, এখন তো বড় হয়ে গেছিস। তবু দূর থেকে চুমু খাচ্ছি।

তোর রাবেয়া আপা

ঠিকানা
সুপারিনটেনডেন্ট, গার্লস হোস্টেল
আদর্শ হাই স্কুল
পোস্ট কলসহাটি
জেলা ময়মনসিংহ

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় প্রায়ই। ছাড়া ছাড়া অর্থহীন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ জেগে উঠি। পরিচিত বিছানায় শুয়ে আছি এই ধারণা মনে আসতেও সময় লাগে। মাথার কাছের জানালা মনে হয় সরে গিয়েছে পায়ের কাছে। তৃষ্ণা বোধ হয়। টেবিলে ঢাকা দেয়া পানির গ্লাস। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেই হয় অথচ ইচ্ছে হয় না।

কোনো কোনো রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। সারা ঘর নরম আলোয় ভাসতে থাকে। ভাবি, একা একা বেড়ালে বেশ হতো। আবার চাদর মুড়ি দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। যেন বাইরের উথাল পাথাল চাঁদের আলোর সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে। একঘেয়ে কান্নার সুরের মতো সে শব্দ।

আমি কান পেতে শুনি। বাতাসে জাম গাছের পাতার সর সর শব্দ হয়। সব মিলিয়ে হৃদয় হা হা করে উঠে। আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতায় কী বিপুল বিষণ্নতাই না অনুভব করি। জানালার ওপাশের অন্ধকার থেকে আমার সঙ্গীরা আমায় ডাকে। একদিন যাদের সঙ্গ পেয়ে আজ নিঃসঙ্গতায় ডুবছি।

অচিনপুর

মরবার পর কী হয় ?

আট-ন বছর বয়সে এর উত্তর জানবার ইচ্ছে হলো। কোনো গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে চিন্তার বয়স সেটি ছিল না, কিন্তু সত্যি সত্যি সেই সময়ে আমি মৃত্যুরহস্য নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা নবু মামাকে নিয়ে গা ধুতে গিয়েছি পুকুরে। চারিদিক ঝাপসা করে অন্ধকার নামছে। এমন সময়ে হঠাৎ করেই আমার জানবার ইচ্ছে হলো, মরবার পর কী হয় ? আমি ফিসফিস করে ডাকলাম, নবু মামা, নবু মামা।

নবু মামা সাঁতরে মাঝপুকুরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন না। আমি আবার ডাকলাম, নবু মামা, রাত হয়ে যাচ্ছে।

আর একটু।

ভয় লাগছে আমার।

একা একা পাড়ে বসে থাকতে সত্যি আমার ভয় লাগছিল। নবু মামা উঠে আসতেই বললাম, মরবার পর কী হয় মামা ? নবু মামা রেগে গিয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা কী বাজে কথা বলিস ? নবু মামা ভীষণ ভীতু ছিলেন, আমার কথা শুনে তাঁর ভয় ধরে গেল। সে সন্ধ্যায় দু'জনে চুপি চুপি ফিরে চলেছি। রইসুদ্দিন চাচার কবরের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখি, সেখানে কে দু'টি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেখে গেছে। দু'টি লিকলিকে ধোঁয়ার শিখা উড়ছে সেখান থেকে। ভয় পেয়ে নবু মামা আমার হাত চেপে ধরলেন।

শৈশবের এই অতি সামান্য ঘটনাটি আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। পরিণত বয়সে এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ছোট একটি ছেলে মৃত্যুর কথা মনে করে একা কষ্ট পাচ্ছে— এ ভাবতেও আমার খারাপ লাগত।

সত্যি তো, সামান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে ভাববার মতো মানসিক প্রস্তুতিও যার নেই, সে কেন কবরে ধূপের শিখা দেখে আবেগে টলমল করবে ? কেন সে একা একা চলে যাবে সোনাখালি ? সোনাখালি খালের বাঁধানো পুলের উপর বসে থাকতে থাকতে এক সময় তার কাঁদতে ইচ্ছে হবে ?

আসলে আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত পরিবেশে। প্রকাণ্ড একটি বাড়ির অগুনতি রহস্যময় কোঠা। বাড়ির পেছনে জড়াজড়ি করা বাঁশবন। দিনমানেই শেয়াল ডাকছে চারিদিকে। সন্ধ্যা হব-হব সময়ে বাঁশবনের এখানে-ওখানে জ্বলে উঠছে ভূতের আগুন। দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়তে শুরু করেছে কানাবিবি! সমস্তই অবিমিশ্র ভয়ের।

আবছা অন্ধকারে কানাবিবির দুলে দুলে কোরান-পাঠ শুনলেই বুকের ভেতর ধক্ করে উঠত। নানিজান বলতেন, 'কানার কাছে এখন কেউ যেও না গো।' শুধু

কানাবিবির কাছেই নয়, মোহরের মা পা ধোয়াতে এসে বলত, 'পুলাপান কুয়াতলায় কেউ যেও না।' কুয়াতলায় সন্ধ্যাবেলায় কেউ যেতাম না। সেখানে খুব একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। ওখানে সন্ধ্যাবেলায় যেতে নেই।

চারিদিকেই ভয়ের আবহাওয়া। নানিজানের মেজাজ ভালো থাকলে গল্প ফাঁদতেন। সেও ভূতের গল্প হাট থেকে শোল মাছ কিনে ফিরছেন তাঁর চাচা। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ছেড়ে বাড়ির পথ ধরেছেন, ওমনি পেছন থেকে নাকী সুরে কে চেঁচিয়ে উঠল, মাঁছটা আঁমারে দিঁয়ে যাঁ।

রাতেরবেলা ঘুমিয়ে-পড়া ছেলেমেয়েদের জাগিয়ে এনে ভাত খাওয়াত মোহরের মা। লম্বা পাটিতে সারি সারি থালা পড়ত। ঘুম-ঘুম চোখে ভাত মাখাচ্ছি, এমন সময় হয়তো ঝুপ করে শব্দ হলো বাড়ির পেছনে। মোহরের মা খসখসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, পেতত্নি নাকি ? পেতত্নি নাকি রে ?

নবু মামা প্রায় আমার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে চাপা সুরে বলত, ভয় পাচ্ছি, ও মোহরের মা, আমার ভয় লাগছে।

নানাজানের সেই প্রাচীন বাড়িতে যা ছিল, সমস্তই রক্ত জমাট-করা ভয়ের। কানাবিবি তার একটিমাত্র তীক্ষ্ণ চোখে কেমন করেই না তাকাত আমাদের দিকে! নবু মামা বলত, ঐ বুড়ি, আমার দিকে তাকালে কঞ্চি দিয়ে চোখ গেলে দেঁব। কানাবিবি কিছু না বলে ফ্যালফ্যালিয়ে হাসত। মাঝেমধ্যে বলত, পুলাপান ডরাও কেন ? আমি কিতা ? পেত্নী ? পেত্নী না হয়েও সে আমাদের কাছে অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল। শুধু আমরা নই, বড়রাও তাকে সমীহ করে চলতেন। আর সমীহ করবে নাই-বা কেন ? বড় নানিজানের নিজের মুখ থেকে শোনা গল্প।

তাঁর বাপের দেশের মেয়ে কানাবিবি। বিয়ের সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ফাই-ফরমাস খাটে। হেসে-খেলে বেড়ায়। একদিন দুপুরে সে পেটের ব্যথায় মরোমরো। কিছুতেই কিছু হয় না, এখন যায় তখন যায় অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়েছেন আশু কবিরাজকে আনতে। আশু কবিরাজ এসে দেখে সব শেষ। বরফের মতো ঠান্ডা শরীর। খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁশ কাটতে লোক গেল। নানিজান মড়ার মাথার কাছে বসে কোরান পড়তে লাগলেন। অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তখনই। আমার নানিজান ভয়ে ফিট হয়ে গেলেন। নানাজান আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন, ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ! কারণ কানাবিবি সে-সময়ে ভালো মানুষের মতো উঠে বসে পানি খেতে চাচ্ছে। এরপর থেকে স্বভাব-চরিত্রে আমূল পরিবর্তন হলো তার। দিনরাত নামাজ রোজা। আমরা যখন কিছু কিছু জিনিস বুঝতে শিখেছি তখন থেকে দেখছি, সে পাড়ার মেয়েদের তাবিজ-কবজ দিচ্ছে। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই দোতলার বারান্দায় কুপি জ্বালিয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়ছে। ভয় তাকে পাবে না কেন ?

এ তো গেল রাতের ব্যাপার। দিনেরবেলাও কি নিস্তার আছে? গোল্লাছুট খেলতে গিয়ে যদি ভুলে কখনো পুবের ঘরের কাছাকাছি চলে গিয়েছি, ওমনি রহমত মিয়া বাঘের মতো গর্জন করে উঠেছে, খাইয়া ফেলুম। ঐ পোলা, কাঁচা খাইয়া ফেলামু। কচ কচ কচ। ভয়ানক জোয়ান একটা পুরুষ শিকল দিয়ে বাঁধা। ব্যাপারটাই ভয়াবহ! বদ্ধ পাগল ছিল রহমত মিয়া, নানাজানের নৌকার মাঝি। তিনি রহমতকে স্নেহ করতেন খুব, সারিয়ে তুলতে চেষ্টাও করেছিলেন। লাভ হয়নি।

এ সমস্ত মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আমার শৈশব। গাঢ় রহস্যের মতো ঘিরে রয়েছে আমার চারিদিক। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অল্প বয়সের ভয়কাতর একটি ছেলে তার নিত্যসঙ্গী নবু মামার হাত ধরে ঘুমোতে যাচ্ছে দোতলার ঘরে। নবু মামা বলছেন, তুই ভিতরের জানালা দু'টি বন্ধ করে আয়, আমি দাঁড়াচ্ছি বাইরে। আমি বলছি, আমার ভয় করছে, আপনিও আসেন। মামা মুখ ভেংচে বলছেন, এতেই ভয় ধরে গেল! টেবিলে রাখা হারিকেন থেকে আবছা আলো আসছে। আমি আর নবু মামা কুকুরকুণ্ডলী হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। নবু মামা শুতে-না-শুতেই ঘুম। একা একা ভয়ে আমার কান্না আসছে। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে হৈচৈ শোনা গেল। শুনলাম, খড়ম পায়ে খটখট করে কে যেন এদিকে আসছে। মোহরের মা মিহি সুরে কাঁদছে। আমি অনেকক্ষণ সেই কান্না শুনে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। জানতেও পারি নি সে-রাতে আমার মা মারা গিয়েছিলেন।

সে-রাতে আমার ঘুম ভেঙেছিল ফজরের নামাজের সময়। জেগে দেখি বাদশা মামা চুপচাপ বসে আছেন চেয়ারে। আমাকে বললেন, আর ঘুমিয়ে কী করবি, আয় বেড়াতে যাই। আমরা সোনাখালির খাল পর্যন্ত চলে গেলাম। সেখানে পাকা পুলের উপর দু'জনে বসে বসে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সে-বার। কুয়াশার চাদরে গাছপালা ঢাকা। সূর্যের আলো পড়ে শিশিরভেজা পাতা চকচক করছে। কেমন অচেনা লাগছে সবকিছু। মামা অন্যমনস্কভাবে বললেন, রঞ্জু, আজ তোর খুব দুঃখের দিন। দুঃখের দিনে কী করতে হয়, জানিস?

না।

হা হা করে হাসতে হয়। হাসলেই আল্লা বলেন, একে দুঃখ দিয়ে কোনো লাভ নেই। একে সুখ দিতে হবে। বুঝেছিস?

বুঝেছি।

বেশ, তাহলে হাসি দে আমার সঙ্গে।

এই বলে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বাদশা মামার খুব মোটা গলা ছিল। তাঁর হাসিতে চারিদিক গমগম করতে লাগল। আমিও তাঁর সঙ্গে গলা মেলালাম। বাদশা মামা বললেন, আজ আর বাসায় ফিরে কাজ নেই, চল শ্রীপুর যাই। সেখানে আজ যাত্রা হবে। আমি মহাখুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম।

কত দিনকার কথা, কিন্তু সব যেন চোখের সামনে ভাসছে।

২

বাদশা মামার সঙ্গে আমার কখনো অন্তরঙ্গতা হয় নি। অথচ আমরা একই ঘরে থাকতাম। দোতলার সবচেয়ে দক্ষিণের ঘরে দুটো খাটের একটিতে বাদশা মামা, অন্যটিতে আমি আর নবু মামা। সারা দিন বাদশা মামার দেখা নেই। রাতে কখন যে ফিরতেন, তা কোনো দিনই জানিনি। ঘুম ভাঙার আগে আগেই চলে গেছেন। কোনো কোনো রাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছি, গুনগুন করে কী পড়ছেন। যেদিন মেজাজ ভালো থাকত, সেদিন খুশি খুশি গলায় বলতেন, রঞ্জু, শোন তো দেখি, কেমন হচ্ছে বলবি।

আমি হঠাৎ ঘুমভাঙা অবস্থায় কী হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না। মামা দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলা শুরু করেছেন—

এ রাজ্যপাট যায় যাক,
কোনো ক্ষতি নাই
কিন্তু ত্রিদিব তুমি
কোথা যাবে ?

ভরাট গলা ছিল তাঁর, সমস্ত ঘর কেঁপে কেঁপে উঠত। মাঝপথে থেমে গিয়ে বলতেন, দাঁড়া, পোশাকটা পরে নিই, পোশাক ছাড়া ভালো হয় না। তোল, নবুকে ঘুম থেকে তোল। নবু মামার ঘুম ভাঙালেই প্রথম কিছুক্ষণ নাকী সুরে কাঁদত। বাদশা মামা বিরক্ত হয়ে বলতেন, গাধা! দেখ না কী করছি। তারপর দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি বাদশা মামার দিকে। আলমারি খুলে তিনি মুকুট বের করেছেন, জরিদার পোশাক পরেছেন। তারপর একা একাই অভিনয় করে চলেছেন। আমরা দুই শিশু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি।

বাদশা মামা প্রথম থেকেই আমাদের কাছে দূরের মানুষ। যিনি জরির পোশাক পরে রাতদুপুরে আমাদের অভিনয় দেখান, তিনি কাছের মানুষ হতে পারেন না। বাড়ির মানুষের কাছেও তিনি দলছাড়া। খুব ছোটবেলায় নানাজান তাঁকে একবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। যে-ছেলে স্কুল পালিয়ে যাত্রাদলে চলে যায়, নানাজানের মতো লোক তাকে ঘরে রাখতে পারেন না। খবর শুনে ছোট নানিজান খাওয়া-দাওয়া ছাড়লেন। মরোমরো অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়ে বাদশা মামাকে ফিরিয়ে আনলেন। সেই থেকে তিনি বাদশা মামাকে ঘাঁটান না। বাদশা মামাও আছেন আপন মনে।

বাদশা মামা আমার শিশুচিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। শিল্পীরা সব সময়ই শিশুদের আকর্ষণ করে। হয়তো শিশুরাই প্রতিভার খবর পায় সবার আগে। বাদশা মামা দারুণ অসুখী ছিলেন। যে সামাজিক পদমর্যাদা তাঁর ছিল, তা নিয়ে যাত্রাদলের মানুষদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন না। অথচ তাঁর চিন্তা-ভাবনার সমস্ত জগৎ যাত্রাদলকে ঘিরে। মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখেছি বারান্দায় চেয়ার পেতে

চুপচাপ বসে আছেন। যদি গিয়ে বলেছি, মামা, কী করেন?

কিছু না।

সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়েছে, মামা তেমনি বসেই আছেন। কেউ যদি গিয়ে বলেছে, বাদশা, তোর কী হয়েছে রে?

কিছু না।

মাঝে মাঝেই এরকম হতো তাঁর। নানাজান তখন ক্ষেপে যেতেন। ছোট নানিজানকে ডেকে বলতেন, ভাং ধরেছে নাকি? শক্ত মুগুর দিয়ে পেটালে ঠিক হয়, বুঁঝেছ? নানিজান মিনমিন করে কি কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করেন। তারপর এক সময় দেখা যায়, তিনি বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন।

নানাজানকে সবাই ভয় করতাম আমরা। দোতলা থেকে একতলায় তিনি নেমে এলে একতলা নীরব হয়ে যেত। খুব কমবয়সী শিশু, যাদের এখনো বিচারবুদ্ধিও হয়নি, তাঁরাও নানাজানকে দেখলে ফ্যাকাসে হয়ে যেত। ভয়টাও বহুলাংশে সংক্রামক।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙত নানাজানের কোরানপাঠের শব্দে। মোটা গলা, টেনে টেনে একটু অনুনাসিক সুরে অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। তখন মাথায় থাকত লাল রঙের ঝুঁটিওয়ালা একটা ফেজ টুপি। খালি গা, পরনে সিল্কের ধবধবে সাদা লুঙ্গি। হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ঝুঁকে ঝুঁকে অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতেন। ছোট নানিজান এই সময়ে জামবাটিতে বড় এক বাটি চা তৈরি করে নিয়ে যেতেন। নানাজান চুকচুক করে অনেকটা সময় নিয়ে চা খেতেন। তারপর নিজের হাতে হাঁসের খোঁয়াড় খুলে দিতেন। পাশেই মুরগির খোঁয়াড়, সেটিতে হাতও দিতেন না। হাঁসগুলি ছাড়া পেয়ে দৌড়ে যেতো পুকুরের দিকে। তিনিও যেতেন পিছু পিছু। সমস্তই রুটিন-বাঁধা, এক চুলও এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

কিছু কিছু মানুষ ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়ে, আবার কারো কারো কাছে ভাগ্য আপনি এসে ধরা দেয়। নানাজান এ দু'টির কোনোটির মধ্যেই পড়েন না। পূর্বপুরুষের গড়ে যাওয়া সম্পদ ও সম্মানে লালিত হয়েছেন। কিন্তু অসংযমী হননি। অহঙ্কার ছিল খুব, সে-অহঙ্কার প্রকাশ পেত বিনয়ে। হয়তো কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে বেড়াতে, নানাজান ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বারবার বলছেন, গরিবের ঘরে এসেছেন, কী দিয়ে খেদমত করি, বড় সরমিন্দায় পড়লাম, বড় কষ্ট হলো আপনার। ওরে তামুক আন, আর খাসি ধর দেখি একটা ভালো দেখে। যিনি এসেছেন, আয়োজনের বাহুল্য দেখে তিনি লজ্জায় পড়ে যেতেন।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের দেখা চিত্র। স্মৃতি থেকে লিখছি। সে-স্মৃতিকে বিশ্বাস করা চলে।

আমরা যারা ছেলে-ছোকড়ার দলে, তাদের প্রতি নানাজানের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। একা একা থাকতেন সারাক্ষণই। বড় নানিজান তো কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থই ছিলেন। তিনি দোতলা থেকে নামতেন কালেভদ্রে। ছোট নানিজানও যে কখনো হালকা সুরে নানাজানের সঙ্গে আলাপ করছেন, এমন দেখিনি কখনো। খালারাও আমাদের মতো দূরে দূরে থাকতেন। ক্ষমতাবান লোকরা সব সময়ই এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে যায়।

কেন জানি না, আমার নিজের খুব ইচ্ছে হতো, নানাজানের সঙ্গে ভাব করি। ঘুমাতে যাবার আগে কতদিন ভেবেছি, নানাজান যেন এসে আমাকে বলছেন— 'আয় রঞ্জু, বেড়াতে যাই।' আমি তাঁর হাত ধরে চলেছি বেড়াতে। কত দিন ভেবেছি, আজ ঘুম থেকে উঠেই নানাজানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি। ঘুম ভাঙতেই তাড়া পড়েছে— ওজু করে পড়তে যা, ওজু করে পড়তে যা। মৌলভি সাহেব বসে আছেন বাইরের ঘরে। আমরা সবাই আবার কায়দা হাতে করে একে একে হাজির হচ্ছি। মেয়েরা ডান পাশে, ছেলেরা বাঁ পাশে। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠছে, আলিফ দুই পেশ উন, বে দুই পেশ বুন। নাশতা তৈরি হওয়ামাত্র আরবি পড়া শেষ। তারপর ইংরেজি, বাংলা আর অঙ্কের পড়া। পড়াতে আসতেন রাম মাস্টার। ভারি ভালো মাস্টার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। নবু মামা ছাড়া বানিয়েছিলেন—

রাম মাস্টার বুড়া
এক পা তার খোঁড়া।

স্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত পড়াতেন তিনি। তাঁর কাছে পড়ত শুধু ছেলেরাই। মেয়েদের আরবি ছাড়া অন্য কিছু পড়বার প্রয়োজন ছিল না। তারা ঘরের কাজ করত, জরি দিয়ে লতাপাতা ফুল বানাত, বালিশের ওয়াড়ে নকশা তুলে লিখত— 'ভুলো না আমায়।' রাম মাস্টার চলে যেতে যেতে স্কুলের বেলা হয়ে যেত। স্কুল শেষ হয়ে গেলে তো খেলারই পাট। সূর্য ডুবে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চলত হৈহৈ। দম ফেলার সময় নেই। এর মধ্যেই লিলি এসে আমাকে নিয়ে যেত বাড়ির ভেতর। সে নিজেকে সব সময় ভাবত আমার একজন অভিভাবক। সে যে আমার বড় বোন এবং নানাজানের এই প্রকাণ্ড বাড়িতে আমিই যে তার সবচেয়ে নিকটতম জন, তা জানাতে তার ভারি আগ্রহ ছিল।

শাড়ি-পরা হালকা-পাতলা শরীর কোনো ফাঁকে আমার নজরে পড়ে গেলেই মন খারাপ হয়ে যেত। অবধারিতভাবে সে হাত ইশারা করে আমায় ডাকবে। ফিসফিস করে বলবে, কাল সবাই দু'খান করে মাছ ভাজা খেয়েছে, আর তুই যে মোটে একটা নিলি?

একটাই তো দিয়েছে আমাকে।

বোকা কোথাকার! তুই চাইতে পারলি না? আর দুধ দেবার সময় বলতে পারিস

না, আরেক হাতা দুধ দাও মোহরের মা ?

দুধ ভালো লাগে না আমার।

ভালো না লাগলে হবে ? স্বাস্থ্য ভালো করতে হবে না ? বেকুব কোথাকার!

এই বলে সে হয়তো কাঁচা-মিঠা গাছের আম এনে দিল আমার জন্য। আবার কোনো দিন হয়তো ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির পেছনে। আগের মতো গলা নেমে গেছে খাদে। ফিসফিস করে বলছে, কী ভাবিস তুই, আমরা কি ফ্যালনা ? বড় নানিজানের সম্পত্তির অংশ পাব না আমরা ? নিশ্চয়ই পাব। বড় নানিজানের মেলা সম্পত্তি। আর আমাদের মা হচ্ছে তার একমাত্র মেয়ে। আমরা দু'জনেই শুধু ওয়ারিসান। বুঝলি ?

হ্যাঁ, বুঝেছি।

কাঁচকলাটা বুঝেছিস। হাঁদার বেহদ্দ তুই। ছি ছি, এতটুকু বুদ্ধিও নেই। নে, এটা রাখ তোর কাছে।

তাকিয়ে দেখলাম, চকচকে সিকি একটা।

কই পেয়েছ ?

আমার ছিল, বলেই লিলি আবার ফিসফিস করে বলল, দেখিস, আবার গাধার মতো সবাইকে বলে বেড়াবি না।

না, বলব না।

লিলির ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, পয়সাটা অন্যভাবে যোগাড় করেছে সে। আমরা দু'ভাই-বোন কখনো হাতে পয়সা পেয়েছি, এমন মনে পড়ে না। অল্প বয়সে স্নেহটাকে বন্ধন মনে হতো। না চাইতেই যা পাওয়া যায় তা তো সব সময়ই মূল্যহীন।

লিলিকে ভালো লাগত কালেভদ্রে। যেদিন সে খেয়ালের বসে সামান্য সাজ করে, লজ্জা মেশানো গলায় আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে যেত, সেদিন তাকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবাসতাম। কিংবা কে জানে অল্প বয়সেই হয়তো করুণা করতে শিখে গিয়েছিলাম। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত্ করে নাক মুখ অল্প লাল করে বলত— আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, তুই থাকবি আমার সঙ্গে।

কবে বিয়ে ?

হবে শিগগির।

তারপরই যেন নেহায়েত একটা কথার কথা, এমনিভাবে বলে বসত, দেখ তো রঞ্জু, শাড়িতে আমাকে কেমন মানায়।

ভালো।

কিন্তু আমার নাকটা যে একটু থ্যাবড়া।

এ বাড়ির কাউকেই লিলি দেখতে পারত না। ভেবে পাই না কেমন করে এত হিংসা পুষে সে বড় হয়েছে। আমি ছাড়া আর একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর খাতির ছিল। তিনি আমাদের বড় নানিজান। বড় নানিজান থাকতেন দোতলায় বাঁদিকের সবচেয়ে শেষের ঘরটায়। অন্ধকার ছোট একটি কুঠুরি। জানালার সামান্য যে ফাঁক দিয়ে আলো-বাতাস আসে, তাও গাবগাছের ঝাঁকড়া ডালপালা অন্ধকার করে রেখেছে। আলো-বাতাসহীন সেই অল্পপরিসর ঘরে বড় নানিজান রাত-দিন বসে আছেন। দেখে মনে হবে নানাজানের দেড় গুণ বেশি বয়স। মাথায় সমস্ত চুল পেকে ধবধব করছে। দাঁত পড়ে গাল বসে গেছে। নিচের মাড়িতে একটিমাত্র নোংরা হলুদ দাঁত। মাঝেমধ্যে তিনি রেলিং ধরে কাঁপা পায়ে নিচে নেমে আসতেন। কী ফুর্তি তখন আমাদের! সবাই ভিড় করেছি তাঁর চারপাশে। নানিজান মস্ত একটি মাটির গামলায় দু'পয়সা দামের হলুদ রঙের হেনরী সাবান গুলে ফেনা তৈরি করেছেন। ফেনা তৈরি হলেই ঢালাও হুকুম— 'মুরগি ধইরা আন।' মুরগি ধরে আনবার জন্য ছোটাছুটি পড়ে যেত আমাদের মধ্যে। সব মুরগি নয়। শুধু ধবধবে সাদা মুরগি ধরে আনবার পালা। নানিজান সেগুলিকে সাবান গোলা পানিতে চুবিয়ে পরিষ্কার করতেন। পাশেই বালতিতে নীল রঙ গোলা থাকত। ধোয়া হয়ে গেলেই রঙে চুবিয়ে ছেড়ে দেয়া। কী তুমুল উত্তেজনা আমাদের মধ্যে!

টগরের সঙ্গে যখন এ গল্প করলাম, সে নিচের ঠোঁট উল্টে দিয়ে বলল, এত মিথ্যে কথাও তোমার আসে? ছিঃ ছিঃ।

মিথ্যে নয় বলে তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না। বড় নানিজানকে নিয়ে কত বিচিত্র সব গল্প আছে। তাঁর ভূতে পাওয়ার গল্পটিও আমি টগরকে শুনিয়েছিলাম।

বড় নানিজানের অভ্যেস ছিল সন্ধ্যাবেলা পুকুরে সাঁতার কেটে নাওয়া। তখন কার্তিক মাস। অল্প অল্প হিম পড়েছে। নানিজান গিয়েছেন অভ্যেস মতো গোসল সারতে। সূর্য ডুবে অন্ধকার হলো, তাঁর ফেরবার নাম নেই। মোহরের মা হারিকেন জ্বালিয়ে পুকুরঘাটে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, কোমর জলে দাঁড়িয়ে তিনি থরথর করে কাঁপছেন। মোহরের মা ভয় পেয়ে বলল, কী হয়েছে গো?

নানিজান অস্পষ্টভাবে টেনে টেনে বললেন, ও মোহরের মা, টেনে তোল আমাকে, আমি উঠতে পারি না, কত চেষ্টা করলাম উঠতে।

টগর বলল, হিস্টিরিয়া ছিল তোমার নানির। ভূত-ফুত কিছু নয়। তোমার বড় নানিজানের ছেলেমেয়ে হয়নি নিশ্চয়ই।

না, হিস্টিরিয়া ছিল না তাঁর। আর ছেলেমেয়ে যে ছিল না তাও নয়। বড় নানিজানের একটিমাত্র মেয়ে ছিল। হাসিনা। সবাই ডাকত হাসনা। তিনি আমার আর লিলির মা।

হাসনা তিন মাসের একটি শিশুকে কোলে করে আর চার বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে এ বাড়িতে এসে উঠেছিল। কোনো একটি বিশেষ ঘটনার কাল্পনিক চিত্র যদি অসংখ্যবার আঁকা যায়, তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন সেই কাল্পনিক চিত্রকেই বাস্তব বলে ভ্রম হয়। আমি মা'র এ বাড়িতে আসার ঘটনাটি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রতিটি ডিটেল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হারিকেন আর কুপি মিলিয়ে পনের-বিশটি বাতি জ্বলছে এখানে-ওখানে। বিল থেকে ধরে আনা মাছের গাদার চারপাশে বসে বউ-ঝিরা মাছ কুটছেন আর হাসি-তামাশা করছেন। হাসনা এলো ঠিক এ সময়ে। অত্যন্ত জেদি ভঙ্গিতে সে উঠোনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখতে পেয়ে সবাই অবাক হয়ে নেমে এলো উঠোনে, খড়ম খটখট করে নানাজান নেমে এলেন দোতলা থেকে। আর হাসনা শুকনো চোখে দেখতে লাগল সবাইকে।

হাসনার বিয়েতে সারা গাঁর দাওয়াত ছিল।

হিন্দুরা মুসলমান-বাড়িতে এখন ইচ্ছে করে মাংস খেতে আসেন, তখন আসতেন না। হিন্দুদের জন্যে ঢালাও মিষ্টির ব্যবস্থা। নামকরা কারিগর রমেশ ঠাকুর বিয়ের দু'দিন আগে বাড়িতে ভিয়েন বসালেন।

আত্মীয়-কুটুম্বের জায়গা হয় না ঘরে, নতুন ঘর উঠল এদিকে-ওদিকে। গাঁয়ের দারোগা খেতে এসে আঁতকে উঠে বলল, করেছেন কী খান সাহেব ? এ যে রাজরাজড়ার ব্যাপার! নানাজান হাসিমুখে বললেন, প্রথম মেয়ের বিয়ে, সবাইকে না বললে খারাপ দেখায়, সবাই আত্মীয়স্বজন।

গ্রামের নিতান্ত গরিব চাষীও মেয়ের বিয়েতে দু'বিঘা জমি বিক্রি করে ফেলে, হালের গরু বেচে দেয়। আর নানাজান তো তখন টাকার উপর শুয়ে।

হাতি আনতে লোক গেল হালুয়াঘাট। সেখানে কালুশেখের দু'টি মাদি হাতি আছে। বন থেকে কাঠের বোঝা টেনে নামায়। বিয়ের আগের রাতে মাহুতকে ঘাড়ে করে হাতি এসে দাঁড়াল। উৎসাহী ছেলেমেয়েরা কলাগাছের পাহাড় বানিয়ে ফেলল উঠোনে। মাহুতের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলার জন্যে কী আগ্রহ সবার! মাহুত সাহেবের কি একটু তামাক ইচ্ছে করবেন ?

হাতির পিঠে চড়ে বর এসে নামল। লোকে লোকারণ্য। ভিড়ের চাপে গেট ভেঙে পড়ে, এমন অবস্থা। জরির মালায় বরের মুখ ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কলমা পড়ানোর আগে জরির মালা সরানো হবে না। সেও রাত একটার আগে নয়। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে বর বন্ধুদের নিয়ে সিগারেট খেতে গেল বাইরে। অমনি হৈহৈ করে উঠল সবাই— দেখেছি! কী রঙ! যেন সাহেবদের রঙ। রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েছে যেন!

লিলিরও বিয়ে হলো এই বাড়িতে। দশ-পনেরজন বন্ধু নিয়ে রোগামতো একটি ছেলে বসে রইল বাইরের ঘরে। নিতান্ত দায়সারা গোছের বিয়ে। ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, এই তো ঢের। তাছাড়া গয়নাটয়নাও তো নেহায়েত কম দেওয়া হয়নি। মায়ের গলার হার, হাতের ছ'গাছা চুড়ি, নানিজান দিলেন কানের দুল, ছোট নানিজান নাম-লেখা আংটি। কবুল বলতে গিয়ে লিলি তবু কেঁদেকেটে অস্থির। নানাজানের প্রবল ধমকের এক ফাঁকে কখন যে কবুল বলেছে তা শুনতেই পেল না কেউ।

ন'মাইল পালকি করে গিয়ে ট্রেন। ট্রেন পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়ে আসব আমি আর নবু মামা। বেডিংপত্তর নিয়ে দু'জন কামলা আগে আগে চলে গিয়েছে। পালকির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি না, বারবার পিছিয়ে পড়ি। নবু মামা বললেন, পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে, আমি জুতা খুলে ফেললাম।

সজনেতলা এসে পালকি থামল। বেহারারা জিরোবে। পান-তামুক খাবে। লিলি পালকির ফাঁক থেকে হাত বাড়িয়ে ডাকল, দুষ্টামি করবি না তো রঞ্জু ?

না।

আমার জন্য কাঁদবি না তো ?

না, কাঁদব না।

কাঁদবি না কী-রে গাধা ? বোনের জন্য না কাঁদলে কার জন্য কাঁদবি ? আমার কি আর কেউ আছে ?

ট্রেন ছেড়ে দিল।

এই বাড়ি ঐ বাড়ি করে ট্রেন দ্রুত সরে যাচ্ছে। নবু মামা কাঁদছেন হু-হু করে। বেহারা এসে বলল, দু'জনে এসে বসেন পালকিতে, ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

লিলিকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এসে আমার বয়স যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল। মনে হলো কিছু কিছু চিরন্তন রহস্য যেন বুঝতে পারছি।

৩

আশ্বিন মাস আসতেই সাজ সাজ পড়ে গেল স্কুলে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। গান আবৃত্তি তো হবেই, সেইসঙ্গে নাটক হবে স্টেজ বেঁধে। 'হিরণ্য রাজা' নাটকের নাম। হিরণ্য রাজার পার্ট করছেন বাদশা মামা। উৎসাহের সীমা নেই আমাদের। খালারাও ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলেন নাটক দেখবার জন্যে। মেয়েদের জন্যে পর্দাঘেরা আলাদা জায়গা করা হয়েছে। এ-বাড়ির মেয়েরা আগে কখনো নাটকফাটক কিছুই দেখেনি। দেখবার শখ খুব। ছোট নানি আর্জি নিয়ে গেলেন নানাজানের কাছে।

এ সব কী দেখবে ? না, না।— বলে প্রথম দিকে প্রবল আপত্তি তুললেও শেষের দিকে তাঁকে কেমন নরম মনে হলো। সুযোগ বুঝে নানিজান বলে চলছেন, এক

দিনের মোটে ব্যাপার। আমোদ-আহ্লাদ তো কিছু করে না।

না— করে না! রাত-দিনই তো আমোদ চলছে। আচ্ছা যাক, পালকি করে যেন যায়।

স্কুলঘরে স্টেজ সাজানো হয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। হারিকেন হাতে নিয়ে গ্রামের লোকজন আসছে কাতারে কাতারে। পর্দায় আড়াল-করা মেয়েদের জায়গায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আমি আর নবু মামা বসেছি মেয়েদের সঙ্গে। ছোট নানি আর দু'খালা চাদর গায়ে চুপচাপ বসে আছেন। নাটক শুরু হতে হতে রাত হয়ে গেল। বাদশা মামা সেজেছেন হিরণ্য রাজা! এমন মহান রাজা— দীন-দুঃখীদের জন্য সমস্ত বিলিয়ে দিচ্ছেন। দুশ্চরিত্র মন্ত্রী ঘোঁট পাকাচ্ছে তলে তলে। রাজা আপনভোলা মানুষ, কিছু জানতেও পারছেন না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছি সবাই। একসময় হিরণ্য রাজা মনের দুঃখে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। রানীও চলেছেন তাঁর পিছু পিছু। নানিজান চমকে বললেন, মেয়ে কোত্থেকে এলো! কার মেয়ে ?

ও হচ্ছে হারু দাদা, মেয়ে সেজেছে।

ওমা, হারু নাকি!

নানিজানের চোখে আর পলক পড়ে না। বিবেকের পার্ট করল আজমল। খালারা কাঁদতে কাঁদতে চাদর ভিজিয়ে ফেলল। শেষ দৃশ্যে হিরণ্য রাজা মন্ত্রীকে বলছেন—

এই রাজ্য তুমি লও ভাই। কাজ নাই রাজ্যপাটে
আমি বনবাসে যাব।
সেইখানে শান্তি অপার।

ছোট খালা বললেন, বেকুবটা মন্ত্রীকে মেরে ফেলে না কেন ?

মন্ত্রী বলছে, দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক রাজা, বৃথা তর্কে কোনো ফল নাই। ঝনঝন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। নবু মামা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। নানিজান পেছনে থেকে চেঁচাচ্ছেন ও নবু বস, দেখতে পাচ্ছি না। বসে পড়।

কী তীব্র উত্তেজনা! রাজার মৃত্যুতে সবার চোখে জল। বাদশা মামার জয়জয়কার। কী পার্টটাই না করলেন!

নানাজানও যে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখবেন, তা কেউ ভাবিনি। পালকিতে খালারা উঠতে যাবে, এমন সময় তিনি এসে হাজির। বাদশা তো বড় ভালো করেছে।— এই বলে পালকিতে উঠবার তাড়া দিয়ে তিনি চলে গেলেন হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ি। সেখানে তাঁর রাতের দাওয়াত।

বাড়ি যেয়ে দেখি মেহমানে বাড়ি ভর্তি, নান্দিপুর থেকে নানাজানের ফুপাতো বোন এসেছেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। সকাল সকালই পৌঁছতেন, নৌকার দাঁড় ভেঙে

যাওয়ায় দেরি হয়ে গেছে। আমি আর নবু মামা অবাক হয়ে গেলাম মেহমানদের মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর একটি মেয়েকে দেখে। নানাজানের ফুপাতো বোনের বড় মেয়ে। ডাকনাম এলাচি। এমন সুন্দরও মানুষ হয়!

দু'মাসের ভেতর এলাচির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বাদশা মামার। আপাত কার্যকারণ ছাড়াই যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটে তা-ই কেমন করে পরবর্তী সময়ে মানুষের সমস্ত জীবন বদলে দেয়, ভাবতে অবাক লাগে।

সে-রাতে নাটক দেখে সবাই বাদশা মামার উপর মহা প্রসন্ন ছিলেন। বাড়ি এসে দেখেন, ফুলের মতো একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাদশার সঙ্গে এর বিয়ে হলে কেমন হয় ? এই ভাবনা চকিতে খেলে গেল সবার মনে। এলাচি স্থায়ীভাবে নানাজানের বাড়িতে উঠে এলেন। নাম হয়ে গেল লালবউ, আমি ডাকতাম লাল মামি, নবু মামা ডাকত লাল ভাবি। টকটকে বর্ণ, পাকা ডালিমের মতো গাল। আর কী নামেই-বা ডাকা যায় ?

নবু মামা এবং আমি দু'জনে একই সঙ্গে লাল মামির প্রেমে পড়ে গেলাম। সদা ঘুরঘুর করি, একটু যদি ফুট-ফরমাস করতে দেন এই আশায়। লাল মামি কাকে বেশি খাতির করেন, আমাকে না নবু মামাকে— এই নিয়ে ঝগড়া হয়ে যায় দু'জনের। স্কুলে যাবার পথে বই-খাতা নামিয়ে হয় হাতাহাতি।

লাল মামির বরই খাবার ইচ্ছে হয়েছে, খেলা বন্ধ করে দু'জনেই ছুটেছি ইন্দু সাহার বাড়ি। ইন্দু সাহার বাড়িতে দু'টি বরই গাছ, মিষ্টি যেন গুড়। লাল মামির ইচ্ছে হয়েছে কামরাঙ্গা খাবেন, ঝাল লঙ্কা মাখিয়ে। বাড়ির পেছনে বিস্তৃত বন। এখানে-ওখানে গাছ আছে লুকিয়ে। দু'জনেই গেছি বনে।

মেয়েরা খুব সহজেই ভালোবাসা বুঝতে পারে। লাল মামি আমাদের দু'জনকেই বুঝে ফেললেন। পোষা বেড়ালের মতো আমরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই। মোহরের মা বলে, পুলা দুইটা মাইয়া স্বভাবের, এসব ভালো না গো।

আমি আর নবু মামা তখন নির্বাসিত হয়েছি পাশের ঘরে। কতটুকুই-বা দূরে ? লাল মামি হাসছেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি। লাল মামি বলছেন, উঁহু চুল ছিঁড়ে গেল। আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। লাল মামি যদি কখনো বলেছেন, এই যা, আজ খাওয়ার পানি আনি নাই, ওমনি নবু মামা তড়াক করে লাফিয়ে পড়েছে বিছানা ছেড়ে, ভাবি, পানি নিয়ে আসছি আমি।

একঘেয়ে কোনো আকর্ষণই আকর্ষণ থাকে না। মায়ের প্রতি মানুষের অন্ধ ভালোবাসাও ফিকে হয়ে আসে একঘেয়েমির জন্যেই। ভাই-বোনের ভালোবাসার ধরনও বদলাতে থাকে। লাল মামির প্রতি আমাদের ভালোবাসা ফিকে হওয়ার কোনো ভয় ছিল না। তাঁর মতো বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে আমি পরবর্তী জীবনে আর একটিমাত্র দেখেছিলাম।

যে-কথা বলছিলাম— লাল মামি আমাদের বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করলেন। হয়তো আমি আর নবু মামা দু'জনে বসে আছি তাঁর ঘরে। মামি হুকুম করলেন, নবু, দরজা বন্ধ করে দে। খোল, এবার আলমারি খোল। রাজার পোশাকটা বের কর তো।

আমি আঁতকে উঠে বলেছি, বাদশা মামা মেরে ফেলবে।

ঠোঁট উল্টে মামি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করছেন, নে তুই, এই মুকুটটা পরে ফেল। নবু, তুই কী সাজবি, সন্ন্যাসী ?

নবু মামা বললেন, তুমি কী সাজবে আগে বলো ?

আমি রানী সাজব।

তাহলে আমি রাজা সাজব।

ততক্ষণে আমি ঢলঢলে মুকুটটা মাথায় পরে ফেলেছি। তারস্বরে চেঁচাচ্ছি, না, আমি রাজা সাজব।

মামি বললেন, যুদ্ধ হোক দু'জনার মধ্যে। যে জিতবে, সে-ই রাজা। কথা শেষ না হতেই নবু মামা ঝাঁপিয়ে পড়েন আমার উপর। দু'জনে ধুলোমাখা মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে থাকি। যেন এই যুদ্ধে জীবনমরণ নির্ভর করছে। আল্লাহ্ জানেন, নবু মামা এই লিকলিকে শরীরে এত জোর পান কী করে!

জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে দীর্ঘ সময় লাগে। মুখে নখের রক্তাভ আঁচড়ে, ধূলিধূসরিত শার্ট নিয়ে যখন যুদ্ধজয়ী রাজা দাঁড়ান, তখন মামি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেন, আজ আর না, আজ থাক, যা তোরা আমার জন্য তেঁতুল নিয়ে আয়।

বল তো তুই, টানলে ছোট হয় কোন জিনিস ?

লাল মামি বিছানায় শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে বলেন। হাজার চিন্তাতেও মাথায় সে-জিনিসটার নাম আসে না, টানলে যা ছোট হতে থাকে।

পারলি না ? দেশলাই আন, আমি দেখাচ্ছি।

নবু মামা দৌড়ে দেশলাই নিয়ে আসেন। মামি আমাদের দু'জনের স্তম্ভিত চোখের সামনে ফস করে একটা বার্ডসাই সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকেন। কোন ফাঁকে জানি বাদশা মামার কাছ থেকে যোগাড় করে রেখেছিলেন। আমাদের দু'জনের নিঃশ্বাস পড়ে না। মামি বলেন, এই দেখ, যতই টানছি ততই ছোট হচ্ছে। আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকি মামির দিকে। মামি আধখাওয়া সিগারেট বাড়িয়ে ধরেন আমাদের দিকে, শান্ত গলায় বলেন, নে, এবার তোরা টান। হাঁ করে দেখছিস কী ? কষে টান দে। নইলে তো বাড়িতে বলে দিবি। মামির মুখের গন্ধ দূর করবার জন্যে পানি আনতে হয়, এলাচ দানা আনতে হয়। সেই সঙ্গে মামির প্রতি আমাদের এক নিষিদ্ধ আকর্ষণ জড়ো হতে থাকে।

বাড়ির বউ-ঝিরা লাল মামিকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। এ কেমন ধারা বউ ? লাজ নেই, সহবত নেই।

কোথায় শাশুড়িকে দেখে এক হাত ঘোমটা দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তা নয়— টগবগিয়ে ঘোড়ার মতো চলে যায়। নতুন বউ রান্নাঘরে গিয়ে বসুক না দু'দণ্ড। ননদের হাত থেকে আনাজ নিয়ে জোর করে কুটে দিক, তা নয়— গলায় বাঁশ দিয়ে হাসছে হিহি হিহি। মোহরের মা সময় বুঝে ছড়া কাটে—

রূপ আর কয় দিনের ?
নিমতা ফুল যয়দিনের!

নিমতা ফুল সকালবেলাতেই ফোটে, রোদ একটু তেতে উঠতেই ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। কিন্তু যার জন্যে বলা, সে শুনছে কই ? শাশুড়ি মুখের উপর কিছু বলেন না। লোকে বলবে, বউ-কাটকী শাশুড়ি। কী লজ্জার কথা!

একমাত্র চাবিকাঠি বাদশা মামা। সে-ই তো পারে বউয়ের রীতিনীতি শুধরে দিতে। কিন্তু দেখেশুনে মনে হয়, বউ জাদু করেছে বাদশা মামাকে।

বিয়ের পরপরই বাদশা মামা ভয়ানক বদলে গেছেন। চালচলনে কথাবার্তায় ভয়ানক অস্থিরতা এসেছে। আগে সমস্ত দিন বাইরে পড়ে থাকতেন। রাতেরবেলা খেতে আসতেন, বাড়ির সঙ্গে এইটুকুই যা সংযোগ। এখন সমস্ত দিন বাড়িতে থাকেন। কিন্তু সেও অন্যরকম থাকা। হয়তো মিনিটখানিকের জন্যে লাল মামির ঘরে এসেছেন, চোখেমুখে ব্যস্ততার ভাব। যেন কোনো দরকারি জিনিস খুঁজে পাচ্ছেন না। লাল মামি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কী চাও ?

কিছু না, কিছু না।

বলে মামা বিব্রত ভঙ্গিতে চলে গেলেন। বসে রইলেন বাইরের ঘরে একা একা। আবার হয়তো এলেন কিছুক্ষণের জন্যে, আবার বাইরে গিয়ে বসে থাকা। নানিজান একদিন বললেন, বাদশা, কী হয়েছে রে ?

বাদশা মামা কিছু বললেন না। ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সবাই অবাক হলো, যেদিন বাদশা মামা কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেলেন। নানাজান সেদিনই প্রথম লাল মামির ঘরে এসে ঠান্ডা গলায় বললেন, এলাচি, বাদশার কী হয়েছে ?

লাল মামি চুপ করে রইলেন।

নানাজান বললেন, তোমাদের মিল হয় না কেন ? কী ব্যাপার ?

মামি চুপ করে রইলেন।

নানাজান শান্তগলায় বললেন, এলাচি, সরফরাজ খানের বাড়িতে কোনো বেচাল হয় না। খেয়াল থাকে যেন।

নানাজান বেরিয়ে এসে ছোট নানিজানকে কিছুক্ষণ অকারণে বকে নিচে নেমে গেলেন। সারা দিন বাড়ি থমথম করতে লাগল। সে-সন্ধ্যায় কানাবিবি যখন সাপ খেলানো সুরে কোরান পড়তে শুরু করল, তখন— কেন জানি না— ভয়ে আমার বুক

কাঁপতে লাগল।

তৃতীয় দিনের দিন সকালবেলা বাদশা মামা ফিরে এলেন। ভেতরের বাড়িতে না এসে বাইরের ঘরে বসে রইলেন। নানিজান এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভেতরবাড়িতে। মামা সারাক্ষণই সঙ্কুচিত হয়ে রইলেন। যখন লাল মামির সঙ্গে তাঁর দেখা হলো তিনি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন।

সবচেয়ে অবাক হওয়ার ব্যাপারটি হলো রাতে। বাদশা মামা লাল মামির ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। মামি বললেন, কে ?

বাদশা মামা নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, আমি।

এদিকে পাশের ঘরে আমি আর নবু মামা কান খাড়া করে বসে আছি। কিন্তু আর কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। বাদশা মামা নিচু গলায় বললেন, দরজাটা খোল।

লাল মামি কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। শেষপর্যন্ত বাদশা মামা আমাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমরা তিনজন একখাটে শুয়ে রইলাম। মামা বারবার বলছেন, কাউকে বলবি না, খবরদার।

না।

বললে কান ছিঁড়ে ফেলব দু'জনের, মনে থাকে যেন।

৪

ভাদ্র মাসের প্রথম দিকে নবু মামা অসুখে পড়লেন, কালান্তক ম্যালেরিয়া। হাত-পা শুকিয়ে কাঠি, পেট ফুলে ঢোল। উঠোনে ছেলেমেয়েরা হুল্লোড় করে বেড়ায়, নবু মামা চাদর গায়ে দিয়ে জলচৌকিতে বসে বসে দেখে। ম্যালেরিয়ার তখন খুব ভালো ওষুধ বেরিয়েছে। গাঢ় হলুদ রঙের কুইনাইন ট্যাবলেট। সেকালের এক পয়সার মতো বড়। আস্ত গেলা যায় না, গলায় আটকে থাকে। সপ্তাহে একদিন খাবার নিয়ম, ম্যালেরিয়া হোক আর না-হোক। ওষুধ খেলেই কানে ভোঁ ভোঁ করত, মাথা হালকা হয়ে যেত।

কুইনাইন খেয়ে খেয়ে এক সময় নবু মামার জ্বর সারল। শরীর খুব দুর্বল। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না। মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সারাদিন ঘ্যানঘ্যান করে, এটা খাবে ওটা খাবে। খিটখিটে মেজাজ। যদি কোনো কারণে লাল মামি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন, অমনি তার রাগ হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছ কেন ? আমার দিকে তাকিয়ে হাস। শুনে লাল মামি নিষ্ঠুরের মতো বলে বসেন, তোর দিকে তাকিয়ে হাসব কী রে, তুই তো চামচিকা হয়ে গেছিস ?

নবু মামার আকাশ-ফাটানো কান্না থামাবার জন্যে লাল মামিকে অনেকক্ষণ নবু মামার দিকে তাকিয়ে হাসতে হয়। স্বাস্থ্যের জন্যে নবু মামার স্কুল যাওয়াও বন্ধ। রোগা শরীর পেয়ে বিভিন্ন রোগ ইচ্ছেমতো ছেঁকে ধরছে। আজ সর্দি তো কাল জ্বর, পরশু পেট নেমেছে।

কানাবিবির দেওয়া তাবিজের বোঝা গলায় নিয়ে নবু মামা বেচারার মতো ঘুরে বেড়ায়। রাতেরবেলা বড় জ্বালাতন করে। কিছুক্ষণ পরপর পানি খেতে চায়। পানি খাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার পেচ্ছাবের বেগ হয়। পেচ্ছাব করানোও কি কম হাঙ্গামা ? হ্যারিকেন জ্বালাতে হয়, নবু মামা হাতে নেন একটা টর্চ। আমাকে গিয়ে ডেকে তুলতে হয় নানিজানকে। নানিজান আর আমি বসে থাকি বারান্দায়। নবু মামা টর্চ ফেলে ভয়ে ভয়ে যান। তাতেও রক্ষা নেই, ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছেন, ওটা কী, ঐ যে গেল ?

কিছু না, শেয়াল।

শেয়াল ? তবে ছায়া পড়ল না কেন ?

অন্ধকারে ছায়া পড়বে কী রে হাঁদা ? নানিজান বিরক্ত হয়ে বলেন।

এই হলো নিত্যকার রুটিন।

খাওয়া নিয়েও কি কম হাঙ্গামা ? আজ ইচ্ছে হয়েছে কই মাছ ভাজা খাবেন। কই মাছ যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ। সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

শেষপর্যন্ত পীর-ফকির ধরা হলো। ধর্মনগরের সুফী সাহেবের পানিপড়া আনবার জন্যে আমি আর বাদশা মামা নৌকা করে ধর্মনগর রওনা হলাম। দু'দিনের পথ। উজান ঠেলে যেতে হয়। সঙ্গে চাল-ডাল নিয়ে নিয়েছি। নৌকাতেই খাওয়া-দাওয়া। বাদশা মামা এই দীর্ঘ সময় চুপচাপ কাটালেন। সন্ধ্যার পর নৌকার ছাদে উঠে বসেন। নেমে আসেন অনেক রাতে। সারা দিন শুয়ে শুয়ে ঘুমান। দেখলেই বোঝা যায় ভরসা-হারানো মানুষ। কিন্তু কী জন্যে ভরসা হারিয়েছেন, তা বুঝতে না পেরে আমার খারাপ লাগে।

সপ্তম দিনে ফিরলাম। সুফী সাহেব খুব খাতির-যত্ন করলেন আমাদের। তাঁর অনুরোধে বাড়িতে চারদিন থেকে যেতে হলো। কথা নেই, বার্তা নেই, বাদশা মামা সুফী সাহেবের মুরিদ হয়ে গেলেন। মাথায় সব সময় টুপি, নিয়ম করে নামাজ পড়ছেন। যতই দেখি, ততই অবাক হই।

আমার অবাক হওয়ার আরো কিছু বাকি ছিল। বাড়িতে ফিরে জানলাম, নবু মামা খুলনা জেলার মনোহরদীপুরে চলে যাচ্ছেন। কিছুদিন সেখানে থাকবেন। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা, শরীর ফিরলে চলে যাবেন রাজশাহী। নানাজানের খালাতো ভাই থাকেন সেখানে। সরকারি জরিপ বিভাগের কানুনগো। নবু মামা সেখানে থেকেই পড়াশোনা করবেন। নানাজান নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে তারই আয়োজন চলছে। নবু মামা আগের চেয়েও মিইয়ে গিয়েছেন। আমাকে ধরা-গলায় বললেন, লাল ভাবিকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

আমি ভেবেই পেলাম না একা একা আমি কী করে থাকব। নবু মামা আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাকে ছাড়া একা একা স্কুলে যাচ্ছি, এই দৃশ্য কল্পনা করলেও চোখে পানি এসে যায়। নবু মামার আমার জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই, তার মুখে শুধুই

লাল ভাবির কথা। আমি বললাম, নবু মামা, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

আমি কী করে নিয়ে যাব ? তুই বাবাকে বল।

নানাজানকে বলবার সাহস আমার নেই। আমি লাল মামিকে ধরলাম। মামি তখন বারান্দায় বসে সুঁচ-সুতো নিয়ে কী যেন করছিলেন। আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে সমস্ত খুলে বললাম। চুপ করে তিনি সমস্ত শুনলেন। আমার কথা শেষ হতেই বললেন, যা তো, দৌড়ে তোর ছোট খালার কাছ থেকে একটা সোনামুখী সুঁচ নিয়ে আয়। বলবি আমি চাইছি।

সুঁচ এনে দিয়ে আমার কাতর অনুরোধ জানালাম।

বলবেন তো মামি ? আজই বলতে হবে। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই।

মামি বিরক্ত হয়ে বললেন, কী ঘ্যানঘ্যান করিস, পরের বাড়িতে আছিস যে হুঁস নেই ? ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে বল।

এর কিছুদিন পরই পানসি নৌকা করে নানাজান আর নবু মামা চলে গেলেন। যাবার সময় নবু মামার সে-কী কান্না! কিছুতেই যাবেন না। লাল মামির শাড়ি চেপে ধরেছে। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে— আমি যাব না, যাব না।

লাল মামি শুকনো গলায় বললেন, শাড়ি ছাড়, শাড়ি ধরে চেঁচাচ্ছিস কেন ?

৫

নবু মামা চলে যাবার পর আমার কিছু করবার রইল না। আম-কাঁঠালের ছুটি হয়ে গেছে স্কুলে। সারাদিন বাড়িতে ঘুরে বেড়াই। বিকেলবেলাটা আর কিছুতেই কাটে না। রোদের তাপ একটু কমতেই হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই সোনাখালি। হেঁটে যেতে যেতে কত আজগুবি চিন্তা মনে আসে। যেন কোনো অপরাধ ছাড়াই দেশের রাজা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। হুকুম হয়েছে আমার ফাঁসি হবে। রাজ্যের সমস্ত লোক ফাঁসির মঞ্চের চারদিকে জড়ো হয়েছে। আমি তাকিয়ে দেখি, এদের মধ্যে লাল রঙের পোশাক পরা একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, না, এ ছেলে কোনো দোষ করে নি, এর ফাঁসি হবে না। বলতে বলতে মেয়েটি কেঁদে ফেলেছে। আমি বলছি, না, হোক, আমার ফাঁসি হোক। মেয়েটি অপলকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার মুখের গড়ন অনেকটা লাল মামির মতো।

সোনাখালি পাকাপুলে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম। সেই সময়ে আমার মন থেকে ভূতের ভয় কেটে গিয়েছিল। একেক দিন নিশীথ রাত্রে একা একা ফিরেছি। অন্ধকারে একা ফিরতে ফিরতে কতবার চমকে উঠেছি নাম-না-জানা পাখির ডাকে। কিন্তু ভয় পাইনি কখনো। রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই মোহরের মা ভাত বেড়ে দেয়, নাও, খেয়ে গুষ্টি উদ্ধার কর। এইসব কথা কখনো গায়ে মাখি না।

আমি সে-সময় অনেক বড় দুঃখে ডুবে ছিলাম। ছোটখাট কষ্টের ব্যাপার, যা প্রতিদিন ঘটত, এই নিয়ে সেই কারণেই কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

দিন আর কাটতে চায় না কিছুতেই। স্নেহ, ভালোবাসা ছাড়া কোনো মানুষই বাঁচতে পারে না। আমি সে-কারণেই হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাই। কেন জানি না, অসুখটাই ভালো লাগে। সকাল থেকে সন্ধ্যা শুয়ে শুয়ে ঘুমানো ছাড়া অন্য কাজ নেই। মাঝেমধ্যে বাদশা মামা এসে বসেন। নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা হয়। মামা হয়তো বললেন, বেশি করে দুধ খা, শরীরে জোর হবে।

আচ্ছা মামা, খাব।

পীরপুরে জন্মাষ্টমীর মেলা, যাবি নাকি দেখতে ?

অসুখ সারলে যাব।

মামা থাকেন অল্পক্ষণ। কথা বলেন ছাড়া-ছাড়া ভঙ্গিতে। দেখে শুনে বড় অবাক লাগে। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। গাল বসে গিয়ে কেমন প্রৌঢ় মানুষের মতো দেখায়।

লাল মামি বড় একটা আসেন না। হয়তো দরজার বাইরে থেকে বললেন, রঞ্জুর জ্বর আবার এসেছে নাকি ?

না মামি, জ্বর নেই।

না থাকলেই ভালো। এই বলে তিনি ব্যস্তভাবে চলে যান। তাঁর যাওয়ার পথে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে থাকি। সে-সময়ে লাল মামিকে আমি একই সঙ্গে ভালোবাসি আর ঘৃণাও করি। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এ ধরনের দ্বৈত অনুভূতি— সেই আমার প্রথম। পরবর্তী সময়ে অবশ্যি আরো অনেকের জন্যেই এমন হয়েছে।

ঠিক এ সময়ে আমার সফুরা খালার সঙ্গে অল্পমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা হলো। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবে, এ আমার খুব ছোটবেলাকার বাসনা। তিনি আমার চেয়ে বৎসরখানেকের বড় হবেন। খুব চুপচাপ ধরনের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, তিনি একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছেন বারান্দায়। হাতে একটা লাঠি। মাঝে মাঝে মেঝেতে ঠক করে শব্দ করছেন আর মুখে বলছেন, 'উড়ে গেল পাখি।' প্রথম দিন এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি। তিনি আমাকে দেখতে পাননি, কাজেই তিনি লাঠি হাতে ঠকঠক করতে লাগলেন আর পাখি ওড়াতে লাগলেন। আমি যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, খালা, কী করেন ?

লজ্জায় খালার চোখে পানি এসে গেল। কোনো রকমে বললেন, কিছু না, আমি খেলি।

তার পরও খালাকে এমন অদ্ভুত খেলা খেলতে দেখেছি। লজ্জা পাবেন, এই জন্যে আমি তাঁর সামনে পড়িনি। তাঁর সঙ্গে ভাব করবার আমার খুব ইচ্ছে হতো। কিন্তু তিনি আমাকে দেখলে ভারি লজ্জা পেতেন।

অসুখের সময় প্রায়ই সফুরা খালা এসে দাঁড়াতেন আমার দরজায়। আমি ডাকতাম, খালা, ভেতরে আসেন।

না, আমি এখানেই থাকি।

এই বলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন দরজায়। অনেক রকম কথা হতো তাঁর সাথে। কী ধরনের কথা, তা আজ আর মনে নেই। মনে আছে, খালা সারাক্ষণই মুখ টিপে টিপে হাসতেন।

খালা মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব গল্প করতেন।

একদিন এসে বললেন, কাল রাতে ভারি আশ্চর্য একটি ব্যাপার হয়েছে রঞ্জু! ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখি একটি ফুটফুটে পরী আমার খাটে বসে আছে। আমি তো অবাক। তারপর পরীটি অনেক গল্প করল আমার সঙ্গে। ভোর হয়ে আসছে যখন, তখন সে বলল— আমি যাই। আমি বললাম— ও ভাই পরী, তোমার পাখায় একটু হাত দেব ? সে বলল— দাও না। আমি পরীর পাখায় হাত বুলিয়ে দেখলাম, কী তুলতুলে পাখা। আর সেই থেকে আমার হাতে মিষ্টি গন্ধ। দেখ না শুঁকে।

আমি সফুরা খালার হাত শুঁকতেই বকুল ফুলের গন্ধ পেলাম। খালা হয়তো অনেকক্ষণ বকুল ফুলের মালা হাতে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারই গন্ধ। সফুরা খালা সত্যি ভারি অদ্ভুত মেয়ে ছিল।

একরাতে ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। আমি লিলিকে স্বপ্নে দেখলাম। সে ঠিক আগেকার মতো অভিভাবকসুলভ ভঙ্গি করে বলছে, রঞ্জু, তোর একটুও যত্ন হচ্ছে না এখানে। তুই আমার কাছে চলে আয়।

আমি লিলির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কতদিন হয়েছে সে চলে গেছে। এ দীর্ঘদিনেও তার কথা কেন যে মনে পড়ল না! স্বপ্ন ভেঙে গেলে আমার খুব অবাক লাগল। লিলি যে দেখতে কেমন ছিল, তা পর্যন্ত আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে, তার চিবুকটা লম্বাটে ধরনের ছিল। সেখানে একটা লাল রঙের তিল ছিল। লিলি ছোটবেলায় আমাকে এই তিল দেখিয়ে বলত, রঞ্জু, এই তিলটা যদি কপালে থাকত, তাহলে আমি রাজরানী হতাম।

দীর্ঘদিন পর লিলিকে স্বপ্নে নিখুঁতভাবে দেখলাম। এবং সে-রাতেই ঠিক করলাম ঘুম ভাঙতেই নানাজানের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে লিলিকে আমি চিঠি দেব। এই মনে করে আমার খুব ভালো লাগতে লাগল। মনে হলো শরীর সেরে গেছে, একটু বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাই।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই জোছনা দেখে চোখ ছলছলিয়ে উঠল। এমন উথালপাথাল আলো দেখলে মানুষের মনে এত দুঃখ আসে কেন কে জানে ?

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। পা যখন ধরে এলো, তখন দেয়াল ঘেঁসে বসে রইলাম। হঠাৎ শুনি পাশের ঘরে লাল মামি কাঁদছেন।

কোনো ভুল নেই, স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মামাও যেন নিচু গলায় কী একটা বললেন। মামি কান্না থামিয়ে ধমকে উঠলেন, কোনো কথা শুনব না আমি।

বাইরের এই অপূর্ব জোছনার সঙ্গে এই ঘটনা কেমন যেন মিশ খায় না। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

৬

নানাজান বললেন, ঠিকানা নিয়ে কী করবি ?

চিঠি লিখব।

এত দিন পর চিঠি লেখার কথা মনে পড়ল ?

আমি চুপ করে রইলাম। নানাজান একটু কেশে বললেন, শরীরের হাল কেমন ? জ্বর আছে ?

জি-না।

নবু তোর কাছে চিঠিফিটি লেখে ?

জি, লেখে।

পূজার বন্ধে বাড়ি আসবে বলে চিঠি লিখেছে আমার কাছে। বলতে বলতে নানাজান হঠাৎ কথা থামিয়ে বলেন, লিলিরা আগে যেখানে থাকত, এখন সেখানে নাই। নতুন ঠিকানা তো আমার জানা নাই। আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে বলব।

লিলি আপনার কাছে চিঠি লেখে নানাজান ?

নানাজান একটু ইতস্তত করে বললেন, কম লেখে।

আশ্বিনের গোড়াতেই নবু মামা এসে পড়লেন।

তাঁকে দেখে আমার চোখে পলক পড়ে না। লম্বায় বেড়েছেন, স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। ঠোঁটের উপর হালকা নীল গোঁফের রেখা। নবু মামা আমাকে দেখে হৈহৈ করে উঠলেন, তোর এ কী হাল রঞ্জু!

অসুখ করেছিল আমার। আপনাকে আর চেনা যায় না মামা।

স্বাস্থ্য দেখেছিস ? দেখ, হাতের মাস্‌ল্‌ টিপে দেখ।

মাসল টিপে দেখার দরকার পড়ে না। নবু মামার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য দেখে ঈর্ষা হয় আমার। লাল মামি তো নবু মামাকে চিনতেই পারে না, কে এসেছে ভেবে থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অমনি নবু মামা খপ করে তাঁর হাত চেপে ধরলেন। মামি বললেন, নবু নাকি ? তুমি তো বদলে গেছ।

মামি নবু মামাকে আজ প্রথম 'তুমি' করে বললেন। নবু মামা হেসেই কূল পান না। হাসি থামিয়ে কোনোমতে বললেন, ভাবি, তুমি আগের মতোই আছ। না, আগের মতো নয়, আগের চেয়ে সুন্দর।

অনেক দিন পর নবু মামাকে দেখে কী যে ভালো লাগল! তাছাড়া মামা এত বেশি বদলে গেছেন কী করে, সেও এক বিস্ময়। ছোটবেলায় দু'জনকে তো একই রকম

দেখাত। আমি পরম বিস্ময় নিয়ে নবু মামার পিছু পিছু ফিরতে লাগলাম। নবু মামার গল্প আর ফুরোয় না। স্কুলের গল্প, স্কুলের বন্ধুদের গল্প। রাজশাহীর গল্প। এর মধ্যে রাজশাহী থেকে নাটোর রাজবাড়িতে গিয়েছিলেন— তার গল্প। আমি শুনি, আর অবাক হই।

নবু মামা ক্লান্ত হয়ে এসেছিলেন। দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমিও পাশে শুয়ে আছি, কখন নবু মামা জাগবেন সেই আশায়। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। ছোট নানিজান এসে ডেকে তুললেন। দু'জনে চলে গেলাম লাল মামির ঘরে। মামির প্রতি নবু মামার শৈশবের যে-টান ছিল তা দেখলাম এত দিনের অদর্শনে এতটুকুও কমেনি, বরং বেড়েছে।

লাল মামি বললেন, নবু, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, পরে গল্প করব তোমার সাথে। নবু মামা হো হো করে হাসেন, না, গল্প এখনি করতে হবে। আর আগের মতো 'তুই' করে ডাকতে হবে।

এই বলে নবু মামা দরজায় খিল এঁটে দিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নবু মামা রহস্যময় ভঙ্গিতে তাঁর প্যান্টের পকেটে হাত দিচ্ছেন, তোমার জন্যে কী এনেছি, দেখ ভাবি।

কী ?

বলো তো দেখি কী ? আন্দাজ কর।

লাল মামি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। নবু মামা বললেন, ছোটবেলায় আমাদের সিগারেট খাইয়েছিলে। আজ আমি সিগারেট নিয়ে এসেছি। আজকে আবার খেতে হবে।

তুমি কি এর মধ্যেই সিগারেট ধরেছ নাকি ?

না, ধরিনি। তোমার জন্যে এনেছি।

বলেই নবু মামা নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে লাল মামির দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

লাল মামি বললেন, আমি সিগারেট খাব না।

খেতেই হবে।

নবু মামা জোর করে মামির মুখে সিগারেট গুঁজে দিলেন। থুথু করে ফেলে দিয়ে মামি শুকনো গলায় বললেন, তুমি বড় বেয়াড়া হয়ে গেছ নবু।

নবু মামা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কায়দা করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। এক সময় বললেন, ভাবি, তোমার কাছে আমি এত চিঠি লিখলাম, জবাব দাওনি কেন ?

একটা তো দিয়েছি।

না, এবার থেকে সব চিঠির জবাব দিতে হবে।

এই বলে নবু মামা বেরিয়ে এলেন। বললেন, রঞ্জু, চল মাঠে বেড়াই। খুব বাতাস দিচ্ছে। মাঠে হাঁটলে খিদে হবে।

মাঠে সে-রাতে প্রচুর জোছনা হয়েছে। চকচক করছে চারিদিক। ঠান্ডা একটা বাতাস বইছে। নবু মামা চেঁচিয়ে বললেন, কী জোছনা, খেতে ইচ্ছে হয়! মনে হয় কপকপ করে খেয়ে ফেলি। নবু মামা মুখ হাঁ করে খাবার ভঙ্গি করতে লাগল। বিস্মিত হয়ে আমি তাঁর আনন্দ দেখলাম।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, বাদশা মামা জলচৌকিতে চুপচাপ বসে আছেন। নবু মামাকে দেখে নির্জীব কণ্ঠে শুধালেন, কখন এসেছিস ?

সকালে! তুমি কোথায় ছিলে ?

বাদশা মামা বিড়বিড় করে কী বললেন বোঝা গেল না। নবু মামা বললেন, তোমার কী হয়েছে ?

বাদশা মামা এর উত্তরেও বিড়বিড় করলেন।

ভাত খেতে খেতে নবু মামা বললেন, বাদশা ভাইয়ের কী হয়েছে ?

নানিজান বললেন, জাদু করেছে তাকে ?

কে জাদু করেছে ?

কে আবার ? বউ।

নবু মামা রেগে গিয়ে বলল, কী সব সময় বাজে কথা বলেন!

নানিজান বললেন, কী যে গুণের বউ, তা কি আর এতদিনে জানতে বাকি আছে আমার ? বাদশার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।

লাল মামি কখন যে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, জানতে পারিনি। ঠান্ডা গলায় বললেন, কে জাদু করেছে, মা ?

নানিজান বললেন, বউ, তুমি চোখ রাঙিয়ে কথা বলো কার সঙ্গে ?

আমি চোখ রাঙিয়েছি ?

তুমি কার উপর গরম দেখাও বউ, রূপের দেমাগে তো পা মাটিতে পড়ে না। এদিকে আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারি না আমি। বাঁজা মেয়েমানুষ বলে সারা দুনিয়ার লোকে তোমাকে ডাকে।

নবু মামা বললেন, মা, আপনি চুপ করেন।

কেন চুপ করব ? কাকে ডরাই আমি ? বাদশাকে আজ বললে কাল সে তিন তালাক দেয়।

লাল মামি বললেন, তাই বলেন না কেন ? ঐ তো বসে আছে চৌকিতে। যান, গিয়ে বলেন।

নবু মামা আর আমি দোতলায় উঠে দেখি, মামি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন

বারান্দায়। আমাদের দেখে উঁচু গলায় বললেন, নবু, তুমি কালকে আমাকে বাবার বাড়িতে রেখে আসবে।

নবু মামা চুপ করে রইলেন।

নবু মামা এক মাস রইলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি অনেক গল্পের বই নিয়ে এসেছিলেন, প্রতিদিন সেগুলি পড়া হতো। 'লোহারামের কেচ্ছা' বলে একটি বই ছিল— এমন হাসির! নবু মামা পড়তেন, আমি আর লাল মামি শুনে হেসে গড়াগড়ি। ছোট নানিজান এক-একদিন রেগে ভূত হতেন।

আস্তে হাসতে পার না বউ ? তোমার শ্বশুর শুনলে কী হবে ?

মোহরের মা আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত—

যত হাসি তত কান্না
কহে গেল রাম সন্না।

নবু মামা শুনতে পেলে বলতেন, মোহরের মা, তোমার রাম সন্নাকে এই বইটা একটু পড়তে দিও। দেখি, ব্যাটা হাসে কি কাঁদে।

একদিন হাসির শব্দ শুনে লাজুক পায়ে সফুরা খালা এসে হাজির। দরজার ওপাশ থেকে ফিসফিস করে বলছে, ভাবি, তোমরা কী নিয়ে হাসছ ?

গল্প শুনে হাসছি। হাসির গল্প।

সফুরা খালা ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে মিটমিট হাসি হাসতে লাগলেন। যেন আমাদের কোনো গোপন অভিসন্ধি টের পেয়ে গিয়েছেন। তারপর আগের মতো ফিসফিসে গলায় বললেন, হাসির গল্প আমার ভালো লাগে না।

তবু তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে নবু মামার গল্প পড়া শুনলেন। তারপর বললেন, চল না, সবাই মিলে দীঘির ঘাট থেকে বেড়িয়ে আসি, এখন তো আর লোকজন নেই।

সেদিন থেকে আমাদের রুটিন হলো, গল্পটল্প পড়ার পর দীঘির ঘাটে বেড়াতে যাওয়া। বেড়াতে বেড়াতে একদিন নবু মামার উল্লাসের কোনো সীমা থাকত না। স্কুল থেকে শিখে আসা একটা হিন্দি গান বেসুরো গলায় ধরে বসতেন। প্রথম লাইনটি বোধহয় এরকম ছিল—

মাটি মে পৌরণ
মাটি মে শ্রাবণ
মাটি মে তনবন যায়গা।

পাখির ডানায় ভর করে সময় কাটতে লাগল। অবশ্যি বেড়াতে এসে মাঝে-মধ্যে লাল মামির ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। সেগুলি ঘটত তখনি, যখন মামি দেখতে পেতেন বাদশা মামা ঘাটের উল্টো দিকে চুপচাপ বসে আছেন। দেখে মনে হয়, যেন মানুষ নয়, উইয়ের ঢিবি। এতটুকু নড়চড়াও নেই।

দেখতে দেখতে নবু মামার ছুটির দিন ফুরিয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল একা একা আমার থাকতে হলে আমি আর বাঁচব না। যতই যাওয়ার দিন এগিয়ে আসে ততই আমার কষ্ট বাড়তে থাকে। যাবার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ভারি মন নিয়ে লাল মামির ঘরে বসে আছি। নবু মামাও কথা বলছে না। এমন সময় নিচে থেকে কানাবিবি ডাকল, ও এলাচি বেগম, ও এলাচি বেগম।

লাল মামি বললেন, আসছি। কেমন ডাকে দেখ না।

নবু মামা বললেন, তোমার নাম এলাচি কেন ভাবি ?

আমার মুখে সব সময় এলাচির গন্ধ থাকে, এই জন্যেই এলাচি নাম।

নবু মামা এগিয়ে এসেছেন, আগে তো কোনো দিন বলোনি, শুঁকে দেখতাম। দেখি ভাবি, মাথাটা একটু নিচু কর তো।

কী পাগলামি কর নবু!

বলার আগেই নবু মামা লাল মামির মাথা জাপটে ধরেছে এবং হৈহৈ করে উঠেছে, আরে সত্যি তাই। সত্যি এলাচির গন্ধ।

ছোট নানিজান ঢুকলেন এ সময়। শুকনো গলায় বললেন, ও বউ, তোমাকে একঘণ্টা ধরে ডাকছে কানাবিবি। কানে শুনতে টুনতে পাও তো ?

লাল মামি বললেন, কী জন্যে ডাকছে ?

সে যে তোমাকে গলায় আর কোমরে বাঁধবার জন্যে তাবিজ দিয়েছিল, সেগুলি কী করেছ ?

ফেলে দিয়েছি।

কেন ফেলে দিয়েছ ?

তাবিজ দিলে কী হবে ?

নানিজান রেগে আগুন হয়ে বললেন, কী, এত বড় সাহস তোমার বউ ? আল্লাহ্‌র কোরান কালামকে অবিশ্বাস! রোজা নাই, নামাজ নাই। বেহায়া বেপর্দা মেয়ে।

নবু মামা বললেন, মা, আপনি চুপ করেন।

না, চুপ করব কেন ? বউ, শেষ কথা আমার, তাবিজ দিবা কি না কও।

লাল মামি বললেন, আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন। সে যদি বলে তাবিজ দিলেই আমার ছেলেমেয়ে হবে, তাহলে দেব।

এমন সময় নিচে প্রচণ্ড হৈচৈ শোনা গেল। আমি আর নবু মামা দৌড়ে গিয়ে দেখি রহমত মিয়া শিকল খুলে কীভাবে যেন বেরিয়ে পড়েছে। হাতের শিকল নাচাচ্ছে, আর বলছে, কাঁচা খাইয়া ফেলামু। কাঁচা খাইয়া ফেলামু।

লোকজন ঘিরে ফেলেছে তাকে। কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। দু-একজন লম্বা বাঁশ বাগিয়ে ধরে আছে। নানাজান বললেন, কেউ ওরে মারবে না, খবরদার। সাবধানে ধর।

বহু কসরত করতে হলো ধরতে গিয়ে। শিকলের বাড়ি খেয়ে হারিস সর্দার তো প্রায় মরোমরো। নানাজান বললেন, যাও, নৌকায় করে পাগল হারামজাদাটাকে এক্ষুণি নান্দিপুরের বাজারে ছেড়ে দিয়ে আস। এঁটো কাঁটা খেয়ে বেশ বেঁচে থাকবে।

ঘাটে নৌকা তৈরিই ছিল। বহু উৎসাহী সহযাত্রী তৈরি হয়ে পড়ল। একটি জলজ্যান্ত পাগলকে অন্য গ্রামের বাজারে ছেড়ে দিয়ে আসা অ্যাডভেঞ্চারের মতো।

পাগল তো কিছুতেই নৌকায় উঠবে না। চেঁচামেচি চিৎকারে বাড়ি মাথায় তুলেছে। কিন্তু নৌকায় উঠেই তার ভাবান্তর হলো। হাত ডুবিয়ে দিল নদীর পানিতে, তারপর খুশিতে হেসে ফেলল।

আহা, পাগলটার কারবার দেখে বড় মায়া লাগে রে।

তাকিয়ে দেখি ঘাটের উপর বসে থেকে বাদশা মামা আফসোস করছেন। তাঁর চোখ স্নেহ ও মমতায় চকচক করছে।

পরবর্তী দু'দিন বাড়ির আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত রইল। নবু মামা যে-সকালে চলে যাবেন, সে-সকালে লাল মামির সঙ্গে কানাবিবির একটা ছোটখাট সংঘর্ষ হয়ে গেল। ঘুম ভেঙেই শুনি লাল মামি বলছেন, এ কানাবিবির কাজ। কানাবিবি, তোমার এমন সাহস!

কানাবিবি বলছে, বাড়ির বউ মানুষ কেমন গলায় কথা কয় গো!

বিষয় আর কিছু নয়। লাল মামি ঘুমোতে গিয়ে দেখেছেন, তাঁর বালিশের নিচে শাড়ির পাড়ের টুকরো, মাথার চুল, একখণ্ড ছোট হাড়— এই জাতীয় জিনিস সুতো দিয়ে বেঁধে রেখে দেওয়া। বশীকরণের জিনিসপত্র হয়তো। সেই থেকেই এ বিপত্তি।

নবু মামাকে স্টেশনে দিয়ে আসতে আমি সঙ্গে চলেছি। রাত দুটোয় ট্রেন। সন্ধ্যাবেলা খেয়েদেয়ে রওয়ানা হয়েছি। হারিকেন দুলিয়ে একটি কামলা যাচ্ছে আগে আগে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে হু-হু করে। নবু মামা আর আমি গল্প করতে করতে যাচ্ছি। হঠাৎ মামা বললেন, ও, তোকে বলা হয়নি, লিলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। শান্তাহার স্টেশনে। প্লাটফরমে বসে ছিল, আমি তাকে চিনতে পারিনি। হঠাৎ ডাকল— নবু মামা না?

নবু মামা কিছুক্ষণ থেমে বললেন, খুব গরিব হয়ে গেছে। রোগা হয়েছে খুব। ময়লা কাপড়চোপড়। এমন খারাপ লাগল দেখে।

লিলির বরের সঙ্গে দেখা হয়নি?

না। লিলি বলল, আমাকে দেখে লজ্জা পেয়ে নাকি লুকিয়ে আছে কোথায়।

আর কিছু বলেনি?

তোর কথা জিজ্ঞেস করল। তার অবস্থা একটু ভালো হলেই তোকে নাকি তার কাছে নিয়ে যাবে।

নবু মামা বললেন, তোর মন খারাপ হয়েছে?

হ্যাঁ।

আমারও হয়েছে। বিয়ের পর যখন লিলি শ্বশুরবাড়ি গেল, মনে আছে রঞ্জু ?

আছে।

ট্রেনে উঠে কী কাঁদাটাই না কাঁদল।

নবু মামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

৭

সেবার আমি খুব অর্থকষ্টে পড়লাম।

স্কুলের বেতন দিতে হয়। মাঝেমধ্যে চাঁদা দিতে হয়। আগে নবু মামা যখন দিতেন, সেই সঙ্গে আমারটাও দিয়ে দিতেন। এখন আমি একলা পড়েছি। নিজ থেকে কারো কাছে কিছু চাইতে পারি না। পোশাকের বেলায়ও তাই। নবু মামার কাপড়-জামা বরাবর পরে এসেছি। লিলিও প্রায়ই বানিয়ে দিয়েছে। অসুবিধে হয়নি কিছু। এখন অসুবিধে হতে লাগল। কী করব ভেবে পাই না। বাদশা মামার কাছে কিছু চাইতে লজ্জা করে। আমি খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবা খুব কষ্ট ও লজ্জার ব্যাপার। আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। খুব ইচ্ছে হতে লাগল লিলির কাছে চলে যাই। কিন্তু তার কাছে চিঠি লিখে জবাব পাই না। পুরনো জায়গা ছেড়ে তারা নতুন যেখানে গিয়েছে, তার ঠিকানাও জানায়নি কাউকে।

তাছাড়া নানাজানের সংসারেও নানা রকম অশান্তি শুরু হয়েছে। তাঁর জন্মশত্রু হাশিম শেখ জমি নিয়ে মামলা শুরু করেছে। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মতো। বৃদ্ধ বয়সে নানাজানকে কোর্ট-কাচারিতে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। বাদশা মামাকে দিয়ে তো কোনো কাজ করাবার উপায় নেই। তিনি জড় পদার্থের মতো হয়ে গিয়েছেন। সুফী সাহেবের বাড়ি থেকে ফেরবার পর বেশ কিছুদিন ধর্ম-কর্ম নিয়ে ছিলেন। লোকে ভালোই বলেছে। এখন সে-সব ছেড়েছেন। নেশা-ভাংও নাকি করেন আজকাল।

সফুরা খালাকে নিয়েও অনেক রকম অশান্তি হচ্ছে। কখন তিনি দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিয়ের কথাবার্তাও হচ্ছে। একবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ছেলের বাবা মেয়ে দেখে মহাখুশি। এমন ভালো স্বভাবের মেয়ে সে নাকি তার সমস্ত জীবনে দেখেনি। কিন্তু বিয়ে হলো না। সফুরা খালাকে নিয়ে তখন নানারকম রটনা। তার নাকি মাথা খারাপ। রাতেবিরেতে মেয়ে নাকি পুকুরঘাটে একা একা হেঁটে বেড়ায়। একবার কোনো মেয়ে সম্পর্কে এ জাতীয় কথা ছড়িয়ে পড়াটা খুব খারাপ লক্ষণ। এ নিয়ে ঘরেও অশান্তির শেষ নেই। নানিজান বিনিয়ে বিনিয়ে গানের মতো সুরে কাঁদেন। মাঝে মাঝে আপন মনে বলেন, আমার নসিব। বিয়ে করালাম ছেলের বউটা বাঁজা। মেয়েটাও আধপাগল।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত অশান্তি, সেই সফুরা খালা নির্বিকার। আমি একদিন সফুরা খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, খালা, আপনি নাকি রাতবিরেতে একা একা ঘুরে বেড়ান ?

খালা মৃদু গলায় বলেন, একা একা পুকুরঘাটে বসে থাকতে এত ভালো লাগে!

তাঁকে নিয়ে চারিদিকে যে এত অশান্তি, সেদিকে কিছুমাত্র খেয়াল নেই। আছেন আপন মনে। তাঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হতে শুরু করল। খালাকে আমি তখন ভালোবেসে ফেলেছি।

আসলে খালাকে আমি একটুও বুঝে উঠতে পারিনি। যাবতীয় দুর্বোধ্য বস্তুর জন্যে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। সেই জন্যেই তাঁর প্রতি আমার প্রবল ভালোবাসা গড়ে উঠল। আমার ইচ্ছে হলো তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠুক। কিন্তু তিনি নিজের চারদিকে একটি দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন। এই দেয়াল ভেদ করে তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় নেই। নিজের সৃষ্ট জগতেই তিনি ডুবে আছেন। বাইরের প্রতি একটুও খেয়াল নেই। ইচ্ছে হলো তো চলে গেলেন পুকুরপাড়ে, একা বেড়াতে গেলেন বাগানে।

এ-সব দেখেশুনে কেন জানি না আমার একটা ধারণা হয়েছিল, সফুরা খালা বড় রকমের দুঃখ পাবে জীবনে। এরকম মনে করবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু আমার মনে হতো। একেই হয়তো intuition বলে।

পরবর্তী জীবনে দেখেছি আমার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। দুঃখ এসেছে এবং অত্যন্ত সহজভাবে জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মতো দুঃখকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এই মেয়ের গল্প আমি অন্য কোথাও বলব, আজ শুধু হাসান আলির কথাটাই বলি।

হাসান আলি বাজারে কিসের যেন ঠিকাদারি করত। ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর বয়স। ভীষণ গরিব। নানাজানদের কীরকম যেন আত্মীয়। থাকত নানাজানদের বাংলাঘরে। (বাড়ির বহির্মহলে অতিথি-অভ্যাগতের জন্যে নির্মিত ঘরকেই বাংলাঘর বলা হতো)।

অত্যন্ত নিরীহ ধরনের ছেলে। যতক্ষণ ঘরে থাকত, ততক্ষণ বসে বসে হিসাবপত্র করত। আমরা সে-সময় তার ঘরে হাজির হলে বিনা কারণে আঁতকে উঠত। তার পরই সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে চোখ-মুখ লাল করে এক বিশ্রী কাণ্ড! প্রতি হাটবার দিন দেখতাম, সে অল্প কিছু মিষ্টি কিনে এনেছে। মিষ্টি আনা হয়েছে নানাজানের বাড়ির মানুষদের জন্যেই, কিন্তু দেওয়ার সাহস নেই। অনেক রাতে কাউকে ডেকে হয়তো ফিসফিস করে বলল, একটু মিষ্টি এনেছিলাম। বাড়ির প্রায় মানুষই তখন ঘুমে।

সফুরা খালা একদিন বললেন, ও রঞ্জু, হাসান আলি বলে একটা লোক নাকি থাকে বাইরের ঘরে ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি জানলেন কী করে ?

ও আল্লা, মজার ব্যাপার হয়েছে। পরশুদিন দীঘির পাড়ে একা একা গিয়েছি, দেখি কে-একজন লোক চুপচাপ বসে আছে। আমি বললাম, কে ওখানে ? লোকটা বলল— আমার নাম হাসান আলি, আমি আপনাদের বাংলাঘরে থাকি। আমি তখন

ভাবলাম ফিরে যাই। লোকটা বলল— এত রাতে আপনি একা একা আসেন কেন ? কত সাপ-খোপ আছে। আমি বললাম— আপনি তো আসছেন, আপনার সাপের ভয় নাই ? লোকটা তখন কী বলল জানো রঞ্জু ?

না।

বলল, আপনি বড় ভালো মেয়ে। এই বলেই হনহন করে চলে গেলে। কী কাণ্ড দেখেছ ?

এর কিছুদিন পরই শুনলাম হাসান আলি নানাজানের কাছে তাঁর ছোট মেয়েটিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছে। নানাজান তো রেগেই আগুন। বাড়িতে হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। সফুরা খালা শুধু বলেন, আহা, বেচারা গরিব বলে কি সবাই এরকম করবে! ছিঃ! লাল মামি ও-কথা শুনে বললেন, আমাদের সফুরার ভাতারকে নিয়ে কেউ তামাশা করবে না। খবরদার, সফুরা মনে কষ্ট পায়। নানিজান লাল মামির কথা শুনে রেগে যান, চেঁচিয়ে বলেন, এ কী কথা বলার ঢং বউ!

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলো না, নানাজান হাসান আলিকে এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যেতে বললেন। শরৎকালের এক সকালে নৌকা করে হাসান আলি চলে গেল। দু'টি ট্রাঙ্কের উপর বিবর্ণ সতরঞ্চিতে ঢাকা একটি বিছানা— তার পাশে মুখ নিচু করে বসা হাসান আলি।

সফুরা খালা এরপর থেকেই অস্থির হয়ে পড়লেন। মুখে শুধু এক বুলি, বিনা দোষে কষ্ট পেল লোকটা। নবু মামা অনেক পরে এ ঘটনা শুনে বলেছিলেন, আমি থাকলে দিতাম শালার ঘাড়ে গদাম করে এক ঘুসি। সফুরা খালা বিষণ্ন কণ্ঠে বলেছেন, ছিঃ নবু, ছিঃ।

৮

অচিনপুরের গল্প লিখতে লিখতে গভীর বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অনুভব করছি সুখ এবং দুঃখ আসলে একই জিনিস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুখ বদলে গিয়ে দুঃখ হয়ে যায়। দুঃখ হয় সুখ। জীবনের প্রবল দুঃখ ও বেদনার ঘটনাগুলি মনে পড়লে আজ আমার ভালো লাগে। প্রাচীন সুখের স্মৃতিতে বুক বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়।

হাসনার কোলে তিন মাস বয়সের যে-শিশুটি এ সংসারে প্রবেশ করেছিল, তার ভূমিকা তো যুক্তিসঙ্গত কারণেই তৃতীয় পুরুষের ভূমিকা হবে। তার উপস্থিতি হবে ছায়ার মতো। সরফরাজ খানের এই পরিবারটির সুখ-দুঃখ তাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু আমি তাদের জীবনের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবেই না জড়িয়ে পড়লাম। বাদশা মামার মলিন চেহারা দেখলে আমার মন কাঁদে। সফুরা খালা যখন হেসে হেসে বলেন, রঞ্জু, আমার খুব ইচ্ছে একদিন অনেক রাত্রে পুকুরে একা একা সাঁতার কেটে গোসল করি। পুকুরঘাটে তুমি আমার জন্যে একটুখানি দাঁড়াবে রঞ্জু ? কেউ যেন জানতে না পারে।— তখন সফুরা খালার জন্যে আমার গাঢ় মমতা বোধ হয়। অথচ

আমি নিশ্চিত জানি একদিন লিলির চিঠি আসবে। আমি এদের সবাইকে পিছনে ফেলে চলে যাব।

হালিম শেখের সঙ্গে পরপর দু'টি মামলাতে নানাজানের হার হলো। এত দিন যে-জমিতে নানাজানের দখলিসত্ব ছিল, হালিম শেখের লোকজন লাল নিশান উড়িয়ে ঢোল আর কাঁসর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সে-জমির দখল নিল। গ্রামের লোকজনকে গরু জবাই করে খাওয়াল হালিম শেখ।

জমির পরিমাণ তেমন কিছু নয়। অর্থব্যয়ও হয়েছে সামান্য। নানাজানের মতো লোকের কাছে সে-টাকা কিছুই নয়। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়লেন। রোজকার মতো উঠোনে বসে কোরান-পাঠ করতে বসেন না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। খাওয়া কমে গেল। রাতে ঘুমুতে পারেন না। উঠোনে অনেক রাত পর্যন্ত চেয়ার পেতে বসে থাকেন। নানিজান মাথায় হাওয়া করেন, পায়ে তেল মালিশ করে দেন।

দিন সাতেক পর নানাজান ঘোষণা করলেন, তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করতে চান। নবু মামার কাছে চিঠি গেল, তিনি যেন পত্রপাঠ চলে আসেন, পড়াশোনার আর প্রয়োজন নেই। লোক পাঠিয়ে দামি কাফনের কাপড় কেনালেন। কবরের জন্য জায়গা ঠিক করা হলো। কবর পাকা করবার জন্য ইট আনানো হলো। মৌলানা ডাকিয়ে তওবা করলেন। বাড়ির সবাই এই নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখতে লাগল। ঠিক এই সময় বড় নানিজান মারা গেলেন।

মোহরের মা রোজ সকালে দুধ নিয়ে যায় নানিজানের ঘরে। সেদিন কী কারণে যেন দেরি হয়েছে। দুপুরের দিকে বাটিভর্তি দুধ নিয়ে গিয়েছে। ঘরে ঢুকেই বিকট চিৎকার। মৃত্যু এসেছে নিঃশব্দে। কেউ জানতেও পারেনি, কখন কীভাবে মারা গেলেন।

আমরা সবাই তাঁর ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়ালাম। পরিপাটি বিছানা পাতা। বালিশের চাদর পর্যন্ত একটুও কোঁচকায়নি। বড় নানিজান সেই পরিপাটি বিছানায় শক্ত হয়ে পড়ে আছেন। ইঁদুর কিংবা অন্য কোনো কিছু তাঁর ঠোঁট আর একটি চোখ খেয়ে গিয়েছে। বিকট হাঁ করা সেই মূর্তি দেখে সফুরা খালা 'ও মাগো' 'ও মাগো' বলে কাঁদতে লাগলেন। লাল মামি সফুরা খালার হাত ধরে তাঁকে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

নানাজানের জন্যে কেনা কাফনের কাপড়ে তাঁর কাফন হলো। নানাজানের জন্যে ঠিক করে রাখা জায়গায় কবর হলো তাঁর। যে-ইট নানাজান নিজের জন্যে আনিয়েছিলেন, সেই ইট দিয়ে কবর বাঁধিয়ে দেওয়া হলো।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমরা সবাই বড় নানিজানের কথা ভুলে গেলাম। আগের মতো ঝগড়া, রং-তামাশা চলতে লাগল। বড় নানিজানের ঘর থেকে তাঁর সমস্ত জিনিস সরিয়ে ফেলে সংসারের প্রয়োজনীয় পেঁয়াজ-রসুন রাখা হলো গাদা করে।

দিন কেটে যেতে লাগল। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন। সেই একা একা হাঁটতে হাঁটতে সোনাখালি চলে যাওয়া। পুকুরঘাটে রাতেরবেলা চুপচাপ বসে থাকা। এর বাইরে যেন আমার জানা কোনো জগৎ নেই। সমস্ত বাসনা-কামনা এইটুকুতেই কেন্দ্রীভূত। এর মধ্যে একদিন নানাজান আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেছেন। বলেছেন, তোমার বড় নানিজান তাঁর নিজের সম্পত্তি তোমাকে আর লিলিকে দিয়ে গিয়েছেন দানপত্র করে।

বড় নানিজান তাঁর বাবার কাছ থেকে প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছিলেন জানতাম। তার পরিমাণ যে কত তা কেউই জানত না। নানাজান বললেন, অনেক জায়গা-জমি, লিলির আসা দরকার। কিন্তু তার ঠিকানাই তো জানা নেই।

৯

রাজশাহী থেকে খবর এলো, স্কুল ফাইনাল দিয়েই নবু মামা কাউকে কিছু না বলে কোলকাতা চলে গেছেন। নানাজানের মুখ গম্ভীর হলো। নানিজানের কেন জানি ধারণা, নবু মামা আর কখনো ফিরবে না। তিনি গানের মতো সুরে যখন কাঁদতে থাকেন, তখন বলেন, এক মেয়ে পাগল, এক ছেলে বিবাগী, এক বউ বাঁজা।

শুনলে হাসি পায়, আবার দুঃখ লাগে। বাদশা মামা মাঝেমধ্যে গিয়ে নানিজানকে ধমক দেন, কী মা, আপনি সব সময় বাঁজা বউ বাঁজা বউ করেন ?

নানিজান ক্ষেপে গিয়ে বলেন, ও বাঁজা বউরে আমি আর কী বলে ডাকব ?

আহা, এলাচি মনে কষ্ট পায়।

নানিজান কপালে করাঘাত করেন আর বলেন, হা রে বউ, তুই কী যাদুটাই না করলি!

বাদশা মামা চিন্তিত, বিরক্ত আর ক্লান্তমুখে চলে আসেন।

নবু মামা হঠাৎ করে কোলকাতা চলে যাওয়ায় খুশি মনে হয় শুধু সফুরা খালাকে। আমাকে ডেকে বলেন, ছেলে হলে আমিও নবুর মতো কাউকে না বলে চলে যেতাম।

আট-দশ দিন পর নবু মামা কোলকাতা থেকে টাকা চেয়ে পাঠাল। নানাজান লোক মারফত টাকা পাঠালেন। নির্দেশ রইল, ঘাড় ধরে যেন তাকে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো নবু মামাকে বিয়ে দেওয়া হবে। নানাজান মেয়ে দেখতে লাগলেন। নানিজান মহাখুশি। লাল মামিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, নতুন বউয়ের এক বৎসরের ভেতর ছেলে হবে, আমি স্বপ্ন দেখেছি।

টাকা নিয়ে লোক যাওয়ার কয়েক দিন পরই নবু মামা এসে পড়লেন। সরাসরি এসে বাড়িতে তিনি উঠলেন না, লোক মারফত খবর পাঠালেন কাউকে কিছু না বলে আমি যেন আজিজ খাঁর বাড়িতে চলে আসি।

আজিজ খাঁর বাইরের ঘরের চেয়ারে নবু মামা গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। মাথায় বেড়েছেন কিছু। গায়ের রঙ ফর্সা হয়েছে। আমাকে দেখে রহস্যময় হাসি হাসলেন, বাড়িতে কেউ জানে না তো আমি এসেছি যে ?

না।

গুড।

কী ব্যাপার নবু মামা ?

একটা প্ল্যান করেছি রঞ্জু। লাল ভাবিকে একেবারে চমকে দেব। গ্রামোফোন কিনেছি একটা। ঐ দেখ টেবিলে।

আমি হাঁ করে টেবিলে রেখে দেওয়া বিচিত্র যন্ত্রটি তাকিয়ে দেখি। নবু মামা হাসিমুখে বলেন, পাঁচটা রেকর্ডও আছে। একশ' পনের টাকা দাম।

নবু মামার প্ল্যান শুনে আমার উৎসাহের সীমা থাকে না। রাতেরবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নবু মামা গ্রামোফোন নিয়ে চুপি চুপি যাবেন। যে-ঘরটায় আমি আর নবু মামা থাকি সেই ঘরটায় চুপি চুপি এসে গ্রামোফোন বাজানোর ব্যবস্থা করা হবে। গান শুনে হকচকিয়ে বেরিয়ে আসবেন লাল মামি। অবাক হয়ে বলবেন, রঞ্জু, কী হয়েছে রে, গান হয় কোথায় ?

তখন হো হো করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবেন নবু মামা। উৎসাহে নবু মামা টগবগ করছেন। আমি বললাম, নবু মামা, এখন একটা গান শুনি।

নবু মামা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, না-না, এখন না। পরে শুনবি। ফার্স্টে কোনটা বাজাব বল তো ?

কী করে বলব, কোনটা ?

সেদিন সন্ধ্যার আগেভাগেই ঝুমঝুম করে বৃষ্টি নামল। সে কী বৃষ্টি। ঘরদোর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করে ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। নবু মামা বিরক্ত মুখে বসে রইলেন। রাতের খাওয়াদাওয়া আজিজ খাঁর ওখানেই হলো।

রাত যখন অনেক হয়েছে, লোকজন শুয়ে পড়েছে সবখানে, তখন আমরা উঠলাম। বৃষ্টি থামেনি, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছেই। মাথায় ছাতা ধরে আধভেজা হয়ে বাড়িতে উঠলাম। কাদায় পানিতে মাখামাখি। বাড়িতে জেগে নেই কেউ। শুধু নানাজানের ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। দু'জনে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলাম। দরজা খোলা হলো অত্যন্ত সাবধানে। একটু ক্যাঁচ শব্দ হলেই দু'জনে চমকে উঠছি।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে গ্রামোফোন বের করলেন নবু মামা। বহু কষ্ট করে চোঙ ফিট করা হলো। দম দিতে গিয়ে বিপত্তি— ঘ্যাসঘ্যাস শব্দ হয়। তবে ভরসার কথা— ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। নবু মামা ফিসফিসিয়ে বললেন, কোন গানটা দিয়েছি কে জানে ? একটা খুব বাজে গান আছে। এটা প্রথম এসে গেলে খারাপ হবে খুব।

আমি বললাম, নবু মামা, দেরি করছ কেন ?

দিচ্ছি। বৃষ্টিটা একটু কমুক, নয়তো শুনবে না।

বৃষ্টির বেগ একটু কমে আসতেই গান বেজে উঠল—

আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো
তোরে আমি কোথায় রাখি বল ?

লাল মামি গান শুনে মুগ্ধ হবে কী, আমি নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। কী অপূর্ব কিন্নরকণ্ঠে গান হচ্ছে। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠল।

নবু মামা ফিসফিসিয়ে বললেন, কী ব্যাপার, ভাবি আসে না যে, ও রঞ্জু।

আমি সে-কথার জবাব দিলাম না। বাইরে তখন ঝড় উঠেছে। জানালার কপাটে শব্দ হচ্ছে খটখট। নবু মামা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি লাল মামি ডাকলেন, রঞ্জু, রঞ্জু।

নবু মামা ফিসফিস করে বললেন, চুপ করে থাক, কথা বলবি না। আমি চুপ করে রইলাম। নবু মামা অন্য রেকর্ড চালিয়ে দিল—

যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন...

লাল মামি দরজায় ঘা দিলেন, ও রঞ্জু, কী ব্যাপার, গান হয় কোথায় ? নবু মামা উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাবি, তোমার জন্য আনলাম। তোমার জন্য আনলাম। নবু মামা লাল মামির হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে এলো। কী ফুর্তি তার! লাল মামি বললেন, কলের গান না ? ছোটবেলায় দেখেছিলাম একবার। চোঙ আছে ? বাতি জ্বালাও না।

বাতি জ্বালানো হলো। লাল মামিকে দেখব কী ? নবু মামার দিকেই তাকিয়ে আছি। আনন্দে উত্তেজনায় নবু মামার চোখ জ্বলজ্বল করছে। মামি বললেন, ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো গানটা আরেকবার দাও।

সেই অপূর্ব গান আবার বেজে উঠল। বাইরে তখন ঝড়-বৃষ্টি।

সে-রাতের কথা আমার খুব মনে আছে।

একটি মানুষের সামগ্রিক জীবনে মনে রাখবার মতো ঘটনা তো খুব সীমিত। কত মানুষ আছে, সমস্ত জীবন কেটে যায়, কোনো ঘটনাই মনে রাখবার মতো আবেগ তার ভেতর সৃষ্টি করে না। আমি নিজে কত কিছুই তো ভুলে বসে আছি। কিন্তু মনে আছে সে-রাতে গান শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই আমার চোখে পানি এসেছিল। নবু মামা আর লাল মামি যেন দেখতে না পায় সে-জন্যে আমি মাথা ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। নবু মামা বললেন, ভাবি, আমার নাচতে মন চাইছে।

নাচ না।

নবু মামা বললেন, রঞ্জু, তুই নাচবি আমার সঙ্গে ?

আমি সে-কথার জবাব দিলাম না। মামি বললেন, নবু, ঐ রেকর্ডটা আবার।

সারা রাত হবে আজকে, বুঝলে ভাবি।

ক্লান্তি নেই নবু মামার। লাল মামির উৎসাহও সীমাহীন। শুনতে শুনতে আমার ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো।

নবু মামা বললেন, গাধা! এত ফাইন গান, আর ঘুমায় কেমন দেখ।

লাল মামি বললেন, আজ তাহলে থাক। ঘুমো তোরা।

না-না, থাকবে না। যতক্ষণ ঝড়-বৃষ্টি হবে ততক্ষণই গান হবে।

কথা শেষ হতে-না-হতেই কড়কড় করে বাজ পড়ল। ফুর্তিতে নবু মামা হো হো করে হেসে ফেললেন। মামি বললেন, রঞ্জুর ঘুম পাচ্ছে। এগুলি নিয়ে আমার ঘরে এসে পড় নবু, আমাকে 'ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো' গানটা শুনে শুনে লিখে দিতে পারবি কাগজে?

নিশ্চয়ই পারব। নিশ্চয়ই।

জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছিল, উঠে বন্ধ করতে গিয়ে দেখি বড় নানিজানের ঘরের লাগোয়া গাবগাছটি ভেঙে পড়ে গেছে। কেমন ন্যাড়া দেখাচ্ছে জায়গাটা। ভালোই ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে, বাতাস থেমে গেলেও বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। কে জানে গতবারের মতো এবারেও হয়তো বান ডাকবে। গতবার এরকম সময়ে বাড়ি থেকে নদীর শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা গেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনি নবু মামা বলছেন, ভাবি, তুমিও গাও সঙ্গে সঙ্গে।

না না, আমি পারব না। তুই গা, মাটি মে পৌরণটা গা।

নবু মামা হেঁড়ে গলায় গান ধরলেন—

মাটি মে পৌরণ, মাটি মে শ্রাবণ
মাটি মে তনবন যায়গা
যব মাটি সে সব মিল যায়গা।

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল মামি বললেন, দক্ষিণের জানালা বন্ধ কর নবু, ভিজে যাচ্ছি।

নবু মামা বললেন, বাদশা ভাই কোথায়?

দু'দিন ধরে দেখা নেই। কোথায় কে জানে। 'যদি ভালো না লাগে' গানটা দে। ঘুম আসছে যে আবার। ও নবু, তোর ঘুম পায় না?

শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো। ঘুমুতে ইচ্ছে করছিল না। শুয়ে শুয়ে গান শুনতে কী ভালোই না লাগে! ক্রমে ক্রমে ঝড়ের মতো বাতাসের বেগ হলো। বাড়ির লম্বা থামে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ উঠতে লাগল। দড়াম দড়াম শব্দ করে দরজা নড়তে লাগল। উঠে দাঁড়িয়েছি হারিকেন জ্বালাব বলে, ওমনি সফুরা খালা ডাকলেন, রঞ্জু, ও রঞ্জু।

দরজা খুলে দেখি সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে সফুরা খালা বৃষ্টির ছাটে ভিজছেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, এদিকে গান হচ্ছিল নাকি রঞ্জু?

হ্যাঁ, নবু মামা কলের গান বাজাচ্ছিলেন। কলের গান এনেছেন নবু মামা।

নবু কোথায় ?

লাল মামি আর নবু মামা গান বাজাচ্ছেন।

সফুরা খালা আরো একটু এগিয়ে এসে বললেন, কই, গান শুনছি না তো ?

আমরা দু'জন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সফুরা খালা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, রঞ্জু, আমার ভীষণ ভয় লাগছে।

১০

সেই অপূর্ব বৃষ্টিস্নাত রাতে যে ভয় করবার মতো কিছু একটি লুকিয়ে ছিল, তা আমি বুঝতে পারি না। সফুরা খালা শীতে কাঁপছিলেন। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তবু শুধুমাত্র তাঁর কথা শুনেই ধারণা হলো, কোথাও নিশ্চয়ই ভয় লুকিয়ে আছে।

সফুরা খালা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত চলে গেলেন, যেন কোনো হিংস্র জন্তু তাঁকে তাড়া করছে। মাতালের মতো বেসামাল পদক্ষেপ। আমি এসে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। মেঘ কেটে গেছে, রোদ উঠেছে ঝকঝকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব কিনা ভাবছি, তখন নবু মামা এসে ডাকলেন, আয়, মাছ মারতে যাই। নতুন পানিতে মেলা মাছ এসেছে।

ছিপ, কানিজাল ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে নৌকা করে চললাম দু'জনে হলদাপোতা। কিন্তু নবু মামার মাছ মারার মন ছিল না। অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা বলতে লাগলেন। দুপুর পর্যন্ত আমরা ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম। নবু মামার ভাবভঙ্গি আমার কাছে কেমন কেমন লাগল। তিনি যেন বিশেষ কোনো কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিয়ের কথা হলে কিশোরী মেয়েরা যেমন পালিয়ে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়, অনেকটা সে-রকম। নবু মামা বললেন, রঞ্জু আমি আর পড়াশুনা করব না।

কেন ?

ভালো লাগে না।

কী করবেন তবে ?

ব্যবসা করব। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব।

নানাজান মানবে না।

আমি কারো ধার ধারি নাকি ?

বলতে বলতে নবু মামা ঈষৎ হাসলেন। দুপুরে খাওয়ার জন্যে চিড়া আর নারিকেল আনা হয়েছিল, তাই খাওয়া হলো। হলদাপোতা থেকে আমরা আরো উত্তরে সরে গেলাম।

আমার আর ভালো লাগছিল না, রোদে গা তেতে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছে ফিরে যাই, কিন্তু নবু মামা বারবার বলছেন, একটা বড় মাছ ধরি আগে।

সন্ধ্যার আগে আগে প্রকাণ্ড একটা কাতল মাছ ধরা পড়ল। সুগঠিত দেহ, কালচে আঁশ বেলাশেষের রোদে ঝকমক করছে। নৌকার পাটাতনে মাছটা ধড়ফড় করতে লাগল। দু'জনেই মহাখুশি। নবু মামা খুব যত্নে বঁড়শি খুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি বললাম, চলুন ফিরে চলি।

চল।

ভাটার টানে নৌকা ভেসে চলেছে। হঠাৎ করে নবু মামার ভাবান্তর হলো। আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, মাছটা ছেড়ে দিই রঞ্জু ?

কেন মামা ?

না, ছেড়ে দি।

বলেই মাছটা জলে ফেললেন। আমি চুপ করে রইলাম। নবু মামা বললেন, একবার আমি একটা পাখি ধরেছিলাম। টিয়া পাখি। তারপর কী মনে করে ছেড়ে দিয়েছি। আমার খুব লাভ হয়েছিল।

কী লাভ ?

হয়েছিল। আজকে মাছটা ছেড়ে দিলাম, দেখিস মাছটা দোয়া করবে আমার জন্যে।

নবু মামা পাটাতনে শুয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বাড়ি এসে দেখি হুলস্থুল কাণ্ড। লাল মামির সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে সফুরা খালার। লাল মামি টেনে সফুরা খালার এক গোছা চুল তুলে ফেলেছে, গাল আঁচড়ে দিয়েছে। সফুরা খালা বিষম দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লাল মামি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই।

বাদশা মামা আধময়লা একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে বলছেন, সবাই যদি এলাচির সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে বেচারি কী করবে ? কেউ দেখতে পারে না! ছোট নানিজান শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। একবার ধমকে দিলেন, যা তুই, খামাখা ঘ্যানঘ্যান। ভাল্লাগে না।

বাদশা মামা উঠোনে গিয়ে বসে রইলেন। বোকার মতো তাকাতে লাগলেন এদিক-সেদিক। নবু মামাকে দেখে বললেন, দেখলি নবু, সফুরা কী ঝগড়া করল ? এলাচির সারা দিন খাওয়া নাই।

রাতের খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হলো। রান্নাবান্না হতে দেরি হয়েছে। সংসারযাত্রা কিছু পরিমাণে বিপর্যস্ত। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমুতে এসে দেখি সফুরা খালা বসে আছেন আমাদের ঘরে। সফুরা খালা বললেন, তোমাদের জন্যে বাইরের বাংলাঘরে বিছানা হয়েছে। এ ঘরে আমি থাকব। তাকিয়ে দেখি পরিপাটি করে ঘর সাজানো। আমার আর নবু মামার ব্যবহারিক জিনিসপত্র কিছুই নেই। নবু মামা বললেন, তুই থাকবি কেন এখানে ? তোর নিজের ঘর কী হলো ?

আমার ঘরে পানি পড়ে, বিছানা ভিজে যায়।

নবু মামা কিছুক্ষণ উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হনহন করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সফুরা খালা বললেন, রঞ্জু, তুমি নবুকে চোখে চোখে রাখবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বাদশা মামার সঙ্গে দেখা। বাদশা মামা বললেন, রঞ্জু, এলাচি ভাত খেয়েছে কিনা জানিস ?

জানি না।

মোহরের মা বলল, খেয়েছে। তুই একটু খোঁজ নিয়ে আয়।

আপনি নিজে যান না মামা।

আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিজেই যাই।

লাল মামি সেদিন না-খেয়ে ছিলেন। রাতেও খেলেন না, দুপুরেও ভাত নিয়ে গিয়ে মোহরের মা ফিরে এলো। সফুরা খালা অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু লাভ হলো না। শেষ পর্যন্ত নানাজান এলেন। বিরক্ত ও দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, এ সব কী বউ ?

লাল মামি কথা বললেন না। নানাজান বললেন, খাও খাও, ভাত খাও।

না, খাব না।

সমস্ত দিন কেটে গেল। সফুরা খালা কাঁদতে লাগলেন। কী বিশ্রী অবস্থা! বাদশা মামা নৌকা করে চলে গিয়েছেন শ্রীপুর। লাল মামির মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন একেবারে।

কানাবিবি বারবার বলে, বউয়ের কোনো খারাপ বাতাস লেগেছে, না হলে এমন হয়! মুকুন্দ ওঝাকে খবর দেও না একবার।

লাল মামির মা খবর পেয়েই এসে পড়লেন। লাল মামি বলল, না, আমি কিছুতেই খাব না। এ বাড়িতে কিছু খাব না আমি। নানাজান বললেন, আচ্ছা, মেয়েকে না হয় নিয়েই যান। ক'দিন থেকে সুস্থ হয়ে আসুক।

ধরাধরি করে লাল মামিকে নৌকায় তোলা হলো। নৌকার পাটাতনে বাদশা মামা তাঁর স্যুটকেস নিয়ে আগে থেকেই বসে আছেন। লাল মামি বাদশা মামাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন, ও গেলে আমি যাব না। আল্লাহর কসম, আমি যাব না।

বাদশা মামা চুপচাপ নেমে পড়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতো সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। যেন কিছুই হয়নি। তাঁর কাণ্ড দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল।

১১

নবু মামার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সবাই। মেয়ে তো আগেই ঠিক করা ছিল, এবার কথাবার্তা এগুতে লাগল। নানাজান অনেক রকম মিষ্টি, হলুদ রঙের শাড়ি ও কানের দুল নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে গেলেন। সঙ্গে গেলেন হেডমাস্টার

সাহেব, আজিজ খাঁ সাহেব। আমিও গেলাম তাঁদের সঙ্গে। কী মিষ্টি মেয়ে, শ্যামলা রঙ, বড় বড় চোখ। একনজর দেখলেই মন ভরে ওঠে। দেখে আমার বড় ভালো লাগল। পৌষ মাসের মাঝামাঝি দিন ফেলে নানাজান উঠে এলেন।

বাড়িতে একটি চাপা আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। সবচেয়ে খুশি সফুরা খালা। হাসি-হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সবার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে গল্প। নবু মামার কিন্তু ভাবান্তর নেই। কী হচ্ছে না-হচ্ছে, তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। মাছ ধরতে যান। কোথাও যাত্রাটাত্রার খবর পেলে যাত্রা শুনতে যান।

গ্রামের মাঠে ফুটবল নেমে গেছে। সারা বিকাল কাটান ফুটবল খেলে। সেন্টার ফরোয়ার্ডে তিনি দাঁড়ালে প্রতিপক্ষ তটস্থ হয়ে থাকে। শীল্ডের অনেক খেলা শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের টিম খুব শক্ত। ফাইনালে উঠে যাবে সন্দেহ নেই। নবু মামা প্রাণপণে খেলেন। মরণপণ খেলা। বল নিয়ে দৌড়ে যাবার সময় তাঁর মাথার লম্বা চুল বাতাসে থরথরিয়ে কাঁপে। মাঠের বাইরে বসে বসে মুগ্ধ নয়নে আমি তাই দেখি। রাতেরবেলা গরম পানি করে আনি, নবু মামা গরম পানিতে পা ডুবিয়ে অন্যমনস্কভাবে নানা গল্প করেন। লাল মামি প্রসঙ্গে কোনো আলাপ হয় না। তিনি সেই যে গিয়েছেন আর ফেরার নাম নেই। বাদশা মামা প্রতি হাটবারে নৌকা নিয়ে চলে যান। আবার সেই দিনই ফিরে আসেন। লাল মামির ঘরেই বাকি সময়টা কাটে তাঁর। আমি বুঝতে পারি কোথাও সুর কেটে গিয়েছে। ভালো লাগে না। কবে লিলির চিঠি আসবে, কবে আমি চলে যেতে পারব, তাই ভাবি। তখন আমি অনেক রকম স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকতে ঘেন্না বোধ হচ্ছে, অথচ বেরিয়েও আসতে পারছি না। বড় নানিজান অনেক সম্পত্তি নাকি আমাকে আর লিলিকে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তাছাড়া সে-সময়ে আমি প্রেমেও পড়েছিলাম। অচিনপুরের এই কাহিনীতে সে-প্রেমের উল্লেখ না করলেও চলে, কারণ তার কোনো ভূমিকা নেই এখানে। তবে প্রচণ্ড পরিবর্তন হচ্ছিল আমার মধ্যে— এইটুকু বলা আবশ্যক।

নবু মামার স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট হলো তখন। খুবই ভালো রেজাল্ট। ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ বলে কী-একটা স্কলারশিপ পেলেন। কলেজে ভর্তি হবার জন্যে টাকা-পয়সা নিয়ে নবু মামা রওনা হলেন। নানাজানের ইচ্ছে ছিল, নবু মামা যেন আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নবু মামার ইচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজ।

নবু মামার বিয়ের তারিখ ঠিকই থাকল। নবু মামা নিজেও একদিন মেয়ে দেখে এলেন। সফুরা খালা যখন বললেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ?— নবু মামা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে।

বারোই ভাদ্র তারিখে নবু মামা চলে গেলেন। আর তেরই ভাদ্র বাদশা মামা শ্রীপুর থেকে আধপাগল হয়ে ফিরে এলেন। আমি ভাসা ভাসাভাবে শুনলাম, লাল মামি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার নাম করে নবু মামার সঙ্গে চলে গিয়েছেন।

কেউ যেন জানতে না পারে, সেই জন্যে বাদশা মামাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হলো। তাঁর মাথার ঠিক নেই, কখন কাকে কী বলে বসেন। ছোট নানিজানের ফিটের ব্যারাম হয়ে গেল। সফুরা খালাকে দেখে কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ে না, শুধু তাঁর চোখে কালি পড়েছে। মুখ শুকিয়ে তাঁকে দেখায় বাচ্চা ছেলেদের মতো।

নানাজান সেই বৎসরেই হজ করতে গেলেন। যাওয়ার আগে সব সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত হলো। বাদশা মামাকে সব লিখে-পড়ে দিয়ে গেলেন।

একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন বটগাছ যেন চোখের সামনে শুকিয়ে উঠেছে। সবুজপাতা ঝরে যাচ্ছে, কাণ্ড হয়েছে অশক্ত। আমি তাই দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে। শৈশবের যে অবুঝ ভালোবাসায় নানাজানের বাড়িটিকে আমি ঘিরে রেখেছিলাম, সেই ভালোবাসা করুণ নয়নে চেয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু আমি তো এখানের কেউ নই। একদিন চুপচাপ চলে যাব। কেউ জানতেও পারবে না, রঞ্জু নামের আবেগপ্রবণ ছেলেটি হঠাৎ কোথায় চলে গেল।

এত বড় বাড়ি, অথচ এই ক'জন মাত্র মানুষ আমরা। রাতেরবেলা গা ছমছম করে। মোহরের মা মাঝেমধ্যে চমকে ওঠে, ওটা কী গো, ও মা, ভূত নাকি ? গাছের পাতায় বাতাস লেগে সরসর শব্দ হয়।

এ বাড়ির সব কিছুই বদলে গেছে। লাল ফেজটুপি-পরা নানাজান সূর্য ওঠার আগেই উঠোনের চেয়ারে এসে আর বসেন না। 'ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান'— ঘুম ঘুম চোখে অর্ধজাগ্রত কানে কতবার শুনেছি এই সুর। এখন সকালটা বড় চুপচাপ।

ভোরের আলোয় মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আমি চাই এ বাড়ির সবার মনের গ্লানি কেটে যাক। নবু মামা ফিরে এসে আগের মতো জোছনা দেখে উল্লাসে চিৎকার করুক— 'কী জোছনা, খেতে ইচ্ছে করে!' সফুরা খালা ঠিক আগের মতো লাঠি হাতে 'পাখি উড়ে গেল' বলে এ সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট উড়িয়ে দিক। বাদশা মামা তার সাজ-পোশাক পরে হিরণ্য রাজার পার্ট করুক। কিন্তু তা আর হবে না, তা হবার নয়। আমি সংসারের মন্থর স্রোতে গা এলিয়ে দিলাম। কারো সঙ্গেই আজ আমার যোগ নেই। দিন কেটে যেতে লাগল।

১২

টিনের কানেস্তারায় বাড়ি পড়েছে। উচ্চকণ্ঠে কী যেন ঘোষণা করা হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে দাঁড়াতেই দেখি বাদশা মামা বিব্রত মুখে সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে হাঁটছেন। তার আগে আরেকজনকে টিনে বাড়ি দিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে কী বলছে। আমি বললাম, কী ব্যাপার, মামা ?

কিছু না, কিছু না।

ঢোল দিচ্ছে কে, আপনি নাকি ?

হুঁ।

কিসের জন্যে ?

বাদশা মামা দাঁড়িয়ে পড়লেন। জড়িত কণ্ঠে বললেন, রহমত পাগলার জন্যে ঢোল দিচ্ছি। যদি কেউ পায়, তাহলে পাঁচ টাকা পুরস্কার।

কেন, কী হয়েছে ?

বাদশা মামা এগিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু আমি ততক্ষণে তাঁর হাত চেপে ধরেছি। মামা অসহায়ভাবে তাকালেন আমার দিকে। আমি দৃঢ় গলায় বললাম, বলেন কী ব্যাপার।

রঞ্জু, পাগলটাকে খেদিয়ে দেবার পর থেকে যত অশান্তি শুরু হয়েছে, ফিরিয়ে আনলে যদি সব মিটে...

মামা আমার হাত ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন।

বাদশা মামা আরো অনেক রকম পাগলামি করতে লাগলেন। নানাজানের একটি আম-কাঁঠালের প্রকাণ্ড বাগান ছিল, জলের দরে সেটি বেচে দিলেন। বিক্রির টাকা দিয়ে নাকি মসজিদ করবেন। ছোট নানিজান কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, এসব কী রে বাদশা ?

বাদশা মামা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন— সাদা পোশাক-পরা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে বললেন, মসজিদ কর, সব কিছু ঠিক হবে। ছোট নানিজান বললেন, বাদশা, তুই মিথ্যা কথা বলছিস। বাদশা মামা মাথা নিচু করে চলে গেলেন। মসজিদের জন্যে ইট পোড়ানো হতে লাগল। ময়মনসিংহ থেকে রাজমিস্ত্রি এলো। বিরাট এক মিলাদ মাহফিলের মধ্যে মসজিদের কাজ শুরু হলো।

নানাজানের দু'টি বিল ছিল। বিলের মাছ থেকে পয়সা আসত বিস্তর। সেই টাকায় সংসার খরচ গিয়েও বেশ মোটা অংশ জমত। বিল দু'টি একই সঙ্গে হাতছাড়া হয়ে গেল। কীভাবে হলো, কেউ বলতে পারল না। নানিজান সারাদিন চোখের পানি ফেলতে লাগলেন।

রহিম শেখ একসঙ্গে বেশ কয়েকটি মামলা রজু করল। সমস্তই মিথ্যা মামলা। বাদশা মামা নির্বিকার বসে আছেন মসজিদের সামনে। দেখছেন কী করে ইটের পর ইট বিছিয়ে ভিত তৈরি হচ্ছে। মামলার তদবিরের জন্য ছোট নানিজানকে নিয়ে আমিই যাওয়া-আসা করতে লাগলাম। দীর্ঘ দিন মামলা চলল। দু'টিতে জিত হলো আমাদের, একটি রহিম শেখ পেল।

নানাজান হজ থেকে ফিরে এলেন এই সময়ে। সংসারের তখন ভরাডুবি ঘটেছে। রোজকার বাজারের টাকাতেও টানাটানি পড়তে শুরু করেছে। নানাজান কিছুই বললেন না। ছয় মাসেই তাঁর বয়স ছয় বছর বেড়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি হয়েছে নিষ্প্রভ, একা একা হাঁটতে পারেন না। লাঠিতে ভর না দিয়ে দাঁড়াতে পারেন না।

চোখের সামনে সংসারকে ভেঙে পড়তে দেখলেন। তবু সকালবেলায় কুরআন শরীফ ধরে বিলম্বিত সুরে পড়তে লাগলেন, 'ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান।' অতএব তুমি আমার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে ?

বৎসর যাবার আগেই সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিতে হলো। বাদশা মামার মসজিদ ততদিনে শেষ হয়েছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে চমৎকার নকশিকাটা গম্বুজ। ধবধবে সাদা দেয়ালে নীল হরফে লেখা কলমায়ে তৈয়ব। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমপারা হাতে সকালবেলাতেই মসজিদে ছবক নিতে আসে। দেখেশুনে বাদশা মামা মহাসুখী। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে মসজিদের সামনে পুকুর কাটিয়ে দিলেন। কী সুন্দর টলটলে জল পুকুরে, পাথরে বাঁধানো প্রশস্ত ঘাট।

বাদশা মামাকে দেখে আমার নিজেরও ভালো লাগে। সাদা গোলটুপি পরে চোখে সুরমা দিয়ে কেমন গর্বিত ভঙ্গিতে নামাজ পড়তে যান। একদিন আমাকে ডেকে একটু ইতস্তত করে বললেন, রঞ্জু, জুমার রাত্রে তাহাজ্জতের নামাজ পড়ে শুয়েছি, অমনি স্বপ্নে দেখি— তোর লাল মামি যেন নৌকায় করে ফিরে আসছে। আসবে ফিরে, দেখিস তুই। বাদশা মামার চোখ আনন্দে চকচক করে।

লাল মামির কথা ভাবতে চাই না আমি। তবু বড় মনে পড়ে। কে জানে কোথায় সংসার পেতেছে তারা। নাকি যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশময়। কোনো দিন কি সত্যি ফিরে আসবে ধ্বসে যাওয়া পরিবারটিকে শেষবারের মতো দেখে যেতে ?

নিজের কথাও আজকাল খুব ভাবি। আজন্ম যে-রহস্যময়তার ভেতর বড় হয়েছি তা সরে সরে যায়। মনে হয় কিছুই রহস্য নয়। চাঁদের আলো, ভোরের প্রথম সূর্য সমস্তই রহস্যের অতীত প্রাকৃতিক নিয়মাধীন। যে-নিয়মের ভেতর আমরা জন্মাই, বড় হই, দুঃখকষ্ট পাই। দুঃখ ও সুখ কী তা নিয়েও ভাবতে চেষ্টা করি। মোহরের মা যখন তার আজীবন সঞ্চিত পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে অশ্রুসজল চোখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'ও ব্যাটা রঞ্জু, যাই গো ব্যাটা। তোমারার দুঃসময়ে একটা মানুষের বোঝা আর বাড়াইতাম না গো।' তখন আমার কোনো দুঃখবোধ হয় না। এ যেন ঘটতই। তাহলে দুঃখ কী ? নতুন করে আবার সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে শুনে ছোট নানিজান যখন উন্মাদের মতো কাঁদেন, তখন বুঝি এই-ই দুঃখ। অথচ সফুরা খালা যখন হাসিমুখে বলেন, 'গরিব মানুষ হওয়ার অনেক রকম মজা আছে রঞ্জু। তুমি ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াতে পারবে, কেউ কিছু বলবে না।' তখন সব ভাবনা-চিন্তা জট পাকিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা আমি নানাজানের হাত ধরে তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যাই। হিম লেগে তাঁর কাশি হয়, খুকখুক করে কাশেন। আমি যদি বলি 'চলেন ঘরে যাই', নানাজান আঁতকে ওঠেন, 'না-না, আরেকটু— আরেকটু বেড়াই।' পরম নির্ভরতার সঙ্গে তিনি আমার হাত ধরে হাঁটেন। বেলাশেষের সূর্যরশ্মি তাঁর সফেদ দাড়িতে চকচক করে।

১৩

লিলির যে-চিঠির জন্যে পরম আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিলাম, সে-চিঠি এসে গেছে। লিলি গোটা গোটা হরফে লিখেছে—

> আমি জানি, তুই রাগ করেছিস। কত দিন হলো গিয়েছি, কিন্তু কখনো তোর কাছে চিঠি লিখিনি। কী করব বল ? এমন খারাপ অবস্থা গেছে আমার। তোর দুলাভাইয়ের চাকরি নেই। বসতবাটিও পদ্মায় ভেঙে নিয়েছে। একেবারে ভিক্ষা করবার মতো অবস্থা। কত দিন যে মাত্র একবেলা খেয়েছি। তারপর আবার তোর দুলাভাইয়ের অসুখ হলো। মরোমরো অবস্থা। এখন অবশ্যি ঠিক হয়ে গেছে সব। তুই অতি অবশ্যি এসে যা রঞ্জু।

লিলির চিঠি পকেটে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই। সবাইকে ছেড়ে যেতে বড় মায়া লাগে। আশৈশব পরিচিত এ বাড়িঘর। বাদশা মামা, নানাজান, লাল মামি, নবু মামা এঁদের সবার স্মৃতির গন্ধ নিয়ে যে-বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ছেড়ে কী করে যাই ? আমি উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সোনাখালির পুলের উপর অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকি। নৌকা নিয়ে চলে যাই হলদেপোতা। খুব জোছনা হলে সফুরা খালাকে নিয়ে পুকুরঘাটে বেড়াতে যাই। সফুরা খালা বলেন, তুমি কবে যাবে রঞ্জু ?

যে-কোনো একদিন যাব।

সেই যে-কোনো একদিনটা কবে ?

হবে একদিন।

একেক রাতে সফুরা খালা কাঁদেন। তাঁর গভীর বিষাদ বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। বুঝতে চাই না। যে-বন্ধন আমাকে এখানে আটকে রেখেছে, কবে তা কাটবে, কবে চলে যাব— তাই ভাবি। নানাজানও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, তোমার যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে ?

না।

তোমার আর লিলির নামে যে-জমিজমা আছে, তার কী হবে ?

যেমন আছে তেমন থাকবে।

নানাজান কথা বললেন না। আমি জানি এই জমিটুকুই তাঁদের অবলম্বন।

সে-রাতে ভীষণ শীত পড়েছিল। সন্ধ্যা না নামতেই ঘন কুয়াশা চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলল। রাতের খাওয়ার পর হারিকেন হাতে বাইরের ঘরে আসছি, হঠাৎ দেখি বাদশা মামা দারুণ উত্তেজিত হয়ে দ্রুত আসছেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

রঞ্জু, দেখ দেখ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, একটু দূরে, লাল মামি একটি বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে বিপন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বাদশা মামা বলে চলেছেন, নৌকা করে সন্ধ্যার

আগেই এরা দু'জন এসেছে। চুপচাপ বসে ছিল। আমি মসজিদে যাব বলে ওজু করতে গিয়েছি, এমন সময়...

লাল মামি বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। (যে উঠোনে অনেক অনেক দিন আগে আমার মা তাঁর দু'টি ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।) কেউ কোনো কথা বলল না। নানাজান চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট নানিজান যেন কিছুই বুঝছেন না, এমন ভঙ্গিতে তাকাতে লাগলেন। সফুরা খালা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি নিচে নেমে এলেন। বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর গরম শালটা কোথায় সফুরা ? এলাচির শীত করছে।

নবু মামার কথা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। সবাই চুপ করে রইল। এক সময় দেখলাম লাল মামি কাঁদছেন।

আমি চুপচাপ বাইরের ঘরে বসে বসে ঝিঁঝির ডাক শুনতে লাগলাম। অনেক রাতে বাদশা মামা আমাকে ডেকে নিলেন। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, তোরা সবাই যদি দূরে দূরে থাকিস, তাহলে এলাচি কী মনে করবে বল ? চল রঞ্জু।

বাদশা মামা আমার হাত ধরলেন।

বহু দিন পর লাল মামির ঘরে এসে ঢুকলাম। পালঙ্কে লাল মামি আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর কোলের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে বাচ্চা মেয়েটি ঘুমিয়ে। আমি এসে বসতেই লাল মামি একটু সরে গেলেন। আমি বললাম, কেমন আছেন মামি ?

মামি মাথা নাড়লেন। বাদশা মামা বললেন, মোটেই ভালো না রঞ্জু। দেখ না, স্বাস্থ্য কী খারাপ হয়ে গেছে! আমি চুপচাপ বসে রইলাম। বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে পুরনো গ্রামোফোন খুঁজে বের করলেন।

আমি বললাম, আজ থাক, মামা।

না না, শুনি। আমার শোনার ইচ্ছা হচ্ছে।

লাল মামি মৃদু কণ্ঠে বললেন, না না, থাকুক। গান বাজাতে হবে না।

তবু গান বেজে উঠল—

আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো
তোরে আমি কোথায় রাখি বল।

আমি চলে এলাম। এই অচিনপুরীতে থাকবার কাল আমার শেষ হয়েছে।

নির্বাসন

রাত্রিতে তাঁর ভালো ঘুম হয়নি।

বার বার ঘুম ভেঙেছে— তিনি ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখেছেন। না, এখনো রাত কাটেনি। একবার হিটার জ্বালিয়ে কফি বানালেন, কিছুক্ষণ পায়চারি করে এলেন ছাদে। আবার বিছানায় ফিরে গিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করলেন। ছাড়া ছাড়া ঘুম, অর্থহীন এলোমেলো স্বপ্ন দেখে আবার ঘুম ভাঙল।

ভোর হতে আর কত দেরি ? আকাশে সামান্য একটু আলোর রেখা কখন ফুটবে ? কা কা করে কাক ডাকছে। অন্ধকার যেন একটু ফিকে হয়ে গেল। আর হয়তো বেশি দেরি নেই। তিনি এই শীতেও ঘরের দরজা-জানালা সব খুলে দিলেন। জানালার সমস্ত পর্দা গুটিয়ে ফেললেন। অন্ধকারে কিছুই নজরে আসছে না। কিন্তু তিনি বাতি জ্বালালেন না। হাতড়ে হাতড়ে ইজিচেয়ারটি খুঁজে বের করলেন। এখানে শুয়ে থেকেই রেডিওগ্রামের সুইচ নাগাল পাওয়া যায়। রেডিওগ্রামে সানাইয়ের তিনটি লং প্লেইং রেকর্ড সাজানো আছে। সুইচ টিপলেই প্রথমে বেজে উঠবে বিসমিল্লাহ খাঁর মিয়া কি টোরী। তিনি সুইচে হাত রেখে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন জরীর বিয়ের দিনে ভোরবেলায় সানাইয়ের সুর শুনিয়ে সবার ঘুম ভাঙাবেন। ঘুম ভাঙতেই সবাই যেন বুঝতে পারে— জরী নামের এ-বাড়ির একটি মেয়ে আজ চলে যাবে।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর চোখে জল এলো। বয়স হবার পর থেকে এই হয়েছে। কারণে অকারণে, চোখ ভিজে ওঠে। সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি বড় তীব্র হয়ে বুকে বাজে।

একতলায় কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঘটাং ঘটাং শব্দে টিউবওয়েলে কেউ একজন পানি তুলছে। মোরগ ডাকছে। ভোর হলো বুঝি! তিনি সুইচ টিপলেন।

সানাই শুনলে এমন লাগে কেন ? মনে হয় বুকের মাঝখানটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। তাঁর অদ্ভুত এক রকমের কষ্ট হতে লাগল। তিনি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হুহু করে শীতের হিমেল বাতাস বইছে। এবার বড় আগেভাগে শীত পড়ে গেল। খুব শীত পড়লেই তাঁর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। স্পষ্ট দেখতে পান, কমলালেবু হাতে সাত-আট বছরের একটি বাচ্চা ছেলে বারান্দায় বসে হুহু করে কাঁপছে। আজও তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। আহ্, পুরনো কথা ভাবতে এত ভালো লাগে! তিনি মনে মনে বললেন, ভাগ্যিস জন্তু জানোয়ার না হয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি।

জরী কি এখনো ঘুমুচ্ছে ? আজ ঘুম ভাঙলে তার কেমন লাগবে কে জানে ? তাঁর খুব ইচ্ছে হচ্ছে জরীকে ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে আসেন। সে আজ তাঁর সঙ্গে ছাদে

দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখুক। দেখুক খুব ভোরে চেনা পৃথিবী কেমন অচেনা হয়ে পড়ে। হালকা কুয়াশায় ঢাকা শীতের সকালে কী অপরূপ সূর্যোদয় হয়।

কিন্তু জরীটা বড্ড ঘুমকাতুরে। তিনি কত চেষ্টাই করেছেন সকালে জেগে ওঠার অভ্যাস করাতে। সে বরাবর আটটার দিকে উঠেছে। বিছানা না ছেড়েই চিৎকার—ও মা, চা দাও, ও মা, চা দাও। বাসি মুখে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে উঠে এসেছে দোতলায়। তিনি হয়তো ততক্ষণে রেয়াজ শেষ করে উঠবেন উঠবেন করেছেন। জরী হাসি মুখে বলেছে, বড় চাচা, আজ আপনার গান শুনতে পারলাম না।

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন, দশটায় ঘুম ভাঙলে কী গান শুনবে জরী ? আমার গান শুনতে হলে রাত কাটার আগে উঠতে হবে।

কাল ঠিক উঠব বড় চাচা। এই আপনার সেতার ছুঁয়ে বলছি।

বলতে বলতেই সেতারের তারে টোকা দিয়েছে জরী। 'গাঁও' করে একটি গম্ভীর আওয়াজ উঠেছে। শুনে জরীর সে কী হাসি।

তিনি মনে মনে বললেন, আজ শুধু জরীর কথা ভাবব। তিনি জরীর মুখ মনে করতে চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য, মনে আসছে না তো!

এরকম হয়। খুব ঘনিষ্ঠ লোকজন, যারা সব সময় খুব কাছাকাছি থাকে, হঠাৎ করে তাদের মুখ মনে করা যায় না। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ছাদে উঠে গেলেন।

এ বাড়ির ছাদটি প্রকাণ্ড। ছাদের চারপাশে বড় বড় ফুলের টবে অযত্নে কিছু গোলাপ চারা বড় হচ্ছে। তিনি ছাদের কার্ণিসে ঝুঁকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সামনে হাত বাড়ালেন। ছাদের এদিকটায় দু'টি প্রকাণ্ড আমগাছ দিনেরবেলাতেও অন্ধকার করে রাখে। চারদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে এলেও এখানে কালো রঙ জমাট বেঁধে আছে। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শীতকালে আমের মুকুল হয় নাকি ?

বড় চাচা!

তিনি চমকে পিছনে ফিরলেন। আশ্চর্য! জরী দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পেছনে। ঘুম জড়ানো ফোলা ফোলা মুখ। মেয়েটিকে আজ বড় অচেনা মনে হচ্ছে। এত রূপসী তো জরীকে কখনো মনে হয়নি। বিয়ের আগের দিন সব মেয়ে নাকি গুটিপোকার মতো খোলস ছেড়ে প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসে। তিনি হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন।

বড় চাচা, কী করছেন একা একা ?

সানাই শুনছি।

আজ আমি খুব ভোরে উঠেছি। আপনি খুশি হয়েছেন চাচা ?

তিনি হাসলেন। জরী একটা হলুদ রঙের চাদর গায়ে জড়িয়েছে। একটু একটু কাঁপছে শীতে।

জরী, তোর শীত লাগছে ?

উঁহু। আপনি আজ রেওয়াজ করবেন না চাচা ?

না মা। আজ আমার ছুটি।

দু'জনে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। জরী অস্ফুট স্বরে বলল, ইস কী কুয়াশা পড়েছে বাবা!

তিনি এক সময় বললেন, সানাই শুনতে ভালো লাগছে জরী ?

লাগছে।

কে বাজাচ্ছে জানিস ?

জানি না, কে বাজাচ্ছে ?

বিসমিল্লাহ খাঁ, এখন বাজছে মিয়া কি টোরী।

জরী আরো কাছে সরে এসে কার্ণিশে ভর দিয়ে দাঁড়াল। মৃদু গলায় বলল, কী সুন্দর লাগছে! আগে জানলে রোজ ভোরে উঠতাম। তিনি জরীর দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন। জরী বলল, একটা হালকা সুবাস পাচ্ছেন বড় চাচা ?

পাচ্ছি।

বলুন তো কিসের ?

তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন। শিউলি ফুলের নাকি ? বাগানে একটি শিউলি গাছ আছে। কিন্তু সে ফুলের গন্ধ তো হালকা।

এতক্ষণে সূর্য উঠল। গাছে গাছে কাক ডাকছে। কিচিরমিচির করতে করতে দু'টি শালিক এসে বসল ছাদে। জরী হাত বাড়িয়ে দু'টি আমের পাতা ছিঁড়ে এনে গন্ধ শুঁকল। তিনি দেখলেন জরী কাঁদছে। তিনি চুপ করে রইলেন। আহা, একটু কাঁদুক। এমন একটি সময়ে না কাঁদলে মানায় না। তাঁর ভীষণ ভালো লাগল। তিনি কোমল গলায় বললেন, জরী দেখ, সূর্য উঠছে। এমন সুন্দর সূর্যোদয় কখনো দেখেছিস ?

জরী চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, সান্তাহার যাবার সময় একবার ট্রেনে দেখেছিলাম।

দেখ, আজকে আবার দেখ।

জরী ফিসফিস করে বলল, কী সুন্দর! বলতে বলতে জরী আবার চোখ মুছল।

তিনি নরম গলায় বললেন, বোকা মেয়ে, আজকের দিনে কেউ কাঁদে ? ঐ দেখ দু'টি শালিক পাখি। দুই শালিক দেখলে কী হয় মা ?

জরী ফিসফিস করে বলল, ওয়ান ফর সরো, টু ফর জয়।

ঠিক তখনি জরীর বন্ধুরা নিচ থেকে 'জরী জরী' করে চেঁচাতে লাগল। জরী নিঃশব্দে নিচে নেমে গেল।

তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ভোরের এরকম অচেনা আলোয় মন বড় দুর্বল হয়ে যায়। আপনাকে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। বড় বেশি মনে পড়ে দিন ফুরিয়ে গেল। তিনি সুর করে পড়লেন—

‘ফাবিআয়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান।’

২

কাল রাতে চার বান্ধবী জরীকে নিয়ে এক খাটে ঘুমিয়েছিল। এরা অনেকদিন পর এক সঙ্গে হয়েছে। লায়লার সঙ্গে জরীর দেখা হয়েছে প্রায় চার বছর পর। আভা ও কনক ময়মনসিংহে থাকলেও দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হয় না বললেই চলে। রুনু দূর সম্পর্কের বোন। স্কুলের পড়া শেষ হবার পর একমাত্র তার সঙ্গেই জরীর রোজ রোজ দেখা হতো। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে শেলী ও ইয়াসমীন আসেনি।

অনেকদিন পর মেয়েবন্ধুরা একত্রিত হলে একটা দারুণ ব্যাপার হয়। আচমকা সবার বয়স কমে যায়। প্রতিনিয়ত মনে হয় বেঁচে থাকাটা কী দারুণ সুখের ব্যাপার।

জরীর বন্ধুরা গত পরশু থেকে ক্লান্তিহীন হৈচৈ করে যাচ্ছে। গুজগুজ করে খানিকক্ষণ গল্প, পর মুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত হাসি। আবার খানিকক্ষণ গল্প, আবার হাসি। একজনকে হয়তো দেখা গেল হঠাৎ কী কারণে দল ছেড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। তার পিছনে পিছনে ছুটছে বাকি সবাই। খিলখিল হাসির শব্দে সচকিত হয়ে উঠেছে বাড়ির লোকজন।

গতরাতটা তাদের জেগেই কেটেছে। আভা তার প্রেমের গল্প বলেছে রাত একটা পর্যন্ত। তার প্রেমিকটি একজন অধ্যাপক। আভার বর্ণনানুসারে দারুণ স্মার্ট ও খানিকটা বোকা। সে তার স্মার্ট প্রেমিকটির দু'টি চিঠিও নিয়ে এসেছিল বন্ধুদের দেখাতে। কাড়াকাড়ি করে দেখতে গিয়ে সে চিঠির একটি ছিঁড়ে কুটি কুটি। অন্যটি থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাই বানান ভুল বের করতে লাগল। একটি ভুল বের হয়, আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সবাই।

মাঝরাতে লায়লার হঠাৎ চা খাবার ইচ্ছে হলো। কনক বলল, চমৎকার, চল সবাই ছাদে বসে চা খাই।

রুনু রাজি হলো না। তার নাকি ঘুম পাচ্ছে। সে বলল, এই শীতে ছাদে কেন? এখানেই তো গল্পগুজব করছিস।

কনক বলল, ছাদে আমি গান শোনাব। সঙ্গে সঙ্গে দলটি চেঁচিয়ে উঠল। গত দু'দিন ধরেই কনককে গাইবার জন্যে সাধাসাধি করা হচ্ছে। লাভ হয়নি। কনক কিছুতেই গাইবে না। লায়লা একবার বলেই ফেলল, একটু নাম হয়েছে এতেই এত তেল, টাকা না পেলে আজকাল তুই আর গাস না?

কনক কিছু বলেনি, শুধু হেসেছে।

ধুপধাপ শব্দ করে সবাই যখন ছাদে উঠল, নিশীথ রাত। চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। জরী বলল, দূর ছাই জোছনা নেই। আমি ভেবেছিলাম জোছনা আছে। আভা বলল, আমার ভয় করছে ভাই, গাছের উপর ওটা কী ?

ওটা হচ্ছে তোর অধ্যাপক প্রেমিকের এঞ্জেল বডি। তোকে দেখতে এসেছে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এই হাসির মধ্যেই গান শুরু করল কনক, 'সঘন গহন রাত্রি...।'

গান শুরু হতেই সবাই চুপ করে গেল। আভা চাপা গলায় বলল, কী সুন্দর গায়। বড় হিংসা লাগে।

কনকের গলা খুব ভালো। ছোটবেলায় কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি অল্প সময়ে কনকের এত নামডাক হয়ে যাবে। রেডিওতে প্রথম যখন গায় তখন সে কলেজে পড়ে। তার পরপরই তার গানের প্রথম ডিস্ক বের হয়— যার এক পিঠে, 'আমি যখন তার দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই।' অন্য পিঠে 'ওগো শেফালী বনের মনের কামনা।'

কনক পর পর চারটি গান গাইল। গানের মাঝখানে জরীর মা চায়ের পট নিয়ে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন, নাও তোমাদের চা। এত রাতে ছাদে গান বাজনা কি ভালো ? চা খেয়ে ঘুমুতে যাও সবাই।

কেউ নড়ল না। রুনু বলল, কনক, আজ সারারাত তোকে গাইতে হবে।

জরীর মা-ও এক পাশে বসে পড়লেন। জরীর বড় চাচাও উঠে এসেছেন ছাদে। আসর যখন ভাঙল তখন রাত দু'টো। জরীর বড় চাচা বললেন, বড় ভালো লাগল মা, বড় মিঠা গলা। জরীর গলাও ভালো ছিল। কিন্তু সে তো আর শিখল না!

আভা বলল, এখন শিখবে।

সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল। কনক বলল, আপনার একটা গান শুনি ?

অন্যদিন, আজ অনেক রাত হয়েছে। তোমরা ঘুমুতে যাও।

সে-রাতে কারোরই ভালো ঘুম হলো না। জরীর বড্ড মন কেমন করতে লাগল। তার ইচ্ছে করল মা'র কাছে গিয়ে ঘুমোয়। কিন্তু সে মরার মতো পড়ে রইল। আভা একবার ডাকল, জরী ঘুমিয়েছিস ? জরী তার জবাব দিল না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। শুধু জরী জেগে রইল। বিয়ের আগের রাতে কোনো মেয়ে কি আর ঘুমুতে পারে ?

ইনিয়ে বিনিয়ে ভৈরবীর সুরে সানাই বাজছে। যে সুরটি উঠানামা করছে সেটি যেন একটি শোকাহত রমণীর বিলাপ। অন্য যে সুরটি ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে সেটি যেন বলছে, কেঁদো না মেয়ে, শুনো, তোমাকে কী চমৎকার গান শুনাচ্ছি।

জরীর বন্ধুদের ঘুম ভেঙেছে। জরী ঘরে নেই। লায়লা গাঢ় স্বরে ডাকল, ও কনক, কনক।

কী ?

সানাই শুনছিস ?

শুনছি।

ভালো লাগছে তোর ?

না। খুব মন খারাপ করা সুর।

তারা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আভা গলা উঁচিয়ে ডাকল, জরী জরী! জরী ছাদ থেকে নেমে আসতেই সবাই দেখল তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ ও ফোলা ফোলা। রুনু বলল, রাতে তোর ঘুম হয়নি, না রে ?

খুব হয়েছে।

এখন তোর কেমন লাগছে জরী ?

কেমন আর লাগবে। ভালোই। আয় বাগানে বেড়াতে যাই।

তারা বাগানে নেমে গেল। এ বাড়ির বাগানটি পুরনো। জরীর দাদার খুব ফুলের শখ ছিল। মালী রেখে চমৎকার বাগান করেছিলেন। বসরাই গোলাপের প্রকাণ্ড একটি ঝাড় ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাড়ির সর্ব দক্ষিণে বেশ কিছু হাস্নাহেনা গাছ আছে। সেখানে হাঁটু উঁচু বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। ওদিকটায় কেউ যায় না।

আভা বলল, এত সুন্দর বাগান, কেউ যত্ন করে না কেন রে ?

জরী বলল, বাগানের শখ নেই কারো, এক পরী আপার ছিল, সে তো আর থাকে না এখানে।

লায়লা বলল, পরী আপা কি আগের মতো সুন্দর আছে ?

এলেই দেখবি।

কখন আসবেন ?

সকাল আটটায়, ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসে।

কনক বলল, এত বড় গোলাপ হয় নাকি, আশ্চর্য! জরী, গোলাপ তুলব একটা ?

তোল না।

চারজন অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সবাই কিছু পরিমাণে গম্ভীর। লায়লা ঘনঘন কাশছে। কাল রাতে তার ঠাণ্ডা লেগেছে। কনকের দেখাদেখি সবাই গোলাপ ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজেছে। আভা হঠাৎ করে বলল, তোদের এখানে বকুল গাছ নেই, না ?

উঁহু।

আমার হঠাৎ বকুল ফুলের কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্কুলের বকুল গাছটার কথা মনে আছে তোদের ?

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল। স্কুলের বকুল গাছটা নিয়ে অনেক মজার মজার ব্যাপার আছে।

জরীর মা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের দেখছিলেন। তিনি সেখান

থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, ও জরী, জরী ?

কী মা ?

কী করছিস তোরা ?

কনক বলল, বেড়াচ্ছি— আপনিও আসুন না খালাম্মা।

জরীর মা হাসি মুখে নেমে এলেন। মনে হলো মেয়েদের দলে এসে তার বয়স যেন হঠাৎ করে কমে গিয়েছে। তিনি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, গত রাতে একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম জরী যেন খুব ছোট হয়ে গিয়েছে। ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে। আর জেগে দেখি সত্যি তাই।

বললেই হলো! আমি বুঝি ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ?

জরীর মা হাসতে লাগলেন। হালকা গলায় বললেন, আমার যখন বিয়ে হয় তখন এ বাগানটা আরো বড় ছিল। আমি রোজ সকালে এখানে এসে একটা করে ফুল খোঁপায় গুঁজতাম।

বলেই তিনি হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেলেন। লায়লা বলল, আসুন খালা, আজ আপনার খোঁপায় ফুল দিয়ে দি।

কী যে বলো মা, ছিঃ ছিঃ!

কিন্তু ততক্ষণে কনক একটি ফুল ছিঁড়ে এনেছে। জরীর মা আপত্তি করবার আগেই তারা সেটি খোঁপায় পরিয়ে দিল। তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, আমি তোমাদের চায়ের যোগাড় করি। আর দেখ হাস্নুহেনা ঝাড়ের দিকে যেয়ো না। খুব সাপের আড্ডা ঐদিকে।

শীতকালে সাপ কোথায় খালা ?

না থাক, তবুও যাবে না।

জরীর মা চলে যেতেই আভা বলল, খালা এখনো যা সুন্দরী, দেখলে হিংসা লাগে।

পরী আপাও ভীষণ সুন্দরী, তাই না জরী ?

হ্যাঁ। আর আমি কেমন ?

পরী আপা ফার্স্ট ক্লাস হলে তুই ইন্টার ক্লাস, আর আমাদের কনক হচ্ছে এয়ারকন্ডিশনড ফার্স্ট ক্লাস।

কনক একটু গম্ভীর হয়ে পড়ল। জরীর দিকে তাকিয়ে বলল, তোর খুব মায়াবী চেহারা জরী। রূপবতী হওয়া বাজে ব্যাপার।

বাজে হলেও আমি রূপবতী হতে রাজি।

সবাই হেসে উঠলেও কনক হাসল না। অসাধারণ সুন্দরী হয়ে জন্মানোয় সে অনেকবার বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কেঁদেছে। অনেকবার তার মনে হয়েছে, সাধারণ একটি বাঙালি মেয়ে হয়ে সে যদি জন্মাত! শ্যামলা রঙ, একটু বোকা বোকা ধরনের মায়াবী চেহারা। কিন্তু তা হয়নি। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির নিচে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে

তাকে বড় হতে হয়েছে। অথচ ছোটবেলায় কেউ যখন বলত, কনকের মতো সুন্দর একটি মেয়ে দেখেছি আজ, তখন কী ভালোই না লাগত!

কুয়াশা কেটে রোদ উঠেছে। ধানী রঙের নরম রোদ। শিশির-ভেজা মাটি থেকে আর্দ্র এক ধরনের গন্ধ আসছে।

মেয়েদের দলটি গোল হয়ে বসে আছে শিউলী গাছের নিচে। এই গাছটি এক সময়ে প্রচুর ফুল ফোটাত। আজ তার আর সে ক্ষমতা নেই। কয়েকটি সাদা সাদা ফুল পড়ে আছে। শীতের বাগানে যখন ধানী রঙের রোদ উঠে এবং সেখানে যদি কয়েকটি মেয়ে চুপচাপ গোল হয়ে বসে থাকে তাহলে বাগানের চেহারাই পাল্টে যায়। বড় চাচা অবাক হয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিয়েবাড়ির লোকজন ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হুটোপুটি আর কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে, টিউবওয়েলে ঘটাং ঘটাং শব্দ করে ক্রমাগত পানি তোলা হচ্ছে। ডেকোরেটরের দোকান থেকে লোকজন এসে গেটের জন্য মাপজোক শুরু করেছে। জরীর বাবা অকারণে একতলা থেকে দোতলায় উঠানামা করছেন। মাঝে মাঝে তাঁর উঁচু গলা শোনা যাচ্ছে— এক ঘণ্টা ধরে বলছি এক কাপ চা দিতে। শুধু এক কাপ চা, এতেই এত দেরি ? মেয়ের বিয়ে কি আর কারো হয় না ?

আভা হঠাৎ বলল, জরী, তোর ছোট চাচার ছেলে কি আমেরিকা চলে গেছে ?

না। সতেরো তারিখে যাবে।

একাই যাচ্ছে ?

না। বড় চাচা সঙ্গে যাবেন।

কনক বলল, কী জন্যে যাচ্ছেন ? কই আমি তো, কিছু জানি না!

জরী অস্বস্তি বোধ করল। থেমে থেমে বলল, চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডে গুলি লেগেছিল। সেই থেকে পেরাপ্লেজিয়া হয়েছে। কোমরের নিচ থেকে অবশ।

আমাকে তো কিছু বলিসনি তুই, গুলি লাগল কী করে ?

আর্মির লেফটেন্যান্ট ছিলেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যখন পাক আর্মির সাথে যুদ্ধ হয় তখন গুলি লেগেছে।

লায়লা বলল, জরীর এই ভাইটিকে তো তুই চিনিস কনক। মনে নেই একবার আমরা সবাই দল বেঁধে আনন্দমোহন কলেজে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, তখন যে একটি ছেলে সন্ন্যাসী সেজেছিল, হঠাৎ নাটকের মাঝখানে তার দাড়ি খুলে পড়ে গেল। ঐ তো আনিস। যা মুখচোরা ছিল।

জরী একটু হেসে বলল, ছোটবেলায় আনিস ভাই ভীষণ বোকা ছিল। একেকবার এমন হাসির কাণ্ড করত! তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলেই হয়েছে, হয় সেখানে একটা কাপ ভাঙবে, নয় চেয়ার নিয়ে হঠাৎ গড়িয়ে পড়বে।

রুনু বলল, বাঘের গল্পটা বল জরী, ওটা ভীষণ মজার।

না থাক।

বল না শুনি।

একবার আমরা 'জঙ্গল বয়' ছবি দেখে এসেছি। আনিস ভাই ফিরে এসেই বড় চাচার সোয়েটার গায়ে দিয়ে বাঘ সেজেছে। আর আমরা সেজেছি হরিণ। আনিস ভাই হালুম শব্দ করে আমার ঘাড় কামড়ে ধরল। কিছুতেই ছাড়বে না। রক্ত-টক্ত বেরিয়ে সারা, শেষে বড় চাচা এসে ছাড়িয়ে দিলেন। দেখ এখনো দাগ আছে।

জরীর মা দোতলা থেকে ডাকল, ও মেয়েরা, চা দেয়া হয়েছে। এসো শিগগির। সবাই দেখল তাঁর মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একজন সুখী চেহারার মা, যাঁর খোঁপায় গোঁজা ফুলটি এখনো রয়েছে। হয়তো ফেলে দিতে তাঁর মনে নেই কিংবা ইচ্ছা করেই ফেলেননি। আভা বলল, চা খেয়ে আমরা আনিস ভাইয়ের সঙ্গে একটু গল্প করব, কেমন জরী ?

বেশ তো করবি।

যুদ্ধের গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।

কনক বলল, কই, আর সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো ?

সানাই বাজছিল ঠিকই কিন্তু বিয়ে বাড়ির হৈচৈ এত বেড়েছে যে শোনা যাচ্ছে না।

তারা সবাই দোতলায় উঠে এলো। সিঁড়িতে জরীর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি দ্রুত নামছিলেন। জরীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, শুনেছিস কারবার, রশীদ টেলিফোন করেছে— দৈ নাকি পাওয়া যাবে না। জরী, তুই আমার সোয়েটারটা বের করে দে, আমি নিজেই যাই। তাড়াতাড়ি কর। এমন গাধার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন... বলে তাঁর খেয়াল হলো। বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, আমি নিজেই খুঁজে নেব। জরীর বন্ধুরা হাসতে লাগল।

৩

সমস্ত শরীর মনে হচ্ছিল অবশ হয়ে যাচ্ছে। কোমরের কাছে চিনচিনে ব্যথা ক্রমশ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। ব্যথাটা শুরু হলেই ভীষণ ঘাম হয় ও পানির প্রবল তৃষ্ণা হয়। আজ টেবিলে পানির জগটি শূন্য। বিয়ে বাড়ির ব্যস্ততার জন্যেই হয়তো রাত্রিতে পানি রেখে যেতে কারো মনে নেই। আনিস উল্টোদিকে একশ' থেকে গুনতে শুরু করল। একশ', নিরানব্বই, আটানব্বই...। কোনো একটা ব্যাপারে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, যাতে ব্যথাটা ভুলে থাকা যায়।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বাজে। অন্যদিন এই সময়ে টিংকু এসে পড়ে। আজ আসেনি। বিয়ে বাড়ির হৈচৈ ফেলে সে যে আসবে এরকম মনে হয় না। তবু দরজার পাশে কোনো একটা শব্দ হতেই আনিস উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। না, টিংকু নয়। আবার তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছে আনিস কাতরাতে থাকে। আশি, উনআশি, আটাত্তর,

সাতাত্তর...। সাতটা বেজে গেছে। আজ তাহলে টিংকু আর এলোই না।

অন্যদিন ভোর ছটার মধ্যেই দরজায় ছোট ছোট হাতের থাবা পড়ত। চিনচিনে গলা শোনা যেত, আনিস আনিস।

কী টিংকুমনি ?

আমি এসেছি, দরজা খোল।

আনিসের খাটটি এমনভাবে রাখা যেন সে শুয়ে শুয়েই দরজার হুক নাগাল পায়। টিংকুর সাড়া পেলেই সে দরজা খুলে দিত। দেখা যেত ঘুম ঘুম ফোলা মুখে চার বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথা ভর্তি লাল চুল। গায়ে কোনো ফ্রক নেই বলে শীতে কাঁপছে। দরজা খুলতেই সে গম্ভীর হয়ে বলবে, আনিস, তোমার ব্যথা কমেছে ?

হ্যাঁ টিংকু।

আচ্ছা।

তারপর সেই লাল চুলের মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়বে বিছানায়। তার হৈচৈ-এর কোনো সীমা থাকবে না। এক সময় বলবে, আমি হাতি হাতি খেলব। তখন কালো কম্বলটা তার গায়ে জড়িয়ে দিতে হবে। একটি কোলবালিশ ধরতে হবে তার নাকের সামনে এবং সে ঘনঘন হুঙ্কার দিতে থাকবে। আনিস বারবার বলবে, আমি ভয় পাচ্ছি, আমি ভয় পাচ্ছি। এক সময় ক্লান্ত হয়ে কম্বল ফেলে বেরিয়ে আসবে সে। হাসি মুখে বলবে, আনিস, এখন সিগারেট খাও। টিংকু নতুন দেশলাই জ্বালাতে শিখেছে, সে সিগারেট ধরিয়ে দেবে। কিন্তু আজ দিনটি শুরু হয়েছে অন্যরকমভাবে।

আজ টিংকু আসেনি। আনিস আবার ঘড়ি দেখল। সাড়ে সাতটা বাজে। অন্যদিন এ সময়ের মধ্যে তার দাড়ি কামানো হয়ে যেত। বাসি জামা-কাপড় বদলে ফেলত। ভোরের প্রথম কাপ চা খাওয়াও শেষ হতো। আজ হয়নি। রাত থাকতেই যে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়েছে! দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তা যেন ক্রমেই বাড়ছে। পিপাসায় বুক মুখ শুকিয়ে কাঠ।

খুট করে শব্দ হলো দরজায়। আনিস চমকে উঠে বলল, কে, টিংকু নাকি ? টিংকু ? কিন্তু টিংকু আসেনি, একটি অপরিচিত ছেলে উঁকি দিচ্ছে। আনিস কড়া গলায় ধমক দিল, গেট এওয়ে, গেট এওয়ে।

ভয়ে ছেলেটির চোখে জল এসে গেল। তার পরনে স্ট্রাইপ দেয়া লাল ব্লেজারের সার্ট ও মাপে বড় একটি সাদা প্যান্ট। প্যান্টটা বারবার খুলে পড়ছে আর সে টেনে টেনে তুলছে। আনিস ক্ষেপে গিয়ে বলল, যাও এখান থেকে— যাও।

ছেলেটি প্যান্ট ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছল। অনেক দূর নেমে গেল প্যান্ট। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, আমি হারিয়ে গেছি। আম্মাকে খুঁজে পাই না।

কী নাম তোমার ?

বাবু।

আনিস খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবুর দিকে। হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে কোমল সুরে বলল, ভেতরে এসো বাবু।

বাবু সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে ভেতরে এসে ঢুকল। একটু ইতস্তত করে বলল, তুমি কাঁদছ কেন?

আমার অসুখ করেছে।

পেটে ব্যথা?

হুঁ। বসো তুমি চেয়ারে। তোমার আম্মাকে খুঁজে দেব। তুমি কোথায় থাক?

বাসায় থাকি।

কী নাম তোমার?

বলেছি তো একবার।

ও, তোমার নাম বাবু। বসো একটু।

আনিস তোয়ালে দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছল। ন'টা বেজে গেছে। রোদ এসেছে ঘরের ভেতরে। একটা ভ্যাপসা ধরনের গরম পড়েছে। বাসি বিছানা থেকে এক ধরনের ভেজা গন্ধ আসছে। বাবু বসে আছে চুপচাপ। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আনিসের দিকে।

আনিস ভাই, ভিতরে আসব?

দরজার ওপাশে জরীর বন্ধুরা কৌতূহলী চোখে উঁকি দিচ্ছে। এদের মধ্যে এক রুনুকেই আনিস চিনতে পারল। আনিস বলল, জরী আসেনি?

না। সে একতলায় আটকা পড়েছে।

জরীর গায়ে-হলুদের আয়োজন চলছে নিচে। পরীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই গায়ে-হলুদের অনুষ্ঠান পিছিয়ে গেল। পরীর আসবার সময় হয়েছে। তাকে আনতে স্টেশনে গাড়ি গিয়েছে।

চিত্রিত পিঁড়িতে বসে আছে জরী। কলসিতে করে পানি এনে রাখা হয়েছে। জরীর সামনে ডালায় বিচিত্র সব জিনিসপত্র সাজানো। সেখানে আবার দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। রাজ্যের মেয়েরা ভিড় করেছে সেখানে। বরের বাড়ি থেকে পাঠানো গায়ে-হলুদের শাড়ি নিয়ে বেশ হৈচৈ হচ্ছে। কাজের বেটিরাও নাকি এত কম দামি শাড়ি পরে না— এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। রুনু এই ফাঁকে তার বন্ধুদের দোতলায় নিয়ে এসেছে। কনক তখন থেকেই আনিসের সঙ্গে দেখা করবার কথা বলছিল।

আনিস বলল, ভেতরে আসো রুনু। কী ব্যাপার?

আনিস ভাই, এরা সবাই জরী আপার বন্ধু, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।

আনিস বিরক্তি চেপে কোনো মতে বলল, তোমরা বসো।

ঘরে বসবার কিছু নেই। একটি মাত্র চেয়ার, সেটিতে বাবু গম্ভীর হয়ে বসে

আছে। আনিস কী বলবে ভেবে পেল না। বিব্রতভাবে বলল, হঠাৎ আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হলো কেন ?

কেউ সে-কথার জবাব দিল না। রুনু কনককে দেখিয়ে বলল, এর নাম কনক, খুব নামকরা মেয়ে আনিস ভাই। রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। সে-ই আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেশি ব্যস্ত।

কনক চুপ করে রইল। আভা বলল, আপনি আমাদের যুদ্ধের গল্প বলুন আনিস ভাই।

আনিস থেমে থেমে বলল, আমি যুদ্ধের কোনো গল্প জানি না।

কেন, আপনি পাক আর্মির সঙ্গে যুদ্ধ করেননি ?

করেছি।

সেই গল্প বলুন।

আমি যুদ্ধের গল্প বলি না।

আভা মুখ কালো করে ফেলল। লায়লা বলল, চল কনক যাই, গায়ে-হলুদের সময় হয়ে গেছে। কনক নড়ল না, থেমে থেমে বলল, যুদ্ধের সময় আমি বড় কষ্ট করেছি আনিস ভাই। বরিশালের কাছে এক জঙ্গলে আমি, আমার মা আর দুই খালা এক সপ্তাহ লুকিয়েছিলাম। এক খালা সেই জঙ্গলেই ভয় পেয়ে মারা গিয়েছিলেন।

আনিস বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল কনকের দিকে। কনক গাঢ় স্বরে বলল, খুব কষ্ট করেছি বলেই যারা যুদ্ধ করেছে তাদের আমার সব সময় খুব আপন মনে হয়।

কনকের কথার মাঝখানে আনিস হঠাৎ বলে উঠল, আমি খুব অসুস্থ। তোমার সঙ্গে পরে আলাপ করব। রুনু, এই ছেলেটিকে নিয়ে যা। সে তার মাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

বাবুকে রুনু কোলে তুলে নিতে গেল। বাবু চেয়ারে আরো ভালো করে সেঁটে বসল। আনিসের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, আমি যাব না। আমি এখানে থাকব।

রুনু তাকে দু'হাত ধরে উপরে তুলতেই সে পা ছুড়ে কাঁদতে শুরু করল। রুনু বলল, আনিস ভাই, আমরা যাই ?

আচ্ছা যাও। কিছু মনে করো না কনক।

না না আনিস ভাই, আমি কিছু মনে করিনি।

আনিস হাঁপাতে শুরু করল। অসহ্য! খুব ঘাম হচ্ছে। বুক শুকিয়ে কাঠ। দাঁতে দাঁত চেপে সে মনে মনে গুনল— একশ', নিরানব্বই...। দরজায় টোকা পড়ল। আনিস তাকাল ঘোলা চোখে। বাবু আবার ফিরে এসেছে। আনিস চোখ বন্ধ করে ফেলল। বাবু বলল, আমি এসেছি।

আনিস কোনো মতে বলল, বাবু, এক গ্লাস পানি আন।

আনিসের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পেথিড্রিন দিতে হবে নাকি কে জানে। বড় চাচাকে খবর দেয়া প্রয়োজন।

বাবু পানির খোঁজে বেরিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল ছাদে। সেখানে মিস্তিরীরা শামিয়ানা খাটাচ্ছে। সে অনেকক্ষণ তাই দেখল। তারপর নেমে এলো দোতলায়। দোতলা খাঁখাঁ করছে। সবাই গিয়েছে গায়ে-হলুদে। সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জরীর বড় চাচা তাঁর রেডিওগ্রাম বন্ধ করে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বারান্দায় বসেছিলেন। বাবু তাকে গিয়ে বলল, পানি খাব। তিনি তাকে পানি খাইয়ে দিলেন। বাবু শান্ত হয়ে আনিসের ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগল।

৪

পরীর ট্রেন ভোর সাড়ে আটটার মধ্যে ময়মনসিংহে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু গফরগাঁ আসতেই পৌনে ন'টা হয়ে গেল। মেল ট্রেন অথচ ছোট-বড় সব স্টেশন ধরছে। লোক উঠেছে বিস্তর। ছাদে পর্যন্ত গাদাগাদি ভিড়। ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ছিল। কিন্তু কাওরাইদে এক দঙ্গল ছাত্র উঠে পড়ল। বিপদের উপর বিপদ, পরীর মেয়ে লীনা ক'দিন ধরেই সর্দিতে ভুগছিল। ট্রেনে ওঠার পর থেকে তার জ্বর হু-হু করে বাড়তে লাগল। পরী মেয়েকে কোলে করে জানালার এক পাশে বসেছে, তার অন্য পাশে বসেছে পান্না। পান্না এক দণ্ডও কথা না বলে থাকতে পারে না। সে ক্রমাগত মাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে।

এটা কী মা ?

ঐ লোকগুলি নৌকায় কী করছে মা ?

ঐ নৌকাটার পাল লাল আর এইটার সাদা কেন মা ?

হোসেন সাহেব ট্রেনে উঠেই একটা বই তার নাকের সামনে ধরে রেখেছেন। গাড়ির ভিড়, লীনার জ্বর বা পান্নার প্রশ্নমালা কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারছে না। পরীর বিরক্তি ক্রমেই বাড়ছিল। এক সময় সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, রাখ তোমার বই। দেখ মেয়েটার কেমন জ্বর।

হোসেন সাহেব হাত বাড়িয়ে মেয়ের উত্তাপ দেখলেন। শান্ত গলায় বললেন, ও কিছু নয়। এক্ষুণি রেমিশন হবে।

তিনি বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলেন। পান্না বলল, মা রেমিশন কী ?

কী জানি কী! চুপ করে বসে থাক।

গাড়ির অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছিল পরীর দিকে। পরী সেই ধরনের মহিলা, যাদের দিকে পুরুষেরা সব সময় কৌতূহলী হয়ে তাকায়। চোখে চোখ পড়লেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় না।

রূপবতী মেয়েদের প্রায়ই বড় রকমের কোনো ত্রুটি থাকে। পরীর একটি মাত্র ত্রুটি সে বোকা। হোসেন সাহেব পরীকে বিয়ে করে বেশ হতাশ হয়েছেন। শুধুমাত্র

রূপ একটি পুরুষকে দীর্ঘদিন মুগ্ধ করে রাখতে পারে না। পরীর মেয়ে দু'টি মায়ের মতো রূপবতী হয়নি দেখে হোসেন সাহেব খুশি হয়েছেন। মেয়ে দু'টি বাবার গায়ের শ্যামলা রঙ পেয়েছে। চোখ মুখ নাক ফোলা ফোলা। অনেকখানি মিল আছে চাইনিজ বাচ্চাদের সঙ্গে। এবারডিন হসপিটালের এক নার্স হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাচ্চাদের মা কি চাইনিজ ? পরী তার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তায় ভোগে। বড় হলে বিয়ে দিতে ঝামেলা হবে, এইসব ভাবনা তাকে মাঝে মধ্যেই পায়। হোসেন সাহেবকে সে-কথা বলতেই তিনি হো হো করে হাসতে থাকেন। পরী রাগী গলায় বলে, এর মধ্যে হাসির কী হলো ? কালো মেয়েদের কি ভালো বিয়ে হয় ? আমি যদি কালো হতাম তুমি আমাকে বিয়ে করতে ? হোসেন সাহেব একটু অপ্রস্তুত হন। মাঝে মধ্যে পরী বেশ গুছিয়ে কথা বলে। হোসেন সাহেব বলেন, আমার সঙ্গে তোমার বিয়েটা তাহলে খুব ভালো বিয়ে বলতে চাও ?

পরী তার জবাব দেয় না। কারণ মাঝে মাঝে তার নিজেরই সন্দেহ হয়। যদিও হোসেন সাহেব একটি নিখুঁত ভদ্রলোক এবং তাকে বিয়ে করার ফলেই সে পৃথিবীর অনেকগুলি বড় বড় দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে, তবু কোথাও কিছু অমিল আছে। লন্ডনে থাকাকালীন প্রথম এটি পরীর চোখে পড়ে। পরীকে সারাদিন একা একা থাকতে হতো ফ্ল্যাটে। রেকর্ড বাজিয়ে আর রান্না করে কতটুকু সময়ই বা কাটে! গল্প করার লোক নেই। পরী ইংরেজি জানলেও বলতে পারে না। আবার বিদেশী উচ্চারণ বুঝতেও পারে না। তার সারাটা দিন কাটত কয়েদির মতো। হোসেন সাহেব ফিরতেন সন্ধ্যাবেলায়। চা খেয়েই তাঁর পড়াশুনা শুরু হতো। পরী হয়তো একটা গল্প শুরু করেছে, হোসেন সাহেব হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। কিন্তু কিছুদূর বলার পরই বুঝতে পারত হোসেনের গল্প শোনার মুড নেই। সে তাকিয়ে আছে পরীর দিকে ঠিকই কিন্তু ভাবছে অন্য কিছু। পরী আচমকা গল্প বন্ধ করত। হোসেন সাহেব বলতেন, তারপর কী হলো ?

থাক। আর ভালো লাগছে না... এই বলে গম্ভীর হয়ে উঠে যেত পরী। তার আরো খারাপ লাগত যখন দেখত, হোসেন গল্প বন্ধ হওয়ায় খুশিই হয়েছে।

পরী বলল, ময়মনসিংহ আর কত দূর ?

হোসেন সাহেব বই থেকে চোখ তুলে বললেন, দূর আছে।

পরী বলল, বাই রোডে এলে কত ভালো হতো!

হোসেন সাহেব জবাব দিলেন না। পান্না বলল, বাই রোডে এলে ভালো হতো কেন মা ?

আর একটা কথা বললে চড় খাবি পান্না।

পরী ঝাঁঝিয়ে উঠল। পান্না উসখুস করতে লাগল। আরেকটা কথা জানবার জন্যে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। সে কয়েকবার মা'র দিকে তাকাল। মা ভীষণ গম্ভীর।

কাজেই সে ঝুঁকে এলো বাবার কাছে। ফিসফিস করে কানে কানে বলল, বাবা একটা কথা শোন।

বল।

ঐ যে কারেন্টের তারে পাখি বসে আছে দেখেছ?

হুঁ, দেখলাম, শালিক পাখি।

ঐ পাখিগুলি শক খায় না কেন?

টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে। টেলিগ্রাফের তারে কারেন্ট নেই। তাই শক খায় না।

অ বুঝেছি।

পরী দেখল, মেয়ে ও বাবা খুব আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সে আগেও দেখেছে মেয়ের সঙ্গে আলাপে হোসেনের কোনো ক্লান্তি নেই। তখন আর্জেন্ট কলের কথাও মনে থাকে না। জরুরি টেলিফোন করতে হবে বলে হঠাৎ উঠে পড়ারও প্রয়োজন হয় না। পরীর মনে হলো সে দারুণ অসুখী ও দুঃখী। এরকম মনোভাব তার প্রায়ই হয়। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

বিলেতে থাকার সময়ও পরী লক্ষ করেছে, তার ব্যাপারে হোসেনের কোনো আগ্রহ নেই। প্রায়ই এক গাদা চিঠি আসত পরীর। হোসেন সাহেব ভুলেও জিজ্ঞেস করতেন না— চিঠি কে লিখল। সে-সব চিঠির জবাব লিখতে এক সময় গভীর রাত হয়ে যেত। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে ঘুমুতে যেতেন হোসেন সাহেব, ভুলেও জিজ্ঞেস করতেন না, এত রাত জেগে কোথায় চিঠি লেখা হচ্ছে?

হোসেনের এক বন্ধু প্রায়ই আসত বাসায়। সে পরীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করত। পরী কোনো কোনো দিন ইচ্ছে করেই সেই বন্ধুটির সঙ্গে বেড়াতে যেত। ফিরতে রাত হতো প্রায় সময়ই। পরী চাইত হোসেনের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিক। ঈর্ষার কিছু জীবাণু কিলবিল করে উঠুক তাঁর মনে। কিন্তু সে-রকম কিছুই হয়নি। হোসেন নির্বিকার ও নিরাসক্ত। হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল পরী। লীনা-পান্না এলো সংসারে। জমজ মেয়ে একা সামলানো মুশকিল। রাত জাগা, কাপড় বদলে দেয়া, ঘড়ি দেখে দেখে দুধ বানানো— এ সব করতে করতে এক সময় পরীর মনে হলো সংসারটা এমন কিছু খারাপ জায়গা নয়। হোসেনের মতো স্বামী নিয়ে সুখী হতে বাধা নেই।

কিন্তু হোসেন যদি আরো একটু কাছে আসত! পরীর কত কী আছে গল্প করবার। সে-সব যদি সে মন দিয়ে শুনত। কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে যদি না বলত— পরী, আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তাহলে জীবনটা অনেক বেশি অর্থবহ ও সুরভিত হতো না?

ময়মনসিংহ এসে গেল প্রায়। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি স্টেশনে গাড়ি এসে থেমেছে। ছাত্রদের দলটি নেমে যাওয়াতে কামরাটি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। হোসেন সাহেব বই বন্ধ করে জানালা দিয়ে গলা বের করলেন। চমৎকার

ইউনিভার্সিটি। সবুজে ছয়লাপ। সাদা রঙের বড় বড় দালানগুলিকে দ্বীপের মতো লাগছে। রাস্তার দু'পাশে নারকেল গাছের সারি। পরী বলল, লীনার জ্বর আর নেই। দেখ তো ক'টা বাজে?

দশটা পনেরো। আড়াই ঘণ্টা লেট।

পান্না বলল, আড়াই ঘণ্টা লেট হলে কী হয় বাবা?

খুব মজা হয়। জুতো পরে নাও পান্না, আর দেরি নেই।

লীনাকে শুইয়ে রেখে পরী টয়লেটে গিয়ে চুল আঁচড়াল। পান্নার জুতো পরিয়ে দিল। লীনার ঘুম ভাঙিয়ে, তার জামা বদলে দিল। বেশ লাগছে তার। পরী হালকা গলায় বলল, জরীর গায়ে-হলুদ কি হয়ে গেল?

তোমার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।

পরী হাসিমুখে বলল, বউ সাজলে জরীকে কেমন দেখাবে কে জানে?

হোসেন সাহেব জবাব দিলেন না। তিনি খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

দূর থেকে স্টেশনের লাল দালান দেখা যাচ্ছে। লাইন বদল হওয়ার ঘটাং ঘটাং শব্দ আসছে। হোসেন সাহেব হঠাৎ বললেন, পরী, আনিসের চিঠির কথাটা মনে আছে? বড় কষ্ট লাগছে।

পরী বলল, আনিস বাঁচবে তো?

না। স্পাইনাল কর্ডের লম্বোসেকরেল রিজিওন ডেমেজইড। তাছাড়া শুধু পেরাপ্লেজিয়া নয় আরো সব জটিলতা দেখা দিয়েছে। শুনেছি পেথিড্রিন দিতে হয়।

পরী গম্ভীর হয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব বললেন, কাল রাত থেকে আনিসের চিঠির কথা মনে পড়ছে। তোমার কাছে আছে সেটা?

না, নেই।

চিঠিটি আনিস পরীকে অনেক ভণিতা করে লিখেছিল। পাঁচ বৎসরে আনিস মাত্র চারটি চিঠি লিখেছিল। ছয়-সাত লাইনের দায়সারা গোছের চিঠি। কিন্তু শেষ চিঠিটি ছিল সুদীর্ঘ। চিঠিতে অনেক কায়দা-কানুন করে লিখেছে সে জরীকে বিয়ে করতে চায়। কাউকে বলতে লজ্জা পাচ্ছে। তবে জরীর কোনো আপত্তি নেই। এখন একমাত্র ভরসা পরী, পরী যদি দয়া করে কিছু একটা করে তাহলে সারাজীবন সে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরী এ চিঠি পেয়ে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায়নি। সে জোর গলায় বলেছে, জরী কিছুতেই রাজি হবে না। ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছি। ছোটবেলায় সবাই এক খাটে ঘুমাতাম।

কিন্তু হোসেন সাহেব খুব শান্ত গলায় বলেছেন, খুব রাজি হবে। আনিসের মতো ছেলে হয় না। তুমি লেখ শ্বশুর সাহেবকে। আমিও লিখব।

আনিসের চিঠি পড়ে হোসেন সাহেবের বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি যে চিঠিটা আসলে লিখেছে জরী। আনিস শুধু কপি করেছে। চিঠিতে পাঁচবার 'আশ্চর্য' শব্দটি

আছে। ঘনঘন আশ্চর্য শব্দ ব্যবহার করা জরীর পুরনো অভ্যাস। তার সব চিঠি শুরু হয় এইভাবে—

আশ্চর্য, বহুদিন আপনাদের চিঠি পাই না।...

আনিস খুবই ভালো ছেলে এতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। তবু পরী জানত বাবা রাজি হবেন না। তিনি কোনো একটি বিচিত্র কারণে আনিসকে সহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া আনিসের মা বিধবা হবার পর পরই আরেকটি ছেলেকে বিয়ে করে খুলনা চলে যান। এই নিয়েও অনেক কথা ওঠে। সব জেনে শুনে পরীর বাবা আনিসকে পাত্র হিসেবে পছন্দ করবেন কেন ? তাছাড়া এত ঘনিষ্ঠভাবে চেনা একটি ছেলেকে কি বিয়ে করা উচিত ? পরী খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল।

এর পরপরই স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হলো। পরীকে চিঠি লিখতে আর হলো না। সে যখন দেশে ফিরে এলো তখন আনিস কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটালে। সেখান থেকে পিজি'তে।

জরী আনিসকে দেখে খুব কেঁদেছিল। আনিস সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলেছে, একটা যুদ্ধে অনেক কিছু হয় জরী।

কতবার জরী গিয়েছে হাসপাতালে, কত কথাই তো হয়েছে কিন্তু ভুলেও আনিস সেই চিঠির উল্লেখ করেনি। জরীও সে প্রসঙ্গ তুলেনি। যেন তাদের মনেই নেই তারা দু'জনে মিলে চমৎকার একটি চিঠি লিখেছিল পরীকে।

গাড়ি ইন করেছে স্টেশনে। হোসেন সাহেব বললেন, লীনাকে আমার কোলে দিয়ে তুমি নামো পরী।

পরীকে দেখতে পেয়ে একদল ছেলে-মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ইস এত দেরি, এদিকে বোধহয় গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে।

পরী তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

লীনা হাততালি দিল।

৫

বিয়েবাড়ি খুব জমে উঠেছে।

বাড়ির সামনে খোলা মাঠে ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করে চি বুড়ি খেলছে। তাদের চিৎকারে কান পাতা দায়। শিশুদের আরেকটি দল গম্ভীর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে বাবুর্চিরা রান্না বসিয়েছে সেখানেও অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিশুদের জটলা। ছাদে শামিয়ানা খাটানো হয়ে গেছে। সেখানে চেয়ার-টেবিল সাজানো হয়েছে। অনেকেই ভারিক্কি চালে চেয়ারে বসে আছে।

কিশোরী মেয়েদের ছ-সাতজনের একটি দল জোট বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ে উপলক্ষে তারা আজ সবাই শাড়ি পরেছে। সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন তাদের

মহিলার মতো দেখায়। এদের মধ্যে শীলা নামের একটি মেয়ে বাড়ি থেকে এক প্যাকেট দামি সিগারেট এনেছে। বিয়ে বাড়ির একটি নির্জন আড়াল খুঁজে পেলেই সিগারেট টানা যায়। কিন্তু কোথাও সে-রকম জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। কিশোরীর এ দলটির সবাই কিছু পরিমাণে উত্তেজিত। তারা কথা বলছে ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে তবে সে হাসির স্বরগ্রামও খুব নিচু।

শেষপর্যন্ত তারা একটি জায়গা খুঁজে পেল। দোতলায় সবচেয়ে দক্ষিণের একটি ঘর। পুরনো আসবাবে সে ঘরটি ঠাসা। দু'টি জানালাই বন্ধ বলে ঘরের ভেতরটা আর্দ্র ও অন্ধকার। একটি নিষিদ্ধ কিছু করবার উত্তেজনায় সবাই চুপচাপ।

বড় রকমের একটি ঝগড়াও শুরু হয়েছে বিয়ে বাড়িতে। এসব ঝগড়াগুলি সাধারণত শুরু করেন নিমন্ত্রিত গরিব আত্মীয়রা। তাঁরা প্রথমে খুব উৎসাহ নিয়ে বিয়ে বাড়িতে আসেন, কোনো একটা কাজ করবার জন্যে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু কিছু করতে না পেরে ক্রমেই বিমর্ষ হয়ে ওঠেন। এক সময় দেখা যায় একটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তাঁর মেতে উঠেছেন। চিৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। বরপক্ষীয়দের তরফ থেকে দু'টি রুই মাছ পাঠানো হয়েছিল। মাছ দু'টি নাকি পচা— এই হচ্ছে আজকের ঝগড়ার বিষয়।

তবে সব বিয়েতেই চরম গণ্ডগোলগুলি যেমন ফস করে নিভে যায়, এখানেও তাই হলো। দেখা গেল বরপক্ষীয় যারা বিয়ের তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল (দু'টি মেয়ে, একটি অল্প বয়সী ছেলে এবং একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক) মহানন্দে রঙ খেলায় মেতে গেছেন। বরের বাড়ির রোগামতো লম্বা মেয়েটিকে দু'তিন জনে জাপটে ধরে সারা গায়ে খুব করে কালো রঙ মাখাচ্ছে। মেয়েটি হাত-পা ছুড়ছে এবং খুব হাসছে।

রঙ ছোড়া-ছুড়ির ব্যাপারটা দেখতে দেখতে খেপামির মতো শুরু হলো। এক দল মেয়ে দৌড়াচ্ছে, তাদের পিছু পিছু আরেক দল যাচ্ছে রঙের কৌটা নিয়ে। খিলখিল হাসি, চিৎকার আর ছোটাছুটিতে চারদিক সরগরম। ছেলেদের দলও বেমালুম জুটে গিয়েছে। অর্ধপরিচিত, অপরিচিত মেয়েদের গালে রঙ মাখিয়ে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করছে না। মেয়েরাও যে এ ব্যাপারে কিছু একটা মনে করছে তা মনে হচ্ছে না। তাদেরও ভালোই লাগছে।

পরী যখন এসে পৌঁছল তখন বরের বাড়ির রোগা মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাকে দেখাচ্ছে ভূতের মতো। পান্না ভয় পেয়ে বলল, মা, একটা পাগলি, ও মা, একটা পাগলি।

পরীকে দেখতে পেয়ে সবাই ছুটে এলো। নিমিষের মধ্যে পরীর ধবধবে গাল আর লালচে ঠোঁট কালো রঙে ডুবে গেল। লীনা ও পান্না দুজনেই হতভম্ব। লীনা বলল, এরকম করছে কেন?

হোসেন সাহেব ব্যাপার দেখে সটকে পড়েছেন। সটান চলে গিয়েছেন দোতলায়।

লীনা ও পান্না হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে রঙ খেলা চরমে উঠেছে। ভেতরের বাড়ির উঠোনে বালতি বালতি পানি ঢেলে ঘন কাদা করা হয়েছে। মাঝবয়েসী একটি ভদ্রমহিলাকে সবাই মিলে গড়াগড়ি খাওয়াচ্ছে সেই কাদায়। ভদ্রমহিলার শাড়ি জড়িয়ে গেছে, ব্লাউজের বোতাম গিয়েছে খুলে। তিনি ক্রমাগত গাল দিচ্ছেন। কিন্তু সেদিকে কেউ কান দিচ্ছে না। সবাই হাসছে সবাই চেঁচাচ্ছে। লীনা ও পান্নার বিমর্ষ ভাব কেটে গিয়েছে। তারাও মহানন্দে জুটে পড়েছে সে খেলায়। পান্না স্ফূর্তিতে ঘনঘন চেঁচাচ্ছে। এমন মজার ব্যাপার সে বহুদিন দেখেনি।

জরী এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। সে সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। তার একটু লজ্জা লজ্জা করছে। পরী কাদামাখা শরীরে জরীকে জড়িয়ে ধরল। জরী বলল, আপা, কখন এসেছিস ?

এই তো এখন। তোর কেমন লাগছে জরী ?

কী, কেমন লাগছে ?

বিয়ে।

জরী হাসতে লাগল।

৬

রঙ ছোড়াছুড়ির হাত থেকে বাঁচবার জন্য হোসেন সাহেব অতিরিক্ত ব্যস্ততায় দোতলায় উঠে এসেছেন। তাঁর গায়ে শার্কস্কিনের দামি কোট— নষ্ট হলেই গেল! বিয়ে-টিয়ের সময় মেয়েদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। উঠোনের কাদায় গড়াগড়ি করাতেও তাদের বাধবে না।

দোতলায় তিনি আনিসের ঘরটি খুঁজে পেলেন না। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন শেষ প্রান্তে। সেখানে কিশোরী মেয়েদের দলটি সিগারেট টানছে। তারা হোসেন সাহেবকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। তিনি নিজেও বিস্মিত, তবু হাসি হাসি মুখে বললেন, আনিসের ঘরটা একজন দেখিয়ে দাও তো।

কেউ নড়ল না।

আনিসের ব্যথা এখন একেবারেই নেই। শরীর বেশ হালকা ও ঝরঝরে লাগছে। জমাদার এসেছিল ঘর ঝাট দিতে, বেড প্যান সরিয়ে নিতে, তাকে দিয়ে পানি আনিয়ে আনিস দাড়ি কামাল। মুখ ধোয়া চুল ব্রাশ করা আগেই হয়েছে। হালকা গোলাপি একটি সিল্কের সার্ট বের করে পরল। বিয়ে বাড়ি উপলক্ষে কত লোকজন আসে, এ সময় কি বাসি কাপড়ে ভূত সেজে শুয়ে থাকা যায় ? বেশ লাগছে আনিসের। মাঝে মাঝে এরকম চমৎকার সময় আসে। মনে হয় বেঁচে থাকাটা খুব একটা মন্দ ব্যাপার নয়।

খবরের কাগজ দিয়ে গেছে খানিক আগে। আনিস আধশোয়া হয়ে বসে আছে খবরের কাগজ কোলে নিয়ে। খবরের কাগজ কোলে নিয়ে বসে থাকাটাও রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আনকোরা নতুন কাগজ। এখনো ভাঁজ ভাঙা হয়নি। ইচ্ছা করলেই পড়া শুরু করা যায়। তবে আনিস এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তার পড়া শুরু হয় ভেতরের পাতা থেকে। হারানো বিজ্ঞপ্তি, পড়াইতে চাই, রেকর্ড প্লেয়ার বিক্রি, পাত্রী চাই— এইগুলিই তার কাছে বড় খবর। পড়তে আনিসের দারুণ ভালো লাগে। এ থেকেই কত মজার মজার জিনিস চোখে পড়ে। একবার রইসুদ্দীন নামের এক ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন দিল, 'আকবর ফিরিয়া আস, যাহা চাও, তাহাই হইবে। তোমার মা রোজ প্যানপ্যান করেন।' 'রোজ প্যানপ্যান করেন' বাক্যটি আনিসের খুব মনে ধরেছিল এবং সে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিল আকবর তার মায়ের কাছে ফিরেছে কিনা তাই ভেবে। আরেকবার আরেকটি বিজ্ঞাপন ছাপা হলো— রোকেয়া সুলতানা নামের এক স্কুল শিক্ষিকার। বর্ণনার ভঙ্গিটি ছিল এই রকম— 'আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। অবিবাহিতা। নিকট আত্মীয়স্বজন কেউ বেঁচে নেই। কোনো সহৃদয় ছেলে আমাকে বিয়ে করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমার চেহারা ভালো নয়।' শেষ লাইনের 'আমার চেহারা ভালো নয়' বাক্যটি একেবারে বুকে বিঁধে। ভদ্রমহিলাকে একটি চিঠি লিখবার দারুণ ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কী লিখবে ভেবে পায়নি বলে, লেখা হয়নি।

আনিস, কী খবর?

আনিস তাকিয়ে দেখল, হোসেন সাহেব হাসি মুখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই লোকটিকে আনিস খুব পছন্দ করে। দেখা সাক্ষাৎ তেমন হয় না কিন্তু যখনই হয় আনিসের সময়টা চমৎকার কাটে। হোসেন সাহেব বললেন, বাইরে খুব রঙ খেলা হচ্ছে, তোমার এখানে আশ্রয় নিতে এলাম।

খুব ভালো করেছেন। কখন এসেছেন?

এইমাত্র, কেমন আছ বলো?

খুব ভালো।

তবে যে শুনলাম খুব পেইন হয়। মাঝে মাঝে পেথিড্রিন দিতে হয়।

তা হয়। কিন্তু এখন ভালো।

হোসেন সাহেব কোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, তোমার জন্যে গল্পের বই পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছ?

জি পেয়েছি।

পড়েছ নাকি সব?

কিছু কিছু পড়েছি।

কী যে রস পাও গল্পের বইয়ে তোমরাই জানো। তোমার পরী আপার তো বই পেলে আর কথা নেই। একবার কী একটা বই পড়ে ফিচ ফিচ করে এমন কান্না— দুপুরে ভাত খেল না, রাতেও না।

কী বই সেটি ?

কী জানি কী বই। জিজ্ঞেস করো ওকে। যে লেখক লিখেছে সে নিশ্চয়ই লিখবার সময় খাওয়া-দাওয়া ঠিকঠাক করেছে।

হোসেন সাহেব হাসতে লাগলেন। আনিসও হাসল। হোসেন সাহেব বললেন, এক কাপ চা পেলে ভালো হতো।

আমার এখানে চায়ের সরঞ্জাম আছে। কাউকে ডেকে আনেন।

ডাকতে হবে না, আমিই পারব।

হোসেন সাহেব নিঃশব্দে উঠে গিয়ে হিটার জ্বালালেন। চা, চিনির পট খুঁজে বের করলেন। দু'টি কাপ ধুয়ে টেবিলে এনে রাখলেন। আনিস দেখল, তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন। এই লোকটির বেশ কিছু বিচিত্র অভ্যেস আছে। আপন মনে হাসা, আপন মনে কথা বলা তার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও আরো অদ্ভুত অভ্যেস আছে। যেগুলি পরী জানে। কিন্তু পরী সেসব নিয়ে কারো সঙ্গে গল্প করতে পারে না। তার স্বামী সম্পর্কে সে খুব সজাগ। কেউ তার কোনো দোষ ধরুক, তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করুক এসব সহ্য করতে পারে না। বড় চাচা একবার পরীকে বলেছিলেন, তোর ভদ্রলোকটি এমন মিনমিনে কেন রে ? এতেই পরী কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়েছিল। বড় চাচা অপ্রস্তুতের একশেষ। আবার এও ঠিক হোসেন সাহেবের সঙ্গে পরীর বনিবনা হয়নি। কুমারী অবস্থায় পরী যেসব কথা ভেবে একা একা লাল হতো তার কোনোটিই বাস্তবের সঙ্গে মিলেনি। এ নিয়ে তার গোপন ব্যথা আছে। আনিস তা জানে। সে হঠাৎ বলল, পরী তার বাচ্চা দু'টিকে কেমন আদর করে দুলাভাই ?

খুব, যাকে বলে এনিমেল লাভ!

আর আপনাকে ?

আমাকে ভয় করে। নাও তোমার চা। মিষ্টি লাগবে কিনা বলো ?

আনিস চায়ে চুমুক দিল। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে। সকালে নাশতা হয়নি, এখন বেলা হয়েছে বারোটা। ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। হোসেন সাহেব বললেন, এ রকম করছ কেন ? ব্যথা শুরু হলো নাকি ?

না, ও কিছু নয়।

হোসেন সাহেব সিগারেট ধরালেন। আনিস খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আপনি কি সুখী ?

সামটাইমস! একটি মানুষ সারাক্ষণ সুখী থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে সুখী হয়। এখন আমি সুখী।

কেন ?

কী জানি কেন ! হঠাৎ এসব কথা জিজ্ঞেস করছ যে ?

দুলাভাই, মাঝে মাঝে আমি এসব নিয়ে ভাবি। কিচ্ছু করবার নেই তো এই

জন্যে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আসলে হেপিনেস বলে আলাদা কিছু নেই।

আনিসের কথা শেষ হবার আগেই দারুণ হৈচৈ ও চেঁচামেচি শোনা যেতে লাগল। একটি তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলায় কে যেন কেঁদে উঠল। ছাদের উপর থেকে হুড়মুড় শব্দ করে একসঙ্গে অনেক লোক নিচে নেমে এলো। হোসেন সাহেব, আধ খাওয়া চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

গোলমালটা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। একটি বিয়ে বাড়ির হৈচৈ হঠাৎ থেমে গেলে বুকে ধ্বক করে ধাক্কা লাগে। আনিস নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।... হোসেন সাহেবের ফিরে আসতে দেরি হলো না। তিনি আবার তাঁর ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আনিসের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসলেন। আনিস বলল, কী হয়েছিল দুলাভাই ?

আমার মেয়ে পান্না ডুবে গিয়েছিল পুকুরে।

বলেন কী ?

সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলেছে।

পুকুরে গেল কী করে ?

মেয়েরা সবাই রঙ খেলে গিয়েছিল গা ধুতে, পান্নাও গিয়েছে।

হোসেন সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। আনিস দেখল আগুন জ্বালাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে, দেশলাইয়ের কাঠি বারবার নিভে যাচ্ছে। আনিস বলল, আপনি পরীর কাছে যান।

যাই। সিগারেটটা শেষ করে নেই। পরী কী করছে জানো ? লীনা-পান্না, তার দু'বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মাঝে মাঝে অবিকল গরুর মতো গলায় চিৎকার করে কাঁদছে।

দুলাভাই আপনি পরীর কাছে যান।

যাই। আনিস, তুমি হেপিনেস সম্পর্কে জানেত চাইছিলে...

পরে বলবেন। এখন পরীর কাছে যান।

হ্যাঁ, তাই যাই।

হোসেন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আনিস দেখল তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসলেন।

হৈচৈ শুনে বড় চাচা নিচে নেমে গিয়েছিলেন।

ততক্ষণে পান্নাকে পানি থেকে তোলা হয়েছে এবং পান্নার চারপাশে একটি জটলার সৃষ্টি হয়েছে। সব ক'টি বাচ্চা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। বড় চাচা কয়েকবার জানতে চেষ্টা করলেন কী হয়েছে। কিন্তু সবাই হৈচৈ করছে, কেউ কিছু বলছে না। তিনি ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলেন পরী তার দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে। পরীর গা ভেজা, তার মাথায় কচুরিপানার ছোট ছোট পাতা লেগে

রয়েছে। বড় চাচা ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। গলা উঁচিয়ে বললেন, কী হয়েছে রে পরী ?

পান্না পানিতে ডুবে গিয়েছিল। আভা কোনো মতে তুলেছে। পরী ঘনঘন চোখ মুছতে লাগল। বড় চাচা বললেন, তুলেই তো ফেলেছে, তবু কাঁদছিস ?

বড় চাচা হাসতে লাগলেন। পরীর কাণ্ড দেখে বেশ মজা লাগছে তাঁর। তিনি একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, পরী নিজেই যে ছোটবেলায় পুকুরে ডুবে মরতে বসেছিল, সেটি কি তার মনে আছে ? কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁকে এখন খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

তেইশ বছর আগে একবার পরী ডুবতে বসেছিল। তাকে সেদিন টেনে তুলেছিল পরীর বড় চাচি। তেইশ বছর পর আবার একজন পরীর মেয়েকে টেনে তুলল। বাহ্! বেশ মজার ব্যাপার তো। কিন্তু পরীর কি সেই শৈশবের কথা মনে আছে ? অনেক বড় বড় ঘটনা মানুষ চট করে ভুলে যায়। আবার অর্থহীন সামান্য অনেক অকিঞ্চিৎ ব্যাপার মানুষের অন্তরে দাগ কেটে বসে যায়।

বড় চাচার এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে কত বড় বড় ঘটনাই তো ঘটেছে। কিন্তু সে সব ছবি বড় ঝাপসা। কষ্ট করে দেখতে হয়, ঠিক ঠিক মনে পড়তে চায় না। শিরীন মরবার সময় তাঁকে যেন কী সব বলেছিল। সে সব কেমন আবছাভাবে মনে আসে। এমনকি শিরীনের চেহারাও ঠিক ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু একটি ছোট ঘটনা একটি অতি সামান্য ব্যাপার আজও কী পরিষ্কারভাবে মনে আছে তাঁর!

সেদিন ভীষণ গরম পড়েছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছেন। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা পড়ে গেছে। তিনি বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। একটি কাক কোত্থেকে এসে কা কা শুরু করেছে। তিনি হাত নেড়ে কাক তাড়িয়ে দিলেন, সেটি আবার উড়ে এলো আর ঠিক তখনি শুনলেন ঘরের ভেতর থেকে শিরীন খুব মৃদু স্বরে সুর করে বলছে, রসুন বুনেছি, রসুন বুনেছি।

কতদিন হয়ে গেল তবু তাঁর মনে হয় যেন সেদিনের ঘটনা। কাকটির তাকানোর ভঙ্গিটিও তাঁর মনে আছে। এরকম হয় কেন মানুষের ? বড় বিচিত্র মন আমাদের।

বড় চাচা দুপুরের খাবার খেতে আনিসের ঘরে চলে গেলেন। আনিস অসুস্থ হয়ে এখানে পড়ে আছে প্রায় এগারো মাস। এই এগারো মাসের প্রতি দুপুরে তিনি আনিসের সঙ্গে খেতে বসছেন। খাওয়ার ঘণ্টা খানিক সময় তিনি আনিসের ঘরে কাটান। এটা সেটা নিয়ে হালকা গল্প-গুজব করেন। আজ ঘরে ঢুকে দেখলেন খাবার দিয়ে গিয়েছে এবং আনিস গোগ্রাসে খাচ্ছে। সে চাচাকে দেখে লজ্জিত হয়ে বলল, বড় ক্ষিধে পেয়েছে চাচা!

ক্ষিধে পেলে খাবি। আমার জন্য অপক্ষা করতে হবে নাকি রে গাধা!

আপনি হাত ধুয়ে আসুন।

তোর শরীর কেমন বল ?

ভালো।

ব্যথা হয়নি, না ?

সকালের দিকে অল্প হয়েছিল, এখন নেই।

বড় চাচা খেতে বসে আনিসের দিকে বারবার তাকাতে লাগলেন। আনিসের চেহারায় তার বাবার চেহারার আদল আছে। খুব পুরুষালী গড়ন। তবে মেয়েদের মতো ছোট্ট বরফি কাটা চিবুক। এইটুকুতেই তার চেহারায় অনেকখানি ছেলেমানুষী এসে গেছে। আনিস বলল, বড় চাচা, আপনার সানাই শুনে আজ জেগেছি।

সানাইয়ের কথায় বড় চাচার মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি যেমন হবে ভেবেছিলেন তেমন হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন বিয়ের এই আনন্দ উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে একটি সকরুণ সুর কাঁদতে থাকুক। সবাইকে মনে করিয়ে দিক এ বাড়ির সবচেয়ে আদরের একটি মেয়ে আজ চলে যাচ্ছে। আর কখনো সে জ্যোৎস্না রাতে ছাদে দাপাদাপি করে ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে না। কিন্তু তিনি যেমন চেয়েছিলেন তেমন হলো না। অল্প বেলা বাড়তেই তুমুল হৈচৈ-এ সানাইয়ের সুর ডুবে গেল। তিনি মনমরা হয়ে রেডিওগ্রাম বন্ধ করে দিলেন।

বড় চাচা হাত ধুয়ে এসে বসলেন আনিসের বিছানায়। আচমকা প্রশ্ন করলেন, তোর কি খুব খারাপ লাগছে আনিস ?

কই না তো!

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে একটা সাদাসিধা ভালো মেয়ে বিয়ে করিস তুই।

আনিস হেসে ফেলল। বড় চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, হাসির কী হলো ? হাসছিস কেন ?

আমি আর বাঁচব না। দিস ইজ এ লাস্ট গেম।

বড় চাচা কথা বললেন না। আনিসের সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু বড় চাচা না যাওয়া পর্যন্ত সেটি সম্ভব নয়। সে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন তিনি উঠেন। কিন্তু তিনি উঠলেন না। আনিসের সিগারেট পিপাসা আরো বাড়িয়ে দিয়ে একটি চুরুট ধরালেন। আনিসের দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, কোনো কারণে আমার উপর তোর কি রাগ আছে ?

কী যে বলেন চাচা! রাগ থাকবে কেন ?

না, সত্যি করে বল ?

কী মুশকিল, আমি রাগ করব কেন ? কী হয়েছে আপনার বলুন ?

আমার কিছু হয়নি।

বড় চাচা হঠাৎ ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কাল রাত থেকে তাঁর মনে হচ্ছিল, আনিসের মনে তাঁর প্রতি কিছু অভিমান জমা আছে। আনিস যদিও এখন হাসছে তবু তাঁর সেই হাসি মুখ দেখে কষ্ট হতে থাকল। তিনি নিজের মনে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে 'যাই আনিস' বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বড় চাচা হচ্ছেন সেই ধরনের মানুষ যারা সামান্য ব্যাপারে অভিভূত হন না। আজ আনিসকে দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন। তিনি চাইছিলেন কিছু একটা করেন কিন্তু কী করবেন তা তাঁর জানা নেই। আনিসের জন্যে তাঁর একটি গাঢ় দুর্বলতা আছে। নিজের দুর্বলতাকে তিনি কোনোকালেই প্রকাশ করতে পারেন না। প্রকাশ করবার খুব একটা ইচ্ছাও তাঁর কোনোকালে ছিল না। কিন্তু আজ তাঁর মন কাঁদতে লাগল। ইচ্ছে হলো এমন কিছু করেন যাতে আনিস বুঝতে পারে এই গৃহে তার জন্যে একটি কোমল স্থান আছে। কিন্তু আনিস বড় অভিমানী হয়ে জন্মেছে। তার জন্যে কিছু করা সেই কারণেই হয়ে ওঠে না।

খুব ছোটবেলায় আনিসের যখন এগারো-বার বৎসর বয়স তখনই বড় চাচা আনিসের তীব্র অভিমানের খোঁজ পান। বড় হয়েছে বলে আনিস তখন আলাদা ঘরে ঘুমায়। তার ঘরটি একতলায়। পাশের ঘরে আনিস, জরী ও পরীদের মাস্টার সাহেব থাকেন। এক রাত্রিতে খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। বড় চাচা আনিসের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনলেন আনিস কাঁদছে। তিনি ডাকলেন, আনিস, কী হয়েছে রে ?

আনিস ফুঁপিয়ে বলল, ভয় পাচ্ছি।

আয় আমার ঘরে। আমার সঙ্গে থাকবি।

না।

তাহলে আমি সঙ্গে শুই ?

না।

দরজা খোল তুই।

আনিস দরজা খুলল না। তিনি অনেকক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বড় চাচার মনে হলো, জরীর বিয়ের এই দিনটি আনিসের জন্যে খুব একটা দুঃখের দিন। কিন্তু তাঁর কিছুই করবার নেই।

যে ছেলেটির সঙ্গে জরীর বিয়ে হচ্ছে তার খোঁজ বড় চাচাই এনেছিলেন। তাঁর আবাল্যের বন্ধু আশরাফ আহমেদের বড় ছেলে। নম্র ও বিনয়ী। লাজুক ও হৃদয়বান। দেখতে আনিসের মতো সুপুরুষ নয়। রোগা ও কালো। জরীর বাবা আপত্তি করেছিলেন। বারবার বলেছেন, ছেলের ধরন-ধারণ যেন কেমন! জরীর মা'রও ঠিক মত নেই। মিনমিন করে বলেছেন, ইউনিভার্সিটির মাস্টার, কয় পয়সা আর বেতন পায়। কিন্তু বড় চাচার প্রবল মতের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তিই টিকল না। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, জরীর মতো একটি ভালো মেয়ের জন্যে এরকম একজন ভাবুক ছেলেই দরকার। যে গল্প-কবিতা লেখে। জরী সুখ পাবে। কিন্তু আপত্তি উঠল সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গা থেকে। বড় চাচা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তিনি সেদিন শয্যাশায়ী। দাঁতের ব্যথায় কাতর। সন্ধ্যাবেলা ঘরের বাতি জ্বালেননি। অন্ধকারে শুয়ে আছেন। জরী এসে কোমল গলায় ডাকল, বড় চাচা।

কী জরী ?

আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

বড় চাচা বিছানায় উঠে বসলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, বাতি জ্বালা জরী।

না, বাতি জ্বালাতে হবে না।

জরী এসে বসল তাঁর পাশে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, কী হয়েছে জরী?

বড় চাচা, আমি...

বল, কী ব্যাপার?

জরী থেমে থেমে বলল, বড় চাচা, আমি ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করব না।

কেন? কী হয়েছে?

বড় চাচা, আমি আনিস ভাইকে বিয়ে করতে চাই।

জরী কাঁদতে লাগল। বড় চাচা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আনিস জানে?

জরী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, জানে। তাকে আসতে বলেছিলাম, তার নাকি লজ্জা লাগে।

দু'জনেই বেশ কিছু সময় চুপচাপ কাটাল। বড় চাচা এক সময় বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে।

সে-রাতে তিনি একটুও ঘুমুতে পারলেন না। অনেকবার তাঁর ইচ্ছে হলো তিনি আনিসের কাছে যান। কিন্তু তিনি নিজের ঘরেই বসে রইলেন। তাঁর অনেক পুরনো কথা মনে পড়তে লাগল।

জরীর অনেক অদ্ভুত আচরণ অর্থবহ হলো। একটি মেয়ে তো শুধু শুধু একা ছাদে বসে কাঁদতে পারে না। সেই চোখের জলের কোনো না কোনো কোমল কারণ থাকে। আশ্চর্য! এ সব তার চোখ এড়িয়ে গেল কী করে?

বিয়ে বড় চাচাই ভেঙে দিয়েছিলেন। যদিও কাউকেই বলেননি এত আগ্রহ যে বিয়ের জন্য ছিল হঠাৎ তা উবে গেল কেন!

আজ জরীর বিয়ে হচ্ছে এবং আশ্চর্য, সেই ছেলেটির সঙ্গেই। মাঝখানে একটি ভালোবাসার সবুজ পর্দা দুলছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কী? জীবন বহতা নদী। একটি মৃত্যুপথযাত্রী যুবকের জন্যে তার গতি কখনো থেমে যায় না। থেমে যাওয়া উচিত নয়।

বড় চাচার কষ্ট হতে লাগল। জরীর জন্য কষ্ট। আনিসের জন্য কষ্ট এবং সেই সঙ্গে তাঁর মৃতা স্ত্রীর জন্যে কষ্ট। তাঁর ইচ্ছে হলো আবার আনিসের ঘরে যান। তার মাথায় হাত রেখে মৃদু গলায় বলেন, আনিস, তোর মনে আছে, একবার আমার সঙ্গে জন্মাষ্টমীর মেলায় গিয়েছিলি, সেখানে...

তিনি আবার আনিসের ঘরে ফিরে এলেন।

আনিস পা দোলাতে দোলাতে সিগারেট টানছিল। বড় চাচাকে দেখে সে সিগারেট লুকিয়ে ফেলল।

কিছু বলবেন চাচা?

না না, কিছু বলব না।

বড় চাচা আবার ফিরে গেলেন।

দুপুরের রোদ সরে গেছে।

শীতের বিকেল বড্ড দ্রুত এসে যায়। বেলা তিনটা মোটে বাজে, এর মধ্যেই গাছের ছায়া হয়েছে দীর্ঘ, রোদ গিয়েছে নিভে। বৈকালিক চায়ের যোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছেন জরীর মা। হাতে সময় খুব অল্প, সন্ধ্যা সাতটার আগেই বরযাত্রী এসে যাবে। তারা খবর পাঠিয়েছে ন'টার মধ্যেই যেন সব শেষ করে কনে বিদায় দিয়ে দেয়া হয়।

রান্নাবান্না হয়ে গিয়েছে। ছাদে টেবিল-চেয়ার সাজানোও শেষ। একশ' বরযাত্রীকে এক বৈঠকেই খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ির সামনে ডেকোরেটররা চমৎকার গেট বানিয়েছে। সন্ধ্যার পর পরই ইলেকট্রিক বাল্বের আলোয় সেই গেট ঝলমল করবে।

জরীর বাবার অফিস সুপারিনটেনডেন্ট কী মনে করে যেন দুপুরবেলাতেই এসে পড়েছেন। জরীর বাবা সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গেই আছেন। জরীর মা'র হাতে যদিও কোনো কাজ নেই তবু তিনি মুহূর্তের জন্যেও ফুসরত পাচ্ছেন না। আজ তাঁর গোসলও করা হয়নি, দুপুরের খাওয়াও হয়নি। সারাক্ষণই ব্যস্ত হয়ে ঘুরঘুর করছেন।

এখন তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তবু এই মাথা ধরা নিয়েই বিরাট এক কেতলি চা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন।

পাড়ার মেয়ে এবং জরীর বন্ধুরা জরীকে ঘিরে বসেছিল। চা আসতেই অকারণ একটা ব্যস্ততা শুরু হলো। কনক বলল, জরী, তুই চা খাবি এক কাপ?

না, আমার শরীর খারাপ লাগছে।

খা না এক ঢোক।

চায়ে প্রচুর চিনি ও এলাচ দেয়ায় পায়েসের মতো গন্ধ। তবু চমৎকার লাগছে খেতে। জরীর মা বললেন, চপ আনতে বলেছি। যে কয়টা পার খেয়ে নাও সবাই—রাতে খেতে দেরি হবে।

আবার একটা হুল্লোড় উঠল।

কন্যাপক্ষীয় মেহমানদের আসবার বিরাম নেই। রিকশা এসে থামছে। হাসিমুখে নামছে চেনা লোকজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিশে যাচ্ছে বিয়ে বাড়ির স্রোতে। এরকম একটা উৎসবে কাউকেই আলাদা করে চেনা যায় না। সবাই বাড়ির লোক হয়ে যায়। আনিসের মা তাই রিকশা থেকে নেমে হকচকিয়ে গেলেন।

আনিসের মা যে আসবেন তা সবাই জানত। তাঁকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে, আনিস সতেরো তারিখে আমেরিকা যাচ্ছে, জটিল অপারেশন হবে। একবার যেন

তিনি আসেন। সেই চিঠি পেয়ে আনিসের মা যে এত আগেভাগে এসে পড়বেন তা কেউ ভাবেনি।

অনেক দিন পরে দেখা, তবু জরীর মা ঠিকই চিনলেন। চিনলেও না চেনার ভান করলেন। বললেন, আপনাকে চিনতে পারলাম না তো!

আনিসের মা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, আমি আশরাফী, আনিসের মা।

তাঁর স্বামী ভদ্রলোকটি মোটাসোটা ধরনের গোবেচারা ভালোমানুষ। তিনি বিনীত হেসে বললেন, আপা, ভালো আছেন ? কার বিয়ে ?

আমার সেজো মেয়ের।

বলতে গিয়ে জরীর মা'র একটু লজ্জা লাগল। কারণ পরীর বিয়ের সময় এদের কোনো খবর দেননি, জরীর বিয়েতেও না। জরীর মা বললেন, আপনারা হাত-মুখ ধোন। আনিসের সঙ্গে দেখা করলে দোতলায় যান।

আনিসের মা দোতলায় উঠলেন না। তাঁর হয়তো কোনো কারণে লজ্জা বোধ হচ্ছিল। বিয়ে বাড়িতে অতিথি হিসেবেও নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগছে। কিন্তু তাঁকে তো আসতেই হবে। কারণ এই বাড়িতেই তাঁর একটি অসুস্থ ছেলে আছে। সেই ছেলেটি এক সময় এতটুকুন ছিল। দু'টি ছোট ছোট দুধ দাঁত দেখিয়ে অনবরত হাসত। কথা শিখল অনেক বয়সে। তাও কী, 'ম' বলতে পারত না। আম্মাকে ডাকত 'আন্না' বলে। আহ, চোখে জল আসে কেন ?

পুরনো কথায় বড় মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি ছোট ছোট পা ফেলে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এ বাড়ির লোকজন অনেকেই আজ তাঁকে চিনতে পারছে না, এও এক বাঁচোয়া। চিনতে পারলে আরো খারাপ লাগত। মাঝ বয়েসী এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জরীর কী হন ?

তিনি থতমত খেয়ে কী একটা বললেন। লোকজনের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলেন ভেতরের দিকে।

এ বাড়ির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি যখন বউ হয়ে আসেন তখন দোতলায় একটিমাত্র ঘর ছিল, সেখানে বড় ভাসুর থাকতেন। পুকুরপাড়েও কোনো আলাদা ঘর ছিল না। বাড়ির কোনো নামও ছিল না। লোকে বলত 'উকিল বাড়ি'। রিকশা থেকে নেমেই পিতলের নেমপ্লেটে বাড়ির নাম দেখলেন 'কারা কানন'। কে রেখেছে এ নাম কে জানে! বোধহয় বড় ভাসুর। এ বাড়ি এখন আর চেনা যায় না। অনেক সুন্দর হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ফুলের বাগানটি নষ্ট হয়ে গেছে। গোলাপঝাড়ে মাত্র অল্প ক'টি ফুল দেখছেন। অথচ এক সময় অগণিত গোলাপ ফুটত।

এই গোলাপ নিয়েই কত কাণ্ড। আনিসের বাবার শখ হলো গোলাপ দিয়ে খাঁটি আতর বানাবেন। রাশি রাশি ফুল কুচিকুচি করে পানিতে চুবানো হলো। সেই পানি জ্বাল দেয়া হলো সারাদিন। সন্ধ্যাবেলা আতর তৈরি হলো, বোটকা গন্ধে তার কাছে যাওয়া যায় না! বাড়িতে মহা হাসাহাসি। আনিসের বাবার মনমরা ভাব কাটাবার

জন্যে তিনি সে আতর মাখলেন। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল 'আতর বৌ'। কী লজ্জা! কী লজ্জা! বড় ভাসুর পর্যন্ত 'আতর বৌ' বলে ডাকতেন। পরী তখন সবে কথা বলা শিখেছে। 'র' বলতে পারে না, সে ডাকত 'আতল, আতল'। আজ কি সেই পুরনো স্মৃতিময় নাম কারো মনে আছে? জরীর মা যখন নাম জানতে চাইলেন তখন তিনি কেন সহজ সুরে বললেন না, আমি আতর বৌ?

না, আজ তা সম্ভব নয়। এ বাড়িতে আতর বৌ বলে কেউ নেই। পুরনো দিনের সব কথা মনে রাখতে নেই। কিছু কিছু কথা ভুলে যেতে হয়। তিনি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পিছনের খোলা জায়গাটায় এসে পড়লেন। এখানে একটি প্রকাণ্ড পেয়ারা গাছ ছিল, 'সৈয়দি পেয়ারা' বলত সবাই। ভেতরটা লাল টুকটুক। গাছটি আর নেই। আতর বৌ হাঁটতে হাঁটতে পুকুরপাড়ে চলে গেলেন। কী পরিষ্কার পানি! আয়নার মতো ঝকঝক করছে। পুকুরপাড়ের ঘাটটি বাঁধানো। তার সময় বাঁধানো ছিল না। সে-সময় কাঠের তক্তা দিয়ে ঘাট বাঁধা ছিল। শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে থাকত সে ঘাট। পা টিপে টিপে পানিতে নামতে হতো। একবার তো পিছলে পড়ে হাত কেটে গেল অনেকখানি।

রক্ত বন্ধ হয় না কিছুতেই, শাড়ি দিয়ে হাত চেপে ধরে ঘরে উঠে এসেছেন। সারা শাড়ি রক্তে লাল। দেখতে পেয়ে আনিসের বাবা সঙ্গে সঙ্গে ফিট। এমন জোয়ান মানুষ, অথচ একটু আধটু রক্ত দেখলেই হয়েছে কাজ। আতর বৌ ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

তাঁর ক্ষণিকের জন্য মনে হলো, এ বাড়ি থেকে চলে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। এখানে থাকলে জীবন এমন কিছু মন্দ কাটত না। পর মুহূর্তেই এ চিন্তা ছেঁটে ফেললেন। পুরনো জায়গায় ফিরে আসবার জন্যই এরকম লাগছে হয়তো। তিনি আসলে মোটেই অসুখী নন। তাঁর স্বামী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কোনো গোপন দুঃখ নেই। নিজের চারদিকে নতুন জীবনের সৃষ্টি করেছেন। সেখানে দুঃখ, হতাশা ও গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসাও আছে। শুধু যদি আনিস তার সঙ্গে থাকত! ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হেসে খেলে বড় হতো।

কিন্তু এ বাড়ির সবাই অহঙ্কারী ও নিষ্ঠুর। আনিসকে তারা কিছুতেই ছাড়ল না। অবিমিশ্র সুখী কখনো বোধহয় হতে নেই।

আতর বৌ এসেছ?

আতর বৌ চমকে দেখলেন— বড় ভাসুর, নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ আতর বৌ।

তাঁর মুখে পুরনো দিনের ডাক শুনে আতর বৌ-এর চোখে পানি এলো। বড় ভাসুর বললেন, তোমার ছেলেমেয়েরা সবাই ভালো?

জি ভালো।

তাদের নিয়ে আসলে না কেন, দেখত তাদের আনিস ভাইকে।

আপনি তো চিঠিতে তাদের আনবার কথা লিখেননি।

আতর বৌ আঁচলে চোখ মুছলেন। বড় ভাসুর বললেন, কাঁদছ কেন ?

না, কাঁদছি না।

আনিসের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?

না।

তাহলে তার পাশে গিয়ে একটু বসো। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। আজ আনিসের বড় দুঃখের দিন।

আতর বৌ বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ? আজ দুঃখের দিন কেন ?

বড় ভাসুর চুপ করে রইলেন। অনেকদিন পর আতর বৌকে দেখে তাঁর বড় ভালো লাগছে। তিনি হঠাৎ কী মনে করে বললেন, আতর বৌ, আনিসের বাবাকে কখনো স্বপ্নে দেখ ?

আতর বৌ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, দেখি।

তুমি কিছু মনে করলে না তো ?

না। কিছু মনে করিনি। স্বপ্নের কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন ?

এমনি করেছি। কোনো কারণ নেই।

৭

আনিস লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। আগে আরো দু'একবার দেখা হয়েছে। আজ যদিও অনেকদিন পরে দেখা তবু চিনতে একটুও দেরি হলো না। লোকটি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। আনিসকে তাকাতে দেখে মৃদু গলায় বলল, ভেতরে আসব ?

আসুন।

লোকটি ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। মাথার চুল পেকে গেছে। কপালের চামড়া কোঁচকানো। চোখ দু'টি ভাসা ভাসা। সমস্ত মুখাবয়বে একটা ভালোমানুষি আত্মভোলা ভঙ্গি আছে।

আমি একটু বসলে তোমার অসুবিধে হবে ?

বসুন বসুন। অসুবিধে হবে কেন ?

আমাকে চিনতে পেরেছ তো বাবা ?

হ্যাঁ।

আমি তোমার মাকে নিয়ে এসেছি।

আনিস চুপ করে রইল। লোকটির বসবার ধরন কেমন অদ্ভুত। পা তুলে পদ্মাসন হয়ে চেয়ারে বসেছেন। সারাক্ষণই হাসছেন আপন মনে। আনিস কী কথা বলবে ভেবে পেল না। দু'জন লোক চুপচাপ কতক্ষণ বসে থাকতে পারে ? এক সময় আনিস

বলল, আপনার ছেলেমেয়ে কয়টি ?

দুই মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, কেমিস্ট্রিতে অনার্স, এইবার সেকেন্ড ইয়ার।

ছেলেমেয়েদের কথা বলতে পেরে ভদ্রলোকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ঝুঁকে এলেন আনিসের দিকে। গাঢ় স্বরে বলতে লাগলেন, বড় মেয়ের নাম নীলা, তোমার মা রেখেছেন। ছোট মেয়ের নাম আমি রেখেছি ইলা। ছেলেটির নাম শাহীন।

ভদ্রলোক মহা উৎসাহে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন। তেমনি অন্তরঙ্গ সুরে বলতে লাগলেন, গত ঈদের সময় নীলা তোমাকে একটা ঈদকার্ড পাঠিয়েছিল। নিজেই এঁকেছে, নদীতে সূর্যাস্ত হচ্ছে। দু'টি বক উড়ে যাচ্ছে। তুমি পাওনি বাবা ?

পেয়েছিলাম।

নীলা ভেবেছিল তুমিও তাকে একটা পাঠাবে। সে রোজ জিজ্ঞেস করত, বাবা, তোমার ঠিকানায় আমার কোনো ঈদকার্ড এসেছে ?

আনিস লজ্জা পেল খুব। লজ্জা ঢাকবার জন্য জিজ্ঞেস করল, ইলা কত বড় হয়েছে ?

ক্লাস নাইনে পড়ে। বৃত্তি পেয়েছে ননরেসিডেনশিয়াল।

দেখতে কেমন হয়েছে ?

আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তবে শ্যামলা রঙ। নাকটা একটু চাপা। স্কুলের মেয়েরা তাকে চায়না ডেকে ক্ষেপায়।

আনিস হো হো করে হেসে ফেলল। নীলা ও ইলার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভালো হতো। আনিস মনে মনে ভাবল ইলার সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয় তাহলে সে বলবে—

ইলা হলো চায়না
ব্যাঙ ছাড়া খায় না।

ভদ্রলোক বললেন, তোমার ভাই-বোনগুলির খুব শখ ছিল তুমি কিছুদিন তাদের সঙ্গে থাক। একবার তোমার মা খুব করে লিখেছিল, ঠিক না ?

আনিস লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়ল। তার মা সেবার শুধু চিঠিই লেখেননি, একশ'টি টাকাও পাঠিয়েছিলেন। সে টাকা ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

ভদ্রলোক উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, ইলা আবার কবিতাও লেখে। স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে তার কবিতা— 'রুগ্ন হওয়ার রহস্য' কবিতার নাম। ভীষণ হাসির কবিতা। দাঁড়াও তোমাকে শুনাই। আমার মনে আছে কবিতাটি।

ভদ্রলোক চেয়ার থেকে পা নামিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

কয়েক হাঁড়ি পাটালী গুড়
সঙ্গে কিছু মিষ্টি দই,
সেরেক খানি চিড়ে ছাড়াও
লাগবে তাতে ভালো খই...

কী, সবটা বলব ?

আনিস সে-কথার জবাব দিল না, ঘোলাটে চোখে তাকাল। তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে। ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, কী হয়েছে বাবা ? তুমি খুব ঘামছ!

সে ব্যথাটি আবার শুরু হয়েছে। পা দুটো কেউ যেন জ্বলন্ত আগুনে ঠেসে ধরল। আনিস গোঙাতে শুরু করল। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মৃদু স্বরে ডাকলেন, ও বাবা শোন, ও আনিস!

আনিস বিকৃত স্বরে বলল, আপনি এখন যান। একা থাকতে দেন আমাকে।

ভদ্রলোক নড়লেন না। একটা হাত-পাখা নিয়ে সজোরে বাতাস করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, পানি খাবে বাবা ? মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ?

আনিস কথা বলতে পারছিল না। ভদ্রলোক অসহায় গলায় বললেন, কেউ কি একজন ডাক্তার ডেকে আনবে, আহা বড় মায়া লাগে। আনিসের মা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে দেখলেন আনিস চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে আছে আর ইলা-নীলার বাবা প্রবল বেগে হাওয়া করছেন। আনিসের মা ঘরের ভেতর ঢুকলেন না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে। শুনলেন ইলার বাবা মৃদুস্বরে বলছেন, ইয়া রহমানু ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকু...

তখন নিচে তুমুল হৈচৈ-এর সঙ্গে 'বর এসেছে বর এসেছে' শোনা গেল, আতর বৌ নিচে নামলেন। তাঁকে একজন ডাক্তার খুঁজতে হবে। আনিসের জন্য একজন ডাক্তার প্রয়োজন।

৮

একটি লাজুক ভদ্র ও বিনয়ী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল জরীর। মুসলমানদের বিয়ে বড় বেশি সাদাসিধে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উৎসবের সমাপ্তি। যে ছেলেটির সঙ্গে কোনো জন্মেও জরীর পরিচয় ছিল না তার সঙ্গে পরম পরিচয়ের অনুষ্ঠানটি এত ক্ষুদ্র হতে দেখে ভালো লাগে না। মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় কী যেন একটা বাকি থেকে গেল।

জরীর দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না। শ্যামলা রঙের এই মেয়েটি এত রূপ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল ? দেখে দেখে বুকের ভেতরে আশ্চর্য এক ব্যথার অনুভূতি হয়। ভয় হয়, সেই লাজুক ভদ্র ও বিনয়ী ছেলেটি কি এই রূপের ঠিক মূল্য দেবে ? হয়তো দেবে কারণ ছেলেটি কবি, মাঝে মাঝে গল্পও লেখে। হয়তো দেবে না, না

চাইতে যা পাওয়া যায় তার তো কোনোকালেই কোনো মূল্য নেই।

জরী বসে আছে সম্রাজ্ঞীর মতো। তার যে বন্ধুরা এতক্ষণ গা ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেছিল তারা এখন খানিকটা দূরে সরে বসেছে। বিয়ের পর পরই অবিবাহিত মেয়েদের থেকে বিবাহিতরা আলাদা হয়ে পড়ে। আভা জিজ্ঞেস করল— কেমন লাগছে জরী ?

জরী হাসল। কনক বলল, আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, তোর বিয়ে হয়ে গেছে।

জরীর মা ক্লান্ত ও অবসন্ন ভঙ্গিতে পাশেই বসে। বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকেই তিনি অবিশ্রান্ত কাঁদছেন। জরী অনেকটা সহজ হয়েছে, হালকা দু-একটা কথাও বলছে। বরের ছোট বোন জরীকে নিয়ে কী একটা রসিকতা করায় সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে জরীও হেসেছে। এক সময় সে বলল, মা, বড় চাচা কোথায় ?

আনিসের ঘরে, আনিসের অসুখটা খুব বেড়েছে। ডাকব তোর চাচাকে ?

না। আনিস ভাইয়ের মা'র সঙ্গে একটু আলাপ করব।

আতর বৌ ছেলের কাছে ছিলেন না। বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। জরী ডাকছে শুনে ঘরে এলেন। জরী বলল, ভালো আছেন চাচি ?

হ্যাঁ মা।

জরী হঠাৎ তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করল। আতর বৌ বললেন, স্বামী ভাগ্যে ভাগ্যবতী হও, লক্ষ্মী মা।

বরের ছোট বোনটি আবার কী একটা হাসির কথা বলে সবাইকে হাসিয়ে দিল। আতর বৌ বললেন, এই ছোট্টটি দেখেছি জরীকে। কী দুষ্টুই না ছিল! এখন কেমন বৌ সেজে বসে আছে। অবাক লাগে।

অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে আনিসের ঘরে। বড় চাচা, হোসেন সাহেব. আনিসের মা, ইলা-নীলার বাবা, আনিসকে যে ডাক্তারটি চিকিৎসা করেন তিনি এবং পরী। সবাই চুপ করে আছে। ব্যথায় আনিসের ঠোঁট নীল হয়ে উঠেছে, তার চোখ টকটকে লাল। সে এক সময় বিকৃত স্বরে বলল, দুলাভাই, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেন। পেথিড্রিন দেন।

হোসেন সাহেব আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। বড় চাচা বললেন, হোসেন, তুমি পেথিড্রিন দাও।

হোসেন সাহেব সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে লাগলেন, আনিসের মা থরথর করে কাঁপছিলেন। এক ফাঁকে হোসেন সাহেব তাঁকে বললেন, আপনি ভয় পাবেন না, এক্ষুণি ঘুমিয়ে যাবে।

আনিসের মা বিড়বিড় করে কী বললেন ভালো শোনা গেল না।

ইনজেকশনের পর পরই আনিস পানি খেতে চাইল। রাত কত হয়েছে জানতে চাইল।

হোসেন সাহেব বললেন, ঘুম পাচ্ছে আনিস ?

হ্যাঁ।

আনিসের মা বললেন, এখন আরাম লাগছে বাবা ?

লাগছে।

আনিসের মা দোয়া পড়ে ফুঁ দিলেন ছেলের মাথায়। আনিস জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, বাতি নিভিয়ে দাও, চোখে লাগে।

বাতি নিভিয়ে তারা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

নিচে জরীর বিদায়ের আয়োজন চলছে। রাত হয়েছে দশটা। বরযাত্রীরা আর এক মিনিটও দেরি করতে চাইছে না। কিন্তু ক্রমাগতই দেরি হচ্ছে। কনে বিদায় উপলক্ষে খুব কান্নাকাটি হচ্ছে। জরীর মা দুবার ফিট হয়েছেন। জরীকে ধরে রেখেছেন।

বর-কনেকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হবে। জরী শেষবারের মতো বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে— তার ছবি। ভাড়া করা ফটোগ্রাফার ক্যামেরা স্ট্যান্ডে লাগিয়ে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে। বর এসে দাঁড়িয়ে আছে কখন থেকে। কনের দেখা নেই। জরীকে বারবার ডাকা হচ্ছে।

ঘরের সব ঝামেলা চুকিয়ে জরী যখন বারান্দায় ছবি তোলবার জন্যে রওয়ানা হয়েছে তখনি হোসেন সাহেব বললেন, জরী, আনিসের সঙ্গে দেখা করে যাও। তার সঙ্গে আর দেখা নাও হতে পারে।

জরী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব বরকে বললেন, তুমি আর দু'মিনিট অপেক্ষা কর। এ বাড়ির একটি ছেলে খুবই অসুস্থ, জরী তার সাথে দেখা করে যাক।

যদি বলেন তবে আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।

না, তোমার কষ্ট করতে হবে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর। এসো জরী।

জরীর সঙ্গে অনেকেই উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু হোসেন সাহেব বারণ করলেন, দল-বল নিয়ে রোগীর ঘরে গিয়ে কাজ নেই।

আনিসের ঘর অন্ধকার। বাইরে বিয়ে বাড়ির ঝলমলে আলো। সে আলোয় আনিসের ঘরের ভেতরটা আবছা আলোকিত। জরী ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। হালকা একটি সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। জরী কী সেন্ট মেখেছে কে জানে। সে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মৃদু স্বরে ডাকল, আনিস ভাই। আনিস ভাই।

কেউ সাড়া দিল না। হোসেন সাহেব বললেন, বাতি জ্বালাব জরী ?

না, না দুলাভাই।

জরী নিচু হয়ে আনিসের কপাল স্পর্শ করল। ভালোবাসার কোমল স্পর্শ। যার জন্যে একটি পুরুষ আজীবন তৃষিত হয়ে থাকে। হোসেন সাহেব বললেন, ছিঃ জরী কাঁদে না। এসো আমরা যাই!

ঘরের বাইরে বড় চাচা দাঁড়িয়েছিলেন। জরী তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে মা। ফি আমানিল্লাহ, ফি আমানিল্লাহ।

নিচে তুমুল হৈচৈ হচ্ছিল। জরী নামতেই তাকে বরের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। ক্যামেরাম্যান বলল, একটু হাসুন।

সবাই বলল, হাসো জরী হাসো, ছবি উঠবে!

জরীর চোখে জল টলমল করছে কিন্তু সে হাসল।

৯

আনিসের ঘুম যখন ভাঙল তখন কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ঠিক বুঝতে পারছে না। জরী কি চলে গিয়েছে নাকি ? উঠোনে সারি সারি আলো জ্বলছে।

গেটের বাতিগুলি জ্বলছে নিভছে। তার বিছানার খানিকটা অংশ বারান্দার বাতিতে আলোকিত হয়ে রয়েছে।

আনিস ঘাড় উঁচু করে জানালা দিয়ে তাকাল। না, বরের গাড়ি এখনো যায়নি। জরী এখনো এই বাড়িতেই আছে। যাবার আগে দেখা করতে এখানে আসবে নিশ্চয়ই। আনিস তখন কী বলবে ভেবে পেল না। খুব গুছিয়ে কিছু একটা বলা উচিত যাতে জরীর মনের সব গ্লানি কেটে যায়। কিন্তু আনিস কোনো কথাই গুছিয়ে বলতে পারে না।

জরীকে বিয়ের সাজে কেমন দেখাচ্ছে কে জানে! আনিস হয়তো দেখে চিনতেই পারবে না। জরী কি হুট করে তাকে সালাম করে বসবে নাকি ? এই একটি বিশ্রী অভ্যেস আছে তার। ঈদের দিন কথা নেই বার্তা নেই সেজে গুঁজে এসে টপ করে এক সালাম। কিছু বললে বলবে— সিনিওরিটির একটা ভ্যালু আছে না ? তারপরই খিলখিল হাসি।

আনিস অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে রইল। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। বরযাত্রীরা তৈরি হয়েছে বিদায় নিতে। সবাই জরীকে ধরাধরি করে উঠোনে নিয়ে এলো। রাজ্যের লোক সেখানে এসে ভিড় করেছে। যাবার আগে সবাই একটু কথা বলবে। দু-একটি কী আচার-অনুষ্ঠানও আছে।

আনিস জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। বরের সাজানো গাড়ি ব্যাক করে আরো পেছনে আনা হচ্ছে। গাড়িতে উঠতে যেন কনেকে হাঁটতে না হয়। উপর থেকে

জরীর ঝলমলে লাল শাড়ির খানিকটা চোখে পড়ে। খুব আগ্রহ নিয়ে আনিস সেদিকে তাকিয়ে রইল। যাবার আগে জরী নিশ্চয়ই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে।

আনিস আনিস ?

কে ?

আমি টিংকুমণি। আমি এসেছি।

এসো এসো।

তোমার ব্যথা কমেছে ?

কমেছে।

আচ্ছা।

সারাদিনের ক্লান্তিতে মেয়েটির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চুল এলোমেলো। আজ কেউ তার দিকে নজর দেবার সময় পায়নি। আনিস তাকে বুকের কাছে টেনে নিল। জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ টিংকু, জরী চলে যাচ্ছে।

টিংকু সে কথায় কান দিল না। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি ব্যথা পেয়েছি, হাত ভেঙে গেছে।

আহা আহা! একটু হাতি হাতি খেলবে টিংকু ?

না, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ছোট ছোট হাতে আনিসের গলা জড়িয়ে ধরে টিংকু কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্রমে ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। বিয়ে বাড়ির আলোগুলি নিভে যেতে লাগল। বাগানের গোলাপ আর হাস্নুহেনা ঝাড় থেকে ভেসে এলো ফুলের সৌরভ। অনেক দূরে একটি নিশি পাওয়া কুকুর কাঁদতে লাগল।

তারও অনেক পরে আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠল। তার আলো এসে পড়ল নিদ্রিত শিশুটির মুখে। জ্যোৎস্নালোকিত একটি শিশুর কোমল মুখ, তার চারপাশে কী বিপুল অন্ধকার! গভীর বিষাদে আনিসের চোখে জল এলো। যে জীবন দোয়েলের, ফড়িংয়ের মানুষের সাথে তার কোনোকালেই দেখা হয় না।

নির্বাসন

আবু জাফর শামসুদ্দিন

নৌকা ছাড়তেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

এ অঞ্চলে বৃষ্টি-বাদলার কিছু ঠিক নেই। কখন যে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামবে, আবার কখন যে সব মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ঝকঝকে হয়ে উঠবে, কেউ বলতে পারে না।

আমি নৌকার ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। বেশ শীত করছে। ঠান্ডা বাতাসে গায়ে কাঁপন লাগে। নৌকা চলছে মন্থর গতিতে। হাসান আলি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড় টানছে। এত বড় নৌকা কী জন্যে নিয়েছে কে বলবে। পানসির মতো আকৃতি। দাঁড় টেনে একে নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা ?

এখন বাজছে ন'টা। রাত দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছানো এ নৌকার কর্ম নয়। লগি ঠেলে নিয়ে গেলে হয়তো হবে। কিন্তু লগিটা ঠেলবে কে ? আমি নেই এর মধ্যে, বৃষ্টিতে ভিজে গুনের দড়ি নিয়ে দৌড়ানো আমাকে দিয়ে হবে না। সাফ কথা।

বৃষ্টি দেখছি ক্রমেই বাড়ছে। বিলের মধ্যিখানে বৃষ্টির শব্দটা এমন অদ্ভুত লাগে! কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আবার বাতাসে 'হঅ' 'হঅ' আওয়াজ উঠছে। প্যাঁচা ডাকার মতো। ভয় ধরে যায় শব্দ শুনে। ছেলেবেলায় একবার এরকম শব্দ শুনে এমন ভয় পেয়েছিলাম। মানসাপোতার বিলে মাঝি দিক ভুল করেছে। চারদিকে সীমাহীন জল। বড়রা সবাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করছে। তাদের হৈচৈ-এ ঘুম ভেঙে শুনেছি সেই বিচিত্র 'হঅ' 'হঅ' আওয়াজ। আজও সেই শব্দে ভয় ধরল। কে জানে কেন। আমি কি কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কা করছি ?

কুটকুট করে মশার কামড় খাচ্ছি। এই বিলের মধ্যে আবার মশা কোত্থেকে আসে ? হাত-পা আর মুখে অল্প কিছু কেরোসিন তেল মেখে নিলে হতো। সবাই দেখি তাই করে। হুমায়ূন ভাইও করেন। মশার উৎপাত থেকে বাঁচা যায় তাহলে। কেরোসিন মাখতে ইচ্ছে হয় না আমার। কী জানি বাবা, চামড়ার কোনো ক্ষতিই করে কিনা। হয়তো গাল-টাল ঝলসে কয়লা হয়ে পড়বে। এর চেয়ে মশার কামড় অনেক ভালো। হান্ড্রেড টাইমস বেটার।

হুমায়ূন ভাইও দেখি আমার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর ধারণা, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি। মাথার নিচ থেকে নিঃশব্দে বালিশটা নিয়ে নিলেন। বেশ লোক যা হোক! মজিদ বা আনিস হলে আমি গদাম করে একটা ঘুসি মারতাম। পরিষ্কার একটা হাতের কাজ দেখতে পেত। চালাকি পেয়েছ, না ? বালিশ ছাড়া আমি শুয়ে থাকতে পারি না। অনেকেরই দেখি মাথার নিচে কিছু নেই, কিন্তু কেমন ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকায়। আমি পারি না।

বৃষ্টির তো বড় বাড়াবাড়ি দেখছি। ঝড়টড় এলে বিপদ। সাঁতার যা জানি, তাতে তিন মিনিটের বেশি ভেসে থাকা যাবে না। নৌকা ডুবলে মার্বেলের গুলির মতো তলিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। অবশ্যি সেটাও খুব একটা মন্দ ব্যাপার হবে না। ওমা, হাসি আসছে কী জন্যে বা! সবাইকে চমকে দিয়ে হেসে উঠব নাকি ?

হুমায়ূন ভাই দেখি উঠে বসেছেন। মশা কামড়াচ্ছে বোধহয়। কিংবা কোনো কারণে ভয় লাগছে। ভয় পেলেই এরকম অস্থিরতা আসে। মজিদ বলল, কি হুমায়ূন ভাই, ঘুম হলো না ?

এই ঝড়-বৃষ্টিতে ঘুম আসে নাকি ? তাছাড়া টেনশনের সময় আমার ঘুম হয় না।

এক দফা চা খেলে কেমন হয় ? বানাব নাকি ?

বাতাসের মধ্যে চুলা ধরাবে কী করে ?

হাসান মিয়া ধরাতে পারবে। ও হাসান, লগি মেরে নৌকা দাঁড় করাও গো! চা না খেলে জুত হচ্ছে না। এহ্-হে, তুমি তো ভিজে একেবারে আলুর দম হয়ে গেছ হাসান আলি।

ভিজে আলুর দম হয়ে যাওয়াটা আবার কী রকম! এরকম উল্টোপাল্টা কথা শুধু মজিদই বলতে পারে। একদিন আমাকে এসে বলছে, জাফর, যা পরিশ্রম করেছি— একেবারে টমেটো হয়ে গেছি। পরিশ্রমের সঙ্গে টমেটোর কী সম্পর্ক কে জানে!

নৌকার খুঁটি গেড়ে বসে আছে। এতক্ষণে তাও নৌকার দুলুনিতে বেশ একটা ঝিমুনির মতো এসেছিল, সেটুকুও গেছে। ঘনঘন চা খেয়ে কী আরাম যে পায় লোকে, কে জানে। আনিস দেখি আবার সিগারেটও ধরিয়েছে। নতুন খাওয়া শিখেছে তো, তাই যখন-তখন সিগারেট ধরানো চাই। আবার ধোঁয়া ছাড়ার কত রকম কায়দা। নাক-মুখ দিয়ে। হাসি লাগে দেখে। মজিদ বলল, আনিস, আমাকে একটা ট্রাফিক পুলিশ দাও দেখি। আরে বাবা, সিগারেটের কথা বলছি।

বুঝেছি বুঝেছি, তোমার এইসব ঢং ছাড় দেখি।

বৃষ্টির বেগ মনে হয় একটু কমেছে। হা-হা করে বাতাস বইছে ঠিকই। মজিদ বলল, জাফর মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে, দেখেছেন হুমায়ূন ভাই!

হেঁটে অভ্যেস নেই তো, টায়ার্ড হয়ে পড়েছে।

টায়ার্ড না হাতি, জাফর হচ্ছে কুম্ভকর্ণের ভাতিজা। হেভি ফাইটিং-এর সময়ও দেখবেন মেশিনগানের ওপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।

সবাই হেসে উঠল হো-হো করে। আমার বেশ মজা লাগছে। আনিস বলল, এক কাজ করি, জাফরের কানের কাছে মুখ নিয়ে 'মিলিটারি মিলিটারি' বলে চিৎকার করে উঠি। দেখি জাফর কী করে। মজিদ বলল, দাঁড়া, চায়ের পানি ফুটুক, তারপর।

ওদের কথাবার্তা এমন ছেলেমানুষী, হাসি লাগে আমার। কী মনে করেছে ওরা!

'মিলিটারি মিলিটারি' শুনে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে আমি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি ? সরি, এতটা ভয় আমার নেই। আচমকা শুনলে একটু দিশাহারা হবো হয়তো, এর বেশি না। সোনাতলায় একবার মিলিটারির সামনে পড়ে গেলাম না ? আমি আর সতীশ ধানক্ষেতে রাইফেল লুকিয়ে একটু এগিয়েছি, অমনি মুখোমুখি। ভাগ্য ভালো— দলের আর কেউ ছিল না আমাদের সঙ্গে। আট-দশটা জোয়ান ছেলে একসঙ্গে দেখলে কি আর রক্ষা ছিল ? দু'জন ছিলাম বলেই বেঁচেছি। সতীশ অবশ্যি দারুণ ভয় পেয়েছিল। নারকেলের পাতার মতো কাঁপতে শুরু করেছে। আমি নিজেও হকচকিয়ে গিয়েছি। ছ'জন মিলিটারি ছিল সব মিলিয়ে, যেমন চেহারা তেমন স্বাস্থ্য। তারা জানতে চাইল, কোন বাড়িতে কচি ডাব পাওয়া যাবে। আমরা ওদের খাতির করে আজিজ মল্লিকের বাড়ি নিয়ে গেলাম। সতীশ গাছে উঠে কাঁদি কাঁদি ডাব পেড়ে নামাল। তারা মহাখুশি। এক টাকার একটা নোট দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল সতীশের দিকে। সতীশ সেই নোট হাতে নিয়ে বত্রিশ দাঁতে হেসে ফেলল— যেন সাত রাজার ধন হাতে পেয়েছে।

প্ল্যান করেছিলাম, রাতের অন্ধকারে এক হাত নেব। কিন্তু ওরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকল না। দুপুরের রোদ একটু কমতেই রওনা হয়ে গেল।

বৃষ্টি বোধ করি একেবারেই থেমে গেল। চা বানানো হচ্ছে শুনছি। ওদের 'মিলিটারি মিলিটারি' বলে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই উঠে পড়ব কিনা ভাবছি, তখনি অনেক দূরে কোথায় 'হই হই' শব্দ পাওয়া গেল। নিমিষের মধ্যে আমাদের নৌকার সাড়া-শব্দ বন্ধ। চায়ের পানি ফোটার বিজ বিজ আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই। হাসান বলল, নৌকা আসতাছে। একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শরীরে। ধ্বক করে উঠল বুক।

কিসের নৌকা, কাদের নৌকা— কে জানে ? মিলিটারিরা অবশ্যি স্পিডবোট ছাড়া নড়াচড়া করে না। তাছাড়া রাতেরবেলা তারা ঘাঁটি ছেড়ে খুব প্রয়োজন ছাড়া নড়ে না। তবে 'রাজাকারের' উপদ্রব বেড়েছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য লুটপাট করা। এই পথে শরণার্থীদের নৌকা মেঘালয়ের দিকে যায়। সে সব নৌকায় হামলা করলে টাকা-পয়সা, গয়না-টয়না পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অল্পবয়সী সুশ্রী মেয়েও পাওয়া যায়। দূরের নৌকা দেখলাম স্পষ্ট হয়েছে। সেখান থেকে ভয় পাওয়া গলায় কে যেন হাঁক দিল, কার নৌকা গো ?

আমাদের নৌকা থেকে মজিদ চেঁচিয়ে বলল, তোমার কার নৌকা ?

ব্যাপারীর নৌকা। মাছ যায়।

শুনে পেটের মধ্যে হাসির বুদবুদি ওঠে। ব্যাপারী মাছের চালান দেয়ার আর সময় পেল না। আর মাছ নিয়ে যাচ্ছে এমন জায়গায়, যেখানে দেড় টাকায় এক-একটা মাঝারি সাইজের রুই পাওয়া যায়। হুমায়ূন ভাইয়ের গম্ভীর গলা শোনা গেল, এই যে মাছের ব্যাপারী, নৌকা আন এদিকে।

কী আশ্চর্য, এই কথাতেই নৌকার ভেতর থেকে বহুকণ্ঠের কান্না শুরু হয়ে গেল! ছোট ছোট ছেলেমেয়ের গলার আওয়াজও আছে। এই বাচ্চাগুলি এতক্ষণ কী করে চুপ করে ছিল তাই ভাবি। নৌকার ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মজিদ বলল, ভয় নাই ব্যাপারী, নৌকা কাছে আন।

আপনারা কী করেন ?

ভয় নাই, আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক। আস এদিকে, কিছু খবর নিই।

মুক্তিবাহিনী, মুক্তিবাহিনী! আনন্দের একটা হল্লা উঠল নৌকা দু'টিতে। অনেক কৌতূহলী মুখ উঁকি মারল। এরা হয়তো আগে কখনো মুক্তিবাহিনী দেখেনি, শুধু নাম শুনেছে। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় কৌতূহলী মুখগুলি দেখতে ভালো লাগে।

নমস্কার গো বাবাসকল। আমার নাম হরি পাল। কাসুন্দিয়ার জগৎ পালের নাম তো জানেন। আমি জগৎ পালের ছোট ভাই। আমার আর জ্যাঠার পরিবার আছে এই নৌকায়। মোট একুশজন।

হরি পাল লোকটা বাক্যবাগীশ। কথা বলেই যেতে লাগল। দেখতে পাচ্ছি, তার ঘনঘন তৃপ্তির নিঃশ্বাস পড়ছে। নৌকার ভেতরের ছেলেমেয়েগুলির কৌতূহলের সীমা নেই। ক্রমাগত উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এদের মধ্যে একটি মেয়ের চেহারা এমন মনকাড়া যে চোখ ফেরানো যায় না। আমি বললাম, ও খুকি, কী নাম তোমার ?

খুকি জবাব দেবার আগেই হরি পাল বলল, এর ডাকনাম মালতী। ভালো নাম সরোজিনী। আর এর বড় যে, তার নাম লক্ষ্মী। ভালো নাম কমলা। ও মালতী, বাবুরে নমস্কার দে। মালতী ফিক করে হেসে ফেলল। হরি পালকে চা খেতে দেওয়া হলো এক কাপ। এত তৃপ্তি করে সে বোধহয় বহুদিন চা খায়নি। খাওয়া শেষে ভোঁস ভোঁস করে কেঁদে ফেলল। তাদের কাছে আমাদের একটিমাত্র জিজ্ঞাসা ছিল— শিয়ালজানী খালে কোনো নৌকা বাঁধা দেখেছে কিনা ? আমাদের একটি দল সেখানে থাকার কথা। কিন্তু হরি পাল বা হরি পালের মাঝি, কেউই সে-কথা বলতে পারল না।

হাসান আলি নৌকা ছেড়ে দিল। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে দাঁড় পড়ছে। হরি পালদের নৌকাকে পেছনে ফেলে এগুচ্ছি, হঠাৎ শুনলাম ইনিয়েবিনিয়ে সে-নৌকা থেকে কে একটি মেয়ে কাঁদছে। হয়তো তার স্বামী নিখোঁজ হয়েছে, হয়তো তার ছেলেটিকে বেঁধে নিয়ে গেছে রাজাকাররা। নিস্তব্ধ দিগন্ত, বিস্তৃত জলরাশি, আকাশে পরিষ্কার চাঁদ— এ সবের সঙ্গে এই করুণ কান্না কিছুতেই মেলানো যায় না। শুধু শুধু মন খারাপ হয়ে যায়।

এগারটা বেজে গেছে। দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছানো অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্যি তা নিয়ে কাউকে খুব চিন্তিতও মনে হচ্ছে না। আনিস দেখি আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। মজিদ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। হাসান আলি নির্বিকার ভঙ্গিতে

দাঁড় টানছে। আমি বললাম, হাসান আলি, দুটোর মধ্যে পৌঁছতে পারব তো ?

হাসান আলি জবাব দিল না। বিশ্রী স্বভাব তার। কিছু জিজ্ঞেস করলে ভান করবে যেন শুনতে পায়নি। যখন মনে করবে জবাব দেওয়া প্রয়োজন, তখনি জবাব দেবে, তার আগে নয়। আমি আবার বললাম, কী মনে হয় হাসান আলি, দুটোর মধ্যে রামদিয়া পৌঁছব ?

কোনো সাড়াশব্দ নেই। এই জাতীয় লোক নিয়ে চলাফেরা করা মুশকিল। আমি তো সহ্যও করতে পারি না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় দিই রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় এক বাড়ি। হারামজাদা ছোটলোক! কিন্তু রাগ সামলাতে হয়। কারণ লোকটা দারুণ কাজের। এ অঞ্চলটা তার নখদর্পণে। নিকষ অন্ধকারে মাঝে মাঝে আমাদের এত সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে, মনে হয়েছে ব্যাটা বিড়ালের মতো অন্ধকারেও দেখতে পায়। খাটতে পারে যন্ত্রের মতো। সারারাত নৌকা চালিয়ে কিছুমাত্র ক্লান্ত না হয়ে বিশ-ত্রিশ মাইল হেঁটে মেরে দিতে পারে। আবু ভাই হাসান আলির কথা উঠলেই বলতেন, দি জায়েন্ট।

কিন্তু এই এক দোষ, মুখ খুলবে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার নিজের কাজ করে যাবে। প্রথম প্রথম মনে হতো হয়তো কানে কম শোনে। ও আল্লা, শেষে দেখি এক মাইল দূরের ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকটিও বুঝি তার কান এড়ায় না। কুড়ালখালির কাছে একবার— আমাদের সমস্ত দলটি নৌকায় বসে। আবু ভাই সে-সময় বেঁচে। তিনি এক ন্যাংটো বাবার গল্প করছেন, আমরা সবাই হো-হো করে হাসছি। এমন সময় হাসান আলি বলল, লঞ্চ আসতাছে, উঠেন সবাই পাড়ে উঠেন।

আমরা কান পেতে আছি। কোথায় কী— বাতাসের হুস হুস শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। আনিস বলল, যত সব বোগাস! তারপর কী হলো ? আবু ভাই বললেন, গল্প পরে হবে, এখন উঠে পড় দেখি। হাসান আলি যখন শব্দ শুনেছে, তখন আর ভুল নেই।

সেবার সত্যি সত্যি দু'টি স্পিডবোট বাজারে এসে ভিড়েছিল। হাসান আলির কথা না শুনলে গোটা দলটা মারা পড়তাম।

আমার অবশ্যি সেরকম মৃত্যুভয় নেই। তবু কে আর বেঘোরে মরতে চায় ? আমাদের মধ্যে মজিদের ভয়টাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কোনো অপারেশনে যাওয়ার আগে কুরআন শরীফ চুমু খাওয়া, নফল নামাজ পড়া, ডান পা আগে ফেলা— একশ' পদের ফ্যাঁকড়া। গলায় ছোটখাট ঢোলের আকারের এক তাবিজ। কোন পীর সাহেবের দেওয়া, যা সঙ্গে থাকলে অপঘাতে মরবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও নেই। ভাবলেই হাসি পায়।

এরকম ছেলে দলে নেওয়া ঠিক নয়। এতে অন্যদের মনের বল কমে যায়। তবে হ্যাঁ, আমি একশ'বার স্বীকার করি, অপারেশন যখন শুরু হয় তখন মজিদের মাথা

থাকে সবচেয়ে ঠাণ্ডা। এক তিল বেতাল নেই। আর 'এইম' পেয়েছে কি, তিনটি গুলির মধ্যে তার দু'টি গুলি যে টার্গেটে লাগবে এ নিয়ে আমি হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি। আমাদের ট্রেনিং দেওয়াতেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার সুরুজ মিয়া। আমরা ডাকতাম বুড্ডা ওস্তাদ। বুড্ডা ওস্তাদ প্রায়ই বলতেন, মজিদ ভাইয়ের হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব। আহ্, কী হাত— কী নিশানা, জিতা রাহ!

মজিদের মতো ছেলের এতটা ভয় থাকা কি ঠিক? মজিদ যদি এরকম ভয় পায় তো আমরা কী করি? এক রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি সে হাউমাউ করে কাঁদছে। আমি হতভম্ব। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে মজিদ?

কিছু হয় নাই।

খুব করে চেপে ধরায় বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে এক বুড়ো লোক এসে তাকে বলছে— আবদুল মজিদ, তোমার গলায় কি গুলি লেগেছে? এতেই কান্না। শুনে এমন রাগ ধরল আমার। ছি-ছি, এ কী ছেলেমানুষী ব্যাপার! আমি অবশ্যি কাউকে বলিনি।

পরবর্তী এক সপ্তাহ সে কোথাও বেরুল না। হেন-তেন কত অজুহাত। আসল কারণ জানি শুধু আমি। কত বোঝালাম— স্বপ্ন তো আর কিছুই নয়, অবচেতন মনের চিন্তাই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু মজিদের এক কথা— তার সব স্বপ্ন নাকি ফলে যায়। একবার নাকি সে স্বপ্নে দেখিছিল তার ছোট বোন 'পানি পানি' করে চিৎকার করছে, আর সেই বোনটি নাকি ক'দিন পরই অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। মরবার সময় 'পানি পানি' করে অবিকল যেমন স্বপ্নে দেখেছিল তেমনি ভঙ্গিতে চেঁচিয়েছে। কী অদ্ভুত যুক্তি!

মৃত্যুর জন্যে ভয় পাওয়াটা একটি ছেলেমানুষী ব্যাপার নয় কি? আমার তাই মনে হয়। যখন সত্যি সত্যি মৃত্যু তার শীতল হাত বাড়াবে, তখন কী করব জানি না, তবে খুব যে একটা বিচলিত হবো, তাও মনে হয় না।

তাছাড়া আমার মৃত্যুতে কারো কিছু আসবে-যাবে না। আমার জন্যে শোক করবার মতো প্রিয়জন কেউ নেই। আত্মীয়-স্বজনরা চোখের পানি ফেলবে, চেঁচিয়ে কাঁদবে, বন্ধু-বান্ধবরা মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াবে, তবেই না মরে সুখ।

শুনেছি বিলেতে নাকি অনেক ধনী বুড়োবুড়ি বিশেষ এক সংস্থার কাছে টাকা রেখে যায়। এইসব বুড়োবুড়ির কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। সেই বিশেষ সংস্থাটি বুড়োবুড়ির মৃত্যুর পর লোক ভাড়া করে আনে। অদ্ভুত ব্যবস্থা! সত্যি এরকম কিছু আছে, না শুধুই গালগল্প? আমাদের দেশে এরকম থাকলে আমিও আগেভাগেই লোক ভাড়া করে আনতাম। তারা সুর করে কাঁদতে বসত— ও জাফর, জাফর রে, তুমি কোথায় গেলা রে? এই কথা মনে উঠতেই দেখি হাসি পাচ্ছে। আমি সশব্দে হেসে উঠলাম। আনিস বলল, কী হয়েছে, এত হাসি...

এমনি হাসছি।

হঠাৎ হাসান আলি ভয়-পাওয়া গলায় বলল, লঞ্চের আওয়াজ আসে।

আমার বুক ধক করে উঠল। তার মানে হচ্ছে, আমিও ভয় পাচ্ছি। সেই ভয়, যা যুক্তি-তর্ক মানে না, হঠাৎ করে এসে আমাদের অভিভূত করে ফেলে। হুমায়ূন ভাই বললেন, নৌকা ভেড়াও হাসান আলি।

ছপ ছপ দাঁড় পড়ছে। আনিস এবং মজিদ দু'জনেই দু'টি বৈঠা তুলে নিয়েছে। আমরা এখনো লঞ্চের শব্দ শুনি নি, তবে হাসান আলি যখন শুনেছে, তখন আর ভুল নেই।

সাড়াশব্দ শুনে মজিদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে হকচকিয়ে বলল, কী হয়েছে?

আমি বললাম, মজিদ, তোমার শ্বশুর সাহেব আসছেন, উঠে বসো।

কে শ্বশুর, কার কথা বলছ?

হুমায়ূন ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, তামাশা রাখ, জাফর। হাসান আলি, এখনো শুনতে পাচ্ছ?

হাসান আলি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হাসিমুখে বলল, না, আর শব্দ পাই না।

খবর পাওয়া গেছে, এই অঞ্চলে কিছু দিন ধরেই একটি স্পিডবোট ঘুরে বেড়াচ্ছে। বর্ষার পানিতে খালবিলগুলি যেই একটু ভরাট হয়েছে, অমনি নামিয়েছে স্পিডবোট। নৌকা করে আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না, বুঝতে পারছি না। অবশ্যি রামদিয়া পর্যন্ত কীভাবে যাব, তা ঠিক করবে হাসান আলি। আমাদের রাত দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে তার। হাসান আলি বলল, হাঁটাপথে যাওন লাগব। অল্প কিছু প্যাক-কাদা আছে, কিন্তু উপায় আর কী!

মজিদ বলল, কয় মাইল পথ?

আট-নয় মাইল।

আমার শেয়ালের মতো খিদে লেগেছে, হাঁটা মুশকিল।

আনিস বলল, শেয়ালের মতো খিদেটা কী রকম জিনিস?

অর্থাৎ মুরগি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মজিদ হো-হো করে হেসে ফেলল।

নৌকা থেকে বেরিয়ে এসে দেখি চাঁদ ডুবে গেছে। কিন্তু খুব পরিষ্কার আকাশ। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। নক্ষত্রের আলোয় আবছাভাবে সব নজরে আসে। আনিস বলল, দশ মাইল হাঁটা সহজ কর্ম না। হুমায়ূন ভাই অনুমতি দিলে আরেক দফা চা হোক, কী বলেন?

বেশ তো, চা চড়াও।

হাসান আলি, আদা আছে তোমার কাছে? একটু আদা-চা হোক, গলাটা খুসখুস করছে। জাফর, তুমিও খাবে নাকি হাফ কাপ?

না, চা খেলে ঘুম হয় না আমার।

ঘুমুবার অবসরটা পাচ্ছ কই ?

ঘুমুবার অবসর সত্যি নেই। তবু অভ্যেসটা তো আছে। হুমায়ূন ভাই দেখি নৌকার ছাদে উঠে বসেছেন। গুনগুন করছেন নিজ মনে। কোন গানটা টিউন করছেন, কে জানে। ঠিক ধরতে পারছি না। আহ্, চমৎকার লাগছে। আড়াল থেকে শুনতে বেশ লাগে। অনুরোধ করতে গেলেই সেরেছে। গাইবেন না কিছুতেই। তাঁর কাছ থেকে গান শোনবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, এমন একটা ভাব দেখানো যে, তিনি কী করছেন তার দিকে তোমার একটুও নজর নেই। হ্যাঁ, এইবার গান শোনা যাচ্ছে—

'শ্যামল ছায়ায় নাই-বা গেলে
না না না নাই-বা গেলে'

'না না' বলবার সময় বেশ কায়দা করে গলা ভাঙছে তো! শুনতে খুব ভালো লাগছে। শান্ত হয়ে আছে বিল। বিলের পানি দেখাচ্ছে কালো আয়নার মতো। কালো আয়নাটা আবার কী ? কী জানি কী! তবে কালো আয়নার কথা মনে হয়। আকাশে অসংখ্য তারা উঠেছে। তারাগুলির জলে ছায়া পড়া উচিত। কী আশ্চর্য, ছায়া পড়ছে না তো! আকাশে যখন খুব তারা ওঠে, তখন নাকি দেশে আকাল আসে। মজিদ বলল, সাংঘাতিক খিদে লেগেছে। খালি পেটে চা খাওয়াটা কি ঠিক ?

হুমায়ূন ভাই গান থামিয়ে বললেন, খালি পেটে চা না খেতে চাইলে গোটা দুই ডিগবাজি খেয়ে নাও মজিদ। এছাড়া আর কোনো খাদ্যদ্রব্য নেই।

আনিস আবার এই শুনেই ফ্যাফ্যা করে হাসতে শুরু করেছে। এর মধ্যে এত হাসির কী আছে ? হুমায়ূন ভাই আবার গুনগুন শুরু করেছেন। তাঁর বোধহয় মন-টন বিশেষ ভালো নেই। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন না। এমনি তিনি অবশ্যি খুব ফুর্তিবাজ ছেলে। আমার উপর রাগ করেছেন কি ?

আজ ভোরে তাঁর সঙ্গে আমার খানিকটা মন কষাকষি হয়েছে। কিন্তু আমি অন্যায় কিছু বলিনি। শুধু বলেছি, মেথিকান্দার এ অপারেশনের দায়িত্ব হুমায়ূন ভাইয়ের নিয়ে কাজ নেই। এতে কী মনে করেছেন তিনি ? তাঁর প্রতি আস্থা নেই আমার ? তিনি ঠিকই মনে করেছেন। এমন দুর্বল লোকের এরকম অ্যাসাইনমেন্টের নেতৃত্ব পাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের সাব-সেক্টরে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড কী মনে করে এটা করলেন কে জানে!

দালাল হাজী মারার ব্যাপারটাই দেখি না কেন। এই লোক কম করে হলেও গোটা ত্রিশেক মানুষ মারিয়েছে। হিন্দুদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে একাকার করেছে। মিলিটারি ক্যাপ্টেনের পিছে পিছে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। সে যখন হলদিয়ার বাজারে ধরা পড়ল আমাদের হাতে, আমি বললাম, গাছের সঙ্গে বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে শেষ করে দি। গ্রামের লোকদের একটা শিক্ষা হোক, ভবিষ্যতে আর কেউ দালালি করবার সাহস পাবে না। হুমায়ূন ভাই মাথা নাড়েন। ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চান

অ্যারেস্ট করে। পাগল নাকি! সেই শেষপর্যন্ত গুলি করে মারতে হলো। হুমায়ূন ভাই সেই দৃশ্যও দেখবেন না। তিনি নদীর পাড়ে চুপচাপ বসে রইলেন। আরে বাবা, তুমি তো মেয়েমানুষ নও। নাচতে নেমেছ, এখন আবার ঘোমটা কিসের ? 'You have to be cruel, only to be kind'— আবু ভাই বলতেন সব সময়। আহ্, মানুষের মতো মানুষ ছিলেন আবু ভাই। আবু ভাইয়ের মতো মানুষগুলি এত অল্প আয়ু নিয়ে আসে কেন ? যুদ্ধ শেষ হলে আবু ভাইয়ের মেয়েটিকে দেখতে যাব। তাকে কোলে নিয়ে বলব...। কী বলব তাকে ?

হুমায়ূন ভাই দেখি উত্তেজিত হয়ে নেমে আসছেন ছাদ থেকে। কী ব্যাপার, মোটর লঞ্চের আলো দেখা যায় নাকি ? আনিস চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলল, কী ব্যাপার হুমায়ূন ভাই ?

কিছু না। অনেকগুলি উল্কাপাত হলো। একটা তো প্রকাণ্ড!

উল্কাপাত শুনেছি খুব অশুভ ব্যাপার। আমার মা বলতেন অন্য কথা। তিনি নাকি কোথায় শুনেছেন উল্কাপাতের সময় কেউ যদি তার গোপন ইচ্ছাটি সশব্দে বলে ফেলে, তাহলে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এক মজার কাণ্ড হলো একদিন। জ্যামিতি বই হারিয়ে ফেলেছি। সন্ধ্যাবেলা বসে আছি বারান্দায়। আকাশের দিকে চোখ। উল্কাপাত হতে দেখলেই বলব, জ্যামিতি বইটা যেন পাই।

কোথায় গেল সেসব দিন। মায়ের মুখ আর মনেই পড়ে না। একদিন কথায় কথায় অবনী স্যার আমাদের ক্লাসে বললেন, যেসব ছেলের মনে মায়ের চেহারার কোনো স্মৃতি নেই, তারা হলো সবচে' অভাগা। আমি চোখ বুঁজে ক্লাসের ভেতরেই মায়ের চেহারা মনে আনতে চেষ্টা করলাম। একটুও মনে পড়ল না। সেই যে পড়ল না, পড়লই না। এখনো পড়ে না। স্বপ্নেও যে এক-আধ দিন দেখব, সে উপায়ও নেই। আমার ঘুম এমন গাঢ়— স্বপ্নটপ্নের বালাই নেই। ধুর ছাই!

নেমে পড়েছে সবাই। ওরে বাবা রে, কী কাদা! কোমর পর্যন্ত তলিয়ে যাবার দাখিল! হাসান আলি আরেকটু হলে গুলির বাক্স নিয়ে নদীতে পড়ত। লাইট-মেশিনগানটা সবাই মিলে চাপিয়েছে আমার কাঁধে। নামেই লাইট, আসলে মেলা ওজন। আকাশে গুড়গুড় মেঘ ডাকছে আবার। বৃষ্টি নামলেই গেছি— মজিদের ভাষায় একেবারে 'পটেটো চিপস' হয়ে যাব।

হুমায়ূন আহমেদ

আজ সারাটা দিন আমার মন খারাপ ছিল; এখন মধ্যরাত্রি, ছপছপ শব্দে কাদা-ভরা রাস্তায় হাঁটছি। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এত দিনেও হাঁটার অভ্যেস হলো না। আনিস এবং মজিদ কত নির্বিকার ভঙ্গিতেই না পা ফেলছে। এতটুকু ক্লান্ত না হয়েও তারা দশ মাইল হেঁটে পার হবে; বিপদ হবে আমাকে নিয়ে।

জাফরও হাঁটতে পারে না। তবে আমার মতো এত সহজে ক্লান্তও হয় না। সমস্ত দলটির মধ্যে আমি সবচেয়ে দুর্বল। শরীরের দিক দিয়ে তো বটেই, মনের দিক থেকেও। তবুও আজকের জন্যে আমিই 'কমান্ডার'। 'কমান্ডার' শব্দটা শুনতে বড় গেঁয়ো। অধিপতি বা দলপতি হলে মানাত। না, আমি তেমন বাংলাপ্রেমিক নই। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ইংরেজি সাইনবোর্ড ভাঙার ব্যাপার আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হয়। যে-কোনো জিনিসের বাড়াবাড়ি আমাকে পীড়া দেয়। আর সে জন্যেই যুদ্ধে এসেছি।

এক মাইলও হাঁটিনি, এর মধ্যেই পা ভারি হয়ে এসেছে। কী মুশকিল! নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। শার্ট ভিজে গিয়েছে ঘামে।

ঢাকা থেকে ভাই, বোন, বাবা, মা সবাইকে নিয়ে একনাগাড়ে ত্রিশ মাইল হেঁটে পৌঁছেছিলাম মির্জাপুর। কী কষ্ট, কী কষ্ট! নিজের জন্যে কিছু নয়। জরী ও পরীর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। পরীর ফরসা মুখ নীল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে অনেকেই হাঁটছিলেন। কাফেলার মতো ব্যাপার। এক-এক বার হুস করে সুখী মানুষেরা গাড়ি নিয়ে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এমন হৃদয়বান কাউকে কি পাওয়া যাবে, যে আমাদের একটুখানি লিফট দেবে! দুঃসময়ে সবাই হৃদয়হীন হয়ে পড়ে। আমাদের সঙ্গে একজন গর্ভবতী মহিলা ক্লান্ত পায়ে হাঁটছিলেন। তিনি ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ছিলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী তা দেখে রেগে আগুন। রাগী গলায় বললেন, টুকুস টুকুস করে হাঁটছ যে ? তোমার জন্যে আমি মরব নাকি ? এই দীর্ঘপথে কত কথাবার্তা হয়েছে কতজনের মধ্যে। কত অশ্রুবর্ষণ, কত তামাশা— কিছুই আজ আর মনে নেই, কিন্তু ঐ স্বামী বেচারার কথাগুলি এখনো কাঁটার মতো বুকে বিঁধে আছে। গর্ভবতী মহিলার শোকাহত চোখ এখনো চোখে ভাসে।

রাস্তাতেই পরীর হু-হু করে জ্বর উঠে গেল। আমি বললাম, কোলে উঠবি পরী ? পরীর কী লজ্জা! ক্লাস টেনে পড়ে মেয়ে, দাদার কোলে উঠবে কি ? পরী অপ্রকৃতিস্থের মতো পা ফেলে হাঁটতেই থাকল। তার হাত ধরে ধরে চলছি আমি। ঘামে ভেজা গরম হাত, আর কী তুলতুলে নরম! পরীর হাতটা যে এত নরম, তা আগে কখনো জানিনি। জরীর হাত ভীষণ খসখসে, অনেকটা পুরুষালি। কিন্তু পরীর হাত কী নরম, কী নরম!

মীর্জাপুরের কাছাকাছি এসেই পরী নেতিয়ে পড়ল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে। বমি করতে লাগল ঘনঘন। বাবা একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কোথায় ডাক্তার কোথায় কী ? এর মধ্যে গুজব রটে গিয়েছে, ঢাকা থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একদল জোয়ানকে মিলিটারিরা এই দিকেই তাড়া করে আনছে। চারদিকে ছুটোছুটি, চিৎকার, আতঙ্ক। মা এবং জরী ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। বাবা যাকেই পাচ্ছেন তাকেই জিজ্ঞেস করছেন, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি ডাক্তার ?

ডাক্তার পাওয়া যায়নি, কিন্তু এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাঁর ট্রাকে আমাদের টাঙ্গাইল পৌঁছে দিলেন। টাঙ্গাইল পৌঁছালাম শুক্রবার সন্ধ্যায়। পরী মারা গেল

রোববার রাতে। সন্ধ্যাবেলাতে কথা বলল ভালো মানুষের মতো। বারবার বলল, কোনো মতে দাদার বাড়ি পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই। তাই না বাবা ?

পরীর মৃত্যু তো কিছুই নয়। কত কুৎসিত মৃত্যু হয়েছে চারপাশে। মৃত্যু এসেছে সীমাহীন বীভৎসতার মধ্যে। কত অসংখ্য অসহায় মানুষ প্রিয়জনের এক ফোঁটা চোখের জল দেখে মরতে পারেনি। মরবার আগে তাদের কপালে কোনো স্নেহময় কোমল করস্পর্শ পড়েনি।

অনেক মধ্যরাত্রিতে যখন অতলস্পর্শী ক্লান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনে হয় আমার হাত ধরে টুকটুক পা ফেলে পরী হাঁটছে।

যে জান্তব পশুশক্তির ভয়ে পরী ছোট ছোট পা ফেলে ত্রিশ মাইল হেঁটে গেছে, আমার সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি তার বিরুদ্ধে। আমি রাজনীতি বুঝি না। স্বাধীনতা-টাধীনতা নিয়ে সে-রকম মাথাও ঘামাই না। শুধু বুঝি, ওদের শিক্ষা দিতে হবে। জাফর প্রায়ই বলে, হুমায়ূন ভাই ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকেন। হয়তো থাকি। তাতে ক্ষতি কিছু নেই। আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করিনি, জাফর ?

মনে মনে এই কথা বলে আমি একটু হাসলাম। জাফরের সঙ্গে আজ ভোরে আমার খানিকটা মন কষাকষি হয়েছে। সে চাচ্ছিল আজকের এই অ্যাসাইনমেন্টের নেতৃত্ব যেন আসলাম পায়। জানি না এর পেছনের সত্যিকার কারণটি কী! দলপতির প্রতি আস্থা না থাকা বড় বিপজ্জনক। মুশকিল হচ্ছে— আমরা রেগুলার আর্মির লোকজন নই। আনুগত্য হলো একটা অভ্যাস, যা দীর্ঘদিনের ট্রেনিং-এর ফলে মজ্জাগত হয়। রেগুলার আর্মির একজন অফিসারের অনুচিত হুকুমও সেপাইরা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু আমার হুকুম নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। পছন্দ না হলে কৈফিয়ত পর্যন্ত তলব করে বসবে। কাজেই আমার প্রথম কাজ ছিল দলের লোকের আস্থা অর্জন করা। বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। কিন্তু আমি তা পারিনি। কাপুরুষ হিসেবে মার্কা-মারা হয়ে গেছি।

যদিও তারা সব সময়ই 'হুমায়ূন ভাই, হুমায়ূন ভাই' করে এবং সবাই হয়তো একটু শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু সে-শ্রদ্ধা একজন যোদ্ধা হিসেবে নয়।

আমার প্রথম ভুল হলো আমি হাজী সাহেবের মৃত্যুতে সায় দিতে পারিনি। লোকটার নৃশংসতা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। মৃত্যুদণ্ড যে তার প্রাপ্য শাস্তি, এতেও ভুল নেই। তবু আমার মায়া লাগল। ষাটের উপর বয়স হয়েছে। মরবার সময় তো এমনিতেই হলো। তবু বাঁচবার কী আগ্রহ! সে আমাদের বিশ হাজার টাকা দিতে চাইল। শুনে আমার ইচ্ছে হলো, একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দি। কিন্তু আমি শান্ত গলায় বললাম— জাফর, হাজী সাহেবকে ক্যাম্পে নিয়ে চল। জাফর চোখ লাল করে তাকাল আমার দিকে। থেমে থেমে বলল, একে কুকুরের মতো গুলি করে মারব। হাজী সাহেব চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন। এই তিনিই যখন মিলিটারি দিয়ে লোকজন মারিয়েছেন, তখন সেই লোকগুলিও নিশ্চয়ই

আল্লাহকে ডেকেছিল। আল্লাহ তাদের যেমন রক্ষা করেননি— হাজী সাহেবের বেলায়ও তাই হলো। হাজী সাহেব অপ্রকৃতিস্থ চোখে তাকিয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখতে লাগলেন। জাফর এক সময় বলল, তওবা-টওবা যা করবার করে নেন। দোওয়া-কালাম পড়েন হাজী সাহেব। আর তখন হাজী সাহেব চিৎকার করে তাঁর মাকে ডাকতে লাগলেন।

ও মাইজি গো, ও মাইজি গো!

কতকাল আগে হয়তো এই মহিলা মারা গেছেন। সেই মহিলাটিকে হাজী সাহেব হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ রাইফেলের কালো নলের সামনে দাঁড়িয়ে আবার তাঁর কথা মনে পড়ল। আল্লাহর নাম চাপা পড়ে গেল। এক অখ্যাত গ্রাম্য মহিলা এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। আনিস বলল, রাইফেলটা আমার কাছে দিন, হুমায়ূন ভাই। আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। জাফর এবং হাসান আলি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উঁচু সড়কে উঠে পড়েছে। বেশ কিছু দূর এগিয়ে রয়েছে তারা। দ্রুত পা চালাচ্ছি। উঁচু সড়কে উঠে পড়তে পারলে হাঁটা অনেক সহজ হবে। পরিষ্কার রাস্তা, জল-কাদা নেই। এখান থেকেই আমরা সরাসরি গ্রামের ভেতর দিয়ে চলব। আমি উঠে আসতেই মজিদ বলল, জোঁক ধরেছে নাকি দেখেন ভালো করে। আনিসের পা থেকে তিনটি জোঁক সরানো হয়েছে। একটা রক্ত খেয়ে একেবারে কোলবালিশ হয়ে গিয়েছিল।

হাসান আলি টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়ের উপর ফেলতে লাগল। না, জোঁকটোক নেই। তবে শামুকে লেগে পা অল্প কেটেছে। জ্বালা করছে। মজিদ বলল, একটু রেস্ট নিই, মালগাড়ির মতো টায়ার্ড হয়ে গেছি। দেখি আনিস, একটা সিগারেট।

আনিস সিগারেটের প্যাকেট খুলল। হাসান আলিও হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। সে আমাদের সামনে খাবে না, তাই একটু সরে গেল। আনিস বলল, আপনিও নিন একটা হুমায়ূন ভাই।

সিগারেট টানলে আমার জিভ জ্বালা করে। নিকোটিন জিভের উপর জমা হয় হয়তো। তবু নিলাম একটা। আমাদের এখন সাহস দরকার। আগুনের স্পর্শ সে সাহস দেবে হয়তো। দেয়াশলাই সবে জ্বালিয়েছি, অমনি বাঁশবনের অন্ধকার থেকে কুকুর ডাকতে লাগল। তার পরপরই একটি ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল, কেডা, ঐখানে কেডা ? কতা কয় না লোকটা! কেডা গো ?

হারিকেন হাতে দু'চারজন মানুষও বেরিয়ে এলো। 'ও রমিজের বাপ, ও রমিজের বাপ!' বলে চিকন কণ্ঠে তুমুল চিৎকার শুরু করল একটি মেয়ে। সবাই বড় ভয় পেয়েছে। এর মধ্যে অল্পবয়সী একটি শিশু তারস্বরে কাঁদতে শুরু করল। মজিদের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, ভয় নাই, আমরা।

তোমরা কেডা ?

আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের চারপাশে ভিড় জমে উঠল। হারিকেন হাতে ভয়কাতর লোকগুলি ঘিরে দাঁড়াল আমাদের। অস্পষ্ট আলোয় রাইফেলের কালো নল চিকচিক করছে। আমরা তাদের সামনে অষ্টম আশ্চর্যের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

মিয়া সাবরা, এট্টু পান তামুক খাইবেন?

না। আপনারা এত রাতেও জাগা, কারণ কী?

বড় ডাকাইতের উপদ্রব। ঘুমাইতাম পারি না। জাইগা বইয়া থাকি।

এই দিকে মিলিটারি আসছিল?

জি না। তয় রাজাকার আইছিল দুইবার। রমেশ মালাকাররে বাইন্ধা লইয়া গেছে। গয়লা পাড়া পুড়াইয়া দিছে।

রাজাকারদের কেউ খাতির যত্ন করেছিল নাকি?

জি না, জি না।

এই গ্রামের কেউ রাজাকারে নাম লেখাইছে?

লোকগুলি চুপ করে রইল। জাফর ধমকে উঠল, বলো ঠিক করে।

একজন গেছে। কী করব মিয়া সাব, পেটে ভাত নাই। পুলাপানডি কান্দে।

আমি বললাম, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল হাঁটা দিই।

আনিসের বোধহয় কিছু কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। সে অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

আনিসের এই স্বভাব আমি লক্ষ করেছি। মানুষের সপ্রশংস চোখ তার ভারি প্রিয়। যখনি আমাদের ঘিরে কিছু কৌতূহলী মানুষ জড়ো হয়, তখনি সে খুব ব্যস্ত হয়ে এলএমজি'র ব্যারেল নাড়তে থাকে বা খামাখাই গুলির কেসটা খুলে ফেলে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে এমন একটা ভঙ্গি করে, যেন ভারি বিরক্ত হয়েছে। বক্তৃতা দিতেও তার খুব উৎসাহ। দেশের এই দুর্দিনে আমাদের কী করা উচিত, এ সম্বন্ধে তার সারগর্ভ ভাষণ তৈরি। টেপ রেকর্ডারের মতো— চালু করে দিলেই হলো। গ্রামে গ্রামে প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে। চোর, ডাকাত, দালাল নির্মূল করতে হবে। দখলদার বাহিনীকে দাঁত-ভাঙা জবাব দিতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। বক্তৃতা শেষে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বিকট সুরে চেঁচিয়ে ওঠে— জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!

আনিস ছেলেটিকে আমি খুব পছন্দ করি। চমৎকার ছেলে, একটু পাগলাটে। অপারেশনের সময় সব বিচারবুদ্ধি খুইয়ে বসে। গুলি ছোড়ে এলোপাথাড়ি। পেছনে সরতে বললে ক্রল করে সামনে এগিয়ে যায়। সামনে এগুতে বললে আচমকা পেছন দিকে দৌড় মেরে বসে।

মেথিকান্দায় প্রথম অপারেশনে গিয়েছি। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে, একেবারে ফাঁকা ক্যাম্প। চারজন পশ্চিম পাকিস্তানি রেঞ্জার আর গোটা পনের রাজাকার ছাড়া আর কেউ নেই। রাত দুটোয় অপারেশন শুরু হলো। আমি আর সতীশ গর্তের মতো একটা জায়গায় পজিশন নিয়েছি। বেশ বড় দল আমাদের।

সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি। দলের নেতা হচ্ছেন আবু ভাই। কথা আছে পশ্চিম দিক থেকে আবু ভাই প্রথম গুলি চালাতে শুরু করবেন, তার পরই মাথা নিচু করে খালের ভেতর দিয়ে চলে আসবেন আমাদের কাছে। আমরা সবাই পূর্ব দিকে বসে আছি। আনিস আর রমজান উত্তরে একটা মাটির ঢিবির আড়ালে চমৎকার পজিশন নিয়েছে। রমজান খুব ভালো মেশিনগানার। বসে আছি তো আছিই, আবু ভাইয়ের গুলি করার কোনো লক্ষণই দেখি না। সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছি। আচমকা আমাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ হতে লাগল। আমরা হতবুদ্ধি। অবশ্যি সবারই পজিশন ভালো। গায়ে গুলি লাগবার প্রশ্নই ওঠে না। তবু একদল ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল আর তার পরই মর্টারের গোলাবর্ষণ হতে লাগল। আমাদের দিকে সবাই চুপচাপ। হতভম্ভ হয়ে গিয়েছি। রমজান মিয়া এই সময় উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কেউ ভয় পাবেন না, কেউ ভয় পাবেন না।

তার পরই রমজান মিয়ার মেশিনগানের ক্যাটক্যাট শব্দ শোনা যেতে লাগল। সতীশকে বললাম, শুরু কর দেখি, আল্লাহ্ ভরসা। আর তখনি মর্টারের গোলা এসে পড়ল। বারুদের গন্ধ ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ধোঁয়া পরিষ্কার হতেই দেখি আমি আনিসের কাঁধে শুয়ে! আনিস প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। সবাই যখন পালিয়েছে, সে তখন জীবন তুচ্ছ করে খোঁজ নিতে এসেছে আমার। মেথিকান্দার সেই যুদ্ধে আমাদের চারজন ছেলে মারা গেল। রমজান মিয়ার মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হারালাম।

গুলি লেগে আবু ভাইয়ের ডান হাতের দুটি আঙুল উড়ে গেল। আবু ভাই তারপর একেবারে ক্ষেপে গেলেন। পাঁচদিন পরই আবার দল নিয়ে এলেন মেথিকান্দায়। সেবারও দুটি ছেলে মারা গেল। তৃতীয় দফায় আবার এলেন। সেবারও তাই হলো। মিলিটারিরা ততদিনে মেথিকান্দাকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে নিয়েছে। চারিদিকে বড় বড় বাঙ্কার, রাত-দিন কড়া পাহারা। গুজব রটে গেল, মেথিকান্দা মুক্তিবাহিনীর মৃত্যুকূপ। সতীশ বলত, যদি বলেন তাহলে গভর্নর হাউসে বোমা মেরে আসব, কিন্তু মেথিকান্দায় যাব না, ওরে বাপ রে।

কিন্তু আবু ভাইয়ের মুখে অন্য কথা, মেথিকান্দা আমিই কব্জা করব। যদি না পারি, তাহলে গু খাই। চতুর্থবারের মতো তিনি বিরাট দল নিয়ে গেলেন সেখানে। সবাই ফিরল, আবু ভাই ফিরলেন না।

পঞ্চমবারের মতো যাচ্ছি আমরা। আমার কি ভয় লাগছে নাকি ? ছি হুমায়ূন! ছি! একটির পর একটি জায়গা তোমাদের দখলে চলে আসছে, মেথিকান্দায় ঘাঁটি করে একবার যদি সোনারদির রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বিরাট একটা অংশ তোমাদের হয়ে যাবে। আর এত ভয় পাওয়ারই বা কী ? মৃত্যুকে এত ভয় পেলে চলে ? একটা গল্প আছে না— এক নাবিককে একজন সংসারী লোক জিজ্ঞেস করল, আপনার বাবা কোথায় মারা গেছিলেন ?

তিনি নাবিক ছিলেন। সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে মরেছেন।

আর আপনার দাদা ?

তিনিও ছিলেন নাবিক। মরেছেন জাহাজডুবিতে।

সংসারী লোকটি আঁতকে উঠে বলল, কী সর্বনাশ! আপনিও তো মশাই নাবিক। আপনিও তো জাহাজডুবি হয়ে মরবেন!

নাবিকটি বলল, তা হয়তো মরব। কিন্তু নাবিক না হয়েও আপনার দাদা বিছানায় শুয়ে মরেছেন, ঠিক নয় কি ?

হ্যাঁ।

আপনার বাবাও বিছানাতেই মরেছেন, নয় কি ?

হ্যাঁ, হাসপাতালে!

আপনিও সেইভাবেই মরবেন। তাহলে বেশ-কমটা হলো কোথায় ?

আসল কথা, আমার ভয় লাগছে। সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছি। ভয় পাওয়াতে লজ্জার কিছু আছে কি ? আমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, এই মনে করে গুনগুন করে গান গাইতে চেষ্টা করলাম— 'সেদিন দুজনে...।' শিস দিয়ে আমি বেশ ভালো সুর তুলতে পারি। কিন্তু গান গাইতে গেলেই চিত্তির। জরী বলে, তোমার মীড়গুলি খুব ভালো আসে, আর কিছুই হয় না। কী জানি বাবা, মীড় কাকে বলে। আমি এত সব জানি না। আমি তো তোর মতো বিখ্যাত শিল্পী নই, গান নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। বাথরুমে গোসল করতে করতে একটু গুনগুন করতে পারলেই হলো।

জাফরটা ভীষণ গান-পাগল। যেই গুনগুন করে একটু সুর ধরেছি, অমনি সে পিছিয়ে পড়েছে। এখন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবে। জাফর যাতে ভালোমতো শুনতে পায়, সেই জন্যে আরেকটু উঁচু গলায় গাইতে শুরু করলাম। আমার গুনগুন শুনেই এই ? জরীর গান শুনলে তো আর হুঁশ থাকবে না। জাফরকে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, গান গায় যে কানিজ আহমেদ, তার নাম শুনেছ ? সে চমকে উঠে বলল, নজরুলগীতি গান যিনি, তাঁর কথা বলছেন ?

হ্যাঁ!

খুব শুনেছি। আপনি চেনেন নাকি ?

আমি সে-কথা এড়িয়ে গিয়েছি। যুদ্ধটুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে জাফরকে একদিন বাসায় নিয়ে যাব। জরীকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দেব, এর নাম আবু জাফর শামসুদ্দীন। আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। আর জাফরকে হেসে বলব, জাফর, এর নাম হলো জরী। আমার ছোট বোন। তুমি চিনলে চিনতেও পার, গানটান গায়, কানিজ আহমেদ। শুনেছ হয়তো।

জাফর নিশ্চয়ই চোখ বড় করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। সেই দৃশ্যটি আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। তাছাড়া আমার মনে একটি গোপন বাসনা আছে। জরীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব জাফরের। যুদ্ধের মধ্যে যে-পরিচয়, তার চেয়ে খাঁটি পরিচয়

আর কী হতে পারে ? জাফরকে আমি ভালোভাবেই চিনেছি।

কিন্তু জরীর কি পছন্দ হবে ? বড় খুঁতখুঁতে মেয়ে। সমালোচনা করা তার স্বভাব। কেউ হয়তো বাসায় গিয়েছে আমার খোঁজে, জরী আমাকে এসে বলবে, দাদা, তোমার একজন চ্যাপ্টা মতো বন্ধু এসেছে। অরুণকে সে বলত কাৎলা মাছ। অরুণ রেগে গিয়ে বলেছিল, কাৎলা মাছের কী দেখলে আমার মধ্যে ? জরী সহজভাবে বলেছে, তোমার মাথাটা শরীরের তুলনায় বড় তো, এই জন্যে। আচ্ছা, রাগ করলে আর বলব না। আদর দিয়ে-দিয়ে মা জরীর মাথাটি খেয়ে বসে আছেন। অল্প বয়সেই অহঙ্কারী আর আহ্লাদী হয়ে উঠেছে।

কে জানে এর মধ্যে বিয়েই হয়ে গেছে হয়তো। অনেক দিন তাদের কোনো খবর পাই না। শুনেছি বাবা আবার ঢাকা ফিরে এসেছেন। ওকালতি শুরুর চেষ্টা করছেন। দেশে এখন কি আর মামলা-মোকদ্দমা আছে ? টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারছেন কিনা কে জানে।

ঢাকার অবস্থা নাকি সম্পূর্ণ অন্যরকম। কিছু চেনা যায় না। ইউনিভার্সিটি পাড়া খাঁ-খাঁ করে। দুপুরের পর রাস্তাঘাট নিঝঝুম হয়ে যায়। ঢাকায় বড় যেতে ইচ্ছে করে। কতদিন ঢাকায় যাওয়া হয় না। আবার কি কখনো এরকম হবে যে নির্ভয়ে ঢাকার রাস্তায় হেঁটে বেড়াব! সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে বসে চা খেয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরব!

সলিল কিছুদিন আগে গিয়েছিল ঢাকায়। অনেক গল্প শুনলাম তার কাছে। খুব নাকি বিয়ে হচ্ছে সেখানে। বয়স্কা মেয়েদের সবাই ঝটপট বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। ঘরে রাখতে সাহস পাচ্ছে না। হতেও পারে। সলিল অবশ্যি বেশি কথা বলে, তবুও বিয়ে কি আর হচ্ছে না ? বিয়ে হচ্ছে। নতুন শিশুরা জন্মাচ্ছে। মানুষজন হাট-বাজার করছে। জীবন হচ্ছে বহতা নদী।

এ-কী! আবু ভাইয়ের মতো ফিলসফি শুরু করলাম দেখি। আবু ভাই কথায় কথায় হাসাতেন, আবার তার ফাঁকে ফাঁকে এত সহজভাবে এমন সব সিরিয়াস কথা বলে যেতেন— আশ্চর্য! আবু ভাই তাঁর অসংখ্য ভক্ত রেখে গেছেন, যারা তাঁকে দীর্ঘ দিন মনে রাখবে। এই-বা কম কী ?

একদিন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন আবু ভাই। দারুণ খুশি-খুশি চেহারা। মাথার লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বললেন, হুমায়ূন, গুড নিউজ আছে। মিষ্টি খেতে চাও কিনা বলো।

চাই, চাই।

ভেরি গুড নিউজটা পরশু শোনাব। মিষ্টি যোগাড় করি আগে, তার পর। পরশু সন্ধ্যায় সবাইকে মিষ্টি খাওয়াব।

সেই গুড নিউজটি শোনা হয়নি। দারুণ ব্যস্ততা শুরু হলো হঠাৎ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লাম সবাই। এবং সবশেষে আবু ভাই গেলেন মেথিকান্দা।

আবু ভাইয়ের লাশ হাসান আলি বয়ে এনেছিল। বিশেষ কোনো কথাবার্তা বলেনি। হাউমাউ করে কাঁদেওনি। অথচ সবাই সেদিন বুঝেছিলাম, হাসান আলির মন ভেঙে গেছে।

মজিদ ডাকল, পা চালিয়ে হুমায়ূন ভাই, আপনি বারবার পিছিয়ে পড়ছেন। হাসান আলি দেখি হনহন করে এগিয়ে চলছে। এত চুপচাপ থাকে কেন লোকটা ?

হাসান আলি

চেয়ারম্যান সাব কইলেন, হাসান আলি, রাজাকার হইয়া পড়। সত্তর টাকা মাসমাইনা, তার সাথে খোরাকি আর কাপড়।

চেয়ারম্যান সাব আমার বাপের চেয়ে বেশি। নেকবক্ত পরহেজগার লোক। তাঁর ঘরের খাইয়া এত বড় হইলাম। আমার চামড়া দিয়া চেয়ারম্যান সাহেবের জুতা বানাইলেও ঋণ শোধ হয় না। তাঁর কথা ফেলতে পারি না। রাজাকার হইলাম।

জুম্মাবাদ চেয়ারম্যান সাব আর তাঁর বিবিরে কদমবুসি কইরা গাঁটরি মাথায় লইলাম। চেয়ারম্যান সাব কইলেন, আল্লাহর হাতে সোপর্দ হাসান আলি, আল্লাহ নেগাবান। সাচ্চা দিলে কাম করবা। হালাল পয়সা খাইবা।

যাওনের আগে মসজিদে গেলাম দোওয়া মাঙতে। গিয়া দেখি মাবুদে এলাহি— মসজিদের মাথার উপর শকুন বইয়া আছে। দুই কুড়ির উপরে বয়স আমার, এত বড় শকুন দেখি নাই। মনডা বড় টানল। বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ কইরা উঠল।

আরো একবার মসজিদের উপরে শকুন বইছিল। আমি তখন ছোড। চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে গরু-রাখালের কাম করি। বাপজান কইলেন, হাছান, শকুন বইছে মসজিদে। বড় খারাপ নিশানা। কেয়ামত নজদিক। বালা-মুসিবত আইব। বাপজানের কথা মিছা হয় নাই। কলেরায় দেশটা সাফা হইয়া গেল।

মসজিদে মওলানা সাব কইলেন, হাসান, তুমি রাজাকার হইতাছ শুনলাম।

হ মৌলানা সাব। দোওয়া মাঙতে আইছি।

বালা করছ। পাকিস্তানের খেদমত কর। কিন্তু হাসান আলি, একটা কথা।

কী কথা মৌলানা সাব...

শুনতাছি রাজাকার বড় অত্যাচার করে। মানুষ মারে, লুটপাট করে, ঘর জ্বালায়। দেইখ বাবা, সাবধান। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হইবা। আখেরাতে নবীজীর শেফায়ত পাইবা না।

মনডা খারাপ হইল। কামডা বোধহয় ভুল হইল। তখনো আমরার গ্রামের মধ্যে রাজাকার-দল হয় নাই। আমরা হইলাম পরথম দল। সাতদিন হইল ট্রেনিং। লেফট রাইট, লেফট রাইট। বন্দুক সাফ করনের কায়দা শিখলাম, গুলি চালাইতে শিখলাম।

'বায়োনেট চারজ' করতে শিখলাম। মিলিটারিরা যত্ন কইরা সব শিখাইল। তারা সব সময় কইত 'তুম সাচ্চা পাকিস্তানি, মুক্তিবাহিনী একদম সাফা কর দো।' মনডার মধ্যে শান্তি পাই না। বুকটা কান্দে। রাইতে ঘুম হয় না। আমরার সাথে ছিল রাধানগরের কেরামত মওলা। সে আছিল রাজাকার কমান্ডার। আহা, ফেরেস্তার মতো আদমি। আর মারফতি গান যখন গাইত, চউক্ষে পানি রাখন যাইত না। মাঝেমধ্যেই কেরামত ভাইয়ের গান শুনতাম—

'ও মনা
দেহের ভিতরে অচিন পাখি অচিন সুরে গায়
তার নাগাল পাওয়া দায়।'

যখন হিন্দুর ঘরে আগুন দেওয়া শুরু হইল, কেরামত ভাই কইলেন, এইটা কী কাণ্ড! কোনো দোষ নাই, কিচ্ছু নাই— ঘরে কেন আগুন দিমু ? ওস্তাদজী কইলেন— ও তো ইন্দু হ্যায়, গাদ্দার হ্যায়।

কেরামত ভাইয়ের সাহসের সীমা নাই। বুক ফুলাইয়া কইল, আগুন নেই দেঙ্গা।

ওস্তাদজী কইলেন, আও হামারা সাথ। কেরামত ভাই গেলেন। দুই দিন পরে তার লাশ নদীতে ভাইস্যা উঠল। ইয়া মাবুদে এলাহি, ইয়া পরওয়ার দেগার, কী দেখলাম, কী দেখলাম! মাথা একেবারে বেঠিক হইয়া গেল। মিলিটারি যা করে, তাই করি। নিজের হাতে আগুন লাগাইলাম সতীশ পালের বাড়ি, কানু চক্রবর্তীর বাড়ি, পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি। ইস, মনে উঠলেই কইলজাটা পুড়ায়।

শেষমেশ মিলিটারিরা শরাফত সাহেবের বড় পুলাডারে ধইরা আনল। আহা রে, কী কান্দন ছেলের! এখনো চউক্ষে ভাসে। বিএ পাস দিয়া এমএ পড়ত। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন আচারব্যাভার। ভদ্রলোকের ছেলে যেমন হওনের তেমন। একদিন বাজারে বইয়া আছি। শরাফত সাহেবের পুলাডার সাথে দেখা। আমারে দেইকা কইল, হাসান ভাই, ভালো আছেন ? আমি একটা কামলা মানুষ। আমারে আপনে কওনের কী দরকার ? কিন্তু সেই ছেলে শিক্ষিত হইলে কী হইব, মনডা ছিল ফিরিশতার। আহা রে, বন্দুকের সামনে দাঁড়াইয়া কেমন কালা হইয়া গেল চেহারাটা। আমি একটু দূরে খাড়াইয়া আল্লাহ রসুলের নাম নিতাছি। আমার মাথার গুণ্ডগোল হইয়া গেছে। কী করতাম ভাইব্যা পাই না। শেষকালে ছেলেডা আমার দিকে চাইয়া কইল, হাসান ভাই, আমারে বাঁচান। ক্যাপ্টেন সায়েবের পাও জড়াইয়া ধরলাম। লাভ হইল না। আহা রে, ভাই রে আমার। কইলজাডা পুড়ায়। আমি একটা কুত্তার বাচ্চা। কিছু করবার পারলাম না।

সইন্ধ্যা কালে শরাফত সায়েবের বাড়িত গিয়া দেখি, ঘরদোয়ার অন্ধকার। ছেলেডার মা একলা বইয়া আছে। তারে কেউ গুলির খবর কয় নাই। আমারে দেইক্যা কইল, ও হাছান, আমার ছেলেডা বাঁইচ্চা আছে ? আল্লাহর দোহাই— হাঁছা কথা কইবা।

আমি তাঁর পা ছুঁইয়া কইলাম, আম্মাজি বাঁইচ্চা আছে, আপনে চাইরডা দানাপানি খান।

সেই রাইতেই গেলাম মসজিদে। পাক কোরআন হাতে লইয়া কিরা কাটলাম। এর শোধ তুলবাম। এর শোধ না তুললে আমার নাম হাছান আলি না। এর শোধ না তুললে আমি বাপের পুলা না। এর শোধ না তুললে আমি বেজন্মা কুত্তা।

রাত্তিরে ক্যাম্পে ফিরতেই হাবিলদার সাব কইলেন পূর্বের বাঙ্কারে একটা লাশ পইড়া আছে, আমি যেন নদীর মধ্যে ফ্যালাইয়া দিয়া আসি।

কী সর্বনাশের কথা! ইয়া মাবুদে এলাহি। গিয়া দেখি কবিরাজ চাচার ছোট মাইয়াটা। ফুলের মতো মাইয়া গো। বারো-তেরো বছর বয়স, ইয়া মাবুদ ইয়া মাবুদ। কাপড় দিয়া শইলডা ঢাইক্যা কইলাম, ভইন, মাপ করিস। এইটা কী, চউক্ষে পানি আসে কেন ? আরে পোড়া চউখ! এখন পানি ফালাইয়া কী লাভ ? আগে তো দেখলি না। আগে তো আন্ধা হইয়া রইলি।

সাথের পুলাপানডির বড় পরিশ্রম হইতাছে। আল্লাহ আল্লাহ কইরা যদি রামদিয়া ঘাটে পৌঁছাইতে পারি, তয় রক্ষা। ইয়া মাবুদ, এই পুলাপানডিরে বাঁচাইয়া রাইখো গো। গরম পীরের দরগাত সিন্নি মানলাম। আমি তিন কালের বুড়া। আমি মরলে কী ? এক চেয়ারম্যান সাব ছাড়া কেউ এক ফোঁটা চউক্ষের পানি ফালাইত না। মরণের পরে হাসরের মাঠে যদি কবিরাজ চাচার মাইয়ার সাথে দেখা হয়, তয় মাইয়ার হাত ধইরা কমু, ভইন, শোধ তুলছি। এখন কও তুমি আমারে মাফ দিছ কি দেও নাই।

আবদুল মজিদ

এখন বাজছে একটা।

আর এক ঘণ্টার মধ্যে কি রামদিয়া পৌঁছানো যাবে ? আমার মনে হয় না। হাসান আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কত দূর হাসান আলি ?

জানি জবাব দেবে না, তবু জিজ্ঞেস করেছি, কারণ এখান থেকে রামদিয়া কত দূর তা জানে শুধু হাসান আলি। ব্যাটা নবাবের নবাব, কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে না। দেব নাকি রাইফেলের বাঁট দিয়ে একটা... ?

খিদে যা পেয়েছে, বলবার নয়। মনে হচ্ছে এক গামলা ভাত খেয়ে ফেলতে পারি। সেবার তালুকদার সাহেবের বাসায় জবর খাইয়েছিল। হারামজাদা ভীতুর একশেষ। মুক্তিবাহিনী এসেছে শুনে ভয়ে পেচ্ছাব করে দেবার মতো অবস্থা। আরে ব্যাটা বলদ, তুই কি দালাল নাকি রে ? তুই ভয় পাস কী জন্যে ? সারাক্ষণ হাত জোড় করে হেঁ হেঁ হেঁ। কী বিশ্রী! তবে যাই হোক, খাইয়েছিল জবর। একেবারে এক নম্বর খানা। পোলাওটোলাও রেঁধে এলাহি কারবার। জিতা রাহো ব্যাটা। কইমাছ ভাজার

স্বাদ এখনো মুখে লেগে রয়েছে। আমাদের খাওয়ার কি আর ঠিক-ঠিকানা আছে? একবার দু'দিন শুকনো রুটি খেয়ে থাকতে হলো, সে রুটিও পয়সার মাল। আবু ভাই বলেছিলেন, খিদে পেলে শুধু খাওয়ার কথা মনে হয়। মহসিন হলে ফিস্ট হলো একবার। জনে জনে ফুল রোস্ট। সেই সঙ্গে কাবাব, রেজালা আর দৈ-মিষ্টি। খেয়ে কূল পাই না এমন অবস্থা। বাবুর্চি রাঁধত ফার্স্ট ক্লাস।

পায়ের কাটাটা জানান দিচ্ছে। ভাঙা শামুকের এমন ধার! প্রথমে ভাবলাম সাপে কামড়াল বুঝি। বর্ষা-বাদলা হচ্ছে সাপের সিজন। এ অঞ্চলে আবার শামুকভাঙা-কেউটের ছড়াছড়ি। ছোবল মেরে শামুক ভেঙে খায়। রাত-বিরাতে এরকম একটা সাপের গায়ে পা দিতে পারলে মন্দ হয় না। বন্দুক নিয়ে তাহলে এরকম আর ঘুরে বেড়াতে হয় না। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি যাকে বলে।

আমার আর ভালো লাগে না, সত্যি। কী হবে দু'একটা টুশ-টাশ করে? মিলিটারি কমছে কই? বন্যার জলের মতো শুধু বাড়ছে। রাজাকার পয়দা হচ্ছে হু-হু করে। যে অবস্থা, একদিন দেখব আমরা কয়জন ছাড়া সবাই রাজাকার হয়ে বসে আছে। আর হবে নাই-বা কেন? প্রাণের ভয় নেই? রাজাকার হলে তাও প্রাণটা বাঁচে। তাছাড়া মাসের শেষে বাঁধা বেতন। লুটপাটের ঢালাও বন্দোবস্ত। দেখেশুনে মনে হয়, দূর শালা রাজাকার হয়ে যাই।

কী আবোল তাবোল ভাবছি! সোহরাব সাহেবের মতো মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? সোহরাব সাহেবকে দেখে কে বলবে, তার মাথাটা পুরো ফরটি-নাইন হয়ে বসে আছে। দিব্যি ভালো মানুষ, মাঝে মাঝে শুধু বলবে, ইস, গুলিটা শেষে কপালেই লাগল।

দু'মাস ছিল বেচারা মুক্তিবাহিনীতে। সাহসী বেপরোয়া ছেলে। আমগাছ থেকে একবার মিলিটারি জিপে গ্রেনেড মেরে একজন আর্টিলারি ক্যাপ্টেনই সাবাড় করে দিল। দারুণ ছেলে। একদিন খবর পাওয়া গেল, কোন বাজারে গিয়ে নাকি ধুমসে দিশী মদ গিলে ভাম হয়ে পড়ে আছে। মদের ঝোঁকে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে আর বলছে, হায় হায়, ঠিক কপালে গুলি লেগেছে! আবু ভাইয়ের হুকুমে জাফর গিয়ে খুব বানাল। দুই রদ্দা খেয়ে নেশা ছুটে গেল, কিন্তু ঐ কথাগুলি আর গেল না। রাতদিন বলত, ইস কী কাণ্ড, শেষ পর্যন্ত ঠিক কপালে গুলি! ঘুম নেই খাওয়া নেই, শুধু এই বুলি। এখন কোথায় আছে কে জানে? চিকিৎসা হচ্ছে কি ঠিকমতো? আমার যদি এরকম হয় তবে তো বিপদের কথা।

দাঁড়ান, সবাই দাঁড়ান।

কে কথা বলে? হাসান আলি নাকি? ব্যাটা আবার হুকুম দিতে শুরু করল কবে থেকে? জায়গাটা ঘুপচি অন্ধকার, চারদিকে বুনো ঝোপঝাড়। পচা গোবরের দম আটকানো গন্ধ আসছে। হুমায়ূন ভাই বললেন, কী হয়েছে হাসান আলি?

কিছু হয় নাই।

কী হয়েছে তা নিজ চোখেই দেখতে পেলাম। আনিস লম্বালম্বি পড়ে রয়েছে মাটিতে। এত বড় একটা জোয়ান চোখের সামনে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল, আমি দেখতেও পেলাম না ? কী আশ্চর্য! কী ভাবছিলাম আমি ? হাসান আলি ধরাধরি করে তুলল আনিসকে। কাদায়-পানিতে সারা শরীর মাখামাখি। হুমায়ূন ভাই অবাক হয়ে বললেন, কী হয়েছে আনিস ?

কী জানি, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল।

দেখি তোমার হাত। আরে, এ যে ভীষণ জ্বর! কখন জ্বর উঠল ?

কী জানি কখন।

আস, আশেপাশের কোনো বাড়িতে তোমাকে রেখে যাই।

আমি হাঁটতে পারব।

পারতে হবে না। মজিদ, তুমি ওর হাতটা ধর।

গায়ে হাত দিয়ে দেখি, সত্যি গা পুড়ে যাচ্ছে। ব্যাটা বলদ, বলবি তো শরীর খারাপ।

হাসান আলি বলল, সামনেই মুক্তার সাহেবের বাড়ি। আসেন, সেই বাড়িতেই উঠি।

জাফর বলল, কত দূর হে সেটা ?

কাছেই, এক-পোয়া মাইল। জুম্মাঘরের দক্ষিণে।

হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায়; জুম্মাঘরও আসে না, এক-পোয়া মাইলেরও ফুরাবার নাম নেই। যতই জিজ্ঞেস করি, কত দূর হাসান আলি ? হাসান আলি বলে, ঐ যে দেখা যায়।

মোক্তার সাহেবের বাড়িটি প্রকাণ্ড। গরিব গ্রামের মধ্যে বাড়ির বিশালত্ব চট করে চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে প্রশস্ত পুকুর। তার চারপাশে সারি-বাঁধা তালগাছ। আমরা বাড়ির উঠোনে দাঁড়াতেই রাজ্যের কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করল। কী ঝামেলা রে বাবা! বাড়ির ভেতর থেকে কেউ একজন পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল, আসগর মিয়া, আসগর মিয়া, ও আসগর মিয়া।

জাফর তার স্বভাবসুলভ উঁচু গলায় ডাকল, বাড়িতে কে আছেন ? দরজা খোলেন।

হঠাৎ করে বাড়ির সব শব্দ থেমে গেল। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। জাফর আবার বলল, ভয় নাই, আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক। তাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শেষপর্যন্ত হাসান আলি বলল, গনি চাচা, আমি হাসান। তখনি খুট করে দরজা খুলে গেল। একটি ভয়-পাওয়া মুখ বেরিয়ে এলো হারিকেন হাতে।

হাসান আলির কারবার দেখে গা জ্বলে যায়। তার গলা শুনলে যখন দরজা খুলে দেয়, তখন গলাটা একটু আগে শোনালেই হয়। জাফর বলল, বিরক্ত করলাম, কিছু

মনে করবেন না। এই ছেলেটার শোওয়ার বন্দোবস্ত করেন। আমাদের ভাত খাওয়াতে পারবেন?

জি জি, নিশ্চয়ই পারব।

আপনার নাম কী?

গনি। আবদুল গনি।

ডাক্তার আছে এদিকে?

আছে, হোমিওপ্যাথ।

দুত্তোরি হোমিওপ্যাথ!

গনি সাহেব ছাড়া আরো দু'জন লোক জড়ো হয়েছে। তারা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। আনিস তোশকহীন একটি চৌকিতে শুয়ে পড়েছে। গনি সাহেব বললেন, কী হয়েছে ওনার? গুলি লেগেছে নাকি?

না। আপনি ভেতরে গিয়ে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

জি, জি।

বুড়ো ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেলেন। দেখতে-দেখতে বাড়ি জেগে উঠল। কত রকম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে— 'আমিনা আমিনা!' 'হারিকেনটা কই?' 'দূর ধুমসী, ঘুমায় কি!'

ভাগ্য ভালো, বাড়িটি একপাশে। পাড়ার লোক সেই কারণেই ভেঙে পড়ল না। গনি সাহেব একধামা মুড়ি আর গুড় দিয়ে গেলেন। বললেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই রান্না হবে। আনিসকে তুলতে গিয়ে দেখি সে অচৈতন্য। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে।

আনিসের শরীর যে এতটা খারাপ, ধারণা করিনি। নৌকায় ওঠার সময় অবশ্যি একবার বলেছিল বমি বমি লাগছে। কিন্তু এরকম অসুস্থ হয়ে পড়বে, কে ভেবেছিল? আনিসটা মেয়েমানুষের মতো চাপা।

দেখতে পাচ্ছি, আনিসকে নিয়ে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। হাসান আলি পানি ঢালছে মাথায়। জাফর প্রবল বেগে হাতের তালুতে গরম তেল মালিশ করছে। বাড়ির কর্তা, মোক্তার সাহেব বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণ লক্ষ করিনি পেছন থেকে দেখলে মোক্তার সাহেবকে অনেকটা আমার বাবার মতো দেখায়। ঠিক সে-রকম ভরাট শরীর, প্রশস্ত কাঁধ। আশ্চর্য মিল!

আনিসের জ্ঞান ফিরল অল্পক্ষণেই এবং সে লজ্জিত হয়ে পড়ল। হুমায়ূন ভাই বললেন, নাও, দুধটা খাও আনিস।

দুধ লাগবে না, দুধ লাগবে না।

আহা খাও।

আনিস বিব্রত মুখে দুধের গ্লাসে চুমুক দিল। আনিসকে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। তার ভেজা মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। মুখময় দাড়ি-

গোঁফের জঙ্গল। তার মধ্যে সরু একটা নাক ঢাকা পড়ে আছে।

জাফর বলল, আনিস থাক এখানে।

হুমায়ূন ভাই বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

রাত দুটো বাজতে বেশি দেরি নেই। রামদিয়ায় আমাদের জন্যে টুনু মিয়ার দল অপেক্ষা করছে। হুমায়ূন ভাই বললেন, আনিস, কয়টা বাজে দেখ তো।

একটা পঁয়ত্রিশ।

বলো কী!

মোক্তার সাহেব, রামদিয়া কত দূর এখান থেকে ?

দূর না। দশ মিনিটের পথ।

হাসান আলি বলল, দুইটার আগে পৌঁছাইয়া দিমু।

ভুলেই গিয়েছিলাম যে হাসান আলির মতো একজন করিৎকর্মা লোক আছে আমাদের সঙ্গে। সে নাকি যা বলে, তাই করে। প্রমাণ তো দেখতেই পাচ্ছি।

বাড়ির ভেতরে রান্নাবান্না শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছি। চিকন গলায় কে একজন মেয়ে ঘনঘন ডাকছে— ও হালিমা, ও হালিমা। সেইসঙ্গে দমকা হাসির আওয়াজ। একটা উৎসব উৎসব ভাব। বেশ লাগছে।

সেরেছে! আনিস দেখি বমি করছে! ব্যাপার কী ? চোখ হয়েছে টকটকে লাল। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। মরেটরে যাবে না তো আবার ? দুত্তোরি, কী শুধু আজেবাজে কথা ভাবছি। বুঝতে পারছি, অতিরিক্ত পরিশ্রম আর মানসিক দুশ্চিন্তায় এরকম হয়েছে। আজ রাতটা রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। একটি ছেলে পাখা করছে আনিসের মাথায়। খুব বাহারে পাখা দেখি! চারিদিকে রঙিন কাপড়ের ঝালর।

জাফরও শুয়েছে লম্বা হয়ে। জাফরের শোওয়া মানেই ঘুম। ঘুম তার সাধা, কোনোমতে বিছানায় মাথাটি রাখতে পারলেই হলো। ভাত রান্না হতে-হতে সে তার সেকেন্ড রাউন্ড ঘুম সেরে ফেলবে। ফার্স্ট রাউন্ড তো নৌকাতেই সেরেছে। জাফরের ঘুম আবার সুরেলা। ফুরুৎ ফুরুৎ করে নাক ডাকবে। এই কথা বলেছিলাম বলে একদিন কী রাগ! মারতে আসে আমাকে। বেশ লোক দেখি তুমি! ফুরুৎ ফুরুৎ করে নাক ডাকতে পারবে, আর আমরা বলতেও পারব না ? করলে দোষ নয়, বললে দোষ ?

ঠিক আমার বাবার মতো। রাত-দিন কারণে-অকারণে চেঁচাচ্ছেন, আর সেও কী চেঁচানি! রাস্তার মোড় থেকে শুনে লোকে খবর নিতে আসে বাসায় কী হয়েছে। মা একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, কী রাত-দিন চেঁচাও! অমনি বাবার রাগ ধরে গেল। ঘাড়টাড় ফুলিয়ে বিকট চিৎকার, কী, আমি চেঁচাই ?

মা সহজ সুরে বললেন, এখন কী করছ, চেঁচাচ্ছ না ?

চুপ রাও। একদম চুপ।

বাবার কথা মনে হলেই এই হাসির কথাটা মনে পড়ে। এমন সব ছেলেমানুষী

ছিল তাঁর মধ্যে। একবার খেয়াল হলো, আমাদের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন সীতাকুণ্ড তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি। দু'মাস ধরে চলল আয়োজন। বাবার ব্যস্ততার সীমা নেই। যাবার দিন এক ঘণ্টা আগে স্টেশনে নিয়ে গেলেন সবাইকে, আর সে কী চেঁচানি, এটা ফেলে এসেছ ওটা ফেলে এসেছ। ট্রেন এলো, সবাই উঠলাম। পাহাড়প্রমাণ মাল তোলা হলো। এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিল, দেখা গেল বাবা উঠতে পারেননি। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। হাতের কাছে যে-কোনো একটা কামরায় উঠে পড়লেই হয়, না— তা উঠবেন না। আমরা যে কামরায় উঠেছি, ঠিক সে-কামরায় ওঠা চাই। এক সময় দেখলাম, বাবা হোঁচট খেয়ে পড়েছেন। হুস-হুস করে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, মৃত মানুষরা কি মানুষের মনের কথা টের পায় ? যদি পায়, তা হলে বাবা নিশ্চয়ই আমি কী ভাবছি বুঝতে পারছেন ? আচ্ছা ধরা যাক, একটি লোককে সবাই মিলে ফাঁসি দিচ্ছে— তাহলে সেই হতভাগ্য লোকটির চোখে-মুখে কী ফুটে উঠবে ? হতাশা, ঘৃণা, ভয়... আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি ? নয়তো এরকম অর্থহীন চিন্তা কেউ করে ? ও-কী, আনিস আবার বমি করছে নাকি ? জোর করে দুধটা না খাওয়ালেই হতো!

মোক্তার সাহেব এসে চুপি চুপি কী বলছেন হুমায়ূন ভাইকে। কে জানে, এর মধ্যেই কী এমন গোপনীয় কথা তৈরি হয়েছে যা কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে হবে! আরে আরে, এই ব্যাপার! এটা আবার কানাকানি বলতে হবে নাকি ? বললেই হয়, ভাত দেয়া হয়েছে, খেতে আসেন। যত বেকুবের দল।

হাসান আলি বলল, তাড়াতাড়ি করেন, সময় নাই।

মাতব্বর কোথাকার! সময় নেই— সেটা তোর কাছে জানতে হবে নাকি ?

খেতে বসে দেখি খিদে মরে গেছে। তরকারিতে লবণ হয়েছে বেশি। ভাত হয়েছে কাদার মতো নরম। চিবাতে হয় না, কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলা যায়। ভালো হলো না মোটেই। জাফর বলল, হু নোজ, দিস মে বি আওয়ার লাস্ট মিল। কথায় কথায় ইংরেজি বলা জাফরের স্বভাব। তার ধরনধারণও ইংরেজের মতো। এই মহা দুর্যোগেও ভোরবেলা উঠেই তার শেভ করা চাই। দুপুরে সাবান মেখে গোসল সারা চাই। দিনের মধ্যে দশবার চিরুনির ব্যবহার হচ্ছে। রূপ যাদের আছে, তারাই রূপ-সচেতন হয়। এবং এত উলঙ্গভাবে হয় যে বড় চোখে লাগে।

আমাদের পাশের বাড়ির রেহানা দশ-এগারো বছর বয়স পর্যন্ত কী চমৎকার মেয়েই না ছিল, কিন্তু যেই তার বয়স তেরো পেরিয়ে গেল, যেই সে বুঝল তার চোখ ধাঁধানো রূপ আছে, অমনি সে বদলে গেল। আহ্লাদী ধরনের টেনে টেনে কথা বলা ম-জি-দ ভা-ই! ঘনঘন ভ্রূ কোঁচকানো। জঘন্য, জঘন্য।

হুমায়ূন ভাই বোধহয় কোনো একটা রসিকতা করলেন। ভ্যাক ভ্যাক করে হাসছে সবাই। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলে শুনতে পাইনি। এখন সবাই হাসছে, আমি মুখ কালো করে বসে আছি। নিশ্চয়ই বোকা-বোকা লাগছে আমাকে। কে

জানে, রসিকতাটা হয়তো আমাকে নিয়েই। সবাই যে-ভাবে তাকাচ্ছে আমার দিকে, তাতে তাই মনে হয়। ও-কী, হাসান আলিও হাসছে দেখি।

হাস বাবা, হাস। যত ইচ্ছে হাস। কিছুক্ষণ পরই যখন বমবম করে মর্টারের শেল ভাঙা শুরু হবে, তখন এত রস আর থাকবে না। কাজেই এই-ই হচ্ছে গোল্ডেন আওয়ার।

পান আনব। পান খাবেন ?

জিজ্ঞেস করল কে যেন। আমি মাথা নাড়লাম। পানটান লাগবে না-রে বাবা। বিনা পানেই চলবে। মুড নেই। পান, সিগারেট, চা— এসব হচ্ছে মুডের ব্যাপার; মুড না থাকলে বিষের মতো লাগে।

হুমায়ূন ভাই বললেন, আমরা রওনা হচ্ছি। আনিস, তুমি থাক। ফেরবার পথে তোমাকে নিয়ে যাব।

তিনি তাহলে ফেরবার চিন্তাও করছেন! ভুলে গেছেন নাকি, মেথিকান্দা মুক্তিবাহিনীর মৃত্যুকূপ। আজ যাত্রা থেকেই অলক্ষণ শুরু হয়েছে। নৌকাও ছাড়ল, বৃষ্টিও নামল। হুমায়ূন ভাই একটা প্রচণ্ড উল্কাপাত দেখলেন। আনিস হয়ে পড়ল অসুস্থ। শেষটায় কী হবে কে জানে ?

বড় অস্থির লাগছে। ইয়া মুকাদ্দেমু, ইয়া মুকাদ্দেমু, ইয়া মুকাদ্দেমু— কে যেন বলেছিল যুদ্ধের সময় এই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো দোয়া— যার অর্থ 'হে অগ্রসরকারী।' এই দোয়া পড়ে শুধু এগিয়ে যাওয়া।

না, বড় খারাপ লাগছে। ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে আর যাব না। সম্ভব হলে ফিরে যাব মৈমনসিংহ। কিন্তু গিয়ে করবটা কী ? মা কোথায় আছেন কে জানে ? বাবা বেচারা মরে বেঁচেছেন। কোনো দায়দায়িত্ব নেই। কিন্তু আমিই-বা কোন দায়িত্ববান সুপুত্রটি ? বাবাকে ধরে নিয়ে গেল মিলিটারি, আমিও এলাম পালিয়ে, অথচ নিশ্চিত জানি মায়ের কোনো সহায়-সম্বল নেই। বোনগুলি বোকার বেহদ্দ। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখব 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। কেউ নেই, সব সাফ হয়ে গেছে। মন্দ হয় না খুব। বাধা-বন্ধনহীন বল্লাহারা জীবন। কি আনন্দ!

অবশ্যি এমনও হতে পারে— দেশ স্বাধীন হবে। আমি মৈমনসিংহ ফিরে যাব। বাবাকে হয়তো তারা প্রাণে মারেনি, তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন। আবার আমরা সীতাকুণ্ড যাব। পাহাড়প্রমাণ জিনিসপত্র তোলা হবে ট্রেনে। এক সময় ট্রেন ছেড়ে দেবে, দেখব বাবা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। আহ্, চোখে জল আসে কেন ?

মোক্তার সাহেব, দোওয়া রাখবেন। খোদা হাফেজ, আনিস।

খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ।

আমার মন বলছে আজকের যুদ্ধে হুমায়ূন ভাই মারা যাবেন। নৌকার ছাদে বসে তিনি যখন আপন মনে গুনগুন করছিলেন, তখনি আমার এ কথাটা মনে হয়েছে। কিছুক্ষণ পর তিনি নেমে এসে বললেন, অনেকগুলি উল্কাপাত হলো। একটা তো প্রকাণ্ড। তখনি আমি নিশ্চিত হয়েছি। আমার মনের মধ্যে যে-কথাটি ওঠে, তাই সত্যি হয়। এ আমি অনেকবার দেখেছি।

সেবার স্বরূপহাটির রেলওয়ে কালভার্ট ওড়াতে গিয়েছি— আমি, রহমান আর ওয়াহেদ। রহমানের আবার খুব চায়ের নেশা। খুঁজে-খুঁজে চায়ের দোকানও একটা বের করেছে। বিস্বাদ তেতো চা— তাতে চুমুক দিয়ে রহমান চেঁচিয়ে উঠল, ফার্স্ট ক্লাস চা। আর তখনি কেন জানি আমার মনে হলো, রহমানের কিছু-একটা হবে। হলোও তাই। হুমায়ূন ভাইয়ের বেলাও কি তাই হবে?

হুমায়ূন ভাইয়ের ঢাকার বাসার ঠিকানা আছে আমার কাছে। ১০/৭ বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭। দোতলায় থাকেন তাঁর বাবা-মা। যদি সত্যি কিছু হয়, তাহলে এই ঠিকানায় খবর দিতে আমি নিজেই যাব। তাঁর মা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন তাঁর ছেলে কীভাবে থাকত, কী করত। সব বলব আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাঁরা হয়তো ছেলে কোথায় মারা গেছে, দেখতে চাইবেন। আমি নিজেই তাঁদের নিয়ে আসব। আমরা আজ যে-পথে এসেছি, সেই পথেই আনব। বলব, রাতটা ছিল অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোয় আলোয় এসেছি। পথে মোক্তার সাহেবের বাড়িতে ভাত খেয়েছি। হুমায়ূন ভাইয়ের মা হয়তো মোক্তার সাহেবকে দেখতে চাইবেন। মোক্তার সাহেবকে হয়তো তিনি বলবেন, আপনি আমার ছেলেকে শেষবারের মতো ভাত খাইয়েছেন। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক।

ক্যান কান্দেন?

আমাকে যে-ছেলেটি বাতাস করছিল, সে অবাক হয়ে আমার কাঁদবার কারণ জানতে চাইছে। ইচ্ছে করে কি আর কাঁদছি? হঠাৎ চোখে জল এলো।

মাথার মধ্যে পানি দিবেন একটু?

না।

মাথাটা টিপা দিমু?

না-না।

সে দেখি আমার সেবা না-করে ছাড়বে না। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি তো দিব্যি আরাম করে শুয়ে আছি। আর ওরা নিশ্চয়ই কাদা ভেঙে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। রামদিয়া থেকে আরো দু'মাইল উত্তরে মেথিকান্দা। সেখানে তারা হাঁটা-পথে যাবে, না নৌকায়?

টুনু মিয়ার দলে মোট কতজন ছেলে আছে? হুমায়ূন ভাই একবার বলেছিলেন,

কিন্তু এখন দেখি ভুলে বসে আছি। ওদের সাথে দু' ইঞ্চি মর্টারও আছে। মেথিকান্দা আজ নিশ্চয়ই দখল হবে। সুজনতলির রেলওয়ে পুলও উড়িয়ে দেওয়া হবে। সমস্ত অঞ্চলটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেবে। ফাইন। কে জানে, এত গোলমালে কেউ কি আর জাতীয় পতাকার কথাটা মনে রাখবে ? স্থানীয় লোকজনের কাছে নিশ্চয়ই স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ পাওয়া যাবে। আগে তো ঘরে ঘরে ছিল। মিলিটারি আসবার পর সবাই হয় পুড়িয়ে ফেলেছে, নয়তো এমন জায়গায় লুকিয়েছে যে ইঁদুরে খেয়ে গিয়েছে। এমন দিনে একটা ঝকঝকে নতুন ফ্ল্যাগ চাই।

এতদিন শুধু ছোটখাট হামলা করেছি। বিভিন্ন থানায় ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধের পর রাতারাতি সরে এসেছি নিরাপদ স্থানে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যতিব্যস্ত করে রাখা। মুহূর্তের জন্যেও যেন শান্তির ঘুম না দিতে পারে। কিন্তু আজকের ব্যাপার অন্য। আজ আমরা খুঁটি গেড়ে বসব। আহা, আবার চোখে জল আসে কেন ?

পর্দার আড়াল থেকে সুশ্রী একটি মেয়ে উঁকি দিয়ে আমায় দেখে গেল। বেশ মেয়েটি। ইচ্ছে হচ্ছিল ডেকে কথা বলি। কিন্তু ইচ্ছাটা গিলে ফেলতে হলো। এ বাড়িতে কিছু সময় থাকতে হবে আমাকে। এ সময় এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে এ বাড়ির লোকজন বিরক্ত হয়।

স্লামালিকুম।

অলায়কুম সালাম।

আমি গনি মিয়ার চাচাত ভাই। উত্তরের বাড়িতে থাকি। মিয়া সাহেবের শরীলডা এখন কেমুন ?

ভালো।

শুধু গনি মিয়ার চাচাত ভাই-ই নয়, আরো অনেকেই জড়ো হয়েছে। সম্ভবত আরো লোকজন আসছে। আমার বিরক্ত লাগছে, আবার ভালোও লাগছে। বিরক্ত লাগছে কথা বলতে হচ্ছে বলে, ভালো লাগছে লোকজনদের কৌতূহলী চোখ দেখে। তোমরা তাহলে শেষপর্যন্ত কৌতূহলী হয়েছ ? দেখতে এসেছ মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের ? বেশ বেশ।

ইস, কী দিনই না গিয়েছে শুরুতে! গ্রামবাসী দল বেঁধে মুক্তিবাহিনী তাড়া করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। অবশ্যি তাদেরই-বা দোষ দিই কী করে ? মিলিটারি রয়েছে ওঁৎ পেতে। যেই শুনেছে অমুক গ্রামে মুক্তিবাহিনী ঘোরাফেরা করছে, হুকুম হলো— দাও ঐ গ্রাম জ্বালিয়ে। যেই শুনেছে অমুক লোকের বাড়ি মুক্তিবাহিনী একরাত্রি ছিল, অমনি হুকুম হলো, অমুক লোককে গুলি করে মার গ্রামের মধ্যিখানে, যাতে সবার শিক্ষা হয়। আহ্, শুরুতে বড় কষ্টের দিন গিয়েছে!

কয়টা বাজে এখন ? আমার কাছে ঘড়ি নেই। সময়টা জানা থাকলে হতো। বুঝতে পারতাম কখন গুলির আওয়াজ পাব। অবশ্যি প্রথম শুনব ব্রিজ উড়িয়ে দেবার বিকট আওয়াজ। ব্রিজটা ওড়াতে পারবে তো ঠিকমতো ? শুনেছি রেঞ্জাররা পাহারা দেয় সারারাত। খুব অস্থির লাগছে। ওদের সঙ্গে গেলেই হতো। না-হয় একটু দূরে

বসে থাকতাম। রেসের ঘোড়ার মতো হলো দেখি! রেসের ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেলে শুনেছি অর্ধ-উন্মাদ হয়ে যায়। রেস শুরু হলে পাগলের মতো পা নাচায়।

আপনার জন্যে দুধ আনব এক গ্লাস ?

সেই সুশ্রী মেয়েটি ঘরের ভেতর ঢুকেছে দেখে অবাক লাগছে। গ্রামঘরের বাড়িতে এরকম তো হয় না। বেশ কঠিন পর্দার ব্যাপার থাকে। আমার খানিকটা অস্বস্তি লাগছে। গনি মিয়ার ভাই, যিনি আমার বিছানার পাশে বসেছিলেন, তিনিও আমার অস্বস্তি লক্ষ করলেন।

মেয়েটি আবার বলল, আনব আপনার জন্যে এক গ্লাস দুধ ?

না-না, দুধ লাগবে না।

খান, ভালো লাগবে। আনি ?

আন।

গনি মিয়ার চাচাত ভাই বললেন, বড় ভালো মেয়ে। শহরে পড়ে।

কী পড়ে ?

বিএ পড়ে। হোস্টেলে থাকে।

শুনে আমি অপ্রস্তুত। তুমি তুমি করে বলছি, কী কাণ্ড! কামিজ পরে আছে বলেই বোধহয় এত বাচ্চা দেখা যায়। তাছাড়া তার হাবভাবও ছেলেমানুষী।

মেয়েটি মোক্তার সাহেবের বড় ভাইয়ের মেয়ে। বড় ভাই ও ভাবি দু'জনেই মেয়েটিকে ছোট রেখে মারা গেছেন। মেয়েটি মোক্তার সাহেবের কাছেই বড় হয়েছে। পড়াশোনার খুব ঝোঁক, ঢাকায় হোস্টেলে থেকে পড়ে। গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে আগেভাগেই চলে এসেছিল।

মেয়েটি দুধের গ্লাস আমার সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখল না, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, তোমার নাম ?

হামিদা। হামিদা বানু।

আমি চুপ করে রইলাম। কী বলব ভেবে পেলাম না। অথচ মেয়েটি দাঁড়িয়েই আছে। হয়তো কিছু কথা শুনতে চায়। যুদ্ধের গল্প শুনতে মেয়েদের খুব আগ্রহ। হামিদা এক সময় বলল, আমার নামটা খুব বাজে! একেবারে চাষা-চাষা নাম।

আমি বললাম, নাম দিয়ে কী হয় ?

হয় না আবার, আমার বন্ধুদের কী সুন্দর সুন্দর নাম! একজনের নাম কিন্নরী, একজনের নাম স্বাতী।

মোক্তার সাহেব বললেন, আপনার জন্যে ডাক্তার আনতে লোক গেছে। ভালো ডাক্তার— এলএমএফ। হামিদা আম্মাজি, ভেতরে যান।

বাহ্! কী সুন্দর আম্মাজি ডাকছে। মেয়েটি বোধহয় সবার খুব আদরের। মোক্তার সাহেবের কথায় সে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল। আমাকে দেখতে আসা লোকগুলি চলে যাচ্ছে

একে একে। এত তাড়াতাড়ি কৌতূহল মিটে গেল ? মোক্তার সাহেব অবশ্যি লোকজনদের ঝামেলা না করবার জন্যে বলছেন। তবুও তাদের আগ্রহ এত কম হবে কেন ?

অন্দরমহলের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে। পর্দার ওপাশে জটলা-পাকানো মেয়েদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। হামিদা বলল, ওরা আপনাকে দেখতে চায়। মুক্তিবাহিনী কোনোদিন তো দেখে নাই।

তুমি দেখেছ নাকি ?

এই তো আপনাকে দেঁখলাম।

বাহ্, বেশ মেয়ে তো! বেশ গুছিয়ে কথা বলে। ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সঙ্গে পড়ত— শেলী রহমান। সেও এরকম গুছিয়ে কথা বলত— একেকবার আমাদের হাসিয়ে মারত। শেলী রহমানের বাবা তো পুলিশ অফিসার ছিলেন, মিলিটারির হাতে মারা যাননি তো।

কয় ভাইবোন আপনারা ?

আমি একা। ভাইবোন নেই কোনো।

ভাইবোন না থাকা খুব বাজে।

এ কী! গুলির আওয়াজ শুনলাম না ? তাহলে কি শুরু হলো নাকি ? তিনটে বেজে গেছে এর মধ্যে। আমি ছটফট করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, কয়টা বাজে হামিদা, একটু জেনে আসবে ? মোক্তার সাহেব বললেন, দুটো পঁচিশ। কি আশ্চর্য, এখনো তো যুদ্ধ শুরুর সময় হয়নি!

হামিদা বলল, কী হয়েছে ?

গুলির আওয়াজ শুনলাম।

কই না, না তো!

আমি তো শুনলাম নিজ কানে।

মোক্তার সাহেব বললেন, না, গুলির আওয়াজ নয়। গুলির আওয়াজ হলে বুঝতাম। কতবার যুদ্ধ হলো এখানে।

মেথিকান্দার আশেপাশে যারা থাকে, গুলির শব্দ তারা অনেকবারই শুনেছে। অনেকবার ব্যর্থ আক্রমণ হয়েছে এখানে। কিন্তু কেউ মুক্তিবাহিনী দেখেনি, এটা কেমন কথা! হয়তো সবাই বিল পার হয়ে ছোট খাল ধরে এগিয়েছে। আমাদের মতো গ্রামের ভিতর দিয়ে রওনা হয়নি। যাই হোক, এ নিয়ে ভাবতে ভালো লাগছে না। বমি-বমি লাগছে। মাথাটা এমন ফাঁকা লাগছে কেন। ব্রিজটা ঠিকমতো ওড়াতে পারবে তো ? এমন যদি হতো, সবাই ঠিকঠাক ফিরে এসেছে, কারো গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। তা কি আর হবে ? কী একটা গান আছে না সুবীর সেনের— 'মন নিতে হলে মনের মূল্য চাই।' ও-কী, মাথা ঘুরছে নাকি ?

আপনার কী হয়েছে, এরকম করছেন কেন ?

কিছু হয় নি। এই তো, এই তো গুলির শব্দ পাচ্ছি। হামিদা, যুদ্ধ শুরু হলো।

বাতাসে জানালা নড়ার শব্দ শুনছেন...

মর্টারের শেল ফাটার আওয়াজ পাচ্ছ না ?

আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন। মাথায় পানি দিই ?

মেয়েটির মাথা নিচু হয়ে এসেছে। কিন্নরী না নাম ? উঁহুঁ, হামিদা। তাহলে কিন্নরী নাম কার ? বেশ সুশ্রী মেয়েটি। গলাটি কী লম্বা! ফরসা, হাঁসের মতো। ঐ তো, আবার শেল ফাটার আওয়াজ। আহ্, পুরোদমে ফাইট চলছে।

আপনি নড়াচড়া করবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন।

অনেক অপরিচিত মহিলা ঘরের ভেতরে ভিড় করছেন। মোক্তার সাহেবকে দেখছি না তো। মোক্তার সাহেব কোথায় ? এই দাড়িওয়ালা লোকটি কে ?

রামদিয়ার ঘাটে তারা যখন পৌঁছল, তখন আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে, বিজলি চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। দমকা বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে বাঁশবনে। হুমায়ূন পিছিয়ে পড়েছিল। হোঁচট খেয়ে তার পা মচকে গিয়েছে। সে হাঁটছে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। জাফর গলা উঁচিয়ে ডাকল, হুমায়ূন ব্রাদার, হুমায়ূন ব্রাদার।

তার ডাকার ভঙ্গিটা ফুর্তিবাজের ভঙ্গি। সব সময় এরকম থাকে না। মাঝেমধ্যে আসে। হুমায়ূন হাসল মনে মনে। সেও খুব তরল গলায় সাড়া দিল, কী ব্যাপার জাফর ?

বৃষ্টি আতা হায়। বহুত মজাকা বাত।

বলতে বলতেই টুপটুপ করে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। জাফর হেসে উঠল হো-হো করে। যেন এ সময় বৃষ্টি আসাটা খুব একটা আনন্দের ব্যাপার।

হাসান আলি মাথার বাক্স নামিয়ে তার উপর বসে ছিল— যদিও বেশ বেগে হাওয়া বইছে, তবু সে লাল গামছা দুলিয়ে নিজেকে হাওয়া করছিল। বৃষ্টি আসতে দেখে সেও কী মনে করে যেন হাসল।

মজিদ একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ফুস-ফুস করে ধোঁয়া ছাড়ছে। সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এখানে দাঁড়িয়ে তার ক্লান্তি আরো বেড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে বলল, কী ব্যাপার হাসান আলি, টুনু মিয়ার দল কোথায় ?

হাসান আলি সে কথার জবাব দিল না, গামছা দুলিয়ে হাওয়া করতেই লাগল। মজিদ গলা উঁচিয়ে বলল, কথা বলছ না যে, কী ব্যাপার ?

নৌকা আসতাছে। বিশ্রাম্ করেন মজিদ ভাই।

হুমায়ূন ও জাফর এসে বসল হাসান আলির পাশে। বৃষ্টি নামতে নামতে আবার

থেমে গেছে। বসে থাকতে মন্দ লাগছে না তাদের। রামদিয়ার ঘাটে টুনু মিয়ার দলকে না দেখতে পেয়ে তারা সেরকম অবাক হলো না। জাফর হঠাৎ সুর করে বলল, 'ওগো ভাবিজান, মর্দ লোকের কাম।'

তারা সবাই মিনিট দশেক বসে রইল। চারিদিকে ঘন অন্ধকারে মাঝে মাঝে সিগারেটের ফুলকি আগুন জ্বলছে-নিভছে। ঝিঁঝি পোকার একটানা বিরক্তিকর আওয়াজ ছাড়া অন্য আওয়াজ নেই। হাসান আলি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নৌকা দেখা যায়। উঠেন, সবেই উঠেন।

দেশী ডিঙ্গি নৌকা ঠেলে উজানে নিয়ে আসছে।

হাসান আলি উঁচু গলায় সাড়া দিল, হই হই হই-হা।

নৌকা থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, হাসান ভাই নাকি গো ? ও হাসান ভাই।

কী।

ঠিকমতো পৌঁছছেন দেহি।

হাসান আলি আচমকা প্রগলভ হয়ে উঠল। নৌকা পাড়ে ভিড়তেই নৌকার দড়ি ধরে শিশুর মতো চেঁচিয়ে উঠল, টুনু মিয়া, ও টুনু মিয়া ?

নৌকার ভেতর থেকে একসঙ্গে উঁচু স্বরগ্রামে হেসে উঠল সবাই। টুনু মিয়া লাফিয়ে নামল নৌকা থেকে, বেঁটেখাট মানুষ। পেটা শরীর, মাথার চুল ছোট-ছোট করে কাটা। সে হাসিমুখে এগিয়ে গেল হুমায়ূনের দিকে।

আমারে চিনছেন কমান্ডার সাব ? আমি টুনু। বাজিতপুরের টুনু মিয়া। বাজিতপুর থানায় আপনার সাথে ফাইট দিছি।

হুমায়ূন বলল, তোমরা দেরি করে ফেলেছ, আড়াইটা বাজে।

আগে কন আমারে চিনছেন কিনা।

চিনেছি, চিনেছি। চিনব-না কেন ?

বাজিতপুর ফাইটে আমার বাম উরাতে গুলি লাগল। আপনে আমারে পিঠে লইয়া দৌড় দিলেন। মনে নাই আপনার ?

খুব মনে আছে!

বাঁচনের আশা আছিল না। আপনে বাঁচাইছেন। ঠিক কইরা কন, আমারে চিনছেন ? সেই সময় আমার লম্বা চুল আছিল।

হুমায়ূন অবশ্যি সত্যি চিনতে পারেনি, তবু আজকের এই মধ্যরাতে স্বাস্থ্যবান হাসি-খুশি এই তরুণটিকে অচেনা মনে হলো না। দলের অন্যান্য সবাই নেমে এসেছে। হাসান আলি তাদের কী যেন বলছে, আর তারা ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছে। কে বলবে এই সব ছেলেদের জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ মুছে যাবে।

জাফর বলল, আর লোকজন কোথায় ?

আছে, জায়গা মতোই আছে।

তাহলে আর দেরি কেন ? নৌকা ছাড়া যাক। হুমায়ূন ভাই কী বলেন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠে পড় সবাই।

নৌকায় উঠে বসতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। নৌকা যদিও ভাটির দিকে যাচ্ছে, তবু বাতাসের ঝাপটায় এগোচ্ছে ধীর গতিতে, মাঝে মাঝে তীরে গজিয়ে ওঠা বেতঝোপে আটকে যাচ্ছে। যতবারই নৌকা আটকে যাচ্ছে, ততবারই মাঝি দু'টি গাল পাড়ছে, ও হালার পুত, ও হারামির বাচ্চা। গ্রামের ভেতর দিয়ে নৌকা যাবার সময় মেঘ ধরে গেল। তীরে বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে অনেক কৌতূহলী লোক বসে আছে। দু'একজন সাহস করে নিচু গলায় বলছে, জয় বাংলা।

মুক্তিবাহিনী চলাচল হচ্ছে এ খবর কী করে পেল কে জানে! হুমায়ূন একটু বিরক্ত হলো। মুখে কিছুই বলল না। অবশ্য ভয় পাবার তেমন কিছু নেইও। মিলিটারিরা কিছুতেই এই রাত্রিতে থানার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরুবে না। মজিদ বলল, হুমায়ূন ভাই, পজিশন নেব কোথায় ? সব খানাখন্দ তো পানিতে ভর্তি। সাপ-খোপও আছে কিনা কে জানে!

নৌকার অনেকেই এই কথায় হেসে উঠল। মজিদ রেগে গিয়ে বলল, হাস কেন ? মিয়ারা, হাস কেন ? মজিদ রেগে যাওয়াতেই হাসিটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। নৌকা নীরব হলো মুহূর্তেই। তখনি শোনা গেল, বাইরে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝি দু'জন ভিজে চুপসে গেছে। জাফর বলল, মাঝিরা তো দেখি গোসল সেরে ফেলেছে।

হ গো ভাই, তিন দফা গোসল হইল।

জাফর সুর করে বলল, বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম।

মজিদ ক্রমাগতই বিরক্ত হচ্ছিল। ভয় করছিল তার। ভয় কাটানোর জন্যেই জিজ্ঞেস করল, মর্টার কোথায় ফিট করেছ তোমরা ? থানা কত দূর ?

গোঁসাই পাড়ায়। বেশি দূর না। পরথমে সেইখানে যাইবেন ?

না-না, যাওয়ার দরকার কী ? তাদের কাজ তারা করবে। হুমায়ূন ভাই কী বলেন ?

হুমায়ূন কিছু বলল না, চুপ করে রইল। তার মচকে যাওয়া পা ব্যথা করছিল। সে মুখ কুঁচকে বসে রইল। তীর থেকে কে একজন চেঁচিয়ে ডাকল, কার নাও ? কার নাও ?

নৌকার মাঝি রসিকতা করল, হেঁড়ে গলায় বলল, তোমার নাও।

নাও ভিড়াও মাঝি, খবর আছে, নাও ভিড়াও।

নৌকা ভিড়ল না, চলতেই থাকল এবং কিছুক্ষণ পরেই তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল নৌকায়।

নৌকা ভিড়াও মাঝি, সামনে রাজাকার আছে।

কোনখানে ?

শেখজানির খালের পারে বইসা আছে।

থাকুক বইসা, তুমি কেডা গো ?

আমি শেখজানি হাইস্কুলের হেড-মাস্টার আজিজুদ্দিন। মুক্তিবাহিনীর নাও নাকি ?

মনে অয় হেই রকমই।

নৌকা ভিড়ল না, কারণ নৌকা শেখজানির খালে যাচ্ছে না। আজিজুদ্দিন মাস্টার হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই মাঝরাত্রে সে ছয় ব্যাটারির টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন কে জানে ?

এখান থেকেই গ্রামের চেহারাটা বদলাতে শুরু করেছে। দুটি আস্ত বাড়ি, তার পরপরই চারটি পুড়ে যাওয়া বাড়ি। আবার একটা গোটা বাড়ি নজরে আসছে, আবার ধ্বংসস্তূপ। মিলিটারিরা প্রায় নিয়মিত আসছে এদিকে। লোকজন পালিয়ে গেছে। ফসল বোনা হয়নি। চারিদিক জনশূন্য। নৌকা যতই এগিয়ে যায়, ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা ততই বেড়ে ওঠে। আর এগুনো ঠিক নয়। রাজাকারদের ছোটখাট দল প্রায়ই নদীর তীর ঘেঁসে ঘুরে বেড়ায়! নজর রাখে রাতদুপুরে কোনো রহস্যজনক নৌকা চলাচল করছে কিনা। তাদের মুখোমুখি পড়ে গেলে তেমন ভয়ের কিছু নেই। তবে আগেভাগেই গোলাগুলির শব্দে চারিদিক সচকিত করে লাভ কী ?

রুস্তম ভাই, এই রুস্তম ভাই।

কেডা গো ?

আমি চান্দু, পাঞ্জাবি মিলিটারি, হি-হি-হি। নৌকা থামান।

নৌকার গতি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটি ছোটখাট রোগা মানুষ লাফিয়ে উঠল নৌকায়। জাফর বলল, কী ব্যাপার, কী চাও তুমি ? কে তুমি ?

আমি কেউ না, চান্দু।

কী কর তুমি ?

আমি খবরদারি করি। আপনেরার সাথে যামু। যা করবার কন করুম।

রুস্তম বলল, চান্দুরে লন সাথে, খুব কামের ছেলে। গ্রেনেড নিয়া একেবারে থানার ভিতরে ফালাইব দেখবেন।

চান্দু গম্ভীর হয়ে বলল, নামেন গো ভালোমানুষের পুলারা। জিনিসপত্র যা আছে, আমার মাথায় দেন।

পিনপিনে বৃষ্টি মাথায় করে দলটি নেমে পড়ল। সবে মাটিতে পা দিয়েছে, অমনি দূরাগত বিকট আওয়াজ কানে এলো। কী হলো, কী হলো। দল দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বর বের করল, হুমায়ূন ভাই, কী ব্যাপার ? উত্তর দিল চান্দু, কিছু না। পুল ফাটাইয়া দিছে। সাবাস, ব্যাটা বাপের পুত।

তা হলে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আহ কী আনন্দ! ভয় কমে যাচ্ছে সবার। সবাই দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিকট শব্দটা হুম হুম করে প্রতিধ্বনি তুলল। থানার

হলুদ রঙের দালানটি দেখা যাচ্ছে। রঙ দেখা যাচ্ছে না। কাঠামোটা স্পষ্ট নজরে আসছে। থানার আশেপাশে দু'শ গজের মতো জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। ঘরবাড়ি নেই, গাছপালা নেই— খাঁ-খাঁ করছে। অনেক দূর থেকে যাতে শত্রুর আগমন টের পাওয়া যায়, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

তিনটি দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। এদেরও অনেক পেছনে আধ ইঞ্চি মর্টার নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি ছোট্ট দল, যে-দলে পেনসনভোগী একজন বৃদ্ধ সুবাদার আছেন। পুরনো লোক। তার উপর বিশ্বাস করা চলে। উত্তর দিকের ঢালু অঞ্চলটায় রুস্তম একাই আঁট হয়ে বসেছে। মাটি হয়েছে পিছল। এলএমজি'র পা পিছলে আসে। কিন্তু সেসব এখন না ভাবলেও চলে।

চান্দু বসে আছে জাফরের পাশে। তার ইচ্ছে— বুকে হেঁটে থানার সামনে যে-দুটি বাঙ্কার, সেখানে গ্রেনেড ছুঁড়ে আসে। এ কাজ নাকি সে আগেও করেছে। জাফর কান দিচ্ছে না তার কথায়।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ আবার পরিষ্কার হয়েছে। তারা দেখা যাচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে হু-হু করে। ঘণ্টা দু'য়েকের ভেতর অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশ ফরসা হবে। শুরু হবে আরেকটি সূর্যের দিন।

কর্দমাক্ত ভেজা জমি। চারপাশের গাঢ় অন্ধকার, ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা— এর মধ্যেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে সবাই। কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। রুস্তম ফিসফিস করে বলে, পায়ের উপর দিয়ে কী গেল, সাপ নাকি? ঠান্ডা ঠান্ডা লাগল। তার কণ্ঠস্বর অন্যরকম শোনায়। কেউ কোনো জবাব দেয় না। সবাই অপেক্ষা করে সেই মুহূর্তটির জন্যে, যখন মনে হবে পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাইফেলের উপর ঝুঁকে থাকা একেকটি শরীর আবেগে ও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকবে থরথর করে।

সৌরভ

আমাদের বাড়িতে ইদানীং ভূতের উপদ্রব হয়েছে।

নিচতলার ভাড়াটে নেজাম সাহেবের মতে একটি অল্পবয়েসী মেয়ের ছায়া নাকি ঘুরে বেড়ায়। গভীর রাতে উঁ উঁ করে কাঁদে। রাতবিরাতে সাদা কাপড় পরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

নেজাম সাহেব লোকটি মহা চালবাজ। ছোট ছোট ধূর্ত চোখ। মাথা নিচু করে এমনভাবে হাঁটেন যে দেখলেই মনে হয় কিছু একটা মতলব আছে। এই লোকের কথা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ নেই, তবু আমি তাঁকে ডেকে পাঠালাম। গলার স্বর যতদূর সম্ভব গম্ভীর করে বললাম, কী সব আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছেন ?

নেজাম সাহেব এমন ভাব করলেন, যেন আমি একটি দারুণ অন্যায় কথা বলে ফেলেছি। মুখ কালো করে বললেন, আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছি ? আমি ? বলেন কী ভাইসাহেব ?

ভূত-প্রেতের কথা বলে বেড়াচ্ছেন লোকজনদের, বলছেন না ?

ভূত-প্রেতের কথা তো বলি নাই। বলেছি একটি মেয়ের ছায়া আছে এই বাড়িতে।

ছায়া আছে মানে ?

বাড়ির মধ্যে আপনার, ভাই, দোষ আছে।

বলতে বলতে নেজাম সাহেব এমন একটি ভঙ্গি করলেন, যেন চোখের সামনে ছায়াময়ী মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছেন।

বাড়ি-বন্ধনের ব্যবস্থা করা দরকার। বুঝলেন ভাই!

আমি কঠিন স্বরে বললাম, যা বলেছেন, বলেছেন! আর বলবেন না।

নেজাম সাহেবকে বিদায় করে ঘরে এসে বসতেই আমার নিজের খানিকটা ভয়-ভয় করতে লাগল। রান্নাঘরে কিসের যেন খটখট শব্দ হচ্ছে। বাথরুমের কলটি কি খোলা ছিল ? সরসর করে পানি পড়ছে। রান্নাঘরে কেউ যেন হাঁটছে। কাদের কি ফিরে এসেছে নাকি ? আমি উঁচু গলায় ডাকলাম, এই কাদের। এই কাদের মিয়া।

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সাড়া পাওয়ার কথাও নয়। কাদের গিয়েছে সিগারেট আনতে। রাস্তার ওপাশেই পান-বিড়ির দোকান, তবু তার ঘণ্টাখানিক লাগবে ফিরতে।

রান্নাঘরে আবার কী যেন একটি শব্দ হলো। তার পরপরই কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিক হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি বারান্দায় এসে দেখি ফকফকা জ্যোৎস্না উঠেছে। নিচতলার নীলু-বিলু দু'বোন ঘরের বাইরে মোড়া পেতে বসে আছে। নেজাম সাহেব উঠোনে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করে কী যেন বলছেন তাদের। আমাকে দেখে

কথাবার্তা থেমে গেল। নেজাম সাহেব তরল গলায় বললেন, কেমন চাঁদনি দেখছেন ভাই ? এর নাম সর্বনাশা চাঁদনি।

আমি জবাব দিলাম না। এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। নেজাম সাহেব গুনগুন করে বিলুকে কী যেন বললেন। বিলু হেসে উঠল খিলখিল করে। এরকম জ্যোৎস্নায় ভরা-বয়সের মেয়েদের খিলখিল হাসি শুনলে গা ঝিমঝিম করে। আমি নিজের ঘরে ফিরে কাদেরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রান্নাঘর থেকে আবার খটখট শব্দ উঠল। বিলু-নীলু দুজনেই আবার শব্দ করে হেসে উঠল। আমি ধরা গলায় ডাকলাম, কাদের, কাদের মিয়া।

কাদের ফিরল রাত দশটায়, এবং এমন ভাব করতে লাগল যেন এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দু'ঘণ্টা লাগাটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে গম্ভীর হয়ে হারিকেন ধরাল। তার চেয়েও গম্ভীর হয়ে বলল, অবস্থাডা খুব খারাপ ছোড ভাই।

আমি চুপ করে রইলাম। কথাবার্তা শুরু করলেই আমার রাগ পড়ে যাবে। সেটা হতে দেওয়া যায় না।

ছোড ভাই, দিন খারাপ।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, ভাত দে, কাদের।

আর ভাত! ভাত খাওনের দিন শেষ ছোড ভাই। মিত্যু সন্নিকট।

যে-কোনো গুরুগম্ভীর আলোচনায় কাদের মিয়া সাধু ভাষা ব্যবহার করে। এই অভ্যাস আগে ছিল না। নতুন হয়েছে।

সব্বমোট তের লাখ ছয়চল্লিশ হাজার পাঁচ শ' পাঞ্জাবি এখন ঢাকা শহরে বর্তমান। আরো আসতাছে।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, খাওয়া-দাওয়ার পর কাদেরকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলব, ভবিষ্যতে সে যদি ফিরতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় দু'ঘণ্টা দেরি করে, তাহলে তার আর ঘরে ফেরার প্রয়োজন নেই। বিসমিল্লাহ— বিদায়।

ভাত খাওয়ার সময় কাদের মিয়া আবার তার পাঞ্জাবি মিলিটারির গল্প ফাঁদতে চেষ্টা করল।

বাচ্চু ভাই দরবেশ কইছে এই দফায় বাঙালির কাম শেষ।

আমি জবাব দিলাম না। কাদেরের অভ্যাস হচ্ছে, যে-সব বিষয় আমি পছন্দ করি না, খাওয়ার সময় সেইসব বিষয়ের অবতারণা করা। গতরাত্রে খাওয়ার সময় সে তার মামাত ভাইয়ের গল্প শুরু করল। সেই মামাতো ভাইটিকে কে যেন খুন করে একটা গাবগাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। পনেরদিন পর সেই লাশ আবিষ্কার হলো। আমি যখন ভাতের সঙ্গে ডাল মাখছি, তখন কাদের মিয়া সেই পচাগলা লাশের একটি বীভৎস প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়ে ফেলল। খাওয়া বন্ধ করে বাথরুমে গিয়ে বমি করতে হলো

আমাকে। আজকেও যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয়, সে-জন্যে আমি কথা বলার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বললাম, বাচ্চু ভাই দরবেশটা কে ?

চায়ের দোকান আছে একটা। সুফি মানুষ। তাঁর চাচা হইলেন হযরত ফজলুল করিম নকশবন্দি।

নকশবন্দি জিনিসটা কী ?

পীর-ফকিরের নামের মইধ্যে থাকে ছোড ভাই।

নকশবন্দির ভাতিজার কাছে ভবিষ্যতে আর যেন না যাওয়া হয়।

কাদের মিয়া উত্তর দিল না। আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, এইসব লোকজন আমি মোটেই পছন্দ করি না।

দরবেশ বাচ্চু ভাই একজন বিশিষ্ট পীর।

পীর মানুষ চায়ের দোকান দিয়ে বসে আছে, এটা কেমন কথা ?

আমাদের নবী-এ করিম রসুলাল্লাহ্ নিজেও তো ব্যবসাপাতি করতেন ছোড ভাই।

আমি সরু চোখে তাকালাম কাদেরের দিকে। মুখে মুখে কথা বলার এই অভ্যাসও কাদেরের নতুন হয়েছে। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে কাদের।

কাদেরের সঙ্গে আমি তুই-তুই করে বলি। কোনো কারণে বিশেষ রেগে গেলেই শুধু তুমি সম্বোধন করি। কাদের তখন দারুণ নার্ভাস বোধ করে।

কী কথা ছোড ভাই ?

কী কথা বলবার আগেই নিচতলার তিন নম্বর ঘর থেকে কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল। আজ এক মাস ধরে এই বাড়ির মেয়েটি কাঁদছে। এপ্রিল মাসের তিন তারিখ জলিল সাহেব বাড়ি ফেরেননি। তাঁর স্ত্রী হয়তো রোজ আশা করে থাকে আজ ফিরবে। রাত এগারটা থেকে কারফিউ। এগারটা বেজে গেলে তার ফেরবার আশা থাকে না। মেয়েটি তখন কাঁদতে শুরু করে। মানুষের শোকের প্রকাশ এত শব্দময় কেন ? যে-মেয়েটির কোনো কথা কোনো দিন শুনিনি, গভীর রাতে তার কান্না শুনতে এমন অদ্ভুত লাগে!

ছোড ভাই, জলিল সাবের এক ভাই আসছে আইজ।

তবে যে শুনলাম জলিল সাহেবের কোনো ভাই নেই।

চাচাতো ভাই। মৌলানা মানুষ। বউ আর পুলাপানটিরে নিতে আইছে।

কবে নেবে ?

বউটা যাইতে চায় না।

কেন যেতে চায় না ?

কী জানি। মাইয়া মাইনসের কি বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে?

আমি চুপ করে রইলাম। কাদের মিয়া বলল, সময়ডা খুব খারাপ। কেয়ামত নজদিক।

ঘুমুতে গেলাম অনেক রাতে। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে কোথায়ও গুলির শব্দ শোনা গেল। গুলির শব্দ দিয়ে এখন আর ভয় দেখানোর প্রয়োজন নেই। তবু ওরা কেন রোজ গুলি ছোড়ে কে জানে!

কাদের আমার পাশের ঘরে শোয়। তার খুব সজাগ নিদ্রা। সামান্য খটখট শব্দেও জেগে উঠে বিকট হাঁক দেয়— 'কেডা, কেডা' শব্দ করে?

আজকেও গুলির শব্দে জেগে উঠল। ভীত স্বরে বলল, শুনতাছেন ছোড ভাই? কাম সাফ।

আমি জবাব দিলাম না। আমার সাড়া পেলেই ব্যাটা উঠে এসে এমন সব গল্প ফাঁদবে যে ঘুমের দফা সারা।

ছোড ভাই ঘুমাইছেন?

আমি গাঢ় ঘুমের ভান করলাম। লম্বা নিঃশ্বাস ফেললাম।

ছোড ভাই, ও ছোড ভাই।

কী?

মিত্যু সন্নিকট ছোড ভাই।

ঘুমা কাদের। বকবক করিস না।

আর ঘুম! বাঁচলে তো ঘুম। জীবনই নাই।

ঝামেলা করিস না কাদের, ঘুমা।

কাদের ঘুমায় না। বিড়ি ধরায়। বিড়ির কড়া গন্ধে বমি আসার যোগাড় হয়। চারদিক নীরব হয়ে যায়। জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্নাও আর শোনা যায় না। কিছুতেই ঘুম আসে না আমার। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করি। একবার বাথরুমে গিয়ে মাথা ধুয়ে এলাম। মাথার নিচে তিনটি বালিশ দিয়ে উঁচু করলাম। আবার বালিশ ছাড়া ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হয় না। এক সময় কাদের মিয়া বলল, ঘুম আসে না ছোড ভাই?

না।

আমারও না। বড় ভয় লাগে।

ভয়ের কিছু নাই কাদের।

তা ঠিক। মিত্যু হইল গিয়া কপালের লিখন। না যায় খণ্ডন।

কাদেরের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মিল আছে। সে আমার মতোই ভীরু এবং আমার মতো তারও কঠিন অনিদ্রা রোগ।

সাড়ে তিনটার দিকে ঘুমের আশা বাদ দিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। কাদের মিয়া চায়ের জন্য কেরোসিনের চুলা ধরাল। চুলাটাও সে নিয়ে এসেছে বারান্দায়। আমার দিকে পিঠ দিয়ে আবার বিড়ি ধরিয়েছে।

নিচতলায়ও কে একজন যেন সিগারেট ধরিয়েছে, বসে আছে জামগাছের নিচে— অন্ধকারে।

গাছতলায় ওটা কে বসে আছে, কাদের ?

কাদের কিছু না দেখেই বলল, নেজাম সাহেব।

বুঝলে কী করে নেজাম সাহেব ?

নেজাম সাহেবেরও রাইতে ঘুম হয় না।

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরে গেল। ঝিমুনির মধ্যে মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ভোরবেলা একজন ডাক্তারের কাছে যাব। রাতের পর রাত না ঘুমানোটা ভালো কথা নয়। বড় আপার বাসায় যেতে হবে। বড় আপা এর মধ্যে তিনবার খবর পাঠিয়েছে। জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। তারাও যদি সত্যি সত্যি চলে যায়, তাহলে ভাড়াটে দেখা দরকার। ভাড়াটে পাওয়া যাবে না, বলাই বাহুল্য। শহর ছেড়ে সবাই এখন যাচ্ছে গ্রামে। কিন্তু বড় আপা এইসব শুনবে না। তাঁর ধারণা— ঢাকা শহরের চার ভাগের এক ভাগ লোক থাকার জায়গা পাচ্ছে না। রাত দিন 'টু লেট' খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চা হয়েছে চমৎকার। চুমুক দিয়ে বেশ লাগল। চারদিকে সুনসান নীরবতা। চাঁদের ম্লান আলো। শীত শীত হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে দূরে কোথায়। মনটা হঠাৎ দারুণ খারাপ হয়ে গেল।

২

সকালবেলা নিচে নামতেই আজিজ সাহেবের সঙ্গে দেখা।

আজিজ সাহেব বিলু-নীলুর বাবা। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। চোখেও দেখতে পান না। পায়ের শব্দে মানুষ চিনতে পারেন। আমি পা ঘষটে ঘষটে বাড়ি ঢুকলেও তিনি চিকন সুরে ডাকেন— কে যায় ? শফিক না ?

আজিজ সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া একটা দুর্ঘটনা বিশেষ। দেখা হওয়ামাত্র তিনি বাড়ির কোনো একটি সমস্যার কথা তুলবেন—

> কল দিয়ে পানি লিক করছে।
>
> বসার ঘরে সুইচটা নষ্ট, হাত দিলেই শক করে।
>
> শোবার ঘরের একটা জানালার পুডিং উঠে গেছে, যে-কোনো সময় কাচ খুলে পড়বে।

যে-লোক চোখে দেখে না এবং সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে, সে এত সব লক্ষ

করে কী করে, সে এক রহস্য। বাড়ির প্রসঙ্গ শেষ হওয়ামাত্র তিনি রাজনীতি নিয়ে আসেন। তাঁর রাজনীতিরও কোনো আগামাথা নেই। একেক দিন একেক কথা বলেন। রাজনীতির পরে আসে স্বাস্থ্যবিধি। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাধির কোনো-না-কোনো টোটকা তাঁর জানা আছে। জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র ওষুধ যে রসুনের খোসা, সেটি তাঁর কাছ থেকেই আমার শোনা।

সকালবেলা তাঁকে ধরাধরি করে বারান্দার ইজিচেয়ারে শুইয়ে দেওয়া হয়। দুপুর পর্যন্ত অনবরত ভ্যাজর ভ্যাজর করতে থাকেন। তিনি বারান্দায় থাকলে আমি পারতপক্ষে নিচে নামি না। আজকেও তিনি বারান্দায় ছিলেন না। পায়ের শব্দ শুনে শোবার ঘর থেকে ডাক দিয়েছেন কে, শফিক না ? আস তো দেখি এদিকে। বাথরুমের ফ্লাশটা থেকে ঘসর ঘসর শব্দ হয়। পানির কোনো ফ্লো নাই।

আমি কাদেরকে বলব আজিজ সাহেব। সে মিস্ত্রি নিয়ে আসবে।

আস তো ভেতরে, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

আমার একটা জরুরি কাজ আছে, আজিজ সাহেব।

এক মিনিট বসে যাও। ও নীলু, চা দে তো।

আজিজ সাহেব, আমার এখন না গেলেই না।

চা খেতে আর কয় মিনিট লাগে ? নীলু, তাড়াতাড়ি চা দে।

বাধ্য হয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। আজিজ সাহেব ঘরে ঢোকামাত্র গলার স্বর নামিয়ে বললেন, কালকে রাতে কিছু শুনলে ?

গুলির কথা বলছেন ?

আহ্, আস্তে বলো। চারদিকে স্পাই। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছ ?

কিসের কথা বলছেন ?

আরে মিলিটারি তো সব কচুকাটা হয়ে গেল। আছ কোথায় তুমি ?

তাই নাকি ?

ভিক্ষা চাই না, মা, কুত্তা সামলা অবস্থা এখন। হা হা হা। মিলিটারিরা আর বড়জোর এক মাস আছে। বিশ্বেস না হয় লিখে রাখ। গুনে-গেঁথে ত্রিশদিন।

গণ্ডগোলের দিন থেকেই তিনি মিলিটারিকে হয় একমাস নয় পনেরদিন সময় দিচ্ছেন। তাঁর হিসাবে রোজ দু'থেকে তিন হাজার মিলিটারি খতম হয়ে যাচ্ছে। চিটাগাং এবং কুমিল্লা— এই দুই জায়গা থেকে টাইট দেওয়া হচ্ছে।

জিয়া সাহেব কি সহজ লোক ? বাঘের মামা টাগ। পাঞ্জাবি সব কাঁচা খেয়ে ফেলবে না ? তুমি ভাবছ কী ?

আজিজ সাহেব এমন মুখভঙ্গি করলেন, যেন পাঞ্জাবি মিলিটারিদের আমি লেলিয়ে দিয়েছি। আমি বিরস মুখে বললাম, আজিজ সাহেব, আজ উঠতে হয়। চা আজকে আর খাব না।

আহ্, বসো দেখি। এই নীলু, চা হয়েছে ?

নীলু সাড়াশব্দও করল না, চা নিয়েও এলো না। আজিজ সাহেব শুরু করলেন যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি। ওদের ভুল থেকে আমাদের কী কী শেখা উচিত ছিল, এবং না শেখাতে আমাদের কী হয়েছে এইসব। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পর নীলু এসে বলল, চা দেরি হবে। চিনি নেই। আনতে গেছে। তাকিয়ে দেখি, নীলু মুখ টিপে হাসছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বলল, সত্যি চিনি নেই। বিশ্বেস করুন।

ছাড়া পেলাম এগারটায়। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তখন। এই সময় মগবাজারে বড় আপার বাসায় যাবার কোনো অর্থ হয় না। প্রথমত, দুলাভাই বাসায় থাকবেন না। দ্বিতীয়ত, বৃষ্টিতে ভিজলে আমার টনসিল ফুলে ওঠে। সবচেয়ে ভালো হয় রফিকের বাসায় গিয়ে টেলিফোন করলে। কিন্তু তারও সমস্যা আছে। টেলিফোন রফিকদের শোবার ঘরে। টেলিফোন করতে গেলেই বাড়ির মেয়েরা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনতে চেষ্টা করে, কী কথাবার্তা হচ্ছে। এবং টেলিফোনের শেষে রফিকের মা প্রচুর চিনি দিয়ে হিমশীতল এক কাপ চা খেতে দেন। সেই চায়ে দুধের সর এবং কালো রঙের পিঁপড়ে ভাসতে থাকে।

শফিক সাহেব, আপনার সঙ্গে একটা কথা।

লোকটিকে চিনতে পারলাম না। লম্বা দাড়ি। হালকা নীল রঙের একটা লম্বা পাঞ্জাবি— ঝুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। গা থেকে আতরের গন্ধ আসছে।

আমি আব্দুল জলিলের বড় ভাই।

ও আচ্ছা। কেমন আছেন ?

আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। জলিলের বৌ আর বাচ্চাটারে নিতে আসছি। আমি থাকি চাঁদপুরে। মাস্টারি করি।

কিছু বলতে চান আমাকে ?

জি।

বলুন।

জনাব, আমি শুনলাম আপনি জলিলের খোঁজখবর করতেছেন।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বলে কী এই লোক। আমি খোঁজ করব কী ? আর খুঁজবই-বা কোথায় ?

আপনার অনেক জানাশোনা আছে। একটু যদি দয়া করেন।

ভদ্রলোক চোখ মুছতে লাগলেন। একজন বয়স্ক লোকের কান্নার মতো কুৎসিত আর কিছুই নেই। আমি ধমক দিয়ে কান্না থামাতে চাইলাম, কাঁদবেন না।

ঢাকা শহরে আমার চেনা-জানা কেউ নাই শফিক সাব।

দিনকাল খুব খারাপ এখন। চেনা-জানাতে কাজ হয় না।

তা ঠিক ভাই। খুব ঠিক। কী করব বলেন, মনটা পেরেশান।

মন পেরেশান করে তো লাভ নেই। মন শক্ত করেন।

চেষ্টা করি, খুব চেষ্টা করি। বিনা দোষে জেলখানাতে আছে মনে হইলেই মন কান্দে।

জেলখানাতে আছে, বলল কে ?

আপনার সাথে যে ছেলেটা থাকে, কাদের মিয়া— সে বলল। অতি ভালো ছেলে। বিশিষ্ট ভদ্রঘরের সন্তান। দুই-তিনবার খোঁজখবর নেয়। গতকাল এক দরবেশ সাহেবের তাবিজ এনে দিয়েছে। দরবেশ বাচ্চু ভাই। খুব বড় আলেম। নাম শুনেছেন বোধহয়।

আমি সাধ্যমতো খোঁজখবর নেব। তবে সময়টা খারাপ, ইচ্ছা থাকলেও কিছু করা যায় না। ও কী, আবার কাঁদেন কেন ?

আল্লাহ্‌পাক আপনার ভালো করবেন, শফিক ভাই।

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। রাস্তায় নেমে দু'টি জিনিস ঠিক করে ফেললাম। রফিকের বাসায় গিয়েই টেলিফোন করব, আর রফিককে জিজ্ঞেস করব লোকজন হারিয়ে গেলে কোথায় খোঁজ করতে হয়। রফিক অনেক খবরাখবর রাখে। সে কিছু একটা করবেই।

রফিক বাসায় ছিল না। তার ছোট ভাই গম্ভীর হয়ে বলল, টেলিফোন করতে এসেছেন ? আমাদের টেলিফোন নষ্ট।

রফিকের এই ভাইটিকে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। সব সময় চালিয়াতি ধরনের কথাবার্তা বলে।

আপনি কি বসবেন ? দাদা ঘণ্টাখানিকের মধ্যে ফিরবে।

তাহলে বসব। ওর সঙ্গে দরকার আছে আমার।

বসার ঘরের দরজা খুলে সে আমাকে নিয়ে বসাল। কালকে রাত্রে আপনি কি গুলির শব্দ শুনেছেন ?

আমি অম্লান বদনে মিথ্যা বললাম, না। কাল খুব ভালো ঘুম হয়েছে, কিছু টের পাইনি।

কালকে ভীষণ গুলি হয়েছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। কী জন্যে হয়েছে জানেন ?

না, আমি কী করে জানব ?

সে এমনভাবে তাকাল, যেন আমি একটি গরুবিশেষ।

আপনার কি কোনো কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না ?

না, তেমন করে না।

ও আচ্ছা।

ঘণ্টাখানিক বসে থেকেও রফিকের খোঁজ পাওয়া গেল না। সরভাসা চা খেলাম পরপর দু'কাপ। রফিকের মা-ও যথারীতি এক ফাঁকে এসে আহাজারি করে গেলেন।

রফিকটার পড়াশোনা হয় নাই কুসঙ্গে থাকার জন্য। যত ছোটলোকের সাথে তার খাতির। তুমি আবার কিছু মনে করো না বাবা। তোমাকে কিছু বলছি না।

না খালা, মনে করার কী আছে।

আমি আবার মনের মধ্যে যা আসে বলে ফেলি।

এইটাই ভালো। বলে ফেলাই ভালো।

ঘর থেকে বের হয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে দেখি রফিক আসছে হনহন করে। তার দু'হাতে দু'টি প্রকাণ্ড বাজারের ব্যাগ। নিখোঁজ লোকদের কোথায় খুঁজতে হবে জিজ্ঞেস করা মাত্রই সে বলল, লেকটার সামনে দাঁড়িয়ে থাক। আমি ব্যাগ দু'টি রেখে আসছি।

আমরা গেলাম জনাব ইজাবুদ্দিন সাহেবের বাড়ি। ইজাবুদ্দিন সাহেব শান্তি কমিটির একজন মেম্বার। হলুদ রঙের একটা দোতলা বাড়িতে থাকেন। বাড়ির নাম 'ভাই ভাই কুটির'। নেমপ্লেটে লেখা— এমএ (গোল্ড মেডালিস্ট) এলএলবি। রফিক বলল, লোকটার সবচেয়ে বড় গুণ হলো— বিরক্ত হয় না। সব সময় হাসিমুখ।

কথা খুবই ঠিক। ইজাবুদ্দিন সাহেব মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। খাতা বের করে নাম-ধাম লিখে রাখলেন এবং বললেন, মিলিটারি জেলে আছে কিনা সে-খবর তিনি দু'দিনের মধ্যে এনে দেবেন। যখন বেরিয়ে আসছি, তখন ইজাবুদ্দিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, আপনার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন তিনি। তাঁর বড় মেয়ের বিয়েতে আমি উপস্থিত ছিলাম। খাওয়াদাওয়া নিয়ে দারুন ঝামেলা হয়েছিল।

আমি বললাম, আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব।

না না, আপনার আসতে হবে না, আমি খবর দেব। বাড়ি আমি চিনি, কতবার গিয়েছি। শরিফ আদমি ছিলেন আপনার বাবা।

রফিককে ছেড়ে দিয়ে নিউমার্কেট পর্যন্ত চলে এলাম। হাঁটা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর। কিন্তু কোনো একটি বিচিত্র কারণে রিকশায় উঠলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস নিতে পারি না।

নিউমার্কেটের সামনে একটি প্রকাণ্ড মিলিটারি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। তিন-চারজন কালো পোশাক পরা মিলিটারি (নাকি মিলিশিয়া? কে যেন বলেছিল কালো পোশাকেরগুলি মিলিশিয়া— আরো ভয়ঙ্কর) জটলা পাকাচ্ছিল। সবার চেহারা দেখতে এক রকম। একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা চুরুট টানছে। এর চেহারা অদ্ভুত সুন্দর। পাতলা পাতলা ঠোঁট, টানা চোখ, রাজপুত্রের মতো চেহারা।

এরা দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেই এই দিক দিয়ে লোক চলাচল একেবারেই নেই। একজন বুড়ো মতো মানুষ শুধু একটি ওজনের যন্ত্র নিয়ে শুকনো মুখে বসেছিল। দু'টি মিলিটারি ওকে কী সব জিজ্ঞেস করে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। একজন আবার দেখি, ওজনের যন্ত্রটায় উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি বিনা দ্বিধায় ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। মিলিটারি আমাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে না। আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চায় না। ছাত্র না চাকরি করি, তাও জানতে চায় না। কারণ আমার ডান পাটি বাঁকা। আমি ডান দিকে ঝুঁকে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটি। লাঠি দিয়ে শরীরের ভার অনেকটা সামলাতে হয়। আমার দিকে ওদের কোনো আগ্রহ নেই।

শারীরিক অক্ষমতা যে এমন একটি সুখকর ব্যাপার হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমাকে দেখে রাজপুত্রের মতো সেই মিলিটারিটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, ভালো আছেন ?

ওজন-মাপা লোকটি অবাক হয়ে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি হাসিমুখে রাজপুত্রটিকে বললাম, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন তো ভাই ?

৩

বড় আপা আমাকে দেখেই বলল, তোর কথাই ভাবছিলাম।

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যা। কারো সঙ্গে দেখা হলেই সে এরকম বলে। তার ধারণা, এ ধরনের কথাবার্তায় খুব আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। তার আন্তরিকতা প্রকাশের আরেকটি কায়দা হচ্ছে, ভাত খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করা। বিকাল চারটার সময় গেলেও সে গলা সরু করে বলবে, আজরফ মিয়া, টেবিলে ভাত দাও তো। তরকারি গরম কর। লেবু কাট। আর দেখ কাঁচামরিচ আছে কিনা।

আজকে অবশ্যি সে-রকম হলো না। সে দেখলাম গম্ভীর হয়ে আছে। চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা। বলাই বাহুল্য দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি সহজভাবে বললাম, ব্যাপার কী ?

ব্যাপার-ট্যাপার কিছু না।

ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

নাহ্।

তুমি গম্ভীর হয়ে আছ।

শীলার জ্বর। তোর দুলাভাইকে বললাম ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। সে নেবে না। তার ধারণা, একটু গা গরম হলেই ডাক্তারের কাছে দৌড় দেওয়ার কোনো দরকার নেই।

জ্বর কি খুব বেশি ?

সকালবেলা ১০২ পয়েন্ট পাঁচ ছিল। এখন ৯৯।

ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিয়েই কি ঝগড়া ?

বললাম তো ঝগড়া কিছুই হয়নি। এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করিস।

বড় আপা কাঁদতে শুরু করল। কান্না তার একটি রোগবিশেষ। যে-কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে কেঁদে বুক ভাসাতে পারে। আমরা তার কান্নায় কখনো কোনো গুরুত্ব দিই না।

আপা কাঁদছ কেন ?

তোর দুলাভাই আমাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। শহরের অবস্থা নাকি খুব খারাপ।

তোমার কাছে খারাপ মনে হচ্ছে না ?

মনে হবে না কেন ? তবে তোর আমার জন্যে তো কিছু না। আমরা হিন্দুও না, আমরা আওয়ামী লীগও করি না। আমাদের আবার কিসের অসুবিধা ?

আমি চুপ করে রইলাম। বড় আপা থেমে থেমে বলতে লাগল, অবস্থা তো অনেক ভালো হয়েছে এখন। পরশুদিন আমি একা একা নিউমার্কেট থেকে বাজার করে আনলাম। আগে কার্ফু ছিল নয়টা থেকে, এখন দশটা থেকে। ঠিক না ? তুই বল ?

তা ঠিক।

তোর দুলাভাইয়ের ধারণা, গ্রামে গেলে আর কোনো ভয় নেই। এইখানে ভয়টা কিসের ? পত্রিকায় দিয়েছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স পরীক্ষার ডেট দিয়েছে। অবস্থা খারাপ হলে দিত ?

পরীক্ষার ডেট দিয়েছে নাকি ?

হুঁ, দৈনিক পাকিস্তানে আছে। দাঁড়া, নিয়ে আসছি, নিজের চোখে দেখ।

থাক আপা, আনতে হবে না।

না, তুই দেখে যা।

সারাটা দিন বড় আপার বাসায় কাটাতে হলো। দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা না করে আসা ভালো দেখায় না। তিনি ফিরবেন ছ'টার দিকে। এত দীর্ঘ সময় বড় আপার সঙ্গে কাটানো একটি ক্লান্তিকর ব্যাপার। এক গল্পই তার কাছে অনেকবার শুনতে হয়। আজরফ কী করে কাপড়-ধোওয়া সাবান দিয়ে ধুয়ে তার একটি বেনারসি শাড়ি নষ্ট করেছে, সে-গল্প আমাকে চতুর্থবারের মতো শুনতে হলো। তারপর শুরু করল দুলাভাইয়ের এক বোনের গল্প। সেই বোনটি বিয়ের পর তার স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে কী সব নটঘট করতে শুরু করেছে। এই গল্পটিও আগে শোনা।

আমি হাই তুলে বললাম, শীলা কোথায় আপা ?

ওর বান্ধবী এসেছে।

যাই, দেখা দিয়ে আসি।

দরজা বন্ধ করে রেখেছে ওরা।

তাই নাকি ?

হুঁ।

দরজা বন্ধ করার ব্যাপার নিয়েও বড় আপা গজগজ করতে লাগলেন।

দরজা বন্ধ করে কথা বলার দরকারটা কী ? এইসব আমি পছন্দ করি না। মেয়েরা দরজা বন্ধ করলেই তাদের মাথায় আজেবাজে সব খেয়াল আসে।

শীলার বয়স এমন কিছু নয়। তের হয়েছে। বড় আপা বলেন সাড়ে এগার। অবশ্যি শীলাকে বেশ বড়সড়ো দেখায়। এই তের বছর বয়সেই সে গোটা চারেক প্রেমপত্র পেয়েছে। এর মধ্যে একটি সে আমাকে দেখিয়েছে (আমার সঙ্গে তার বেশ ভাব আছে)। সেই চিঠিটি এতই কুৎসিত যে পড়া শেষ করে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। আমি যখন বললাম, এই চিঠি তুই জমা করে রেখেছিস ? ছিঁড়ে ফেলে দিস না কেন ?

শীলা অবাক হয়ে বলেছে, আমার কাছে লেখা চিঠি আমি ফেলব কেন ? জানো, লুনা একুশটা চিঠি পেয়েছে ? এর মধ্যে একটা আছে ষোল পাতার।

কী আছে সেই ষোল পাতার চিঠিতে ?

তোমাকে বলা যাবে না।

লুনা মেয়েটিই আজকে এসেছে। বড় আপা একে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। প্রধান কারণ হচ্ছে, মেয়েটি অসামান্য রূপসী। আমার ধারণা, এই মেয়েটির দিকে তাকালে যে-কোনো পুরুষের মনে তীব্র ব্যথাবোধ হয়। বড় আপা মুখ লম্বা করে বললেন, লুনার সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়েদের মিশতে দেয়া উচিত না।

আমি বলব না বলব না করেও বললাম, লুনাও তো অল্পবয়সী।

বড় আপা আকাশ থেকে পড়ল, অল্প বয়স কোথায় দেখলি তুই! দুই বছর আগে থেকে ব্রা পরে এই মেয়ে।

বিকালে চা দিতে এসে আজরফ গম্ভীর মুখে বলল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মিলিটারি জিপ।

আপা এটা শুনেই রেগে গেল। মিলিটারি জিপ হয়েছে তো কী হয়েছে ? মিলিটারি তোকে খেয়ে ফেলেছে ? গরু কোথাকার! যা আমার সামনে থেকে।

আজরফ সামনে থেকে নড়ল না। মুখ আগের চেয়েও গম্ভীর করে চা ঢালতে লাগল। আপা থমথমে গলায় বলল, মিলিটারি জিপ দেখেছিস, দেখেছিস। এর মধ্যে গল্প করার কী আছে ? খবরদার, এইসব নিয়ে গল্পগুজব করবি না। আমি পছন্দ করি না।

আম্মা, জিপটার লক্ষণ ভালা না। এক জায়গার মধ্যে ঘুরাঘুরি করতাছে।

করুক। তারা তাদের কাজ করবে, তুই করবি তোর।

আইচ্ছা।

খবরদার, মিলিটারি নিয়ে আর কোনো কথা বলবি না।

আইচ্ছা।

আপার বক্তৃতা আজরফের মনে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। কারণ খানিকক্ষণ পর শীলা এসে বলল, আজরফ ভাই বলল রাস্তার মোড়ে একটা জিপ ঘোরাঘুরি করছে।

করুক, তাতে তোমার কী ?

ওরা অল্পবয়সী মেয়েদের ধরে নিয়ে নেংটা করে একটা ঘরের মধ্যে রেখে দেয়।

বড় আপা স্তম্ভিত হয়ে বলল, কে বলেছে এইসব ?

লুনা। লুনা বলল।

যাও, নিজের ঘরে যাও। যত আজগুবি কথাবার্তা। বলতে লজ্জাও করে না!

লজ্জা করবে কী জন্যে ? আমাকে তো আর নেংটো করে রাখেনি। শীলা ফিক করে হেসে ফেলল।

যাও, ঘরে যাও। তোমার বন্ধু যাবে কখন ?

ও আজ থাকবে আমার সঙ্গে। বাসায় টেলিফোন করে দিয়েছি। মা, তুমি কিন্তু খিচুড়ি করবে রাতে। আমার এখন জ্বর নেই।

ঠিক আছে, তুমি যাও। আজরফকে পাঠিয়ে দিও।

আপা দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারল না। আজরফ যখন দ্বিতীয়বার চা দিতে এলো তখন শুধু গম্ভীর হয়ে বলল, আজরফ, তোমার চাকরি শেষ। কাল সকাল ন'টায় বেতনটেতন বুঝে নিয়ে বাড়ি যাবে।

জি আচ্ছা, আম্মা।

আজরফকে মোটেই বিচলিত মনে হলো না। দিনের মধ্যে কয়েকবার যার চাকরি চলে যায়, তাকে চাকরি নিয়ে বিচলিত হলে চলে না।

দুলাভাই ঠিক ছ'টার সময় এলেন।

তাঁর সব কাজ ঘড়ি ধরা, সময় নিয়ে খানিকটা বাতিকের মতো আছে। পাঁচটায় কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে চারটা পঞ্চাশে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং ঠিক পাঁচটায় ঢুকবেন। অফিসের লোকরা তাঁকে 'ঘড়িবাবু' বলে।

দুলাভাই আমাকে দেখেই বললেন, তিন ঠ্যাং-এর শালা বাবু যে ? কী হেতু আগমন ?

পা নিয়ে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু দুলাভাইয়ের উপর আমি কখনো রাগ করতে পারি না। এই লোকটিকে আমি খুবই পছন্দ করি।

আছ কেমন, শালা বাবু ?

আমি হাসিমুখে বললাম, ভালো আছি দুলাভাই।

তোমার তিন নম্বর ঠ্যাংটা সাবধানে রাখছ তো ? খানায় পড়ার সম্ভাবনা। হা-হা-হা।

সাবধানেই রাখছি। আমাকেও হাসির ভান করতে হয়।

শুনেছ নাকি, ওদের নীলগঞ্জে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শুনেছি।

তোমার আপার ধারণা, সে বনবাসে যাচ্ছে। তবে যে-পরিমাণ কান্নাকাটি করছে, সীতাও তার বনবাসে এত কাঁদেনি।

সীতার সঙ্গে তো রাম ছিল। কিন্তু আপনি তো যাচ্ছেন না।

আমিও যাব। ব্যাক টু দা ফরেস্ট। তবে কিছুদিন পর। তুমিও চল।

না দুলাভাই। এখানে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

তা ঠিক। ঢাকা শহরে কানা-খোঁড়া-অন্ধ এরা বর্তমানে খুব নিরাপদ। হা-হা-হা।

আমি চুপ করে রইলাম।

রাগ করলে নাকি শফিক ?

জি-না।

ঠাট্টা করে বলি।

ঠিক আছে।

বড় আপা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, চা খাবি আরেকবার ?

দুলাভাই বললেন, আমি খাব। আমাকে এক কাপ লেবু চা দাও।

বড় আপা কথা না বলে চলে গেলেন। দুলাভাই ক্লান্ত স্বরে বললেন, তোমার একজন ভাড়াটে যে নিখোঁজ হয়েছিল, কী নাম যেন তার ?

আব্দুল জলিল।

ও হ্যাঁ, জলিল। কোনো খোঁজ হয়েছে ?

এখনো হয়নি। রফিককে নিয়ে চেষ্টা করছি।

তুমি খোঁজাখুঁজির মধ্যে যাবে না। কোনোক্রমেই না। সময় ভালো না এখন। প্রায়ই লোকজন ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

করছে কী ওদের ?

কিছু দিন রেখে ছেড়ে দিচ্ছে সম্ভবত। মানুষ মারা তো খুব কঠিন ব্যাপার।

ধরাধরিটাই-বা করছে কী জন্যে ?

মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। ভয় ধরানোর এটা খুব ইফেকটিভ ব্যবস্থা। একজন নিখোঁজ হলে পাঁচ হাজার লোক সেটা জানে। সবাই খোঁজাখুঁজি করে।

বড় আপা থমথমে মুখে চা নিয়ে ঢুকল। ওর বুদ্ধিসুদ্ধি সত্যি কম। চা এনেছে শুধু আমার জন্যে, দুলাভাইয়ের জন্যে নয়। তিনি একটু হাসলেন এবং হাসিমুখেই বললেন, শীলার জ্বর কমেছে ? লুনাকে দেখলাম ওর ঘরে।

আপা জবাব দিল না।

ও কি আজকে থাকবে ? এই সময় কেউ মেয়েদের বাইরে পাঠায় ? কী আশ্চর্য!

আপা তারও জবাব দিল না।

আমি বললাম, মেয়েটি আজকে থাকবে দুলাভাই। শীলা ওর বাসায় টেলিফোন করে দিয়েছে।

মেয়েটিকে তুমি দেখেছ শফিক ?

দেখেছি।

ওর চেয়ে সুন্দর মেয়ে তুমি দেখেছ ?

আমি ইতস্তত করে বললাম, না।

আমি কিন্তু দেখেছি। ঢাকা কলেজে তখন পড়ি। বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে করে যাচ্ছি দিনাজপুরে। ময়মনসিংহ স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখি, একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে প্লাটফরমে টিনের একটা ট্রাঙ্কে বসে আছে। খুবই গরিব ঘরের মেয়ে। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল।

আপা রাগী গলায় বলে উঠলেন, লুনার মধ্যে তুমি সুন্দরের কী দেখলে, সমস্ত মুখ ভর্তি নাক।

লুনার কথা তো আমি বলছি না। যার কথা আমি বলছি, তার নামধাম কিছুই জানি না।

আপা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দুলাভাই হাসতে লাগলেন ঘর ফাটিয়ে।

আমি বললাম, ওদের কবে পাঠাচ্ছেন ?

এই মাসেই পাঠাব। আমি নিজেও চলে যেতে পারি। রাতে আমার ভালো ঘুম হয় না। আরাম করে ঘুমোতে ইচ্ছা করে।

দুলাভাই গাড়ি করে আমাকে পৌঁছে দিতে রওনা হলেন। সাতটা মাত্র বাজে, এর মধ্যেই দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে লোক-চলাচল নেই। কেমন খাঁখাঁ করছে চারদিক। এত বড় একটা শহর ঝিম মেরে গিয়েছে।

দুলাভাই বললেন, সন্ধ্যার পর চলাফেরা করা ঠিক না।

দুলাভাই, আপনার কি ভয় লাগছে ?

না, ভয় লাগে না। অন্যরকম লাগে। আমার কাছে টিক্কা খানের সই করা পাশ আছে, আমাকে কেউ ধরবে না।

গাড়ি সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছাকাছি আসতেই দেখি রোড ব্লক দিয়ে তিন-চারজন সেপাই দাঁড়িয়ে। ওরা গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে কী-সব দেখছে। একটি কালো

ভকস ওয়াগনকে দেখলাম রাস্তার পাশে। রোগামতো একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে। একজন সেপাই কী-সব যেন জিজ্ঞেস করছে। দুলাভাই শুকনো গলায় বললেন, তুমি চুপচাপ থাকবে। কথাবার্তা যা বলবার আমি বলব।

ওরা আমাদের গাড়ি থামাল না। হাত ইশারা করে চলে যেতে বলল। তাকিয়ে দেখি দুলাভাইয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

গেটের সামনে গাড়ি থামতেই জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্না শোনা গেল। আজ সকাল-সকাল কান্না শুরু হয়েছে। দুলাভাই ভীত স্বরে বললেন, কাঁদে কে ?

জলিল সাহেবের বউ।

রোজ এরকম কাঁদে ?

হ্যাঁ।

শফিক...

জি।

তুমি খোঁজখবরের মধ্যে যাবে না। সময়টা খারাপ...। দুলাভাই কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন।

আসেন, উপরে যাই। চা খেয়ে যান।

না থাক। দেরি হয়ে যাবে।

দেরি হবে না।

না থাক।

দুলাভাই 'না' বলেও গাড়ি থেকে নেমে আমার সঙ্গে উপরে উঠতে লাগলেন।

শফিক, আমিও নীলগঞ্জে চলে যাব।

ভালোই হবে।

আমার ভালো লাগছে না। বড়ই দুঃসময়।

৪

বিকালবেলা চুপচাপ ঘরে বসে আছি, কিছুই ভালো লাগছে না। সম্ভবত জ্বর আসছে। নিঃসন্দেহ হবার উপায় হচ্ছে সিগারেট ধরানো। দু'টি টান দিয়ে যদি ছুড়ে ফেলতে ইচ্ছা হয়, তাহলে নির্ঘাত জ্বর আসছে। পরীক্ষাটা করবার উপায় নেই। সিগারেট ফুরিয়েছে। কাদের মিয়া আনতে গিয়েছে। কখন ফিরবে কে জানে!

আমি একটি চাদর গায়ে দিয়ে বারান্দায় বসলাম। বিলু এলো সেই সময়। এই মেয়েটি নিঃশব্দে চলাফেরা করে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসার কোনো শব্দ আমি শুনিনি।

কী ব্যাপার বিলু ?

আপনাকে বাবা ডাকছেন।

আমি তো যেতে পারব না, আমার জ্বর।

আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বিলু বলল, কই দেখি ? বলেই সে হাত রাখল আমার কপালে। আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

জ্বর কোথায়। আপনার শরীর নদীর মতো ঠান্ডা।

নিজেকে সামলে নিয়ে সহজভাবে বলতে চেষ্টা করলাম, কী জন্যে ডাকছেন আমাকে ?

কী জন্যে তা আমি কী করে বলব ?

বিলু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। এই মেয়েটি খুব অদ্ভুত। এমনি আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ-হুঁ করে জবাব দেয়। আবার কখনো আপনা থেকেই অনেক কথা বলে।

আজকে আমাদের ক্লাসে কী হয়েছে জানেন ? নাজমা নামের একটা মেয়ে ফ্লাস্কে করে দুধ নিয়ে এসেছে, টিফিনের সময় খাবে। সেই দুধ আমরা ক্লাসের মধ্যে ঢেলে ফেললাম। তারপর কী হয়েছে জানেন ?

না।

আমাদের কেমিস্ট্রির স্যার এসে বললেন— এই...

বিলুর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, সে কোনো কথা শেষ করবে না। হঠাৎ কথা থামিয়ে বলবে, সর্বনাশ, চুলায় গরম পানি দিয়ে এসেছি, মনেই ছিল না। আমি যাই।

তোমাদের সেই কেমিস্ট্রি স্যার দুধ দেখে কী বললেন ?

সে চোখ কপালে তুলে বলবে, ধুর, এইসব শুনে কী করবেন ?

বেশ লাগে আমার বিলুকে।

একটি গরম সোয়েটার গায়ে দিয়ে নামছি, হঠাৎ বিলু নিচু গলায় বলল, আমাদের বাসায় দেখবেন একটি লোক বসে আছে। ওর সঙ্গে নীলু আপার বিয়ে হবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তাই নাকি ?

হুঁ।

কবে হচ্ছে বিয়েটা ?

খুব শিগগির।

বিলু দেখলাম বেশ গম্ভীর। যেন এই বিয়ের ব্যাপারটি তার ভালো লাগছে না।

আমি বললাম, তোমার মনে হচ্ছে মন খারাপ ?

না, মনে খারাপ হবে কেন ? আপনি কী-যে পাগলের মতো কথা বলেন! খুব রাগ লাগে।

আমি ঘরে ঢুকে দেখি আজিজ সাহেবের সামনে একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রলোকের মাথাভর্তি টাক। একটা রুমাল দিয়ে তিনি ক্রমাগত মাথার টাক মুছছেন।

আজিজ সাহেব বললেন, এই যে শফিক, আস আস। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, এ হচ্ছে মতিনউদ্দিন। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। আমেরিকার নর্থ ডাকোটাতে ছিল অনেক দিন। গত সপ্তাহে হঠাৎ এসে হাজির। দেখ না কাণ্ড! মতিনউদ্দিন— এ হচ্ছে আমাদের বাড়িওয়ালা, তবে আত্মীয়ের চেয়েও বেশি।

ভদ্রলোক মিহি সুরে বললেন, আপনার কথা অনেক শুনেছি।

আমি বড়ই অবাক হলাম। আমার কথা অনেক শোনার কোনো কারণ নেই। ভদ্রলোক বিদেশ থেকে ফিরে আজই হয়তো প্রথম এখানে এসেছেন। এই সময়ের মধ্যে আমার কথা শুনে ফেলবেন, সেটা ঠিক বিশ্বাস্য নয়।

আমি হাসিমুখে বললাম, কার কাছ থেকে শুনলেন ?

নীলু বলল।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম নীলুর দিকে। নীলুর এমন একজন বয়স্ক মোটাসোটা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে, তা ঠিক কল্পনা করা যায় না। নীলু রূপসী এবং অহঙ্কারী। এই জাতীয় মেয়েরা মোটাসোটা টাকওয়ালা লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না। ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে বললেন, আপনি নাকি একবার একটা কাক পুষেছিলেন ? কাকটার নাম ছিল সম্রাট কনিষ্ক।

আমাকে মানতেই হলো ভদ্রলোক আমার কথা আগেই শুনেছেন। প্রথম দিনই কেউ আমার কাক পোষার কথা জানবে, তা বিশ্বাস করা কষ্টকর।

নীলু আমাকে সব কিছু লিখত চিঠিতে।

আমি ভালোভাবে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। তাঁর চোখে-মুখে এমন একটি ছেলেমানুষী ভাব আছে, যা ছেলেমানুষদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে বললেন, কাকটা নাকি রাত-দিন আপনার পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করত। সত্যি ?

আমার কাক পোষার ব্যাপারটির মধ্যে এতটা অতিরঞ্জন আছে, তা জানা ছিল না। ঘটনাটি খুলে বলা যাক।

কাকটির সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই আকস্মিক। একদিন সকালে নাশতা খাবার সময় সে রেলিংয়ের উপর এসে বসল। আমি যথারীতি একটি রুটির টুকরো ছুড়ে দিলাম। সে রুটির টুকরোটি স্পর্শও করল না। ঘাড় বাঁকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় ডাকল কা-কা। খাবার স্পর্শ করে না, এই জাতীয় কাক আমি আগে দেখিনি। কাজেই অবাক হয়ে আরো কয়েক টুকরো রুটি ছুড়ে দিলাম। সে যেন আমাকে খুশি করবার জন্যেই একটি টুকরো উঠিয়ে আবার সন্ন্যাসীর মতো বসে থাকল বারান্দায়। সেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। শেষের দিকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকত

রেলিং-এ। আমাকে দেখতে পেলেই গম্ভীর গলায় ডাকত কা-কা। আমাদের মধ্যে কথাবার্তাও হতো। যেমন আমি যদি বলতাম, কী হে কনিষ্ক, শরীর ভালো তো ?

কা-কা।

তাঁর মানে ভালো নেই।

হুঁ। হয়েছেটা কী ?

কা কা কা। (গম্ভীর আওয়াজ)

কাদের মিয়ার এই কাক নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তার ধারণা, এটা একটা অলক্ষণ। সে ঝাঁটা নিয়ে অনেকবার তাড়াতে চেষ্টা করেছে। লাভ হয়নি। ছাব্বিশে মার্চের পর এই কাকটিকে আর দেখা যায়নি। কোথায় গিয়েছে কে জানে ?

মতিনউদ্দিন সাহেব বললেন, কাকটির নাম কনিষ্ক রাখলেন কেন ? কনিষ্ক মানে কী ?

কনিষ্ক হচ্ছে কুষাণ বংশের একজন সম্রাট। ভারতে রাজত্ব করে গেছেন আনুমানিক ১০০ খ্রিষ্টাব্দে।

মতিনউদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, নীলু ঠিকই বলেছে, আপনি ভাই অদ্ভুত লোক।

নীলু রেগে গিয়ে বলল, আমি আবার কখন এইসব বললাম ?

মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দুপুরে আমাকে ভাত খেতে হলো। অন্যের বাড়িতে ভাত খেতে ভালো লাগে না। বড়ই অস্বস্তি বোধ হয়। সেখানে ভাত মাখাতে হয় ভদ্রভাবে। লক্ষ রাখতে হয় ঠোঁটে ভাত লেগে আছে কিনা। হাত দিয়ে লবণ না নিয়ে চামচ দিয়ে নিতে হয়। সেই চামচটি আবার ধরতে হয় বাঁ হাতে। আমি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অন্যের বাড়িতে খেতে বসি না। এখানেও নিতান্ত বাধ্য হয়ে বসতেই হলো। যখন নীলুর মতো একটা মেয়ে নরম স্বরে বলে, আপনি না খেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। আমি রান্না করেছি আপনার জন্যেই।— তখন অবাক হয়ে খেতে বসতেই হয়।

নীলু আমার সঙ্গে কথাটথা বিশেষ বলে না। মাসের প্রথম দিকে বাড়িভাড়ার টাকাটা খামে ভরে দিতে এসে টেনে টেনে বলে, টাকাটা গুনে নিন।

আমি সব সময়ই বলি, গুনতে হবে না, ঠিক আছে।

সে ঠান্ডা স্বরে বলে, না, গুনে নিন।

আমাকে চোখ-মুখ লাল করে টাকা গুনতে হয়। রূপসী একটা মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে টাকা গোনা বিড়ম্বনা বিশেষ। এক সময় সে বলে, ঠিক আছে তো ?

ঠিক আছে।

মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে ভাত খেতে খেতে মনে পড়ল— এবার নীলু ভাড়া দিতে এসে টাকা গুনে নেবার কথা বলেনি। আমি যখন নিজ থেকে গুনতে যাচ্ছি,

তখন বলেছে, শফিক সাহেব, আপনার যদি অস্বস্তি লাগে, তাহলে থাক— শুনতে হবে না। আমি শুনে এনেছি।

অন্যবারের মতো টাকাটা দিয়েই নিচে নেমে যায়নি, হঠাৎ করে বলেছে, আপনার বন্ধু কনিষ্কের কোনো খোঁজ পেলেন ?

না, এখনো পাইনি।

আমার মনে হয়, সে মনের দুঃখে বিবাগী হয়েছে।

নীলু খিলখিল করে হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি খুব সুখে আছেন শফিক সাহেব। কাজটাজ কিছু করতে হয় না। বাড়িভাড়া নেন, আর ঘুরে বেড়ান।

আমি উত্তর দিলাম না। সে দেখলাম খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করেন।

তাই নাকি ?

তাঁর ধারণা, আপনার মতো ভালো ছেলে খুব কম জন্মায়।

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, উনি আমার পা দেখতে পান না তো, তাই বলেন।

এরপর কথা আর এগোয়নি। নীলু মুখ কালো করে নিচে নেমে গেছে। আমি নিজেও ভেবে পাইনি, হঠাৎ এই প্রসঙ্গ কেন তুললাম। না ভেবেচিন্তে মানুষ অনেক কিছুই বলে। আর বলে বলেই আমরা ভালো মানুষ আর মন্দ মানুষকে আলাদা করতে পারি। এই যেমন আজ মতিনউদ্দিন সাহেব ভাত মাখতে মাখতে বললেন, মিলিটারিগুলি দেখতে বেশ লাগে। কেমন স্মার্ট।

ভদ্রলোকের এই কথা থেকেই বোঝা যায়, এর মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। এখনো মিলিটারি দেখে যে মুগ্ধ হয় সে কিছু পরিমাণে ছেলেমানুষ। স্বামী হিসেবে এ ধরনের মানুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে যাচ্ছি, তখন কাদের এসে উপস্থিত। সে আমাকে এক কোনায় নিয়ে চোখ ছোট করে বলল, ছোড ভাই, রোজ কেয়ামত।

কী হয়েছে ?

রফিক সাহেবের ছোড ভাইয়ের খেল খতম।

কী বলিস!

কোনো খোঁজ নাই। তার মা ফিট হয় আর উঠে, আবার ফিট হয়।

আমি ভালোমতো বিদায় না নিয়েই গেলাম রফিকের বাসায়। বাসায় দেখি অনেক লোকজনের ভিড়। একটি ছোটমতো নীল রঙের গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢুকে দেখি রফিকের ছোট ভাই বসার ঘরে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তাকে ঘিরে বহু লোকজন।

রফিক আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলো, খবর পেলি কার কাছে ?

হয়েছেটা কী ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

শুনিসনি কিছু ?

না।

কাল বিকালে বাইরে গিয়েছিল। সারা রাত আর ফেরে নি। আমাদের অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছিস। মা রাতে তিনবার ফিট হয়েছে।

গিয়েছিল কোথায় ?

ওর এক বন্ধুর বাড়ি। দেরি হয়েছিল বলে ওরা আর আসতে দেয়নি। বুঝে দেখ আমাদের অবস্থা।

রফিকের বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দেখি আরো লোকজন আসছে। ঢাকা শহরের সব লোকজন কি জেনে গেছে নাকি— রফিকের ছোট ভাই কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি ?

ঘরে ফিরে দেখি মতিনউদ্দিন সাহেব দোতলার বারান্দায় বসে সিগারেট টানছেন। জুতো-টুতো খুলে পা তুলে বসেছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, সিগারেট খাবার জন্যে আসলাম। মুরুব্বিদের সামনে তো আর খাওয়া যায় না। কী বলেন ?

তা তো ঠিকই। চা খাবেন ?

তা বেশ তো। চা খেলে তো ভালোই হয়। অসুবিধা তো কিছু দেখছি না।

লোকটির মাথায় কি ছিট আছে ? আমি আড়চোখে তাকালাম তাঁর দিকে। কেমন নিশ্চিন্তে পা তুলে বসে আছেন। কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই।

শফিক ভাই, আমি বসে বসে এতক্ষণ আপনার কাকটার কথা ভাবছিলাম, যার নাম রেখেছিলেন কনিষ্ক।

কী ভাবছিলেন ?

না, বলা ঠিক হবে না আপনাকে।

আমি আচমকা বললাম, আমেরিকায় কী করতেন আপনি ?

পড়াশোনা। পিএইচডি করেছি এগ্রনমিতে।

আমি অবাক হয়েই তাকালাম। কে বলবে এই লোকটির একটি পিএইচডি ডিগ্রি আছে ? কেমন নির্বোধ চোখ। ঢিলাঢালা ভাবভঙ্গি। মতিনউদ্দিন সাহেব বিকাল পর্যন্ত আমার বারান্দায় বসে রইলেন। সন্ধ্যার আগে আগে তাঁকে নিতে তাঁর বড় ভাই আসবেন গাড়ি নিয়ে। তিনি গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। বিলু একবার এসে বলল নিচে যেতে। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, বারান্দায় বেশ বাতাস, তিনি বাতাস ছেড়ে নিচে যেতে চান না। বিলুকে এইটুকু বলতেই তাঁর কান-টান লাল হয়ে একাকার হলো।

সন্ধ্যাবেলা কোনো গাড়ি এলো না। শোনা গেল, ঝিকাতলা এলাকায় কী-একটা ঝামেলা হয়েছে। ঝিকাতলা থেকে ধানমণ্ডি পনের নম্বর পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি নাকি সার্চ

করা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে একটা জিপে মাইক লাগিয়ে বলা হলো, এই অঞ্চলে পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরই কারেন্ট চলে গেল। কাদের হারিকেন জ্বালিয়ে আবার নিভিয়ে ফেলল। মিলিটারি সার্চের সময় অন্ধকার থাকাই নাকি ভালো। এতে তারা মনে করে, বাড়িতে লোকজন নেই। মতিনউদ্দিন সাহেব একেবারেই চুপ হয়ে গেলেন। বিলু যখন এসে বলল— খাবার দেওয়া হয়েছে, তিনি বললেন— তাঁর একেবারেই খিদে নেই।

গভীর রাত পর্যন্ত আমি এবং মতিনউদ্দিন সাহেব অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ বসে রইলাম, রাত একটায় বাসার সামনে দিয়ে একটি খোলা জিপ গেল। সেই জিপটিই আবার রাত দেড়টার দিকে ফিরে গেল।

আমি বললাম, ঘুমোবেন নাকি মতিন সাহেব ? কাদের জায়গা করেছে।

মতিন সাহেব শুকনো গলায় বললেন, না, ঘুম আসছে না।

আমি বললাম, ভয় লাগছে না ?

জি-না। বড্ড মশা।

মতিন সাহেব সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ বললেন, এটা বাংলা কোন মাস ?

তাঁর কথার জবাব দেবার আগেই জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্না শোনা গেল।

কে কাঁদে ?

জলিল সাহেবের স্ত্রী। ওর স্বামীর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

কী সর্বনাশ, বলেন কী আপনি!

মতিন সাহেব এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, যেন এরকম ভয়াবহ কথা এর আগে শোনেননি। সেই খোলা জিপটা এসে থামল বাসার গেটের কাছে। কাদের ফিসফিস করে বলল, দোয়া ইউনুস পড়েন ছোড ভাই। ভয়ের কিছু নাই।

দোয়া ইউনুস কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। কাদের মতিন সাহেবের শার্ট টেনে চাপা স্বরে বলল, সিগারেট ফেলেন। আগুন দূর থাইক্যা দেখা যায়।

গাড়িটি এইখানে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ? না, চলতে শুরু করেছে। এই তো যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। আমার দোয়া ইউনুস মনে পড়ল। লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যোয়ালেমিন।

৫

জলিল সাহেবের ভাই এখনো দেশে ফেরেননি।

সমগ্র ঢাকা শহর চষে বেড়াচ্ছেন। কীভাবে-কীভাবে যেন একজন কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত দিয়ে এসেছেন। দৈনিক পাকিস্তানে 'সন্ধান চাই'— এই শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং সন্ধানদাতাকে নগদ পাঁচশ' টাকা পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন।

পুরস্কার ঘোষণা কাজে দিয়েছে বলা যেতে পারে। কালো মতো লম্বা এক লোক এসে হাজির। তার চোখে নিকেলের চশমা, নিচের পাটির একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। জলিল সাহেবের ভাই লোকটিকে আমার কাছে এনে হাজির করলেন। লোকটির বক্তব্য, বিজ্ঞাপনের বর্ণনা মতো একজন লোক মিরপুর বারো নম্বরে আটক আছে। তাকে ছাড়িয়ে আনা যাবে না, তবে এক হাজার টাকা দিলে সে দেখা করিয়ে দিতে পারে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললাম, আপনি নিজে দেখেছেন ?

জি জনাব। নিজে না দেখলে বলি কেন ? তবে আগের মতো নাই, অনেক রোগা হয়ে গেছেন।

আপনি দেখলেন কীভাবে ? মিরপুর বারো নম্বরে আপনি কী করেন ?

আমার চেনাজানা লোক আছে।

বাড়ি কোথায় আপনার ?

বাড়ি দিয়ে আপনার দরকার কী ? দেখা করিয়ে দিলেই তো হয়।

কখন দেখা করাবেন ?

এখন বলতে পারব না। খোঁজখবর নিয়ে বলতে হবে।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন এক কাজ করেন না কেন, জলিল সাহেবকে দিয়ে এক লাইনের একটা লেখা লিখিয়ে আনেন, আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা দেয়া হবে।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠল।

আপনে আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই। আপনার সাথে ভাই আমি নাই। আমার এক কথা, আমি দেখা করিয়ে দিব। কিন্তু টাকাটা আমাকে এখন দিতে হবে।

এখন দিতে হবে ?

জি জনাব। অর্ধেক এখন দেন, আর বাকি অর্ধেক দেখা হওয়ার দিন দেন। ব্যস, সাফ কথা।

আমি ঠান্ডা গলায় কাদেরকে বললাম, এই লোকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দে কাদের।

জলিল সাহেবের ভাই দারুণ অবাক হয়ে বললেন, আরে না-না। এইসব কী বলছেন ? আসেন তো ভাই আপনি আমার সাথে। চা-পানি খান। আসেন দেখি। অবিশ্বাস করার কী আছে ? মাবুদে এলাহি, অবিশ্বাস করব কেন ? আপনি কি আর খামাখা মিথ্যা কথা বলবেন ?

সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম লোকটিকে পাঁচশ' টাকা দেওয়া হয়েছে এবং একটি টিফিন কেরিয়ারে করে গোশত-পরোটা দেওয়া হয়েছে পৌঁছে দেবার জন্যে। লোকটি বলে গেছে সে বৃহস্পতিবার বিকালে এসে জলিল সাহেবের ভাইকে মিরপুর বারো

নম্বরে নিয়ে যাবে। লোকটি যে আর আসবে না, সেই সম্পর্কে আমি ষোল আনা নিশ্চিত ছিলাম।

কিন্তু সে সত্যি সত্যি বৃহস্পতিবার বেলা দু'টার সময় এসে হাজির। খালি টিফিন-কেরিয়ারটিও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সে অবশ্যি দেখা করানোর জন্যে জলিল সাহেবের ভাইকে মিরপুরে নিয়ে গেল না। তার জন্যে নাকি অন্য এক বিহারি ব্যক্তির (সুলায়মান খাঁ) সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া প্রয়োজন। সেই লোক রোববার আসবে। রোববারে অবশ্যি দেখা হবে। এইবারও লোকটি একটি কম্বল, একটি বালিশ এবং দুশ' টাকা নিয়ে গেল।

জলিল সাহেবের ভাইয়ের ধৈর্য সীমাহীন। তিনি রোববার ভোরে গেলেন, মঙ্গলবার দুপুরে গেলেন এবং আবার বৃহস্পতিবার সকালে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা গায়ে জ্বর নিয়ে ফিরে এলেন। আমি দেখতে গেলাম রাতে। বেশ জ্বর। ভদ্রলোক লেপ গায়ে দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন।

শুয়ে থাকেন, উঠতে হবে না। আজকেও দেখা হয়নি ?

জি-না। সামনের মাসের দুই তারিখ যাইতে বলে।

যাবেন ?

জি-না। ওরা কোনো খোঁজ জানে না। শুধু পেরেশানি করে।

এতদিনে বুঝলেন ?

বুঝেছি আগেই ভাই, কিন্তু কী করব— মিথ্যাটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

আরো খোঁজখবর করবেন ?

জি-না, আগামী মঙ্গলবার ইনশাল্লাহ দেশের বাড়ি রওনা হব।

ঠিক আছে, আপনি বিশ্রাম করেন। পরে কথা বলব।

না ভাই, একটু বসেন। এক কাপ চা খান। আমিনা, ও আমিনা।

আমিনা সম্ভবত জলিল সাহেবের স্ত্রী। কঠিন পর্দা এঁদের। তিনি এলেন না। দরজার ওপাশে খটখট শব্দে জানান দিলেন। জলিল সাহেবের ভাই শান্ত স্বরে বললেন, আমিনা, রোজ কেয়ামতের দিন কোনো পর্দা থাকে না। মেয়ে-পুরুষ তখন সব সমান। এখন সময়টা কেয়ামতের মতো। এখন কোনো পর্দা-পুশিদা নাই। তুমি আস চা নিয়া।

জলিল সাহেবের স্ত্রীকে দেখে আমি বড়ই অবাক হলাম। নিতান্ত বাচ্চা একটি মেয়ে। শ্যামলা ছিপছিপে গড়ন। খুব লম্বা ঘন কালো চুল। এই বয়সের মেয়েরা বেণি দুলিয়ে স্কুলে যায়। হাতভর্তি আচার নিয়ে বারান্দায় বসে চেটে চেটে খায়। মেয়েটি নিজে থেকেই বলল, আপনার কী মনে হয়, তাঁকে মেরে ফেলেছে ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলাম না। মেয়েটি থেমে থেমে বলল, তাঁকে কেন মারবে বলেন ? সে তো কিছুই করে নাই। সে তো মানুষকে একটা কড়া কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। সাত বৎসর বয়স থেকে কোনো নামাজ কাজা করে নাই।

কেন আল্লাহ্ এমন করবেন ?

জলিল সাহেবের ভাই গম্ভীর হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কাজের কোনো সমালোচনা নাই আমিনা। গাফুরুর রাহিম যা জানেন, আমরা সেইটা জানি না।

মঙ্গলবার দুপুরে জলিল সাহেবের ভাই সবাইকে নিয়ে চাঁদপুর চলে গেলেন। একটি ঠিকানা দিয়ে গেলেন কোনো খবর থাকলে জানাবার জন্যে। ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে থাকলেন। আমার কিছু একটা বলা উচিত। কোনো একটা আশার কথা। অর্থহীন কোনো সান্ত্বনার বাণী। কিছুই বলতে পারলাম না।

রাতে অনেকদিন পর কোনো কান্না শোনা গেল না। তাদের তালা-দেওয়া বাড়ির সামনে একটা কুকুর এসে শুয়ে থাকল। রাত দশটার দিকে দেখি সেই বাড়ির বারান্দায় বসে নেজাম সাহেব সিগারেট টানছেন। জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বেশ খাতির হয়েছিল। প্রায়ই দেখতাম দু'জন একসঙ্গে বেরোচ্ছেন।

মতিনউদ্দিন সাহেব আজকাল খুব ঘনঘন আসেন। আজিজ সাহেবের ঘরে না গিয়ে সরাসরি উঠে আসেন দোতলায়। আমার খোঁজ করেন না, চিকন সুরে কাদেরকে ডাকেন, ও কাদের মিয়া। কাদের আছ নাকি ?

কাদের সাড়া দিলেই তিনি অসঙ্কোচে বলেন, কাদের মিয়া, রাতে এখানে খাব।

বড়ই আশ্চর্য লাগে আমার কাছে। একদিন বিকালে এসে দেখি, ভদ্রলোক আমার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে দিব্বি ঘুমোচ্ছেন। কাদের আমাকে ফিসফিস করে বলল, ইনার শইলডা খারাপ। গায়ে জ্বর।

কাদের, রাতে আমি ভাত খাব না। রুটি করবে।

আমাকে বললেন, জ্বর গায়ে ভাত খাওয়াটা ঠিক হবে না। কী বলেন শফিক ভাই ?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনি কি এইখানেই থাকবেন নাকি ?

ভদ্রলোক আমার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে বললেন, জ্বরজ্বারি নিয়ে যাব কোথায় ? কাজের জন্যে যে ছেলে রেখেছিলাম, সেটাও চলে গেছে। একা-একা থাকি কী করে ?

তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক দু'টি প্রকাণ্ড কালো রঙের স্যুটকেস সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

বিলু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে টেনে টেনে খুব হাসতে লাগল। আমার সামনেই নীলুকে বলল, আমি তোমাকে কতবার বলেছি, ভদ্রলোকের মাথা পুরোপুরি খারাপ। তুমি তো বিশ্বাস কর না।

নীলু খুবই রাগ করল। একেবারে কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। চোখ-মুখ লাল করে বলল, কী মনে করে ঘর-বাড়ি নিয়ে আপনি অন্যের বাড়িতে উঠে আসলেন ?

একলা থাকতে পারি না নীলু। ভয় লাগে।

ভয় লাগে! আপনি কচি খোকা নাকি ?

নীলু সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। আমি অবস্থা সামলাবার জন্যে বললাম, এই সময় একা-একা থাকাটা ভয়েরই কথা।

নিচে থেকে নেজাম সাহেব হৈচৈ শুনে উঠে এসেছিলেন। তিনি মহাউৎসাহে বললেন, কোনো অসুবিধা নাই। আপনি ভাই আমার সঙ্গে থাকেন। ভূতের উপদ্রব এই বাড়িতে। একা-একা থাকতে আমারও ভয় লাগে।

মতিনউদ্দিন সাহেব পরদিন কাদেরকে নিয়ে বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে এলেন। মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে বিরাট এক একতলা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। কাদেরের ভাষায় ঐ বাড়িতে একা-একা জ্বীনও থাকতে পারে না। আশেপাশে কোনো বাড়িতে কোনো লোক নেই। এই ক'দিন ভদ্রলোক কী করে একা-একা ছিলেন তাই নাকি এক রহস্য।

কাদেরের কাছ থেকে আরো জানা গেল যে, মতিনউদ্দিন সাহেব এই দেশে থাকবেন না— আবার চলে যাবেন। ভিসার জন্যে দরখাস্ত করেছেন। নতুন ব্যবস্থায় আজিজ সাহেব মহাখুশি। তাঁর মতে এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা। সব দিক থেকেই ভালো। নীলুর মনোভাব ঠিক বোঝা যায় না। তাকে মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে গল্পটল্প করতে দেখি না, তবে একদিন দেখলাম জামগাছের নিচে দু'জনে কথা বলতে-বলতে হাঁটছে। আমাকে দেখতে পেয়ে নীলু চট করে আড়ালে সরে গেল। কী জন্যে কে জানে ?

আজিজ সাহেব আজকাল আর আগের মতো আমাকে ডেকে পাঠান না। তাঁর ব্যস্ততা হঠাৎ করে খুব বেড়েছে। তিনি স্থির করেছেন, ছাব্বিশে মার্চের পর থেকে কোথায় কী হচ্ছে সব লিখে রাখবেন। লেখার কাজটা করবে বিলু। তিনটি আলাদা খাতা করা হয়েছে। একটিতে লেখা হচ্ছে পাকিস্তান রেডিওর খবর, অন্যটিতে আকাশবাণী কোলকাতার। তৃতীয়টি হচ্ছে স্বাধীন বাংলা, বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকার জন্যে।

জুন মাসে ঢাকার অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গেল। কার্ফু সময়সীমা কমিয়ে রাত বারোটা থেকে সকাল ছটা করা হলো। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় যে-সব মিলিটারি চেকপোস্ট ছিল, সেখান থেকে মিলিটারি সরিয়ে পুলিশ বসান হলো। ঢাকার সমস্ত পুলিশ মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে বলে যে-খবর পেয়েছিলাম সেটি বোধহয় পুরোপুরি সত্যি নয়। চারদিকে প্রচুর পুলিশ দেখা যেতে লাগল।

সেন্ট্রাল শান্তি কমিটি থেকে বলা হলো, সমগ্র দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। একজন ফরাসি সাংবাদিক পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার সার্বিক উন্নতি হয়েছে। তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা তাঁর চোখে পড়েনি। জনগণের মধ্যে আস্থার ভাব পুরোপুরি ফিরে এসেছে।

নীলক্ষেতের রাস্তা দিয়ে আসবার সময় দেখি মহসিন হলের অনেকগুলি জানালা খোলা। ছেলেরা দড়িতে শার্ট শুকাতে দিয়েছে। সত্যি সত্যি হল খুলে দেয়া হয়েছে

নাকি ? হতেও পারে। পত্রিকায় দেখলাম আসন্ন রমজান উপলক্ষে রেশনে ঘি এবং সুজি দেওয়া হবে।

ঠিক এই সময় রফিকের ছোট ভাইটির বিয়ে হয়ে গেল। হঠাৎ করেই নাকি সব ঠিক হয়েছে। দুপুরবেলায় বিয়ে। আমাকে বরযাত্রী যেতে হলো। রফিককে মনে হলো বেশ সঙ্কুচিত। তাকে বাদ দিয়ে ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এই কারণেই কিনা কে জানে।

বিয়েবাড়িতে গিয়ে দেখি হুলস্থুল কারবার। গেটের সামনে ব্যান্ড পার্টি। ছোট-ছোট মেয়েরা পরীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় ভালো লাগল দেখে। গেট-ধরনীরা হাজার টাকার কমে গেট ছাড়বে না। শুধু টাকা দিলেই হবে না। তিনটি ধাঁধা আছে, ভেতরে ঢুকতে হলে সেগুলিও ভাঙতে হবে। একটি ধাঁধা হচ্ছে, কাটলে কোন জিনিস বড় হয়। বরযাত্রী যারা ছিলাম, কারোর বুদ্ধিসুদ্ধি বোধহয় সে-রকম নয়। আমরা কেউই একটি ধাঁধারও উত্তর দিতে পারলাম না। বাচ্চা মেয়েগুলি খুব হাসাহাসি করতে লাগল। হাসাহাসি করলে কী হবে, সবগুলি বিচ্ছু— গেট খুলবে না। শেষপর্যন্ত মেয়ের বাবা এসে ধমক দিলেন, গেট খোল। সব সময় ফাজলামি!

বিয়ে পড়ানো হয়ে গেল নিমেষের মধ্যেই। দেন মোহরান— যা নিয়ে দু'পক্ষই ঘণ্টাদুয়েক দড়ি টানাটানি করেন, তাও দেখি আগেই ঠিক-করা। শুধু কবুল বলে নাম সই। বিয়ে বলতে এইটুকুই।

খেতে গিয়েও দেখি এলাহি ব্যবস্থা। জনপ্রতি ফুল রোস্ট, কাবাব, রেজালা। আমার পাশে রোগামতো একটি লোক বসেছিল। সে আমার পেটে খোঁচা মেরে ফিসফিস করে বলল, ব্রিগেডিয়ার বখতিয়ার এসেছে, দেখেছেন ?

কোথায় ব্রিগেডিয়ার বখতিয়ার ?

ঐ যে দেখছেন না, সানগ্লাস পরা। খাস পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আর্মড কোরের লোক। বডি দেখেছেন ?

আমি দেখলাম, লম্বা করে রোগামতো একটি লোক। বেশ কিছু লোক ঘুরঘুর করছে তার সঙ্গে।

কত বড় দালাল দেখেছেন ? পাঞ্জাবির সাথে পিতলা খাতির।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই রফিক আমাকে বউ দেখাতে নিয়ে গেল। মেয়েটি দেখে আমি স্তম্ভিত। যেন সত্যি সত্যি একটি জলপরী বসে আছে। এমন সুন্দর মেয়েও পৃথিবীতে আছে!

৬

দুপুরবেলা হঠাৎ চারদিক অন্ধকার করে ঝড় এলো।

জামগাছ থেকে শনশন শব্দ উঠতে লাগল, একতলার কলঘরের টিনের চাল উড়ে চলে গেল। ঝড় একটু কমতেই শুরু হলো বর্ষণ। তুমুল বর্ষণ। দরজা-জানালা সব

বন্ধ, তবু ফাঁক দিয়ে পানি এসে ঘর ভাসিয়ে দিল। কাদের মহাউৎসাহে ছোটাছুটি করছে। একবার নিচে যাচ্ছে, আবার উপরে উঠে আসছে। তার সীমাহীন ব্যস্ততা। আমি চা করতে বলেছিলাম, সে তার ধার দিয়েও যাচ্ছে না। একবার এসে হাসিমুখে বলল, বিলু আফার ঘরের একটা জানালার কাম সাফ। উইড়া গেছে।

উল্লসিত হওয়ার মতো কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু কাদেরের মনস্তত্ত্ব বোঝার সাধ্য আমার নেই। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, হাসি তামাশার কী আছে এর মধ্যে ?

ঠিক এই সময় একতলা থেকে নেজাম সাহেব ভীত স্বরে ডাকতে লাগলেন, শফিক ভাই, শফিক ভাই। আমার উত্তর দেবার আগেই কাদের মিয়া বিদ্যুৎগতিতে নিচে নেমে গেল। সেখান থেকে সেও চেঁচাতে লাগল, ও ছোড মিয়া, ও ছোড মিয়া। আমি গিয়ে দেখি জলিল সাহেব। মাথার চুল কামানো। গায়ে একটি গেঞ্জি এবং ফুল প্যান্ট।

আমাকে দেখে বললেন, ভালো আছেন শফিক ভাই ?

নেজাম সাহেব বললেন, হাতটার অবস্থা দেখেছেন ?

হাতের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলাম। তাঁর বাঁ হাতটি কনুইয়ের নিচ থেকে শুকিয়ে গেছে। আমি বললাম, আপনার বউ আর মেয়ে ভালো আছে। আপনার ভাই এসে তাদের নিয়ে গেছে চাঁদপুর।

জলিল সাহেবের কোনো ভাবান্তর হলো না। থেমে থেমে বললেন, খিদে লাগছে, ভাত খাব।

ভাত খেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল তাঁর প্রচণ্ড জ্বর। চোখ রক্তবর্ণ। মনে হলো কাউকে চিনতে পারছেন না।

নেজাম সাহেব বললেন, জলিল ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি নেজাম।

জলিল সাহেব উত্তর দেন না।

কি, চিনতে পারছেন না ?

জলিল সাহেব বললেন, পানি দেন ভাইসাব, তিয়াস লাগে।

কাদের দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার আনল। আর আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে জলিল সাহেব রাত একটার সময় মারা গেলেন। মারা যাবার আগমুহূর্তে খুব সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতো কথাবার্তা বললেন। বউ কোথায় ? মেয়েটি কেমন আছে ? জিজ্ঞেস করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নেজাম সাহেব বললেন, হাতটা এরকম হলো কেন ?

জলিল সাহেব তার উত্তর দিলেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন ?

মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। গুলিস্তানের কাছ থেকে।

কবে ছেড়েছে ?

গত পরশু।

বলেন কী! এই দুইদিন তাহলে কোথায় ছিলেন ?

জলিল সাহেব তার উত্তর দিলেন না। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হলো। আমি চলে এলাম উপরে। এসে দেখি মতিনউদ্দিন সাহেব ইজিচেয়ারে বসে হাউমাউ করে কাঁদছেন।

ঝড়-বৃষ্টি কেটে গিয়ে মধ্যরাতে আকাশ কাচের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রকাণ্ড একটি চাঁদ ঝকমক করতে লাগল সেখানে। সেই অসহ্য জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থেকে শুনলাম, অনেক দিন পর জলিল সাহেবের বউ কাঁদছে। সরু মেয়েলি গলায় গাঢ় বিষাদের কান্না।

কে কাঁদছে ?

কাদের মিয়া বলল, বিলু আফা কানতাছে।

বিলু-নীলু দুই বোন সমস্ত রাত জলিল সাহেবের মাথার পাশে বসে রইল।

৭

মৌলবি ইজাবুদ্দিন সাহেব, (এমএ, এলএলবি) খবর পাঠিয়েছেন— আমি যেন অবশ্যি তাঁর সঙ্গে দেখা করি, বিশেষ প্রয়োজন। দু'বার গিয়ে তাঁকে পেলাম না। তিনি আজকাল ভীষণ ব্যস্ত। বাসায় টেলিফোন এসেছে। সন্ধ্যার পর দু'জন আনসার তাঁর বাড়ি পাহারা দেয়। আগে তাঁর বাড়ির বারান্দায় কোনো আলো ছিল না। এখন তিন দিকে একশ' পাওয়ারের তিনটি বাতি জ্বলে।

কোনো মানুষকে দু'বার গিয়ে না পাওয়া গেলে তৃতীয়বার যাওয়ার উৎসাহ থাকে না। তাছাড়া আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হওয়ার কোনোই কারণ নেই। আমি আর না যাওয়াই ঠিক করলাম। তৃতীয় দিন ইজাবুদ্দিন সাহেব আমাকে নেওয়ার জন্যে গাড়ি পাঠালেন। গাড়িতে অসম্ভব রোগা এবং অসম্ভব লম্বা একটি লোক বসেছিল। সে কড়া গলায় বলল, আপনাকে ডাকা হয়েছে, তবু আপনি আসেন নাই কেন ?

আমার সঙ্গে কেউ কড়া গলায় কথা বললে আমি সাধারণত কড়া গলায় জবাব দিই। কিন্তু দিনকাল ভালো নয়, কাজেই সহজ ভঙ্গিতে বললাম, আপনি কে ?

তা দিয়ে আপনার দরকার কী ?

আপনি কি ইজাবুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কাজ করেন ? আপনাকে তো দেখিনি।

আপনি বেশি কথা বলেন। বেশি কথা বলা ঠিক না।

ঠিক না কেন বলেন তো ?

লোকটি কঠিন মুখে চুপ করে রইল।

ইজাবুদ্দিন সাহেব কিন্তু এমন ভাব করলেন, যেন আমি একজন মহাসম্মানিত ব্যক্তি। গাড়ি থামামাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নরম স্বরে বললেন, আসতে কোনো

তকলিফ হয় নাই তো ?

না, কোনো তকলিফ হয়নি। ব্যাপারটা কী ?

আরে না ভাই, কিছু না। কথাবার্তা বলার জন্যে ডাকলাম। আসেন, ভেতরে গিয়ে বসি।

ভেতরে অনেক লোকজন বসে ছিল। এঁদের মধ্যে একজনের মাথায় একটি ঝলমলে ঝুঁটিওয়ালা টুপি। লোকজন এখনো এই জাতীয় টুপি পরে, আমার জানা ছিল না। গাড়ির সেই শুকনো লোকটিকে দেখলাম আলাদা একটা টেবিলে। টেবিলে ফাইলপত্রও আছে। ইজাবুদ্দিন সাহেব বললেন, আপনার এইখানে একজন লোক মারা গেছে শুনলাম। কীভাবে মারা গেল, কী সমাচার ?

আমি বেশ স্পষ্ট স্বরেই বললাম, মিলিটারিরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

বলেন কী সাহেব!

ইজাবুদ্দিন সাহেব এমন ভাব করলেন, যেন অকল্পনীয় একটি ঘটনা শুনলেন। সেই শুকনো লোকটি সরু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তুর্কি টুপি-পরা ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তিনি এক সময় গলার স্বর উঁচু করে বললেন, লোকটি কে ?

আমার একজন ভাড়াটে। পরহেজগার লোক। সাত বছর বয়স থেকে নামাজ কাজা করেনি।

ইজাবুদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, বড়ই আফসোসের কথা। সিপাইদের হাতে দু-একটা এই রকম ঘটনা ঘটেছে। দশজন মন্দের সাথে একজন ভালোও শাস্তি পায়। দুনিয়ার নিয়মই এই। আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে নিজে বলব ব্যাপারটা। ভবিষ্যতে এইরকম যেন না হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। তুর্কি টুপি-পরা ভদ্রলোক বললেন, মৃত্যু স্বয়ং আল্লাহপাকের হাতে। আল্লাহপাক যদি ঐ লোকের মৃত্যু মিলিটারির হাতে লিখে থাকেন, তা হলে হবেই। আপনি আমি কিছুই করতে পারব না। কী বলেন ইজাবুদ্দিন সাহেব ?

ইজাবুদ্দিন সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না।

আমি বললাম, আপনি কি এইটার জন্যেই ডেকেছেন ?

জি-না, আমি ডেকেছি অন্য ব্যাপারে। স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে একটা শান্তিসভা হবে, যাতে মানুষের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়। সবারই এখন মিলেমিশে থাকা দরকার। আপনার বাবা ছিলেন এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। পাকিস্তান হাসেলের জন্যে তিনি যে কী করেছেন তা তো আপনি জানেন না, জানি আমি। জিন্নাহ সাহেবের সাথে তাঁর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। তাঁর ছেলে হিসাবে আপনার শান্তিসভাতে থাকা দরকার।

আমি থাকব।

তা তো থাকবেনই। না থাকলে কি আর আমি ডাকতাম আপনাকে ? মানুষ চিনি তো। আপনার দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো সেদিন। তিনি আবার ব্রিগেডিয়ার তোফাজ্জল সাহেবের বিশিষ্ট বন্ধু। ইংল্যান্ডে উনার সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার সাহেবের পরিচয়। জানি তো সব, হা-হা-হা।

ইজাবুদ্দিন সাহেব আমাকে গাড়িতে করে ফেরত পাঠালেন। সেই শুকনো লোকটা এবারো যাচ্ছে আমার সঙ্গে। তার ভাবভঙ্গি এখন আর আগের মতো নয়। খুব বিনীত অবস্থা। গাড়ি ছাড়ামাত্র বলল, কোনো রকম অসুবিধা হলে বলবেন আমাকে।

আপনাকে বলব কেন ?

না, আমি মানে খোঁজখবর রাখি। অনেক রকম কানেকশন আছে, ইয়ে কী যেন বলে...

লোকটি থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

বাসায় এসে দেখি বড় আপা চিঠি পাঠিয়েছে, তাতে লেখা— আগামীকাল দুপুরে আমরা নীলগঞ্জে চলে যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই তোমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসবে। তোমার দুলাভাইয়ের ধারণা, অবস্থা খুব খারাপ।

আমি অবস্থা খারাপের তেমন কোনো লক্ষণ দেখলাম না। সব কিছুই বেশ স্বাভাবিক। মুক্তিবাহিনীটাহিনী বলে কিছু নেই বলেই মনে হচ্ছে। বড় আপার ধারণা, মুক্তিবাহিনীর সমস্ত ব্যাপারটাই আকাশবাণী কোলকাতার দেবদুলাল বাবুর কল্পনায়। বড় আপাকে ঠিক দোষও দেওয়া যায় না, কোলকাতার খবরগুলির প্রায় বারো আনাই মিথ্যা। তাদের খবর অনুসারে যেদিন মুক্তিবাহিনীর বোমায় মগবাজার বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন কেন্দ্র সম্পূর্ণ বিকল বলা হলো, তার পরদিনই বড় আপার বাসায় যাবার সময় দেখি সব ঠিকঠাক আছে। আরেকদিন বলা হলো— মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরের ফল হিসেবে ঢাকার রাজপথ আজ জনশূন্য। আমি দেখলাম দিব্যি লোকজন চলাচল করছে।

আমার জানামতে দু'জন লোককেই পাওয়া গেল, যাদের স্বাধীন বাংলা বেতার এবং কোলকাতার বেতারের খবরের উপর পূর্ণ আস্থা। একজন আমাদের আজিজ সাহেব, অন্যজন কাদের মিয়া। কাদের মিয়া আবার যা শোনে, তার তিনগুণ বলে। রাতে শোবার আগে সে ইদানীং নিচু গলায় বলছে, ছোড ভাই, মিলিটারির পাতলা পায়খানা শুরু হইছে।

আমি এই জাতীয় আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখাই না, কিন্তু কাদেরের কোনো উৎসাহর প্রয়োজন হয় না।

বিবিসির খবর ছোড ভাই, চিটাগাং-এ পুরা ফাইট। ঢাকা শহরেও শুরু হইছে। খেইল জমতাছে ছোড ভাই।

কই, আমি তো কোনো খেইল দেখি না।

ছোড ভাই, এইসব তো দেখনের জিনিস না। ভিতরের ব্যাপার। ইসকুরু টাইট হইতাছে, ছোড ভাই।

টাইট দেওয়া হলে তো ভালোই।

কাদেরের আগের ভাব এখন নেই। আগে সে বাড়িঘর ছেড়ে বড় আপার বাসায় গিয়ে ওঠার জন্যে ব্যস্ত ছিল, এখন সে-ব্যস্ততা নেই। তবে তার কাজ অনেক বেড়েছে। প্রতিদিনই একবার মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে তার বৈঠক বসে। সেই বৈঠক রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত চলে। একদিন দেখি— সে মতিনউদ্দিন সাহেবের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিচ্ছে। মতিনউদ্দিন সাহেব লাইটার এগিয়ে দিলেন। সকালবেলা নীলু যখন খবরের কাগজ পড়ে তার বাবাকে শোনায়, কাদের মিয়া সেখানেও হাজির থাকে। এবং পড়া শেষ হলে গম্ভীর হয়ে বলে, একটাও সত্যি খবর নাই। এ ব্যাপারে আজিজ সাহেবও তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

মগবাজারে বড় আপার বাসায় গিয়ে দেখি, তাদের যাওয়া বাতিল হয়ে গেছে। বড় আপা মহাখুশি। কাপড়চোপড় স্যুটকেস থেকে নামানো হচ্ছে। বেশ একটা খুশি খুশি ব্যস্ততা।

তোমাদের যাওয়ার কী হলো ?

তোর দুলাভাইকে জিজ্ঞেস কর, আমি কিছু জানি না।

দুলাভাই ঠিক পরিষ্কার করে কিছু বলেন না। তাঁর হাবভাবে মনে হলো অবস্থা যতটা খারাপ মনে করেছিলেন, ততটা খারাপ নয়। একদিনে অবস্থা হঠাৎ করে কীভাবে ভালো হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এক ফাঁকে বড় আপা বললেন— তাঁরা তাজমহল রোডের বিজলী মহল্লায় একটা চারতলা বাড়ি কিনবেন। পঁচানব্বই হাজার টাকা দিলেই পাওয়া যায়। যে-অবাঙালির বাড়ি, সে পাকিস্তান চলে যাবে— কাজেই জলের দরে সব কিছু বিক্রি করে দিচ্ছে। দেশের অবস্থা ভালো হলে ঐ লোককে জলের দরে সব কিছু বিক্রি করে চলে যেতে হচ্ছে কেন, তাও পরিষ্কার বোঝা গেল না।

দুলাভাই আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন। অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বললেন, এখানের একজন ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা আছে। তোফাজ্জল নাম। বেলুচ রেজিমেন্টের লোক। খুবই ভালো মানুষ।

আমি জানি, ইজাবুদ্দিন সাহেব বলেছেন।

দুলাভাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, আর কী বলেছে ইজাবুদ্দিন ?

নাহ্, আর কিছু বলে নি।

দুলাভাই খুব ঠান্ডা গলায় বললেন, আমি এদের সঙ্গে মেলামেশা করি না। তোফাজ্জলকে বাসায় পর্যন্ত আসতে বলি না। আমাকে প্রায়ই টেলিফোন করে। কয়েকদিন আগে রাজশাহীর এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছে।

আমি চুপ করে রইলাম। দুলাভাই ক্লান্ত স্বরে বললেন, এদের সাথে বেশি মাখামাখি করা ঠিক না। শীলার বন্ধু লুনাকে তো চেন ? ঐ যে খুব সুন্দর দেখতে ?

হ্যাঁ চিনেছি।

ওদের বাড়িতে খুব যাতায়াত ছিল মিলিটারিদের। লুনার বাবা প্রায়ই পার্টিফার্টি দিতেন। এখন শুনলাম, এক মেজর নাকি লুনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। ক্লাস নাইনে পড়ে মেয়ে, চিন্তা করে দেখ অবস্থাটা।

বিয়ে হচ্ছে ?

দুলাভাই দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, না হয়ে উপায় আছে ? তবে আমি লুনার বাবাকে বলেছি সবাইকে নিয়ে সরে পড়তে। লোকটা ঘাবড়ে গেছে।

নীলুর সঙ্গে মতিনউদ্দিন সাহেবের বিয়ে সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, তা বোধহয় ঠিক নয়। বিলুকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছে, ধুর, কী যে বলেন! আপনিও কি মতিন ভাইয়ের মতো পাগলা নাকি ?

বিলুর কথা অবশ্যি ধর্তব্য নয়। সে কখন কী বলে, তার ঠিক নেই। কখন সে রেগে আছে আর কখন শরিফ মেজাজে আছে, তাও বোঝা মুশকিল। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, বিলু, মতিন সাহেব শুনলাম আমেরিকা ফিরে যাবেন, সত্যি নাকি ?

বিলু সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল। চোখ বড় বড় করে বলল, যেতে চাইলে যাক, আমরা কি তাকে ধরে রেখেছি ?

রাগ করছ কেন বিলু ? আমি বিব্রত হয়ে বললাম।

রাগ করলাম কোথায় ? রাগের কী দেখলেন ? আমি কি আপনাকে বকেছি, না কিছু বলেছি ?

বিলু মেয়েটিকে আমার বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়। পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ের মধ্যে এতটা দুর্বোধ্যতার কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

একদিন দুপুরবেলা আমাকে এসে বলল, শফিক ভাই, 'নীপ' শব্দের অর্থ জানা আছে আপনার ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো ? কী জন্যে ?

জানবার জন্যে ? 'এসো নীপবনে এসো ছায়াবীথি তলে' এই গানটি শোনেননি আপনি ?

শুনেছি।

ঐ জায়গায় তো 'নীপ' শব্দটি আছে— এর মানে কী ? নীলু আপা জানতে চাচ্ছে ?

জানি না আমি। চলন্তিকা দেখে বলতে হবে।

কখন বলবেন ?

আমার কাছে চলন্তিকা নেই। খুঁজে দেখতে হবে, রফিকের হয়তো আছে। তার ছোট ভাই বইপত্রের পোকা।

বেশ, তাহলে আজকে সন্ধ্যার আগে বলবেন, খুব জরুরি।

সন্ধ্যাবেলা 'নীপ' শব্দের মানে জেনে ঘরে ফিরছি, গেটের কাছ দেখা নীলুর সঙ্গে। আমি বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললাম, নীপ শব্দের মানে হচ্ছে কদম্ব। নীপবন হচ্ছে কদম্ববন।

নীলু মনে হলো খুবই অবাক হলো। আমি বললাম, বিলু বলছিল তুমি এর মানে জানতে চাও?

নীলু ইতস্তত করে বলল, বিলু প্রায়ই আসে আপনার কাছে, তাই না?

তা আসে।

শফিক ভাই, ওকে আপনি প্রশ্রয় দেবেন না। বিলুর বয়স কম। এই বয়সে মেয়েরা অনেক মন-গড়া জিনিসকে সত্যি মনে করে।

আমি অবাক হয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম নীলুর দিকে। নীলু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, জলিল সাহেবের স্ত্রীকে কি আপনি খবর পাঠিয়েছেন?

না। তার ভাইকে চিঠি দিয়েছি।

উত্তর এসেছে কোনো?

না।

আসলে আমাকে জানাবেন।

৮

সকালে কাদেরকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি, সে সিগারেট না নিয়ে ফিরে এলো। তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

ছোড ভাই, কাম সাফ! খেল খতম পয়সা হজম!!

সে খবর এনেছে, জেনারেল টিক্কা খানকে মেরে ফেলা হয়েছে। এত বড় খবরের পর সিগারেটের মতো নগণ্য জিনিসের কথা তার মনে নেই। দু'দিন পরপর কাদের এই জাতীয় খবর নিয়ে আসে। একবার খবর আনল বেলুচি এবং পাঞ্জাবি এই দুই দলের মধ্যে গণ্ডগোল লেগে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দু'দলই শেষ। একদম পরিষ্কার।

আরেকবার দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের দোকান থেকে পাকা খবর আনল, মেজর জিয়া চিটাগাং এবং কুমিল্লা দখল করে ঢাকার দিকে রওনা হয়েছে। দাউদকান্দিতে তুমুল 'ফাইট' হচ্ছে! রাত গভীর হলেই নাকি কামানের শব্দ শোনা যাবে।

বলাই বাহুল্য, টিক্কা খানের মৃত্যুসংবাদটিও বাচ্চু ভাইয়ের দোকান থেকেই এসেছে। আমি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কাদেরকে দোকানে ফেরত পাঠালাম। সিগারেট ছাড়া আমি সকালের চা খেতে পারি না। কাদের ফিরল না। ঠিক দু'ঘণ্টা অপেক্ষা

করে নিচে নেমে দেখি, আজিজ সাহেবের ঘরে মিটিং বসেছে। নেজাম সাহেব এবং মতিনউদ্দিন সাহেব দু'জনেই মুখ লম্বা করে বসে আছেন। আজিজ সাহেব পায়ের শব্দ শুনেই আমাকে ডাকলেন, শফিক, কী সর্বনাশ! আজকে বেরুবে না কোথায়ও। খবর শোননি ?

কী খবর ?

টিক্কা মারা গেছে।

কে খবর দিয়েছে ? আমাদের কাদের মিয়া তো ?

খবর দেওয়াদেওয়ির কিছু নেই শফিক। সবাই জানে। আমরা জানলাম সবার শেষে।

আজিজ সাহেব 'আকাশবাণী' ধরে বসে আছেন। এরা খবর দিতে এত দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না। তারা শুধু বলেছে— 'ঢাকা থেকে প্রচণ্ড গণ্ডগোলের খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া গেছে।' বিবিসি দিনেরবেলা পরিষ্কার ধরা যায় না, রাত না হওয়া পর্যন্ত সঠিক কী ঘটেছে, তা জানা যাবে না। নেজাম সাহেব বললেন, তিনি অফিসে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলেন, অবস্থা বেগতিক দেখে চলে এসেছেন। দোকানপাট যেগুলি খুলেছিল সে-সব বন্ধ করে লোকজন বাড়ি চলে গেছে। রাস্তাঘাটে রিকশার সংখ্যাও নগণ্য। মিরপুর রোডে চেকপোস্ট বসেছে। রিকশা-গাড়ি সবকিছুই থামানো হচ্ছে।

আজিজ সাহেব বললেন, কলিজা শুকিয়ে শুকনা কাঠ হয়ে গেছে শফিক। বাঙালি তো চিনে নাই। এখন চিনবে। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখে নাই।

আমাকে তারা কিছুতেই বের হতে দিল না। আজিজ সাহেব বললেন, আজকের দিনটা খুব সাবধানে থাকা দরকার। ওরা পাগলা কুত্তার মতো হয়ে আছে তো, কী করে না-করে কিছুই ঠিক নাই।

দুপুরের আগেই কী করে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, তা জানা গেল। জেনারেল টিক্কা খান ফাইলপত্র সই করছিলেন। এমন সময় তাঁর ইউনিটের একজন বাঙালি অফিসার (সে-ই একমাত্র বাঙালি, যে এখনো টিকে আছে এবং পাক আর্মির কথামতো সমানে বাঙালি মারছে) জেনারেল টিক্কার ঘরে ঢুকল। তাদের মধ্যে ইংরেজিতে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

টিক্কা কী ব্যাপার কর্নেল মইন ? এত রাতে কোনো প্রয়োজন আছে ?

মইন : জি স্যার, আছে।

টিক্কা বেশ, বলে ফেল। আমার হাতে সময় কম। আমি খুবই ব্যস্ত।

মইন আপনার সময় কম, কথাটি স্যার সত্যি।

এক পর্যায়ে কর্নেল মইন (নামের ব্যাপারে খানিকটা সন্দেহ আছে। কেউ কেউ বলছে মেজর সাঈদ) রিভলবার বের করে পরপর তিনটে গুলি করলেন।

মতিনউদ্দিন সাহেবকে দেখে মনে হলো তিনি কিছুটা দিশাহারা, যেন বুঝতে পারছেন না ঠিক কী হচ্ছে। আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে নিচু স্বরে বললেন, টিক্কা সাহেবকে অন্যায়ভাবে মারাটা ঠিক হলো না।

আমার বদ্ধমূল ধারণা, মতিনউদ্দিন সাহেবের মাথায় ছিট আছে। এখন তিনি নেজাম সাহেবের সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ান। যেখানে তিনি আছেন, সেখানেই মতিন সাহেব আছেন। কাদেরের কাছে শুনলাম, নেজাম সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নাকি ভূত দেখেছেন। সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে ছিলেন, সড়সড় শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন, জামগাছের ডালে কে যেন বসে আছে। কোনোদিকে কোনো বাতাস নেই, শুধু জামগাছের ডালটি নড়ছে। মতিন সাহেবকে দেখি সব সময় ঘরেই থাকেন। চাকরিবাকরি কিছুই করবেন না নাকি? জিজ্ঞেস করলেই হুঁ-হাঁ করেন, পরিষ্কার কিছু বলেন না।

টিক্কা খানের মৃত্যুপ্রসঙ্গে আমার যা-কিছু অবিশ্বাস ছিল, বিকালের দিকে তা ধুয়ে-মুছে গেল। বড় আপার বাসায় যাবার জন্যে বেরিয়েছি, দেখি সত্যি সত্যি খুব থমথমে অবস্থা। দোকানপাট বেশির ভাগই বন্ধ, লোকজন এখানে-ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। ইপিআর হেড কোয়ার্টারের গেটের সামনে বালির বস্তা ফেলে দুর্গের মতো করা। বালির বস্তা আগেও ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যুদ্ধের সাজসজ্জা। সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে মেশিনগান বসানো দু'টি কালো রঙের জিপ। সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে রিকশা নিয়ে চলে গেলাম মগবাজারে। রিকশাওয়ালাটি বৃদ্ধ। টানতে পারে না। পাক মটরস পর্যন্ত যেতেই তাকে তিনবার থামতে হলো। যতক্ষণ থেমে থাকে, ততক্ষণ সে আমাকে খুশি রাখবার জন্যেই হয়তো গল্পগুজব করে। তার কাছ থেকেই জানলাম— জেনারেল টিক্কা একা মারা যায়নি। তার বউ এবং ছেলেটাও মারা গেছে।

গুষ্টি নিকাশ হইছে স্যার। নিব্বংশ হইছে।

আমি বললাম, খবর কোথায় পেলেন চাচা মিয়া?

সে গম্ভীর হয়ে বলল, এইসব খবর কি স্যার গোপন থাকে? মুক্তিবাহিনীর লোক শহরে ঢুকছে। লাড়াচাড়া শুরু হইছে।

কী লাড়াচাড়া?

যাত্রাবাড়িতে দুইটা ট্রাক উড়াইয়া দিছে। হেই রাস্তায় দুইদিন ধইরা লোক চলাচল বন্ধ।

যাত্রাবাড়ির দিকে গেছিলেন নাকি?

কী যেন কন! উদিকে কেউ যায়?

আমাকে দেখে বড় আপা বললেন, তুই আবার আসলি কী জন্যে? এই বৎসর আর জন্মদিনটিন কিচ্ছু করছি না।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। দুলাভাই বললেন, তুমিও আবার জন্মদিনটিন মনে রাখ নাকি, শফিক ? আমার নিজেরও কিন্তু মনে নাই। হা-হা-হা। গিফটটিফট কিছু আছে সঙ্গে, না খালি হাতে এসেছ ?

তখন আমার মনে পড়ল, আজ জুলাইয়ের ৬ তারিখ— শীলার জন্মদিন। বড় একটা উৎসবের তারিখ।

তোর জন্যে সকালেই গাড়ি পাঠাতাম। তোর দুলাভাই বলল অবস্থা থমথমে, তাই পাঠাইনি। তুই আবার জন্মদিনের জন্যে চলে আসলি ? ঘর থেকে বার হওয়াই তো এখন ঠিক না।

আমি ইতস্তত করে বললাম, জন্মদিন ভেবে আসিনি। জন্মদিনটিন আমার মনে থাকে না।

আপা তার স্বভাবমতো সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। দুলাভাই ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন।

দিলে তো তোমার আপাকে রাগিয়ে। জন্মদিন ভেবে আসনি, এটা বড় গলা করে বলার দরকার কী ? তুমি দেখি ডিপ্লোমেসি কিছুই শিখলে না। হা-হা-হা।

জন্মদিনের কোনো আয়োজন হয়নি, কথাটা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ পরই দেখলাম শীলার বান্ধবীরা আসতে শুরু করেছে। এরা আশেপাশেই থাকে। এদের বলা হয়েছে। লুনা মেয়েটি একটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে এসেছে। তুলিতে আঁকা ছবির মতো লাগছে মেয়েটিকে। আমি আপাকে বললাম, এই মেয়েটির যে এক মেজরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, হয়েছে ?

আপা সরু গলায় বলল, তোকে কে বলেছে ?

দুলাভাইয়ের কাছে শুনলাম।

তোর দুলাভাইকে নিয়ে মুশকিল। পেটে কথা থাকে না। শুধু লোক-জানাজানি করা, আর মানুষকে বিপদে ফেলা!

আপা রাগে গজগজ করতে লাগল। আমি জানলে কী-রকম বিপদ হতে পারে, তা বুঝতে পারলাম না। আপার কথাবার্তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। যখন যা মনে আসে বলে। সব মেয়েরাই এরকম নাকি ? আপা ভ্রূ কুঁচকে বলল, জন্মদিন ভেবে আসিসনি, তো কী ভেবে এসেছিস ? তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।

টিক্কা খান মারা যাওয়ার পর দুলাভাইয়ের পরিকল্পনা কিছু বদলেছে কি না জানবার জন্যে আসলাম।

টিক্কা খান মারা গেছে, তোকে বলল কে ?

মারা যায় নি ?

টিক্কা খান কি মাছি যে থাবা দিয়ে মেরে ফেলবে ?

আপা কোনো এক বিচিত্র কারণে পাকিস্তানি মিলিটারি মারা পড়ছে— এই

জাতীয় খবর সহ্য করতে পারে না। আমি আপার রাগী মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করলে সঠিক জানা যেত।

আমি যে বললাম, সেটা বিশ্বাস হলো না?

রাতে আমাকে থেকে যেতে হলো। দুলাভাই আমাকে গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিতে রাজি হলেন না, আবার একা-একা ছাড়তেও চাইলেন না। বড় আপার বাসায় আমার রাত কাটাতে ভালো লাগে না। এখানে রাত কাটানোর মানেই হচ্ছে সারা রাত বসার ঘরে বসে বড় আপা যে কী পরিমাণ অসুখী, সেই গল্প শোনা। দুলাভাই ঠিক দশটা ত্রিশ মিনিটে, 'তুমি তোমার দুঃখের কাহিনী এখন শুরু করতে পার' এই বলে দাঁত মাজতে যান এবং দশটা পঁয়ত্রিশে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েন। আপার দুঃখের কাহিনী অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় না। দুলাভাই ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না, সেই সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করে আকবরের মাকে চা আনতে বলে, তারপর গলার স্বর যথাসম্ভব নিচে নামিয়ে বলে, শফিক, জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। তুই তো বিশ্বাস করবি না। তোর দুলাভাই একটা অমানুষ।

কী যে তুমি বলো আপা!

কী বলি মানে? তুই কি ভেতরের কিছু জানিস? তুই তো দেখিস বাইরেরটা।

বাদ দাও, আপা।

বাদ দেব কী? বাদ দেওয়ার কিছু কি আছে? তুই কি ভাবছিস আমি ছেড়ে দেব? নীপু যদি না ছাড়ে, আমিও ছাড়ব না।

নীপু আমার মেজো বোন। গত পনের বছর ধরে সে আমেরিকার সিয়টলে থাকে। গত বৎসর খবর এসেছে, সে সেপারেশন নিয়ে আলাদা থাকে। আমি আপাকে বললাম, নীপুর সঙ্গে তুলনা করছ কেন?

কেন তুলনা করব না? নীপু কি আমার চেয়ে বেশি জানে না নীপুর বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি? সে যদি সেপারেশন নিতে পারে— আমিও পারি। তুই কি ভাবছিস, আমি এমনি ছেড়ে দেব? ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব না?

যেহেতু নীপু সেপারেশন নিয়েছে, কাজেই আপার ধারণা হয়েছে সেপারেশন নেবার মধ্যে বেশ খানিকটা বাহাদুরি আছে।

আজ রাতে বড় আপা তার দুঃখের কাহিনী শুরু করবার সুযোগ পেল না। ঘড়িতে এগারটা বাজল, তবু দুলাভাই উঠবার নাম করলেন না।

আপা বলল, ঘুমাবে না?

নাহ্।

শরীর খারাপ?

নাহ্, শরীর ঠিক আছে।

শরীর ঠিক থাকলে ঘুমাতে যাচ্ছ না কেন? তোমার তো সব কিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চলে।

এই নিয়েও তুমি একটা ঝগড়া শুরু করতে চাও ?

আমি বুঝি সব কিছু নিয়ে ঝগড়া করি ?

তা করো। আমি যদি এখন একটা হাঁচি দিই, এই নিয়েও তুমি একটা ঝগড়া শুরু করবে।

তুমি হাঁচি দিলেই ঝগড়া শুরু করব!

প্রথমে ঝগড়া, তারপর কান্নাকাটি, তারপর খাওয়া বন্ধ।

বড় আপা মুখ কালো করে উঠে চলে গেল। দুলাভাই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কফি খাওয়া যাক। শফিক খাবে ?

না, কফি ভালো লাগে না। চা হলে খেতে পারি।

আমি নিজে বানাচ্ছি, খেয়ে দেখ। খুব সাবধানে লিকার বের করব। সবাই পারে না, খেলেই বুঝবে।

দুলাভাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হলো। সমস্ত অঞ্চল অন্ধকার হয়ে পড়ল। দুলাভাই থেমে থেমে বললেন, খুব সম্ভব ট্রান্সমিশন স্টেশনটি শেষ করে দিয়েছে।

শীলা ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করতে লাগল। ঘণ্টা বাজিয়ে কয়েকটা দমকলের গাড়ি ছুটে গেল। গুলির আওয়াজ হলো বেশ কয়েকবার। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কয়েকটি ভারি ট্রাক জাতীয় গাড়ি গেল।

আমরা সবাই শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। আমার জানা মতে সেটিই ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর প্রথম সফল আক্রমণ।

৯

দরবেশ বাচ্চু ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

বাচ্চু ভাই একা নয়, তার চায়ের দোকানে রাত ন'টার সময় যে ক'জন ছিল, সবাইকে। আমাদের কাদের মিয়া তাদের একজন। এত রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে না। রাত আটটায় বিবিসি'র খবর। এর আগেই সে আজিজ সাহেবের ঘরে উপস্থিত হয়। সেদিনই শুধু দেরি হলো।

যে-ছেলেটি খবর দিতে এলো সে দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের দোকানের বয়। দশ-এগার বছর বয়স। তাকেই শুধু ওরা ছেড়ে দিয়েছে। তার কাছে জানা গেল, রাত ন'টার কিছু আগে দু-তিনজন লোক এসেছে দোকানে। লোকগুলি বাঙালি। এদের মধ্যে একজন বেঁটেমতো— মাথার চুল কোঁকড়ানো। সে বলল, বাচ্চু ভাই এখানে কার নাম ?

বাচ্চু ভাই কাউন্টার থেকে উঠে এলেন।

আমার নাম। কী দরকার ?

একটু বাইরে আসেন।

ওরা বাচ্চু ভাইকে বাইরে নিয়ে একটা গাড়িতে তুলল। তারপর এসে বাকি সবাইকে বলল, জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে থানায় নিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কিচ্ছু নাই।

আমি ছেলেটিকে বললাম, দোকানে তালা দিয়ে এসেছিস ?

হ স্যার। ক্যাশ বাক্সের টেকাও আমার কাছে।

কত টাকা ?

মোট তেত্রিশ টাকা বারো আনা।

তুই আর এত রাতে যাবি কোথায় ? থাক এখানে।

দরবেশ সাবের বাসাত একটা খবর দেওন দরকার।

সকালে দিবি, এখন আর যাবি কীভাবে ? কার্ফু না ?

ছেলেটি মাথা চুলকাতে লাগল। বললাম, দরবেশ সাবের বাড়িতে আছে কে ?

তাঁর পরিবার আছে। আর একটা পুলা আছে, নান্টু মিয়া নাম। খালি কান্দে।

তুই খাওয়াদাওয়া করেছিস ?

জি-না।

ভাত খা। এখন ঘর থেকে বার হওয়া ঠিক না।

কাদের মিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে, এই খবরে আমি বিশেষ বিচলিত বোধ করলাম না। সহজ-স্বাভাবিকভাবেই চা বানালাম। রাতের জন্যে কাদের কিছু রান্না করে গেছে কিনা, তা দেখলাম হাঁড়ি-পাতিল উল্টে। ছেলেটার শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কিছু গল্পগুজবও করলাম।

বাড়ি কোথায় ?

বিরামছরি, ময়মনসিং।

বাড়িতে আছে কে ?

মা আছে, ভইন আছে, দুইটা ভাই আছে। চাইরজন খানেওয়ালা।

বোনের বিয়ে হয়েছে ?

হইছিল, এখন পৃথ্যক।

এক সময় বিলু এসে আমাকে নিচে ডেকে নিয়ে গেল। আজিজ সাহেবের জ্বর। তিনি কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর সামনের চেয়ারে নেজাম সাহেব বসে আছেন। আমাকে দেখেই নেজাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, কাদের মিয়াকে শুনলাম শুট করেছে।

ধরে নিয়ে গেছে। শুট করেছে কিনা জানি না।

কী সর্বনাশের কথা ভাই! আজিজ সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। থেমে থেমে বললেন, মনটা খুব খারাপ আজকে।

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু বলল, আপনার খাওয়া হয়েছে?

না।

আপনার জন্য ভাত বাড়ছি। আমি এখনো খাইনি। নীলু আপাও খায়নি!

না, আমি খাব না। কাদের রেঁধে গিয়েছে।

তবু খেতে হবে।

নীলু বলল, ইনি খেতে চাচ্ছেন না, তবু জোর করছ কেন?

না, খেতেই হবে।

আজিজ সাহেব বললেন, কাদেরের ব্যাপারে কী করবে?

করার তো তেমন কিছু নেই।

তা ঠিক।

সকালবেলা ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে যাব।

আর কোনো কথাবার্তা হলো না। বিলু এসে বলল, আসুন, ভাত দিয়েছি।

আমি অস্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। ভাত খেতে গিয়ে দেখি, নীলু খেতে আসেনি। তার নাকি মাথা ধরেছে।

বিলু বলল, মাথা ধরেছে না হাতি, আমার সঙ্গে রাগ। আপনাকে খেতে বলেছি তো, তাই তার রাগ উঠে গেছে। তার রাগ করবার কী?

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু বলল, সে অনেক কিছুই করে, যা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আমি কি রাগ করি?

রাগ করো না?

মাঝে মাঝে করি, কিন্তু কাউকে বুঝতে দিই না। আমার মুখ দেখে কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। এই যে কাদের বেচারা মারা গেল...

কাদের মারা গেছে বলছ কেন?

মিলিটারি ধরলে কি আর কেউ ফেরে? কেউ ফেরে না।

উপরে এসে দেখি, ছেলেটি তখনো ঘুমায়নি। বারান্দায় বসে আছে।

কী-রে, ঘুমাসনি?

দরবেশ সাবের লাগি পেট পুড়ে।

পেট পুড়বার কিছু নাই। দেখবি সকালে ছেড়ে দেবে। মিলেটারির হাতে তো ধরা পড়েনি। মিলিটারির হাতে ধরা পড়লে একটা চিন্তার কারণ ছিল।

ছেলেটা গম্ভীর হয়ে বলল, না স্যার, দরবেশ সাবেরে আইজ রাইতেই গুলি করব।

ধুর ব্যাটা, বলেছে কে তোকে?

আমার মনে অইতাছে স্যার। যেডা আমার মনে অয় হেইডা অয়।

বলে কী এই ছেলে! আমি সিগারেট ধরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে।

দরবেশ সাবরে খাওন দিছে, না দিছে-না, শেষ খানাটা বালা হওয়ন দরকার। কী কন স্যার ?

কী বলছিস এইসব ?

দরবেশ সাব আর জিন্দা নাই, স্যার।

আমি একটা কড়া ধমক লাগালাম। রাগী গলায় বললাম, দেখবি ভোরবেলা চলে এসেছে। দরবেশ মানুষ, তাকে খামাখা গুলি করবে কেন ?

ইজাবুদ্দিন সাহেব আগের মতোই আমাকে খাতির-যত্ন করলেন। প্রায় দশবার বললেন, আমার সাধ্যমতো খোঁজখবর করব। সন্ধ্যার মধ্যে ইনশাল্লাহ্ খবর বের করব।

ছাড়া পাবে তো ?

যদি বেঁচে থাকে, তাহলে ইনশাল্লাহ্ ছাড়া পাবে।

বেঁচে না থাকার সম্ভাবনা আছে নাকি ?

আছে শফিক সাহেব, সময় খারাপ। চারদিকে ঝামেলা, কারোর মাথাই ঠিক নাই।

কোনো খবর পেলে জানাবেন।

ইনশাল্লাহ্ জানাব। চিন্তা করবেন না। ফি আমানিল্লাহ।

আমি সন্ধ্যার সময় এসে খোঁজ নেব।

কোনো দরকার নাই। কষ্ট করবেন কেন খামাখা ?

ইজাবুদ্দিন সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, চীনা সৈন্যরা চলে আসছে, জানেন নাকি ?

চীনা সৈন্য ?

জি, হাজারে হাজারে আসছে। যে-সব ফুটফাট শুনেন, সব দেখবেন খতম।

চীনা সৈন্য আসছে, এইসব বলল কে আপনাকে ?

হা-হা-হা। খবরাখবর কিছু কিছু পাই। ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে খানা খেয়েছি গত সপ্তাহে। খুব হামদর্দি লোক।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, ইজাবুদ্দিন সাহেব।

জি।

এইসব বিশ্বাস করবেন না। পাকিস্তানিদের অবস্থা খারাপ।

এইটা ভাইসাব আপনি কী বললেন ?

ঠিকই বললাম। আপনি নিজেও সাবধানে থাকবেন।

মাবুদে এলাহি, আমি সাবধানে থাকব কেন ? আমি কী করলাম ?

ইজাবুদ্দিন সাহেব কাজের লোক। বিকালবেলায় খবর আনলেন, কাদের মিয়া,

পিতা বিরাম মিয়া, গ্রাম কুতুবপুর, থানা কেন্দুয়া— জীবিত আছে। দু-এক দিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। তবে দরবেশ বাচ্চু ভাই নামে কেউ ওদের কাস্টডিতে নেই। এই নামে কোনো লোককে আটক করা হয়নি।

দু'দিনের জায়গায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল, কাদের ফিরল না। আমি রোজই একবার যাই ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে। ভদ্রলোকের ধৈর্য সীমাহীন— একটুও বিরক্ত হন না। রোজই বলেন, বলছি তো ছাড়া পাবে। সবুর করেন। আল্লাহ্ দুই কিসিমের লোক পছন্দ করে, এক. যারা নেক কাজ করে; দুই. যারা সবুর করে। সবুরের মতো কিছু নাই।

কাদেরের অনুপস্থিতিতে আমার খাওয়াদাওয়া হয় নিচতলায় নেজাম সাহেবদের ওখানে। ওদের একটি কাজের মেয়ে রান্না করে দিয়ে যেত। এখন আর আসছে না। এখন রান্না করছেন মতিনউদ্দিন সাহেব। চমৎকার রান্না। দৈনন্দিন খাবারের ব্যাপারটি যে এত সুখকর হতে পারে, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। অবশ্য নেজাম সাহেব প্রতিটি খাবারের কিছু-না-কিছু ত্রুটি বের করেন।

গরুর গোশতে কেউ টমেটো সস দেয়! করেছেন কী আপনি ? খেতে ভালো হলেই তো হয় না। একটা নিয়ম-নীতি আছে। গোশতের সঙ্গে আলু ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায় না।

কেন ? দেওয়া যায় না কেন ?

আরে ভাই যায় না, যায় না। কেন তা জানি না। টেস্টের চেয়ে দরকার ফুড ভ্যালু। বুঝলেন ?

নেজাম সাহেবের আরেকটি দিক হচ্ছে, নিতান্ত আজগুবি সব কুৎসা খুব বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বলা। এগুলি হয় সাধারণত ভাত খাবার সময়। সেদিন যেমন জলিল সাহেবের প্রসঙ্গ তুললেন, জলিল সাহেবের স্ত্রীর ভাবভঙ্গি লক্ষ করেছেন ?

কী ভাবভঙ্গি ?

না, তেমন কিছু না।

তেমন কিছু না হলে লক্ষ করব কীভাবে ?

জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যেন কেমন কেমন।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, কেমন কেমন মানে ?

নেজাম সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, জলিল সাহেবের ভাই বিয়ে-শাদি করেন নাই, জানেন তো ?

না, জানি না। তাতে কী ?

নেজাম সাহেব আর কথা বললেন না।

একদিন চোখ ছোট করে বিলুর প্রসঙ্গ তুললেন, মেয়েটাকে দেখে কী মনে হয় আপনার, শফিক ভাই ?

কী মনে হবে! কিছুই মনে হয় না।

তাই বুঝি?

নেজাম সাহেব মাথা হেলিয়ে হে-হে করে হাসতে লাগলেন, যা শুনে গা রি রি করে।

আমার অনুপস্থিতিতে এই লোকটি আমাকে নিয়ে কী বলে কে জানে?

চাঁদপুর থেকে জলিল সাহেবের ভাইয়ের একটি চিঠি এসেছে। তিনি গোটা গোটা হরফে লিখেছেন—

> পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই সাহেব,
>
> সালাম পর সমাচার এই যে, আপনার পত্রখানি যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে। জলিল যে শেষ সময়ে আপনাদের মতো দরদি মানুষের সঙ্গে ছিল, ইহার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমার হাজার শুকুর। সমগ্র জীবন আমি আল্লাহ্‌পাকের রহমত স্বীকার করিয়াছি। গাফুরুর রাহিমের কোনো কাজের জন্য মন বেজার করি নাই। কিন্তু আজকে আমার মনটায় বড়ই কষ্ট। আপনি লিখিয়াছেন, জলিলের মাথার কাছে দাঁড়ায়ে বোন নীলু ও বোন বিলু কাঁদতে ছিল। আল্লাহ তাদের বেহেস্ত নসিব করুক, হায়াত দরাজ করুক। জলিলের পরম সৌভাগ্য আপনাদের মতো মানুষের সহিত তাহার দেখা হইল। আপনি লিখিয়াছেন, তাহার মৃত্যুসংবাদ যেন এখন আর তাহার স্ত্রী ও কন্যার নিকট না দেই। আপনার কথাটি রাখিতে না পারার জন্য আমি বড়ই শরমিন্দা। হাদিসে জন্ম ও মৃত্যুসংবাদ গোপন না করার নির্দেশ আছে। আল্লাহ্‌পাক যাহাকে দুঃখ দেন, তাহাকে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাও দেন। গাফুরুর রাহিমের কাছে আপনার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ্‌পাক আপনার হায়াত দরাজ করুক, আমিন।
>
> ইতি
>
> আপনার স্নেহধন্য
>
> আব্দুর রহমান

চিঠি পড়ে কেন জানি খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমি চিঠিটি হাতে নিয়ে আজিজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ঘরে ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে দেখি, বিলু মাথা নিচু করে কাঁদছে। আজিজ সাহেব এবং নীলু গম্ভীর হয়ে বসে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই নীলু-বিলু উঠে চলে গেল। আজিজ সাহেব এই প্রথমবারের মতো শব্দ শুনে আমাকে চিনতে পারলেন না। থেমে থেমে বললেন, কে, মতিনউদ্দিন?

জি-না, আমি। আমি শফিক।

ও শফিক। বসো। বসো তুমি। মনটাতে খুব অশান্তি।

আমি বেশ খানিকক্ষণ বসে রইলাম। আজিজ সাহেব কোনো কথা বললেন না। অন্যদিনের মতো বিলুকে ডেকে চায়ের ফরমাশ করলেন না। আমি যখন চলে আসবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন তিনি ক্লান্ত স্বরে বললেন, আমি আমার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কখন ঠিক করলেন ?

অনেকদিন ধরেই চিন্তা করছিলাম। এখন মনস্থির করেছি। নেজাম সাহেবকে বলেছি আমাদের নিয়ে যেতে।

কবে নাগাদ যাবেন ?

জানি না এখনো, নেজাম সাহেব অফিস থেকে ছুটি নেবেন, তারপর।

আজিজ সাহেবেরা শুক্রবার দু'টার সময় সত্যি সত্যি চলে গেলেন।

যাবার আগে বিলু দেখা করতে এলো আমার সঙ্গে। খুব হাসিখুশি ঝলমলে মুখ। এসেই জিজ্ঞেস করল, চট করে বলুন তো, সব প্রাণীর লেজ হয়, আর মানুষের হয় না কেন ? চট করে বলুন।

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু হাসতে হাসতে বলল, কি, পারলেন না তো ? না, আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই।

আমি বললাম, তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে ?

বিলু গম্ভীর হয়ে বলল, আর দেখাটেখা হবে না। কিছু বলবার থাকলে বলে ফেলুন। কি, আছে কিছু বলবার ?

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, কিছু বলতে পারি না। নিচ থেকে নীলু তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকে, এত দেরি করছিস কেন, এই বিলু, এই ?

মতিনউদ্দিন সাহেব জিনিসপত্র নিয়ে উঠে আসেন দোতলায়। একা-একা নিচতলায় থাকতে ভয় লাগে তাঁর। তার উপর ক'দিন আগেই নাকি ভয়াবহ একটি স্বপ্ন দেখেছেন— একটি কালো রঙের জিপে করে তাঁকে যেন কারা নিয়ে যাচ্ছে। যারা নিয়ে যাচ্ছে, তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে লোকগুলি অসম্ভব বুড়ো। অনেক দূর গিয়ে জিপটি থামল। তিনি জিপ থেকে নামলেন। কিন্তু বুড়ো লোকগুলি নামল না। যে-জায়গাটিতে তিনি নেমেছেন, সেটি পাহাড়ি জায়গা, খুব বাতাস বইছে। তিনি ভয় পেয়ে বললেন, এই, তোমরা আমাকে কোথায় নামালে ?

বুড়ো লোকগুলি এই কথায় খুব মজা পেয়ে হো-হো করে হাসতে লাগল। তিনি দেখলেন, জিপটি চলে যাচ্ছে। তিনি প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন, এই—এই।

১০

গত চারদিন ধরে মতিন সাহেব দোতলায় আমার সঙ্গে আছেন। এই চারদিন সারাক্ষণই তিনি আমার সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে আছেন। আমি বাজারে যাচ্ছি— তিনি সঙ্গে যাচ্ছেন। আমি ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে কাদেরের খোঁজে যাচ্ছি, তিনি আছেন। আজকেও বেরুবার জন্যে কাপড় পরছি, দেখি তিনিও কাপড় পরছেন।

আমি থমথমে স্বরে বললাম, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

আজ আমি একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না।

মতিনউদ্দিন সাহেব অত্যন্ত অবাক হলেন, সে-কী, আমি একা-একা থাকব কীভাবে!

যেভাবেই থাকেন থাকবেন।

তাঁকে রেখেই আমি বের হয়ে এলাম। এই লোকটি দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠছে। এখন মনে হচ্ছে, সঙ্গে টাকা-পয়সা নেই। আমার কাছে সেদিন একটি মিনোল্টা এসএলআর ক্যামেরা বিক্রি করতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনার টাকা-পয়সা নেই নাকি?

কিছু আছে। যা নিয়ে এসেছিলাম, খরচ হয়ে যাচ্ছে।

কাজটাজ কিছু দেখেন।

কী দেখব বলেন? ইউনিভার্সিটিতে কোনো পোস্ট অ্যাডভার্টাইজ করছে না। মাস্টারি ছাড়া আর কিছু তো করতেও পারব না আমি।

আত্মীয়স্বজন কে কে আছে আপনার?

আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।

কেউ নেই মানে! একজন বড় ভাই তো আছেন জানি। গাড়ি করে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার যার কথা ছিল।

ও, রকিব ভাই, সে অনেক দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তাছাড়া আমাকে সে পছন্দও করে না।

নীলুরাও তো শুনেছি আপনার আত্মীয়, ওদের সঙ্গে চলে গেলেন না কেন?

মতিনউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, ওরা আমাকে এখন আর পছন্দ করে না। বিলুর ধারণা আমার মাথা খারাপ। দেখেন তো অবস্থা! তবু আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নীলু খুব রাগ করল।

মতিনউদ্দিন সাহেবকে একা ঘরে রেখেই আমি চলে এলাম। সারাক্ষণ কাউকে গাদাবোটের মতো টেনে বেড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। বাইরে বেরিয়ে আবার আমার খারাপ লাগতে লাগল। সঙ্গে নিয়ে এলেই হতো। রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ালাম, ফিরে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসব? ঠিক তখনি কে যেন ডাকল, ও

ছোড ভাই, ও ছোড ভাই।

চমকে তাকিয়ে দেখি, কাদের মিয়া। রিকশা করে আসছে। চোখ কোটরাগত, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে।

এই কাদের, এই।

রিকশা ভাড়াডা দেন ছোড ভাই।

কখন ছাড়া পেলি ?

এক ঘণ্টার মতো হইব। বালা আছেন ছোড ভাই ? আজিজ সাব আর নেজাম স্যাবে বালা ?

তুই ভালো ?

মতিনউদ্দিন সাবের শইলডা কেমন ?

বলতে বলতে কাদের মিয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। সেই রিকশায় করেই কাদেরকে ঘরে নিয়ে এলাম।

ছোড ভাই, পেটে ভুখ লাগছে, চাইরডা ভাত খাওন দরকার।

তুই চুপচাপ বসে থাক। আমি ভাত বসাচ্ছি। শুয়ে থাকবি ?

জি-না।

ঘরে ঘি আছে। গরম গরম ভাত খাবি ঘি দিয়ে। রাতে মতিনউদ্দিন সাহেব রান্না করবে। খুব ভালো রাঁধে।

কাদের বসে বসে ঝিমুতে লাগল। সে কোথায় ছিল, কেমন ছিল— আমি কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না।

ছোড ভাই, নিচতলাটা দেখলাম খালি।

ওরা দেশের বাড়িতে চলে গেছে।

বালা করছে, খুব বালা কাম করছে।

ভাত খেতে পারল না কাদের। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল।

কিছুই তো মুখে দিলি না, এই কাদের।

শইলডা জুইত নাই ছোড ভাই।

শুয়ে থাক, আরাম করে শুয়ে থাক। ভয়ের কিছু নেই।

সন্ধ্যার পর থেকে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। এবং যথারীতি কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি হারিকেন জ্বালিয়ে মতিনউদ্দিন সাহেব নেজাম সাহেবের ঘর থেকে বেরোচ্ছেন। এতক্ষণ সেখানেই বসে ছিলেন। আমার তাঁর কথা মনেই হয়নি। আমাকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, ঝড়-বৃষ্টির রাতে মিলিটারি বের হবে না। আরাম করে ঘুমানো যাবে। ঠিক না শফিক সাহেব ?

এই বলেই কাদেরের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। ভীতস্বরে বললেন, মরে গেছে নাকি ?

না, মরেনি।

আসছে কখন ?

বিকালে।

আপনি আমাকে খবর দেননি কেন ? কেন আমাকে খবর দেননি ?

মতিন সাহেব বড়ই রেগে গেলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

আমাকে কেউ মানুষ বলে মনে করে না। যখন কাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে, তখনো কেউ আমাকে বলেনি। আমি জেনেছি একদিন পরে। কেন আপনারা আমার সঙ্গে এরকম করেন ? আমি কী করেছি ?

হৈচৈ শুনে কাদের জেগে উঠল। মতিনউদ্দিন সাহেব হঠাৎ অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন, তোমার জন্যে আমি খুব চিন্তা করেছি কাদের। হযরত শাহ্‌জালাল সাহেবের দরগাতে সিন্নি মানত করেছি।

আপনের শইলডা বালা ?

আমার শরীর বেশি ভালো না কাদের। রাতে ঘুম হয় না। কিন্তু তোমার পায়ে কী হয়েছে ? ভেঙে ফেলেছে নাকি ?

না, ভাঙে নাই।

বললেই হয়, ভাঙেনি ? নিশ্চয়ই ভেঙেছে। পায়ে কোনো সেন্স আছে ? চিমটি দিলে বুঝতে পার ?

জি, পারি।

মতিনউদ্দিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি রাজাকারে ভর্তি হয়ে যাও কাদের মিয়া। তাহলে মিলিটারি তোমাকে কিছু করবে না। ভয়ডর থাকবে না, আরাম করে ঘুমাতে পারবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। নব্বই টাকা বেতন পাবে, তার সঙ্গে খোরাকি। ভালো ব্যবস্থা। ভর্তি হয়ে যাও। কালকেই যাও।

আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম মতিন সাহেবকে। লোকটির বয়স হঠাৎ করে যেন অনেক বেড়ে গেছে। অনিদ্রার জন্যে চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। মোটাসোটা থাকায় আগে যেমন সুখী-সুখী লাগত, এখন লাগে না। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি। সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন রুক্ষ।

মতিন সাহেব সেই রাতে আমাকে খুবই বিরক্ত করলেন। একটা চিঠি লিখছিলাম। তিনি পেছন থেকে বারবার সেই চিঠি পড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি রাগী গলায় বললাম, কী করছেন এইসব!

দেখছি মিলিটারির বিরুদ্ধে কিছু লিখছেন কিনা। চিঠি এখন সেন্সর হয়। আপনার লেখার জন্যে শেষে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

আপনার ভয় নেই, মিলিটারির বিরুদ্ধে কিছু লিখছি না।

কী লিখেছেন, পড়ে শোনান।

আপনি ঘুমাতে চেষ্টা করেন মতিন সাহেব।

রাতে তো আমি ঘুমাই না। তার উপর আজকে আবার ইলেকট্রিসিটি নেই। মিলিটারির জন্যে খুব সুবিধা।

মতিন সাহেব।

জি।

আপনি দয়া করে আপনার ঘরে যান তো।

কেন, আমি থাকলে কী হয় ? আমি তো আর আপনাকে বিরক্ত করছি না। বসে আছি চুপচাপ।

বহু কষ্টে রাগ থামালাম আমি। নেজাম সাহেব কবে যে ফিরবেন, আর কবে যে এই গ্রহের হাত থেকে বাঁচব কে জানে ? মতিন সাহেব হঠাৎ উঠে জানালা বন্ধ করতে লাগলেন।

জানালা খোলা থাকলে অনেক দূর থেকে আলো দেখা যায়। এত রাত পর্যন্ত আলো জ্বলা খুব সন্দেহজনক।

গরমে সিদ্ধ হয়ে মরব মতিন সাহেব।

গরম কোথায়, হারিকেনটা নিভিয়ে দেন। দেখবেন শীত-শীত লাগবে।

১১

গলা ব্যথার জন্যে ওষুধ কিনতে গিয়েছি, দেখি ওষুধের দোকানে রফিকের ছোট ভাই। অ্যাসপিরিন কিনছে। আমাকে দেখে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমি অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে বললাম, এই যে, কী ব্যাপার ?

সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। যেন আমাকে ঠিক চিনতে পারছে না। আমি হাসি-হাসি মুখে বললাম, তারপর, সব খবর ভালো তো ? হানিমুন কোথায় করলে ?

সে তার উত্তর দিল না। অ্যাসপিরিনের দাম দিয়ে লম্বা মুখ করে বেরিয়ে গেল।

এই ছেলেটিকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তবু রাস্তায় দেখা হলে কথা বলি। সে-ই সবজান্তার ভঙ্গিতে দু'একটা জ্ঞানগর্ভ কথা বলেই গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে এরকম করল কেন ? ছেলেটির সঙ্গে আমার মোটামুটি খাতির আছে। আমার নিজের ধারণা, আমি বোকা সেজে থাকি বলে ছেলেটা আমাকে খানিকটা পছন্দও করে। আমি ওষুধ কিনে বাড়ি না ফিরে চলে গেলাম রফিকের ওখানে। রফিক বাসায় ছিল না। তার ছোট ভাই বেরিয়ে এসে পাথরের মতো মুখ করে বলল, আমাদের টেলিফোন নষ্ট।

টেলিফোন করতে আসিনি, রফিকের সঙ্গে কথা ছিল।

দাদা তো সন্ধ্যার আগে আসবে না।

রফিক এসে পড়ল মিনিট দশেকের মধ্যেই।

কোনো কাজে এসেছিস ?

না, দেখা করতে আসলাম। কাদের ছাড়া পেয়েছে, জানিস নাকি ?

জানব না কেন, তুই-ই তো টেলিফোন করলি। আছে কেমন এখন ?

ভালোই আছে। তোদের খবর কী ?

রফিক মুখ কালো করে বলল, তুই জানিস না কিছু ?

না। কী জানব ?

সারা ঢাকার লোক জানে, আর তুই জানিস না। আয় আমার সাথে, চায়ের দোকানটাতে গিয়ে বসি। সিগারেট আছে ?

চায়ের দোকানে রফিক খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল। আমি বললাম, বল কী হয়েছে ?

আমার ছোট ভাই ফিরোজ, সে এখন আর তার বৌকে দেখতে পারে না। মেয়েটা থাকে বাপের বাড়ি। সে যায় না ওখানে। খুবই অশান্তি।

কারণটা কী ?

কোনোই কারণ নেই। একটা গুজব উঠেছে বুঝলি— দু-একজন লোক বলাবলি করছে, মেয়েটাকে নাকি একবার মিলিটারিরা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দু'রাত নাকি রেখেছিল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

গুজব ছাড়া আর কিছুই না। এই সিগারেটের আগুন হাতে নিয়ে বলছি। কিন্তু ফিরোজের ধারণা, এইটা গুজব না। ঐটা তো আসলে একটা গরু, চিলে কান নিয়ে গেছে শুনলে চিলের পিছে দৌড়ায়।

রফিক আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে নিচু গলায় বলল, ফিরোজকে দোষ দিয়ে কী হবে বল। আমার মায়েরও সেই রকম ধারণা। মা ঐদিন বলছিলেন— কোনো দোষ না থাকলে এই রকম একটা সুন্দরী মেয়েকে ফিরোজের কাছে বিয়ে দেয় কেন ? ফিরোজের আছে কী ?

রফিক আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। আমি বললাম, আর চা নিস না। দুপুরবেলা গাদাখানিক চা খাওয়া ঠিক না।

রফিক বলল, কাউকে বলিস না, তোকে একটা কথা বলছি— আমি ঠিক করেছি মুক্তিবাহিনীতে চলে যাব। আমার জীবনের কোনো দাম আছে নাকি ? বেঁচে থাকলেই কী, আর মরলেই কী। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

মুক্তিবাহিনীতে যাবি কীভাবে ?

প্রথম মেঘালয়ে যাব। সেখানে গেলেই ব্যবস্থা হবে। সোর্স পাওয়া গেছে।

কবে যাবি ?

দু-এক দিনের মধ্যে যাব।

কাউকে বলেছিস বাড়িতে ?

বাবাকে বলেছি।

চাচা কী বলেন ?

কী বলেন, শুনে লাভ নেই। দে, আরেকটা সিগারেট দে।

উঠে আসবার সময় রফিক ইতস্তত করে বলল, একটা কথা শফিক, আমার ভাইয়ের ব্যাপারটা একটু গোপন রাখিস। বড় লজ্জার ব্যাপার হয়েছে রে ভাই। সে আবার গত সোমবার নয়টা ফেনোবারবিটল খেয়েছে। চিন্তা করে দেখ!

কে খেয়েছে ?

ফিরোজ, আর কে ? কী লজ্জা ভেবে দেখ। স্টমাক ওয়াশটোয়াশ করাতে হয়েছে।

ঘরে ফিরে দেখি বাচ্চু ভাই দরবেশের দোকানের সেই ছেলেটা (বাদশা মিয়া) এসে বসে আছে। কাদের বাচ্চু ভাই দরবেশের কোনো খবর পেয়েছে কিনা তাই জানতে এসেছে। কাদের গম্ভীর হয়ে বলছে, বাঁইচা আছে, এই খবর পাইছি।

কে কইছে ?

ইজাবুদ্দিন সাব।

এইটা কেমুন কথা কাদের ভাই। ইজাবুদ্দিন সাব তো কইছে উল্টা কথা।

আমি কি তর সাথে মিছা কইছি ?

না, তুমি মিছা কইবা ক্যান!

দরবেশ সাবের পরিবাররে কইছ চিন্তার কোনো কারণ নাই।

দেখা করনের কোনো উপায় আছে কাদের ভাই ?

দেখা করনের চিন্তা বাদ দে বাদশা। বাঁইচা আছে— এইটাই বড় কথা। কয়জন বাঁচে ক দেখি ?

তা ঠিক।

বাদশা মিয়া ছেলেটি খুব কাজের, সে একাই বাচ্চু ভাই দরবেশের দোকান চালু করে দিয়েছে। আগের মতো বিক্রি নেই, তবু বাজার খরচ উঠে যায়। বাচ্চু ভাইয়ের পরিবারকে পথে বসতে হয়নি।

একদিন গেলাম তার ওখানে চা খেতে। লোকজন নেই, খালি দোকান সাজিয়ে বাদশা মিয়া বসে আছে।

কী-রে, লোকজন তো কিছু নেই।

সকালের দিকে কিছু কিছু হয়।

চা তুই একাই বানাস, না অন্য কেউ আছে ?

জি-না, আমি একলাই আছি, অন্য কেউ নাই।

কিছুতেই তাকে চায়ের দাম দেওয়া গেল না। চোখ কপালে তুলে বলল, আপনার কাছ থাইক্যা দাম নেই ক্যামনে ? কন কী স্যার!

আমার প্রতি তার এই প্রগাঢ় ভক্তির কারণ কী, কে জানে ?

বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, আজিজ সাহেবের কাছ থেকে লম্বা একটি চিঠি এসেছে। চিঠিটি লিখে দিয়েছে নীলু। দু'টি খবর জানা গেল সে-চিঠিতে। আজিজ সাহেব তাঁর মেয়েদের জন্যে বিয়ে ঠিক করেছেন। বিলুর বিয়ে হচ্ছে যে-ছেলেটির সঙ্গে সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফিফথ ইয়ারে পড়ে। দেখতে ভালো, বংশও ভালো। ছেলের বাবা স্কুলের হেডমাস্টার। আজিজ সাহেব লিখেছেন— বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। সমগ্র চিঠিতে নীলুর বিয়ে কোথায় হচ্ছে, কার সঙ্গে হচ্ছে, কিছুই লেখা নেই। নেজাম সাহেবের কথাও নেই। সেটিও বেশ রহস্যময়।

চিঠির সঙ্গে বিলুর একটি চিরকুটও আছে। আমি অসংখ্যবার পড়লাম সেটি।

> শফিক ভাই
>
> মতিন ভাইয়ের কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলাম আপনাকে দেবার জন্যে। লিখেছিলাম এক মাসের মধ্যে অবশ্যি যেন তার জবাব দেন। আপনি দেননি। এমন কেন আপনি ?
>
> বিলু

মতিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, বিলু কি যাবার আগে আপনাকে কোনো চিঠি দিয়েছিল ?

মতিন সাহেব অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে দিতে বলেছিল। খুব নাকি জরুরি।

কোথায় সে-চিঠি ?

মতিন সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, আমি কী করে বলব কোথায় ?

সে চিঠিটি আর কোথাও পাওয়া গেল না।

১২

মানুষ যে-কোনো অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। ফাঁসির আসামিও শুনেছি এক সময় মৃত্যুভয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়, নিয়মিত খাওয়াদাওয়া করে, তরকারিতে লবণ কম হলে মেটকে চৌদ্দপুরুষ তুলে গালি দেয়। সেই হিসেবে আমাদের দীর্ঘ ছ'মাসে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হওয়া গেল না। তার মূল কারণ সম্ভবত অনিশ্চয়তা। রাস্তায় রিকশা নিয়ে বের হলে দু'টি সম্ভাবনা— মিলিটারিরা রিকশা থামাতে পারে, না-ও থামাতে পারে। থামলে ধরে নিয়ে যেতে পারে, না-ও

ধরতে পারে। ধরে নিয়ে গেলে আবার ফিরে আসতে পারে, আবার না-ও ফিরে আসতে পারে। এই ধরনের অনিশ্চয়তায় বেঁচে থাকা যায় না।

যদি নিশ্চিতভাবে জানা যেত— এর বেশি আর কিছু হবে না, স্বাধীনতা-টাধিনতার কথা চিন্তা করে লাভ নেই, তাহলে হয়তো সময় এত দুঃসহ হতো না। কিন্তু একটি আশার ব্যাপার আছে। একদিন হয়তো আবার আগের মতো রাস্তায় ইচ্ছামতো হাঁটা যাবে। রাত বারোটায় চায়ের দোকানে বসে সিঙ্গেল চায়ের অর্ডার দেওয়া যাবে। স্বাধীনতা একেকজনের কাছে একেকরকম। এই মুহূর্তে আমার কাছে স্বাধীনতা মানে হচ্ছে, রাত এগারটায় রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে গম্ভীর হয়ে পানের পিক ফেলা। মতিনউদ্দিন সাহেবের কাছে স্বাধীনতার মানে খুব সম্ভব রাতেরবেলায় জানালা খোলা রেখে (এবং বাতি জ্বালিয়ে রেখে) ঘুমানোর অধিকার।

আজকাল আমি রাস্তায় দীর্ঘসময় হেঁটে বেড়াই। আগে কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করত না। এখন মাঝে-মাঝে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বাসা কোথায় ? কোথায় যাচ্ছি ? মুসলমান না হিন্দু (হিন্দু বলতে পারে না, বলে ইন্দু) ? একবার শুধু-শুধু দু'ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখল। আমার ধারণা, নিছক ভয় দেখিয়ে মজা করবার জন্যেই। আমার সঙ্গে আরেকটি ছেলে ছিল। সে বাজার করে ফিরছে। বাজারের ব্যাগ থেকে ইলিশ মাছের লেজ বের হয়ে আছে। ছেলেটি কুলকুল করে ঘামতে শুরু করল। নেহায়েত বাচ্চা ছেলে। হয়তো কাজের ছেলেটা আসেনি, মা জোর করে পাঠিয়েছে। আমি বললাম, ভয়ের কিছু নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। এক্ষুণি ছেড়ে দেবে। যে সেপাইটি আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সে একবার এসে জিজ্ঞেস করল, কেয়া, ডর লাগতা ?

ছেলেটি কোনো কথা বলতে পারল না। আমি বললাম, ইলিশ মাছ কত দিয়ে কিনেছ ?

বেচারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। প্রচণ্ড ঘামছে সে। আমি বললাম, এক্ষুণি ছাড়বে, ভয়ের কিছু নেই।

যদি না ছাড়ে ?

কী যে বলো! ছাড়বেই। তোমার নাম কী ?

লম্বামতো একটি মিলিটারি এগিয়ে এলো এই সময়, এবং আমি কিছু বোঝবার আগেই প্রচণ্ড এক চড় মারল ছেলেটির গালে। আমি হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে টেনে তুললাম। তার ব্যাগ ছিটকে পড়েছে দূরে। সেখান থেকে আলুগুলি বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিলিটারিটি আমাদের হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। ছেলেটির গা কাঁপছিল, ঠিকমতো হাঁটতে পারছিল না। সে ফিসফিস করে বলল, আমাকে একটু বাসায় পৌঁছে দেবেন ? আমরা একটা রিকশা নিলাম। ছেলেটি রিকশায় উঠে ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগল। আমার খুব ইচ্ছা হলো বলি— আজ তুমি যে লজ্জা পেয়েছ, সে শুধু তোমার একার লজ্জা নয়— আমাদের সবার লজ্জা। কিন্তু কিছুই

বললাম না। এইসব বড় কথার আসলে তেমন কোনো অর্থ নেই।

আমি তাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ছেলেটির মা এমন ভাব করতে লাগল, যেন আমি তাকে মিলিটারির হাত থেকে ছুটিয়ে এনেছি। আমার জন্যে হালুয়া এবং পরোটা তৈরি হলো। হালুয়া খাবার সময় ভদ্রমহিলা একটা তালপাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। আমি বললাম, রোজার সময় দেখবেন এরা বেশি ঝামেলা করবে না। আর কয়েকটা দিন।

আমাদের কাদের মিয়াও খবর আনল, প্রথম রোজার দিন সব আটক লোকদের ছেড়ে দেয়া হবে। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে বসবে। সব ঠিকঠাক। আমেরিকা নাকি শক্ত ধমক দিয়েছে ইয়াহিয়া খানকে। ইয়াহিয়া মিটমাটের জন্যে একটা পথ খুঁজছে।

বুঝলেন ছোড ভাই, সাপ গিলার অবস্থা হইছে। না পারে গিলতে না পারে রাখতে। কাদের পহেলা রমজানের জন্যে খুব উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার উৎসাহের প্রধান কারণ, দরবেশ বাচ্চু ভাই ছাড়া পাবে।

দরবেশ বাচ্চু ভাই ছাড়া পেলেন না। রমজানের সময় অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হলো। আলবদর বাহিনী তৈরি হলো। প্রথমবারের মতো অনুভব করলাম, কিছু কিছু যুদ্ধ সত্যি সত্যি হচ্ছে। নয়তো এতটা খারাপ অবস্থা হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইজাবুদ্দিন সাহেবও অনেকখানি মিইয়ে গেলেন। বারান্দায় এখন আর তিনি একশ' পাওয়ারের বাতি দু'টি জ্বালান না। ছয় রোজার দিন রাতে তারাবির নামাজ শেষে ফেরবার পথে তিনি মারা পড়লেন। হাসিমুখে খবর আনল কাদের মিয়া। প্রচণ্ড ধমক লাগালাম কাদেরকে, এই লোকটার জন্য বেঁচে আছিস তুই কাদের। আর যেই হাসে হাসুক, তুই হাসিস না।

কাদেরের হাসি বন্ধ হলো না। চোখ ছোট-ছোট করে বলল, খেইল শুরু হইছে ছোড ভাই। বিসমিল্লাহ দিয়া শুরু।

মতিনউদ্দিন সাহেব শুধু বললেন, মানুষ মারাটা ঠিক না। মানুষ মারাটা কোনো হাসির জিনিস না কাদের মিয়া। ইজাবুদ্দিন সাহেব মানুষের অনেক উপকার করেছেন।

দুলাভাই খবর পাঠিয়েছেন এক্ষুণি যেতে হবে। দুলাভাইয়ের গাড়ির এই ড্রাইভারটি নতুন রাখা হয়েছে। লোকটি বিহারি। মিলিটারি গাড়ি থামালেই সে গলা বের করে একগাদা কথা হড়হড় করে বলে। ফলস্বরূপ গাড়ি থেকে নামতে হয় না।

দুলাভাইয়ের বাসায় গিয়ে দেখি, জিনিসপত্র গোছগাছ হচ্ছে। আপার মুখে আষাঢ়ের ঘনঘটা। দুলাভাই বললেন, ইন্ডিয়া যুদ্ধে নামবে, বুঝলে নাকি শফিক ? শহর ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

কখন ছাড়ছেন শহর ?

আন্দাজ করো দেখি ?

আজকেই যাচ্ছেন নাকি ?

ঠিক। এক ঘণ্টার মধ্যে। গাড়িতে করে যাব ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহে খবর দেয়া আছে।

হঠাৎ করে যাচ্ছেন দুলাভাই। আজকেই ঠিক করলেন নাকি ?

হ্যাঁ।

আজকে ঠিক করার পিছনে কোনো কারণ আছে ?

আছে। সিরিয়াস কারণ আছে।

বলেন শুনি।

তার আগে বলো, তুমি একটা কাজ করতে পারবে কিনা ?

কী কাজ ?

লুনাকে তো চেন, শীলার বান্ধবী— এক মেজর বিয়ে করতে চায় তাকে।

চিনি।

সেই মেয়েটিকে তোমার ওখানে নিয়ে রাখবে। শুধু আজকের রাতটা। কাল ভোরে মেয়ের এক চাচা এসে মেয়েকে নিয়ে যাবে। খবর দেওয়া হয়েছে, তাঁকে তোমার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি।

কিছুই বুঝতে পারছি না দুলাভাই। মেয়েটা কোথায় ?

এইখানেই আছে। শীলার ঘরে আছে।

ব্যাপার মোটামুটি এই রকম— গত দশদিন ধরে লুনা এই বাড়িতে আছে। মেয়ের বাবা-মা মেজর ভদ্রলোককে বলেছেন, মেয়ে চিটাগাং তার নানার বাড়িতে আছে। ঈদের পর আসবে। বিয়ের পাকা কথাবার্তা হবে তখন। মেজর সাহেব কিছুই বলেননি। আজ সকালে কিছু লোকজন এসে মেয়ের বাবা-মাকে তুলে নিয়ে গেছে। দুলাভাইয়ের ধারণা, তাঁকে ধরতে আসবে আজকালের মধ্যে।

বড় আপা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, মেয়েকে আমার এখানে রাখার কথা তো আমি বলিনি, তোর দুলাভাই গলা বাড়িয়ে বলেছে। এখন দেখ না ঝামেলা।

ঝামেলা তো সবারই আপা। তুমি ঝামেলায় পড়লে দেখবে সাহায্যের জন্যে লোক আসছে।

রাখ রাখ। লম্বা লম্বা কথা ভালো লাগে না। লম্বা কথা অনেক শুনেছি।

বড় আপার ঢাকা ছাড়ার ইচ্ছা মোটেই নেই। তিনি আমার সামনেই একবার দুলাভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, সবচেয়ে ভালো হয় এই বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায়ও ওঠা।

শফিকের ওখানে উঠতে দোষ কী ? ঘর তো খালি পড়ে আছে।

দুলাভাই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, ঢাকা শহরে এক ঘণ্টার বেশি আমি থাকব

না। ওরা আমাকে খুঁজছে।

তুমি তো শেখ মুজিব! তোমাকে না হলে ওদের ঘুম হচ্ছে না।

দুলাভাই শান্ত স্বরে ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি বের করতে। আমাকে বললেন, লুনাকে সবকিছু বলা হয়েছে, খুব শক্ত মেয়ে। একটুও ঘাবড়ায়নি।

আমি বললাম, যদি ওর চাচা না আসে ?

আসবেই। আর যদি না-আসে, তাহলে তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে যা করবার করবে। মেয়ের এক দূরসম্পর্কের খালা আছে ঢাকায়। লুনার কাছে ঠিকানা আছে।

ওর বাবা-মা'র খবর ওকে বলেছেন ?

হ্যাঁ।

কান্নাকাটি করছে না ?

আমাদের সামনে না। মেয়ে বড় শক্ত, মচকাবার মেয়ে না। আমি খুবই ইমপ্রেসড।

দুলাভাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, একটা টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি, সেই টেলিফোন নাম্বারে ফোন করে বলবে যে আমি চলে গেছি।

কাকে বলব ?

যে টেলিফোন রিসিভ করবে, তাকেই বলবে। বলবে মেসেজ রাখতে।

এইটি কি আপনার ব্রিগেডিয়ার বন্ধুর নাম্বার ?

হ্যাঁ, তোমার ওর কাছে যাওয়ার দরকার নেই।

১৩

লুনাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি।

রাস্তায় নেমেই প্রচণ্ড ভয় লাগল। মনে হলো রাস্তাঘাট যেন বড় নির্জন। যেন আজকেই ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে। শাহবাগের পাশে প্রকাণ্ড একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার বুক কাঁপতে লাগল। মনে হলো ওরা আজ অবশ্যই আমাদের গাড়ি থামাবে। ঠান্ডা স্বরে বলবে, তোমার সঙ্গের ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে আমরা নিয়ে যাব। আমি বলব, জনাব, ও একটি নিতান্ত বাচ্চা মেয়ে। ক্লাস নাইনে পড়ে। ওরা দাঁত বের করে হাসবে। এবং হাসতে হাসতে বলবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে বাচ্চা মেয়েরাই ভালো।

আমি নিজেকে সাহস দেবার জন্যেই বললাম, লুনা, ভয়ের কিছু নেই। তুমি শান্তভাবে চুপচাপ বসে থাক।

চুপচাপই তো বসে আছি।

জানালা দিয়ে বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছ কেন ? মাথাটা নিচু করে বসো না।

আহ্, আপনি কেন এত ভয় পাচ্ছেন ? মাথা নিচু করে বসব কেন শুধু শুধু ?

ড্রাইভার গাড়ি ছোটাচ্ছে ঝড়ের মতো। এত জোরে গাড়ি চালানোর দরকারটা কী? শুধু শুধু মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা। আমি বললাম, ড্রাইভার সাহেব, একটু আস্তে চালান।

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে নিয়ে এলো, যা আরো সন্দেহজনক। যেই দেখবে, তারই মনে হবে বদ মতলব নিয়ে গাড়ির ভেতর কেউ বসে আছে, সম্ভবত একটি লুকানো স্টেনগান আছে, সুবিধামতো টার্গেট পেলেই বের হয়ে আসবে।

বাড়ির সামনে এসেও আমার বুকের ধকধকানি কমে না। এত খাঁখাঁ করছে কেন চারদিক? আগে তো কখনো এরকম লাগেনি। আমি গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, এই কাদের, কাদের।

কাদেরের সাড়া পাওয়া গেল না। মতিনউদ্দিন সাহেব জানালা দিয়ে মাথা বের করে আবার কচ্ছপের মতো মাথা টেনে নিলেন। তার পরই ঝপাং করে জানালা বন্ধ করে ফেললেন। ভদ্রলোকের মাথা কি পুরোপুরিই খারাপ হয়ে গেছে?

মতিন সাহেব, আপনি নিচে এসে স্যুটকেসটা নিয়ে যান দয়া করে।

মতিন সাহেব নিচে নামলেন না। শব্দ শুনে বুঝলাম ভদ্রলোক অন্য জানালাগুলি বন্ধ করছেন।

লুনা বলল, আমি নিতে পারব।

তোমার নিতে হবে না। রাখ তুমি। মতিন সাহেব, ও মতিন সাহেব।

কোনোই সাড়া নেই।

লুনা বলল, ঐ লোকটিরই কি মাথা খারাপ?

কে বলল তোমাকে?

শীলা। শীলা বলেছে।

শীলা দেখলাম অনেক কিছুই বলেছে। এই বাড়িতে যে একটা তক্ষক আছে, তাও তার জানা। দোতলায় উঠেই বলল, এ বাড়িতে নাকি কুমিরের মতো বড় একটা তক্ষক আছে?

তা আছে।

কোথায়, দেখান তো।

এই মেয়ে যে-অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় কেউ যে তক্ষকের খোঁজ করতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমি গম্ভীর মুখে লুনাকে বসিয়ে রেখে মতিন সাহেবের খোঁজ করতে গেলাম। তিনি কাদেরের ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

দরজা খোলেন মতিন সাহেব।

ঐ মেয়েটা কে?

আমার ভাগ্নি। আপনি দরজা বন্ধ করে বসে আছেন কেন?

মতিন সাহেব দরজা খুলে ফিসফিস করে বললেন, আপন ভাগ্নি ?

তা দিয়ে দরকার কী আপনার ?

মতিন সাহেব দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বললেন, মেয়েটাকে আমি চিনি, শফিক সাহেব। আপনাকে আমি আগে বলিনি, একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা মিষ্টি গন্ধ। তাকিয়ে দেখি, মাথার কাছে একটি মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার নাকের কাছে একটা তিল। এইটি সেই মেয়ে। দেখেই চিনেছি।

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই লোক তো বদ্ধ উন্মাদ!

মতিন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, আপনার বিশ্বাস হয় না ?

না। অন্ধকারের মধ্যে আপনি একটা মেয়ের নাকের তিল দেখবেন কী করে ?

তাও তো ঠিক।

মেয়েটার নাকে কোনো তিল-টিল নেই, বিপদে পড়ে এসেছে, কাল সকালে চলে যাবে।

কী সর্বনাশ! রাতে থাকবে, আগে বলেন নি কেন ?

আগে বললে কী করতেন ?

না, মানে করার তো কিছু নেই।

যান, নিচে থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে আসেন। কাদের গেছে কোথায় ?

জানি না। আমাকে কিছু বলে যায়নি।

কখন আসবে, তাও বলেনি ?

নাহ্।

লুনা অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ সহজ হয়ে গেল। কথাবার্তা বলতে শুরু করল। ভাবখানা এরকম, যেন এ-জাতীয় ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত পুরুষদের মধ্যে রাত কাটানোটা তেমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। নিজের বাবা-মা'র কথা একবারই শুধু বলল। তক্ষকরা কী খায়, সেই গল্প বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেলল, আপনার কি মনে হয়, আব্বা-আম্মা ছাড়া পেয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ? আমার ঠিকানা তো তারা জানে না।

প্রশ্নটি এত আচমকা এসেছে যে, আমার জবাব দিতে দেরি হলো। আমি থেমে থেমে বললাম, খুবই সম্ভব। তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আর তোমার চাচা তো আমার ঠিকানা জানেন।

তা ঠিক, এটি আমার মনেই হয়নি।

তার মুখ দেখে মনে হলো বড় একটি সমস্যার খুব সহজ সমাধান পাওয়া গেছে। এ নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। আমি বললাম, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করো। কাদের এসে এই ঘর তোমার জন্যে ঠিকঠাক করবে। চা খাবে ? খিদে লেগেছে ?

ঘরে অবশ্যি কিছু নেই। শুধু শুধু চা এক কাপ খাও।

কে বানাবে চা, আপনি ?

হ্যাঁ, কেন ?

শীলা বলেছে আপনি কিছুই করতে পারেন না। চা পর্যন্ত বানাতে জানেন না। এই জন্যেই চাকরিটাকরি কিছুই করেন না। শুধু ঘরে বসে থাকেন।

আর কী বলেছে ?

আর বলেছে আপনি কাক পোষেন। আপনি যে দিকেই যান, দশ-বারোটা কাক কা-কা করতে করতে আপনার পেছনে পেছনে যায়।

লুনা খিলখিল করে হেসে উঠল। বহুদিন আমার এই অগোছাল নোংরা ঘরে এমন মন খুলে কেউ হেসে ওঠেনি। আমার মনে হলো, সব যেন আগের মতো হয়ে গেছে। আর ভয়ে ভয়ে রাস্তায় বের হতে হবে না। রাতেরবেলা জিপের শব্দ শুনে কাঠ হয়ে বিছানায় বসে থাকতে হবে না। লুনা বলল, আপনি আবার রাগ করলেন নাকি ?

কাদের এসে নিমেষের মধ্যে ঘরদোর গুছিয়ে ফেলল। চাল-ডালের টিন দু'টি কোথায় যেন সরিয়ে ফেলল। নতুন টেবিলক্লথ বের হলো। বিছানার চাদর নিয়ে রমিজের দোকান থেকে ইস্ত্রি করিয়ে আনল। বইয়ের শেলফ গুছিয়ে, মতিন সাহেবকে নিয়ে ধরাধরি করে বড় ট্রাঙ্কটা সরানো হলো। এতে নাকি হাঁটা-চলার জায়গা বেশি হবে। এক ফাঁকে আমাকে এসে ফিসফিস করে বলে গেল, মেয়েছেলে না থাকলে ঘরের কোনো সুন্দর্য নাই। এই কথাটা ছোড ভাই খুব খাঁটি। লাখ কথার এক কথা।

লুনার থাকার ব্যবস্থা হলো আমার ঘরে। আমি গেলাম কাদেরের ঘরে। মতিন সাহেব বললেন, তিনি বারান্দায় বসে থাকবেন। ঘরে একটি মহিলা আছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। তাঁর যখন এমনিতেই ঘুম হয় না, কাজেই অসুবিধা কিছু নেই। আমি লুনাকে বেশ কয়েকবার বললাম, ভয়ের কিছু নেই, একটা রাত দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। আর যদি ভয়টয় লাগে, ডাকবে। আমার খুব সজাগ ঘুম।

না, আমার ভয় লাগছে না।

কাদের বলল, চিন্তার কিছু নাই আফা। কোনো বেচাল দেখলেই আমার কাছে খবর আসব। লোক আছে আমার আফা, আগের দিন আর নাই।

কাদের যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছে, বেচাল দেখলেই তার কাছে খবর চলে আসবে— তা জানা ছিল না। সে কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছে— এইভাবে থাকা ঠিক না। কিছু করা বিশেষ প্রয়োজন।

মতিন সাহেবের কাছে শুনলাম কাদের নাকি কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তারা তাকে নিয়ে যাবে। কখন নেবে, কী, তা গোপন। হঠাৎ একদিন হয়তো চলে যেতে হবে। এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে তার কোনো কথা হয়নি। সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলার বোধহয় তার ইচ্ছাও নেই।

লুনা রাত দশটা বাজতেই ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। আমি শুতে গেলাম রাত বারোটার দিকে। শোয়ামাত্রই আমার ঘুম আসে না। দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হয়। এপাশ-ওপাশ করতে হয়। দু-তিনবার বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে পানি দিতে হয়। বিচিত্র কারণে আজ শোয়ামাত্রই ঘুম এলো। গাঢ় ঘুম। ঘুম ভাঙল অনেক রাতে। দেখি অন্ধকারে উবু হয়ে বসে কাদের বিড়ি টানছে। আমাকে দেখে হাতের আড়ালে বিড়ি লুকিয়ে ফেলে নিচু গলায় বলল, মেয়েডা খুব কানতেছে ছোড ভাই। মনটার মইদ্যে বড় কষ্ট লাগতাছে।

প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই শুনতে পেলাম না। তারপর অস্পষ্ট ফোঁপানির আওয়াজ শুনলাম। মেয়েটি নিশ্চয়ই বালিশে মুখ গুঁজে কান্নার শব্দ ঢাকার চেষ্টা করছে। আমি উঠে দরজার কাছে যেতেই কান্না অনেক স্পষ্ট হলো। মাঝে-মাঝে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে— আম্মি আম্মি। আমি কিছুই বললাম না। কিছু কিছু ব্যক্তিগত দুঃখ আছে, যা স্পর্শ করার অধিকার কারোরই নেই। মতিন সাহেব অনেকটা দূরে ইজিচেয়ারে মূর্তির মতো বসে ছিলেন, আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ধরা গলায় বললেন, মেয়েটা খুব কাঁদছে। কী করা যায় বলেন তো?

কিছুই করার নেই।

তা ঠিক, কিছুই করার নেই। বড় কষ্ট লাগছে, আমিও কাঁদছিলাম।

বলতে-বলতে মতিন সাহেব চোখ মুছলেন। দু'জন চুপচাপ বারান্দায় বসে রইলাম। এক সময় কাদেরও এসে যোগ দিল। শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি পড়তে লাগল। জামগাছের পাতায় সড়সড় শব্দ উঠল। লুনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে ডাকল, আম্মি আম্মি। পরদিন লুনার চাচা লুনাকে নিতে এলেন না।

সন্ধ্যার পর মডার্ন ফার্মেসি থেকে টেলিফোন করতে চেষ্টা করলাম। অপারেটর বলল, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নষ্ট। কখন ঠিক হবে তা জানে না। আমি বাসায় ফিরে দেখি লুনা মুখ কালো করে বসে আছে।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকা পড়েছেন। কাল নিশ্চয়ই আসবেন।

লুনা কোনো কথাটথা বলল না।

কালকে আমি তোমার খালার বাসা খুঁজে বের করব। চা খেয়েই চলে যাব। তোমার কাছে ঠিকানা আছে না?

জি, আছে।

আমি খুব ভোরেই যাব। যদি এর মধ্যে তোমার চাচা চলে আসেন, তাহলে তুমি তাঁর সঙ্গে চলে যাবে। অবশ্যই যাবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না।

লুনা শান্ত স্বরে বলল, না। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

আমার ফিরতে কত দেরি হবে, কে জানে। হয়তো আটকা পড়ে যাব রাস্তায়। তুমি অপেক্ষা করবে না। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায় ততই ভালো।

রাতে ভাত খাওয়ার জন্যে ডাকতে গিয়ে দেখি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

আমি ভাত খাব না।

তোমার কি শরীর খারাপ লুনা ?

জি-না।

জ্বর না তো ? চোখ-মুখ কেমন যেন ফোলা-ফোলা লাগছে।

জ্বরটর না। কিছু খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

দুধ খাবে ? ঘরে কলা আছে।

জি-না। আমি কিছুই খাব না।

আমি ফিরে আসছি, হঠাৎ লুনা খুব শান্ত স্বরে বলল, আমার মনে হয় কেউ আমাকে নিতে আসবে না।

শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি টিকটিকি ডাকল। লুনা বলল, দেখলেন তো, টিকটিকি বলছে 'ঠিক ঠিক'। তার মানে কেউ আসবে না।

১৪

ঠিকানা নিয়ে যে-বাড়িতে উপস্থিত হলাম সেটি তালাবন্ধ। গেটে 'টু লেট' ঝুলছে। বাড়িওয়ালা আশেপাশেই ছিলেন, আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, বাড়ি ভাড়া করবেন ? খুব সস্তায় পাবেন। সারভেন্টের জন্য আলাদা বাথরুম আছে এখানে। গত বছর দেওয়াল ডিসটেম্পার করলাম।

বাড়ি ভাড়ার জন্যে আসি নি, খোরশেদ আলি সাহেবের খোঁজ করছি। শুনে ভদ্রলোক খুব হতাশ হলেন।

এরা থাকে না এখানে— জুন মাসে বাড়ি ছেড়ে গেছে। অঞ্চলটা নাকি নিরাপদ না। বলেন দেখি কোন অঞ্চলটা নিরাপদ ? আমি তো এখানেই আছি, আমার কিছু হয়েছে ? বলেন দেখি ?

খোরশেদ আলি সাহেবরা এখন থাকেন কোথায় জানেন ?

ঠিকানা আছে। গিয়ে দেখবেন, সেইখানেও নেই। নিরাপদ জায়গা যারা খোঁজে তারা এক জায়গায় থাকে না। ঘোরাঘুরি করে।

ভদ্রলোক ঠিকানা বের করতে এক ঘণ্টা লাগালেন। শেষ পর্যন্ত ঠিকানা যেটা পাওয়া গেল, সেটায় বাড়ির নম্বর দেওয়া নেই। লেখা আছে মসজিদের সামনের হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, মসজিদের সামনেই বাড়ি, তাই মনে করেছে খুব নিরাপদ। বুদ্ধি নেই, লোক তো গাছে হয় না, মায়ের পেটেই হয়।

বহু ঝামেলা করে মসজিদের সামনের হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি খুঁজে বের করলাম। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কথাই ঠিক। খোরশেদ আলি সাহেব এখানেও

নেই। কোথায় গেছেন, তাও কেউ জানে না। বাসায় ফেরার পথে মনে হলো, লুনার চাচা ভদ্রলোক হয়তো আমার ঠিকানাই হারিয়ে ফেলেছেন। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি কাগজটা হারিয়ে ফেলা। ঠিকানা হারিয়ে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বড় আপার বাসায় খোঁজাখুঁজি করছেন। অবশ্যি এ-যুক্তি তেমন জোরালো নয়। বড় আপার বাসার দারোয়ান শমসের মিয়া আমার ঠিকানা খুব ভালো করে জানে। তবে এটা অসম্ভব নয় যে, শমসের মিয়াকে বিদায় দিয়ে নতুন লোক রাখা হয়েছে। খুব সম্ভব বিহারি কেউ। গাড়ির ড্রাইভার যেমন বিহারি রাখা হয়েছে সে-রকম। এ-যুক্তি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হওয়ায় আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে বড় আপার বাসায় দুপুর দু'টার দিকে উপস্থিত হলাম। না, শমশের মিয়াই আছে এবং কেউ এ-বাড়িতে আসেনি। আসবার মধ্যে পিয়ন এসেছে।

খাওয়ার কিছু আছে শমসের মিয়া ?

ঘর তো তালা দেওয়া, ছোট ভাই। চাবি মেমসাবের কাছে।

তোমার কাছে কিছু নাই ?

মুড়ি আছে।

দাও দেখি। তেল মরিচ দিয়ে মেখে। চিঠিপত্র কী আছে দেখি।

চিঠি এসেছে অনুর কাছ থেকে। বড় আপার কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠি (অনু আমাকে কখনো চিঠি লেখে না, নববর্ষের সময় কার্ড পাঠায়)। বড় আপার কাছে লেখা চিঠি আমার পড়তে কোনো দোষ নেই, এই চিন্তা করে চিঠি খুলে ফেললাম, চিঠি পড়ে বড়ই কষ্ট লাগল। এই যে, এত বড় একটা দুঃসময় যাচ্ছে আমাদের, সেই সম্পর্কে শুধু একটি লাইন লেখা— দেশের খবর শুনে খুব চিন্তা লাগছে, সাবধানে থাকবি। তার পরপরই তিন পৃষ্ঠা জুড়ে মন্টানা যাওয়ার পথে কী ঝামেলা হয়েছিল সেটা লেখা— আইডাহো ছাড়ার পাঁচ ঘণ্টা পর গাড়ির ট্রান্সমিশন গেল বন্ধ হয়ে। হাইওয়েতে দু'ঘণ্টা বসে থাকতে হলো। শেষ পর্যন্ত হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ এসে রাত তিনটায় একটা অতি বাজে হোটেলে নিয়ে তুলল। পেটে প্রচণ্ড খিদে। ভেন্ডিং মেশিনে আপেল আর মিল্ক চকোলেট ছাড়া কিছু নেই। বাধ্য হয়ে আপেল আর চকোলেট খেয়ে ঘুমাতে যেতে হলো সবাইকে। আর ঘুম কি আসে ? এয়ারকুলারটা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ।

শমসের মিয়া এক গামলা মুড়ি নিয়ে এলো। কাঁচামরিচ যে ক'টা ঘরে ছিল, সবই বোধহয় দিয়ে দিয়েছে। ঝালের চোটে চোখে পানি আসার যোগাড়। শমসের মিয়া গলা নিচু করে বলল, জায়গায়-জায়গায় নাকি যুদ্ধ শুরু হইছে, কথাডা সত্যি ছোট ভাই ?

সত্যি।

দেশ স্বাধীন হইলে গরিব-দুঃখীর কোনো চিন্তা থাকত না, কী কন ছোট ভাই ?

না থাকারই কথা।

খাওয়া-খাদ্য থাকব বেশুমার।

তা থাকবে।

খারাপের পরে ভালা দিন আয়, এইটা বিধির বিধান।

খুবই খাঁটি কথা, শমসের মিয়া।

চিন্তা করলে মনটার মইদ্যে শান্তি হয়।

বাড়ি ফিরে শুনি লুনার চাচা আজকেও আসেননি। লুনার জ্বরও বেড়েছে। কাদের একজন ডাক্তার নিয়ে এসেছিল। ওষুধপত্র দিয়েছে আর বলেছে রক্ত পরীক্ষা করতে।

লুনা আমাকে দেখে বলল, কাউকে পাননি ?

কাল ঠিক পাব। সকালেই গুলিস্তান থেকে বাস নিয়ে চলে যাব নারায়ণগঞ্জ।

আপনি যে সারাদিন ঘোরাঘুরি করেন, আপনার ভয় লাগে না ?

নাহ্, আমার অচল পা দেখেই মিলিটারিরা মনে করে, একে নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না।

লুনা গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি ভাবছেন আপনার কথা শুনে আমি হাসব ? আমাকে যতটা ছোট আপনি ভাবছেন, তত ছোট আমি না। আমি অনেক কিছু বুঝি।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। লুনা শান্ত স্বরে বলল, এই যে আমার কাল রাত থেকে জ্বর, আপনি কি আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছেন— কতটা জ্বর ? আপনি কি মনে করেন, আমি জানি না কেন আপনি এরকম করছেন ? আমি ঠিকই জানি।

কী জানো ?

লুনা থেমে থেমে বলল, গায়ে হাত দিলেই আমি অন্য কিছু ভাবব, বলেন, ভাবছেন না ? আমি সব বুঝতে পারি। আমি যদি কালো, কুৎসিত একটা মেয়ে হতাম— আপনি ঠিকই আমার গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখতেন। দেখেন টিকটিকি টিকটিক করছে, তার মানে সত্যি।

আমি লুনার কপালে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর গায়ে। স্বাভাবিক সুরে বললাম, লুনা, তুমি শুয়ে থাক, আমি ভাত খেয়ে আসছি। আর তুমি যা বলেছ সেটা ঠিক। খুবই ঠিক।

রান্নাঘরে ঢুকতেই মতিনউদ্দিন সাহেব বললেন, খতমে জালালিটা শুরু করা দরকার। লুনার চাচা আসছে না। এদিকে আবার জ্বরজ্বারি। এক লাখ পঁচিশ হাজার বার 'দোয়া ইউনুস' পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। খুব শক্ত খতম এটা।

ভাত খেতে বসে শুনলাম দূরে কোথায় যেন গোলাগুলি হচ্ছে। থেমে থেমে বন্দুকের আওয়াজ। মতিন সাহেব মাখা ভাত রেখে উঠে পড়লেন। তাকিয়ে দেখি তাঁর পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কাদের বলল, ভয়ের কিছু নাই। নিশ্চিন্ত মনে ভাত খান।

আমার খিদে নেই। বমি বমি লাগছে।

খানিকক্ষণ পর ভারি ভারি দু'টি ট্রাক গেল। মতিন সাহেব ভীত স্বরে বললেন, সব বাতিটাতি নিভিয়ে ফেলা দরকার।

তিনি দিশাহারার মতো জানালা বন্ধ করতে ছুটলেন। কাদের বলল, লক্ষণ খারাপ ছোড ভাই।

রাত দশটায় হঠাৎ বাদশা মিয়া এসে হাজির। সে খুব একটা খারাপ খবর নিয়ে এসেছে। বিহারিরা দল বেঁধে লুটপাট শুরু করেছে। মানুষও মারছে। শুরু হয়েছে তাজমহল রোড, নূরজাহান রোড অঞ্চল থেকে। খবর সত্যি হলে খুবই চিন্তার ব্যাপার। কাদেরের মুখ শুকিয়ে গেল।

আমি বললাম, কোত্থেকে খবর পেয়েছিস?

ঠিক খবর স্যার। এক চুল মিথ্যা না।

লুনার ঘরে গিয়ে দেখি সে জেগে আছে। আমাকে দেখেই বলল, ঐ ছেলেটি কী বলছে?

না, কিছু না।

বলেন আমাকে, কী বলছে?

বিহারিরা নাকি লুটপাট করা শুরু করেছে।

কোন জায়গায়?

শুরু হয়েছে মোহাম্মদপুরে।

মোহাম্মদপুর কত দূর এখান থেকে?

দূর আছে।

আপনি ঠিক করে বলেন। কেন আমাকে লুকাচ্ছেন?

বেশি দূর না।

বাদশা মিয়া থাকল না। কার্ফু হবে দশটা থেকে। তার আগেই দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের ঘরে পৌঁছানো দরকার। সেখানে পুরুষমানুষ কেউ নেই। বাচ্চু ভাইয়ের ছেলের বয়স মাত্র চার বছর।

আমরা বাতিটাতি নিভিয়ে সমস্ত রাত জেগে বসে রইলাম। মাঝরাতের দিকে সোবাহানবাগের দিক থেকে খুব হৈচৈ ও চিৎকার শোনা গেল। এর কিছুক্ষণ পর একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় গুলির শব্দ হতে লাগল। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম।

কাদের, কী করা যায়?

আল্লাহ্‌র নাম নেন ছোড ভাই। আল্লাহ্ মালিক।

লুনা কিছুতেই বিছানায় শুয়ে থাকতে রাজি হলো না। অন্ধকার বারান্দায় আমাদের সঙ্গে সারা রাত বসে রইল। ভোর রাতে মাইকে করে বলা হলো, এই অঞ্চলে বিকাল তিনটা পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ থাকবে।

দিনটি মেঘলা। দুপুর থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আমি নিচতলায় আজিজ সাহেবের ঘরের সামনে চুপচাপ বসে রইলাম। আজিজ সাহেব বা নেজাম সাহেব কারোর কোনো খোঁজখবর নেই। নেজাম সাহেবের নামে একটি রেজিস্ট্রি চিঠি অনেকদিন থেকে পড়ে আছে। লোকটি কোথায় আছে কে জানে?

ছোড ভাই, আপনের চা।

কাদের শুধু চা নয়, একটি পিরিচে দুটি বিস্কিটও নিয়ে এসেছে।

কী ব্যাপার, চা কেন?

ছোড ভাই, এই শেষ্ কাপ চা বানাইলাম।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

আর দেখা হয় কি না-হয়।

ব্যাপার কী!

আমি রফিক ভাইয়ের সাথে মেঘালয় যাইতেছি ছোড ভাই।

কবে?

আইজই যাওনের কথা। কার্ফু তুললেই রওনা দেওনের কথা।

আগে বলিসনি কেন?

কাদের চুপ করে রইল। এক সময় মৃদু স্বরে বলল, কার্ফু ভাঙলেই আমি লুনা আফার জন্যে ডাক্তারের ব্যবস্থা কইরা রফিক ভাইয়ের বাসায় যাইয়াম। এখন ডাক্তার পাইলে হয়।

তাকিয়ে দেখি, কাদের শার্টের হাতায় চোখ মুছছে।

বেলা সাড়ে-তিনটায় কাদের সত্যি চলে গেল। মতিনউদ্দিন সাহেব কিছুই জানেন না বলে মনে হলো। আমাকে বললেন, কাদেরের কাণ্ড দেখেছেন, তিন ঘণ্টার জন্যে কার্ফু রিলাক্স করেছে— এর মধ্যেই তাকে বেরুতে হবে। কথা বললে তো শোনে না। শেষে তার জন্যে সবাই মারা পড়ব।

মতিনউদ্দিন সাহেব গম্ভীর হয়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। আমি বললাম, আপনার কি শরীর ঠিক আছে?

জি, ঠিক আছে।

দেখছেন কেমন ঢালা বর্ষা শুরু হয়েছে?

জি, দেখলাম।

লুনা কি ঘুমাচ্ছে?

মতিন সাহেব হঠাৎ বললেন, মেয়েটার কাছে গিয়ে বসেন। ওর শরীর খুব খারাপ। সহজ স্বাভাবিক ভালোমানুষের মতো কথাবার্তা।

লুনা জেগে ছিল। জ্বরের আঁচে তার ফর্সা গাল লালচে হয়ে আছে। চোখ দুটিও ঈষৎ রক্তবর্ণ।

খুব বেশি খারাপ লাগছে ?

হ্যাঁ।

কাদের এক্ষুণি ডাক্তার পাঠাবে।

আপনি একটু বসবেন আমার কাছে ?

আমি তার মাথার কাছে গিয়ে বসলাম। লুনা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। আমার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলল, একদিন সব আবার আগের মতো হবে, ঠিক না ?

নিশ্চয়ই হবে, খুব বেশি দেরিও নেই।

সেই সময় আপনাকে আমাদের বাসায় কয়েকদিন এসে থাকতে হবে। মতিন সাহেবকে আর কাদেরকেও।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভালোই হবে।

তখন কিন্তু হেন-তেন অজুহাত দিতে পারবেন না।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

আপনার থাকার ইচ্ছা নেই, হাসছেন মনে মনে।

আরে না।

আর যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমি প্রায়ই আপনার এখানে বেড়াতে আসব।

তা তো আসবেই।

তখন আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতে হবে। তখন যদি আপনি মনে করেন যে বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে আমি কী কথা বলব তাহলে খুব রাগ করব।

না, রাগ করতে দেব না।

আমি কিন্তু মোটেই বাচ্চা মেয়ে না। আমি অনেক কিছু জানি। ও-কী, আপনি হাসছেন কেন ?

কই, হাসছি কোথায় ?

মনে মনে হাসছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি। যান, আপনার সঙ্গে কথা বলব না আমি।

লুনা ঝিম মেরে গেল। দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। আমি চুপচাপ কাছে বসে রইলাম। কাদের কি ডাক্তারকে বলতে ভুলে গিয়েছে ? ভোলবার কথা তো নয়।

লুনা সমস্ত দিন কিছুই খায়নি। আমি এক গ্লাস দুধ এনে দিলাম, সে তা স্পর্শও করল না। এক সময় গাঢ় রক্তবর্ণ চোখ মেলে বলল, কাদের এবং মতিন সাহেব এদের একটু ডেকে জিজ্ঞেস করুন তো ওরা আমাদের বাসায় থাকবে কি-না ?

নিশ্চয়ই থাকবে।

তবু আপনি জিজ্ঞেস করুন।

মতিন সাহেবকে ডেকে আনলাম। লুনা জড়িত স্বরে বলল, আপনি কি থাকবেন আমাদের বাসায় কিছু দিন ? থাকতে হবে। না বললে শুনব না।

মতিন সাহেব মুখ কালো করে বললেন, জ্বর মনে হয় খুব বেশি ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, অনেক বেশি। কাদের ডাক্তার পাঠাবে।

কখন পাঠাবে ?

কার্ফু ভাঙার আগেই পাঠাবে।

লুনা বলল, কোনো ডাক্তার আসবে না। কেউ আসবে না আমার জন্যে।

ডাক্তার সত্যি সত্যি এলো না। সন্ধ্যার আগে বাদশা মিয়া এসে উপস্থিত। জানা গেল কাদের দু'জন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, তাদের একজন বলেছেন পরদিন সকালবেলায় আসবেন। অন্যজন বলেছেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আবার কার্ফু। লুনা আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। মাঝে মাঝে বেশ সহজভাবে কথা বলে পরক্ষণেই নিজের মনে বিড়বিড় করে। একবার খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, ঠিক করে বলুন তো, আমার চেয়েও সুন্দরী কোনো মেয়ে দেখেছেন ? আমাকে খুশি করবার জন্যে বললে হবে না। আমি ঠিক বুঝে ফেলব।

আমি চুপ করে রইলাম। লুনার মুখে আচ্ছন্ন ভাব।

চুপ করে থাকলে হবে না, বলতে হবে।

তোমার চেয়ে কোনো সুন্দরী মেয়ে আমি দেখিনি, লুনা।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

আমার গা ছুঁয়ে বলুন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুনার অবস্থা খুব খারাপ হলো। মনে হলো লোকজন ঠিক চিনতে পারছে না। মতিন সাহেব ঘরে ঢুকতেই বলল, আপনি আমার আম্মিকে একটু ডেকে দেবেন ?

মতিন সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

ডেকে দিন না। বেশিক্ষণ কথা বলব না, সত্যি বলছি।

মতিন সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, শফিক ভাই, আমি ডাক্তারের খোঁজে যাব। আপনি ওর কাছে বসে থাকুন। হাসপাতালে নিতে হবে।

মতিন সাহেবের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সহজ সাধারণ মানুষের মতো কাপড় পরলেন। বাদশা অবাক হয়ে বলল, কার্ফুর মইধ্যে যাইবেন ?

হ্যাঁ।

আমি বললাম, সত্যি সত্যি বেরুচ্ছেন মতিন সাহেব ?

হ্যাঁ। কাদের মুক্তিবাহিনীতে গেছে শুনেছেন ?

শুনেছি।

বাদশা বলল, খুব নাকি কাঁদছিল। কাঁদার তো কিছু নেই, কী বলেন ?

মতিনউদ্দিন সাহেব জুতো পায়ে দিতে-দিতে বললেন, দেখবেন, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বসে রইলাম মেয়েটির পাশে। জানালা দিয়ে দেখছি, শান্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে মতিনউদ্দিন সাহেব এগোচ্ছেন। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তাঁর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে।

একদিন এই দুঃস্বপ্ন নিশ্চয়ই কাটবে। এই অপূর্ব রূপবতী মেয়েটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে হয়তো সত্যি সত্যি বেড়াতে আসবে এ বাড়িতে। বিলু-নীলুরা ফিরে আসবে একতলায়। অকারণেই বিলু দোতলায় উঠে এসে চোখ ঘুরিয়ে বলবে, আচ্ছা বলুন দেখি, দুই এবং তিন যোগ করলে কখন সাত হয় ? কনিষ্কও ফিরে এসে গর্বিত ভঙ্গিতে রেলিং-এ বসে ডাকবে 'কা-কা'। কাদের মিয়া বিরক্ত ভঙ্গিতে বলবে— 'কী অলক্ষণ! যা-যা, ভাগ।' গভীর রাতে মুষলধারে বর্ষণ হবে। সেই বর্ষণ অগ্রাহ্য করে পাড়ার বখাটে ছেলেরা সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে শিস দিতে-দিতে বাড়ি ফিরবে। বৃষ্টির ছাটে আমার তোষক ভিজে যাবে, তবু আমি আলস্য করে উঠব না।

আমি বসেই রইলাম। বসেই রইলাম। লুনা ফিসফিস করে তার মাকে একবার ডাকল। হঠাৎ লক্ষ করলাম, মতিন সাহেব ঠিকই বলেছেন। মেয়েটির নাকের ডগায় ছোট একটি লাল রঙের তিল। বহু দূরে একসঙ্গে অনেকগুলি কুকুর ডাকতে লাগল। আমার ঘরের প্রাচীন তক্ষকটি বুক সেলফের কাছ থেকে মাথা ঘুরিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছোটগল্প

নিশিকাব্য

নিশিকাব্য

পরী মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে এসে দেখে চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে। চিকমিক করছে চারদিক। সে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। এরকম জ্যোৎস্নায় মন খারাপ হয়ে যায়।

বেশ রাত হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকেছে অনেক আগে। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। শুধু আজিজ সাপ খেলানো সুরে পরীক্ষার পড়া পড়ছে। পরীর এখন আর কিছুই করার নেই। সে একাকী উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল।

কী করছ ভাবি ?

পরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, হারিকেন হাতে রুনু এসে দাঁড়িয়েছে। সে হালকা গলায় বলল, ঘুমুবে না ভাবি ?

ঘুমুব। দাঁড়া একটু। কী চমৎকার জ্যোৎস্না দেখলি ?

হুঁ।

আয় রুনু, তোকে একটা জিনিস দেখাই।

কী জিনিস ?

ঐ দেখ জামগাছটার কেমন ছায়া পড়েছে। অবিকল মানুষের মতো না ? হাত-পা সবই আছে।

ও-মা, তাই তো! রুনু তরল গলায় হেসে উঠল।

পরী বলল, কুয়োতলায় একটু বসবি নাকি রে রুনু ? চল বসি গিয়ে।

তোমার মেয়ে জেগে ওঠে যদি ?

বেশিক্ষণ বসব না, আয়।

কুয়োতলাটা বাড়ি থেকে একটু দূরে। তার দু'পাশে দু'টি প্রকাণ্ড শিরীষ গাছ। জায়গাটা বড় নিরিবিলি। রুনু বলল, কেমন অন্ধকার দেখেছ ভাবি ? ভয় ভয় লাগে।

ধুর, ভয় কিসের! বেশ হাওয়া দিচ্ছে, তাই না ?

হ্যাঁ।

দু'জনেই কুয়োর বাঁধানো পাশটায় চুপচাপ বসে রইল। ঝিরঝির বাতাস বইছে। বেশ লাগছে বসে থাকতে। পরী কী মনে করে যেন হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসছ কেন ভাবি ?

এমনি। রাস্তায় একটু হাঁটবি নাকি ?

কোথায় ?

চল না, হাঁটতে হাঁটতে পুকুরপাড়ের দিকে যাই। বেশ লাগছে না জ্যোৎস্নাটা?

রুনু সে-কথার জবাব না দিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, দেখ ভাবি, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ওইখানটায়?

শিরীষ গাছের নিচে যেখানে ঘন হয়ে অন্ধকার নেমেছে, সেখানে সাদা মতো কী একটি যেন নড়ে উঠল।

কে ওখানে? কথা বলে না যে! কে?

কেউ সাড়া দিল না। রুনু পরীর কাছে সরে এলো। ফিসফিস করে বলল, ভাবি, ছোটভাইজানকে ডাক দাও।

তুই দাঁড়া না, আমি দেখছি। ভয় কিসের এত?

সাহস দেখাতে হবে না ভাবি, তুমি ছোটভাইজানকে ডাক।

শিরীষ গাছের নিচের ঘন অন্ধকার থেকে একটা লোক হেসে উঠল। হাসির শব্দ শুনেই রুনু বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বড়ভাইজান এসেছে। বড়ভাইজান এসেছে।

পর মুহূর্তেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়িতে খবর দিতে।

আনিস স্যুটকেস কুয়োতলায় নামিয়ে পরীর পাশে এসে দাঁড়াল। পরী কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। তার কেন জানি চোখে পানি এসে পড়ল।

টুকুন ভালো আছে, পরী?

হুঁ।

আর তুমি?

ভালো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?

তোমাদের আসতে দেখে দাঁড়ালাম। কী মনে করেছিলে— ভূত?

পরী তার জবাব না দিয়ে হঠাৎ নিচু হয়ে কদমবুসি করল। আনিস অপ্রস্তুত হয়ে হাসল।

কী যে করো তুমি পরী, লজ্জা লাগে।

ততক্ষণে হারিকেন হাতে বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছে। পরী বলল, তুমি আগে যাও। স্যুটকেস থাক, রশীদ নিয়ে যাবে।

আনিস হাসিমুখে হাঁটতে লাগল।

বাড়ির উঠোনে আনিস এসে দাঁড়াতেই আনিসের মা কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অভ্যাসই এরকম। যে-কোনো খুশির ব্যাপারে মরাকান্না কাঁদতে বসেন। কেউ ধমক দিয়ে না থামালে সে-কান্না থামে না। আনিসের বাবা চেঁচিয়ে বললেন, একটা জলচৌকি এনে দে না কেউ, বসুক। সবগুলো হয়েছে গাধা। রুনু, হাঁ করে দেখছিস কী? পাখা এনে হাওয়া কর।

আনিসের ছোটভাই আজিজ বলল, খবর দিয়ে আসে নাই কেন দাদা? খবর দিলেই ইস্টিশনে থাকতাম।

আনিস কিছু বলল না। জুতোর ফিতা খুলতে লাগল। আনিসের মা'র কান্না তখনো থামে নি। এবার আজিজ ধমক দিল।

আহ মা, তোমার ঘ্যানঘ্যানানি থামাও।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কান্না থেমে গেল। সহজ ও স্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, তোর শরীরটা এত খারাপ হলো কী করে রে আনিস ? পেটের ওই অসুখটা সারেনি ? চিকিৎসা করাচ্ছিস তো বাবা ?

সবাই লক্ষ করল আনিসের শরীর সত্যি খারাপ হয়েছে। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল ভেতরে বসে গেছে। আনিসের বাবা বললেন, স্বাস্থ্য খারাপ হবে না! মেসের খাওয়া। পাঁচ বছর মেসে থাকলাম, জানি তো সব। বুঝলে আনিসের মা, মেসে খাওয়ার ধারাই ওই।

পরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আনিসের জন্য নতুন করে রান্না চড়াতে হবে। তবু তার ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। পরীর শাশুড়ি একসময় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ও-কী বৌমা, সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন ? রান্না চড়াও গিয়ে। তার আগে আনিসকে চা দাও এক কাপ।

পরী অপ্রস্তুত হয়ে রান্নাঘরে চলে এলো। রুনু এলো তার পিছু পিছু।

রুনু হেসে বলল, আমি চা বানিয়ে আনছি, তুমি ভাইজানের কাছে থাক ভাবি।

পরী লজ্জা পেয়ে হাসল। তুই তো ভারি ফাজিল হয়েছিস রুনু।

হয়েছি তো হয়েছি। তোমাকে একটা কথা বলি ভাবি।

কী কথা ?

রুনু ইতস্তত করতে লাগল। পরী অবাক হয়ে বলল, বল না কী বলবি।

বাবা আমার যেখানে বিয়ে ঠিক করেছেন সেটা আমার পছন্দ না ভাবি। ভাইজানকে বুঝিয়ে বলবে তুমি। দোহাই তোমার।

পরী আশ্চর্য হয়ে বলল, পছন্দ হয়নি কেন রুনু ? ছেলেটা তো বেশ ভালোই। কত জায়গাজমি আছে। তার উপর স্কুলে মাস্টারি করে।

করুক। আমার একটুও ভালো লাগেনি। কেমন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিল দেখতে এসে। না না ভাবি, তোমার পায়ে পড়ি।

আচ্ছা আচ্ছা, পায়ে পড়তে হবে না। আমি বলব।

রুনু খুশি হয়ে বলল, তুমি বড় ভালো মেয়ে ভাবি।

তাই নাকি ?

হুঁ। ভাইজান হঠাৎ আসায় তোমার খুব খুশি লাগছে, তাই না ?

পরী জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে হাসতে লাগল।

বলো না ভাবি, খুব খুশি লাগছে ?

লাগছে।

রুনু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। থেমে থেমে বলল, ভাইজানের চাকরিটা বড় বাজে। বৎসরে দশটা দিন ছুটি নেই। গত ঈদে পর্যন্ত আসল না।

পরী কিছু বলল না। চায়ের কাপে চিনি ঢালতে লাগল।

রুনু বলল, এবার তুমি বাসা করে ভাইজানের সঙ্গে থাক ভাবি। মেসের খাওয়া খেয়ে তার শরীরের কী হাল হয়েছে, দেখেছ ?

পরী মৃদুস্বরে বলল, দুই জায়গায় খরচ চালানো কি সহজ কথা ? অল্প ক'টা টাকা পায়। চা হয়ে গেছে, নিয়ে যা রে রুনু।

রুনু চা নিয়ে এসে দেখে তার বিয়ে নিয়েই আলাপ হচ্ছে। বাবা বলছেন, ছেলে হলো তোমার বিএ ফেল। তবে এবার প্রাইভেট দিচ্ছে। বংশটংশ খুবই ভালো। ছেলের এক মামা ময়মনসিংহে ওকালতি করেন। তাঁকে এক ডাকে সবাই চিনে।

আনিসের মা বলছেন, ছেলে দেখতে শুনতে খারাপ না— রঙটা একটু মাজা। পুরুষমানুষের ফর্সা রঙ কি আর ভালো ? ভালো না।

আনিস বলল, রুনুর পছন্দ হয়েছে তো ? তার পছন্দ হলে আপত্তি কী ?

পাশের বাড়ি থেকে আনিসের ছোট চাচা এসেছেন খবর পেয়ে। তিনি বললেন, রুনুর আবার পছন্দ-অপছন্দ কী ? আমাদের পছন্দ নিয়ে কথা।

আনিস রুনুর দিকে তাকিয়ে হাসল। লজ্জা পেয়ে রুনু চলে এলো রান্নাঘরে।

আনিসের বাবা বললেন, কাল বিকালে না হয় ছেলেটাকে খবর দিয়ে আনি। তুই দেখ।

কাল বিকাল পর্যন্ত তো থাকব না বাবা। আজ শেষরাতেই যাব।

সে-কী!

ছুটি নিয়ে আসিনি তো। কোম্পানি একটা কাজে পাঠিয়েছিল ময়মনসিংহ। অনেকদিন আপনাদের দেখি নাই। কাজটাও হয়ে গেল সকাল সকাল। তাই আসলাম।

একটা দিন থাকতে পারিস না ?

উঁহু। কাল অফিস ধরতেই হবে। প্রাইভেট কোম্পানি, বড় ঝামেলার চাকরি।

আনিস একটা নিঃশ্বাস ফেলল। সবাই চুপ করে গেল হঠাৎ। চার মাস পর এসেছে আনিস। আবার কবে আসবে কে জানে। আনিসের মা কাঁপা গলায় বললেন, তোর বড় সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে দে না।

আনিস হেসে উঠল। গায়ের শার্ট খুলতে খুলতে বলল, বড়কর্তা যদি কোনোমতে টের পায় আমি বাড়িতে এসে বসে আছি, তাহলেই চাকরি নট হয়ে যাবে। গোসল করব মা, গা কুটকুট করছে।

কুয়োয় করবি ? পানি তুলে দেবে ?

উঁহু, পুকুরে করব। পুকুরে মাছ আছে রে আজিজ ?

আছে ভাইজান। বড় বড় মৃগেল মাছ আছে।

আনিসের পিছু পিছু পুকুরপাড়ে সবাই এসে পড়ল। আনিসের বাবা আর মা পাড়ে বসে রইলেন। আজিজ 'ভীষণ গরম লাগছে' এই বলে আনিসের সঙ্গে গোসল করতে নেমে গেল। ঝুনু ঘাটের ওপর তোয়ালে আর সাবান নিয়ে অপেক্ষা করছে। আনিসের সবচেয়ে ছোট বোন ঝুনু, ঘুমিয়ে পড়েছিল। আনিস ভোর রাতে চলে যাবে শুনে তার ঘুম ভাঙানো হয়েছে। সেও এসে চুপচাপ রুনুর পাশে বসেছে। শুধু পরী আসেনি। দু'টি চুলোয় রান্না চাপিয়ে সে আগুনের আঁচে বসে আছে একাকী।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে অনেক রাত হলো। আনিসকে ঘিরে গোল হয়ে সবাই বসে গল্প করতে লাগল। উঠোনে শীতল পাটিতে বসেছে গল্পের আসর। এর মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রুনু ঘুমুচ্ছে। চমৎকার চাঁদনি, সেই সঙ্গে মিষ্টি হাওয়া। কারুর উঠতে ইচ্ছে করছে না। পরীর কাজ শেষ হয়নি। সে বাসন-কোসন নিয়ে ধুতে গেছে ঘাটে। একসময় রুনু বলল, ভাইজান এখন ঘুমোতে যাক মা। রাত শেষ হতে দেরি নেই বেশি। আনিসের বাবা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, যা রে তুই ঘুমুতে যা। রুনু, তুই বৌ-মাকে পাঠিয়ে দে। বাসন সকালে ধুলেই হবে।

ঘরের ভেতর হারিকেন জ্বলছিল। আনিস সলতা বাড়িয়ে দিল। টুকুন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আনিস চুমু খেল তার কপালে। পরীর দিকে তাকিয়ে বলল, জ্বর নাকি টুকুনের ?

হুঁ।

কবে থেকে ?

কাল থেকে। সর্দি জ্বর। ও কিছু না। ঘাম দিচ্ছে, এক্ষুনি সেরে যাবে।

আনিস পরীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। পরীর লজ্জা করতে লাগল। পরী বলল, হাসছ কেন ?

এমনি। পরী, তোমার জন্যে শাড়ি এনেছি একটা। দেখ তো পছন্দ হয় কি-না।

পরী খুশি খুশি গলায় বলল, অনেকগুলো পয়সা খরচ করলে তো।

শাড়িটা পরো, দেখি কেমন তোমাকে মানায়।

রুনুর জন্যে একটা শাড়ি আনলে না কেন ? বেচারির একটাও ভালো শাড়ি নেই।

পয়সায় কুলোলে আনতাম। আরেকবার আসার সময় আনব।

পরী ইতস্তত করে বলল, আমার একা একা শাড়ি নিতে লজ্জা লাগবে। এইটি রুনুর জন্যে থাক। আরেকবার নিয়ে এসো আমার জন্যে।

আনিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশ থাক তবে, আজ রাতের জন্যে পরো না দেখি ?

শাড়ির ভাঁজ ভেঙে যাবে যে। রুনু মনে করবে আমার জন্যে এনেছিলে, পরে তাকে দিয়েছ।

আচ্ছা, তাহলে থাক।

পরী লজ্জিত স্বরে বলল, বিয়ের শাড়িটা পরব ? যদি বলো তাহলে পরি।

পরী লজ্জায় লাল হয়ে ট্রাঙ্কের তালা খুলতে লাগল। আনিস বলল, টুকুন দেখতে তোমার মতো হয়েছে, তাই না ?

হ্যাঁ, আব্বা তাকে ছোট পরী ডাকে। আচ্ছা টুকুনের একটা ভালো নাম রাখ না কেন ?

জরী রাখব তার নাম।

জরী আবার কেমন নাম ?

তোমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখলাম। পরীর মেয়ে জরী।

পরী হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, অন্যদিকে তাকিয়ে থাক, শাড়ি বদলাব।

কী হয় অন্যদিকে না তাকালে ?

আহ, শুধু অসভ্যতা!

আনিস মাথা নিচু করে টুকুনকে আদর করতে লাগল। পরী হালকা গলায় বলল, দেখ তো কেমন লাগছে ?

একেবারে লাল পরী।

ইশ, শুধু ঠাট্টা।

রান্নাঘর থেকে ধুপধুপ শব্দ উঠছে।

আনিস বলল, এত রাতে ধান কুটছে কেন ?

ধান কুটছে না, চাল ভানছে। তোমার জন্যে পিঠা তৈরি হবে।

নিশ্চয়ই রুনুর কাণ্ড।

আনিস পরীর হাত ধরে তাকে কাছে টানল। পরীর চোখে আবার পানি এসে পড়ল। গাঢ়স্বরে বলল, আবার কবে আসবে ?

জুলাই মাসে।

কতদিন থাকবে তখন ?

অ-নে-ক দিন।

তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন ? পেটের ওই ব্যথাটা এখনো হয় ?

হয় মাঝে মাঝে।

টুকুন কেঁদে জেগে উঠল। পরী বলল, জ্বর আরো বেড়েছে। ও টুকুন সোনা, কে এসেছে দেখ। দেখ তোমার আব্বু এসেছে।

আনিস বলল, আমার কোলে একটু দাও তো পরী। আরে আরে মেয়ের একটা দাঁত উঠেছে দেখছি। কী কাণ্ড। ও টুকুন, ও জরী, একটু হাস তো মা। ও সোনামণি,

দেখি তোমার দাঁতটা ?

টুকুন তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। তাই দেখে আনিস ও পরী দু'জনেই হাসতে লাগল।

আমার জরীসোনা কথা শিখেছে নাকি, পরী ?

হুঁ। মা বলতে পারে। আর পাখি দেখলে বলে, ফা ফা।

আনিস হো হো করে হেসে উঠল, যেন ভীষণ একটা হাসির কথা। হাসি থামলে বলল, আমার জরী তোমার চেয়েও সুন্দর হবে। তাই না পরী ?

আমি আবার সুন্দর নাকি ?

না, তুমি ভীষণ বিশ্রী।

আনিস আবার হেসে উঠল। তার একটু পরেই বাইরে কাক ডাকতে লাগল। আনিসের বাবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ও আনিস, ও আনিস।

জি, আব্বা।

এখন রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারবি না বাবা।

আনিস টুকুনকে শুইয়ে দিল বিছানায়। পরী কোনো কথা বলল না। আনিস বাইরে বেরিয়ে দেখল চাঁদ হেলে পড়েছে। জ্যোৎস্না ফিকে হয়ে এসেছে। বিদায়ের আয়োজন শুরু হলো। ঘুমন্ত ঝুনুকে আবার ঘুম থেকে টেনে তোলা হলো। সে হঠাৎ বলে ফেলল, ভাবি আজ বিয়ের শাড়ি পরেছে কেন ?

কেউ তার কথার কোনো জবাব দিল না। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী আকাশের চাঁদ। পরীকে অহেতুক লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যেই হয়তো একখণ্ড বিশাল মেঘের আড়ালে তার সকল জ্যোৎস্না লুকিয়ে ফেলল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল আনিস। শেষরাতের ট্রেনটা যেন কিছুতেই মিস না হয়।

শ্যামল ছায়া

খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

কয়েক মুহূর্ত সে নিঃশ্বাস নিতে পারল না, দম আটকে এলো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রহিমার এরকম হয়। আজ একটু বাড়াবাড়ি হলো, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। রহিমা ভয় পেয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, মজিদ মিয়া! ও মজিদ মিয়া!

মজিদ শেষপ্রান্তে থাকে। এত দূরে গলার আওয়াজ পৌঁছানোর কথা নয়। তবু রহিমার মনে হলো মজিদ বিছানা ছেড়ে উঠেছে, দরজা খুলছে শব্দ করে। এই আবার যেন কাশল। রহিমা চিকন সুরে দ্বিতীয়বার ডাকল, ও মজিদ মিয়া! ও মজিদ!

কিন্তু কেউ এলো না। মজিদ তাহলে শুনতে পায় নি। চোখে পানি এসে গেল রহিমার। হাঁপাতে হাঁপাতে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর একসময় হঠাৎ করে ব্যথাটা মরে গেল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো। একটু আগেই যে মরে যাবার মতো অনুভূতি হয়েছে তাও পর্যন্ত মনে রইল না।

নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে এলো রহিমা। বালিশের নিচ থেকে দেয়াশলাই নিয়ে হারিকেন ধরাল। খুব আস্তে অনেকটা সময় নিয়ে দরজার খিল খুলল। রাতেরবেলা ঝন্‌ঝন্‌ করে দরজা খুললে মজিদ বিরক্ত হয়। বাইরে বেশ শীত, ঠান্ডা বাতাস বইছে। কার্তিক মাসের শুরুতেই শীত নেমে গেছে এবার। বাঁ হাতে হারিকেন উঁচু করে ধরে পা টিপে টিপে মজিদের ঘরের পাশে এসে দাঁড়াল রহিমা। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে মজিদ এখনো জেগে। বুকের নিচে বালিশ দিয়ে উবু হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। ঘরের মেঝেতে আধখাওয়া সিগারেটের আস্তরণ। কটু গন্ধ আসছে সিগারেটের। রহিমা কোনো সাড়াশব্দ করল না। চুপচাপ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল।

রহিমা ভেবে পায় না এত রাত জেগে কী পড়ে ছেলেটা। পরীক্ষার পড়া তো কবেই শেষ হয়েছে। রহিমা অনেকক্ষণ হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার যখন ঝিমুনি এসে গেল তখন মৃদু গলায় ডাকল, ও মজিদ মিয়া।

মজিদ বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, ঠিক করে ডাক মা। কী সব সময় মিয়া মিয়া করো।

রহিমা একটু অপ্রস্তুত হলো। (মজিদকে মজিদ মিয়া ডাকলে সে রাগ করে কিন্তু রহিমার একটুও মনে থাকে না।) রহিমা বলল, শুয়ে পড় মজিদ।

তুমি ঘুমাও গিয়ে। ঘ্যানঘ্যান করো না।

রহিমা মৃদু গলায় বলল, জানালা বন্ধ করে দেই ? ঠান্ডা বাতাস।

মজিদ সে-কথার জবাব দিল না। বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল। রহিমা তবুও দাঁড়িয়ে রইল। তার ঘুমুতে ইচ্ছে করছিল না। কে জানে আবার হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে, দম বন্ধ হয়ে যাবার কষ্টটা নতুন করে শুরু হবে। মজিদ রাগী গলায় বলল, যাও না মা, দাঁড়িয়ে থেকো না।

রহিমা জানালার পাশ থেকে সরে এলো। মজিদকে তার ভয় করে। অথচ জন্মের সময় সে এই এতটুকুন ছিল। রাত-দিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদত। মজিদের বাবা বলত, এই ছেলে বাঁচবে না গো, এরে বেশি মায়া করলে কষ্ট পাবে।

ছি ছি, কী অলক্ষুণে কথা! বাপ হয়ে কেউ এরকম বলে ? লোকটার ধারাই এমন, কথার কোনো মা-বাপ নাই।

রহিমা এসে শুয়ে পড়ল। ঘুমুতে তার ভালো লাগে না। তাই ঘুম তাড়াতে নানা কথা ভাবে। রাত জেগে ভাববার মতো ঘটনা তার বেশি নেই। ঘুরেফিরে প্রতি রাতে একই কথা সে ভাবে। যেন সে একা একা একটি সাজানো ঘরে বসে আছে। হৈচৈ হচ্ছে খুব। মনটা বেশি ভালো নেই। ভয় ভয় করছে এবং একটু কান্না পাচ্ছে তার। এমন সময় বড় ভাবি মজিদের বাবাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন, নাও তোমার জিনিস। এখন দু'জনে মিলে ভাবসাব কর। এই বলে বাইরে থেকে খুট করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। নতুন শাড়ি পরে জড়সড় হয়ে বসে আছে রহিমা। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। কী বলবে তা-ও ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় কী কাণ্ডটাই না হলো। কথাবার্তা নেই হড়হড় করে লোকটা বমি করে বিছানা ভাসিয়ে ফেলল। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে রহিমা তাকে এসে ধরল। ভাবতে ভাবতে চোখ ভিজে ওঠে। আহা, নতুন বউয়ের সামনে কী লজ্জাটাই না পেয়েছিল লোকটা। কতদিনকার কথা, অথচ মনে হয় এই তো সেদিন।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে রহিমা উঠে বসল। পানের বাটা থেকে পান বের করল। সুপুরি কাটল কুচি কুচি করে। পান মুখে দিয়ে আগের মতো চুপিচুপি মজিদের জানালায় উঁকি দিল। না, এখনো ঘুমায়নি। রহিমা মজিদের কোনো ব্যাপারই বুঝতে পারে না। লেখাপড়া না-জানা মূর্খ বাপ-মা'র ছেলে যদি বৃত্তিটৃত্তি পেয়ে পাস করতে করতে এমএ পাস করে ফেলে তাহলে সে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

একসময় মজিদের চোখ গিয়ে পড়ে জানালায়। এ-কী মা, এখনো ঘুরঘুর করছ? ঘুমাও না কেন?

যাই বাবা, যাই।

রহিমার নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। বারান্দায় এসে বসে রইল একা একা। আধখানা চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় আবছাভাবে সবকিছু নজরে পড়ে। রাতেরবেলা একলা লাগে তার। বুকের মধ্যে হু-হু করে। দিনের বেলাটা এতটা খারাপ লাগে না। ঘরের কত কাজকর্ম আছে। কাজের লোক নেই। তাকেই সব করতে হয়। সময়টা বেশ কেটে যায়। বাসার কাছেই মাইকের দোকান আছে একটা। তারা সারাদিনই কোনো গানের সিকিখানা, কোনো গানের আধাআধি বাজায়। বেশ লাগে।

মজিদের বাবারও গান ভালো লাগত। এক একবার গান শুনে চেঁচিয়ে বলেছে, ফাস ক্লাস, ফাস ক্লাস। মজিদের বাপ লোকটা আমোদ-আহ্লাদের বড় কাঙাল ছিল। বদনসিব লোক। আমোদ-আহ্লাদ তার ভাগ্যে নাই। কোনোদিন হয়তো জামা-টামা পরে খুশি হয়ে গেছে সিনেমা দেখতে। ফিরে এসেছে মুখ কালো করে। হয় টিকিট পায়নি, নয়তো পকেট মার গেছে। কোনো বিয়ের দাওয়াত-টাওয়াত পেলে হাসিমুখে গিয়েছে কিন্তু খেতে পায়নি কিছু। তার খাওয়ার আগেই খাবার শেষ হয়ে গেছে। নিজের ছেলেটা যখন লেখাপড়া শেষ করেছে, চাকরি-বাকরি করে বাপকে আরাম

দেবে, তখনি কথা নেই বার্তা নেই বিছানায় শুয়েই শেষ। রহিমা রান্নাঘর থেকে বলেছে পর্যন্ত, অসময়ে ঘুমাও কেন ? চা খাবে, চা দেব ?

রহিমা সেই মন্দভাগ্য লোকটার কথা ভেবে নিঃশ্বাস ফেলল। এমন খারাপ ভাগ্যের লোক আছে দুনিয়ায় ? মরণের সময়ও যার পাশে কেউ রইল না। মজিদের তখন কোনো খোঁজ নেই। কোথায় নাকি গিয়েছে মিটিং করতে। তার বাপকে কাফন পরিয়ে খাটিয়ায় তুলে সবাই যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলে হাঁক দিয়েছে তখন মজিদ নেমেছে রিকশা থেকে। বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছে, কী হয়েছে ?

আহা! লোকটা সারাজীবন কী কষ্টটা না করল। কী কষ্ট! কী কষ্ট, মেকানিকের আর কয় পয়সা বেতন ? বাড়ির জমিজমা যা ছিল বেচে বেচে পড়ার খরচ চলল মজিদের। এত কষ্টের পয়সায় পড়ে আজ মজিদের এই হাল। সন্ধ্যা নামতেই বন্ধুরা আসে। মিটিং বসে ঘরে। ট্রেড ইউনিয়ন, মৎস্য সমবায় সমিতি, হেনো তেনো। ছি।

মজিদের মাথায় কিসের পোকা ঢুকেছিল কে জানে। মজিদের বাপকে রহিমা কত বলেছে, ছেলেকে এসব করতে মানা কর গো, কোনদিন পুলিশে ধরবে তাকে।

মজিদের বাপ শুধু বলেছে, বুঝদার বিদ্বান ছেলে, আমি মূর্খ মানুষ, আমি কী বলব ?

রহিমার শীত করছিল, সে ঘরের ভেতর চলে গেল। অন্ধকার ঘরে ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা লাগল কিসের সঙ্গে। পিতলের বদনা ঝনঝন করে গড়িয়ে গেল কতদূর। মজিদ ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, কে কে ?

আমি।

আর কোনো সাড়াশব্দ হলো না। রহিমা যখন ভাবছে আবার শুয়ে পড়বে কি-না, তখনি শুনল মজিদ বেশ শব্দ করে হাসছে। কী কাণ্ড। রহিমা ডাকল, ও মজিদ মিয়া।

কী ?

হাস কেন ?

এমনি হাসি। ঘুমাও তো, ফ্যাচফ্যাচ করো না।

না, মজিদকে রহিমা সত্যি বুঝতে পারে না। শুধু মজিদ নয়, মজিদের বন্ধুদেরও অচেনা লাগে। ঠিক সন্ধ্যাবেলায় তারা আসে। চোখের দৃষ্টি তাদের কেমন কেমন। কথা বলে থেমে থেমে, নিচু গলায় হাসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে তাদের আলাপ। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পাশের রইসুদ্দীনের চায়ের স্টল থেকে দফায় দফায় চা আসে। কিসের এত গল্প তাদের ? রহিমা দরজার সাথে কান লাগিয়ে শুনতে চেষ্টা করে।

না, ইলেকশন হবে না। পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

কিন্তু না হলে আমাদের করণীয় কী ?

শেখ সাহেব কী ভাবছেন তা জানা দরকার।

শেখ সাহেব আপস করবেন। সাফ কথা।

সাদেক বেশি বাড়াবাড়ি করছে। একটু কেয়ারফুল না হলে...

রহিমার কাছে সমস্তই দুর্বোধ্য মনে হয়। তবু রোজ দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে সে শোনে। আর যদি কোনোদিন শিখা নামের মেয়েটি আসে তবে তো কথাই নেই। রহিমা জোঁকের মতো দরজার সঙ্গে সেঁটে থাকে। শিখা আসে লম্বা একটি নক্‌শিদার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে। একটুও সাজগোজ করে না, তবু কী সুন্দর লাগে তাকে। সে হাসতে হাসতে দরজায় ধাক্কা দেয়। ভেতর থেকে মজিদ গম্ভীর হয়ে বলে, কে ? কে ? (যদিও হাসির শব্দ শুনেই মজিদ বুঝতে পেরেছে কে, তবু তার এই ঢংটা করা চাই-ই।)

আমি, আমি শিখা।

অগ্নিশিখা নাকি ?

না, আমি প্রদীপশিখা।

বলতে বলতে মেয়েটা হাসিতে ভেঙে পড়ে। দরজা খুলে মজিদ বেরিয়ে আসে। মজিদের চোখ-মুখ তখন অন্যরকম মনে হয়। দেখে-শুনে রহিমার ভালো লাগে না। কে জানে শিখাকে হয়তো পছন্দ করে ফেলেছে। হয়তো এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে রেখেছে অথচ মজিদের বাপ সুতাখালীর ওই শ্যামলা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের বিয়ে দেবে বলে কী খুশি (টাঙ্গাইলের লালপাড় একটি শাড়িও সে দিয়েছে হাসিনা নামের ওই ভালোমানুষ মেয়েটিকে। রহিমা মেয়েটিকে দেখে নি, শুনেছে খুব নরম মেয়ে আর ভীষণ লক্ষ্মী)। আহা, মজিদের বাপ বেচারা বিয়েটা দিতে পারল না! আহা!

রহিমা কতবার দেখেছে শিখা এলেই মজিদ কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। শুধু শুধু হো হো করে হাসে। চায়ের সঙ্গে খাবার আনতে নিজেই উঠে যায়। কথাবার্তার মাঝখানে ফস করে বলে, আজ আর ইলেকশন-ফিলেকশন ভালো লাগছে না। আজ অন্য আলাপ করব। ঘরে যারা থাকে তারা উসখুস করলেও আপত্তি করে না। তখন শোনা যায় হাসির হল্লা। মেয়েমানুষ এত চেঁচিয়ে কী করে হাসে রহিমা বুঝতে পারে না। শুধু হাসি নয়, গানটানও হয়। শিখা মেয়েটি মাঝে মাঝে গান গায় (তার জন্য সবাইকে খুব সাধ্য-সাধনা করতে হয়। খুব অহঙ্কারী মেয়ে)। রহিমা বুঝতে পারে না এত রাত পর্যন্ত মেয়েমানুষ কী করে আড্ডা দেয়। মজিদের বাপ এসব দেখেও কোনোদিন কথা বলেনি। শুধু বলেছে, বুঝদার বিদ্বান ছেলে, আমি কী করব ?

মজিদের বাপ লোকটাও কি কম বুঝদার ছিল ? চুপ করে থাকলে কী হবে, দুনিয়ার হাল অবস্থা ঠিক বুঝত। রহিমার কতবার মনে হয়েছে পড়াশোনা করতে পেলে এই লোকটাও বন্ধুদের সাথে সন্ধ্যাবেলা ইংরেজিতে গল্প করত। নসিবে দেয়নি। ইমানদার লোক বদনসিব হয়। রহিমা আবার বিছানা ছেড়ে উঠল। বাতি জ্বালল। একা একা অন্ধকার ঘরে ভালো লাগে না। যুদ্ধের পর তেলের যা দাম

হয়েছে। কে আর সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখবে ? ওই ঘরে মজিদ আবার ঘুমের মধ্যে খুকখুক করে কাশছে। নতুন হিম পড়েছে। রহিমা কতবার বলেছে জানালা বন্ধ করে ঘুমুতে। কিন্তু মজিদ কিছুতেই শুনবে না। বন্ধ ঘরে তার নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। মজিদের বাপেরও এরকম বদঅভ্যাস ছিল। মাঘ মাসের শীতেও জানালা খোলা রাখা চাই। একবার তো খোলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার শার্ট আর গেঞ্জি নিয়ে গেল। শার্টের পকেটে ছয় টাকা ছিল। কী মুশকিল। শেষ পর্যন্ত মজিদের বাপ ছোট এক শার্ট গায়ে দিয়ে কারখানায় গেছে। আহা একটা শার্ট ছিল না লোকটার। কম বেতনের চাকরি। তার উপর পয়সা জমানো নেশা। খুব ধুমধাম করে মজিদের বিয়ে দেবে সেজন্যেই পাই পয়সাটিও জমিয়ে রাখা।

শিখা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের পরিচয় না হলে সুতাখালীর ওই মেয়েটির সঙ্গে কত আগেই মজিদের বিয়ে হয়ে যেত। আর বিয়ে হলে কি বউ ফেলে যুদ্ধে যেত মজিদ ? কোনোদিন না। গ্রামের মধ্যে বউ নিয়ে লুকিয়ে থাকত কিছুদিন। তারপর সব ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসত সবাই।

কিন্তু সেরকম হলো না। শিখা মেয়েটি বাহারি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আসতেই থাকল। আসতেই থাকল। আর দিন দিন সুন্দর হতে থাকল মেয়েটা।

তখন খুব গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। মজিদের ঘরে দিনরাত লোকজনের ভিড়। আগের মতো শিখা মেয়েটির তীক্ষ্ণ হাসি শোনা যায় না। রহিমা বুঝতে পারে খুব খারাপ সময়। দেশের অবস্থা ভালো না। কিন্তু দেশের অবস্থা দিয়ে রহিমা কী করবে ? সে শুধু দেখে তার নিজেরই কপাল মন্দ। মন্দ কপাল না হলে কি মজিদ তার বাপকে বলে, দেশের অবস্থা খুব খারাপ। কী হয় বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা গ্রামে চলে যাও।

মজিদের বাপ বলেছে, তুই গেলে আমরা যাব।

আরে কী বলো পাগলের মতো। আমি কী করে যাই ? আমার কত কাজ এখন। তোমরা কবে যাবে বলো ? আমি সব ব্যবস্থা করে দেই।

মজিদের বাপ সে-কথার জবাব না দিয়ে ফস করে একটা বিড়ি ধরিয়েছে, আর মজিদ হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পাল্টে নিচু গলায় বলেছে, শিখাকে বিয়ে করলে তোমাদের আপত্তি নেই তো, বাবা ?

মজিদের বাপ একটুও অবাক না হয়ে বলেছে, কবে বিয়ে ?

সে দেরি আছে। তোমাদের আপত্তি আছে কি-না তাই বলো।

না, আপত্তি কিসের জন্যে ? বিয়েটা সকাল সকাল করে ফেললেই তো ভালো হয়। টাকার জন্যে ভাবিস না তুই। তোর বিয়ের টাকা আলাদা করে পোস্টাপিসে জমা আছে।

ছেলের বিয়ে দেখে যেতে পারল না। রহিমা যখন রান্নাঘরে ডাল চাপিয়ে খোঁজ নিতে এসেছে লোকটা চা-টা কিছু খাবে কিনা তখনি জেনেছে সব শেষ। সব আল্লার ইচ্ছা।

তারপর তো যুদ্ধই শুরু হলো। গ্রামের বাড়িতে রহিমাকে রেখে মজিদ উধাও। কত উড়ো খবর কানে আসে। কোথায় নাকি একশ' মুক্তিবাহিনীর ছেলে ধরা পড়েছে। কোথায় নাকি চারজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মিলিটারি পুড়িয়ে মেরেছে। রহিমা শুধু যন্ত্রের মতো বলেছে, মজিদের হায়াৎ ভিখ মাংগি গো আল্লাহ। তুমি নেগাবান। হাসবুনাল্লাহে নিয়ামুল ওয়াকিল নেয়ামুল মওলা ওয়া নিয়ামুন নাসির। রহিমার রাতে ঘুম হয় না। জেগে জেগে রাত কাটে। সেই সময়ই অসুখটা হলো। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় মৃত্যু বুঝি এসে বসেছে বুকের উপর।

যুদ্ধ থেমে গেল। মজিদ ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাসিমুখে একদিন দরজার সামনে এসে ডাকল, মা, আমি মরি নাই গো। দেখো বেঁচে আছি।

অসুখটা তখন খুব বাড়ল রহিমার। ক্র্যাচের খট্‌খট্ শব্দ তুলে মজিদ যখন এক পায়ে হেঁটে বেড়ায় তখন রহিমার বুক ধড়ফড় করে। কী কষ্ট, কী কষ্ট। সে মজিদের মতো ভাবতে চেষ্টা করে, একটি স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য।

মজিদ বলে না কিছু, কিন্তু রহিমা জানে শিখার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সেই ছেলেটি নিশ্চয়ই মজিদের মতো ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটে না।

স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য। রহিমা মজিদের মতো ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু রহিমা মজিদ নয়। জীবন তার সুবিশাল বাহু রহিমার দিকে প্রসারিত করেনি। কাজেই তার ঘুম আসে না।

শেষরাতে যখন চাঁদ ডুবে গিয়ে নক্ষত্রের আলোয় চারদিক অন্যরকম হয় তখন সে চুপি চুপি মজিদের জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভাঙা গলায় ডেকে ওঠে, ও মজিদ মিয়া! ও মজিদ মিয়া! সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে মজিদের ঘুম ভাঙে না। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করবার জন্যেই হয়তো শেষরাতের দিকে তার গাঢ় ঘুম হয়।

কল্যাণীয়াসু

ট্রেটয়াকভ আর্ট গ্যালারিতে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। পুরনো দিনের মহান সব শিল্পীদের আঁকা ছবি। দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। সঙ্গের রাশিয়ান গাইড বলল, কী হয়েছে?

আমি হাত উঁচিয়ে একটি পেইনটিং দেখালাম। প্রিন্সেস তারাকনোভার পেইনটিং। অপূর্ব ছবি।

জরী, ছবিটি দেখে তোমার কথা মনে পড়ল।

গাইড বলল, সেন্ট পিটার্সবার্গ জেলে প্রিন্সেসের শেষ দিনগুলো কেটেছে। ওই দেখ, সেলের অন্ধকূপে কী করে বন্যার পানি ঢুকছে। দেখ, প্রিন্সেসের চোখে-মুখে কী গভীর বিষাদ। প্রগাঢ় বেদনা!

আমি কথা বললাম না। অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। গাইড বলল, এসো পাশের কামরায় যাই।

আমি নড়লাম না। মৃদু গলায় বললাম, মি. যোখভ, আজ আর কিছু দেখব না। চল, কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।

দু'জনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। ভীষণ শীত বাইরে। রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া মোটা ওভারকোট ভেদ করে শরীরে বিঁধছে। আমার সঙ্গী হঠাৎ জানতে চাইল, তোমার কি শরীর খারাপ করছে ?

না।

আর্ট গ্যালারি কেমন দেখলে ?

চমৎকার। অপূর্ব।

আমি চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বললাম, তোমাদের প্রিন্সেস তারাকনোভাকে দেখে আমার এক পরিচিতা মহিলার কথা খুব মনে পড়ছে।

গাইড কৌতূহলী হয়ে বলল, কে সে ? নাম জানতে পারি ?

জরী তার নাম।

যোখভ বিস্মিত হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি মনে মনে বললাম, প্রিন্সেস জরী। প্রিন্সেস জরী।

জরী, রাজকুমারীর ছবি দেখে আজ বড় অভিভূত হয়েছি। হঠাৎ করে তোমাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে। ক্রমাগতই নস্টালজিক হয়ে পড়ছি। ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। ঘনঘন কফি খাই। চুরুটের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। শেষরাতের দিকে ঘুমুতে গিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। পরশু রাতে কী স্বপ্ন দেখলাম জানো ? দেখলাম আমাদের নীলগঞ্জে যেন খুব বড় একটা মেলা বসেছে। বাবার হাত ধরে মেলা দেখতে গিয়েছি। (ইশ! কত দিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম।) বাবা বললেন, খোকা, নাগরদোলায় চড়বি ? আমি যতই না করি তিনি ততই জোর করেন। তারপর দেখলাম, ভয়ে আমি থরথর করে কাঁপছি আর শাঁ-শাঁ শব্দে নাগরদোলা উড়ে চলেছে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ছাড়িয়ে দূরে, দূরে— আরো দূরে। ঘুম ভেঙে দেখি চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। চল্লিশ বছর বয়সে কেউ কি এমন করে কাঁদে ?

আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি জরী। আজকাল খুব নীলগঞ্জে চলে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আগের মতো সন্ধ্যাবেলা পুকুরঘাটে বসে জোনাকি পোকার আলো জ্বলা দেখি।

মস্কোতে আজ আমার শেষ রাত। আগামীকাল ভোর চারটায় রওনা হব রুমানিয়ায়। খুব কষ্ট করে এক মাসের ভিসা জোগাড় করেছি। এই এক মাস খুব ঘুরে বেড়াব। তারপর ফিরে যাব মন্ট্রিলে, নিজ আস্তানায়। বেশ একটা গতির জীবন বেছে নিয়েছি, তাই না ? অথচ ছোটবেলায় এই আমিই হোস্টেলে যাবার সময় হলে কী মন খারাপ করতাম। হাসু চাচা আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে লাল গামছায় ঘনঘন চোখ মুছত। ধরা গলায় বলত, বড় মিয়া, চিঠি দিয়েন গো।

আমার মনে হতো— দূর ছাই, কী হবে পড়াশোনা করে। বাবা, হাসু চাচা, এদের ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না।

প্রবল ঘরমুখো টান ছিল বলেই আজ হয়তো যাযাবর বৃত্তি বেছে নিতে হয়েছে। তাই হয়, তোমার জন্যে প্রবল তৃষ্ণা পুষেছিলাম বলেই কি তোমাকে পাই নি ? টেনটেলাসের গল্প জানো তো ? তার চারদিকে পানির থৈ-থৈ সমুদ্র, অথচ তাকেই কিনা আজীবন তৃষ্ণার্ত থাকতে হলো।

জরী, তোমার কি মনে আছে বিয়ের পরদিন তোমাকে নিয়ে যখন নীলগঞ্জে আসি তুমি ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে খুব কেঁদেছিলে ? তখন কার্তিকের শুরু। ধানীরঙের রোদে ঝলমল করছে চারদিক। হালকা হিমেল বাতাস। মনে আছে সেসব কথা ? আমি বলেছিলাম, মাথাটা ভেতরে টেনে নাও জরী। কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে পড়বে। তুমি বললে, পড়ুক।

কামরায় আমরা দু'টি মাত্র প্রাণী। বরযাত্রীরা আমাদের একা থাকবার সুযোগ দিয়ে অন্য কামরায় উঠেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে ঝিক্‌ঝিক্‌ করে। বাতাসে তোমার লালচে চুল উড়ছে।

কী-একটা সেন্ট মেখেছ। চারপাশে তার চাপা সৌরভ। আমি গাঢ় স্বরে বলেছিলাম, ছিঃ জরী, এত কাঁদছ কেন ? কথা বলো। আমার কথায় তুমি কী মনে করেছিলে কে জানে। অনেকক্ষণ আমার চোখে চোখে তাকিয়ে কী মনে করে যেন হেসে ফেললে। হেসে ফেলেই লজ্জা পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। সেদিন কী গভীর আনন্দ আমাকে অভিভূত করেছিল। মনে হয়েছিল রহস্যমণ্ডিত এই রমণীটিকে পেয়েছি।

গৌরীপুরে গাড়ি অনেকক্ষণ হল্ট করল। একজন অন্ধ ভিখারি একতারা বাজিয়ে আমাদের কামরার সামনে খুব গান গাইতে লাগল, ও মনা, এই কথাটি না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।

তুমি অবাক হয়ে বললে, কী সুন্দর গায়। তারপর দু'টি টাকা বের করে দিলে। ট্রেন ছাড়তেই জানালা দিয়ে অনেকখানি মাথা বের করে বললে, দেখুন দেখুন, কতগুলো বক একসঙ্গে উড়ে যাচ্ছে।

বক নয়। শীতের শুরুতে ঝাঁক বেঁধে বালিহাঁস উড়ে আসছিল। আগে দেখনি কখনো, তাই খুব অবাক হয়েছিলে। আমি বলছিলাম, বক নয় জরী। ওগুলো

বালিহাঁস। আর শোন, আপনি আপনি করছ কেন ? আমাকে তুমি করে বলবে।

ওই হাঁসগুলো কোথায় যাচ্ছে ?

বিলের দিকে।

আপনাদের নীলগঞ্জে বিল আছে ?

আবার আপনি ?

তুমি হেসে বললে, নীলগঞ্জে বিল আছে ?

আমি বললাম, বলো, তোমাদের নীলগঞ্জে বিল আছে ?

তুমি মুখ ফিরিয়ে হাসতে শুরু করলে। আমার মনে হলো সুখ কোনো অলীক বস্তু নয়। এর জন্যে জীবনব্যাপী কোনো সাধনারও প্রয়োজন নেই। প্রভাতের সূর্যকিরণ বা রাতের জ্যোৎস্নার মতোই এও আপনাতেই আসে।

কিন্তু প্রিন্সেস তারাকনোভার ছবি দেখতে গিয়ে উল্টো কথা মনে হলো। মনে হলো সুখ-টুখ বলে কিছু নেই। নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ নিয়ে আমাদের কারবার। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম হতাশ রাজকুমারী পিটার্সবার্গের নির্জন সেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। হু-হু করে বন্যার জল ঢুকছে ঘরে। রাজকুমারীর ঠোঁটের কোনায় কান্নার মতো অদ্ভুত এক হাসি ফুটে রয়েছে।

ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় মনে হলো রাজকুমারীকে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। জরীর মুখের আদল আসছে নাকি ? পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল। না, জরীর সঙ্গে এ মুখের কোনো মিল নাই। জরীর মুখ গোলগাল। একটু আদুরে ভাব আছে। আর রাজকুমারীর মুখটি লম্বাটে ও বিষণ্ন। মনে আছে জরী, একবার তোমার একটি পোর্ট্রেট করেছিলাম ? কিছুতেই মন ভরে না। ব্রাশ ঘষি আবার চাকু দিয়ে চেঁছে রঙ তুলে ফেলি। দু'মাসের মতো সময় লাগল ছবি শেষ হতে। পোর্ট্রেট দেখে তুমি হতভম্ব। অবাক হয়ে বললে, ও আল্লা, চোখে সবুজ রঙ দিয়েছ কেন ? আমার চোখ বুঝি সবুজ ? আমি বললাম, একটু দূর থেকে দেখ।

তুমি অনেকটা দূরে সরে গেলে এবং চেঁচিয়ে বললে, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

ছবি আঁকিয়ে হিসেবে জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু সেদিনকার সেই মুগ্ধ কণ্ঠ এখনো কানে বাজে।

সেই পোর্ট্রেটটি অনেকদিন আমার কাছে ছিল। তারপর বিক্রি করে দিলাম। ছবি দিয়ে কী হয় বলো ? তার উপর সেবার খুব টাকার প্রয়োজন হলো। মিলানে গিয়েছি বন্ধুর নিমন্ত্রণে। গিয়ে দেখি বন্ধুর কোনো হদিস নেই। ক'দিন আগেই নাকি বিছানাপত্র নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। কী করি, কী করি! সঙ্গে সম্বলের মধ্যে আছে ত্রিশটি আমেরিকান ডলার আর মন্‌ট্রিলে ফিরে যাবার একটি ট্যুরিস্ট টিকিট। এর মধ্যে আবার আমার পুরনো অসুখ বুকে ব্যথা শুরু হলো। সস্তা দরের এক হোটেলে উঠলাম। তবুও দু'দিন যেতেই টাকা-পয়সা সব শেষ। ছবি বিক্রি ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

এক সন্ধ্যায় বড় রাস্তার মোড়ে ছবি টাঙিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। কারো যদি পছন্দ হয় কিনবে। ছবির মধ্যে আছে দু'টি ওয়াটার কালার আর তেল রঙে আঁকা তোমার পোট্রেট। ছবিগুলোর মধ্যে 'নীলগঞ্জের জ্যোৎস্না' নামের অপূর্ব একটি ওয়াটার কালার ছিল। আমাদের বাড়ির পেছনে চার-পাঁচটা নারকেল গাছ। দেখ নি তুমি ? ওই যে পুকুরপাড়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল। এক জ্যোৎস্নারাতে পুকুরের কালো জলে তাদের ছায়া পড়েছিল— তারই ছবি। চোখ ফেরানো যায় না এমন। অথচ বিক্রি হলো শুধু তোমার পোট্রেটটি। এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কিনলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে বললেন, কেন এই পোট্রেটটা কিনলাম জানো ?

না ম্যাডাম।

আমি যখন কিশোরী ছিলাম তখন এই ছবিটিতে যে মেয়েটিকে তুমি এঁকেছ তার মতো সুন্দর ছিলাম, তাই কিনলাম।

আমি হেসে বললাম, আপনি এখনো সুন্দর।

ভদ্রমহিলা বললেন, এসো না আমার ঘরে। কফি করে খাওয়াব। এমন কফি সারা মিলান শহরে খুঁজেও পাবে না।

ভদ্রমহিলা আশাতীত দাম দিলেন ছবির। শুধু কফি নয়, রাতের খাবার খাওয়ালেন। তাঁর অল্পবয়েসী নানা ছবি দেখালেন। সবশেষে পিয়ানো বাজিয়ে খুব করুণ একটি গান গাইলেন যার ভাব হচ্ছে— 'হে প্রিয়তম, বসন্তের দিন শেষ হয়েছে। ভালোবাসাবাসি দিয়ে সে দিনকে ধরে রাখা গেল না।'

নিজের হাতে তোমার ছবি টানালাম। কোথাকার ইটালির মিলান শহরে এক বৃদ্ধা মহিলা, তার ঘরে তোমার হাসিমুখের ছবি ঝুলতে লাগল। কেমন অবাক লাগে ভাবতে। একশ' বছর পর এই ছবিটি হয়তো অবিকৃতই থাকবে। বৃদ্ধার নাতি-নাতনিরা ভাববে, এইটা কার পোট্রেট ? এখানে কীভাবে এসেছে ?

ফেরার পথে বৃদ্ধার হাতে চুমু খেলাম। মনে মনে বললাম, আমার জরী যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

আমরা সবসময় সুখে থাকার কথা বলি। যতবার নীলগঞ্জ থেকে ঢাকার হোস্টেলে যেতাম— বাবা বলতেন, সুখে থাক। তুমি যখন লাল বেনারসিতে মুখ ঢেকে ট্রেনে উঠলে তোমার মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সুখে থাক।

জরী, আমার কাছে তুমি সুখে ছিলে না ? কিসে একটি মানুষ সুখী হয় ? নীলগঞ্জে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ি দেখে তোমার কি মন ভরে ওঠেনি ? তুমি কি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠনি, ওমা, এ যে রাজপ্রাসাদ! জ্যোৎস্নারাতে হাত ধরাধরি করে যখন আমরা পুকুরপাড়ে বেড়াতে যেতাম, তখন কি গভীর আবেগ তোমাকে এতটুকু আচ্ছন্ন করেনি ? তোমাকে আমি কী দিইনি জরী ? নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসার দেয়ালে তোমাকে ঘিরে রেখেছিলাম। রাখিনি ?

তবু এক রাতে তুমি বিছানা ছেড়ে চুপিচুপি ছাদে উঠে গেলে। আমি দেখলাম, তুমি পাথরের মূর্তির মতো কার্নিস ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছ। বুকে ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগল। বিস্মিত হয়ে বললাম, কী হয়েছে জরী ?

তুমি খুব স্বাভাবিক গলায় বললে, কই কিছু হয়নি তো। তারপর নিঃশব্দে নিচে নেমে এলে।

তোমার মধ্যে গভীর একটি শূন্যতা ছিল। আমি তা ধরতে পারিনি। শুধু বুঝতে পারছিলাম তোমার কোনোকিছুতেই মন লাগছে না। সে সময় 'এসো নীপবনে' নাম দিয়ে আমি চমৎকার একটি পেইনটিং করছিলাম। আকাশে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। একটি ভাঙা বাড়ির পাশে একটি প্রকাণ্ড ছায়াময় কদম গাছ। এই নিয়ে আঁকা। আমার শিল্পীজীবনের ভালো ক'টি ছবির একটি। ভেবেছিলাম বিয়ের বছরটি ঘুরে এলে তোমাকে এই ছবি দিয়ে মুগ্ধ করব। কিন্তু ছবি তোমাকে এতটুকুও মুগ্ধ করল না। তুমি ক্লান্ত গলায় বললে, এক বছর হয়ে গেছে বিয়ের ? ইশ, কত তাড়াতাড়ি সময় যায়।

তোমার কণ্ঠে কি সেদিন একটি চাপা বিষাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল ? ক্রমে ক্রমে তুমি বিষণ্ন হয়ে উঠতে লাগলে। প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে দেখতাম তুমি জেগে বসে আছ। অবাক হয়ে বলেছি, কী হয়েছে জরী ?

কই ? কিছু হয়নি তো।

ঘুম আসছে না ?

আসছে।

বলেই তুমি আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লে। কিন্তু তুমি জেগে রইলে। অথচ ভান করতে লাগলে যেন ঘুমিয়ে আছ। আমি বললাম, জরী, সত্যি করে বলো তো তোমার কী হয়েছে ?

কিছু হয় নি।

কোথাও বেড়াতে যাবে ?

কোথায় ?

কক্সবাজার যাবে ? হোটেল ভাড়া করে থাকব।

উঁহু, ভাল্লাগে না।

তারও অনেকদিন পর এক সন্ধ্যায় ঘন ঘোর হয়ে মেঘ করল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ঝড়। দরাম শব্দে একেকবার আছড়ে পড়ছে জানালার পাট। বাজ পড়ছে ঘনঘন। ঘরের লাগোয়া জাম গাছে শোঁ-শোঁ শব্দ উঠছে। দু'জনে বসে আছি চুপচাপ। তুমি হঠাৎ একসময় বললে, তোমাকে একটা কথা বলি, রাখবে ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কী কথা ?

আগে বলো রাখবে ?

নিশ্চয়ই রাখব।

তুমি তখন আমাকে তোমার আনিস স্যারের গল্প বললে। যিনি কলেজে তোমাদের অঙ্কের প্রফেসর ছিলেন। খামখেয়ালির জন্যে যাঁর কলেজের চাকরিটি গেছে। এখন খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। কোনোরকমে দিন চলে। তুমি আমাকে অনুরোধ করলে নীলগঞ্জে নতুন যে কলেজ হচ্ছে সেখানে তাঁকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে।

তুমি উজ্জ্বল চোখে বললে, আনিস স্যার মানুষ নন। সত্যি বলছি, ফেরেশতা। তুমি আলাপ করলেই বুঝবে।

আমি বললাম, নীলগঞ্জের কলেজের এখনো তো অনেক দেরি। মাত্র জমি নেয়া হয়েছে।

হোক দেরি। আনিস স্যার ততদিন থাকবেন আমাদের এখানে। নিচের ঘর তো খালিই থাকে। একা মানুষ, কোনো অসুবিধা হবে না।

একা মানুষ ?

হুঁ। মেয়ে আর বউ দু'জনের কেউই বেঁচে নেই। একদিনে দু'জন মারা গেছে কলেরায়। আর মজা কী জানো ? তার পরদিনই আনিস স্যার এসেছেন ক্লাস নিতে। প্রিন্সিপ্যাল স্যার বললেন, আজ বাড়ি যান। ক্লাস নিতে হবে না। আনিস স্যার বললেন, বাড়িতে গিয়ে করবটা কী ? কে আছে বাড়িতে ?

আমি বললাম, চিঠি লিখলেই কি তোমাদের স্যার আসবেন এখানে ?

হ্যাঁ, আসবেন। আমি লিখলেই আসবেন। লিখব স্যারকে ?

বেশ, লেখ।

তুমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখতে উঠে গেলে। সে চিঠি শেষ হতে অনেক সময় লাগল। বসে বসে দেখলাম অনেক কাটাকুটি করলে। অনেক কাগজ ছিঁড়ে ফেললে। এবং একসময় চিঠি শেষ করে হাসিমুখে উঠে এলে। তোমাকে সে-রাতে ভীষণ উৎফুল্ল লাগছিল।

আহ্, লিখতে লিখতে কেমন যেন লাগছে। এখন প্রায় মধ্যরাত। তবু ইচ্ছে হচ্ছে রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াই। নিশিরাতে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার বেশ লাগল। তুমি কি দস্তয়োভস্কির 'রূপালী রাত্রি' পড়েছ ? 'রূপালী রাত্রি'তে আমার মতো একজন নিশি-পাওয়া লোকের গল্প আছে।

জরী, তোমাদের স্যার কবে যেন উঠলেন আমাদের বাড়িতে ? দিন-তারিখ এখন আর মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে মাঝবয়েসী একজন ছোটখাটো মানুষ ভোরবেলা এসে খুব হৈচৈ শুরু করেছিলেন। চেঁচিয়ে রাগী ভঙ্গিতে ডাকছিলেন, সুলতানা, সুলতানা। তুমি ধড়মড় করে জেগে উঠলে। ও আল্লা, কী কাণ্ড, স্যার এসে পড়েছেন— এই বলে খালি পায়েই ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে গেলে। আমি জানালা

দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম তুমি পা ছুঁয়ে সালাম করছ, আর তোমাদের স্যার বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। খানিক পরে দেখলাম তিনি খুব হাসছেন। সেই সঙ্গে লাজুক ভঙ্গিতে তুমিও হাসছ।

তুমি খুশি হয়েছিলে তো ? নিশ্চয়ই হয়েছিলে। আমি স্টুডিওতে বসে তোমার গভীর আনন্দ অনুভব করতে পারছিলাম। একটি তীব্র ব্যথা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেদিন আমার আত্মহত্যার কথা মনে হয়েছিল।

অথচ তোমার স্যার ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। এমন সহজ, এমন নির্লোভ লোক আমি খুব কমই দেখেছি। কোনোকিছুর জন্যেই কোনো মোহ নেই। এমন নির্লিপ্ততা কল্পনাও করা যায় না। জরী, তুমি ঠিক লোকের প্রেমেই পড়েছিলে। এমন মানুষকে ভালোবেসে দুঃখ পাওয়াতেও আনন্দ। তোমার স্যার ফেরেশতা ছিলেন। কিন্তু জরী, আমি তো ফেরেশতা নই। আমার হৃদয়ে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি ও ঘৃণা আছে। আমি সত্যি একজন সাধারণ মানুষ।

সময় কাটতে লাগল। আমি শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। অনেকগুলো ছবি আঁকলাম সেসময়। তোমার পোট্রেটটিও সেসময়ই করা। পোট্রেটে সিটিং দেবার জন্যে ঘণ্টাখানেক বসতে হতো তোমাকে। তুমি হাসিমুখে এসে বসতে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরই ছটফট করে উঠতে, এই রে, স্যারকে চা দেয়া হয়নি। একটু দেখে আসি। এক মিনিট, প্লিজ। আমি তুলি হাতে তোমার ফেরার প্রতীক্ষা করতাম। এক কাপ চা তৈরি করতে প্রচুর সময় লাগত তোমার।

মাঝে মাঝে আসতেন তোমার স্যার। অর্ধসমাপ্ত ছবিগুলো দেখতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং বলতেন, ছবি আমি ভালো বুঝি না। কিন্তু আপনি যে সত্যিই ভালো আঁকেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁর প্রশংসা আমার সহ্য হতো না।

আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতাম। তিনি বলতেন, আপনি আঁকুন। আমি দেখি কী করে ছবি আঁকা হয়।

আমি কারো সামনে ছবি আঁকতে পারি না।

তবু তোমার স্যার বসে থাকতেন। তীব্র ঘৃণায় আমি কতবার তাঁকে বলেছি, এখানে বসে আছেন কেন ? বাইরে যান।

কোথায় যাব ?

নদীর ধারে যান। জরীকে সঙ্গে নিয়ে যান। কাজের সময় বিরক্ত করছেন কেন আপনি ?

অপমানে তোমার মুখ কালো হয়ে উঠত। থমথমে স্বরে বলতে, চলুন স্যার, আমরা যাই।

ক্রমে ক্রমেই তুমি সরে পড়তে শুরু করলে। পরিবর্তনটা খুব ধীরে হচ্ছিল। সে জন্যেই ঠিক বলতে পারব না কখন থেকে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলে। ব্যক্তিগত হতাশা ও বঞ্চনা— এই দুই মিলিয়ে মানসিক দিক দিয়ে অনেক আগেই

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে অসুখ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। একনাগাড়ে জ্বর চলল দীর্ঘদিন। ঘুম হয় না, বুকের মধ্যে একধরনের ব্যথা অনুভব করি। তীব্র যন্ত্রণা।

অসুখ-বিসুখে মানুষ খুব অসহায় হয়ে পড়ে। সে-সময় একটি সুখকর স্পর্শের জন্যে মন কাঁদে। কিন্তু তুমি আগের মতোই দূরে দূরে রইলে। যেন ভয়ানক একটি ছোঁয়াচে রোগে আমি শয্যাশায়ী। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে না চললে সমূহ বিপদ।

তোমার স্যার আসতেন প্রায়ই। আমি তাঁর চোখে গভীর মমতা টের পেতাম। তিনি আমার কপালে হাত রেখে নরম গলায় বলতেন, একটি গল্প পড়ে শোনাই আপনাকে ? আপনার ভালো লাগবে।

আমি রেগে গিয়ে বলতাম, একা থাকতেই আমার ভালো লাগবে। আপনি নিচে যান। কেন বিরক্ত করছেন ?

এত অস্থির হচ্ছেন কেন ? আমি একটু বসি এখানে। কথা বলি আপনার সঙ্গে ?

না, না অসহ্য। আপনি জরীর সঙ্গে কথা বলুন।

আমার অসুখ সারে না কিছুতেই। বাবার বন্ধু শশধর ডাক্তার রোজ দু'বেলা আসেন আর গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়েন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, হাঁপানির টান ওঠে নাকি বাবা ? হাঁপানি তোমাদের বংশের অসুখ। তোমার দাদার ছিল, তোমার বাবারও ছিল। শ্বাস নিতে কোনো কষ্ট টের পাও ?

একটু যেন পাই।

ডাক্তার চাচা একটি মালিশের শিশি দিলেন। শ্বাসের কষ্ট হলে অল্প অল্প মালিশ করবে। সাবধান, মুখে যেন না যায়। তীব্র বিষ। ছোট্ট একটি শিশিতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ তরল বিষ। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডাক্তার চাচা চলে যেতেই তোমাকে ডেকে বললাম, জরী, এই শিশিটিতে কী আছে জানো ?

জানি না। কী আছে ?

তীব্র বিষ! সাবধানে তুলে রাখ।

তোমাকে কেন বললাম এ কথা কে জানে। কিন্তু বলবার পর দারুণ আত্মপ্রসাদ হলো। দেখলাম তুমি সরুচোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলে আমার দিকে। কী ভাবছিলে ?

অসুখ সারল না। ক্রমেই বাড়তে থাকল। চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়ল। জন্ডিসের রোগীর মতো গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে গেল। দিনরাত শুয়ে শুয়ে থাকি। কত কী মনে হয়। কত সুখস্মৃতি, কত দুঃখ-জাগানিয়া ব্যথা। শ্লথ সময় কাটে। এক এক রাতে ঘন ঘোর হয়ে বৃষ্টি নামে। ঝমঝম শব্দে গাছের পাতায় অপূর্ব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। শুয়ে শুয়ে শুনি তুমি নিচের ঘরে বৃষ্টির সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করছ। আহ্, কী-সব দিন কেটেছে!

একটি প্রশস্ত ঘর। তার একপ্রান্তে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড একটি পালঙ্ক। সেখানে শয্যা পেতে রাতদিন খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা। কী বিশ্রী জীবন! ডাক্তার চাচা কতবার আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলেছেন, কেন তোমার অসুখ সারে না ? বলো, কেন ?

আমি কী করে বলব ?

যাও, হাওয়া বদল করে আস। বৌমাকে নিয়ে ঘুরে আস কক্সবাজার থেকে।

আচ্ছা যাব।

আচ্ছা নয়, কালই যাও। সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসে।

এত তাড়া কিসের ?

তাড়া আছে। আমি বলছি বৌমাকে সব ব্যবস্থা করতে।

ডাক্তার চাচা সেদিন অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ও বৌমা! বৌমা!

তুমি তো প্রায় সময়ই থাকতে না, সেদিনও ছিলে না।

ডাক্তার চাচা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সেদিন।

শুধু কি তিনি ? এ বাড়ির সব ক'টি লোক কৌতূহলী হয়ে দেখত আমাকে। আবুর মা গরম পানির বোতল আমার বিছানায় রাখতে রাখতে নেহায়েত যেন কথার কথা এমন ভঙ্গিতে বলত, বিবি সাহেব নদীর পাড়ে বেড়াইতে গেছেন।

আমি বলতাম না কিছুই। অসহ্য বোধ হলে বিষের শিশিটির দিকে তাকাতাম। যেন সেখানে প্রচুর সান্ত্বনা আছে।

জরী, আমাদের এ বংশে অনেক অভিশাপ আছে। আমার দাদা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের হাতে খুন হয়েছিলেন। আমার মা'র মৃত্যুও রহস্যময়। লোকে বলে তাঁকে নাকি বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল। আমার সারাক্ষণ মনে হতো পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেও করতে হবে।

জরী, আমার জরী, আহ! কতদিন তোমাকে দেখি না। তোমার গোলগাল আদুরে মুখ কি এখনো আগের মতো আছে ? না, তা কি আর থাকে ? জীবন তো বহতা নদী। মাঝে মাঝে তোমার জন্যে খুব কষ্ট হয়। ইচ্ছে হয় আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে। ট্রেনে করে তুমি প্রথমবারের মতো নীলগঞ্জে আসছ— সেখান থেকে। ওই যে গৌরীপুরে ট্রেন থেমে থাকল অনেকক্ষণ। একজন অন্ধ ভিখিরি একতারা বাজিয়ে করুণ সুরে গাইল,

ও মনা
এই কথাটি না জানলে
প্রাণে বাঁচতাম না।
ও মনা। ও মনা।

তুমি ভিখিরিকে দু'টি টাকা দিলে।

তোমার কথা মনে হলেই কষ্ট হয়। ভালোবাসার কষ্ট আমার চেয়ে বেশি কে আর জানবে বলো ? তোমার ব্যথা আমি সত্যি সত্যি অনুভব করেছিলাম।

তোমার স্যার যেদিন নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, সুলতানা, আমার স্যুটকেসটা গুছিয়ে দাও। আমি ভোরে যাচ্ছি— তখন তোমার চোখে জল টলমল করে উঠল। তোমার স্যার সেদিকে লক্ষও করলেন না। সহজ ভঙ্গিতে এসে বসলেন আমার বিছানার পাশে। গাঢ়স্বরে বললেন, আপনি জরীকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে কিছুদিন থাকুন। ভালো হয়ে যাবেন।

আমি বললাম, না না, আমি যাব না। সমুদ্র আমার ভালো লাগে না। আপনারা দু'জনে যান। সমুদ্রতীরে সবসময় দু'জন করে যেতে হয়। এর বেশিও নয়, এর কমও নয়।

তোমার স্যার তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলেন। তুমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলে। একটি কথাও বললে না। আমি দেখলাম, খুব শান্ত ভঙ্গিতে তুমি তোমার স্যারের স্যুটকেস গুছিয়ে দিলে। রাস্তায় খিদে পেলে খাবার জন্যে একগাদা কী-সব তৈরি করে দিলে। তিনি বিদায় নিলেন খুব সহজভাবেই। ঘর থেকে বেরিয়ে একবারও পিছনে ফিরে তাকালেন না। তুমি মূর্তির মতো গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলে।

জরী, তুমি ভুল লোকটিকে বেছে নিয়েছিলে। এইসব লোকের কোনো পিছুটান থাকে না। নিজ স্ত্রী-কন্যার মৃত্যুর পরদিন যে ক্লাস নিতে আসে তাকে কি আর ভালোবাসার শিকলে বাঁধা যায় ?

তোমার স্যার চলে যাবার দিন আমি তোমাকে তীব্র অপমান করলাম। বিশ্বাস করো, ইচ্ছে করে করিনি। তোমার স্যার যখন বললেন, আপনার কাছে আমার একটি জিনিস চাইবার আছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কী জিনিস ?

আপনার আঁকা একটি ছবি আমি নিতে চাই। হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি।

নিশ্চয়ই। আপনার পছন্দমতো ছবি আপনি উঠিয়ে নিন। যে-কোনো ছবি। যেটা আপনার ভালো লাগে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে আমার স্টুডিওর দিকে চলে গেলেন। আমি তোমার চোখে চোখ রেখে বললাম, স্যার কোন ছবিটি নেবেন জানো তুমি ?

না।

স্যার নেবেন তোমার পোট্রেট।

তিনি কিন্তু নিলেন অন্য ছবি। জলরঙে আঁকা 'এসো নীপবনে'। তাকিয়ে দেখি অপমানে তোমার মুখ নীল হয়ে গেছে। তীব্র ঘৃণা নিয়ে তুমি আমার দিকে তাকালে।

সেইসব পুরনো কথা তোমার কি মনে পড়ে ? বয়স হলে সবাই তো নস্টালজিক হয়, তুমি হও নি ? কুটিল সাপের মতো যে ঘৃণা তোমার বুকে কিলবিল করে উঠেছিল

তার জন্যে তোমার কি কখনো কাঁদতে ইচ্ছে হয় না ? তুমি কাঁদছ এই ছবিটি বড় দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার স্যার চলে যাবার পর তুমি কী করবে তা কিন্তু আমি জানতাম জরী। তোমার তো এ ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। মিছিমিছি তুমি সারা জীবন লজ্জিত হয়ে রইলে।

আমি তোমাকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছি। তুমি বলেছ, না। তোমাকে কিছুদিন তোমার বাবা-মা'র কাছে রেখে আসতে চেয়েছি। তুমি কঠিন স্বরে বলেছ, না। কতবার বলেছি, বাইরে থেকে ঘুরে এলে তোমার মন ভালো থাকবে। তুমি শান্ত স্বরে বলেছ, আমার মন ভালোই আছে।

আসি জানতাম ঘৃণার দেয়ালে বন্দি হয়ে একজন মানুষ বেশিদিন থাকতে পারে না। তোমার সামনে দু'টি মাত্র পথ। এক— মরে যাওয়া, আর দুই...। কিন্তু মরে যাওয়ার মতো সাহস তোমার ছিল না। কাজেই দ্বিতীয় পথ যা তুমি বেছে নেবে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। এও একধরনের খেলা। আমি জানতাম তুমি এবারও পরাজিত হবে। পরাজয়ের মধ্যেই আসবে জয়ের মালা। উৎকণ্ঠায় দিন কাটতে লাগল। কখন আসবে সেই মুহূর্তটি ? সেই সময় আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারব তো ?

সেই মুহূর্তটির কথা তোমার কি মনে পড়ে কখনো ? ঘন হয়ে শীত পড়ছে। শরীর খানিক সুস্থ বোধ হওয়ায় আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি।

সন্ধ্যা মিলাতেই ঘরে আলো দিয়ে গেল। তারও কিছু পর তুমি এলে চা নিয়ে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে গিয়ে চা ছলকে পড়ল মেঝেতে। বিড়বিড় করে তুমি কী যেন বললে। আমি তাকালাম টেবিলের দিকে। বিষের সেই শিশিটি নেই। তুমি অপলকে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলাম চায়ের পেয়ালার জন্যে। তুমি জ্ঞান হারিয়ে এলিয়ে পড়লে মেঝেতে। হেরে গেলে জরী।

তোমাকে এরপর খুব সহজেই জয় করা যেত। কিন্তু আমি তা চাইনি, সব ছেড়েছুড়ে চলে এলাম। অল্প ক'দিন আমরা বাঁচি। তবু এই সময়ে কত সুখ-দুঃখ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। কত গ্লানি, কত আনন্দ আমাদের চারপাশে নেচে বেড়ায়। কত শূন্যতা বুকের ভেতরে হা হা করে।

জরী, এখন গভীর রাত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পোর্টার এসে দরজায় নক করবে। বিমান কোম্পানির মিনিবাস এসে দাঁড়াবে দোরগোড়ায়। আবার যাত্রা শুরু।

আবার হয়তো কোনো এক পেইনটিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কথা মনে পড়বে। আবার এরকম লম্বা চিঠি লিখব। কিন্তু সেসব চিঠি কখনো পাঠাব না তোমাকে। যৌবনে হৃদয়ের যে উত্তাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, আজ কি আর তা পারবে ? কেন আর মিছে চেষ্টা।

কথা ছিল পারুল ন'টার মধ্যেই আসবে।

কিন্তু এলো না। বারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম একা একা। চোখে জল আসবার মতো কষ্ট হতে লাগল আমার। মেয়েগুলো বড্ড খেয়ালি হয়।

বাসায় এসে দেখি ছোট্ট চিরকুট লিখে ফেলে গেছে।

সন্ধ্যায় ৬৯৭৬২১ নম্বরে ফোন করো।
— পারুল

তাদের পাশের বাড়ির ফোন। আগেও অনেকবার ব্যবহার করেছি। কিন্তু আজ তাকে ফোনে ডাকতে হবে কেন? অনেক আলাপ-আলোচনা করেই কি ঠিক করা হয়নি আজ সোমবার বেলা দশটায় দু'জন টাঙ্গাইল চলে যাব? সেখানে হারুনের বাসায় আমাদের বিয়ে হবে।

সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। হোটেল থেকে ভাত এনেছিলাম। সেগুলো স্পর্শও করলাম না। ছোটবেলায় যেরকম রাগ করে ভাত না খেয়ে থেকেছি, আজও যেন রাগ করবার মতো সেরকম একটি ছেলেমানুষি ব্যাপার হয়েছে। পারুলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়েছে— এই ভাবতে ভাবতে নিজেকে খুব তুচ্ছ ও সামান্য মনে হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন করবার জন্যে যখন বেরিয়েছি, তখন অভিমানে আমার ঠোঁট ফুলে রয়েছে। গ্রীন ফার্মেসির মালিক আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, অসুখ নাকি ভাই?

আমি শুকনো গলায় বললাম, একটা টেলিফোন করব।

পারুল আশপাশেই ছিল। রিনরিনে ছয়-সাত বছর বয়সের ছেলেদের মতো গলা যা শুনলে বুকের মধ্যে সুখের মতো ব্যথা বোধ হয়।

হ্যালো শোন, কিন্ডারগার্টেনের মাস্টারিটা পেয়েছি। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? বড্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে লাইনে।

পারুলের উৎফুল্ল সতেজ গলা শুনে আমি ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। তোতলাতে তোতলাতে কোনোরকমে বললাম, আজ ন'টার সময় তোমার আসবার কথা ছিল...।

মনে আছে, মনে আছে। শোন তারিখটা একটু পিছিয়ে দাও। এখন তো আর সেরকম ইমার্জেন্সি নেই। তাছাড়া...

তাছাড়া কী?

তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা বিয়ে করলে দু'জনকেই একবেলা খেয়ে থাকতে হবে।

হড়বড় করে আরো কী কী যেন সে বলল। হাসির শব্দও শুনলাম একবার।

আমি বুঝতে পারলাম পারুল আর কখনোই আমাকে বিয়ে করতে আসবে না। কাল তাকে নিয়ে ঘর সাজাবার জিনিসপত্র কিনেছি। সারা নিউ মার্কেট ঘুর ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে কেনাকাটা করেছে। দোকানিকে ডাবল বেডশীট দেখাতে বলে সে লজ্জায় মুখ লাল করেছে। এবং আজ সন্ধ্যাতেই খুব সহজ সুরে বলছে, তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা। আঘাতটি আমার জন্যে খুব তীব্র ছিল। আমার সাহস কম, নয়তো সে রাতেই আমি বিষ খেয়ে ফেলতাম কিংবা তিনতলা থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়তাম। আমি বড় অভিমানী হয়ে জন্মেছি।

সে বৎসর আরো অনেকগুলো দুর্ঘটনা ঘটল। ইরফানের কাছে আমার চার হাজার টাকা জমা ছিল। সে হঠাৎ মারা গেল। রামগঞ্জে এক ওয়াগন লবণ বুক করেছিলাম। সেই ওয়াগনটি একেবারে উধাও হয়ে গেল। পাথরকুঁচি সাপ্লাইয়ের কাজটায় বড় রকমের লোকসান দিলাম। ভদ্রভাবে থাকবার মতো পয়সাতেও শেষ পর্যন্ত টান পড়ল। মেয়েরা বেশ ভালো আন্দাজ করে। পারুল সত্যি সত্যি আমার ভবিষ্যৎটা দেখে ফেলেছিল। পারুলের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল। আমি নিজে কখনো যেতাম না তার কাছে। তবু তার সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে যেত। হয়তো বাস স্টপে দু'জন একসঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছি। পারুল আমাকে দেখামাত্রই আন্তরিক সুরে বলেছে, কী আশ্চর্য, তুমি! এ-কী স্বাস্থ্য হয়েছে তোমার ? ব্যবসাপত্র কেমন চলছে ?

চলছে ভালোই।

ইস, বড় রোগা হয়ে গেছ তুমি। চা খাবে এক কাপ ? এসো তোমাকে চা খাওয়াব।

দুপুরবেলা সিনেমাহলের সামনে একদিন দেখা হয় গেল। আমি তাকে দেখতে পাইনি এরকম একটা ভান করে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কিন্তু সে পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, এই এই। সিনেমা দেখতে এসেছিলে নাকি ?

না।

শোন, একটা কথা শুনে যাও।

কী ?

আমার এক বান্ধবীর ছেলের আজ জন্মদিন। প্লিজ, একটা উপহার আমাকে চয়েস করে দাও। চল আমার সাথে।

পারুলকে যতবার দেখি ততবারই অবাক লাগে। তিনশ' টাকার স্কুল মাস্টারি তাকে কেমন করে এতটা আত্মবিশ্বাসী আর অহঙ্কারী করে তুলেছে, ভেবে পাই না। ভুলেও সে আমাদের প্রসঙ্গ তোলে না। এক সোমবারে আমরা যে একটি বিয়ের দিন ঠিক করেছিলাম তা যেন বান্ধবীর ছেলের জন্মদিনের চেয়েও অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। তার উজ্জ্বল চোখ, দ্রুত কথাবলার ভঙ্গি স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় জীবন অনেক অর্থবহ ও সুরভিত হয়ে হাত বাড়িয়েছে তার দিকে।

এপ্রিল মাসের তেরো তারিখে পারুলের বিয়ে হয়ে গেল। নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়ে সে যে আমাকে তার আর একটি নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখায়নি সেজন্যে আমি তাকে প্রায় ক্ষমা করে ফেললাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমি একটি ভালো রেস্টুরেন্টে খেয়ে অনেকদিন পর সিনেমা দেখতে গেলাম। সিনেমার শেষে বন্ধুর বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত হৃষ্টমনে গল্প করতে লাগলাম। এমন একটা ভাব করতে লাগলাম যেন পারুলের বিয়েতে আমার বিশেষ কিছুই যায় আসে না। একজনের সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে অন্য একজনকে বিয়ে করা যেন খুব একটা সাধারণ ব্যাপার, অহরহই হচ্ছে।

সে-রাতে ঘরের বাতাস আমার কাছে উষ্ণ ও আর্দ্র মনে হতে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না। শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত ভাবলাম ব্যবসার অবস্থাটা অল্প একটু ভালো হলেই একটি সরল দুঃখী-দুঃখী চেহারার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলব। এবং সেই মেয়েটির সঙ্গে পারুলের হৃদয়হীনতার গল্প করতে করতে হা হা করে হাসব।

কিন্তু দিনদিন আমার অবস্থা আরো খারাপ হলো। একটা ছোটখাটো কনট্রাক্ট নিয়েছিলাম। তাতে সঞ্চিত টাকার সবটাই নষ্ট হয়ে গেল। একেবারে ডুবে যাবার মতো অবস্থা। চাকর ছেলেটিকে ছাড়িয়ে দিতে হলো। দু'একটি শৌখিন জিনিসপত্র (একটি থ্রি ব্যান্ড ফিলিপস্ ট্রানজিস্টার, একটি ন্যাশনাল রেকর্ড প্লেয়ার, একটি দামি টেবিল ঘড়ি) যা বহু কষ্ট করে কৃপণের মতো পয়সা জমিয়ে জমিয়ে কিনেছি, বিক্রি করে দিলাম। এবং তারপরও আমাকে একদিন শুধু হাফ পাউণ্ডের একটি পাউরুটি খেয়ে থাকতে হলো।

সহায়-সম্বলহীন একটি ছেলের কাছে এ শহর যে কী পরিমাণ হৃদয়হীন হতে পারে তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। নিষ্ঠুর এবং অকরুণ এই শহরে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সে সময় সারাক্ষণই খিদের কষ্ট লেগে থাকত। ফুটপাতের পাশে চটের পর্দার আড়ালে ভাতের দোকানগুলি দেখলেই মন খারাপ হয়ে যেত। দেখতাম রিকশাওয়ালা শ্রেণীর লোকরা উবু হয়ে বসে গ্রাস পাকিয়ে মহানন্দে ভাত খাচ্ছে। চুম্বকের মতো সেই দৃশ্য আমাকে আকর্ষণ করত। 'আহ্, ওরা কী সুখেই না আছে!'— এইরকম মনে করে আমার চোখ ভিজে উঠত। আমি বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। 'নিউ ইংক' কালি কোম্পানির সেলসম্যানের চাকরি নিলাম একবার। একবার কাপড়কাঁচা সাবানের বিজ্ঞাপন লেখার কাজ নিলাম। পারুলকে আমার মনে রইল না। বেমালুম ভুলে গেলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মোহাম্মদপুর বাজারের কাছ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি পারুল। সঙ্গে ফুটফুটে একটি বাচ্চা। পায়ে লাল জুতো, মুখটি ডল পুতুলের মতো গোলগাল। পারুলের শাড়ির আঁচল ধরে টুকটুক করে হাঁটছে। পারুল যাতে আমাকে দেখতে না পায় সেজন্যেই আমি চট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম। অথচ তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পারুলের সমস্ত ইন্দ্রিয় তার মেয়েটিতে নিবদ্ধ

ছিল। মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হলো এই চমৎকার ডল পুতুলের মতো মেয়েটি আমার হতে পারত। কিন্তু পরক্ষণেই— সোবহান মিয়া হয়তো আমাকে কাজটা দেবে না— এই ভাবনা আমাকে অস্থির করে ফেলল।

আমার ভাগ্য ভালো। কাজটা হয়ে গেল। রোজ সকালে সেগুনবাগিচা থেকে হেঁটে হেঁটে মোহাম্মদপুরে আসি। সমস্ত দিন সোবহান মিয়ার ইন্ডেন্টিং ফার্মের হিসাব নিকাশ দেখে অনেক রাতে সেগুন বাগিচায় ফিরে যাই। নিরানন্দ একঘেয়ে ব্যবস্থা। গভীর রাতে মাঝেমধ্যে ঘুম ভেঙে গেলে মরে যেতে ইচ্ছে করে।

রাস্তায় আমি মাথা নিচু করে হাঁটি। পরিচিত কেউ আমাকে উচ্চস্বরে ডেকে উঠুক তা এখন আর চাই না। কিন্তু তবু পারুলের সঙ্গে আরো দু'বার আমার দেখা হয়ে গেল। একবার দেখলাম হুড-ফেলা রিকশায় সে বসে, চোখে বাহারি সানগ্লাস। তারপাশে চমৎকার চেহারার একটি ছেলে (খুব সম্ভব এই ছেলেটিকেই সে বিয়ে করেছে। কারণ সফিকের কাছে শুনেছি পারুলের বর হ্যান্ডসাম এবং বেশ ভালো চাকরি করে)। দ্বিতীয়বার দেখলাম অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে হাসতে হাসতে যাচ্ছে। কোনোবারই সে আমাকে দেখতে পায়নি। অবশ্যি দেখতে পেলেও সে আমাকে চিনতে পারত না। অভাব, অনাহার ও দুর্ভাবনা আমার চেহারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। তাছাড়া পুরনো বন্ধুদের করুণা ও কৌতূহল থেকে বাঁচবার জন্যে আমি দাড়ি রেখেছিলাম। লম্বা দাড়ি ও ভাঙা চোয়ালই আমার পরিচয়কে গোপন রাখবার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তবু আমি হাত দুলিয়ে অন্যরকম ভঙ্গিতে হাঁটা অভ্যাস করলাম। যার জন্যে সফিক (যার সঙ্গে এক বিছানায় অনেকদিন ঘুমিয়েছি) পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারেনি। চেহারা পরিচিত মনে হলে মানুষ যে-রকম পিটপিট করে দু'একবার তাকায় তাও সে তাকায়নি।

আমি নিশ্চিত, পারুলের সঙ্গে কোনো একদিন চোখাচোখি হবে। এবং সেও চিনতে না পেরে সফিকের মতো ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে যাবে। কিন্তু পারুল আমাকে এক পলকে চিনে ফেলল। আমাকে দেখে সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'এক মুহূর্ত সে কোনো কথা বলতে পারল না। আমি খুব স্বাভাবিক গলায় বললাম, ভালো আছ পারুল ? অনেকদিন পরে দেখা। আমার খুব একটা জরুরি কাজ আছে। যাই তাহলে কেমন ?

পারুল আশ্চর্য ও দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি তখন সে কথা বলল। তোমার এমন অবস্থা হয়েছে ?

আমি অল্প হাসির ভঙ্গি করে হালকা সুরে বলতে চেষ্টা করলাম, ব্যবসাটা ফেল মেরেছে পারুল। আচ্ছা, যাই তাহলে ?

পারুল সে-কথার জবাব দিল না। আমি বিস্মিত হয়ে দেখি তার চোখে পানি এসে পড়েছে। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল।

পারুলকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যে জীবন আমার শুরু হয়েছে সেখানে প্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সামান্য কয়েক ফোঁটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারুল নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করল। সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে তাকে হারানোর দুঃখই নতুন করে অনুভব করলাম।

আমার জন্যে এই দুঃখটার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল।

নন্দিনী

মজিদ বলল, চল্ তোকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই।

বেশ রাত হয়েছে। চারদিকে ফিনফিনে কুয়াশা। দোকানপাট বন্ধ। হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পাড়াগাঁর শহরগুলোতে আগেভাগে শীত নামে। মজিদ বলল, পা চালিয়ে চল। শীত কম লাগবে।

কোথায় যাবি ?

চল না দেখি। জরুরি কোনো কাজ তো তোর নেই। নাকি আছে ?

না নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তা ছেড়ে ইট বিছানো সরু রাস্তায় এসে পড়লাম। শহর অনেক বদলে গেছে। আগে এখানে ডালের কারবারিরা বসত। এখন জায়গাটা ফাঁকা। পিছনেই ছিল কার্তিকের 'মডার্ন সেলুন'। সেখানে দেখি একটা চায়ের স্টল। শীতে গুটিসুটি মেরে লোকজন চা খাচ্ছে। আমি বললাম, এক দফা চা খেয়ে নিবি নাকি মজিদ ?

উঁহু, দেরি হয়ে যাবে।

শহরটা বদলে গেছে একেবারে! মহারাজের চপের দোকানটা এখনো আছে ?

আছে।

হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা পর্যন্ত চলে এলাম। ধর্মতলার গা ঘেঁসে গিয়েছে হাড়িখাল নদী। আমি আর মজিদ গোপনে সিগারেট টানবার জন্যে কতবার হাড়িখালের পাড়ে এসে বসেছি। কিন্তু এখন নদী-টদী কিছু চোখে পড়ছে না।

নদীটা কোথায় রে মজিদ ? হাড়িখাল এইদিকেই ছিল না ?

ওই তো নদী। সাবধানে আয়।

একটা নর্দমার মতো আছে এখানে। পা পিছলে পড়েই গিয়েছিলাম। সামলে উঠে দেখি নদী দেখা যাচ্ছে। আমরা নদীর বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। সরু ফিতের মতো নদী অন্ধকারেও চিকমিক করছে। আগে এখানে এরকম উঁচু বাঁধ ছিল না।

নদীর ঢালু পাড়ে সরষের চাষ হতো। মজিদ চুপচাপ হাঁটছিল।

আমি বললাম, আর দূর কত ?

ওই দেখা যাচ্ছে।

কার বাড়ি ?

আয় না চুপচাপ। খুব সারপ্রাইজড্ হবি।

একটি পুরনো ভাঙা দালানের সামনে দু'জন থমকে দাঁড়ালাম। বাড়ির চারপাশ ঝোপঝাড়ে অন্ধকার হয়ে আছে। সামনের অপরিচ্ছন্ন উঠোনে চার-পাঁচটা বড় বড় কাগজি লেবুর গাছ। লেবুর গন্ধের সঙ্গে খড় পোড়ানো গন্ধ এসে মিশেছে। অসংখ্য মশার পিনপিনে আওয়াজ। মজিদ খট্ খট্ করে কড়া নাড়তে লাগল। ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কেউ একজন বলল, কে ?

মজিদ আরো জোরে কড়া নাড়তে লাগল। হারিকেন হাতে একটি লম্বা রোগামতো শ্যামলা মেয়ে দরজা খুলে দিল। মজিদ বলল, কাকে নিয়ে এসেছি দেখ।

আমি কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন তো ? আমি নন্দিনী।

আমি মাথা নাড়লাম।

আপনি কবে দেশে ফিরেছেন ?

দু'মাস হবে। এতদিন ঢাকায় ছিলাম। এখানে এসেছি গতকাল।

মজিদ বিরক্ত হয়ে বলল, ভিতরে আয় না। ভিতরে এসে বস।

ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। একটি টেবিলে কাচের ফুলদানিতে গন্ধরাজ ফুল সাজানো। চৌকিতে ধবধবে সাদা চাদর বিছানো। ঘরের অন্যপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটা ইজি চেয়ার। মজিদ গা এলিয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ল। হালকা গলায় বলল, চিনি এনেছি। একটু চা বানাও।

নন্দিনী হারিকেন দুলিয়ে চলে গেল। আমরা দু'জন অন্ধকারে বসে রইলাম। মজিদ ফস করে বলল, সারপ্রাইজড হয়েছিস নাকি ?

হুঁ।

কেমন দেখলি নন্দিনীকে ?

ভালো।

শুধু ভালো ? ইজ নট শী ওয়ান্ডারফুল ?

আমি সে-কথার জবাব না দিয়ে বললাম, এই বাড়িতে আর কে থাকে ?

সবাই থাকে।

সবাই মানে ?

মজিদ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ঠান্ডা গলায় বলল, তুই একবার নন্দিনীকে প্রেমপত্র লিখেছিলি না ? অনেক কবিতা-টবিতা ছিল সেখানে। তাই না ?

আমি শুকনো গলায় বললাম, বাদ দে ওসব পুরনো কথা।

মজিদ টেনে টেনে হাসতে লাগল।

পরের দশ মিনিট দু'জনেই চুপ করে রইলাম। মজিদ একটির পর একটি সিগারেট টানতে লাগল। মাঝে মাঝে হাসতে লাগল আপন মনে।

অনেকক্ষণ আপনাদের অন্ধকারে বসিয়ে রাখলাম। ঘরে একটা মোটে হারিকেন। কী যে করি!

নন্দিনী চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল।

চিনি হয়েছে চায়ে?

কাপে চুমুক দিয়ে মজিদ বিষম খেয়ে কাশতে লাগল। আমি বললাম, আপনাদের এদিকে খুব হাওয়া তো।

হুঁ, নদীর উপরে বাড়ি। হাওয়ার জন্যে কুপি জ্বালানোই মুশকিল।

ভেতর থেকে কে একজন ডাকল, বউ! ও বউ!

নন্দিনী নিঃশব্দে উঠে গেল। আমি বললাম, তুই প্রায়ই আসিস এখানে?

আসি।

ব্যাপার কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

আমি চুপ করে রইলাম। মজিদ বলল, রাত হয়ে যাচ্ছে, এইবার ফিরব। নন্দিনীকে কেমন দেখলি বল না শুনি।

ভালো। আগের মতোই, একটুও বদলায়নি।

নন্দিনী আমাদের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় চারদিক কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। মজিদ বলল, যাই নন্দিনী।

নন্দিনী কিছু বলল না। হারিকেন উঁচু করে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে রইল। আমরা ধর্মতলা পর্যন্ত নিঃশব্দে হাঁটলাম। একসময় মজিদ বলল, কলেজের ফেয়ারওয়েলে নন্দিনী কোন গানটা গেয়েছিল মনে আছে?

না মনে নেই।

আমার আছে।

মজিদ গুনগুন করে একটি গানের সুর ভাজতে থাকল। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, জানিস, নন্দিনীকে আমিই এ বাড়িতে এনে তুলেছিলাম।

তাই নাকি?

ওর বাবাকে তখন মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে।

সুরেশ্বর বাবুকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছিল নাকি?

মারবে না তো কি আদর করবে? তুই কী যে কথা বলিস। মেরে তো সাফ করে ফেলেছে এদিকে।

আমি বললাম, সুরেশ্বর বাবু একটা গাধা ছিলেন। কত বললাম— মিলিটারি আসবার আগেই পালান। না, পালাবেন না, একটামাত্র মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হুস করে চলে যাবে, তা না...।

মজিদ একদলা থুথু ফেলে বলল, নন্দিনী তখন এসে উঠেছে হারুনদের বাসায়। হিন্দু মেয়েদের সেসময় কে জায়গা দেবে বল ? কী যে মুসিবত হলো! কতজনের বাড়িতে গিয়ে হাত জোড় করে বলেছি, এই মেয়েটিকে একটু জায়গা দেবেন ? এর বড় বিপদ। কেউ রাজি হয় না। শেষকালে আজিজ মাস্টার রাজি।

আজিজ মাস্টার কে ?

এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের টিচার।

মজিদ একটি সিগারেট ধরাল। ঘনঘন ধোঁয়া টেনে কাশতে লাগল। আমি বললাম, পা চালিয়ে চল, বেশ রাত হয়েছে।

মজিদ ঠাণ্ডা সুরে বলল, নন্দিনী আজিজ মাস্টারের কাছে কিছুতেই থাকতে চায়নি। বারবার বলেছে— আপনি তো ইন্ডিয়া যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। পায়ে পড়ি আপনার।

আমি ধমক দিয়ে বলেছি, তুমি হিন্দু মেয়ে, মুসলমান ছেলের সঙ্গে যাবে, পথেঘাটে গিজগিজ করছে মিলিটারি। নন্দিনী কী বলেছিল জানিস ?

কী ?

আন্দাজ করতে পারিস কিছু ?

আমি কথা বলার আগেই মজিদ চাপা গলায় বলল, নন্দিনী বলেছে, বেশ, তাহলে আপনার বউ সেজে যাই। না হয় আপনি আমাকে বিয়ে করুন।

মজিদ এক দলা থুথু ফেলল। আমি বললাম, আজিজ খাঁ বুঝি বিয়ে করেছে একে ?

হ্যাঁ।

আজিজ খাঁ কোথায় ? তাঁকে তো দেখলাম না।

ও শালাকে দেখবি কী করে ? ও মুক্তিবাহিনীর হাতে মরেছে। দালাল ছিল শালা। হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে বিয়ে করেছে। বুঝতে পারছিস না ? আর নন্দিনী কিনা তার বাড়িতেই মাটি কামড়ে পড়ে রইল। হারামজাদি।

আমি চুপ করে রইলাম। মজিদ দাঁড়িয়ে পড়ল। অকারণেই গলা উঁচিয়ে বলল, মেয়েমানুষের মুখে থুথু দেই। তুই হারামজাদি ওই বাড়িতে পড়ে আছিস কী জন্যে ? কী আছে ওই বাড়িতে ? জোর করে তোকে বিয়ে করেছে, আর তুই কিনা ছিঃ ছিঃ!

দু'জনে বাঁধ ছেড়ে শহরের প্রশস্ত পথে উঠে এলাম। বড় রাস্তাটা বটগাছ পর্যন্ত গিয়ে বেঁকে গেছে ডানদিকে। এদিকেই সুরেশ্বর বাবুর বাড়ি ছিল। আমি আর মজিদ সেই বাড়ির সামনে শুধুমাত্র নন্দিনীকে এক নজর দেখবার জন্যে ঘুরঘুর করতাম। কোনো কোনো দিন সুরেশ্বর বাবু অমায়িক ভঙ্গিতে ডাকতেন, আরে আরে তোমরা

যে। এসো, এসো চা খাবে। মজিদ হাতের সিগারেট কায়দা করে লুকিয়ে ফেলে বলত, আরেক দিন আসব কাকা।

মজিদ নিঃশব্দে হাঁটছিল। আমি ডাকলাম, এই মজিদ।

কী ?

চুপচাপ যে ?

শীত করছে।

সে কান পর্যন্ত চাদর তুলে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, জানিস, আমি আর নন্দিনী একটা গোটা রাত নৌকায় ছিলাম। রাতের অন্ধকারে আজিজ খাঁর বাড়িতে নৌকা করে ওকে রেখে এসেছিলাম। খুব কাঁদছিল সে। আমি ওর ঘাড়ে একটা চুমু খেয়েছিলাম।

মজিদ হঠাৎ কথা থামিয়ে কাশতে লাগল। আমি চারদিকের গাঢ় কুয়াশা দেখতে লাগলাম।

শঙ্খমালা

অনেক রাতে খেতে বসেছি, মা ধরা গলায় বললেন, খবর শুনেছিস ছোটন ?

কী খবর ?

পরী এসেছে।

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। মা থেমে থেমে বললেন, পরীর একটি মেয়ে হয়েছে।

মায়ের চোখে এবার দেখা গেল জল। আমি বললাম, ছিঃ মা, কাঁদে কেন ?

মা সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, না, কাঁদি না তো। আর দুটি ভাত নিবি ?

আমি দেখলাম মা'র চোখ ছাপিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। মায়েরা বড় দুঃখ পুষে রাখে।

ছ'বছর আগের পরী আপাকে ভেবে আজ কি আর কাঁদতে আছে ? হাত ধুতে বাইরে এসে দেখি ফুটফুটে জ্যোৎস্না নেমেছে। চারদিকে কী চমৎকার আলো। উঠোনের লেবু গাছের লম্বা কোমল ছায়া সে আলোয় ভাসছে। কতদিনের চেনা ঘরবাড়ি কেমন অচেনা লাগছে আজ।

বারান্দায় ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন আমার অন্ধ বাবা। তাঁর পাশে একটি শূন্য টুল। ঘরের সমস্ত কাজ সেরে আমার মা এসে বসবেন সেখানে। ফিসফিস করে কিছু কথা হবে। দুজনেই তাকিয়ে থাকবেন বাইরে। একজন দেখবেন

উথাল-পাতাল জ্যোৎস্না, অন্যজন অন্ধকার।

বাবা মৃদু স্বরে ডাকলেন, ছোটন, ও ছোটন! আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি তাঁর অন্ধ চোখে তাকালেন আমার দিকে। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, পরী এসেছে শুনেছিস?

শুনেছি।

আচ্ছা যা।

আজ আমাদের বড় দুঃখের দিন। পরী আপা আজ এসেছেন। কাল খুব ভোরে তাদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়তো দেখা যাবে হাসি-হাসি মুখে শিমুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। শিমুল তুলো উড়ে এসে পড়ছে তাঁর চোখে-মুখে। আমাকে দেখে হয়তো খুশি হবেন। হয়তো বা হবেন না। পরী আপাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে।

আমরা খুব দুঃখ পুষে রাখি। হঠাৎ হঠাৎ এক-একদিন আমাদের কত পুরনো কথা মনে পড়ে। বুকের ভেতর আচমকা ধাক্কা লাগে। চোখে জল এসে পড়ে। এমন কেন আমরা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, আমার মা হাত ধুতে কলঘরে যাচ্ছেন। মাথার কাপড় ফেলে তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর অনেক সময় নিয়ে অজু করলেন। একসময় এসে বসলেন শূন্য টুলটায়। বাবা ফিসফিস করে বললেন, খাওয়া হয়েছে তোমার?

হুঁ। তোমার বুকে তেল মালিশ করে দেব?

না।

সিগারেট খাবে? দেব ধরিয়ে?

না।

তারপর দু'জনে নিঃশব্দে বসেই রইলেন, বসেই রইলেন। লেবু গাছের ছায়া ক্রমশ ছোট হতে লাগল। এত দূর থেকে বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার মা কাঁদছেন। বাবা তাঁর শীর্ণ হাতে মা'র হাত ধরলেন। কফ-জমা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কাঁদে না, কাঁদে না।

বাবা তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীকে আজ আবার তিরিশ বছর আগের মতো ভালোবাসুক। আমার মা'র আজ বড় ভালোবাসার প্রয়োজন। আমি তাঁদের ভালোবাসার সুযোগ দিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়। মা ব্যাকুল হয়ে ডাকলেন, কোথায় যাস ছোটন?

এই একটু হাঁটব রাস্তায়।

দেরি করবি না তো?

না।

মা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, ছোটন, তুই কি পরীদের বাসায় যাচ্ছিস?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, যেতে চায় যাক না। যাক।

রাস্তাঘাট নির্জন। শহরতলীর মানুষরা সব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। তারস্বরে ঝিঁঝি ডাকছে চারপাশে। গাছে গাছে নিশি পাওয়া পাখিদের ছটফটানি। তবু মনে হচ্ছে চারপাশ কী চুপচাপ।

রাস্তায় চিনির মতো সাদা ধুলো চিকমিক করে। আমি একা একা হাঁটি। মনে হয় কত যুগ আগে যেন অন্য কোনো জন্মে এমন জ্যোৎস্না হয়েছিল। বড়দা আর আমি গিয়েছিলাম পরী আপাদের বাসায়। আমার লাজুক বড়দা শিমুল গাছের আড়াল থেকে মৃদুস্বরে ডেকেছিলেন, পরী, ও পরী।

লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন পরীর মা। হাসিমুখে বলছিলেন, ও-মা তুই ? কবে এলি রে ? কলেজ ছুটি হয়ে গেল ?

ভালো আছেন খালা ? পরী ভালো আছে ?

খবর পেয়ে পরী হাওয়ার মতো ছুটে এসেছিল ঘরের বাইরে। এক পলক তাকিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিল, ইশ! কতদিন পর কলেজ ছুটি হলো আপনার।

আমার মুখচোরা লাজুক দাদা ফিসফিসিয়ে বলছিলেন, পরী, তুমি ভালো আছ ?

হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন ?

ভালো। তোমার জন্যে গল্পের বই এনেছি পরী।

এসব কোন জন্মের কথা ভাবছি ? হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে— এসব কি সত্যি সত্যি কখনো ঘটেছিল ? একজন বৃদ্ধা মা একজন অন্ধ বাবা— এরা ছাড়া কোনো কালে কি কেউ ছিল আমার ?

পরী আপার বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়ালাম। খোলা উঠোনে চেয়ার পেতে পরী আপা চুপচাপ বসে আছেন। পাশে একটি শূন্য চেয়ার। পরী আপার বর হয়তো উঠে গেছেন একটু আগে। পরী আপা আমাকে দেখে স্বাভাবিক গলায় বললেন, ছোটন না ?

হ্যাঁ।

উহ্! কতদিন পর দেখা। বোস এই চেয়ারটায়।

আপনি ভালো আছেন, পরী আপা ?

হ্যাঁ, আমার মেয়ে দেখবি ? বোস নিয়ে আসছি।

লাল জামা গায়ে ডল পুতুলের মতো একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করে ফিরে আসলেন তিনি।

দেখ, অবিকল আমার মতো হয়েছে। তাই না ?

হ্যাঁ, কী নাম রেখেছেন মেয়ের ?

নীরা। নামটা তোর পছন্দ হয় ?

চমৎকার নাম।

অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমি। একসময় পরী আপা বললেন, বাড়ি যা ছোটন। রাত হয়েছে।

বাবা আর মা তেমনি বসে আছেন। বাবার মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। তাঁর সারা মাথায় দুধের মতো সাদা চুল। মা দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। পায়ের শব্দে চমকে উঠে বাবা বললেন, ছোটন ফিরলি?

জি।

পরীদের বাসায় গিয়েছিলি?

হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হলো না। আমরা তিনজন চুপচাপ বসে রইলাম।

একসময় বাবা বললেন, পরী কিছু বলেছে?

না।

মা'র শরীর কেঁপে উঠল। একটি হাহাকারের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন, আমার বড় খোকা। আমার বড় খোকা।

এনড্রিন খেয়ে মরা আমার অভিমানী দাদা যে প্রগাঢ় ভালোবাসা পরী আপার জন্যে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন তার সবটুকু দিয়ে বাবা আমার মাকে কাছে টানলেন। ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলেন মা'র কুঞ্চিত কপালে। ফিসফিস করে বললেন, কাঁদে না, কাঁদে না।

ভালোবাসার সেই অপূর্ব দৃশ্যে আমার চোখে জল আসল। আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললুম, পরী আপা, আজ তোমাকে ক্ষমা করেছি।

ফেরা

খেতে বসে জরীর রাগ হয়ে গেল। ভাতের থালা সরিয়ে তেজী গলায় বলল, মা, আমি ভাত খাব না।

দীপু বসেছিল জরীর পাশে। বড় আপা যা করে তারও তাই করা চাই। সেও হাত গুটিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, মা, আমিও ভাত খাব না।

হাসিনা কিছু বলল না। জরীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। জরী মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আগের মতো তেজী গলায় বলল, রোজ রোজ এক জিনিস। ঘেন্না লাগে, মা।

বড় আপার দেখাদেখি দীপু বলল, আমারও ঘেন্না লাগে। রোজ রোজ এক জিনিস।

হাসিনার ভীষণ খিদে পেয়েছিল। দীপুর আব্বা কত রাতে ফেরে তার ঠিক নেই। হাসিনা খানিক ইতস্তত করে নিজের জন্যে ভাত বাড়ল। দীপুর মাথায় হাত রেখে কোমল স্বরে বলল, ভাত খেয়ে ফেল, লক্ষ্মীসোনা।

বড় আপা খাবে না?

না। সে রাজকন্যা কি-না, পোলাও-কোর্মা ছাড়া খেতে পারে না।

আমিও পোলাও-কোর্মা খাব মা।

আচ্ছা খেয়ো।

দীপু আড়চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে ভাত মাখতে শুরু করল। জরী বলল, ডিম ভেজে দিলে খাব।

ডিম নেই।

তাহলে কিন্তু আমি খাব না।

হাসিনা কিছু বলল না। জরী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফের বলল, আমি কিন্তু মা কাল সকালেও কিছু খাব না।

আচ্ছা, না খেলে কী করব আমি?

আমি তাহলে ঘুমুতে যাচ্ছি।

জরী প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। হাসিনা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। তাঁর এই মেয়েটি বড্ড অভিমানী হয়েছে। খাওয়া নিয়ে কেউ এরকম করে? অন্য ছেলেমেয়েগুলো খুব লক্ষ্মী। কোনোকিছু নিয়েই কোনো আবদার নেই। গত ঈদে দীপুকে কোনো কাপড় দিতে পারেনি। দীপুর আব্বা শুধু একজোড়া লাল মোজা দিয়েছিল ছেলেকে। তাই নিয়ে কী খুশি ছেলের। আর জরী গাল ফুলিয়ে বলেছে, বাবা, তোমাকে সিল্কের কাপড় আনতে বলেছি, তুমি এটা কী এনেছ? না, এ জামা আমি পরব না।

সে-কী কান্না মেয়ের! দীপুর আব্বা ভীষণ মন খারাপ করেছিল সেবার। হাসিনাকে বলেছিল, মরে যেতে ইচ্ছে করে গো। ছেলেমেয়েগুলোর সামান্য শখও মেটাতে পারি না। ছিঃ ছিঃ।

হাসিনা ভেবে পায় না জরী এমন অবুঝ হলো কী করে? বাবার রোজগারটাও তার চোখে পড়ে না? বছর না ঘুরতে ম্যাট্রিক দিবে যে মেয়ে।

সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। দীপু বলল, আজ তুমি আমাদের সঙ্গে ভাত খেয়েছ মা?

হ্যাঁ।

কী জন্যে খেয়েছ?

তোমরা যে লক্ষ্মীসোনা— এই জন্যে।

ও, বুঝেছি।

দীপুটা এমন করে কথা বলে। বড় মায়া লাগে হাসিনার।

খাওয়া হয়ে যেতেই হাসিনা অসুস্থ পরীর জন্য দুধ গরম করতে বসল। পরী খুব অসুখে ভোগে। কিছুদিন আগেই মাত্র হাম থেকে উঠল। এখন আবার জ্বর। বড় একজন ডাক্তারকে না দেখালেই নয়। দীপুর বাবাকে না জানিয়ে বড়দা'র কাছে চিঠি লিখলে কেমন হয়? এই ভাবতে ভাবতে হাসিনা পরীর কাছে গেল। পরী মা'কে দেখেই বলল, একটু ভাত খাব মা। কাঁচামরিচ দিয়ে ঝাল করে।

কাল খেয়ো মানিক।

না মা, আজ খাব। অল্প, মাত্র তিন লোকমা।

দীপু বলল, মা, পরী আপার জন্যে আমি ভাত বেড়ে আনব?

না, তুমি ঘুমাও।

পরীকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে দুধ খাওয়াতে হলো। হাসিনার ঘুম পাচ্ছিল। ছেলেমেয়েরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলটায় খুব সকাল সকাল রাত বাড়ে। ন'টাও বাজেনি, এর মধ্যে কেমন নীরব হয়ে গেছে চারদিক। কুলিপট্টির দিকে মাঝে মাঝে হল্লার শব্দ উঠছে— এছাড়া চারদিক ভীষণ নীরব।

রাত আরো বাড়তেই গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকতে লাগল। বিজলি চমকাতে লাগল ঘনঘন। আজ সারাদিন খুব গুমোট গিয়েছে। ঝড়টড় হবে কিনা কে জানে। ঝিঁঝি ডাকছে। মেঘের ডাক আর ঝিঁঝির শব্দ এই দুই মিলিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগছে। হাসিনা জেগে জেগে ঝিঁঝির ডাক শুনতে লাগল।

দীপুর বাবা এলো ঠিক ঝড় আসার আগে আগে। আরেকটু দেরি হলে ভিজে চুপসে যেত। সে এসে ঘরে ঢুকছে ওম্নি ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি। দমকা বাতাস। হাসিনা বলল, আর কিছুক্ষণ পরে এলেই গোসল সেরে আসতে পারতে।

গোসল এখন সারব, তুমি ভাত চড়াও দেখি।

হাসিনা অবাক হয়ে বলল, ভাত চড়াব কী! ভাত তো রাঁধাই আছে।

সে তো শুধু আমার জন্যে। সবাই মিলে আজ আবার খাব। দেখ কী এনেছি।

হাসিনা দেখল বড়সড় একটি রুই মাছ দড়ি দিয়ে কানকোর সঙ্গে বাঁধা। হাসিনা বলল, ও-মা, হঠাৎ এত বড় মাছ! কী ব্যাপার?

আছে একটা ব্যাপার।

দীপুর বাবা রহস্যময় হাসি হাসতে লাগল।

আজ থেকে আমার চল্লিশ টাকা বেতন বেড়েছে। তোল তোল সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোল। ওরে ও জরী, ওঠ তো মা।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সব কটি ছেলেমেয়ে উঠোনের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। অসুস্থ শরীরে পরীও উঠে এসে তার বাবার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে। দীপু বসেছে তার বাবার কোলে। পরী বলল, আমিও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ভাত খাব বাবা।

আচ্ছা খাবি।

দীপু বলল, আমরা আজ দু'বার করে খাব তাই না বাবা ?

হ্যাঁ।

দু'বার করে কেন খাব বাবা ?

বড় মাছ এনেছি তো সেইজন্যে।

ও বুঝেছি।

জরী মাছ ভেজে ভেজে থালায় রাখছিল। আনন্দে তার চোখ ঝলমল করছে। সে বলল, রোজ এরকম বড় মাছ হলে বেশ হয়। তাই না বাবা ?

হুঁ। আমার জরী মা তাহলে খুব খুশি হয়।

পরী বলল, রঞ্জু মামা গত বছর এরচে' বড় একটা মাছ এনেছিল না মা ? সেটা আরো কত বড়।

তোর বাবা একবার একটা চিতল মাছ এনেছিল। মাপ দিয়ে দেখেছি আমার চেয়েও লম্বা।

দীপু চোখ কপালে তুলে বলল, তুমি ভয় পেয়েছিলে, তাই না মা ?

হেসে উঠল সবাই। ভাত তখনো হয় নি। কাজেই অনেকক্ষণ ধরে মাছ মারার গল্প হতে থাকল। দীপুর বাবা একসময় জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে বড় মাছের কী নাম দীপু ?

চিতল মাছ বাবা।

জরী বলল, ধুর বোকা, তিমি মাছ।

রাত বাড়তেই থাকল। খাওয়াদাওয়া অনেক আগেই সারা হয়েছে। তবু ছেলেমেয়েরা বাবাকে ঘিরে বসে রয়েছে। সামান্য সব কথায় হা হা করে হেসে উঠছে। বাসন-কোসন কলতলায় রাখতে গিয়ে হাসিনা অবাক হয়ে দেখে, মেঘ কেটে অপরূপ জ্যোৎস্না উঠেছে। বৃষ্টিভেজা গাছপালায় ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। অকারণেই তার চোখে জল এসে যায়।

সৌরভ

আজহার খাঁ ঘর থেকে বেরুবেন, শার্ট গায়ে দিয়েছেন, তখনি লিলি বলল, বাবা আজ কিন্তু মনে করে আনবে।

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। মেয়ে বড় হয়েছে, ইচ্ছে করলেও ধমক দিতে পারেন না। সেই জন্যেই রাগী চোখে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

লিলি বলল, রোজ রোজ মনে করিয়ে দেই। আজ আনবে কিন্তু।

সামনের মাসে আনব।

না, আজই আনবে।

রাগে মুখ তেতো হয়ে গেল আজহার খাঁর। প্রতিটি ছেলেমেয়ে এমন উদ্ধত হয়েছে। বাবার প্রতি কিছুমাত্র মমতা নেই। আর নেই বলেই মাসের ছাব্বিশ তারিখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দৃঢ় গলায় বলতে পারে, না, আজই আনতে হবে।

তিনি নিঃশব্দে শার্ট গায়ে দিলেন। চুল আঁচড়ালেন। জুতা পরলেন। জুতার ফিতায় কাদা লেগেছিল, ঘষে ঘষে সাফ করলেন। লিলি সারাক্ষণই বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি বেরুবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই বলল, বাবা আনবে তো?

মেয়েটার গালে প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রাণপণে দমন করে তিনি শান্ত গলায় বললেন, টাকা নেই, সামনের মাসে আনব।

লিলি নিঃশব্দে উঠে গেল। তিনি ভেবে পেলেন না সবাই বৈরি হয়ে উঠলে কী করে বেঁচে থাকা যায়। তিনি তো কিছু বলেননি। শুধু শান্ত গলায় বলেছেন, হাতে টাকা নেই। এটা তাঁকে বলতে হলো কেন? যে মেয়ে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর অভাব বুঝতে পারে না সে কেমন মেয়ে?

তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। ইদানীং অল্পতেই তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়, সামান্য সব কারণে হতাশ বোধ করেন। বেঁচে থাকা অনাবশ্যক বলে মনে হয়।

‘হতাশা গুণনাশিনী। হতাশা মানুষের সমস্ত গুণ নষ্ট করে দেয়। তবুও তো ভালোবাসার মতো মহত্তম সৎগুণটি আমার এখনো নষ্ট হয়নি। তোমাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি। তোমাদের জন্যে সারাক্ষণ আমার বুক টনটন করে, আর লিলি তুমি তোমার বাবার দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে থাক। মাসের ছাব্বিশ তারিখে তোমার একটি শখের জিনিস আমি কিনে আনতে পারি না। কিন্তু তুমি তো আমারই মেয়ে। তুমি তোমার মায়ের মতো অবুঝ হবে কেন?’

আজহার খাঁর কান্না পেতে লাগল। যদিও সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাঁকে এক্ষুনি বাইরে বেরুতে হবে। তবু তিনি চৌকিতে বসে বাইরের আকাশ দেখতে লাগলেন।

বাবা, এই নাও টাকা।

লিলি তিনটি দশ টাকার নোট টেবিলে বিছিয়ে দিল। তিনি অবাক হয়ে বললেন, টাকা কোথায় পেয়েছিস?

আমার টাকা। আমি জমিয়েছি। আনবে তো বাবা?

আনব।

নাম মনে আছে তোমার?

আছে।

লজ্জা ও হতাশার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। বাইরে ঝিরঝির

করে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যা এখনো মিলায়নি। এর মধ্যেই চারদিকের তরল অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। পরিচিত পথঘাটও অপরিচিত লাগছে।

'দশ বছর ধরে আমি এই শহরে পড়ে আছি। দশ বছর খুব দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময়ে আমি রোজ একই রাস্তায় হাঁটছি। একই ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি। এই দীর্ঘ সময়ে কোথাও যাইনি। তোমাদের কথা ভেবেই প্রতিটি পয়সা আমাকে সাবধানে খরচ করতে হয়েছে। অফিসে টিফিন আওয়ারে সবাই যখন চায়ের সঙ্গে দু'টি করে বিস্কিট খায় আমি সেখানে এক কাপ চা নিয়ে বসি। সেও তোমাদের কথা ভেবেই। তোমরা তার প্রতিদানে কী দিয়েছ আমাকে ? আমাকে লজ্জা দেবার জন্যে লিলি, তুমি তোমার দীর্ঘদিনের জমানো টাকা বের করে আন। তোমার মা তার ভাইদের কাছে টাকা চেয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লেখে।'

তাঁর মনে হলো তিনি কুকুরের জীবনযাপন করছেন। সাধ-আহ্লাদহীন বিরক্তিকর জীবন। তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

বৃষ্টির ছাটে আধভেজা হয়ে আজহার খাঁ বাজারে ঢুকলেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে বাজার তেমন জমেনি। সন্ধ্যাবেলা যেমন জমজমাট থাকে চারদিক সেরকম নয়। কেমন ফাঁকা ফাঁকা। তিনি বড়সড় দেখে একটি স্টেশনারি দোকানে ঢুকে পড়লেন।

'ইভিনিং ইন প্যারিস' সেন্টটা আছে আপনাদের ?

না, অন্য সেন্ট আছে। দেখবেন ?

উঁহু, এইটাই চাই।

তখন ঝমঝম করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন। তিন-চারটি দোকান ঘুরতেই কাদায় পানিতে মাখামাখি। তাঁর গাল বেয়ে পানির স্রোত বইতে লাগল। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, সেন্টের শিশিটি তাঁর এই মুহূর্তেই প্রয়োজন। বৃষ্টি কখন ধরবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছেন না— এমনি তাড়া। পঞ্চম দোকানে সেটি পাওয়া গেল। দোকানি শিশিটি কাগজে মুড়ে বলল, ইশ, একেবারে যে ভিজে গেছেন ? রিকশা করে চলে যান।

কত দাম ?

ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দরদাম করবার ধৈর্য নেই আর। টাকার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে আজহার খাঁ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেখানে দু'টি এক টাকার নোট আর একটি আধুলী ছাড়া কিছুই নেই।

দোকানি নীরবে শিশিটি আগের জায়গায় রেখে দিল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এরকম ঘটনা যেন প্রতিদিন ঘটে। কাস্টমার জিনিস কিনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে পয়সা নেই। এ যেন খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

আজহার খাঁ ভাবলেশহীন মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বৃষ্টির ভেতর নেমে গেলেন। হু-হু করে হাওয়া বইছে। ঝড় উঠবে কিনা কে জানে। চশমার কাচে বৃষ্টির ফোঁটা জমে চারদিক ঝাপসা দেখাচ্ছে। আজহার খাঁ নীরবে হেঁটে চলেছেন। দু'একটি রিকশা তার ঘাড়ের উপর পড়তে পড়তে সামলে উঠছে। দ্রুতগামী ট্যাক্সির উজ্জ্বল আলো মাঝে মাঝে তাঁর চোখ ঝলকে দিচ্ছে। তিনি আচ্ছন্নের মতো হাঁটছেন। এই বৃষ্টি, এই শীতল হাওয়া, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাওয়া ময়লা পানির স্রোত, কিছুই যেন নজরে আসছে না তাঁর।

'আহা, আমার মেয়ে শখ করে একটা জিনিস চেয়েছে। আশা করে বসে আছে হয়তো। এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমার। বাবার সংসারে কত কষ্ট পাচ্ছে। তার নিজের সংসার হোক, সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি।'

এই জাতীয় অসংলগ্ন ভাবনা ভাবতে ভাবতে তিনি নয়াপাড়া ছাড়িয়ে হাইস্কুল ছাড়িয়ে সেইজখালী পর্যন্ত চলে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন, কী জন্য যাচ্ছেন, এসব তাঁর মনে রইল না। একসময় ইটে ধাক্কা খেয়ে পানিতে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলেন তাঁর পা টলছে; মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। 'পাগলের মতো ঘুরছি কী জন্যে ?' এই ভেবে ফিরে চললেন উল্টো পথে। বাজারের সীমানা ছাড়িয়ে পোস্ট অফিসের কাছে আসতেই সশব্দে বাজ পড়ল কোথাও। রাত কত হয়েছে কে জানে। বাতি-টাতি বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। লোকজন শুয়ে পড়েছে। আজহার খাঁর হঠাৎ মনে হলো রফিকের বাসায় গিয়ে বিশটা টাকা নিয়ে এলে হয়। কিন্তু দোকান খোলা থাকবে কতক্ষণ! তিনি ডানদিকের গলিতে ভেজা স্যান্ডেল টানতে টানতে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

ঘন অন্ধকার রাস্তা, বিজলির আলোয় একআধবার সব ফর্সা হয়ে ওঠে। পরক্ষণে নিকষ কালো।

রফিকের বাসায় কড়া নাড়তে গিয়ে বুঝলেন তাঁর শরীর সুস্থ নয়। প্রবল জ্বর এসেছে। পিপাসায় গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। রফিক আঁতকে উঠে বলল, কী হয়েছে আজহার ভাই ?

না, কিছু হয়নি। এক গ্লাস পানি খাওয়াও।

বাসার সবাই ভালো আছে তো ? ভাবির জ্বর কেমন ?

সব ভালোই আছে, এক গ্লাস পানি আন আগে।

আজহার খাঁ উদ্‌ভ্রান্ত শূন্যদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। রফিক তাঁর হাত ধরল, এহ্‌, তোমার ভীষণ জ্বর। কী হয়েছে বলো ?

টাকা আছে তোমার কাছে ?

কত টাকা ?

গোটা বিশেক।

দিচ্ছি। তুমি একটা শুকনো কাপড় পরো। আমি রিকশা আনিয়ে দিই।

আগে একটু পানি দাও।

ঘর বন্ধ করে দোকানিরা শুয়ে পড়েছিল। আজহার খাঁ হতভম্ব হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। রিকশাওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলল, ধাক্কা দেন না স্যার, ভিতরে লোক আছে।

তিনি প্রাণপণে দরজায় ঘা দিলেন। ভেতর থেকে শব্দ এলো— কে ? তিনি ভাঙা গলায় বললেন, আমি। একটু খুলেন ভাই।

কী ব্যাপার ?

টাকা নিয়ে এসেছি। সেন্টের শিশিটা দিন।

খুট্‌ করে দরজা খুলে গেল। সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দোকানদার তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তিনি পকেট হাতড়ে টাকা বের করলেন।

দোকানদার বলল, আপনার কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি।

এত রাতে আসলেন কেন ? সকালে আসলেই পারতেন।

রাত কত হয়েছে ?

সাড়ে বারো।

দ্রুতগতিতে রিকশা চলছে। তিনি শক্ত হাতে হুড চেপে ধরে আছেন। তাঁর সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। তাঁর মনে হলো তিনি যে-কোনো সময় ছিটকে পড়ে যাবেন।

বাড়ির কাছাকাছি সমস্ত অঞ্চলটা অন্ধকারে ডুবে আছে। একটি লাইটপোস্টেও আলো নেই। অল্প ঝড়-বাদলা হলেই এ দিককার সব বাতি নিভে যায়। রিকশা আজহার খাঁর বাড়ি থেকে একটু দূরে টগরদের বাড়ির সামনে থামল। তিনি দেখলেন, হারিকেন জ্বালিয়ে লিলি আর তার মা বারান্দায় বসে আছে। রিকশার বাতি দেখে দু'জনই উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারের জন্যে বুঝতে পারছে না কে এলো।

আজহার খাঁ ডাকলেন, লিলি! লিলি!

জমে থাকা পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে মা ও মেয়ে দু'জনেই দ্রুত আসছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে রিকশা থেকে নামতে গিয়ে উল্টে পড়লেন। যে জায়গাটায় তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, সেখানটায় অদ্ভুত মিষ্টি সুবাস। তিনি ধরা গলায় বললেন, লিলি, তোর শিশিটা ভেঙে গেছে রে।

লিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার শিশি লাগবে না। তোমার কী হয়েছে বাবা ?

গভীর জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন আজহার খাঁ। রঞ্জু অকাতরে ঘুমুচ্ছে। লিলি আর লিলির মা ভয়কাতর চোখে জেগে বসে আছেন। বাইরে বৃষ্টিস্নাত গভীর রাত। ঘরের ভেতরে হারিকেনের রহস্যময় আলো। জানালা গলে ভিজে হিমেল হাওয়া আসছে।

সেই হাওয়া সেন্টের ভাঙা শিশি থেকে কিছু অপরূপ সৌরভ উড়িয়ে আনল।

ভালোবাসার গল্প

নীলু কঠিন মুখ করে বলল, কাল আমাকে দেখতে আসবে।

রঞ্জু নীলুর কথা শুনল বলে মনে হলো না। দমকা বাতাস দিচ্ছিল। খুব কায়দা করে তাকে সিগারেট ধরাতে হচ্ছে। কথা শুনবার সময় নেই।

নীলু আবার বলল, আগামীকাল সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসবে।

কে আসবে ?

মাঝে মাঝে রঞ্জুর বোকামিতে নীলুর গা জ্বালা করে। এখনো তাই করছে।

রঞ্জু আবার বলল, কে আসবে সন্ধ্যাবেলা ?

নীলু থেমে থেমে বলল, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্র দেখতে আসবে।

রঞ্জুকে এ খবরে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হলো না। সে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আসুক না।

আসুক না মানে ? যদি আমাকে পছন্দ করে ফেলে ?

রঞ্জু গম্ভীর হয়ে বলল, পছন্দ করবে না মানে ? তোমাকে যে-ই দেখবে সে-ই ট্যারা হয়ে যাবে।

নীলু রেগে গিয়ে বলল, তোমার মতো যারা গাধা শুধু তাদের চোখই ট্যারা হবে।

রঞ্জু রাস্তার লোকজনদের সচকিত করে হেসে উঠল। নীলু বলল, আস্তে হাঁট না, দৌড়াচ্ছ কেন ?

রঞ্জু এ কথাতেও হেসে উঠল। কী কারণে জানি তার আজ ফুর্তির মুড দেখা যাচ্ছে। গুনগুন করে গানের কী একটা সুর ভাজল। সচরাচর এরকম দেখা যায় না। রাস্তায় সে ভারিক্কি চালে হাঁটে।

নীলু, সিনেমা দেখবে নাকি একটা ?

না।

চল না, যাই।

নীলু চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

কথা বলো না যে ? দেখবে ?

উঁহু। বাড়িতে বকবে।

কেউ বকবে না। মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা যখন হয় তখন মায়েরা তাদের কিছু বলে না।

কে বলেছে তোমাকে ?

আমি জানি। তখন মায়েদের মন খুব খারাপ থাকে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। এসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার তুমি বুঝবে না। চল একটা সিনেমা দেখি।

না।

বেশ তাহলে চল কোনো ভালো রেস্টুরেন্টে বসে চা খাওয়া যাক। নীলু সরু চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, খুব পয়সা হয়েছে দেখি।

রঞ্জু আবার হেসে উঠল, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল, কী ভেবেছ তুমি ? রোজ তোমার পয়সায় চা খাব ? এই দেখ।

রঞ্জু ম্যাজিশিয়ানদের মতো পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি চকচকে একশ' টাকার নোট বের করল।

আরো দেখবে ? এই দেখ।

এবার আরো দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট বের হলো। নীলু কোনো কথা বলল না।

তুমি এত গম্ভীর কেন নীলু ?

তোমার মতো শুধু শুধু হাসতে পারি না। বাসায় যাব, এখন চা-টা খাব না।

প্লিজ নীলু, এরকম করো কেন তুমি ?

রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। রঞ্জু ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে বলল, বেশ হয়েছে। যতক্ষণ বৃষ্টি না থামবে ততক্ষণ বন্দি। সে এবার আরাম করে আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীলু বলল, এই নিয়ে ক'টি সিগারেট খেলে ?

এটা হচ্ছে ফিফ্‌থ।

সত্যি ?

হুঁ।

গা ছুঁয়ে বলো।

আহ্ কী সব মেয়েলি ব্যাপার। গা ছুঁয়ে বললে কী হয় ?

হোক না হোক তুমি বলো।

রঞ্জু ইতস্তত করে বলল, আর সিগারেট খাব না। ওয়ার্ড অব অনার। মরদকা বাত হাতিকা দাঁত।

তারা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুল সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে। বৃষ্টি নেই। নিয়ন আলোয় ভেজা রাস্তা চিকমিক করছে।

রঞ্জু বলল, রিকশা করে একটু ঘুরবে নীলু ?

উঁহু।

বেশ। চল রিকশা করে তোমাকে ঝিকাতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

হ্যাঁ, পরে কেউ দেখুক।

সন্ধ্যাবেলা কে আর দেখবে ? একটা রিকশা ডাকি ?

আচ্ছা ডাক।

রিকশায় উঠতে গিয়ে রঞ্জু দেখল নীলুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সে দারুণ অবাক হয়ে গেল।

কী ব্যাপার নীলু ?

খুব খারাপ লাগছে। কাল যদি ওরা আমাকে পছন্দ করে ফেলে ?

রঞ্জু দরাজ গলায় হেসে উঠল, করুক না পছন্দ, আমরা কোর্টে বিয়ে করে ফেলব।

তারপর আমাকে তুলবে কোথায়, খাওয়াবে কী ? দু'টি টিউশনি ছাড়া আর কী আছে তোমার ?

এমএ ডিগ্রিটা আছে। সাহস আছে। আর...

আর কী ?

আর আছে ভালোবাসা।

নীলু এবং রঞ্জু দুজনেই এবার একত্রে হেসে উঠল। রঞ্জু অত্যন্ত উৎফুল্ল ভঙ্গিতে আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীলু মৃদুস্বরে বলল, এই তোমার সিগারেট ছেড়ে দেয়া ? ফেলো এক্ষুনি।

এটাই লাস্ট ওয়ান।

উঁহু।

রঞ্জু সিগারেট ছুড়ে ফেলল রাস্তায়।

পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে সন্ধ্যাবেলা, কিন্তু তোড়জোড় শুরু হলো সকাল থেকে। নীলুর বড়ভাই এই উপলক্ষে অফিসে গেলেন না। নীলুর ছোটবোন বীলুও স্কুলে গেল না। এই বিয়ের যিনি উদ্যোক্তা, নীলুর বড় মামা, তিনিও সাতসকালে এসে হাজির। নীলু তার এই মামাকে খুব পছন্দ করে, কিন্তু আজ যখন তিনি হাসিমুখে বললেন, কিরে নীলু বিবি, কী খবর ? তখন নীলু শুকনো মুখে বলল, ভালো।

মুখটা এমন হাঁড়ির মতো করে রেখেছিস কেন ? তোর জন্যে একটা শাড়ি এনেছি। দেখ তো পছন্দ হয় কি-না।

শাড়ি কী জন্যে মামা ?

আনলাম একটা ভালো শাড়ি। এই শাড়ি পরে সন্ধ্যাবেলা যখন যাবি ওদের সামনে...।

নীলু নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে এলো।

রান্নাঘরে নীলুর ভাবি রেহানা মাছ কুটছিল। কলেজ যেদিন ছুটি থাকে সেদিন নীলু রান্নায় সাহায্য করার নামে বসে বসে গল্প করে। আজ নীলু দেখল রেহানা ভাবির মুখ গম্ভীর। নীলু পাশে এসে বসতেই সে বলল, তোমার ভাই কাল রাতে আমাকে একটা চড় মেরেছে। তোমার বিশ্বাস হয় নীলু ?

নীলু স্তম্ভিত হয়ে গেল। রেহানা বলল, তুমি বিয়ে হয়ে চলে গেলে আমার কেমন করে যে দিন কাটবে।

নীলু বলল, দাদাটা একটা অমানুষ। অভাবে অভাবে এরকম হয়েছে ভাবি। তুমি কিছু মনে করো না।

না, মনে করব কী ? আমার এত রাগ-টাগ নেই।

দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। রেহানা একসময় বলল, তোমার ভাই পাঁচ টাকা মানত করেছে। তোমাকে যদি ওদের পছন্দ হয় তবে পাঁচ টাকা ফকিরকে দেবে।

নীলু কিছু বলল না। রেহানা বলল, পছন্দ তো হবেই। তোমাকে পছন্দ না করলে কাকে করবে ? তুমি কি আর আমার মতো ? কত মানুষ যে আমাকে দেখল নীলু, কেউ পছন্দ করে না। শেষকালে তোমার ভাই পছন্দ করল। সুন্দর-টুন্দর তো সে বোঝে না।

নীলু হেসে উঠল। রেহানা বলল, চা খাবে ? নীলু জবাব দিল না।

তোমাকে চা খাওয়াবার সুযোগ কি আর হবে ? বড়লোকের বউ হবে। মামা বলেছিলেন ওদের নাকি দু'টি গাড়ি। একটা ছেলেরা ব্যবহার করে, একটা বাড়ির মেয়েরা।

নীলু চুপ করে রইল। রেহানা বলল, ছেলের এক চাচা হাইকোর্টের জজ।

হাইকোর্টের জজ দিয়ে আমি কী করব ভাবি ?

তুমি যে কী কথা বলো নীলু, হাসি লাগে।

দুপুর থেকে নীলুর দাদা গম্ভীর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। নীলু ভেবে পেল না এই সামান্য ব্যাপারে দাদা এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে কেন ? একটি ছেলে মোটা মাইনের একটা চাকরি করলে এবং ঢাকা শহরে তার ঘর-বাড়ি থাকলেই এরকম করতে হয় নাকি ?

অকারণে রেহানা নীলুর দাদার কাছে ধমক খেতে লাগল।

বললাম একটা ফুলদানিতে ফুল এনে রাখতে।

এই বুঝি ঘর পরিষ্কারের নমুনা ?

টেবিল ক্লথটাও ইস্ত্রি করিয়ে রাখতে পারনি ?

নীলুর বড় মামা অনেকবার তাকে বোঝালেন কী করে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। নম্র ভঙ্গিতে চা এগিয়ে দিতে হবে। কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব কম কথায় উত্তর দিতে হবে। নীলুর রীতিমতো কান্না পেতে লাগল। সাজগোজ করাবার জন্যে মামি

এলেন বিকেলবেলা। সন্ধ্যা হবার আগেই নীলু সেজেগুজে বসে রইল। সমস্ত ব্যাপারটি যেরকম ভয়াবহ মনে হয়েছিল সেরকম কিছুই হলো না। ছেলের বাবা খুব নরম গলায় বললেন, কী নাম মা তোমার ?

নীলাঞ্জনা।

খুব কাব্যিক নাম। কে রেখেছেন ?

বাবা।

তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নীলুর মামার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। ছেলে নিজেও এসেছিল। নীলু তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারল না। চা-পর্ব শেষ হবার পর নীলু যখন চলে আসছে তখন শুনল একজন ভদ্রমহিলা বলছেন, খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের।

আগস্ট মাসে বিয়ে দিতে আপনাদের কোনো অসুবিধা আছে ?

নীলুর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রেহানা রান্নাঘরে বসে ছিল। নীলুকে দেখেই বলল, টি-পটটা ভেঙে দু'টুকরো হয়েছে। তোমার ভাই শুনলে কী করবে ভেবে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কী অলক্ষণ। ওমা, কাঁদছ কেন, কী হয়েছে ?

নীলু প্রায় দৌড়ে এসে তার ভাবিকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল, ভাবি, আমি রঞ্জু ভাইকে বিয়ে করব। আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়। তুমি দাদাকে বলো ভাবি।

আমি ? আমার সাহস হয় না। হায় রে কী করি। চুপ নীলু, চুপ। ভালো করে সব ভাবো। এক্ষুনি জানাজানির কী দরকার।

আমি ভাবতে পারি না ভাবি।

নীলু এ ক'দিন কলেজে যায়নি। দিন সাতেক পর যখন প্রথম গেল ক্লাসের মেয়েরা অবাক হয়ে বলল, বড্ড রোগা হয়ে গেছিস তুই। অসুখ-বিসুখ নাকি ?

সে চুপ করে রইল।

কেমন গোলগাল মুখ ছিল তোর, এখন কী রকম লম্বাটে হয়ে গেছে। কিন্তু বেশ লাগছে তোকে ভাই।

ক্লাসে মন টিকল না নীলুর। ইতিহাসের অনিল স্যার ঘুমপাড়ানো সুরে যখন গুপ্ত ডায়ানিস্টি পড়াতে লাগলেন তখন ছাত্রীদের স্তম্ভিত করে নীলু উঠে দাঁড়াল।

স্যার, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। বাসায় যাব।

অনিল স্যার অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বেশি খারাপ ? সঙ্গে কোনো বন্ধুকে নিয়ে যাবে ?

না স্যার, একাই যাব।

নীলু ক্লান্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, কলেজ গেটের সামনে রঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো মুখ। হাতে একটা কাগজের ঠোঙ্গা।

গত তিনদিন ধরে আমি রোজ একবার করে আসি তোমাদের কলেজে।

নীলু বলল, এই ক'দিন আসিনি, শরীর ভালো না।

দুজন পাশাপাশি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল। তারপর রঞ্জু হঠাৎ দাঁড়িয়ে থেমে থেমে বলল, আগস্ট মাসের ৯ তারিখে তোমার বিয়ে ?

কে বলল ?

কার্ড ছাপিয়েছ তোমরা। রেবার কাছে তোমার বিয়ের কার্ড দেখেছি।

নীলু চুপ করে রইল। রঞ্জু এত বেশি উত্তেজিত ছিল যে, সহজভাবে কোনো কথা বলতে পারছিল না। কোনোমতে বলল, কার্ড দেখেও আমার বিশ্বাস হয়নি। তুমি নিজের মুখে বলো।

নীলু মৃদুস্বরে বলল, না, সত্যি না। তোমাকেই বিয়ে করব আমি।

কবে ?

আজই।

রঞ্জু স্তম্ভিত হয়ে বলল, তোমার মাথা ঠিক নেই নীলু।

মাথা ঠিক আছে। কোর্টে মানুষ কীভাবে বিয়ে করে আমি জানি না।

রঞ্জু বলল, চল আমার মেসে। কী হয়েছে সব কিছু শুনি।

সে নীলুর হাত ধরল।

রঞ্জুর নয়া পল্টনের মেসে নীলু আগে অনেকবার এসেছে। দুপুরের গরমে বসে অনেক সময় গল্প করে কাটিয়েছে। কিন্তু আজকের মতো কুলকুল করে ঘামেনি কখনো। রঞ্জু বলল, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নীলু, বড্ড ঘামছ।

আমার কিছু হয় নি।

চা খাবে ? চা দিতে বলব ?

উঁহু। পানি খাব।

রঞ্জু পানির গ্লাস নিয়ে এসে দেখে, নীলু হাত-পা এলিয়ে বসে আছে। চোখ ঈষৎ রক্তাভ। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সে ভাঙা গলায় বলল, রেবা তোমাকে আমার বিয়ের কার্ড দেখিয়েছে ?

হুঁ।

আর কী বলেছে সে ?

বলেছে, তোমাকে নাকি ফর্সা মতন রোগা একটি ছেলের সঙ্গে দেখেছে।

নীলু বলল, ওর নাম জমশেদ। ওর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে আমার।

রঞ্জু কিছু বলল না।

নীলু বলল, ওই ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তুমি কী করবে ?

কী করব মানে ?

নীলু ভীষণ অবাক হয়ে বলল, কিছু করবে না তুমি ?

তোমার শরীর সত্যি খারাপ নীলু। তুমি বাসায় যাও। বিশ্রাম করো।

নীলু রিকশায় উঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রঞ্জু বলল, আমি তোমার সঙ্গে আসব ? বাসায় পৌঁছে দেব ?

উঁহু।

নীলু বাসায় পৌঁছে দেখে অনেক লোকজন। হিরণপুর থেকে খালারা এসেছেন। বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে তুমুল হৈচৈ। নীলু আলগাভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সন্ধ্যায় চা খেতে বসে সেজো খালার হাসির গল্প শুনে উঁচু গলায় হাসল। কিন্তু রাতেরবেলা অন্যরকম হলো। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নীলু গিয়ে তার দাদার ঘরে ধাক্কা দিল। রেহানা বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে নীলু ?

নীলু ধরা গলায় বলল, বড় কষ্ট হচ্ছে ভাবি।

রেহানা নীলুর হাত ধরল। কোমল স্বরে বলল, ডাকব তোমার দাদাকে ? কথা বলবে তার সাথে ?

ডাক।

নীলুর দাদা সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে এলেন। অবাক হয়ে বললেন, কিরে নীলু, কিছু হয়েছে ?

নীলু বলল, কিছু হয় নি দাদা। তুমি ঘুমাও।

তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

অসময়

ঘরে ঢুকেই দেখি বসার ঘরে সোফায় হলুদ চাদর গায়ে দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে রগ-ওঠা ময়লা পা বের হয়ে আছে। সোফার হাতলে যে গোলাকার দাগ তা ওই পা থেকে এসেছে, বলাই বাহুল্য। রাগে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রান্নাঘরে জরী চা বানাচ্ছিল। আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, চায়ের সঙ্গে কী খাবে ? ঘরে কিছুই নেই। লুচি ভেজে দেব ?

আমি শুকনো গলায় বললাম, কে এসেছে ?

আমি জানি না। মগবাজার থেকে এসে দেখি উনি শুয়ে আছেন। করিম দরজা খুলে দিয়েছে। তোমার নাকি কী রকম আত্মীয় হন।

অনেকক্ষণ আমার মুখে কোনো কথা এলো না। দু'দিন পরপর এ-কী যন্ত্রণা! গত সপ্তাহেই এসেছে দু'জন। এর মধ্যে একজনের আবার ফিরে যাওয়ার ভাড়া ছিল না। তাকে নেত্রকোনায় ফিরে যাওয়ার ভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা দিতে হয়েছে। আমার হিসেব করা বেতনে ত্রিশ টাকার দাম আছে। মাসের বিশ তারিখে অফিস থেকে ফিরে নতুন একজন মেহমানকে দেখলে আমার সঙ্গত কারণেই মন খারাপ হয়।

তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে বসো। আমি চা নিয়ে আসছি।

কতদিন থাকবেন কিছু জানো নাকি ?

না। তবে বিছানাপত্র নিয়ে এসেছেন। কাজেই দীর্ঘ পরিকল্পনা থাকা বিচিত্র নয়।

জরী মুখ নিচু করে হাসল। এর মধ্যে হাসির কি আছে কে জানে। জরীকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

বিয়ের পর থেকেই সে মেহমানদারি করছে। সবই আমার গ্রামের বাড়ির গরিব আত্মীয়স্বজন। কেউ চাকরির সন্ধানে, কেউ চিকিৎসার জন্যে। আবার কেউ কেউ নিছক বেড়াবার জন্যে। নতুন এয়ারপোর্ট দেখবে, চিড়িয়াখানায় যাবে, শিশুপার্কে যাবে। জরী নির্বিকার। যেন এসব ঝামেলা বিচলিত হওয়ার মতো কোনো ঝামেলা নয়।

আমি প্রথম-প্রথম ভেবেছিলাম জরীর এই ব্যাপারটি লোক-দেখানো। আমার কাছে প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, সে যদিও অনেক বড়লোকের বাড়ির মেয়ে তবু আমার গরিব আত্মীয়স্বজনদের সে মোটেই অবহেলা করে না। এখন বুঝতে পারছি আমার ধারণা ঠিক নয়। কোনো-এক বিচিত্র কারণে জরীর মধ্যে বিরক্ত হবার ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। আমি যখন দেখি আমার কোনো ফুপাতো ভাই কিংবা খালাতো ভাই কার্পেটের ওপর নাক ঝেড়ে টেবিল ক্লথে হাত মুছছে তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। অথচ জরীকে দেখি বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক, যেন কার্পেটে নাক ঝাড়া তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

বারান্দায় ফুরফুরে হাওয়া। তবু আমার বিরক্ত ভাব কাটল না। জরী চা নিয়ে আসতেই বললাম, এইরকম মেহমানদারি করলে তো চলবে না জরী।

যতক্ষণ চলছে চলুক। তুমি চা খেয়ে ভদ্রলোককে ডেকে তুলে আলাপ-পরিচয় করো। রাগ করার কি আছে বলো ?

রাগ করার কিছু নেই ?

উঁহু।

সময়-অসময় নেই, স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে মাথায় একটা কাঁঠাল নিয়ে লোকজন আসতে থাকবে, আর আমি গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরব ?

জরী খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন এরকম মজার কথা সে বহুদিন শোনেনি। চা খেতে-খেতেই জানা গেল মেহমানের ঘুম ভেঙেছে এবং মেহমান আমার খোঁজ করেছেন। আমি গিয়ে দেখি হাসু চাচা! প্রায় এগারো বছর পরে দেখা। ডান গালে লাল

জড়ুল না দেখলে চিনতেই পারতাম না। কী চেহারা হয়েছে! মাথার চুল উঠে গেছে, সরু-সরু হাত-পা। আমাকে দেখেই বললেন, বিয়ে করলি, খবর তো দিস নাই।

আপনিও তো আমাকে কোনোদিন কোনো খবর দেননি চাচা!

তা ঠিক। খুব ঠিক কথা।

আপনার শরীরের এ-কী অবস্থা হয়েছে ?

মরণ রোগ। মরবার সময় যেসব অসুখ-বিসুখ হয় সেইসব। ভাবলাম মরবার আগে একবার দেখে যাই। বৌমাকেও দেখি। বৌমার খুব প্রশংসা শুনি লোকের কাছে।

আমি জরীকে গিয়ে বললাম, ইনি আমাদের হাসু চাচা।

তুমি যার বাড়িতে থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছিলে ?

হ্যাঁ।

এই প্রথমবার দেখলাম মেহমান দেখে বিরক্ত হওনি।

হাসু চাচা না থাকলে আমার পড়াশোনা হতো না জরী।

জরী হাসতে হাসতে বলল, পড়াশোনা না হলে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হতো না। কাজেই আমাদের দু'জনের দেখা হওয়ার পেছনেও তোমার হাসু চাচা।

রাতে হাসু চাচার অবস্থা খারাপ হলো। আকাশ-পাতাল জ্বর। আমাদের পাড়ার আফজল ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম রাত এগারোটায়।

ডাক্তার বললেন, এ তো সিরিয়াস রোগী। হাসপাতালে নিতে হবে।

হাসু চাচা শ্বাস টানতে-টানতে বহু কষ্টে বললেন, হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

প্রয়োজন নেই বললে তো হবে না। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

জরী আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, ইনার আত্মীয়স্বজনদের খবর দেয়া প্রয়োজন মনে হয়। কেমন করে তাকাচ্ছেন দেখ না। তুমি আমার ফুপার কাছেও একবার যাও। ফুপাকে নিয়ে এসো সঙ্গে করে।

ফুপা অবশ্যি এলেন না। জরীর আত্মীয়স্বজনরা কেউ কখনো আসেন না আমার এখানে। তবে তিনি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। রাগী রাগী গলায় বললেন, শুধু-শুধু বাড়িতে ঝামেলা করবেন না। হাসপাতালে দিন। আমি বলে দেব, ভালো খোঁজখবর করবে।

বাসায় ফিরে দেখি, হাসু চাচার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। আমাকে চিনতে পারেন না, কথা বললে জবাব দেন না, মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চারদিকে তাকান।

জরী একবার পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকতেই অবাক হয়ে ডাকতে লাগলেন, ও মিনু, ও মিনু।

জরী ফ্যাকাসে হয়ে বলল, মিনু কে ?

আমি বললাম, হাসু চাচার মেয়ে। অনেকদিন আগে মারা গেছে।

হাসু চাচা টেনে টেনে বললেন, ও মিনু ও মিনু, বেটি কাছে আয়। আয় না।

রাত একটার সময় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত দু'টা বেজে গেল। জরী দেখি একা একা জেগে বসে আছে। তার মুখ রক্তশূন্য। একদিনের পরিশ্রমে চোখের নিচে কালি পড়েছে।

অবস্থা কী তাঁর ?

বেশি ভালো না। স্যালাইন দিচ্ছে।

তুমি কি চা খাবে এক কাপ ?

না, এত রাতে ইচ্ছে করছে না।

খাও না। আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে বসো। আমি নিয়ে আসছি।

আমরা ঘুমুতে গেলাম প্রায় শেষরাতে। বাতি নিভিয়ে বিছানায় উঠতেই জরী মৃদুস্বরে বলল, তোমার হাসু চাচার যে একটি মেয়ে ছিল, মিনু— এই কথা কিন্তু তুমি আমাকে কখনো বলোনি।

এটা এমন কোনো দরকারি কথা না জরী।

জরী অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর হঠাৎ বলল, মাঝে মাঝে তুমি যখন আমাকে খুব আদর করো তখন কিন্তু আমাকে 'মিনু' ডাকো।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

জরী বলল, হাসু চাচার মেয়েটি কখন মারা গিয়েছিল ?

ক্লাস নাইনে পড়ার সময়।

মেয়েটি কেমন ছিল দেখতে ?

আমি জবাব দিলাম না। দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে জরী আমার হাত ধরল। ভালোবাসার গাঢ় স্পর্শ। বাইরের অস্পষ্ট আলোয় জরীর মুখ অবিকল সেই বালিকা মিনুর মুখের মতো দেখাতে লাগল। সেই মুখ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

বান

মাঝরাতে বাতাসীর ভয়ার্ত গলা শোনা গেল— ও রহমান, ও রহমান।

রহমান তার আগেই জেগেছে। সে জবাব দিল না। কান পেতে শুনল। কলকল করে ঘরে পানি ঢুকছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে নদীর শোঁ-শোঁ আওয়াজ আসছে। বাতাসী হাহাকার করে উঠল, পানি আসে, ও রহমান।

রহমান মরার মতো পড়ে রইল যেন সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

ও রহমান, ওরে রহমান।

রহমান ঠান্ডা গলায় ধমক দিল, প্যান প্যান করবা না। কুপি জ্বালো। খামোকা চিল্লাইও না।

পানি আসে যে রহমান।

আসুক।

বাতাসী কান্নার মতো শব্দ করে। রহমান শক্ত ধমক লাগায়, খবরদার কানবা না। ভাল্লাগে না।

কুপি জ্বালতে গিয়ে বাতাসীর হাত কাঁপে। বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ শব্দ হয়। কুপি জ্বালানোও মুশকিল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি বারবার নিভে যায়। কুপির ঘোলাটে আলোয় বাতাসী দেখতে পায় রহমান চুপচাপ বসে আছে চৌকিতে। তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে যেখানে ঘোলাটে পানি ক্রমে ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাতাসী চেঁচিয়ে উঠল, পুতিরে ডাক দে রহমান। আবাগীর বেটি এখনো ঘুমায়।

তুমি চুপ থাক। খামোকা চিল্লানি।

বাতাসী চুপ করে যায়। দরজা খুলতেই হাওয়ায় দপ করে কুপি নিভে যায়। ছপছপ শব্দ করে রহমান উঠোনে নেমে পড়ে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার চারদিকে। একটানা বৃষ্টি পড়ছে। নদীর পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাড়িঘরগুলো জেগে উঠেছে। দূরে দূরে কুপির আলোর ব্যস্ত নাড়াচাড়া চোখে পড়ে। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে একজন আরেকজনকে গলা ফাটিয়ে ডাকছে— কলিম ভাই! ও কলিম ভাই! একজন ডাকলেই সাড়া দিচ্ছে অনেকে। অনেকটা জায়গা জুড়ে হুই হুই শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে রহমান হাঁক পাড়ে, কুপি ধরাও গো মা, ভেন্দার মতো চাইয়া থাইক্য না।

কুপি হাতে বাইরে আসতেই আবার ফস করে কুপি নিভে যায়।

রহমান গাল পাড়ে, আরে বেকুব বেটি বুদ্ধিসুদ্ধি ছটাকটাও নাই।

ছপছপ শব্দ তুলে হাতড়ে হাতড়ে রহমান এগোয়। পানি এর মধ্যেই হাঁটু ছাপিয়ে উঠেছে। গোয়ালঘর অনেকটা নিচুতে। গরু দু'টির গলার দড়ি কেটে দেয়া উচিত। কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। কে জানে কেন! এর মধ্যেই ডুবে মরেছে নাকি ?

ঘরের ভেতর পুতি জেগে উঠেছে। পুতি ঘুমায় তার দাদির সঙ্গে। সেও জেগে উঠে চেঁচাতে শুরু করেছে, ও দাদি! ও দাদি!

পুতি, কী হইছেরে ? ও পুতি, কী হইছে ?

পুতি বলল, বান ডাকছে গো দাদি।

বুড়ি কানে শুনতে পায় না। সে কিছুই বুঝল না। পুতির ছোট ভাই কাদের আলী নেংটো হয়ে ঘুমিয়েছিল। বহু ডাকাডাকি করেও পুতি তার ঘুম ভাঙাতে পারল না।

বাইরে থেকে রহমান বলল, মুরগি কয়টা বেবাক মরছে গো মা।

গরুর দড়ি কাটছস বাপধন ?

হঁ। কাটছি।

তয় দেরি করস ক্যান ?

আইতাছি।

পুতি ঘরের আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। ভয়ে ভয়ে বলে, পানি কদ্দুর ভাইজান ?

বুক পানি। জব্বর টান।

রহমানকে দেখতে পেয়ে বধির দাদি গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। রহমান বিরক্ত হয়ে বলে, কী হইছে ?

পুতি আমারে গাল পাড়ে রহমান।

দুত্তেরি খালি বাজে ঝামেলা।

পুতি আমারে হাত দিয়া ঠেলা দিছে।

রহমান উত্তর না দিয়ে ঘুমন্ত কাদের আলীর গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দেয়।

হারামজাদা এখনো ঘুমায়, পানিতে সব নিল।

বুড়ি ঘ্যানঘ্যান করে, পুতিরে একটা চড় দে, ও রহমান, পুতি আমারে গাইল দিছে।

কাদের আলী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পানির দিকে। কাঁদতেও ভুলে যায়। রহমানের দাদি ফোকলা মুখে পান চিবোয়।

রহমান তার মায়ের দিকে পেছন ফিরে তামাক টানে। অনেকটা রাত পড়ে আছে সামনে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত যাওয়া যাবে না কোথাও। কিন্তু পানি যে হারে বাড়ছে কতক্ষণ চৌকির উপর বসে থাকা যাবে কে জানে।

ও রহমান, জাগন আছ ? ও রহমান।

রহমান হুঁকা রেখে বেরিয়ে এলো। কলাগাছের ভেলায় করে হাসু চাচা এসেছেন। তাঁর ছোট ছেলেটাও সঙ্গে আছে। ভিজে চুপসে গেছে দু'জনেই। হাসু চাচা ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, রহমান, জিনিস-পত্তর গোছগাছ কইরা রাখ। পানি আরো বাড়ব। আমি নৌকা আনতে যাই। রাইতে রাইতে বেবাক মানুষ রেল সড়কও তুলন লাগব।

রহমান বলল, তামুক খাইবেন চাচা ?

নাহ্। করিম মনে লয় বানে ভাইস্যা গেছে। হুনছস ?

নাহ্। হুনি নাই।

তার বউটা খুব চিল্লাইতেছে।

এট্টু তামুক খান চাচা।

নাহ্ যাই। তরা জিনিসপত্র ঠিকঠাক কর।

বাতাসী ও পুতি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ছোট ছোট পুঁটলি তৈরি করতে থাকে। রহমান চৌকির ওপর চুপচাপ বসে থাকে। তার দৃষ্টি নিরাসক্ত, যেন কোনোকিছুর

সঙ্গেই তার কোনো যোগ নেই। ঘরের ভেতরের পানি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পুতির চোখে জল টলটল করে। নিচু গলায় বলে, বড় ডর লাগে ভাইজান।

ডর লাগনের কিছু নাই। কাম কর।

কোমর ছাপিয়ে পানি উঠে আসবার পরই সবাইকে নিয়ে চালে ওঠে রহমান। বৃষ্টিও তখন নামে জোরেসোরে। রহমানের দাদি গলা ছেড়ে কাঁদতে বসে।

ও রহমান, ভিজলাম যে রে।

বুড়ির সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদে কাদের আলী।

বাতাসী আক্ষেপের সুর বের করে, ধান-চাউল সব গেল রে, ও রহমান। ও বাপধন।

রহমান ধমক লাগায়, খবরদার প্যানপ্যান করবা না।

অন্ধকার রাত। অঝোরে পড়ছে বৃষ্টি। চারদিকে ফুলে-ফেঁপে উঠছে রাতের মতোই অন্ধকার জলরাশি। দূরে দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাড়িঘর থেকে চিৎকার ও কোলাহল শোনা যাচ্ছে। নদীর শোঁ-শোঁ আওয়াজের সঙ্গে সে কোলাহল মিশে অদ্ভুত শব্দ হয়।

স্রোতের প্রবল টানে রহমানের বহুদিনের পুরনো চালাঘর নড়বড় করে কাঁপে। ভয়-পাওয়া গলায় পুতি ডাকে, ভাইজান! ও ভাইজান!

রহমানের দাদি ভাঙা গলায় বলে, ও দাদা, বড় শীত লাগে। এবং একসময় পুতি শুনতে পায় তার ছাব্বিশ বছরের জোয়ান দাদা ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে। তার বড় ইচ্ছে করে সে দাদার পাশে বসে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। দাদাকে তারা সবাই বড় ভয় করে।

সায়েন্স ফিকশন

তোমাদের জন্য ভালোবাসা

সবাই এসে গেছেন।

কালো টেবিলের চারপাশে সাজানো নিচু চেয়ারগুলিতে চুপচাপ বসে আছেন তাঁরা। এত চুপচাপ যে তাঁদের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসবে। কাল রাতের বেলা 'ভয়ানক জরুরি' ছাপমারা লাল রঙের চিঠি গিয়েছে সবার কাছে। সেখানে লেখা, 'আসন্ন মহাসংকট নিয়ে আলোচনা, আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।' মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণাগার-প্রধান এস. মাথুরের সই করা চিঠি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলে পরিচিত মহামান্য ফিহাও হয়তো হাজির থাকবেন এই জরুরি বৈঠকে। চিঠিতে অবশ্য এই কথা উল্লেখ নেই। কখনো থাকে না। অতীতে অনেকবার বিজ্ঞানী সম্মেলনের মহাপরিচালক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে, কিন্তু তিনি আসেন নি। বলে পাঠিয়েছেন, 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আসতে পারছি না, দুঃখিত।' কিন্তু আজ তাঁকে আসতেই হবে। আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা তো আর রোজ রোজ দেখা দেয় না। লক্ষ লক্ষ বছরেও এক-আধবার হয় কিনা কে জানে! এ সময়ে ফিহার মতো বিজ্ঞানী তাঁর অভ্যাসমতো শুয়ে শুয়ে গান শুনে সময় কাটাবেন, তাও কি হয়!

আমার মনে হয় মাথুর এসে পড়তে আর দেরি নেই।

যিনি কথা বললেন, সবাই ঘুরে তাকালেন তাঁর দিকে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, নীরবতা ভাঙার জন্যই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এ কথাগুলি বলা হয়েছে। বক্তার দিকে তাকিয়ে দু'একজন ভ্রু কোঁচকালেন। বক্তা একটু কেশে বললেন, কাল কেমন ঝড় হয়েছিল দেখেছেন? জানালার একটা কাচ ভেঙে গেছে আমার।

কথার উত্তরে কাউকে একটি কথাও বলতে না শুনে তিনি অস্বস্তিতে আঙুল মটকাতে লাগলেন। মাথা ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলেন।

ঘরটি মস্ত বড়। প্রায় হলঘরের মতো। জরুরি পরিস্থিতিতে হাজার দুয়েক বিজ্ঞানীর বসার জায়গা আছে। আজ অবশ্য এসেছেন আটাশ জন। বসবার ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণকক্ষের পাশের ফাঁকা জায়গাটায়। পর্দা টেনে নিয়ন্ত্রণকক্ষকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত ধরনের ঘর। শীতকালে জমে যাওয়া হ্রদের জলের মতো মৃসণ মেঝে। কালো পাথরের ইমিটেশনে তৈরি দেয়াল, দেখা যায় না এমন উঁচুতে ছাদ।

যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন, তার পাশের ঘরটিতে মহাশূন্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে যাওয়া স্টেশন, অভিযাত্রী দল, সন্ধানী দলের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে কম্পিউটার সিডিসি। বিজ্ঞানীদের হাজার বছরের সাধনায় তৈরি, মানুষের মস্তিষ্কের নিওরোনের[১] নিখুঁত অনুকরণে তৈরি নিওরোন যার জন্য প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। কে বলবে,

আজকের এ বৈঠকে হয়তো কম্পিউটার সিডিসিও অংশগ্রহণ করবে, নয়তো ঠিক তার পাশের ঘরেই বৈঠক বসানোর কোনো কারণ নেই।

এস. মাথুরের আসার সময় হয়েছে ঠিক দেড় ঘণ্টা আগে।— কথাগুলি বলে পদার্থবিদ স্রুরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অল্পবয়সেই অকল্পনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি সম্মানসূচক একটি লাল তারা পেয়েছেন। তাঁর আবিষ্কৃত দ্বৈত অবস্থানবাদ[২] নিয়ে তিন বছর ধরেই ক্রমাগত গবেষণা হচ্ছে। সেদিন হয়তো খুব দূরে নয়, যখন 'দ্বৈত অবস্থানবাদ' স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা স্রুরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তেজনায় স্রুরা অল্প কাঁপছিলেন। তাঁর টকটকে ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কপালের উপর এসে পড়া লালচে চুলগুলি বাঁ হাতে সরিয়ে তিনি দৃঢ় গলায় বললেন, একটি মিনিটও যেখানে আমাদের কাছে দামি, মাথুর কী করে সেখানে দেড় ঘণ্টা দেরি করেন ভেবে পাই না।

বিরক্তিতে স্রুরা কাঁধ ঝাঁকাতে লাগলেন। প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, মাথুরের মনে রাখা উচিত, সমস্যাটি মারাত্মক।

বিজ্ঞানীরা নড়েচড়ে বসলেন। সমস্যাটি নিঃসন্দেহে মারাত্মক, হয়তো ইতিমধ্যেই তা তাঁদের গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই ঘর, এই গোল কালো রঙের টেবিল, ঘরের ভেতরের ঠান্ডা বাতাস সমস্তই বলছে— সময় খুব কম, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের ভয়-পাওয়া মুখের ছায়া পড়েছে ঘরের কালো দেয়ালে। বুকের ভেতর শিরশির করা অনুভূতি নিয়ে তাঁরা নীরবে বসে আছেন।

মাঝে মাঝে একেকটা সময় আসে যখন পুরনো ধারণা বদলে দেয়ার জন্যে মহাপুরুষের মতো মহাবিজ্ঞানীরা জন্মান। কালজয়ী সেসব অতিমানব মানুষের জ্ঞানের সিঁড়ি ধাপে ধাপে না বাড়িয়ে লাফিয়ে ধারণাতীত উঁচু ধাপে নিয়ে যান। বিধাতার মতো ক্ষমতাধর এ সমস্ত মানুষেরা বহু যুগে এক-আধজন করে জন্মান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ শুরু হয় তখন। মানুষের আদিমতম কামনা, দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় বিষয় আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলব, অজানা কিছুই থাকবে না, অদেখা কিছুই থাকবে না। কোনো রহস্য থাকবে না।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়টা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের ক্ষমতার কাল চলছে। পুরনো ধারণা বদলে গিয়ে নতুন নতুন সূত্র ঝড়ের মতো এসে পড়ছে। যে সমস্ত জটিল রহস্যের হাজার বছরেও সমাধান হয় নি, অতীতের তাবৎ বিজ্ঞানীরা যা অসহায়ভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তাদের সমাধানই শুধু হয় নি— সে সমাধানের পথ ধরেই নতুন সূত্রাবলি, নতুন ধারণা কম্পিউটারের মেমরি সেলে[৩] সঞ্চিত হতে শুরু হয়েছে। জন্ম হয়েছে ফিহার মতো মহা আঙ্কিকের, যিনি তাঁর তুলনাহীন প্রতিভা নিয়ে

ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের[৪] সমাধান করেছেন মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে। জন্ম হয়েছে পদার্থবিদ স্ত্রুরার, পদার্থবিদ এস. মাথুরের। মানুষের তৈরি কৃত্রিম নিওরোন নিয়ে তৈরি হয়েছে মানবিক আবেগসম্পন্ন কম্পিউটার সিডিসি। গ্রহ থেকে গ্রহে, মহাকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। কে বলে জ্ঞানের শেষ নেই, সীমা নেই ? মানুষের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তেই হবে জ্ঞানকে। বিজ্ঞানীদের পিছু ফেরবার রাস্তা নেই— আরো জানো, আরো বেশি জানো।

এমনি যখন অবস্থা, ঠিক তখনি আবিষ্কৃত হলো টাইফা গ্রহ[৫]। এন্ড্রোমিডা[৬] নক্ষত্রপুঞ্জের একপাশে পড়ে থাকা ছোট্ট একটি নীল রঙের গ্রহ। চারপাশে উজ্জ্বল ধোঁয়াটে রঙের ছায়াপথের মাঝামাঝি গ্রহ একটি। এটি হঠাৎ আবিষ্কার। বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাকাশ গবেষণামন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল WGK-166[৭], একটি সাদা বামন নক্ষত্রকে, যা দ্রুত উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে প্রবল বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে যাবার জন্যে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ করলেন সাদা বামন নক্ষত্র[৮] থেকে বেরিয়ে আসা বিকিরণ-তেজের প্রায় ষাটভাগ কেউ যেন শুষে নিচ্ছে। এই প্রকাণ্ড ক্ষমতাকে কে টেনে নিতে পারে ? অন্য কোনো গ্রহের কোনো উন্নত প্রাণী কি এই মহাশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করছে ? যদি তা-ই হয়, তবে সে প্রাণী কত উন্নত ?

আবিষ্কৃত হলো টাইফা গ্রহ।

বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাজাগতিক স্টেশন নিনুপ-৩৭-এর অধিনায়ক টাইফার অনন্যসাধারণ আবিষ্কারক। সেই স্টেশনের সবাই অতি সম্মানসূচক দুই নীল তারা উপাধি পেলেন।

টাইফা গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগল এক বছর। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা হকচকিয়ে গেলেন। টাইফা গ্রহের গণিতশাস্ত্রের খবর আসতে লাগল। বিস্মিত বিজ্ঞানীরা কী করবেন বুঝতে পারলেন না। সমস্তই তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচরে। সেখানে সময় বলে কি কিছুই নেই ? সময়কে সবসময় শূন্য ধরা হচ্ছে কেন ? বস্তু বলে কি কিছুই নেই ? বস্তুকে শূন্য ধরা হচ্ছে কেন ? শক্তিকে দুই মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করছে কেন ?

মহা আঙ্কিক ফিহা, পৃথিবীর সব অঙ্কবিদরা নতুন গণিতশাস্ত্রের নিয়মাবলি পরীক্ষা করতে লাগলেন। ভুতুড়ে সব গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কোত্থেকে কী হচ্ছে ? তাদের ফলাফল হিসেবে মহাশূন্যে কোথাও কোনো বস্তু নেই। চারদিকে অনন্ত শূন্য। মানুষ মহাজাগতিক শক্তির একটি আংশিক ছায়া। তাহলে আমাদের ভাবনা-চিন্তা, আমাদের অনুভূতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রেম, ভালোবাসা সমস্তই কি মিথ্যা ? ছায়ার উপরেই জন্ম-মৃত্যু ?

পৃথিবীর খবরের কাগজগুলিতে আজগুবি সব খবর বেরুতে লাগল। কেউ কেউ লিখল, টাইফা গ্রহের মানুষেরা পৃথিবী ধ্বংস করে দিচ্ছে। কেউ লিখল, তারা পৃথিবীতে তাদের ঘাঁটি বানাবার জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। কেউ লিখল, বিজ্ঞানীদের মাথা গুলিয়ে ফেলার জন্যে তারা আজগুবি সব তথ্য পাঠাচ্ছে। গুজবের পিঠে ভর করেই গুজব চলে। টাইফা গ্রহ নিয়ে অজস্র বৈজ্ঞানিক-কল্পকাহিনী লেখা হতে থাকল। দু'জন পরিচালক এই নিয়ে থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি তৈরি করলেন। ছবির নাম 'নরক থেকে আসছি'। কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা ছড়িয়ে পড়ল, টাইফা গ্রহের বিজ্ঞানীরা নাকি পৃথিবীর বিজ্ঞানপল্লী সিরানে[৯] এসে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। মহাশূন্য-গবেষণা বিভাগ, খাদ্য-উৎপাদন বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণে। বাধ্য হয়ে এস. মাথুর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন।

জনসাধারণকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে। অমূলক ভয়ভীতি সরিয়ে দিয়ে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিজ্ঞানপল্লী সিরানে সেবারই সর্বপ্রথম অবিজ্ঞানীরা নিমন্ত্রিত হলেন।

'বিজ্ঞান পরিষদে'র মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি ...

বিজ্ঞানপল্লী সিরানে সর্বপ্রথম নিমন্ত্রিত অতিথিরা, আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। শুরুতেই টাইফা গ্রহ সম্বন্ধে আপনাদের যাবতীয় ধারণার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি। টাইফা গ্রহ নিয়ে আপনারা যত ইচ্ছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনা করুন, ছবি তৈরি করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। 'নরক থেকে আসছি' ছবিটা আমার নিজেরও অত্যন্ত ভালো লেগেছে।

গ্যালারিতে বসা দর্শকরা এস. মাথুরের এই কথায় হৈহৈ করে হাততালি দিতে লাগলেন। তালির শব্দ কিছুটা কমে আসতেই এস. মাথুর তাঁর নিচু ও স্পষ্ট কথা বলার বিশেষ ভঙ্গিতে আবার বলে চললেন, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা উন্নত ধরনের প্রাণীর সন্ধান টাইফা গ্রহে পেয়েছি।

একজন দর্শক চেঁচিয়ে বললেন, তারা কি দেখতে মানুষের মতো ?

তারা দেখতে কেমন তা দিয়ে আমার বা আপনার কারো কোনো প্রয়োজন নেই। তবে তারা নিঃসন্দেহে উন্নত জীব। তারা ওমিক্রন[১০] রশ্মির সাহায্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমরা ওমিক্রন রশ্মির যে সংকেত পাঠাচ্ছি, তা তারা বুঝতে পারছে এবং তারা সেই সংকেতের সাহায্যেই আমাদের খবর দিচ্ছে। এত অল্প সময়ে সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে সেই সংকেতে খবর পাঠানো নিঃসন্দেহে উন্নত শ্রেণীর জীবের কাজ।

হলঘর নিঃশব্দ হয়ে এস. মাথুরের কথা শুনছে। শুধু কয়েকটা মুভি ক্যামেরার সাঁ সাঁ ছুট্ ছুট্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এস. মাথুর বলে চললেন, আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, টাইফা গ্রহ গণিত ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন সূত্রাবলি সম্পর্কে যা বলতে চায় তা হতে পারে না, তা অসম্ভব।

কথা শেষ না হতেই নীল কোট পরা এক সাংবাদিক বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন, চেঁচিয়ে বললেন, কেন হতে পারে না ? কেন অসম্ভব ? আমরা বুঝতে পারছি না বলে ?

এস. মাথুর বললেন, তাদের নিয়মে সময় বলে কিছু নেই। একজন অনায়াসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। এ অসম্ভব ও হাস্যকর।

সাংবাদিক চড়া গলায় বললেন, কেন হাস্যকর ? হাজার বছর আগেও তো পৃথিবীতে টাইম মেশিন নিয়ে গল্প চালু ছিল।

এস. মাথুর বললেন, গল্প ও বাস্তব ভিন্ন জিনিস। আপনি একটি গল্পে পড়লেন যে, একটি লোক হঠাৎ একটি পাখি হয়ে আকাশে উড়ে গেল। বাস্তবে আপনি সেরকম কোনো পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারেন না। পারেন কি ?

কথা শেষ না হতেই দর্শকরা হো হো করে হেসে উঠল এবং বিক্ষিপ্তভাবে হাততালি পড়তে লাগল। সাংবাদিক লাল হয়ে বললেন, আমি পাখি হবার কথা বলছি না। আপনি কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

এস. মাথুর হাসিমুখে বললেন, না, আমি এড়িয়ে যাচ্ছি না। টাইম মেশিনের কল্পনা কতটুকু অবাস্তব তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন একটা টাইম মেশিন তৈরি করলাম, মেশিনে চড়ে আমরা চলে গেলাম অতীতে, যখন আপনার জন্মই হয় নি। আপনার বাবার বয়স মাত্র বারো। মনে করুন আপনার সেই বারো বছর বয়সের বাবাকে আমি খুন করে আবার টাইম মেশিনে চড়ে বর্তমানে এসে হাজির হলাম। এসে দেখি আপনি সিরানপল্লীতে দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা শুনছেন। অথচ তা হতে পারে না, কারণ আপনার বাবা বারো বছর বয়সে মারা গেছেন। অতএব আপনার জন্মই হতে পারে না।

সাংবাদিক বললেন, আমি বুঝতে পারছি, আমাকে ক্ষমা করবেন।

কিছুক্ষণ আর কোনো কথাবার্তা শোনা গেল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মহামান্য ফিহা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, দুর্লভ তিন লাল তারা সম্মানের অধিকারী, ত্রিমাত্রিক যৌগিক সময় সমীকরণের নির্ভুল সমাধান দিয়ে যিনি সমস্ত বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করে রেখেছেন। ফিহা মাথা নিচু করে হেঁটে গেলেন মাথুরের কাছে, বললেন, আমি কিছু বলব।

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। ফিহা বলে চললেন, কাল আমি সারারাত ঘুমুতে পারি নি। আমার একটা পোষা বেড়ালছানা আছে, সাদা রঙের, ধবধবে সাদা, বিলিয়ার্ড বলের মতো। ওর কী একটা অসুখ করেছে, সারারাত বিরক্ত করেছে আমাকে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভোররাতে ঘুমুতে গেছি, হঠাৎ মনে হলো টাইফা গ্রহের বিজ্ঞান নিশ্চয়ই নির্ভুল। আচমকা মনে হলো, সময় সংক্রান্ত আমার যেসব সূত্র আছে, সেখানে সময়কে শূন্য রাখলেও উত্তর নির্ভুল হয়, শুধু বস্তুকে ভিন্ন খাতায় নিয়ে যেতে হয়। আমি দেখাচ্ছি করে।

ফিহা ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে চলে গেলেন। একটির পর একটি সূত্র লিখে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অঙ্ক কষে চললেন। পরবর্তী পনের মিনিট শুধু চকের খসখস শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। ফিহা একসময় বোর্ড ছেড়ে ডায়াসে উঠে এসে বললেন, সবাই বুঝতে পেরেছেন আশা করি ?

দর্শকদের কেউই বুঝতে পারেন নি কিছুই। শুধু অঙ্ক কষার ধরন-ধারণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। সবাই মাথা নাড়ালেন, যেন খুব বুঝতে পেরেছেন। ফিহা বললেন, এখন মুশকিল হয়েছে কী জানেন ? তারা এত উপরের স্তরে পৌঁছে গেছে যে তাদের কোনো কিছুই এখন আর আমাদের ধারণায় আনা সম্ভব নয়। তাদের গণিত বলুন, তাদের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা— কিছুই নয়।

এবার বিজ্ঞানীদের ভেতর একজন দাঁড়িয়ে বললেন, কেন সম্ভব নয় ?

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, বোকার মতো কথা বলবেন না। মানুষ যেমন উন্নত, পিপীলিকাও তার স্কেলে অর্থাৎ তার প্রাণিজগতে উন্নত। এখন মানুষ কি পারবে পিপীলিকাকে কিছু শেখাতে ? গণিত শেখাতে পারবে ? পদার্থবিদ্যা শেখাতে পারবে ? পিপীলিকার আগ্রহ যতই থাকুক না কেন।

সভাকক্ষে তুমুল হাততালি পড়তে লাগল। এস. মাথুর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনারা হৈচৈ করবেন না। এইমাত্র নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে একটা মারাত্মক খবর এসেছে। আজকের অধিবেশন এই মুহূর্তেই শেষ।

এস. মাথুর উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। যিনি তাঁকে এসে কানে কানে খবরটি দিয়েছেন তিনিও ঘনঘন জিভ বের করে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন।

মারাত্মক খবরটি কী ? আমরা জানতে চাই।

দর্শকরা চেঁচাতে লাগলেন। বসে-থাকা বিজ্ঞানীরাও উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাথুরের দিকে।

মাথুর ভীত গলায় বললেন, কিছুক্ষণ আগে নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হঠাৎ করে ভোজবাজির মতো টাইফা গ্রহটি হারিয়ে গেছে। কোনো বিস্ফোরণ নয়, কোনো সংঘর্ষ নয়, হঠাৎ করে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। যেখানে গ্রহটি ছিল, সেখানে এখন শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনারা দশ মিনিটের ভেতর হলঘর খালি করে চলে যান। এক্ষুনি বিজ্ঞানীদের বিশেষ জরুরি বৈঠক বসবে। সভাপতিত্ব করবেন মহামান্য ফিহা।

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার এক্ষুনি বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। বেড়ালছানা রাত থেকে কিছু খায় নি। তাকে গ্লুকোজ ইন্টারভেনাস দিতে হবে।

মাথুর বললেন, আপনি চলে গেলে কী করে হবে ?

ফিহা বললেন, আমি থাকলেই বুঝি সেই গ্রহটা আবার ফিরে আসবে ?

সেদিন সন্ধ্যাতেই অভ্যন্তরীণ বেতার, বহির্বিশ্ব বেতার থেকে জরুরি নির্দেশাবলি প্রচারিত হলো—

আমি বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি।

এই মুহূর্ত থেকে পৃথিবীর উপনিবেশ মঙ্গল ও চন্দ্র এবং পৃথিবীর যাবতীয় মহাজাগতিক স্টেশনে চরম সঙ্কট ঘোষণা করা হলো। টাইফা গ্রহ যেরকম কোনো কারণ ছাড়াই মহাশূন্যে মিশে গেছে, তেমনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রও মিশে যাচ্ছে। আমাদের কম্পিউটার সিডিসি কত পরিধি, কোন্ পথে এবং কত গতিতে এই অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, তা বের করতে সক্ষম হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, এই গতিপথ চক্রাকার। তা টাইফা গ্রহ থেকে শুরু হয়ে আবার সেখানেই শেষ হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবী, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি এই আওতায় পড়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবী আর এক বছর তিন মাস পনের দিন পর এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে। বিজ্ঞানীরা কী করবেন তা স্থির করতে চেষ্টা করছেন। আপনাদের প্রতি নির্দেশ—

এক. আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। আতঙ্কগ্রস্ত হলে এই বিপদ থেকে যখন রক্ষা পাওয়া যাবে না, তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লাভ কী ?

দুই. যার যা করণীয় তিনি তা করবেন।

তিন. কোনো প্রকার গুজব প্রশ্রয় দেবেন না। মনে রাখবেন বিজ্ঞানীরা সবসময় আপনাদের সঙ্গেই আছেন। যা অবশ্যম্ভাবী, তাকে হাসিমুখে বরণ করতে হবে নিশ্চয়ই, তবু বলছি, বিজ্ঞানীদের উপর আস্থা হারাবেন না।

কালো টেবিলের চারপাশে নিচু চেয়ারগুলিতে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন। পদার্থবিদ স্রুরা বললেন, আমরা কি অনন্তকাল এখানে বসে থাকব ? এস. মাথুর যদি পাঁচ মিনিটের ভেতর না আসেন তবে আমি চলে যাব।

ঠিক তক্ষুনি এস. মাথুর এসে ঢুকলেন। এক রাতের ভেতরেই তাঁর চেহারা বদলে গিয়ে কেমন হয়ে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কোনো রকমে বললেন, আমি দুঃখিত, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি এতক্ষণ চেষ্টা করছিলাম ফিহাকে আনতে। তিনি কিছুতেই আসতে রাজি হলেন না। প্রেইরি অঞ্চলে চলে গেছেন হাওয়া বদল করতে। এত বড় বিপদ, অথচ—।

স্রুরা মুখ বিকৃত করে বললেন, ওর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, যতবড় প্রতিভাই হোক, প্রাণদণ্ডই তার যোগ্য পুরস্কার।

মাথুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

হাতলে হাত রাখবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

এত অল্প সময়ে কী করে যে গতি এমন বেড়ে যায় ভাবতে ভাবতে লী বাতাসের ধাক্কা সামলাতে লাগল। হাতল খুব শক্ত করে ধরা আছে, তবু দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে

না। বাঁ হাতে মস্ত একটা ব্যাগ থাকায় সে-হাতটা অকেজো। দেরি করবার সময় নেই, টুরিস্ট ট্রেনগুলি অসম্ভব গতিতে চলে। কে জানে হয়তো এরই মধ্যে ঘণ্টায় দু'শো মাইল দিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে হাতের কালো ব্যাগটা ছুটে বেরিয়ে যাবে।

এই মেয়ে, ব্যাগ ফেলে দু'হাতে হাতল ধরো।

বুড়োমতো একজন ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। ঠিক কখন যে তিনি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, লী লক্ষই করে নি। সে চেঁচিয়ে বলল, ব্যাগ ফেলা যাবে না। আপনি আমার কোমরের বেল্ট ধরে টেনে তুলুন না দয়া করে।

লীর ধাতস্থ হতে সময় লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ধন্যবাদ। আরেকটু দেরি হলে উড়েই যেতাম।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। লজ্জিতভাবে বললেন, এই কামরার বিপদ সংকেতের বোতামটা আমি খুঁজে পাই নি, পেলে এত অসুবিধা হতো না।

ঐ তো বোতামটা, কী আশ্চর্য, এটা দেখেন নি!

উঁহু। বুড়ো মানুষ তো।

লীর মনে হলো এই লোকটি তার খুব চেনা। যেন দীর্ঘকালের গভীর পরিচয়। অথচ কোথায়, কী সূত্রে, তার কিছুই মনে নেই।

লী বলল, আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

হচ্ছে নাকি?

আপনি সিনেমায় অভিনয় করেন? সিনেমার লোকদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে খুব চেনা মনে হয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আপনি কখনো সিনেমার অভিনেতাদের রাস্তায় দেখেন নি?

না।

আমি দেখেছি। হাপারকে দু'দিন দেখেছি।

তুমি কি নিজেও সিনেমা কর?

না। কেন বলুন তো?

খুব সুন্দর চেহারা তোমার, সেই জন্যেই বলছি।

যান! বেশ লোক তো আপনি।

কী নাম তোমার?

লী।

শুধু লী?

হ্যাঁ, শুধু লী।

লী চুলের ক্লিপ খুলে চুল আঁচড়াতে লাগল। বুড়ো ভদ্রলোক হাসতে হাসতে পা নাচাতে লাগলেন। লী বলল, এই সম্পূর্ণ কামরা আপনি রিজার্ভ করেছেন?

হ্যাঁ।

আপনি খুব বড়লোক বুঝি ?

হ্যাঁ।

সত্যি বলছি, আমারও খুব বড়লোক হতে ইচ্ছে করে।

কী কর তুমি ?

প্রাচীন বই বিভাগে কাজ করি। জানেন, আমি অনেক প্রাচীন বই পড়ে ফেলেছি।

বেশ তো।

জানেন, 'হিতার' বলে একটা বই পড়ে আমি কত যে কেঁদেছি।

তুমি দেখি ভারি ছেলেমানুষ, বই পড়ে বুঝি কেউ কাঁদে ?

আপনি বুঝি বই পড়েন না ?

পড়ি, তবে কাঁদি না। তাছাড়া বাজে বই পড়ার সময় কোথায় বলো ?

লী বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তার মনে হলো বুড়ো ভদ্রলোকটি তাকে খুব ভালো করেই চেনেন। কথা বলছেন এমনভাবে, যেন কতদিনের চেনা। অথচ কথার ভেতর কোনো মিল নেই। লী বলল, পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এতে আপনার খারাপ লাগে না ?

না।

কেন ?

ধ্বংস তো একদিন হতোই।

কিন্তু আপনি যে মরে যাবেন।

আর পৃথিবী ধ্বংস না হলেই বুঝি আমি অমর হয়ে থাকব ?

লী চুপ করে থাকল। হু হু করে ছুটে চলেছে গাড়ি। ভদ্রলোক শুয়ে শুয়ে নিবিষ্ট মনে কী যেন পড়ছেন, কোনো দিকে হুঁশ নেই। কী এমন বই এত আগ্রহ করে পড়া হচ্ছে, দেখতে গিয়ে লী হতবাক। শিশুদের একটা ছড়ার বই। আবোল-তাবোল ছড়া। লী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ছড়ার বই পড়তে আপনার ভালো লাগছে ?

খুব ভালো লাগছে। পড়লে তোমারও ভালো লাগবে, এই দেখ না কী লিখেছে—

কর ভাই হল্লা
নেই কোনো বল্লা
চারিদিকে ফল্লা

লী বিস্মিত হয়ে বলল, বল্লাই বা কী আর ফল্লাই বা কী ? আবোল-তাবোল লিখলেই হলো ?

ভদ্রলোক বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, না, কোনো অর্থ অবশ্যি নেই, তবে শুধুমাত্র ধ্বনি থেকেই তো একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে।

কী রকম ?

ছড়াটা শুনেই কি তোমার মনে হয় নি যে, কোনো অসুবিধে নেই, হল্লা করে বেড়াও। তাই না ?

লী মাথা নাড়ল। সে ভাবছিল, লোকটা কে হতে পারে, এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন ? তাকানোর ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, সমস্ত যেন কত চেনা, অথচ কিছুতেই মনে আসছে না।

নিঃশব্দে ট্রেন চলছে। সন্ধ্যা হয়ে আসায় হলুদ বিষণ্ন আলো এসে পড়েছে ভেতরে। এ সময়টাতে সবকিছুই অপরিচিত মনে হয়। জানালা দিয়ে তাকালেই দ্রুত সরে যাওয়া গাছগুলিকেও মনে হয় অচেনা। সঙ্গী ভদ্রলোক কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। লী কিছু করার না পেয়ে ধূসর রঙের টেলিভিশন সেটটি চালু করে দিল। সেই একঘেয়ে পুরনো অনুষ্ঠান। ঘনঘন জরুরি নির্দেশাবলি— 'গুজব ছড়াবেন না। বিজ্ঞানীরা আপনাদের সঙ্গেই আছেন। মহাসংকট আসন্ন, সেখানে ধৈর্য হারানো মানেই পরাজয়।'

এই জাতীয় খবর শুনলে মন খারাপ হয়ে যায় লীর। ভূতুড়ে টাইফা গ্রহ সবকিছু কেমন পাল্টে দিল। লীর কতই-বা বয়স, কিছুই দেখা হয় নি। মঙ্গল গ্রহে নয়, বুধে নয়, এমনকি চাঁদে পর্যন্ত যায় নি। এমনি করেই সব শেষ হয়ে যাবে ? লীর চোখ ছলছল করতে থাকে। একবার যদি দেখা করা যেত মাথুর কিংবা ফিহার সাথে। নিদেনপক্ষে সিরানপল্লীর যে-কোনো একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা কারো সঙ্গেই দেখা করবেন না। তাঁরা অসম্ভব ব্যস্ত। চেষ্টা তো লী কম করে নি।

কী হয়েছে লী ?

লী চমকে বলল, কই, কিছু হয় নি তো।

কাঁদছিলে কেন ?

কাঁদছি না তো।

পৃথিবীর জন্যে কষ্ট হয় ?

পৃথিবীর জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যেই কষ্ট হয়।

আচ্ছা, আমি তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি, একটা হাসির গল্প বলছি।

বলুন।

ভদ্রলোক বলে চললেন— জীববিদ্যার এক অধ্যাপক প্রতিদিন দুপুরে বড়সড় একটা মটন চপ খেয়ে ক্লাস নিতে যান। একদিন তিনি ক্লাসে এসে বললেন, আজ তোমাদের ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড পড়াব। এই দেখ একটি ব্যাঙ। ছেলেরা সমস্বরে বলল, ব্যাঙ কোথায় স্যার, এটি তো একটি চপ। অধ্যাপক বিব্রত হয়ে বললেন, সে-কী! আমি তাহলে কী দিয়ে লাঞ্চ সেরেছি ?

লী ম্লান হেসে চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বললেন, তুমি হাসলে না যে? ভালো লাগে নি?

লেগেছে। কিন্তু টেলিভিশন দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছা হয় একবার মাথুর কিংবা ফিহার সঙ্গে দেখা করি।

তাদের সঙ্গে দেখা করে তুমি কী করবে?

আমার কাছে একটি অদ্ভুত জিনিস আছে। একটি খুব প্রাচীন বই। পাঁচ হাজার বছর আগের লেখা, মাইক্রোফিল্ম[১১] করা। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ পেয়েছি।

কী আছে সেখানে?

না পড়লে বুঝতে পারবেন না। সেখানে ফিহার নাম আছে, সিরান-পল্লীর কথা আছে, এমনকি পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সে-কথাও আছে।

বুড়ো ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, আরে, থাম থাম। পাঁচ হাজার বছর আগের বই, অথচ ফিহার নাম আছে!

লী উত্তেজিত হয়ে বলল, সমস্ত না শুনলে আপনি এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না।

আমি এর গুরুত্ব বুঝতে চাই না। আমি উদ্ভট কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

লী রেগে গিয়ে বলল, আপনি উদ্ভট কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করেন না, কারণ আপনি নিজেই একটা উদ্ভট জিনিস।

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে ফেললেন। লী বলল, আমি যদি মাথুর কিংবা ফিহা কিংবা সিরান-পল্লীর কারো সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, তবে দেখতেন কেমন হৈচৈ পড়ে যেত।

ভদ্রলোক বললেন, তুমি কোথায় নামবে?

স্টেশন ৫০০৭-এ।

তৈরি হও। সামনেই ৫০০৭। বেশ আনন্দে কাটল তোমাকে পেয়ে। তবে তুমি ভীষণ কল্পনাবিলাসী, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

কল্পনাবিলাসীরা তো অল্পতেই রাগে, জানেন না?

ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ট্রেন। ব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোক একটা ওভারকোটের পকেট থেকে নীল রঙের ত্রিভুজাকৃতির একটা কার্ড বের করে লীকে বললেন, তুমি ভীষণ রেগে গেছ মেয়ে, নাও তোমাকে খুশি করে দিচ্ছি। এইটি নিয়ে সিরান-পল্লীর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে, যার সঙ্গে ইচ্ছা কথা বলতে পারবে। খুশি হলে তো? রাগ নেই তো আর?

লী দেখল নীল কার্ডে জ্বলজ্বল করছে তিনটি লাল তারা। নিচে ছোট্ট একটি নাম— ফিহা। স্বপ্ন দেখছে না তো সে? ইনিই মহামান্য ফিহা! এই জন্যেই এত পরিচিত মনে হচ্ছিল?

লীর চোখ আবেগে ঝাপসা হয়ে এল।

ফিহা বললেন, নেমে যাও মেয়ে, নেমে যাও, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।

কে ?

আমি স্ত্রুরা। ভেতরে আসতে পারি ?

এসো।

ঘরে হালকা নীল রঙের বাতি জ্বলছিল। মাথুর টেবিলে ঝুঁকে কী যেন পড়ছিলেন। স্ত্রুরার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

এত রাতে আপনার ঘরে আসার নিয়ম নেই, কিন্তু—

স্ত্রুরা চেয়ার টেনে বসলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্ধত চোখ জ্বলতে লাগল। মাথুর বললেন, এখন কোনো নিয়মটিয়ম নেই স্ত্রুরা। তুমি কি কিছু বলতে এসেছ ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি এখন কিছু শুনতে চাই না। চার রাত ধরে আমার ঘুম নেই। আমি ঘুমুতে চাই। এই দেখ আমি একটা প্রেমের গল্প পড়ছি। মন হালকা হলে সুনিদ্রা হতে পারে, এই আশায়।

স্ত্রুরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন। আমিও ঘুমাতে পারি না, তার জন্যে আমি রাত জেগে জেগে প্রেমের গল্প পড়ি না। অবসর সময়টাও আমি ভাবতে চেষ্টা করি।

সিডিসির রিপোর্ট তো দেখেছ ?

হ্যাঁ দেখেছি। ধ্বংস রোধ করার কোনো পথ নেই।

যখন নেই, তখন রাতে একটু শান্তিতে ঘুমুতে চেষ্টা করা কি উচিত নয় ? চিন্তা এবং পরিকল্পনার জন্যে তো সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে।

থাকুক পড়ে। আমি একটা সমাধান বের করেছি।

মাথুর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, তুমি বলতে চাও পৃথিবী রক্ষা পাবে ?

না।

তবে ?

স্ত্রুরা কথা না বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাথুরের দিকে। ঠান্ডা গলায় বললেন, আপনার এ সময় উত্তেজনা মানায় না। আপনি অবসর গ্রহণ করুন।

তুমি কী বলতে চাও, বলো।

আমি একটি সমাধান বের করেছি। পৃথিবী রক্ষা পাবার পথ নেই, কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকবে। লক্ষ লক্ষ বছর পর আবার সভ্যতার জন্ম হবে। ফিহার মতো, মাথুরের মতো, স্ত্রুরার মতো মহাবিজ্ঞানীরা জন্মাবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

স্ত্রুরা, তুমি নিজেও উত্তেজিত।

দুঃখিত। আপনি কি পরিকল্পনাটি শুনবেন?

এখন নয়, দিনে বলো।

আপনাকে এখনি শুনতে হবে, সময় নেই হাতে।

স্রুরা ঘরের উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দিলেন। মাথুর তাকিয়ে রইলেন স্রুরার দিকে। দুর্লভ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই যুবকটিকে হিংসা হতে লাগল তাঁর। স্রুরা খুব শান্ত গলায় বলে যেতে লাগলেন, শুনতে শুনতে মাথুর একসময় নিজের রক্তে উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলেন।

বছর ত্রিশেক আগে 'মীটস' নামে একটা মহাশূন্যযান তৈরি করা হয়েছিল। আদর করে তাকে ডাকা হতো 'দ্বিতীয় চন্দ্র' বলে। আকারে চন্দ্রের মতো এত বিরাট না হলেও সেটিকে ছোটখাটো চন্দ্র অনায়াসে বলা যেত। মহাজাগতিক রশ্মি থেকে সংগৃহীত শক্তিতে একটি কল্পনাতীত বেগে চলবার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি ছিল এরই মধ্যে। একটি ছিল মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জে প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে। বিজ্ঞানী মীটসের তত্ত্বাবধানে এই অসাধারণ যন্ত্রযান তৈরি হয়েছিল; নামকরণও হয়েছিল তাঁর নাম অনুযায়ী। এটি তৈরি হয়েছিল তাঁরই একটি তত্ত্বের পরীক্ষার জন্যে।

মীটস দেখলেন নক্ষত্রপুঞ্জ NGC1303[১২] আলোকের চেয়ে দ্রুতগতিতে সরে যাচ্ছে। আলোর কাছাকাছি গতিসম্পন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে অনেক আগে, এই প্রথম তিনি বিজ্ঞানের সূত্রে সম্ভব নয় এমন একটি ব্যাপার পরখ করলেন। তিনি অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন এবং খুব অল্প সময়ে এর ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, আলোর গতি ধ্রুব নয়। এটি ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডলে ভিন্ন। স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির নিয়মাবলিও ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডলে ভিন্ন। মীটস এটা ব্যাখ্যা করেই চুপ করে গেলেন। তৈরি করলেন মহাশূন্যযান— মীটস, যা পাড়ি দেবে এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ ছাড়িয়েও বহুদূরে NBP203 নক্ষত্রপুঞ্জে[১৩]। সেখানে পৌঁছুতে তার যুগের পর যুগ লেগে যাবে, কিন্তু পৌঁছুবে ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে মীটসের ধারণা সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য মহাশূন্যযানটি প্রস্তুত হবার পরপর তিনি মারা যান। তাঁর পরিকল্পনাও স্থগিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা তখন প্রতি-বস্তুর ধর্মকে বিশেষ সূত্রে ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

স্রুরার পরিকল্পনা আর কিছুই নয়, পৃথিবীর একদল শিশু মীটসে করে সরিয়ে দেয়া। শিশুরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে মহাশূন্যযানের ভেতর শিক্ষা লাভ করবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হবে মহাশূন্যযানের এক লাইব্রেরি কক্ষে। এইসব শিশু বড় হবে। তাদের ছেলেমেয়ে হবে, তারাও শিখতে থাকবে, তারাও বড় হবে—

থাম থাম, বুঝতে পারছি। মাথুর হাত উঁচিয়ে স্রুরাকে থামালেন। বললেন, কতদিন তারা এরকম ঘুরে বেড়াবে?

যতদিন বসবাসযোগ্য কোনো গ্রহ না পায়। যতদিন মহাশূন্য থাকবে, ততদিন

তো খাদ্যের কোনো অসুবিধা নেই।

তা নেই। কিন্তু—

আবার কিন্তু কিসের ? মহাশূন্যযান তৈরি আছে, কাজ যা করতে হবে তা হলো ল্যাবরেটরি দুটি সরিয়ে মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসানো, তার জন্যে তিনমাস সময় যথেষ্ট। এ দায়িত্ব আমার।

মাথুর চুপ করে রইলেন। স্রুরা অসহিষ্ণু হয়ে মাথা ঝাঁকালেন, আপনার চুপ করে থাকা অর্থহীন। মানুষের জ্ঞান এভাবে নষ্ট হতে দেয়া যায় না।

তা ঠিক। কিন্তু সিরানদের মতামত...।

কোনো মতামতের প্রয়োজন নেই। এ আমাকে করতেই হবে, আমি কম্পিউটার সিডিসিকে নির্দেশ দিয়ে এসেছি মহাশূন্যযানটির যাত্রাপথ বের করতে। সিডিসিকে মহাশূন্যযানে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। মহাশূন্যযান নিয়ন্ত্রণ করবে সে।

তুমি নির্দেশ দিয়ে এসেছ ?

হ্যাঁ, আমি সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙে এ করেছি। আমি আপনাকেও মানি না—আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। গত একমাস আপনি প্রত্যেক মিটিং-এ আবোল-তাবোল বকেছেন। আপনি বিশ্রাম নিন।

স্রুরা উজ্জ্বল বাতি নিভিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মাথুর হতভম্ব হয়ে বের হয়ে এলেন ঘরের বাইরে। অন্ধকারে কে যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ দেখলে পাথরের মূর্তি মনে হয়। মাথুর ডাকলেন, কে ওখানে ?

আমি ওলেয়া।

ওখানে কী করছেন ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখছি। আমার একটি ছেলে চাঁদে অ্যাকসিডেন্ট করে মারা গিয়েছিল। আপনার হয়তো মনে আছে।

আছে। কিন্তু এত দূরে এসে চাঁদ দেখছেন ? আপনার ঘর থেকেই তো দেখা যায়।

তা যায়। আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। এসে দেখি স্রুরা গল্প করছেন আপনার সঙ্গে, তাই বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম।

বলুন কী বলবেন।

আমাকে ছুটি দিন আপনি। বিজ্ঞানীরা তো কিছুই করতে পারছেন না। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে কী হবে ? মরবার আগে আমার ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে থাকতে চাই।

তা হয় না ওলেয়া।

কেন হয় না ?

আপনি চলে গেলে অন্য সবাই চলে যেতে চাইবে। সিরান-পল্লীতে কেউ থাকবে না।

নাই-বা থাকল, থেকে কী লাভ ?

শেষ মুহূর্তে আমরা একটা বুদ্ধি তো পেয়েও যেতে পারি।

আপনি বড় আশাবাদী মাথুর।

হয়তো আমি আশাবাদী। কিন্তু আপনি নিজেও তো জানেন, পৃথিবী আরো একবার মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। সৌর বিস্ফোরণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ দু'শ' বছর আগের বিজ্ঞানীরাই সে সমস্যার সমাধান করেছেন। আমরা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি জানি, আমাদের ক্ষমতা অনেক বেশি।

ওলেয়া অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়লেন। শুকনো গলায় বললেন, আমি কোনো ভরসা পাচ্ছি না। এই মহাসংকট তুচ্ছ করে ফিহা বেড়াতে চলে গেলেন। আপনি নিজে এখন পর্যন্ত কিছু করতে পারেন নি। স্রূরার যত প্রতিভা-ই থাকুক, সে তো শিশুমাত্র, এ অবস্থায়—।

কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। স্রূরা উত্তেজিতভাবে হেঁটে আসছেন। হাত দুলিয়ে হাঁটার ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছে একটা কিছু হয়েছে।

মহামান্য মাথুর।

বলো।

এইমাত্র একটি মেয়ে এসে পৌঁছেছে। তার হাতে মহামান্য ফিহার নিজস্ব পরিচয়পত্র রয়েছে।

সে-কী!

মেয়েটি বলল, সে একটি বিশেষ কাজে এসেছে, কী কাজ তা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলবে না।

কিন্তু ফিহার পরিচয়পত্র সে পেল কোথায় ?

ফিহা নিজেই নাকি তাকে দিয়েছেন।

আশ্চর্য!

লী নিজেও বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। সিরান এলাকায় এমন অবাধে ঘুরে বেড়াবে তা কখনো কল্পনা করে নি। ফিহার ত্রিভুজাকৃতি কার্ডটি মন্ত্রের মতো কাজ করছে। অনেকেই যে বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে আছে, তাও সে লক্ষ করল। বুড়োমতো এক ভদ্রলোক বিনীতভাবে লীর নামও জানতে চাইলেন।

মাথুর বললেন, শুনেছি আপনি ফিহার কাছ থেকে আসছেন ?

জি।

আপনি কি তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর এনেছেন ?

জি-না।

তবে ?

আমি একটা বই নিয়ে এসেছি, আপনি সে বইটি আশা করি পড়বেন।

কী নিয়ে এসেছেন ?

একটি বই।

লী তার ব্যাগ থেকে বইটি বের করল।

কী বই এটি ?

পড়লেই বুঝতে পারবেন। আশা করি আজ রাতেই পড়তে শুরু করবেন।

মাথুর হাত বাড়িয়ে বইটি নিলেন। বিস্ময়ে তাঁর ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। লী বলল, আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি কি একগ্লাস পানি খেতে পারি ?

ফিহা গাড়ি থেকে নামলেন সন্ধ্যাবেলা। স্টেশনে আলো জ্বলছিল না। চারদিক কেমন চুপচাপ থমথম করছে। যাত্রী বেশি নেই, যে কয়জন আছে তারা নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। বছর পাঁচেক আগেও একবার এসেছিলেন ফিহা। তখন কেমন গমগম করত চারদিক। ট্যুরিস্টের দল হৈহৈ করে নামত। অকারণ ছোটাছুটি, ব্যস্ততা, চেঁচামেচি— চমৎকার লাগত। এখন সব বদলে গেছে। ফিহার কিছুটা নিঃসঙ্গ মনে হলো।

আমার আসতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল।

ফিহা তাকিয়ে দেখলেন নিকি পৌঁছেছে। নিকিকে তার করা হয়েছিল স্টেশনে থাকার জন্যে। ফিহা বললেন, এমন অন্ধকার যে ?

কদিন ধরেই তো অন্ধকার।

কেন ?

পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ। সমস্তই বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছেন। জানেন না ?

না।

একটা উপগ্রহ ছাড়া হচ্ছে। এখানকার পৃথিবীর কিছু শিশুকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যাতে করে শেষপর্যন্ত মানুষের অস্তিত্ব বেঁচে থাকে। স্রুরার পরিকল্পনা।

অ।

দু'জনে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। ফিহা বললেন, সমস্ত বদলে গেছে।

হ্যাঁ। সবাই হতাশ হয়ে গেছে। উৎপাদন বন্ধ, স্কুল-কলেজ বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ। খুব বাজে ব্যাপার।

হুঁ।

আপনি হঠাৎ করে এ সময়ে ?

আমি কিছু ভাবতে এসেছি। নিরিবিলি জায়গা দরকার।

টাইফা গ্রহ নিয়ে ?

হুঁ।

আপনার কী মনে হয় ? কিছু করা যাবে ?

জানি না, হয়তো যাবে না, হয়তো যাবে। ঘর ঠিক করেছ আমার জন্যে ?

জি।

আমার একটা কম্পিউটার প্রয়োজন।

কম্পিউটার চালাবার মতো ইলেকট্রিসিটি কোথায় পাবেন ?

ছোটখাটো হলেও চলবে। কিছু হিসাব-টিসাব করব। আছে সেরকম ?

তা আছে।

বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দু'কামরার ঘর একটা। ফিহার পছন্দ হলো খুব। নিকি বড় দেখে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ফিহা বসে বসে খবরের কাগজ দেখতে লাগলেন। এ কয়দিন তাঁর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। অথচ ইতিমধ্যে বেশ পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীতে। সবচে আগে তাঁর চোখে পড়ল শীতলকক্ষের খবরটি। শীতলকক্ষ উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। শীতলকক্ষের সমস্ত ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো হয়েছে, তারা ফিরে গেছে আত্মীয়স্বজনদের কাছে। কী আশ্চর্য!

পৃথিবীতে শীতলকক্ষ স্থাপনের যুগান্তকারী পরিকল্পনা নিয়েছিলেন নেতেনটি। ভারি চমৎকার একটি ব্যবস্থা। নব্বুই বছর বয়স হওয়ামাত্র যেতে হবে শীতলকক্ষে। সেখানে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে আরো একশ' বছর। এর ভেতর তারা মাত্র পাঁচবার কিছুদিনের জন্যে তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে যেতে পারবেন। তারপর আবার ঘুম। ঘুমোতে ঘুমোতেই নিঃশব্দ মৃত্যু। নেতেনটির এই সিদ্ধান্তের খুব বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রথম দিকে, পরে অবশ্য সবাই মেনে নিয়েছিলেন। তার কারণও ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞান তখন এত উন্নত যে একটি মানুষ অনায়াসে দেড়শ' বছর বাঁচতে পারে। অথচ নব্বুই বছরের পর তার পৃথিবীকে দেবার মতো কিছুই থাকে না। বেঁচে থাকা সেই কারণেই অর্থহীন। কাজেই শীতলকক্ষের শীতলতায় নিশ্চিন্ত ঘুম। মানুষটি বেঁচে থাকলে তার পেছনে যে খরচটি হতো তার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র খরচ এখানে। হার্টের বিট সেখানে ঘণ্টায় দু'টিতে নেমে আসে, দেহের তাপ নামে শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি। সেখানে শরীরের প্রোটোপ্লাজমকে[১৪] বাঁচিয়ে রাখতে খুব কম শক্তির প্রয়োজন।

শীতলকক্ষের সব মানুষ জেগে উঠে তাদের প্রিয়জনদের কাছে ফিরে গেছে— এ খবর ফিহাকে খুব আলোড়িত করল। দু'-তিনবার পড়লেন খবরটি। নিজের মনেই

বললেন, সত্যিই কি মহাবিপদ ? সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙে পড়ছে এভাবে। না, তা কেন হবে—

যারা কোনোদিন পৃথিবীকে চোখেও দেখল না, তাদের কথা কি কখনো ভেবেছেন ফিহা ?

নিকি চা নিয়ে কখন যে ফিহার সামনে এসে বসেছে এবং চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে, ফিহা তা লক্ষই করেন নি।

কাদের কথা বলছ নিকি ?

মানুষদের কথা, যাদের জন্ম হয়েছে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে মহাকাশযানে কিংবা অন্য উপগ্রহে। জানেন ফিহা, পৃথিবীতে ফিরে এসে একবার শুধু পৃথিবীকে দেখবে, এই আশায় তার পাগলের মতো—

নিকি, তুমি জানো আমি কবি নই। এসব বাজে সেন্টিমেন্ট আমার ভালো লাগে না।

আমি দুঃখিত। চায়ে চিনি হয়েছে ?

হয়েছে।

আপনার আর কিছু লাগবে, কোনো সহকারী ?

না, তার প্রয়োজন নেই। তুমি একটা কাজ করবে নিকি ?

বলুন কী কাজ।

আমার বাবা-মা শীতলকক্ষ থেকে বেরিয়ে হয়তো আমাকে খুঁজছেন।

তাঁদের এখানে নিয়ে আসব ?

না না। তাঁরা যেন আমার খোঁজ না পান। আমি একটা জটিল হিসাব করব। খুব জটিল।

ঠিক আছে।

রাতে বাতি নিভিয়ে ফিহা সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। মাথার কাছে মোমবাতি রেখে দিলেন। রাত-বিরেতে ঘুম ভেঙে গেলে আলো জ্বালিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, এই জন্যে। চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে, এমন সময় একটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো। ফিহার মনে হলো ঘরের ভেতর কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে আবছামতো একটি মূর্তি দেখতে পেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, কে ?

আমি।

আমিটি কে ?

বলছি। দয়া করে বাতি জ্বালাবেন না।

ফিহা নিঃশব্দে বাতি জ্বালালেন। আশ্চর্য! ঘরে কেউ নেই। তিনি বাতি হাতে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালেন। চাঁদ উঠেছে আকাশে। চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

কাল সকালে ডাক্তারের কাছে যাব। আমি অসুস্থ, আবোলতাবোল দেখছি। জটিল একটা অঙ্ক করতে হবে আমাকে। এ সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন। ফিহা মনে মনে বললেন।

বাকি রাতটা তাঁর বারান্দায় পায়চারি করে কাটল।

মাথুর ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। সমস্ত বইটা পড়তে আমার একঘণ্টার বেশি লাগবে না— মনে মনে এই ভাবলেন। আসন্ন বিপদের হয়তো তাতে কোনো সুরাহা হবে না, তবু তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। সে তুলনায় এ তো অনেক বড় অবলম্বন। স্বয়ং ফিহা বলে পাঠিয়েছেন যেখানে।

রাত জেগে জেগে মাথুরের মাথা ধরেছিল। চোখ করকর করছিল। তবু তিনি পড়তে শুরু করলেন। বাইরে অনেক রাত। বারান্দায় খ্যাপার মতো হাঁটছেন স্রুরা। খটখট শব্দ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকক্ষে। সমস্ত অগ্রাহ্য করে মাথুর পড়ে চললেন। মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে বলতে লাগলেন, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! তা কী করে হয় ? না না, অসম্ভব!

—আমি নিশ্চিত বলতে পারি যিনি এই বই পড়ছেন, রূপকথার গল্প ভেবেই পড়ছেন। অথচ এখানে যা যা লিখেছি একদিন আমি নিজেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। মাঝে মাঝে আমারও সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। মনে হয়, হয়তো আমার মাথায় দোষ হয়েছিল, বিকারের ঘোরে কত কী দেখেছি। কিন্তু আমি জানি, মস্তিষ্ক বিকৃতিকালীন স্মৃতি পরবর্তী সময়ে এত স্পষ্ট মনে পড়ে না। তখনি সমস্ত ব্যাপারটাকে সত্য বলে মনে হয়। বড়রকমের হতাশা জাগে। ইচ্ছে করে মরে যাই। ঘুমুতে পারি না, খেতে পারি না, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। এই জাতীয় অস্থিরতা ও হতাশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি লিখতে শুরু করলাম। এই আশায়, যে, কেউ একদিন আমার লেখা পড়ে সমস্তই ব্যাখ্যা করতে পারবে। অনেক সময়ই তো দেখা গেছে, আজ যা রহস্য, কাল তা সহজ স্বাভাবিক সত্য। আজ যা বুদ্ধির অগম্য, কাল তা-ই সহজ সামান্য ঘটনা।

আমার সে-রাতে ঘুম আসছিল না। বাগানে চেয়ার পেতে বসে আছি। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আনা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে তার মার কাছে বেড়াতে গেছে। বিশেষ কাজ ছিল বলে আমি যেতে পারি নি। ফাঁকা বাড়ি বলেই হয়তো আমার বিষণ্ন লাগছিল। সকাল সকাল শুয়েও পড়েছিলাম। ঘুম এল না— মাথা দপদপ করতে লাগল। একসময় 'দূর ছাই' বলে বাগানে চেয়ার টেনে বসলাম। এপ্রিল মাসের রাত। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে, খুব সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে। এত পরিষ্কার আলো যে মনে হতে লাগল, অনায়াসে এই আলোতে বই পড়া যাবে। মাঝে মাঝে মানুষের ভেতরে যেরকম ছেলেমানুষি জেগে ওঠে, আমারও তেমনি জেগে উঠল। খুব ইচ্ছে হতে লাগল একটা বই এনে দেখেই ফেলি না পড়া যায় কিনা। চারদিকে কোনো

সাড়াশব্দ নেই। নির্জনতায় কেমন ভয়ভয় লাগে, আবার ভালোও লাগে। চুপচাপ বসে আবোলতাবোল কত কী ভাবছি, এমন সময় একটা হালকা গন্ধ নাকে এল। মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু ভালো লাগে না, অস্বস্তি বোধ হয়। কিসের গন্ধ এটি ? বের করতে চেষ্টা করতে লাগলাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, গন্ধের তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। হাত-পা অসাড় হয়ে উঠতে লাগল। যতই ভাবছি এইবার উঠে দৌড়ে পালাব, ততই সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় হলো আমার। সেসময় ঘুম পেতে লাগল। কিছুতেই ঘুমাব না, নিশ্চয়ই কোনো বিষাক্ত গ্যাসের খপ্পরে পড়েছি, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা ঘুম। চোখ মেলতে পারছিলাম না, তবে মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসছিল তখনো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই। ঘুম ভাঙল মাথায় তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে, তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ। চোখ মেলে আমি দিন কি রাত বুঝতে পারলাম না। কোথায় আছি, আশেপাশে কাদের ফিসফিস শব্দ শুনছি কে জানে! চোখের সামনে চোখ-ধাঁধানো হলুদ আলো। বমি করার আগের মুহূর্তে যে ধরনের অস্বস্তি বোধ হয়, সে ধরনের অস্বস্তিবোধ নিয়ে আমি জেগে রইলাম।

বুঝতে পারছি সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি একটি অদ্ভুত অবস্থায় আছি। অচেতন নই, আবার ঠিক যে চেতনা আছে তাও নয়। কিন্তু ভাবতে পারছি না। আবার শারীরিক যাতনাগুলিও সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। আমার মনে হলো, দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। চোখের সামনে তীব্র হলুদ আলো নিয়ে আমি যেন অনন্তকাল ধরে জেগে আছি। মাঝে মাঝে একটা বিজবিজ শব্দ কানে আসে— লক্ষ লক্ষ মৌমাছি একসঙ্গে উড়ে গেলে যেরকম শব্দ হতো, অনেকটা সেরকম।

আমি কি মারা গেছি ? আমি কি পাগল হয়ে গেছি ? এজাতীয় চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হয়তো আরো কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে সত্যি পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু তার আগেই কে যেন মিষ্টি করে বলল, একটু ধৈর্য ধরুন, খুব অল্পসময়।

স্পষ্ট গলার স্বর, নিখুঁত উচ্চারণ। আমার শুনতে একটুও অসুবিধে হলো না। সমস্ত মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করে চেঁচিয়ে উঠলাম, আপনি কে ? আমার কী হয়েছে ?

গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না। কিন্তু তবুও শুনলাম কেউ যেন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সেই আগের মিষ্টি নরম গলা।

একটু কষ্ট করুন। অল্পসময়। খুব অল্পসময়। বলুন আমার সঙ্গে, এক—

এক।

বলুন, দুই।

আমি বললাম। সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকল। হাজার ছাড়িয়ে লক্ষ ছাড়িয়ে বাড়তেই থাকল, বাড়তেই থাকল। আমি নেশাগ্রস্তের মতো আওড়াতে থাকলাম।

আমার চোখের উপর উজ্জ্বল হলুদ আলো, বুকের ভেতর হা হা করা তৃষ্ণা। অর্ধচেতন অবস্থায় একটি অচেনা অদেখা ভৌতিক কণ্ঠের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটির পর একটি সংখ্যা বলে চলছি। যেন কত যুগ কত কাল কেটে গেল। আমি বলেই চলেছি, বলেই চলেছি।

একসময় মাথার ভেতর সব জট পাকিয়ে গেল। নিঃশ্বাস ফেলার মতো অতি সামান্যতম বাতাসও যেন আর নেই। বুক ফেটে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমি প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করলাম, আর নয়, আমাকে মুক্তি দিন। আমি মরে যেতে চাই, আমি মরে যেতে চাই।

আবার সেই গলা, এইবার ঘুমিয়ে পড়ুন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল। আহা, কী শান্তি! কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি দ্রুত। হলুদ আলো ফিকে হয়ে আসছে। শারীরিক যন্ত্রণাগুলো ভোঁতা হয়ে আসছে, শরীরের প্রতিটি কোষ যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, কী শান্তি!

জানি না কখন ঘুম ভাঙল। খুব স্বাভাবিকভাবে চোখ মেললাম।

একটা ধাতব চেয়ারে বসে আছি। চেয়ারটি গোলাকার একটি ঘরের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। ঠিক আমার মাথার কাছে ছোট্ট একটি নল দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। ঘরের বাতাস যেন একটু ভারি। বাতাসের সঙ্গে লেবু ফুলের গন্ধ মিশে আছে। আমি ভালো করে চারদিক দেখতে চেষ্টা করতে লাগলাম। গোল ঘরটিতে কোনো দরজা-জানালা নেই। চারদিক নিশ্ছিদ্র। ঘরে কোনো বাতি নেই। তবু সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে নীলাভ আলো আসছে হয়তো।

আমার তখন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কোথায় আছি, আমার কী হয়েছে— এ সমস্ত ছাড়িয়ে শুধু একটি চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেটি হলো ক্ষুধা। আমার ধারণা ছিল, হয়তো আগের মতো কথা বলতে পারব না, তবু বললাম, আমি কোথায় আছি ?

সে শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল। গোলাকার ঘরের জন্যই হয়তো সে শব্দ চমৎকার প্রতিধ্বনিত হলো। এবং আশ্চর্য, সে শব্দ বাড়তেই থাকল— আমি কোথায় আছি ? আমি কোথায় আছি ? আমি কোথায় আছি ?

একসময় যেন মনে হলো লক্ষ লক্ষ মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করছে। আমি নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। দশ থেকে এক পর্যন্ত উল্টোদিকে গুনলাম, আমি কি অচেতন অবস্থায় এসব শুনছি, না সত্যি কিছু জ্ঞান এখনো অবশিষ্ট আছে, তা জানার জন্যে।

এখন লিখতে খুব অবাক লাগছে, সেই অবস্থাতেও কী করে আমি এতটা স্বাভাবিক ছিলাম! অবশ্যি সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল সম্ভবত আমার মাথায় চোট লেগে মস্তিষ্কের কোনো এক অংশ অকেজো হয়ে পড়েছে। অবাস্তব দৃশ্যাবলি দেখছি। একসময় প্রচণ্ড খিদে সত্ত্বেও আমার ঘুম পেল। ঘুমিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তেও

শুনতে পেলাম সমুদ্রগর্জনের মতো কোলাহল— আমি কোথায় আছি ? আমি কোথায় আছি ?

কতক্ষণ এভাবে কাটিয়েছিলাম মনে নেই। একসময় সমস্ত জড়তা কেটে গিয়ে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল। খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, আলস্য নেই। যেন ছুটির দুপুরবেলাটা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছি। চোখ মেলতে ভয় লাগছিল, কে জানে আবার হয়তো সেইসব আজগুবি ব্যাপার দেখতে থাকব। কান পেতে আছি যদি কিছু শোনা যায়। না, কোনো সাড়াশব্দ নেই। চারদিক সুনসান।

তোমার চা।

চমকে তাকিয়ে দেখি আনা, আমার স্ত্রী, দশ বছরের বিবাহিত জীবনের সঙ্গী হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে বাইরে। আমি শুয়ে আছি আমার অতি পরিচিত বিছানায়। টেবিলের উপর আগের মতো আগোছাল বইপত্র পড়ে আছে। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! আমি প্রায় লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম, আনা, আমার কী হয়েছে ?

আনা চায়ের পেয়ালা হাতে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই মনে হলো, এই মেয়েটি অন্য কেউ, এ আনা নয়। যদিও সেই চোখ, সেই ঢেউ খেলানো বাদামি চুল, গালের মাঝামাঝি লাল রঙের কাটা দাগ। আমি ভয়ে কাতর গলায় বললাম, তুমি কে ? তুমি কে ?

আমি আনা।

না, তুমি আনা নও।

আমি কি দেখতে আনার মতো নই ?

দেখতে আনার মতো হলেও তুমি আনা নও।

বেশ নাই-বা হলাম, চা নাও।

আমি আবার বললাম, দয়া করে বলো তুমি কে ?

বলছি। সমস্তই ধীরে ধীরে জানবে।

আমি কোথায় আছি ?

তুমি তোমার পৃথিবী থেকে বহু দূরে। ভয় পেয়ো না, আবার ফিরে যাবে। তোমাকে আনা হয়েছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে।

কারা আমাকে এখানে এনেছে ?

এখানে যাদের বাস, তারা এনেছে। যারা আমাকে তৈরি করেছে তারা। চতুর্মাত্রিক জীবেরা[১৫]।

তোমাকে তৈরি করা হয়েছে ?

হ্যাঁ, আমাকে তৈরি করা হয়েছে তোমার সুখ ও সুবিধার জন্যে। তাছাড়া আমি তোমাকে অনেক কিছু শেখাব। আমার মাধ্যমেই তুমি এদের সঙ্গে কথা বলবে।

কাদের সঙ্গে কথা বলব ?

যারা তোমাকে নিয়ে এসেছে।

যারা আমাকে নিয়ে এসেছে তারা কেমন ? তারা কি মানুষের মতো ?

তাদের তুমি দেখতে পাবে না। এরা চতুর্মাত্রিক জীব। পৃথিবীর মানুষ ত্রিমাত্রিক[১৬] জিনিসই শুধু দেখতে পায় ও অনুভব করতে পারে। সেগুলি তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চতুর্মাত্রিক জগৎ তোমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না।

শুনতে শুনতে আমার গা ছমছম করতে লাগল। এসব কী বলছে সে! ভয় পেয়ে আমি মেয়েটির হাত ধরলাম। এই অদ্ভুত তৈরি পরিবেশে তাকেই আমার একান্ত আপনজন মনে হলো। মেয়েটি বলল, আমাকে তুমি আনা বলেই ভাববে। আনার সঙ্গে যেভাবে আলাপ করতে, সেভাবেই আলাপ করবে। আমাকে ভয় পেয়ো না। তোমার যা জানতে ইচ্ছে হবে আমার কাছ থেকে জেনে নেবে। আমি তো তোমাকে বলেছি, আবার তুমি ফিরে যাবে তোমার সত্যিকার আনার কাছে।

আমি বললাম, এই যে আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি, নিজের বইপত্র টেবিলে পড়ে আছে, এসবও কি আমার মতো পৃথিবী থেকে আনা হয়েছে ?

এগুলি আনতে হয় নি। তৈরি করা হয়েছে। ইলেকট্রন, প্রোটন এসব জিনিস দিয়ে তৈরি হয় এটম। বিভিন্ন এটমের বিভিন্ন অনুপাতে তৈরি হয় এক একটি বস্তু। ঠিক তো ?

হ্যাঁ, ঠিক।

কোনো বস্তুর প্রতিটি ইলেকট্রন, প্রোটন কী অবস্থায় আছে এবং এটমগুলি কীভাবে আছে, সেগুলি যদি জানা থাকে এবং ঠিক সেই অনুপাতে যদি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং এটম রাখা যায় তবেই সেই বস্তুটি তৈরি হবে। ঠিক তো ?

হয়তো ঠিক।

কিছু শক্তি খরচ করলেই হলো। এভাবেই তোমার ঘর তৈরি হয়েছে। আমিও তৈরি হয়েছি। এখানকার জীবরা মহাশক্তিধর। এই হচ্ছে তোমার প্রথম পাঠ। হ্যাঁ, এবার চা খাও। দাও, চায়ে চুমুক দাও।

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি আনা অল্প অল্প হাসছে। আমার সে মুহূর্তে এই মেয়েটিকে সত্যি সত্যি আনা বলেই ভাবতে ইচ্ছে হলো।

আমার নিজের অনুভূতি কখনো খুব একটা চড়া সুরে বাঁধা ছিল না। সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করে এসেছি। হঠাৎ করেই যেন সব বদলে গেল। নিজেকে যদিও ঘটনাপ্রবাহের উপর সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলাম, তবু একটা ক্ষীণ আশা সবসময় লালন করেছি— হয়তো একসময় দেখব আশেপাশে যা ঘটছে সমস্তই মায়া, হয়তো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। এক্ষুনি স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠব। মেয়েটি বলল, কী ভাবছ ?

কিছু ভাবছি না। আচ্ছা একটা কথা—

বলো।

কী করে এসেছি আমি এখানে ?

সেই জটিল প্রক্রিয়া বুঝবার উপায় নেই।

এটা কেমন জায়গা ?

কেমন জায়গা তা তোমাকে কী করে বোঝাব ? তুমি ত্রিমাত্রিক জগতের লোক, আর এটি হচ্ছে চতুর্মাত্রিক জগৎ।

কিছুই দেখা যাবে না ?

চেষ্টা করে দেখ। যাও, বাইরে পা দাও। দরজাটা আগে খোল। কী দেখছ ?

আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। চারদিকে ঘন ঘোলাটে হলুদ আলো। পেটের ভেতরে চিনচিনে ব্যাথা। মাথা ঘুরতে লাগল আমার।

থাক আর দেখবার কাজ নেই, এসে পড়।

আমার মনে হলো মেয়েটি যেন হাসছে আপন মনে। আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েটি বলল, তুমি অল্প কিছুদিন থাকবে এখানে। তারপর তোমাকে পাঠানো হবে একটা ত্রিমাত্রিক জগতে, সেখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি বললাম, তুমি থাকবে তো সঙ্গে ?

নিশ্চয়ই। আমি তোমার একজন শিক্ষক।

আচ্ছা একটা কথা—।

বলো।

এখানকার জীবদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ কী করে হয় ?

আমি জানি না।

তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানো না ?

না।

তাদের সঙ্গে তোমার কথা হয় না ?

না।

আমার সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হবে তা তাদের কী করে জানাবে ?

তাদের জানাতে হবে না। আমি কি নিজের থেকে কিছু বলি তোমাকে ? যা বলি সমস্তই ওদের কথা। চুপ করে আছ কেন ? তোমাকে তো আগেই বলেছি, তুমি তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।

তোমাকে ধন্যবাদ।

দিন-রাত্রির কোনো তফাৎ ছিল না বলেই আমি ঠিক বলতে পারব না— ক'দিন সেই ছোট্ট ঘরটিতে ছিলাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আগের মতোই হয়। নিজের বাসায় যে ধরনের খাবার খাওয়া হতো, সে ধরনের খাবারই দেয়া হয় এখানে। আমার

সর্বক্ষণের সঙ্গী হলো সেই মেয়েটি, যে দেখতে অবিকল আনার মতো, অথচ আনা নয়। খুবই আশ্চর্যের কথা, মেয়েটির সঙ্গে আমার ভারি ঘনিষ্ঠতা হলো। মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড ভ্রম হতো এ হয়তো সত্যি আনা। সে এমন অনেক কিছুই বলতে পারত, যা আনা ছাড়া অন্য কারো বলা সম্ভব নয়। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এসব কী করে জানলে ?

মেয়েটি হেসে বলেছে, যে সমস্ত স্মৃতি আনার মেমরি সেলে আছে, সে সমস্ত স্মৃতি আমার ভেতরেও তৈরি করা হয়েছে। আনার অনেক কিছুই মনে নেই, কিন্তু আমার আছে।

আমি এসব কিছুই মেলাতে পারছিলাম না। এ কেমন করে হয়! একদিন নখ দিয়ে আঁচড়ে দিলাম মেয়েটির গালে, সত্যি সত্যি রক্ত বেরোয় কিনা দেখতে। সত্যিই রক্ত বেরিয়ে এল। সে অবাক হয়ে বলল, এসব কী ছেলেমানুষি কর ?

দেখি, তুমি সত্যি মানুষ না অন্যকিছু।

এর ভেতর আমি অনেক কিছু শিখলাম। অনেক কিছুই বুঝতে পারি নি। আনার আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান এমনিতেই আমি কম বুঝি। চতুর্মাত্রিক জগৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

চতুর্মাত্রিক জীবরা কি কোনো খাদ্য গ্রহণ করে ?

না, করে না।

এরা কেমন ? অর্থাৎ ব্যাপারটি কী ?

এরা হচ্ছে ছড়িয়ে থাকা শক্তির মতো। যেমন মনে কর, একগ্লাস পানি। পানির প্রতিটি অণু একই রকম। কোনো হেরফের নেই। সমস্ত অণু মিলিতভাবে তৈরি করেছে পানি। এরাও সেরকম। কারোর কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। সম্মিলিতভাবেই তাদের পরিচয়। তাদের জ্ঞান সম্মিলিত জ্ঞান।

এদের জন্ম-মৃত্যু আছে ?

শক্তি তো সবসময় অবিনশ্বর নয়। এরও বিনাশ আছে। তবে আমি ঠিক জানি না কী হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কী রকম হয় ?

কী রকম হয় বলতে পারব না, তবে তারা দ্রুত সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

একদিন আনা বলল, আজ তোমাকে ত্রিমাত্রিক গ্রহে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমি বললাম, সেখানে আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারব তো ?

আনা হো হো করে হেসে বলল, নিশ্চয়ই। সেটি তোমার নিজের গ্রহ বলতে পার। তোমার জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর পর পৃথিবীর মানুষের একটা ছোট্ট দল

এখানে এসেছিল। তারপর আরো তিন হাজার বছর পার হয়েছে। মানুষেরা চমৎকার বসতি স্থাপন করেছে সেখানে। ভারি সুন্দর জায়গা।

আমার জন্মের পাঁচ হাজার বছর পরের মানুষদের কাছে আমি কী করে যাব ?

তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, তুমি চতুর্মাত্রিক জগতে আছ। এখানে ত্রিশ হাজার বছর আগেও যা, ত্রিশ হাজার বছর পরেও তা।

তার মানে আমার বয়স কখনো বাড়বে না ?

নিশ্চয়ই বাড়বে। শারীরবৃত্তির নিয়মে তুমি বুড়ো হবে।

কিন্তু ভবিষ্যতে যাওয়ার ব্যাপারটা কেমন ?

তুমি কি একটি সহজ সত্য জানো ?

কী সত্য ?

তুমি কি জানো যে, কোনো যন্ত্রযানের গতি যদি আলোর গতির চেয়ে বেশি হয়, তবে সেই যন্ত্রযানে করে ভবিষ্যতে পাড়ি দেয়া যায় ?

শুনেছি কিছুটা।

চতুর্মাত্রিক জগৎ একটা প্রচণ্ড গতির জগৎ। সে গতি আলোর গতির চারগুণ বেশি। সে গতি হচ্ছে ঘূর্ণায়মান গতি। তুমি নিজে চতুর্মাত্রিক জগতে আছ। কাজেই অবিশ্বাস্য গতিতে ঘুরছ। যে গতি অনায়াসে সময়কে অতিক্রম করে।

কিন্তু আমি যতদূর জানি, কোনো বস্তুর গতি যখন আলোর গতির কাছাকাছি আসে, তখন তার ভর অসীম হয়ে যায়।

তা হয়।

তাহলে তুমি বলতে চাও আমার ভর এখন অসীম ?

না। কারণ তুমি বস্তু নও, তুমি এখন শক্তি।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তুমি তৈরি হয়ে থাক। তোমাকে নিয়ে ত্রিমাত্রিক জগতে যাব এবং তারপরই তোমার কাজ শেষ।

ভেতরে ভেতরে আমি তীব্র কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। কী করে কী হচ্ছে ? আমাকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করা হবে, তা জানার জন্যে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এত উদ্যোগ আয়োজন নিশ্চয়ই কোনো একটি অশুভ শক্তির জন্যে।

দাঁতের ডাক্তারের কাছে দাঁত তুলতে গেলে যেমন বুক-কাঁপানো আতঙ্ক নিয়ে বসে থাকতে হয়, ভিন্ন গ্রহে যাবার জন্যে আমি তেমনি আতঙ্ক নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

যদিও অন্য একটি গ্রহে যাবার কথা ভেবে আতঙ্কে আমার রক্ত জমে যাচ্ছিল, তবু যাত্রাটা কী করে হয়, তা জানার জন্যে প্রচণ্ড কৌতূহলও অনুভব করছিলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি এত হঠাৎ করে হলো যে, আমি ঠিক কী যে হচ্ছে তা-ই বুঝতে পারলাম না।

দেখলাম চোখের সামনে থেকে আচমকা পরিচিত ঘরটি অদৃশ্য হয়েছে। চারদিকে চোখ-ধাঁধানো হলুদ আলো, যার কথা আমি আগেও অনেকবার বলেছি। মাথার ভেতরে তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণা। যেন কেউ একটি সূক্ষ্ম তলোয়ার দিয়ে সাঁই করে মাথাটি দু'ফাঁক করে ফেলেছে। ঘুরঘুর করে উঠল পেটের ভেতর, পা ও হাতের পাতাগুলি জ্বালা করতে লাগল। আগেই বলেছি সমস্ত ব্যাপারটি খুব অল্প সময়ের ভেতর ঘটে গেল। সমস্ত অনুভূতি উল্টেপাল্টে যাবার আগেই দেখি চৌকোনা একটি ঘরে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা, মেয়েটি পাশে নেই। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তার চারপাশে অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি। চকচকে ঘড়ির ডায়ালের মতো অজস্র ডায়াল। কোনোটির কাঁটা স্থির হয়ে আছে। বড় বড় লিভারজাতীয় কিছু যন্ত্র। গঠনভঙ্গি দেখে মনে হয় হাত দিয়ে চাপ দেয়ার জন্যে তৈরি। টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের মতো বোতামের রাশ। প্রতিটিতেই হালকা আলো জ্বলছে। মাথার ঠিক উপরে সাঁ সাঁ করে পাখা ঘুরছে। পাখাটির আকৃতিও অদ্ভুত। ফলের কুঁড়ি ফুটে উঠছে, আবার বুজে যাচ্ছে— এরকম মনে হয়। কোনো বাতাস আসছে না সেখান থেকে। পিঁ পিঁ করে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হচ্ছে কেবল। হঠাৎ পরিষ্কার শুনলাম, দয়া করে অল্প কিছু সময় অপেক্ষা করুন। বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলুন। আলোর বেগে এসেছেন আপনি এখানে। আপনার শরীরের প্রতিটি অণু থেকে গামারশ্মি[১৭] বিকিরণ হচ্ছে, আমরা এটি বন্ধ করছি। কিছুক্ষণের ভেতরেই আপনি আসবেন আমাদের মধ্যে। আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি।

আমি চুপ করে কথাগুলি শুনলাম। যেভাবে বলা হলো সেভাবেই নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। আবার তাদের গলা শোনা গেল, আপনি দয়া করে আমাদের কতগুলি প্রশ্নের জবাব দিন।

আমি বললাম, প্রশ্ন করুন, আমি জবাব দিচ্ছি।

আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?

না।

আপনার কি মাথা ধরেছে?

কিছুক্ষণ আগে ধরেছিল, এখন নেই।

আচ্ছা বলুন তো, ঘরে কী রঙের আলো জ্বলছে?

নীল।

ভালো করে বলুন, সবুজ নয় তো?

না, সবুজ নয়।

হালকা নীল ?

না, ঘন নীল। আমাদের পৃথিবীর মেঘশূন্য আকাশের মতো।

উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। কারণ পরবর্তী কিছুক্ষণ আর কোনো প্রশ্ন শোনা গেল না।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রশ্নকর্তা এবার থেমে বললেন, আপনি কি জানেন, আমাদের পূর্বপুরুষ একদিন পৃথিবী থেকেই এ গ্রহে এসেছিলেন ?

আমি জানি।

আপনি আমাদের একান্ত আপনজন। আপনি এখানে এসেছেন, সেই উপলক্ষে আজ আমাদের ছুটির দিন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী আশ্চর্য! আপনারা জানতেন আমি এসেছি ?

নিশ্চয়ই।

আপনাদের এ গ্রহের নাম ?

টাইফা।

আমি লক্ষ করলাম, ঘরের নীল আলো কখন চলে গেছে। সবুজাভ আলোয় ঘর ভরে গেছে। আমি বললাম, শুনুন, আমি এবার সবুজ আলো দেখছি।

বলবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একটি অংশ নিঃশব্দে ফাঁক হয়ে যেতে লাগল। আমি দেখলাম অসংখ্য কৌতূহলী মানুষ অপেক্ষা করছে বাইরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি সেই গ্রহ থেকে এসেছি, যেখান থেকে তাদের পূর্বপুরুষ একদিন রওনা হয়েছিল। অজানা সেই গ্রহের জন্যে সমস্ত ভালোবাসা এখন হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে।

যাঁরা আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বেশ বয়স্ক। একটু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রহে কাটিয়ে মানুষের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। সাধারণ মানুষের চেয়ে শুধু একটু লম্বা, চেহারা একটু সবুজাভ— এই পরিবর্তনটাই চট করে চোখে পড়ে। চোখগুলি অবশ্য খুব উজ্জ্বল। মনে হয় অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো আলো ছড়াবে।

আমার নাম ক্রিকি। বলেই তাদের একজন আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। অল্প হেসে বললেন, আপনি আমাদের কথা ঠিক বুঝতে পারছেন তো ?

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। লম্বাটে ধরনের মুখ, ঢেউ খেলানো লম্বা চুল। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফে একটা জঙ্গুলে চেহারা। আমি বললাম, খুব ভালো বুঝতে পারছি। আপনারা কি এই ভাষাতেই কথা বলেন ?

না, আমরা আমাদের ভাষাতেই কথা বলছি। আমাদের সবার সঙ্গেই অনুবাদক যন্ত্র আছে। আসুন, আমার নিজের ঘরে আসুন।

আমার খুব ইচ্ছে করছিল, বাইরে ঘুরে ঘুরে সব দেখি। এখানকার আকাশ কী

রকম ? গাছপালাই-বা কেমন দেখতে! প্রথম দিকে আমার যে নিস্পৃহ ভাব ছিল, এখন আর সেটি নেই। আমি তীব্র উত্তেজনা অনুভব করছিলাম, যা-ই দেখছি তা-ই আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। ক্রিকি বললেন, আমাদের এই গবেষণাগারে চারটি ভাগ আছে। সবচেয়ে জটিল এবং সবচেয়ে জরুরি বিভাগ হচ্ছে সময় পরিভ্রমণ বিভাগ। জটিলতম কারিগরি বিদ্যা কাজে খাটানো হয়েছে। এখান থেকেই সময়ের অনুকূলে ও প্রতিকূলে যাত্রা করানো হয়। যেমন আপনি এলেন। তারপরই আছে অনঅধীত গণিত বিভাগ। দু'রকম গণিত আছে, একটি হচ্ছে ব্যবহারিক, অন্যটি অনঅধীত, অর্থাৎ যে গণিত এখনো কোনো কাজে খাটানো যাচ্ছে না। আমাদের এখানকার গণিত বিভাগটি হচ্ছে অনঅধীত গণিত বিভাগ।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগটি কী ?

তৃতীয়টি হচ্ছে পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চতুর্থটি প্রতিপদার্থ[১৮] বিভাগ। এ দুটির কাজ হচ্ছে অনঅধীত গণিতকে ব্যবহারিক গণিতে পরিণত করা। আসুন আমি আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আপনি ক্লান্ত নন তো ?

না না, আমি ঠিক আছি। আমার সব দেখেশুনে বেড়াতে খুব ভালো লাগছে।

প্রথমে আপনাকে নিয়ে যাব গণিত বিভাগে। অবশ্য সেটি আপনার ভালো লাগবে না।

গণিত বিভাগ দেখে আমি সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। হাসপাতালের লম্বা ঘরের মতো মস্ত লম্বা ঘর। রোগীদের যেমন সারি সারি বিছানা থাকে, তেমনি দু'ধারে বিছানা পাতা। তাদের মধ্যে অদ্ভুত সব বিকৃত শরীর শুয়ে আছে। সবারই বয়স পনের থেকে কুড়ির ভেতরে। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা নড়েচড়ে বসল।

ক্রিকি বললেন, আপনি যে কয়দিন এখানে থাকবেন, সে কয়দিন আপনাকে গণিত বিভাগেই থাকতে হবে। গণিত বিভাগের প্রধান, যিনি এই গবেষণাগারের মহাপরিচালক, তাঁর তাই ইচ্ছে।

আমি ক্রিকির কথায় কান না দিয়ে বললাম, এরা কারা ?

প্রশ্ন শুনে ক্রিকি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমি তখন খুব অবাক হয়ে সারবন্দি পড়ে থাকা এইসব অসুস্থ ছেলের দিকে তাকিয়ে আছি। কারো হাত-পা শুকিয়ে সুতার মতো হয়ে গিয়েছে, কারো চোখ নেই, কেউ ধনুকের মতো বেঁকে পড়ে আছে। কারো শরীরে আবার দগদগে ঘা। আমি আবার বললাম, এরা কারা, বললেন না ?

ক্রিকি থেমে থেমে বললেন, এরা গণিতবিদ। টাইফা গ্রহের গণিতের যে জয়জয়কার, তা এদের জন্যেই।

কথা শেষ না হতেই শুয়ে-থাকা অন্ধ একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলল, টাইফা গ্রহের উন্নত গণিতের মুখে আমি থুতু দিই। বলেই সে থুঃ করে একদলা থুথু ফেলল।

ক্রিকি বললেন, এই ছেলেটার নাম নিনাষ। মহা প্রতিভাবান।

আমি বললাম, এরা এমন পঙ্গু কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্রিকি বললেন, মায়ের পেটে থাকাকালীন এদের জিনে[১৯] কিছু অদলবদল করা হয়েছে, যার ফলে মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশের বিশ্লেষণী ক্ষমতা হাজারগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু ওরা ঠিক মানবশিশু হয়ে গড়ে ওঠে নি। সুতীব্র গামারশ্মির রেডিয়েশনের ফলে যে সমস্ত জিন শরীরের অন্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করত, তা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ এই বিকলাঙ্গতা। বিজ্ঞান সবসময়ই কিছু পরিমাণে নিষ্ঠুর।

এরা কি জন্ম থেকেই অঙ্কবিদ?

না। বিশিষ্ট অঙ্কবিদরা এদের বেশ কিছুদিন অঙ্ক শেখান।

কিন্তু এ তো ভীষণ অন্যায়।

ক্রিকি বললেন, না, অন্যায় নয়। শারীরিক অসুবিধে ছাড়া এদের তো অন্য কোনো অসুবিধে নেই। তাছাড়া এরা মহাসম্মানিত। বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে সবসময় কিছু ব্যক্তিগত ত্যাগের প্রয়োজন।

এরকম কতজন আছে?

আছে বেশ কিছু। কারো কারো কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ এখনো শিখছে।

কতদিন কর্মক্ষমতা থাকে?

পাঁচ থেকে ছ'বছর। অত্যধিক পরিশ্রমে এদের মস্তিষ্কের নিওরোন নষ্ট হয়ে যায়।

তাদের দিয়ে কী করা হয় তখন?

সেটা নাই-বা শুনলেন।

কিন্তু আমি এদের সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে বলুন। বছরে কতজন এমন বিকলাঙ্গ শিশু আপনারা তৈরি করেন?

সরকারি নিয়মে প্রতিটি মেয়েকে তার জীবদ্দশায় একবার প্রতিভাবান শিশু তৈরির জন্য গামারশ্মি বিকিরণের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। তবে সবগুলি তো আর সফল হয় না। চলুন যাই অন্য ঘরগুলি ঘুরে দেখি।

আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমি দেখলাম, হাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে একজন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল অন্ধ ছেলেটির কাছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকল, নিনাষ! নিনাষ!

বলুন।

এই হিসাবটা একটু কর। নবম নৈরাশিক গতিফলকে বৈদ্যুতিক আবেশ দ্বারা আয়নিত করা হয়েছে, পটেনশিয়ালের পার্থক্য ছয় দশমিক শূন্য তিন মাইক্রোভোল্ট। আউটপুটে কারেন্ট কত হবে?

বারো এম্পিয়ার হবার কথা, কিন্তু হবে না।

লোকটি লাফিয়ে উঠে বলল, কেন হবে না?

কারণ নবম নৈরাশিক একটি ভেক্টর সংখ্যা। কাজেই গতির দিকনির্ভর। ভেক্টরের সঙ্গে স্কেলারের যোগ এভাবে করা যায় না।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। ক্রিকিকে বললাম, আমি এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করতে পারি?

ক্রিকি একটু দোমনা ভাবে বললেন, নিশ্চয়ই।

আমি নিনাষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি তোমার বন্ধু। তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।

আমার কোনো বন্ধু নেই। চলে যাও এখান থেকে, নয়তো তোমার গায়ে থুথু দেব।

ক্রিকি বললেন, আপনি চলে আসুন। এরা সবাই কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থ। আসুন আমরা পদার্থবিদ্যা বিভাগে যাই।

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, আমার বিশ্রাম প্রয়োজন, আমার মাথা ঘুরছে।

ক্রিকি আমার হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি পরে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

অবাক হয়ে দেখি, আনার মতো দেখতে মেয়েটি সেই ঘরে হাসিমুখে বসে আছে। তাকে দেখে কেমন যেন ভরসা হলো। সে বলল, এই জায়গা কেমন লাগছে?

ভালো।

নাও, খাবার খাও। এখানকার খাবার ভালো লাগবে খেতে।

টেবিলে বিচিত্র ধরনের খাবার ছিল। সমস্তই তরল। যেন বিভিন্ন বাটিতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ গুলে রাখা হয়েছে। ঝাঁঝালো ধরনের টক টক লাগল। যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন, খুবই সুস্বাদু খাবার। মেয়েটি বলল, তুমি খুব শিগগিরই দেশে ফিরবে।

কবে?

তোমার হিসেবে এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে।

কিন্তু কী জন্য আমাকে এখানে আনা হয়েছে? আমাকে দিয়ে তোমরা কী করতে চাও?

মেয়েটি বলল, গণিত বিভাগের প্রধানের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

না, হয় নি।

তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবেন।

গণিত বিভাগের প্রধানের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আলাপ হলো। ক্রিকি আমাকে নিয়ে গেল তাঁর কাছে। গোলাকার একটি ঘরের ঠিক মধ্যিখানে তিনি বসে ছিলেন। ঘরে আর দ্বিতীয় কোনো আসবাব নেই। সে ঘরে একটা জিনিস আমার খুব চোখে লাগল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সমস্তই গাঢ় সবুজ রঙে রাঙানো। এমনকি যে

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন, তার রঙও গাঢ় সবুজ। আমাকে দেখে ভদ্রলোক অত্যন্ত মোটা গলায় বলে উঠলেন, আমি গণিত বিভাগের প্রধান মিহি। আশা করি আপনি ভালো আছেন।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি। আমার ভেতরটা যেন কেটে কেটে দেখে নিচ্ছে। শক্ত সমর্থ চেহারা। সমস্ত চোখে-মুখে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। তিনি বললেন, ক্রিকি, তুমি চলে যাও। আর আপনি বসুন।

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, কোথায় বসব ? মেঝেতে ?

হ্যাঁ। কোনো আপত্তি আছে ? আপত্তি থাকলে আমার চেয়ারে বসুন। বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, আমার বসবার তেমন প্রয়োজন নেই। আপনি কী বলবেন বলুন।

আপনি কি জানেন, কী জন্যে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে ?

না, জানি না।

কোনো ধারণা আছে ?

কোনো ধারণা নেই।

বলছি। তার আগে আমার দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আপনি যে ভবিষ্যতে পাঁচ হাজার বছর পাড়ি দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে ?

না, আমার কোনো ধারণা নেই।

আপনি যে উপায়ে ভবিষ্যতে চলে এসেছেন সে উপায়ে অতীতেও চলে যেতে পারেন। নয় কি ?

আমি ঠিক জানি না। আমাকে নিয়ে কী করা হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে না পারলেও খুব অসুবিধে নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মানুষের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ।

আমি কিছুই জানি না। স্কুলে আমি সমাজবিদ্যা পড়াতাম। বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি একেবারে অজ্ঞ।

আপনাকে বলছি, মন দিয়ে শুনুন। মানুষ কিছুই জানে না। তারা সময়কে অতিক্রম করতে পারে না। শূন্য ও অসীম— এই দুইয়ের প্রকৃত অর্থ জানে না। সৃষ্টির আদি রহস্যটা কী, তাও জানে না। পদার্থের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক তার জানা, কিন্তু তার সঙ্গে সময়ের সম্পর্কটা অজানা। প্রতিপদার্থ কী তা সে জানে, কিন্তু প্রতিপদার্থে সময়ের ভূমিকা কী, তা সে জানে না। অথচ জ্ঞানের সত্যিকার লক্ষ্য হচ্ছে এই সমস্ত রহস্য ভেদ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এইসব রহস্য মানুষ কখনো ভেদ করতে পারবে না, তার ফলস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র গণ্ডিতে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়া।

আপনি বুঝতে পারছেন ?

বুঝতে চেষ্টা করছি।

একটা সামান্য জিনিস ভেবে দেখুন, NGK123[২০] গ্রহটিতে মানুষ কখনো যেতে পারবে না। আলোর গতিতেও যদি সে যায়, তবু তার সময় লাগবে এক লক্ষ বছর।

সেখানে যাওয়া কি এতই জরুরি ?

নিশ্চয়ই জরুরি। অবিকল মানুষের মতো, একচুলও হেরফের নেই— এ জাতীয় প্রাণের বিকাশ হয়েছে সেখানে। অপূর্ব সে গ্রহ! মানুষের সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করেছে তার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য। অথচ মানুষ কখনো তার নাগাল পাবে না। তবে—

তবে কী ?

যদি মানুষকে বদলে দেয়া যায়, যদি তাদের মুক্তি দেয়া হয় ত্রিমাত্রিক বন্ধন থেকে, যদি তাদের নিয়ে আসা যায় চতুর্মাত্রিক জগতে— তবেই অনেক কিছু তাদের আয়ত্তে এসে যাবে। তার জন্যে দরকার চতুর্মাত্রিক জগতের মহাজ্ঞানী শক্তিশালী জীবদের সাহায্য। মানুষ অবশ্যি ত্রিমাত্রা থেকে চতুর্মাত্রায় রূপান্তরের আদি সমীকরণের প্রথম পর্যায় শুরু করেছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে একটি মাত্র মানুষের জন্যে। সে হচ্ছে ফিহা।

ফিহা ?

হ্যাঁ, ফিহা। তার অসাধারণ মেধার তুলনা মেলা ভার। অথচ তিনি সঠিক পথে এগুচ্ছেন না। এই সমীকরণের দুটি সমাধান আছে। তিনি একটি বের করেছেন, অন্যটি বের করতে চেষ্টা করছেন না।

কিন্তু এখানে আমার ভূমিকাটি কী ? আমি কী করতে পারি ?

আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন। চতুর্মাত্রিক জীবরা ফিহাকে চান। ফিহার অসামান্য মেধাকে তাঁরা কাজে লাগাবেন।

বেশ তো, আমাকে তাঁরা যেভাবে এনেছেন, ফিহাকেও সেভাবে নিয়ে এলেই তো হয়।

সেভাবে নিয়ে আসা যাচ্ছে না বলেই তো আপনাকে আনা হয়েছে। সিরানরা পৃথিবীর মানুষদের ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি[২১] থেকে বাঁচানোর জন্যে পৃথিবীর চারদিকে শক্তিবলয় তৈরি করেছে। চতুর্মাত্রিক জীবরা শক্তিবলয় ভেদ করতে পারেন না, মানুষ যা অনায়াসেই পারে। সে কারণে ফিহাকে আনা যাচ্ছে না।

আমি সেখানে গিয়ে কী করব ?

ফিহাকে নিয়ে আসবেন আপনি। সম্ভব না হলে ফিহাকে হত্যা করবেন।

আপনি এসব কী বলছেন!

যান, বিশ্রাম করুন গিয়ে, এ নিয়ে পরে আলাপ হবে। যান যান। দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

আমি উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে এলাম। এই মুহূর্তে আমার সেই মেয়েটিকে প্রয়োজন। সে হয়তো অনেক কিছু বুঝিয়ে বলবে আমাকে। গিয়ে দেখি মেয়েটি কৌচের উপর ঘুমিয়ে রয়েছে। শ্রান্ত মানুষেরা যেমন ঘুমোয়, অবিকল তেমনি।

এত নিখুঁত মানুষ যারা তৈরি করতে পারে তাদের আমার হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে হলো। এরাই কি ঈশ্বর ? সৃষ্টি এবং ধ্বংসের অমোঘ ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসে আছে ? প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে মহাপুরুষদের কথা আছে, তাঁরা ইচ্ছেমতো মৃতকে জীবন দিতেন। ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন। কে জানে, হয়তো মহাক্ষমতার অধিকারী চতুর্মাত্রিক জীবদের দ্বারাই এসব হয়েছে। নকল মানুষ তৈরি করে তাদের দিয়ে ভেলকি দেখিয়েছে। আনার মতো মানুষ যারা নিখুঁতভাবে তৈরি করে, তাদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

আনাকে ঘুমন্ত রেখেই বেরিয়ে এলাম। উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালাম কিছু সময়। হাঁটতে হাঁটতে একসময় মনে হলো পথ হারিয়েছি। আমার নিজের ঘরটিতে ফিরে যাব, তার পথ পাচ্ছি না। কাউকে জিজ্ঞেস করে নিই ভেবে একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিলাম। খুব অল্পবয়স্ক এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত, আসুন, আসুন। আপনার কাছে যাব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। সত্যি বলছি।

আমি হাসিমুখে বললাম, কী করেন আপনি ?

আমি একজন ডাক্তার।

এখানে ডাক্তারও আছেন নাকি ?

নিশ্চয়ই। মস্ত বড় টিম আমাদের। আমি একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ। আমরা সবাই মিলে একটা ছোট্ট গবেষণাগার চালাই।

খুব অল্প বয়স তো আপনার!

না না। যত অল্প ভাবছেন তত অল্প নয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া কি বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় ? বলেই ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন, যেন খুব একটা মজার কথা।

জানেন, আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন থেকেই আমি এখানে। একটি দিনের জন্যেও এর বাইরে যেতে পারি নি। সেই বয়স থেকে স্নায়ু নিয়ে কারবার আমার। বাজে ব্যাপার।

তার মানে এই দীর্ঘ সময়ে একবারও আপনি বাবা-মার কাছে যান নি ?

না। এমনকি আমার নিজের গ্রহটি সত্যি দেখতে কেমন তাও জানি না। তবে শুনেছি সেটি নাকি অপূর্ব। বিশেষ করে রাতের বেলা। অপূর্ব সব রঙ তৈরি হয় বলে শুনেছি। তাছাড়া দিন-রাত্রি সবসময় নাকি হু হু করে বাতাস বইছে। আর সেখানকার ঘরবাড়ি এমনভাবে তৈরি যে, একটু বাতাস পেলেই অপূর্ব বাজনার মতো আওয়াজ হয়।

আপনি কি কখনো যেতে পারেন না সেখানে ?

ডাক্তার অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কী করে যাব ? আমাদের এই সম্পূর্ণ গবেষণাগারটি একটি চতুর্মাত্রিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

তার মানে ?

একটা ডিম কল্পনা করুন। কুসুমটি যেন আমাদের গবেষণাগার, একটি ত্রিমাত্রিক জগৎ। ডিমের সাদা অংশটি হলো চতুর্মাত্রিক জগৎ এবং শক্ত খোলটি হচ্ছে আমাদের প্রিয় গ্রহ টাইফা।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এরকম করা হলো কেন ?

চতুর্মাত্রিক জীবদের খেয়াল। তবে আপনাকে একটা ব্যাপার বলি শুনুন, ঐসব মহাপুরুষ জীবদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য, সমস্ত ত্রিমাত্রিক জগৎ বিলুপ্ত করা। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই গবেষণাগার। বুঝতে পারছেন ?

না।

না পারলেই ভালো।

আপনি কি এসব সমর্থন করেন না ?

না। কেন করব ? আমি বাইরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর কিছু কিছু রাখি। আমি জানি ফিহা ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের কাজে হাত দিয়েছেন। অসম্ভব মেধা তাঁর। সমীকরণের সমাধান হওয়ামাত্র চতুর্মাত্রিক জগতের রহস্য ভেদ হয়ে যাবে মানুষের কাছে, বুঝলেন ? আর এতেই মাথা ঘুরে গেছে সবার। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা ফিহাকে নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু কলা! কাঁচকলা! ফিহাকে আনতে গিয়ে কাঁচকলাটি খাও।

আমি লক্ষ করলাম ডাক্তার ভদ্রলোক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, মানুষেরা পৃথিবীর চারদিকে শক্তিবলয় তৈরি করেছে। কিন্তু চতুর্মাত্রিক জীবদেরও সাধ্য নেই, সেই বলয় ভেদ করে। হাঃ হাঃ হাঃ...।

হাসি থামলে কাতর গলায় বললাম, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে আমায় আমার ঘরটি দেখিয়ে দেবেন ? আমার কিছুই ভালো লাগছে না।

তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অবসন্নভাবে হাঁটছি। কী হতে যাচ্ছে কে জানে। আবছা আলোয় রহস্যময় লম্বা করিডোর। দুইপাশের প্রকাণ্ড সব কামরা বিচিত্র সব যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। অথচ এদের কোনো কিছুর সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। আমি আমার জায়গায় ফিরে যেতে চাই, যেখানে আমার স্ত্রী আছে, আমার দু'টি অবোধ শিশু আছে, দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে অবোধ ভালোবাসা আছে।

পরবর্তী দু'দিন, অনুমানে বলছি, সেখানে পৃথিবীর মতো দিন-রাত্রি নেই, আমার উপর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো। একেকবার একেকটি ঘরে ঢুকি। বিকট সব যন্ত্রপাতি আমার চারপাশে বসানো হয়। তারপর ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। একটি পরীক্ষা

শেষ না হতেই অন্যটি শুরু। বিশ্রাম নেই, নিঃশ্বাস ফেলার অবসরটুকু নেই। আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। কী হবে প্রশ্ন করে? নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি ভাগ্যের হাতে। ক্লান্তিতে যখন মরমর হয়েছি, তখন বলা হলো পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ বিশ্রাম। তারপর আমাকে পাঠানো হবে পৃথিবীতে।

সমস্ত দিন ঘুমালাম। ঘুম ভাঙল দরজায় মৃদু টোকার শব্দ শুনে।

গণিত বিভাগের একটি ছেলে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। কিছু বলবে, খুব জরুরি। রোগামতো লোকটি খুব নিচু গলায় বলল কথাগুলি।

আমি বললাম, কে সে?

নিনাষ। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম। আমার মনে হলো কিছু একটা হয়েছে, থমথম করছে চারদিক। আনার মতো মেয়েটিও নেই কোথাও।

সবাই যেন অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। আমি যেতেই উৎসুক হয়ে নড়েচড়ে বসল সবাই।

তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলে?

নিনাষ বলল, হ্যাঁ। আপনি জানেন কি, টাইফা গ্রহ অদৃশ্য হয়েছে?

আমি কিছুই জানি না।

তাহলে আমার কাছ থেকে জানুন। অল্প কিছুক্ষণ হলো সমস্ত গ্রহটি চতুর্মাত্রিক গ্রহে পরিণত করা হয়েছে। কেমন করে জানলাম? ত্রিমাত্রিক গ্রহকে চতুর্মাত্রিক গ্রহে পরিণত করার নির্দিষ্ট হিসাব আমরা করেছি। আমরা সব জানি। শুধু যে টাইফা গ্রহই অদৃশ্য হয়েছে তাই নয়, একটি বৃত্তাকার স্থান ক্রমশই চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করছে এবং আপনার পৃথিবী সেই বৃত্তের ভেতরে। বুঝলেন?

আমি বললাম, আমার তাহলে আর প্রয়োজন নেই?

এই মুহূর্তে আপনাকেই তাদের প্রয়োজন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই। নিশ্চয় তারা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চেষ্টা করবে— ফিহার মতো বিজ্ঞানী যেখানে আছেন। আমি খুব ভালো করে জানি, মহাজ্ঞানী ফিহা একটা বুদ্ধি বের করবেনই। যাক, ওসব ছেড়ে দিন। আপনাকে কী জন্যে পাঠানো হবে জানেন?

না।

আপনাকে পাঠানো হবে, যেন ফিহা পৃথিবী রক্ষার কোনো পরিকল্পনা করতে না পারেন তা দেখতে। ফিহার যাবতীয় কাগজপত্র আপনাকে নষ্ট করে ফেলতে বলবে। এমনকি প্রয়োজন হলে আপনাকে বলবে ফিহাকে হত্যা করতে। কিন্তু শুনুন, তা করতে যাবেন না। বুঝতে পারলেন? টইফা গ্রহ চলে গেছে, পৃথিবী যেন না যায়।

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি আনা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। আমাকে বলল, সুসংবাদ। তুমি অল্প কিছুক্ষণের ভেতর পৃথিবীতে যাবে। তোমাকে কী করতে হবে

তা মিহি বুঝিয়ে বলবেন।

আনা, চতুর্মাত্রিক জীবরা যখন তোমার মতো মানুষ তৈরি করতে পারে, তখন ওদের পাঠালেই পারতে পৃথিবীতে, ওরাই করতে পারত যা করার।

তৈরি মানুষ শক্তিবলয় ভেদ করতে পারে না।

কিন্তু আনা, তোমরা আমাকে যা করতে বলবে তা আমি করব না।

নিনাষ কিছু বলেছে তোমাকে, না ?

ঠিক সেজন্যে নয়। আমার মন বলছে আমি যা করব তা অন্যায়।

বাজে কথা রাখ— তুমি করবেই।

আমি করবই ? যদি না করি ?

না করলে ফিরে যেতে পারবে না তোমার স্ত্রী-পুত্রের কাছে। খুব সহজ সত্য। তুমি কি তোমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে চাও না ?

চাই।

তাছাড়া আরেকটা দিক ভেবে দেখ। তোমার তো কিছু হচ্ছে না। তুমি তোমার কাজ শেষ করে পৃথিবীতে নিজের ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যাবে। তারও পাঁচ হাজার বছর পর পৃথিবীর পরিবর্তন হবে। তার আগে নয়। এসো, মিহির কাছে যাই, তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। ও কী, তুমি কাঁদছ নাকি ?

না, আমি ঠিক আছি।...

বইটি অর্ধসমাপ্ত। এরপর আর কিছু নেই। উত্তেজনায় মাথুর হাঁপাতে লাগলেন। সেই মেয়েটি কোথায়, যে তাকে এই বইটি দিয়ে গেছে ? তার সঙ্গে এই মূহূর্তে কথা বলা প্রয়োজন। মাথুর ঘরের বাতি নিভিয়েই বেরিয়ে এলেন। বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। ঘুমন্ত সিরানপল্লীর ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে নির্জন পথ। মাথুরের অল্প শীত করছিল। মেয়েটি কোথায় আছে তা তিনি জানেন। দরজায় টোকা দিতেই লী বলল, কে ?

আমি। আমি মাথুর।

লী দরজা খুলে দিল। মাথুর খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, বইটির শেষ অংশ কোথায় ?

শেষ অংশ পাই নি। আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।

মাথুর ধীরে ধীরে বললেন, লোকটি তার অভিজ্ঞতার কথা লিখে যেতে পেরেছে। তার মানেই হলো সে ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়। অর্থাৎ তার উপর যে দায়িত্ব ছিল তা সে পালন করেছে। সহজ কথায় ফিহাকে পৃথিবী রক্ষার কোনো পরিকল্পনা করতে দেয় নি। ফিহাকে আমাদের বড্ড প্রয়োজন।

মাথুর আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলেন, একসময় নিঃশব্দে উঠে এলেন।

নিকি ঘরে ঢুকে থমকে গেল।

সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে ফিহা শুয়ে আছেন। ন'টার মতো বাজে। এই সময় তিনি সাধারণত অঙ্ক কষেন, নয়তো দুলেদুলে বাচ্চাদের মতো বই পড়েন। নিকি বলল, আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে ?

ফিহা বললেন, শরীর নয়, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাল সারারাত আমি ভূত দেখেছি।

ভূত!

হ্যাঁ, জ্বলজ্যান্ত ভূত। মানুষের গলায় কথা বলে। বাতি জ্বাললেই চলে যায়। আবার ঘর অন্ধকার করলে ফিরে আসে। অদ্ভুত ব্যাপার। সকালবেলা শুয়ে শুয়ে তা-ই ভাবছি।

নিকি বলল, রাত-দিন অঙ্ক নিয়ে আছেন। মাথাকে তো আর বিশ্রাম দিচ্ছেন না, সেইজন্যে এসব হচ্ছে। ভালো করে খাওয়াদাওয়া করুন। একজন ডাক্তার আনব ?

না না, ডাক্তার-ফাক্তার লাগবে না। আর বিশ্রামের কথা বলছ ? সময় তো খুব অল্প। যা করতে হয় এর ভেতর করতে হবে।

নিকি দেখল, ফিহা খুব সহজভাবে কথা বলছেন। সাধারণত দুটি কথার পরই তিনি রেগে যান। গালিগালাজ করতে থাকেন। রাগ খুব বেশি চড়ে গেলে হাতের কাছে যে কাগজটা পান তা কুচিকুচি করে ফেলেন। রাগ তখন একটু পড়ে। নিকি ভাবল, রাতে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে, যার জন্যে আজ ফিহার গলায় এরকম নরম সুর। নিকি চেয়ারে বসতে বসতে বলল, কী হয়েছিল ফিহা। ভূতটা কি আপনাকে ভয় দেখিয়েছিল ?

না, ভয় দেখায় নি। বরং খুব সম্মান করে কথা বলেছে। বলেছে, এই যে চারদিকে রব উঠেছে— মহাসংকট, মহাসংকট— এসব কিছু নয়। শুধুমাত্র পৃথিবীর ডাইমেনশন বদলে যাবে, আর নতুন ডাইমেনশনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবর্ণ সুযোগ। এবং সেখানে নাকি আমার মতো বিজ্ঞানীর মহা সুযোগ-সুবিধা। কাজেই আমি যেন এমন কিছু না করি যাতে এই মহাসংকট কেটে যায়। এইসব।

আপনি তার কথা শুনে কী করলেন ?

প্রথমে কাচের গ্লাসটা ছুড়ে মেরেছি তার দিকে। তারপর ছুড়ে মেরেছি অ্যাসট্রেটা। এতেও যখন কিছু হলো না, তখন বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছি।

নিকি অবাক হয়ে বলল, আমার যেন কেমন লাগছে। সত্যি কি কেউ এসেছিল ?

আরে না। আসবে আবার কী ? ত্রিমাত্রিক জগৎকে চতুর্মাত্রিক জগতে পরিণত করবার জন্যে আমি একসময় কতকগুলি ইকোয়েশন সমাধান করেছিলাম, জানো

বোধহয় ? গত কয়েকদিন ধরেই কেন জানি বারবার সে-কথা মনে হচ্ছে। তা থেকে এসব দেখছি। মাথা গরম হলে যা হয়। বাদ দাও ওসব। তুমি কি চা দেবে এক কাপ ?

আনছি, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

রাত্রি জাগরণের ফলে ফিহা সত্যি সত্যি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আগে ভেবে রেখেছিলেন, আজ সমস্ত দিন কাজ করবেন এবং সমস্ত দিন কোনো খাবার খাবেন না। ফিহা সবসময় দেখেছেন যখন তাঁর পেটে এক কণা খাবার থাকে না, ক্ষুধায় সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসে, তখন তাঁর চিন্তাশক্তি অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। বিস্ময়কর যে কয়টি আবিষ্কার তিনি করেছেন, তা ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই করেছেন। আজ অবশ্যি কিছু করা গেল না। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিকি সকালের খাবার দিয়ে যায় নি। গতরাতে যদি এ জাতীয় আধিভৌতিক ব্যাপারগুলি না হতো, তাহলে এতক্ষণে কাজে লেগে পড়তেন।

এই নিন চা। আমি সঙ্গে কিছু বিস্কিটও নিয়ে এসেছি।

খুব ভালো করেছ।

নিকি একটু ইতস্তত করে বলল, ফিহা, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলো, বলো।

আগে বলুন আপনি হাসবেন না ?

হাসির কথা হলেও হাসব না ?

হাসির কথা নয়। আমি— মানে আমার মনে ক'দিন ধরেই একটা ভাবনা হচ্ছে, আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না।

ফিহা বললেন, বলেই ফেলো। কোনো প্রেমের ব্যাপার নাকি ?

না না, কী যে বলেন! আমার মনে হয়, আমরা যদি পৃথিবীটাকে সরিয়ে দিতে পারি তার কক্ষপথ থেকে, তাহলে বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারি। নয় কি ?

ফিহা হো হো করে হেসে ফেললেন। নিকি বলল, কেন, পৃথিবীটাকে কি সরানো যায় না ?

নিশ্চয়ই যায়। তুমি যদি মঙ্গল গ্রহটা পরম পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দাও, তাহলেই সৌরমণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণজনিত সমতা ব্যাহত হবে। এবং পৃথিবী ছিটকে সরে যাবে।

তাহলেই তো হয়। পৃথিবীকে নিরাপদ জায়গায় এই করে সরিয়ে নিলেই হয়।

কিন্তু একটা গ্রহ উড়িয়ে দিলে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে তাতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে। আর পৃথিবীকে অল্প একটু সরালেই তো জীবনধারণ একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ধরো, পৃথিবী যদি সূর্যের একটু কাছে এগিয়ে আসে, তাহলেই উত্তাপে সুমেরু-কুমেরুর যাবতীয় বরফ গলে মহাপ্লাবন হবে। আর সূর্য থেকে একটু

দূরে সরে গেলে শীতে আমাদের শরীরের প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত জমে যাবে। বুঝলে?

নিকির চেহারা দেখে মনে হলো সে ভীষণ হতাশ হয়েছে। ফিহা চুপচাপ চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি এখন আর তাঁর নেই। নিকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি নিজেও একটু উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। নিকির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আমি অবাক হয়ে লক্ষ করছি, প্রতিটি মেয়ে পৃথিবী রক্ষার জন্যে এক-একটি পরিকল্পনা বের করে ফেলেছে। ট্রেনে আসবার পথে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা, সেও নাকি কী বই পেয়েছে কুড়িয়ে, পাঁচ হাজার বছরের পুরনো বই—তাতেও নাকি পৃথিবী কী করে রক্ষা করা যায় তা লেখা আছে। হাঃ হাঃ হাঃ।

নিকি চুপ করে রইল। বেচারি বেশ লজ্জা পেয়েছে। লাল হয়ে উঠেছে চোখ-মুখ। ফিহা বললেন, নিকি, তুমি কি আমার কথায় লজ্জা পেয়েছ?

না।

এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে, তোমরা সবাই কিছু-না-কিছু ভাবছ। আমার ভেতর কোনোরকম ভাবালুতা নেই। তবু তোমাদের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয়, যে পৃথিবীর জন্যে সবার এত ভালোবাসা তা নষ্ট হয় কী করে!

নিকি বলল, আপনি কিছু ভাবছেন ফিহা?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডা মাথায় ভাববার জন্যই তো এমন নির্জন জায়গায় এসেছি। আমি প্রাণপণে বের করতে চেষ্টা করছি কী জন্যে এমন হচ্ছে। সেই বিশেষ কারণটি কী হতে পারে, যার জন্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র লাপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে কিছুই হচ্ছে না। যেই মুহূর্তে কারণ জানা যাবে, সেই মুহূর্তে পৃথিবী রক্ষার উপায় একটা কিছু হবেই। আমার বয়স হয়েছে, আগের মতো খাটতে পারি না, তবু মাথার ধার একটুও ভোঁতা হয় নি। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে।

আবেগে নিকির চোখে পানি এল। ফিহার চোখে পড়লে তিনি রেগে যাবেন, তাই সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটু আসছি।

ফিহা ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। হাতে সিগারেট জ্বলছে। হেঁটে বেড়াচ্ছেন ঘরের ভেতর। মনে মনে বলছেন, কিছু একটা করা প্রয়োজন। কিন্তু কী করে সেই কিছু একটা হবে, তা-ই ভেবে পাচ্ছেন না। অন্ধকারে হাতড়ানোর কোনো মানে হয় না। ফিহা গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, নিকি।

নিকি দৌড়ে এল। ফিহা বললেন, আমি মাথুরের সঙ্গে একটু আলাপ করি, কী বলো? ঐ মেয়েটা কী কাণ্ডকারখানা করে বেড়াচ্ছে তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

নিশ্চয়ই। আমি এক্ষুনি যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি।

মাথুরের চিন্তাশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। লীর নিয়ে আসা বইটির শেষ অংশ নেই, এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এদিকে ফিহার কোনো খোঁজ নেই। সিরান-পল্লীর বিজ্ঞানীরা তাঁকে বয়কট করেছেন। কাজকর্ম চালাচ্ছে স্ত্রুরা। স্ত্রুরা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, মাথুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সমস্তই মাথুরের কানে আসে। মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণাগারের তিনি মহাপরিচালক, অথচ তাঁর হাতে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নেই।

মাথুর সময় কাটান শুয়ে শুয়ে। নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার কথা মনেও হয় না তাঁর। দশ থেকে পনেরটি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। কাজ বলতে এই। রাতের বেলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ঘুমুতে যান। ঘুম হয় না, বিছানায় ছটফট করেন।

সেদিনও খবরের কাগজ দেখছিলেন। সরকারি নির্দেশ থাকার জন্যেই কোথাও মহাবিপদের কোনো উল্লেখমাত্র নেই, অথচ সমস্ত খবরের মূল কথাটি হচ্ছে, বিপদ এগিয়ে আসছে পায়ে-পায়ে। পাতায় পাতায় লেখা— শহরে আইনশৃঙ্খলা নেই, খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত, যানবাহন চলাচল বন্ধ, কলকারখানার কর্মীরা কাজ ছেড়ে বিনা নোটিশে বাড়ি চলে যাচ্ছে। ছয়জন তরুণী আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসেছে। পড়তে পড়তে মাথুরের মনে হলো, তিনি নিজেও কি আত্মহত্যা করে বসবেন কোনো দিন ?

ট্রিইই। ট্রিইই।

যোগাযোগের স্বচ্ছ পর্দা নীলাভ হয়ে উঠল। মাথুর চমকে তাকালেন সেদিকে। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে কে কথা বলতে চায় ?

মাথুর, আমি ফিহা বলছি। কেমন আছ তোমরা ?

মাথুর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। পাওয়া গেছে, ফিহাকে পাওয়া গেছে।

মাথুর, লী বলে সেই পাগলা মেয়েটি এসেছিল ?

জি এসেছিল।

সে কি এখনো আছে তোমার কাছে ?

না, সে চলে গেছে। ফিহা, আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা ছিল।

কী কথা ? আমি এখন একটু ব্যস্ত।

শত ব্যস্ত থাকলেও আপনাকে শুনতে হবে। আপনি কি ইদানীং কোনো আজগুবি ব্যাপার দেখছেন, কেউ এসে কি আপনাকে ভয়টয় দেখাচ্ছে ?

ফিহা একটু অবাক হলেন। থেমে থেমে বললেন, তুমি জানলে কী করে! নিকি কি এর মধ্যেই তোমাকেও এসব জানিয়ে বসে আছে ?

না না, নিকি নয়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। আপনাকে সব বোঝানো যাবে না। তা ছাড়া সময়ও খুব কম।

বেশ, তাহলে জরুরি কথাটাই সেরে ফেলো।

আপনি ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের সমাধান করেছিলেন ?

করেছিলাম, তা তো তোমার মনে থাকা উচিত।

মনে আছে ফিহা। কিন্তু আপনার সমীকরণের দুটি সমাধান ছিল।

দুটি নয়, একটি। অন্যটিতে ইমাজিনারি টার্ম ব্যবহার করা হয়েছিল, কাজেই সেটি বাদ দিতে হবে। কারণ এখানে সমাধানটির উত্তরও ইমাজিনারি টার্মে এসেছিল।

ফিহা, আমাদের দ্বিতীয় সমাধানটি দরকার ?

কেন ?

দ্বিতীয় সমাধানটি সঠিক সমাধান।

মাথুর, একটা কথা বলছি, রাগ করো না।

বলুন।

তোমার মাথায় দোষ হয়েছে। বুঝতে পারছি, এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখা খুব মুশকিল।

আমার মাথা খুব ঠিক আছে। আমি আপনার পায়ে পড়ি, আমার কথা শুনুন।

বেশ বেশ বলো।

দ্বিতীয় সমাধানটি যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা নিজেরাই একটি চতুর্মাত্রিক জগৎ তৈরি করতে পারি।

হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে। কিন্তু সমাধানটি তো ভুল।

সমাধানটি ভুল নয়। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। আচ্ছ ফিহা, ধরুন একদল বিজ্ঞানী একটি নির্দিষ্ট পথের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে চতুর্মাত্রায় পরিবর্তিত করেছেন, এখন তাঁদের আমরা আটকাতে পারি, যদি সেই পথে আগেই আমরা একটি চতুর্মাত্রিক জগৎ তৈরি করে রাখি।

মাথুর, তোমার কথায় আমি যেন কিসের ইঙ্গিত পাচ্ছি। মাথুর, এসব কী বলছ ?

আমি ঠিক কথাই বলছি ফিহা। আপনি কি সমাধানটি নিজে এখন একটু পরীক্ষা করবেন ?

ফিহা উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমি করছি, আমি এক্ষুনি করছি। আর তুমি নিজেও করে দেখ, স্রুরাকে বলো করে দেখতে। সমাধানটি লিখে নাও।

ফিহা একটির পর একটি সংখ্যা বলে যেতে লাগলেন।

মাথুর একমনে লিখে চললেন। দু'জনের চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করছে।

সন্ধ্যা হয় নি তখনো। শেষ বিকেলের লালচে আলো গাছের পাতায় চিকচিক করছে। ফিহা বারান্দায় চেয়ার পেতে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বিকেল হলেই তাঁর মনে একধরনের বিষণ্ন অনুভূতি হয়।

নিকি চায়ের পেয়ালা হাতে বাইরে এসে দেখে, ফিহা ভ্রু কুঁচকে দূরের গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাতাসে তাঁর রুপালি চুল তিরতির করে উড়ছে। নিকি কোমল কণ্ঠে ডাকল, ফিহা।

ফিহা চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললেন, নিকি! আমার মনে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা অর্থহীন।

নিকি কিছু বলল না, চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। ফিহা বললেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান তো মানুষের জন্যে, আর একটি মানুষ কতদিন বাঁচে ? তার মৃত্যুর সাথে সাথেই তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সব সম্পর্কের ইতি। ঠিক নয় কি ?

নিকি শক্ত মুখে বলল, না ঠিক নয়। ফিহা চুপ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। একটু অস্বস্তির সাথে নিকি বলল, দেখুন ফিহা, আপনার সাথে তর্ক করা আমার সাজে না। কিন্তু নবম গণিত সম্মেলনে আপনি একটা ভাষণ দিয়েছিলেন—।

কী বলেছিলাম আমার মনে নেই।

বলেছিলেন, মানবজাতি জন্মমুহূর্তেই একটা অত্যন্ত জটিল অঙ্ক কষতে শুরু করেছে। এক-এক যুগে এক-এক মানুষ এসেছে, আর সে জটিল অঙ্কের এক একটি ধাপ কষা হয়েছে। অজানা নতুন নতুন জ্ঞান মানুষের ধারণায় এসেছে।

বেশ।

আপনি বলেছিলেন, একদিন সে অঙ্কটির সমাধান বের হবে। তখন সমস্ত রহস্যই এসে যাবে মানুষের আওতায়। বের হয়ে আসবে মূল রহস্য কী। মানুষের ছুটি হচ্ছে সেই দিন।

ফিহা বললেন, এইসব বড় বড় কথা অর্থহীন নিকি।

নিকি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এলোমেলোভাবে বসে থাকা ফিহাকে লক্ষ করল। তারপর বলল, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ফিহা ?

না নিকি, আজ আমার মতো সুস্থ আর কেউ নেই। একটু থেমে অন্যমনস্ক স্বরে ফিহা বললেন, পৃথিবী রক্ষার উপায় বের হয়েছে নিকি। পৃথিবী এবারেও বেঁচে গেল।

ফিহা বসে বসে সন্ধ্যা মিলানো দেখলেন। চাঁদ উঠে আসতে দেখলেন। তাঁর মনে হলো, এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রকৃতিকে তিনি এর আগে কখনো দেখেন নি। তাঁর কেমন যেন বেদনাবোধ হতে লাগল। যাবতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনে সুপ্ত বেদনাবোধ জাগিয়ে তোলে কেন কে জানে! একসময় নিকি ভেতর থেকে ডাকল, ফিহা, ভেতরে এসে পড়ুন। ভারি ঠান্ডা পড়েছে।

ফিহা নিঃশব্দে উঠে এলেন। চাবি ঘুরিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে বিরক্ত গলায় বললেন, আবার— আবার এসেছ তুমি ?

ভৌতিক ছায়ামূর্তি অন্ধকারে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। তার হাতে অদ্ভুত একটি সুচাল যন্ত্র। সে হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ফিহা।

আমি তখনি ক্ষমা করব, যখন তুমি আমার ঘর ছেড়ে চলে যাবে।

কিন্তু ফিহা, আমি ঘর ছেড়ে চলে যেতে আজ আসি নি।

তবে কী জন্যে এসেছ ?

আপনাকে হত্যা করতে।

ফিহা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, তাতে তোমার লাভ ?

তাহলেই আমি আমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে পারব।

ফিহা মৃদু গলায় বললেন, ঠিক আছে। কীভাবে হত্যা করবে ?

আমার কাছে শক্তিশালী রেডিয়েশন গান আছে মহামান্য ফিহা।

ফিহা জানালা খুলে দিলেন। বাইরের অপরূপ জোছনা ভাসতে ভাসতে ঘরের ভেতর চলে এল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিহা অভিভূতের মতো বললেন, দেখ দেখ, কী চমৎকার জোছনা হয়েছে!

ছায়ামূর্তির রেডিয়েশন গানের অগ্নিঝলক সেই জোছনাকে ম্লান করে দিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই। আবার সেই উথালপাথাল আলো আগের মতোই নীরবে ফুটে রইল।

পরিশিষ্ট

পৃথিবী কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় নি।

স্রুরার কথা তো আগেই বলেছি। অসাধারণ চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সম্মানসূচক এক লালতারা পেয়েছিলেন খুব কম বয়সেই। শেষ পর্যন্ত তিনিই ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

আর সেই স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় অন্ধ যুবকটি ? চতুর্মাত্রিক জগতের জীবরা যাকে পাঠাল ফিহাকে হত্যা করবার জন্যে ?

না, তার উপর পৃথিবীর মানুষের কোনো রাগ নেই। তার লেখা থেকেই তো মাথুর জানলেন ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটি, যা তিনি ভুল ভেবে ফেলে রেখেছিলেন তা ভুল নয়।

আর তার সাহায্যেই তো চতুর্মাত্রিক মহাপ্লাবন রোধ করা গেল।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে।

কত নতুন জ্ঞান, নতুন পথ, আপনি এসে ধরা দিয়েছে মানুষের হাতে। এখন শুধু ছুটে চলা, জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে। ফিহার মতো নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছেন কবে মানুষ বলবে, তোমাদের

আত্মত্যাগ, মানুষদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তোমাদের সাধনা, আমরা ভুলি নি। আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি। আমাদের কাছে কোনো রহস্যই আর রহস্য নয়।

ঠিক সন্ধ্যাবেলা পুবের আকাশে যে ছোট্ট তারাটি অল্প কিছুক্ষণের জন্যে নীল আলো জ্বেলে আপনিতেই নিভে যায়, পৃথিবীর মানুষ সেটি তৈরি করেছেন ফিহার স্মরণে। সেই কৃত্রিম উপগ্রহটির সিলঝিন[২৩] নির্মিত কক্ষে পরম যত্নে রাখা হয়েছে ফিহার প্রাণহীন দেহ। সে-সব কতকাল আগের কথা।

আজও সে উপগ্রহটি ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর চারদিকে। হিসেবমতো জ্বলে উঠছে মায়াবী নীল আলো। পৃথিবীর মানুষ যেন বলছে, ফিহা, তোমাকে আমরা ভুলি নি, আমাদের সমস্ত ভালোবাসা তোমাদের জন্যে। ভালোবাসার নীল আলো সেই জন্যেই তো জ্বেলে রেখেছি।

নির্ঘণ্ট

১. নিওরোন মস্তিষ্কের যে সব কোষে স্মৃতি সজ্জিত থাকে।

২. দ্বৈত অবস্থানবাদ একই সময়ে একই স্থানে দুটি বস্তুর উপস্থিতির সম্ভাবনা সম্পর্কীয় সূত্র। (কাল্পনিক)

৩. মেমরি সেল মস্তিষ্কের নিওরোন সেলের অনুকরণে কম্পিউটারে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা তথ্য সংরক্ষণ করার সেল।

৪. ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণ ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক বস্তুর যোগসূত্র সম্পর্কিত সূত্র। (কাল্পনিক)

৫. টাইফা তিন লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী একটি গ্রহ। (কাল্পনিক)

৬. এন্ড্রোমিডা : ছায়াপথের মতোই একটি নীহারিকা, যা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী।

৭. WGK166 একটি সাদা বামন নক্ষত্র। (কাল্পনিক)

৮. সাদা বামন নক্ষত্র : নক্ষত্রের মৃত্যু হওয়ার পূর্বে ক্ষুদ্রকায় অবস্থা। সূর্যও একটি স্তর পার হয়ে ক্ষুদ্রকায় সাদা বামন নক্ষত্রের রূপ নেবে।

৯. সিরান ঘটনা বর্ণিত সময়ে বিজ্ঞানীদের সম্মানসূচক উপাধি। (কাল্পনিক)

১০. ওমিক্রন রশ্মি : অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং অতি শক্তিশালী বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ, যা অন্তর্নীহারিকাপুঞ্জ যোগাযোগে ব্যবহার করা হয়। (কাল্পনিক)

১১. মাইক্রোফিল্ম বই ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্যে ক্ষুদ্রকায় ফটো তুলে রাখার পদ্ধতি।

১২. NGC1303 দূরবর্তী কোয়াজার। (কাল্পনিক)

১৩. NBP203 সাতাত্তর লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ। (কাল্পনিক)

১৪. প্রোটোপ্লাজম জীবকোষের জীবন্ত অংশটুকু।

১৫. চতুর্মাত্রিক জগৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, সময়— এই চারটি মাত্রা নিয়ে গঠিত অদৃশ্য বস্তু। ত্রিমাত্রিক বস্তু যেরূপ চতুর্মাত্রা সময়ে পরিভ্রমণ করে, চতুর্মাত্রিক বস্তু ঠিক সেরূপ পঞ্চম মাত্রায় পরিভ্রমণ করে। (কাল্পনিক)

১৬. ত্রিমাত্রিক জগৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নিয়ে গঠিত বস্তু। আমাদের দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণই ত্রিমাত্রিক।

১৭. গামারশ্মি : উচ্চ কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ।

১৮. প্রতিপদার্থ : যে বিশেষ ধরনের পদার্থ সাধারণ পদার্থের সংস্পর্শে এসে উভয়েই অদৃশ্য হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

১৯. জিন : জীবকোষের যে অংশটুকু প্রাণীদেহে পৈতৃক গুণাবলি বহন করে।

২০. NGK123 এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরবর্তী একটি গ্রহ। (কাল্পনিক)

২১. মহাজাগতিক রশ্মি : মহাজগৎ থেকে নিয়ত যে শক্তিকণা পৃথিবীর বুকে আঘাত করছে।

২২. শক্তিবলয় ঘটনাবর্ণিত সময়ে মহাজাগতিক রশ্মি ক্ষতিকর রূপ নেয়ার পর পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আয়োনোস্ফিয়ারে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র। (কাল্পনিক)

২৩. সিলঝিন : ১১৯তম ধাতু সিলঝিনিয়াম ও এক্টিনিয়ামের সংমিশ্রণে তৈরি বিশেষ ঘাতসহ সঙ্কর ধাতু। (কাল্পনিক)

স্মৃতিকথা

আমার ছেলেবেলা

শোনা কথা

মানুষ অসম্ভব স্মৃতিধর।

নব্বই বছরের একজন মানুষও তার ছেলেবেলার কথা মনে করতে পারে। মস্তিষ্কের অযুত নিযুত নিওরোনে বিচিত্র প্রক্রিয়ায় স্মৃতি জমা হয়ে থাকে। কিছুই নষ্ট হয় না। প্রকৃতি নষ্ট হতে দেয় না। অথচ আশ্চর্য, অতি শৈশবের কোনো কথা তার মনে থাকে না। দুবছর বা তিন বছর বয়সের কিছুই সে মনে করতে পারে না। মাতৃগর্ভের কোনো স্মৃতি থাকে না, জন্মমুহূর্তের কোনো স্মৃতিও না। জন্মসময়ের স্মৃতিটি তার থাকা উচিত ছিল। এত বড় একটা ঘটনা অথচ এই ঘটনার স্মৃতি প্রকৃতি মুছে ফেলে। মনে হয় প্রকৃতির কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য এতে কাজ করে। প্রকৃতি হয়তো চায় না পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা আমরা মনে করে রাখি।

আমি যখন মন ঠিক করে ফেললাম, ছেলেবেলার কথা লিখব, তখন খুব চেষ্টা করলাম জন্মমুহূর্তের স্মৃতির কথা মনে করতে এবং তারও পেছনে যেতে, যেমন মাতৃগর্ভ। কেমন ছিল মাতৃগর্ভের সেই অন্ধকার ? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করল। এল এস ডি (Lysergic acid dietlyamide) নামের একধরনের ড্রাগ নাকি মাতৃগর্ভ এবং জন্মমুহূর্তের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। আমেরিকা থাকাকালীন এই ড্রাগের খানিকটা জোগাড় করেছিলাম। সাহসের অভাবে খেতে পারিনি। কারণ এই হেলুসিনেটিং ড্রাগ প্রায়ই মানুষের মানসিক অবস্থায় বড় রকমের ঢেউ তোলে।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, খুব পুরনো কথা আমার কিছুই মনে নেই। তবে জন্মের চার বছরের পর থেকে অনেক কিছুই আমি মনে করতে পারি। সেইসব কথাই লিখব। শুরুটা করছি শোনা কথার উপর নির্ভর করে। শোনা কথার উপর নির্ভর করাও বেশ কঠিন। একই গল্প একেকজন দেখি একেকরকম করে বলেন। যেমন— একজন বললেন, তোমার জন্মের সময় খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। অন্য একজন বললেন, কই না তো, প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল এইটা খেয়াল আছে, ঝড়বৃষ্টি তো ছিল না!

আমি সবার কথা শুনে শুনে একটি ছবি দাঁড় করিয়েছি। এই ছবি খানিকটা এদিক-ওদিক হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি এমন কেউ না যে আমার জন্মমুহূর্তের প্রতিটি ঘটনা হুবহু লিখতে হবে। কোনো ভুলচুক করা যাবে না। থাকুক কিছু ভুল। আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়েই তো আছে ভুল এবং ভ্রান্তি।

আমার জন্ম ১৩ই নভেম্বর। ১৯৪৮ সন। শনিবার, রাত ১০টা তিরিশ মিনিট। শুনেছি ১৩ সংখ্যাটাই অশুভ। এই অশুভের সঙ্গে যুক্ত হলো শনিবার। শনি-মঙ্গলবারও নাকি অশুভ। রাতটাও কৃষ্ণপক্ষের। জন্মমুহূর্তে দপ করে হারিকেন নিভে

গেল। ঘরে রাখা গামলার পানি উলটে গেল। একজন ডাক্তার, যিনি গত তিনদিন ধরে মা'র সঙ্গে আছেন, তিনি টর্চলাইট জ্বেলে তার আলো ফেললেন আমার মুখে। ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, এই জানোয়ারটা দেখি তার মাকে মেরেই ফেলছিল!

আমি তখন গভীর বিস্ময়ে টর্চলাইটের ধাঁধানো আলোর দিকে তাকিয়ে আছি। চোখ বড় বড় করে দেখছি— এসব কী ? অন্ধকার থেকে এ আমি কোথায় এলাম ?

জন্মের পরপর কাঁদতে হয়। তা-ই নিয়ম।

চারপাশের রহস্যময় জগৎ দেখে কাঁদতেও ভুলে গেছি। ডাক্তার সাহেব আমাকে কাঁদাবার জন্য ঠাস করে গালে চড় বসালেন। আমি জন্মমুহূর্তেই মানুষের হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়ে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলাম। ঘরে উপস্থিত আমার নানিজান আনন্দিত স্বরে বললেন, 'বামুন রাশির ছেলে'। বামুন রাশি বলার অর্থ প্লেসেন্টার সঙ্গে যুক্ত রক্তবাহী শিরাটি বামুনের পৈতার মতো আমার গলা পেঁচিয়ে আছে।

শিশুর কান্নার শব্দ আমার নানাজানের কানে যাওয়ামাত্র তিনি ছুটে এসে বললেন, ছেলে না মেয়ে ?

ডাক্তার সাহেব রহস্য করবার জন্যে বললেন, মেয়ে, মেয়ে। ফুটফুটে মেয়ে।

নানাজান তৎক্ষণাৎ আধমণ মিষ্টি কিনতে লোক পাঠালেন। যখন জানলেন মেয়ে নয় ছেলে— তখন আবার লোক পাঠালেন— আধমণ নয়, এবার মিষ্টি আসবে একমণ। এই সমাজে পুরুষ এবং নারীর অবস্থান যে ভিন্ন তাও জন্মলগ্নেই জেনে গেলাম।

নভেম্বর মাসের দুর্দান্ত শীত।

গারো পাহাড় থেকে উড়ে আসছে অসম্ভব শীতল হাওয়া। মাটির মালসায় আগুন করে নানিজান সেক দিয়ে আমাকে গরম করার চেষ্টা করছেন। আশেপাশের বৌ-ঝি'রা একের পর এক আসছে এবং আমাকে দেখে মুগ্ধ গলায় বলছে— 'সোনার পুতলা।'

এতক্ষণ যা লিখলাম সবই শোনা কথা। মা'র কাছ থেকে শোনা। কিন্তু আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ আমি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। আমাকে দেখে সোনার পুতলা বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার কিছু নেই। তাছাড়া জন্মমুহূর্তের এতসব কথা আমার মা'রও মনে থাকার কথা নয়। তাঁর তখন জীবন-সংশয়। প্রসববেদনায় পুরো তিনদিন কাটা মুরগির মতো ছটফট করেছেন। অতিরিক্ত রকমের রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পাড়াগাঁর মতো জায়গায় তাঁকে রক্ত দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থাতেও তিনি লক্ষ করছেন, তাঁর সোনার পুতলা গভীর বিস্ময়ে চারপাশের পৃথিবীকে দেখছে, কাঁদতে ভুলে গেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার ধারণা, মা যা বলেছেন তা অন্যদের কাছ থেকে শুনেই বলেছেন।

ধরে নিচ্ছি, মা যা বলেছেন সবই সত্যি। ধরে নিচ্ছি, একসময় আমার গাত্রবর্ণ কাঁচা সোনার মতো ছিল। ধরে নিচ্ছি, আমার জন্মের আনন্দপ্রকাশের জন্য সেই রাতে একমণ মিষ্টি কিনে বিতরণ করা হয়েছিল। মিষ্টি কেনার অংশটি বিশ্বাসযোগ্য।

নানাজানের অর্থবিত্ত তেমন ছিল না, কিন্তু তিনি দিলদরিয়া ধরনের মানুষ ছিলেন। আমার মা ছিলেন তাঁর সবচে' আদরের প্রথমা কন্যা, বিয়ে হয়ে যাবার পরও যে-কন্যার মাথার চুল তিনি নিজে পরম যত্নে আঁচড়ে দিতেন। এই অতি আদরের কন্যার বিয়ের সময়ও তিনি জমিটমি বিক্রি করে খরচের চূড়ান্ত করলেন। পিতৃহৃদয়ের মমতা প্রকাশ করলেন দুহাত খুলে টাকা খরচের মাধ্যমে।

উদাহরণ দিই— মোহনগঞ্জ স্টেশন থেকে বর আসবে, হাঁটাপথে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। পালকির ব্যবস্থা করলেই হয়। আমার নানাজান হাতির ব্যবস্থা করলেন। সুসং দুর্গাপুর থেকে দুটি হাতি আনানো হলো। যে-লোক এই কাজ করতে পারেন, তিনি তাঁর প্রিয় কন্যার প্রথম সন্তান জন্মের খবরে বাজারের সমস্ত মিষ্টি কিনে ফেলতে পারেন।

আমার বাবা তখন সিলেটে। বিশ্বনাথ থানার ওসি।

ছেলে হবার খবর তাঁর কাছে পৌঁছল। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বেচারার খুব শখ ছিল প্রথম সন্তানটি হবে মেয়ে। তিনি মেয়ের নাম ঠিক করে বসে আছেন। একগাদা মেয়েদের ফ্রক বানিয়েছেন। রুপার মল বানিয়েছেন। তাঁর মেয়ে মল পায়ে দিয়ে ঝমঝম করে হাঁটবে— তিনি মুগ্ধ হয়ে দেখবেন। ছেলে হওয়ায় সব পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল। তিনি একগাদা ফ্রক ও রুপার মল নিয়ে ছেলেকে দেখতে গেলেন। পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এইসব মেয়েলি পোশাক আমাকে দীর্ঘদিন পরতে হয়। বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মা আমার মাথার চুলও লম্বা রেখে দেন। সেই বেণি-করা চুলে রঙবেরঙের রিবন পরে আমার শৈশবের শুরু।

বাবা-মা'র প্রথম সন্তান হচ্ছে চমৎকার একটি জীবন্ত খেলনা। এই খেলনার সবই ভালো। খেলনা যখন হাসে, বাবা-মা হাসেন। খেলনা যখন কাঁদে, বাবা-মা'র মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। আমার বাবা-মা'র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। তাঁরা তাঁদের শিশুপুত্রের ভেতর নানান প্রতিভার লক্ষণ দেখে বারবার চমৎকৃত হলেন। হয়তো আমাকে চাবি-দেয়া একটা ঘোড়া কিনে দেয়া হলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ভেঙে ফেললাম। আবার বাবা পুত্রপ্রতিভায় মুগ্ধ। হাসিমুখে বললেন, দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কী কৌতূহল! সে ভেতরের কলকজা দেখতে চায়।

হয়তো আমাকে খাওয়ানোর জন্য মা থালায় করে খাবার নিয়ে গেলেন, আমি সেই থালা উড়িয়ে ফেলে দিলাম। বাবা আমার প্রতিভায় মুগ্ধ— দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের রাগ দ্যাখো। রাগ থাকা ভালো। এই যে থালা সে উড়িয়ে ফেলে দিল, এতে প্রমাণিত হলো তার পছন্দ-অপছন্দ দুটিই খুব তীব্র।

এই সময় বই ছিঁড়ে ফেলার দিকেও আমার ঝোঁক দেখা গেল। হাতের কাছে বই পাওয়ামাত্র টেনে ছিঁড়ে ফেলি। এর মধ্যেও বাবা আমার প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পেলেন। তিনি মা'কে বোঝালেন— এই যে সে বই ছিঁড়ছে, তার কারণ বইয়ের লেখা সে পড়তে পারছে না, বুঝতে পারছে না। যে-জিনিস সে বুঝতে পারছে না সেই জিনিস সে নষ্ট করে দিচ্ছে। এটি প্রতিভার লক্ষণ।

আদরে বাঁদর হয়।

আমি পুরোপুরি বাঁদর হয়ে গেলাম। এবং আমার প্রতিটি বাঁদরামিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখে আমার বাবা-মা বারবার চমৎকৃত হতে লাগলেন। বাবা-মা'র সঙ্গে যুক্ত হলেন বাবার এক বন্ধু গনি সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী। এই নিঃসন্তান দম্পতি তাঁদের বুভুক্ষু হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা আমার জন্যে ঢেলে দিলেন। তাঁদের ভালোবাসার একটা ছোট্ট নমুনা দিচ্ছি। একদিন বেড়াতে এসে দেখেন আমি চামচে করে চিনি খাচ্ছি। গনি চাচা বললেন, আরে এ তো আগ্রহ করে চিনি খাচ্ছে! চিনি খেতে পছন্দ করে তা তো জানতাম না! তিনি তৎক্ষাণাৎ বের হয়ে গেলেন। ফিরে এলেন পাঁচ সের চিনি নিয়ে। মেঝেতে পাটি পেতে আমাকে বসিয়ে দিলেন। আমার চারদিকে চিনি ছড়িয়ে দেয়া হলো। গনি চাচা হৃষ্টচিত্তে বললেন, খা ব্যাটা, কত চিনি খাবি খা।

আমাকে ঘিরে বাবা-মা'র আনন্দ স্থায়ী হলো না। আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কালান্তক জ্বর। টাইফয়েড। তখন টাইফয়েডের ওষুধ বাজারে আসেনি। রুগীকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কিছুই করণীয় নেই। যতই দিন যেতে লাগল মা'র শরীর ততই কাহিল হতে থাকল। একসময় দেখা গেল তিনি কাউকে চিনতে পারছেন না। এক গভীর রাতে বাবাকে ঘুম ভাঙিয়ে অত্যন্ত অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আমার পাশে এই যে ছোট্ট ছেলেটা শুয়ে আছে, এ কে ?

বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। মা বললেন, এই ছেলেটা এখানে কেন ? এ কার ছেলে ?

আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো নানাজানের কাছে। সিলেটের বিশ্বনাথ থেকে ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে। পিতৃমাতৃ স্নেহ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে আমার দ্বিতীয় জীবন শুরু হলো। আমার নানিজান আমাকে লালনপালনের ভার গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর একটি মেয়ে হয়েছে। তাঁর এক কোলে সেই মেয়ে, অন্য কোলে আমি। নানিজানের বুকের দুধ খেয়ে দুজন একসঙ্গে বড় হচ্ছি।

দুমাস জ্বরে ভোগার পর মা সেরে উঠলেন কিন্তু টাইফয়েড তার প্রবল থাবা বসিয়ে গেল। মা'র মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা গেল। কাউকে চেনেন না। যার সঙ্গে দেখা হয় তাঁকেই বলেন, কত টাকা লাগবে তোমার বলো তো! আমার কাছে অনেক টাকা আছে। যত টাকা চাইবে ততই পাবে। ফেরত দিতে হবে না।

বলেই তোশকের নিচ থেকে লক্ষ লক্ষ কাল্পনিক টাকা বের করতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে এইসব কাল্পনিক টাকা জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেন। চিকন স্বরে চেঁচিয়ে বলেন, টাকা নিয়ে যাও। টাকা। আমি টাকা উড়াচ্ছি। যার যত দরকার, নাও। ফেরত দিতে হবে না।

মা বিয়ের পর খুব কষ্টে পড়েছিলেন। টাকাপয়সার কষ্ট। বিশ্বনাথ থানার ওসি হিসেবে বাবার বেতন ছিল আশি টাকা। বেতনের এই আশিটি টাকা বাবা তাঁর খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য অতি দ্রুত খরচ করে ফেলতেন। মাসের দশ তারিখেই

বাবার হাতে একটা পয়সা নেই। থানার ওসিদের টাকাপয়সার অভাব হবার কথা না। কিন্তু আজ লিখতে গিয়ে গর্ব এবং অহঙ্কারে বুক ভরে যাচ্ছে যে, আমার বাবা ছিলেন সাধু প্রকৃতির মানুষ। বেতনের টাকাই তাঁর একমাত্র রোজগার। মা'র কাছে শুনেছি, পুলিশের রেশনই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখত। মাসের প্রথমেই রেশন তোলা হতো। রেশনে চাল, ডাল এবং তেল পাওয়া যেত। সারা মাসে তাঁদের খাবারে মেনু ছিল ডাল, ডালের বড়া এবং নিমপাতা ভাজা। বাসার সঙ্গে লাগোয়া একটা নিমগাছ ছিল। সেই নিমের কচি পাতা ভাজা করা হতো। মাকে শাড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য বাবার ছিল না। মা'র শাড়ি পাঠাতেন নানাজান। সতেরো বছরের একটি মেয়ে, যে মোটামুটি সচ্ছলতায় মানুষ হয়েছে, তার জন্য এই অর্থকষ্ট বড়ই ভয়াবহ ছিল। অর্থনৈতিক পীড়ন তাঁর উপর যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল মানসিক বিকৃতির সময় তা-ই ফুটে বের হলো। যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই মা এক লাখ বা দুলাখ টাকা দিয়ে দেন।

দুবছর এমন করেই কাটল। আমি নানিজানের কাছে। মা-বাবার সঙ্গে সিলেটে। পুরোপুরি পাগল একজন মানুষ।

এক শ্রাবণ মাসের রাতে মা'র ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। হাওয়ায় বাড়ি যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির পেছনের ঝাঁকড়া জামগাছে শোঁশোঁ শব্দ হচ্ছে। মা বাবাকে ডেকে তুলে ভয়ার্ত স্বরে বললেন, বাতি জ্বালাও, ভয় লাগছে।

বাবা চমকে উঠলেন। দিব্বি সুস্থ মানুষের মতো কথাবার্তা।

হারিকেন জ্বালানো হলো। মা তীব্র স্বরে বললেন, আমার ছেলে কোথায়?

বাবা তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মন আশা-নিরাশায় দুলছে। তাহলে কি মাথা ঠিক হয়ে গেল?

কথা বলছো না কেন? আমার ছেলে কোথায়?

আয়েশা, তোমার কি সবকিছু মনে পড়ছে?

আমার ছেলে কোথায়?

ও আছে। ও ভালো আছে, তোমার মা'র কাছে আছে। তুমি দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে ছিলে। তাকে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তুমি শান্ত হও, কাল ভোরেই তোমাকে নিয়ে আমি মোহনগঞ্জ রওনা হব।

আমি অসুস্থ ছিলাম?

হ্যাঁ।

মা উঠে গিয়ে একটা আয়না আনলেন। আয়নায় নিজেকে দেখে চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। মাথাভরতি চুল ছিল। কোনো চুল নেই। দাঁতের রং কুচকুচে কালো। আয়নায় যার ছায়া পড়েছে সে উনিশ বছরের তরুণী নয়, যেন ষাট বছর বয়সের এক বৃদ্ধা।

আয়েশা, তোমার কি সব মনে পড়ছে?

হ্যাঁ।

বলো তো কত তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছিল ?

আষাঢ় মাসে। পয়লা আষাঢ়।

আনন্দে বাবার চোখও ভিজে উঠল।

বাইরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি। ঘরে নিবুনিবু হারিকেনের রহস্যময় আলো। সেই আলোয় মূর্তির মতো বসে আছেন পুত্রবিরহকাতর এক মা, যিনি এই কিছুক্ষণ আগে তাঁর হারানো স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন।

বাবা মাকে নিয়ে মোহনগঞ্জ উপস্থিত হলেন। আমাকে মা'র কোলে বসিয়ে দেয়া হলো। মা বিস্মিত হয়ে বললেন, এই কি আমার ছেলে ?

নানিজান বললেন, হ্যাঁ।

ছেলে এত বড় কেন ?

ছেলের বয়স দুই বছর, বড় হবে না ?

কথা বলতে পারে ?

পারে, সব কথা বলতে পারে।

মা নানিজানের দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বললেন, আমার ছেলের কোনো অনাদর হয়নি তো ?

নানিজান হেসে ফেললেন।

আমার ছেলের সোনার মতো গায়ের রং ছিল। ও এত কালো হলো কেন ?

সারাদিন রোদে রোদে ঘোরে।

কেন, আপনারা দেখেন না ? কেন আমার ছেলে সারাদিন রোদে রোদে ঘোরে ?

মা যতই রাগ করেন সবাই তত হাসে।

বাড়িভরতি মানুষ। মাতা-পুত্রের মিলনদৃশ্য দেখতে পাড়া ভেঙে বৌ-ঝি'রা এসেছে। আমার নানাজান আবার একমণ মিষ্টি কিনতে লোক পাঠিয়েছেন।

আসরের মধ্যমণি হয়ে আমার মা একটা জলচৌকিতে আমাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এই তাঁর মুখে তৃপ্তি, এই তাঁর চোখে জল। মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলছে। পৃথিবীর মধুরতম একটি দৃশ্য সবাই দেখছে মুগ্ধ হয়ে। এর মধ্যে মা সবাইকে সচকিত করে একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা করলেন। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, আমার এই ছেলের শৈশব বড় কষ্টে কেটেছে, আল্লাহ, তার বাকি জীবনটা তুমি সুখে সুখে ভরে দিও। বাকি জীবনে সে যেন কোনো দুঃখ না পায়।

ঈশ্বর মা'র এই প্রার্থনা গ্রহণ করেননি। এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি বারবার দুঃখ পেয়েছি। বারবার হৃদয় হা-হা করে উঠেছে। চারপাশের মানুষদের নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতায় আহত হয়ে কতবার মনে হয়েছে— এই পৃথিবী বড়ই বিষাদময়! আমি এই পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোনো পৃথিবীতে যেতে চাই, যে-পৃথিবীতে মানুষ নেই।

চারপাশে পত্রপুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি। আকাশে চিরপূর্ণিমার চাঁদ, যে-চাঁদের ছায়া পড়েছে ময়ূরাক্ষী নামের এক নদীতে। সেই নদীর স্বচ্ছ জলে সারাক্ষণ খেলা করে জোছনার ফুল। দূরের বন থেকে ভেসে আসে অপার্থিব সঙ্গীত।

মা আমাকে নিয়ে সিলেট চলে এলেন। কিছুদিন তাঁর নিশ্চয়ই খুব সুখে কাটল। কোনো সুখ স্থায়ী হয় না। এই সুখও স্থায়ী হলো না, আবার টাইফয়েড হলো। টাইফয়েডের বীজ হয়তো লুকিয়ে ছিল। প্রাণসংহারক মূর্তিতে সে আবার আত্মপ্রকাশ করল। বাবা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। মা সারাদিন প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে এলে ব্যাকুল হয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে খোঁজেন। সেই শিশুকে তাঁর কাছে যেতে দেয়া হয় না। মা কাকুতি-মিনতি করেন, ওকে একটু দেখতে দাও। একবার শুধু দেখব।

কাজের মেয়ে আমাকে নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। মা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন। গভীর বিষাদ এবং গভীর আনন্দে তাঁর চোখে জল আসে।

এর মধ্যেই একদিন ডাক্তার সাহেব বাবাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনার স্ত্রী বাঁচবেন না। আপনি মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

বাবা বললেন, কোনো আশাই কি নেই?

না। টাইফয়েড দ্বিতীয়বার হলে আর রক্ষা নেই, তবে...

তবে কী?

টাইফয়েডের নতুন একটা ওষুধ বাজারে এসেছে। শুনেছি ওষুধটা কাজ করে। ইন্ডিয়াতে হয়তোবা পাওয়া যায়। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

আসামের শিলচরে বাবা লোক পাঠালেন। ওষুধ পাওয়া গেল না। বাবা স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সেই প্রস্তুতির প্রমাণ হচ্ছে আমার নামকরণ। আমার নাম রাখলেন কাজল। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অপুর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। অপুর ছেলের নাম ছিল কাজল। আমার ভালো নাম রাখা হলো শামসুর রহমান। বাবার নাম ফয়জুর রহমান। বাবার নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছেলের নাম। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে শামসুর রহমান নাম নিয়ে চলাফেরা করতে হলো। সপ্তম বছরে বাবা হঠাৎ সেই নাম বদলে রাখলেন হুমায়ূন আহমেদ। বছর দুই হুমায়ূন আহমেদ নামে চলার পর আবার আমার নাম বদলে দেবার ব্যবস্থা হলো। আমি কঠিন আপত্তি জানালাম। বারবার বদলানো চলবে না। আমাদের সব ভাইবোনেরই প্রথম ছ'সাত বছর এক নাম, তারপর অন্য নাম। আমার বাবার মৃত্যুর পর তাঁর পেনশন এবং গ্র্যাচুইটির টাকাপয়সা তুলতে গিয়ে বিরাট যন্ত্রণায় পড়লাম। দেখা গেল, তিনি তাঁর টাকাপয়সা তাঁর স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়েকে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তিন ছেলেমেয়ের যে নাম লিখে রেখে গেছেন, এখন কারওরই সেই নাম নেই। বাবা তাঁর ছেলেমেয়ের নাম বদলেছেন। কিন্তু কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে ভুলে গেছেন।

আমি এখন আমার বিচিত্র বাবা সম্পর্কে বলব। মৃত্যুপথযাত্রী মা'র প্রসঙ্গটা আপাতত থাক। শুধু এইটুকু বলে রাখি, তিনি দ্বিতীয়বার টাইফয়েডের ধাক্কাও সামলে ওঠেন জনৈক হিন্দু সাধুবাবার ফুঁ-দেয়া তার্পিন তেল খেয়ে। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তার্পিন টাইফয়েডের ওষুধ নয়। নিশ্চয়ই অন্যকোনো ব্যাপার আছে। আমি যা শুনেছি তা-ই লিখলাম। সাধুবাবার ফুঁ-দেয়া তার্পিন খেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে কেউ ফিরে আসবে এই তথ্য হজম করা আমার পক্ষে বেশ কঠিন। যেহেতু মা দাবি করছেন, সেহেতু লিখছি।

এবার বাবার কথা বলি।

একজন অদ্ভুত বাবা

আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল তার লেখা প্রথম গ্রন্থ 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখে'র উৎসর্গপত্রে লিখেছে :

'পৃথিবীর সবচে' ভাল মানুষটিকে বেছে নিতে বললে
আমি আমার বাবাকে বেছে নেব।'

বইয়ের উৎসর্গপত্রে লেখকরা সব সময় আবেগের বাড়াবাড়ি করেন। আমার ভাইয়ের এই উৎসর্গপত্র আবেগপ্রসূত ধরে নিতে খানিকটা অসুবিধা আছে। সে যদি লিখত পৃথিবীর সবচে ভালো মানুষ আমার বাবা এবং মা তা হলে আবেগের ব্যাপারটি চলে আসত। সে তা না করে বাবার কথাই লিখেছে। পৃথিবীর সবচে' ভালো মানুষের মধ্যে মা'কে ধরেনি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার উৎসর্গপত্র আবেগপ্রসূত নয়। চিন্তাভাবনা করে লেখা। ইকবালকে আমি যতটুকু চিনি সে চিন্তাভাবনা না করে কখনো কিছু বলে না এবং লেখেও না।

আমার বাবা পৃথিবীর সবচে' ভালো মানুষদের একজন কি না তা জানি না, তবে বিচিত্র একজন মানুষ, তা বলতে পারি। তাঁর মতো খেয়ালি, তাঁর মতো আবেগবান মানুষ এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আবেগ ছাড়াও তাঁর চরিত্রে আরো সব বিস্ময়ের ব্যাপারও ছিল। তিনি ছিলেন জন স্টেইনবেকের উপন্যাস থেকে উঠে-আসা এক রহস্যময় চরিত্র।

সবার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। রাত প্রায় বারোটা। রঙমহল সিনেমাহল থেকে সেকেন্ড শো ছবি দেখে বাবা এবং মা রিকশা করে ফিরছেন। বড় একটা দিঘির পাশ দিয়ে রিকশা যাচ্ছে। মা হঠাৎ বললেন, আহা দ্যাখো কী সুন্দর দিঘি! টলটল করছে পানি। ইচ্ছে করছে পানিতে গোসল করি।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, রিকশা থামাও।

রিকশাওয়ালা থামল।

বাবা বললেন, চলো দিঘিতে গোসল করি।

মা হতভম্ব। এই গভীর রাতে দিঘিতে নেমে গোসল করবেন কী? নিতান্ত পাগল না হলে কেউ এরকম বলে?

মা বললেন, কী বলছো তুমি!

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, দ্যাখো আয়েশা, একটাই আমাদের জীবন। এই এক-জীবনে আমাদের বেশির ভাগ সাধই অপূর্ণ থাকবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসব সাধ আছে, যা মেটানো যায় তা মেটানোই ভালো। তুমি আসো আমার সঙ্গে।

বাবা হাত ধরে মা'কে নামালেন। স্তম্ভিত রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে দেখল হাত-ধরাধরি করে দুজন নেমে গেল দিঘিতে।

এই গল্প যতবার আমার মা করেন ততবার তাঁর চোখে পানি এসে যায়। তাঁর নিজের ধারণা, তাঁর জীবনে যে অল্প কিছু শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এসেছিল ঐ দিঘিতে অবগাহন তার মধ্যে একটি।

বাবার চরিত্রকে স্পষ্ট করার জন্যে আরো কিছু ঘটনার উল্লেখ করি। বাবা তখন সিলেট সদরে পুলিশের ইন্টেলিজেন্সিতে আছেন। পদমর্যাদায় সাব-ইন্সপেক্টর। বেতন সর্বসাকুল্যে মাসে নব্বই টাকা। সেই টাকার একটা অংশ দেশের বাড়িতে চলে যায়, এক অংশ ব্যয় হয় বই কেনা বাবদ। বাকি যা থাকে তা দিয়ে অনেক কষ্টে সংসার চালিয়ে নিয়ে যান মা। যাকে বলে ভয়াবহ জীবনসংগ্রাম। জীবনসংগ্রামের এই অংশটি বাবার কখনো চোখে পড়ে না। কারণ দেশের বাড়িতে পাঠানো টাকা এবং বই কেনার টাকা আলাদা করে বাকি টাকাটা মা'র হাতে তুলে দেন। বাবার দায়িত্ব শেষ। বাকি মাস টেনে নিয়ে যাবার দায়িত্ব হচ্ছে মা'র। তিনি তা কীভাবে নেবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। বাবার কোনোই মাথাব্যথা নেই।

এইরকম অবস্থায় মাসের প্রথম তারিখে বাবাকে খুব হাসিমুখে বাড়ি ফিরতে দেখা গেল। তিনি বিশ্বজয়-করা হাসি দিয়ে বললেন, আয়েশা, একটা বেহালা কিনে ফেললাম।

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, কী কিনে ফেললে?

বেহালা।

বেহালা কী জন্যে?

বেহালা বাজানো শিখব।

কত দাম পড়ল?

দাম সস্তা, সত্তর টাকা। সেকেন্ড হ্যান্ড বলে এই দামে পাওয়া গেল।

বাবা সংসার চালাবার জন্য মা'র হাতে দশটা টাকা তুলে দিলেন। মা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না।

বাবার খুব শখ ছিল ওস্তাদ রেখে তাঁর কাছে বেহালা বাজানো শিখবেন। ওস্তাদকে বেতন দিয়ে বেহালা বাজানো শেখার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। কাজেই অতি যত্নে বেহালা তুলে রাখা হলো। যেদিন সামর্থ্য হবে তখন ওস্তাদ রেখে বেহালা শেখা হবে।

মাঝে মাঝে দেখতাম কাঠের বাক্স থেকে তিনি বেহালা বের করছেন। অতি যত্নে ধুলো সরাচ্ছেন। ছড়ে রজন মাখাচ্ছেন এবং একসময় লাজুক ভঙ্গিতে বেহালায় ছড় ঘষছেন। কান্নার মতো একরকম আওয়াজ উঠছে বেহালা থেকে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি।

বাবার অসংখ্য অপূর্ণ শখের মতো বেহালা বাজানো শেখার শখও পূর্ণ হয়নি। বাক্সবন্দি থাকতে থাকতে একসময় বেহালার কাঠে ঘুণ ধরে গেল। ছড়ের সুতা গেল ছিঁড়ে। বেহালা চলে এল আমাদের দখলে। আমার ছোট বোন শেফু বেহালার বাক্স দিয়ে পুতুলের ঘর বানাল। বড় চমৎকার হলো সেই ঘর। ডালা বন্ধ করে সেই ঘর হাতলে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

আরেক দিনের ঘটনা। শীতকালের এক ভোরে মা'র গলা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। কী নিয়ে যেন বাবার সঙ্গে রাগারাগি করছেন। এরকম তো কখনো হয় না! তাঁরা ঝগড়া-টগড়া অবশ্যই করেন, তবে সবটাই চোখের আড়ালে। আজ হলো কী ? আমি কান পেতে আছি যদি কিছু টের পাওয়া যায়। কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না। মা বারবার শুধু বলছেন, ঘোড়া দিয়ে তুমি করবে কী ? আমাকে বুঝিয়ে বলো, কে পুষবে এই ঘোড়া ?

বাবা বলছেন, এত রাগছো কেন ? একটা কোনো ব্যবস্থা হবেই।

মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, আমরা নিজেরা খেতে পাচ্ছি না, এর মধ্যে ঘোড়া! তোমার কি মাথা-খারাপ হলো ?

আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে একটা ঘোড়া কেনা হয়েছে।

আমাকে জেগে উঠতে দেখে বাবা হাসিমুখে বললেন, ঘরের বাইরে গিয়ে দেখে আয় ঘোড়া কিনেছি।

কী অদ্ভুত কাণ্ড! ঘরের বাইরে সুপারিগাছের সঙ্গে বাঁধা বিশাল এক ঘোড়া। ঘোড়াটাকে আমার কাছে আকাশের মতো বড় মনে হলো। সে ক্রমাগত পা দাপাচ্ছে এবং ফোঁসফোঁস করে শব্দ করছে। আমাদের কাজের ছেলে আছদ [তার নাম সম্ভবত আসাদ, সে বলত আছদ] ভীতমুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘটনা হচ্ছে— বাবা মা'কে না জানিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডে এ পর্যন্ত জমা সব টাকা তুলে একটা ঘোড়া কিনে ফেলেছেন। এই সেই ঘোড়া। মহাতেজি, প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি প্রাণী, যে-প্রাণীদের সঙ্গে বাবার প্রথম পরিচয় হয় সারদা পুলিশ একাডেমীতে। তাঁর বড়ই পছন্দ হয়। বাবা তাঁর পছন্দের জিনিস যে-করেই হোক জোগাড় করেন। এতদিন পর ঘোড়াও জোগাড় হলো। তখন পুলিশ অফিসাররা

ব্রিটিশ নিয়মের সূত্র ধরে ঘোড়া পুষলে অ্যালাউন্স পেতেন। বাবা আশা করছেন সেই অ্যালাউন্সের টাকাতেই এর পোষার খরচ উঠে আসবে।

ঘোড়া সুপারিগাছের সঙ্গে বাঁধা। বাবা-মা'র মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হচ্ছে। উত্তাপ পুরোটাই মা-ই চালাচ্ছেন, বাবা শুধু কাটান দেয়ার চেষ্টা করছেন।

কী করবে তুমি এই ঘোড়া দিয়ে শুনি ? সিলেট শহরে ঘোড়ায় করে ঘুরবে ?

হুঁ। অসুবিধা কী ? ছেলেমেয়েদেরও ঘোড়ায় চড়া শেখাব।

ছেলেমেয়েরা ঘোড়ায় চড়া শিখে কী করবে ?

কিছু করবে না, একটা বিদ্যা শেখা থাকল।

ঘোড়ার পেছনে কত খরচ হবে সেটা ভেবেছ ?

এত ভাবলে বেঁচে থাকা যায় না।

বেঁচে থাকা যাক আর না-যাক এই ঘোড়া তুমি এক্ষুনি বিদেয় করো।

পাগল হয়েছ ? এত শখ করে কিনলাম!

বাবা ছিলেন আবেগনির্ভর মানুষ। যুক্তি দিয়ে তাঁকে টলানো মুশকিল। কিন্তু তাঁকেও টলতে হলো। কারণ ঘোড়া দ্বিতীয় দিনেই লাথি মেরে আছদের পা ভেঙে ফেলল। মা হাতে অস্ত্র পেয়ে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, তোমার ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ ঘোড়াকে ঘিরে নাচানাচি করে। লাথি খেয়ে ওরা মারা পড়বে। তাই কি তুমি চাও ? বাবা ঘোড়া বিক্রি করে দিলেন। সেই টাকায় কিনলেন একটা দামি কোডাক ক্যামেরা। তবে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ঘোড়ার জিন রেখে দিলেন। আমাদের খেলার সামগ্রী-তালিকায় আরেকটি জিনিস যুক্ত হলো।

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জিনিসের প্রতি তাঁর আমৃত্যু শখ ছিল— একটি হচ্ছে পামিস্ট্রি, অন্যটি ফটোগ্রাফি। তাঁর কোডাক ক্যামেরা তিনি আগলে রাখতেন যক্ষের মতো। শুধু যে ছবি তুলতেন তা-ই না, সেই ছবি নিজেই ডেভেলপ এবং প্রিন্ট করতেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমাদের শৈশবের আনন্দময় মুহূর্তের একটি হচ্ছে বাবাকে ঘিরে আমরা বসে আছি। একটা গামলায় পানি। সেই পানিতে কিছু কাগজ ভাসছে। ধবধবে সাদা কাগজে আস্তে আস্তে মানুষের মুখের আদল ফুটতে শুরু করেছে। আমরা আনন্দে লাফাচ্ছি। বাবার মুখে আনন্দের হাসি। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের কথা লিখছি। সেই সময় পুলিশের একজন দরিদ্র সাব-ইন্সপেক্টর নিতান্তই শখের কারণে ঘরে ডার্করুম বানিয়ে ছবি প্রিন্ট করছেন— ব্যাপারটা বেশ মজার।

পামিস্ট্রি নিয়েও বাবার উৎসাহ ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। আমার মনে হয় তাঁর মূল ঝোঁকটা ছিল রহস্যময়তার দিকে। তিনি রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন ফটোগ্রাফিতে, ঝুঁকে পড়েছেন সেদিকে। রহস্য ছিল জ্যোতিষবিদ্যায়, সেদিকেও ঝুঁকলেন।

কিছুদিন পরপরই ছুটির দিনের সকালে একটা আতশি কাচ নিয়ে বসতেন। গম্ভীর গলায় বলতেন, বাবারা আসো তো দেখি, হাতের রেখায় কোনো পরিবর্তন হলো কি না।

একবার ইকবালের হাত দেখে বললেন— চমৎকার রেখা। চন্দ্র এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রও ভালো। দীর্ঘ আয়ু। তুই খুব কম করে হলেও আশি বছর বাঁচবি। সেই রাতের ঘটনা। ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে সবার ঘুম ভেঙে গেল। ইকবাল হাউমাউ করে কাঁদছে। কী হয়েছে, কী হয়েছে ? সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আশি বছর পর আমি মরে যাব এই জন্যে খুব খারাপ লাগছে আর কান্না পাচ্ছে।

বাবা বললেন, গণনায় ভুল হতে পারে। আরেকবার দেখা দরকার। কই, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দেখি।

গভীর রাতে বাবা তাঁর আতশি কাচ নিয়ে বসলেন। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে বসলাম। ইকবালের এক হাত বাবার কাছে, অন্য হাতে সে চোখ কচলাচ্ছে। বাবা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, আগের গণনায় ভুল হয়েছিল। তোর হাতে আছে ইচ্ছামৃত্যুর চিহ্ন। তোর হবে ইচ্ছামৃত্যু।

ইচ্ছামৃত্যু কী ?

যতক্ষণ পর্যন্ত মরার ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুই মরবি না। বেঁচে থাকবি।

কোনোদিন যদি মরার ইচ্ছা না হয় ?

তা হলে বেঁচে থাকবি। মরবি না।

ইকবাল হৃষ্টচিত্তে ঘুমুতে গেল।

জ্যোতিষবিদ্যা কোনো বিদ্যা নয়। জ্যোতিষবিদ্যা হচ্ছে একধরনের অপবিদ্যা, অপবিজ্ঞান। মানুষের ভবিষ্যৎ তার হাতের রেখায় থাকে না। থাকার কোনো কারণ নেই। তবু অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বলছি, আমাদের সব ভাইবোন সম্পর্কে তিনি যা বলে গিয়েছিলেন তা মিলে গিয়েছিল। তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর কপালে অপঘাত মৃত্যু লেখা। সেই মৃত্যু হবে ভয়ঙ্কর মৃত্যু।

এইসব তথ্য তিনি হাত দেখে পেয়েছিলেন, না অন্য কোনো সূত্রে পেয়েছিলেন, আমার জানা নেই। মিলগুলো কাকতালীয় বলেই মনে হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরেকটি বিষয়েও জড়িত ছিলেন। সেটাকে প্রেতচর্চা বলা যেতে পারে। প্লানচেট, চক্র, ভূত নামানো এইসব নিয়ে খুব মাতামাতি ছিল। দাদাজান এই নিয়ে বাবার উপর খুব বিরক্ত ছিলেন। তিনি বাবাকে ডেকে তওবা করালেন যাতে তিনি কোনোদিন প্রেতচর্চা না করেন। বাবা তওবার পর প্রেতচর্চা ছেড়ে দেন, তবে এই বিষয়ে বই পড়া ছাড়েননি। বাবার সংগ্রহের বড় অংশ ছিল প্রেতচর্চাবিষয়ক বইপত্র।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, তিনি আস্তিক মানুষ ছিলেন। আমরা কখনো তাঁকে রোজা ভাঙতে দেখিনি। নামাজ খুব নিয়মিত পড়তেন না, তবে রোজ রাতে এশার নামাজে দাঁড় হতেন। গম্ভীর স্বরে সুরা আবৃত্তি করতেন। পরিবেশ হয়ে উঠত রহস্যময়।

আমার বাবা যে একজন রহস্যময় পুরুষ ছেলেবেলায় তা কখনো বুঝতে পারিনি। তখন ধরেই নিয়েছিলাম সবার বাবাই এরকম। আমার বাবা অন্যদের চেয়ে

আলাদা কিছু না। তাছাড়া বাবার সঙ্গে আমাদের কিছু দূরত্বও ছিল। ছেলেমেয়েদের প্রতি আদরের বাড়াবাড়ি তাঁর চরিত্রে ছিল না। নিজে খুব ব্যস্তও থাকতেন। সারাদিন অফিস করে বিকেলে বই পড়তে যেতেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। দিনের পর দিন কাটত, তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা হতো না। এই কারণে মনে মনে চাইতাম তাঁর যেন কোনো-একটা অসুখ হয়। বাবার অসুখ খুবই মজার ব্যাপার। অসুখ হলে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের চারপাশে বসিয়ে উঁচুগলায় কবিতা আবৃত্তি করতেন। এতে নাকি তাঁর অসুখের আরাম হতো।

এই অসুখের সময়ই তিনি একবার ঘোষণা করলেন, 'সঞ্চয়িতা' থেকে যে একটা কবিতা মুখস্থ করে তাঁকে শোনাতে পারবে সে এক আনা পয়সা পাবে। দুটো মুখস্থ করলে দুআনা।

আমি বিপুল উৎসাহে কবিতা মুখস্থ করতে শুরু করলাম। এর মধ্যে কোনো কাব্যপ্রীতি কাজ করেনি। আর্থিক ব্যাপারটাই ছিল একমাত্র প্রেরণা। যথাসময়ে একটা কবিতা মুখস্থ হয়ে গেল। নাম 'এবার ফিরাও মোরে'। দীর্ঘ কবিতা। এই দীর্ঘ কবিতাটা মুখস্থ করার পেছনের কারণ হলো, এটা বাবার খুব প্রিয় কবিতা। তাঁদের সময় নাকি বি. এ. ক্লাসে পাঠ্য ছিল।

বাবা আমার কবিতা আবৃত্তি শুনলেন।

কোনো ভুল না করে এই দীর্ঘ কবিতাটি বলতে পারায় তিনি আনন্দে অভিভূত হলেন। এক আনার বদলে আমি চার আনা পয়সা পেলাম। সাহিত্যবিষয়ক কর্মকাণ্ড থেকে ওটাই ছিল আমার প্রথম রোজগার।

প্রসঙ্গ থেকে আবার সরে এসেছি। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বুঝতে পারছি, এরকম সমস্যা বারবার হবে, মূলধারা থেকে সরে আসব উপধারায়। কে জানে সেই উপধারাই হয়তো বা মূলধারা। তাছাড়া আত্মজীবনীমূলক রচনায় মূল্যহীন অংশগুলোই বেশি মূল্য পায়।

গানবাজনা বাবার বড়ই প্রিয় ছিল। বি.এ. পাস করার পর কলকাতায় কী-একটা পার্ট-টাইম কাজ জুটিয়ে কিছু পয়সা করেন। তা দিয়ে যে-বস্তুটি কেনেন তার নাম কলের গান। দম দিয়ে চালানো কলের গান। কোডাক ক্যামেরাটা ছাড়া অন্য কোনো জাগতিক বস্তুর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না; কিন্তু এই যন্ত্রটির প্রতি তাঁর মমতার সীমা ছিল না। পার্ট-টাইম চাকরিটি চলে যাবার পর তিনি অথই জলে পড়েন। কলকাতার যে-মেসে থাকতেন তার ভাড়া বাকি পড়ে। শখের জিনিস এক এক করে বিক্রি করে ফেলার অবস্থায় পৌঁছে যান। বিক্রি করার মতো অবশিষ্ট যা থাকে তা হচ্ছে কলের গান, যা বিক্রি করা আমার বাবার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সেই সময় তাঁর বন্ধুবান্ধবরা বললেন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা করলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষিত মুসলমান ছেলে তাঁর কাছে চাকরির আবেদন করলেই কাজ সমাধা। কিছু-না-কিছু তিনি জুটিয়ে দেবেনই। বাবা বি. এ. পাস করেছেন ডিসটিংশন নিয়ে। খুব শখ ছিল ইংরেজি সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়বেন। অর্থের অভাবে তা হয়ে উঠছে না। সেই সময় মুসলমান ছেলেদের চাকরিবাকরির প্রায় সব দরজাই বন্ধ। বাবা ঠিক করলেন, দেখা করবেন শেরে বাংলার সঙ্গে। এই অভাব আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

অতিব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী বাবাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো

বি. এ. পাস করেছ ?

জি।

ফলাফল কী ?

বি. এ.-তে ডিসটিংশন ছিল।

বাহ্, খুব খুশি হলাম শুনে। এম. এ. পড়বে তো ?

জি জনাব, ইচ্ছা আছে।

ইচ্ছে আছে বললে হবে না— পড়তেই হবে। তুমি কি আমার কাছে বিশেষ কোনো কাজে এসেছ ? কোনো সাহায্য বা কোনো সুপারিশ, কিংবা চাকরি ?

বাবার খুবই লজ্জা লাগল। তিনি বললেন, জি না, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অন্য কোনো কারণে না।

শেরে বাংলা বেশ খানিকক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, সবাই আমার কাছে তদবির নিয়ে আসে। অনেকদিন পর একজনকে পাওয়া গেল, যে কোনো তদবির নিয়ে আসেনি। আমি খুব আনন্দিত হলাম। তুমি এম. এ. পাস করার পর পেশা হিসাবে শিক্ষকতা বেছে নেবে। আমার ধারণা তুমি ভালো শিক্ষক হবে।

বাবা সেই রাতেই কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের কুতুবপুর চলে আসেন। বাড়ি থেকে সাত মাইল দূরে মীরকাশেম নগরের এক স্কুলে বিপুল উৎসাহে শিক্ষকতা শুরু করেন। মাসের শেষে বেতন নিতে গেলে হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আদায়পত্র কিছুই নেই, বেতন দেব কী ? দেখা যাক পরের মাসে।

পরের মাসেও একই অবস্থা। তার পরের মাসেও তা-ই। হেডমাস্টার সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন, শিক্ষকতা হচ্ছে মহান পেশা। আত্মনিবেদন থাকতে হয়। শুধু টাকা টাকা করলে কি হয় ?

অভাব-অনটনে বাবার জীবন পর্যুদস্ত হয়ে গেল। চাকরির দরখাস্ত করেন— চাকরি পান না। এর মধ্যে বিয়েও করে ফেলেছেন। স্ত্রীকে নিজের কাছে এনে রাখার সামর্থ্য নেই। ঘোর অমানিশা। এই অবস্থায় কী মনে করে জানি ব্রিটিশ সরকারের বেঙ্গল পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টরির পরীক্ষায় বসলেন। সেই সময়ের অত্যন্ত লোভনীয়

এই চাকরিতে নির্বাচিত হবার জন্যে কঠিন সব পরীক্ষায় বসতে হতো। তিনি পরীক্ষা দিতে বসলেন। গ্রহের ফেরে এই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গেলেন। ট্রেনিং নিতে গেলেন পুলিশ একাডেমী সারদায়।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুলিশের চাকরিটি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর দেখা গেল, এই জীবনে তিনি চার হাজারের মতো বই এবং পোস্টাপিসের পাশ বই-এ একশত তিরিশ টাকা ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। বইয়ের সেই বিশাল সংগ্রহও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নির্দেশে পিরোজপুরের একদল হৃদয়হীন মানুষ লুট করে নিয়ে যায়। বাবাকে ধরে নিয়ে যায় বলেশ্বর নদীর তীরে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ভরা পূর্ণিমায় ফিনকি-ফোটা জ্যোৎস্নায় তাঁর রক্তাক্ত দেহ ভাসতে থাকে বলেশ্বর নদীতে। হয়তো নদীর শীতল জল তাঁর রক্ত সে-রাতে ধুয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। পূর্ণিমার চাঁদ তার সবটুকু আলো ঢেলে দিয়েছে তাঁর ভাসন্ত শরীরে। মমতাময়ী প্রকৃতি পরম আদরে গ্রহণ করেছে তাঁকে।

এই প্রসঙ্গ থাক। এই প্রসঙ্গে আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। বরং মা'র কথা বলি।

আমার মা

আমার মা ছিলেন তাঁর পরিবারের প্রথম সন্তান। শ্যামলা ধরনের একহারা গড়নের মেয়ে। অতি আদরের মেয়ে। কেমন করে জানি সবার ধারণা হলো, এই মেয়ে তেমন বুদ্ধিমতী হয়নি। তাঁকে বুদ্ধিমতী বানানোর জন্যে ছোট বয়সেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো বারহাট্টায়। বারহাট্টায় আমার মা'র মামার বাড়ি। মা'র নানিজান অসম্ভব বুদ্ধিমতী। তিনি যদি ট্রেনিং দিয়ে এই মেয়েকে কিছুটা মানুষ করতে পারেন।

তাঁর ট্রেনিং-এ তেমন কাজ হলো না। মা'র বুদ্ধি বিশেষ বাড়ল না। তবে ক্লাস টুতে তখন সরকারি পর্যায়ে একটি বৃত্তি পরীক্ষা হতো। মা এই পরীক্ষা দিয়ে মাসে দুটাকা হারে বৃত্তি পেয়ে চারদিকে চমক সৃষ্টি করে ফেললেন। একী কাণ্ড! মেয়েমানুষ সরকারি জলপানি কী করে পায় ?

মা'র দুর্ভাগ্য বৃত্তির টাকা তিনি পাননি। কারণ তাঁকে উপরের কোনো ক্লাসে ভরতি করানো হলো না। মেয়েদের পড়াশোনার দরকার কী! চিঠি লিখতে পারার বিদ্যা থাকলেই যথেষ্ট। না থাকলেও ক্ষতি নেই। মেয়ে মানুষের এত চিঠি লেখালেখিরই-বা কী প্রয়োজন ? তারা ঘর-সংসার করবে। নামাজ-কালাম পড়বে। এর জন্যে বাংলা-ইংরেজি শেখার দরকার নেই। তারচে' বরং হাতের কাজ শিখুক। রান্নাবান্না শিখুক, আচার বানানো শিখুক, পিঠা বানানো শিখুক। বিয়ের সময় কাজে লাগবে।

আমার মা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এইসব কাজ অতি যত্নের সঙ্গে শিখতে লাগলেন। তাছাড়া নানিজান প্রতি বৎসর একটি করে পুত্র বা কন্যা জন্ম দিয়ে ঘর ভরতি করে ফেলছেন। তাঁর সর্বমোট বারোটি সন্তান হয়। বড় মেয়ে হিসেবে ছোট ভাইবোনদের মানুষ করার কিছু দায়িত্বও মা'র উপর চলে আসে।

এই করতে করতে একদিন তাঁর বয়স হয়ে গেল পনেরো। কী সর্বনাশের কথা! পনেরো হয়ে গেছে এখনো বিয়ে হয়নি! বারহাট্টা থেকে কঠিন সব চিঠি আসতে লাগল যেন অবিলম্বে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করা হয়। চারদিকে সুপাত্র খোঁজা চলতে লাগল। একজন সুপাত্রের সন্ধান আনলেন মা'র দূর-সম্পর্কের চাচা, শ্যামপুরের দুদু মিয়া। দুদু মিয়াও পাগলা ধরনের মানুষ। বি. এ. পাস করেছেন। দেশ নিয়ে মাথা ঘামান। কী করে অশিক্ষিত মূর্খ মুসলমানদের রাতারাতি শিক্ষিত করা যায়, সেই চিন্তাতেই তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটে। শ্যামপুরের অতি দুর্গম অঞ্চলে তিনি ইতোমধ্যে একটা স্কুল দিয়ে ফেলেছেন। সেই স্কুলে একদল রোগাভোগা ছেলে সারাদিন স্বরে অ, স্বরে আ বলে চ্যাঁচায়। যে-মানুষটি এইসব কর্মকাণ্ডের মূলে তাঁর বিচারবুদ্ধির উপর খুব আস্থা রাখা যায় না। তবু আমার নানাজান তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হয়—

ছেলে কী করে ?

কিছু করে না। করার মধ্যে যা করে তা হলো ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে সারাদিন বই পড়ে।

তুমি তাকে চেন কী করে ?

দীর্ঘদিন তার সঙ্গে কলকাতার এক মেসে ছিলাম। তাকে খুব ভালো করে দেখার সুযোগ হয়েছে।

বাড়ির অবস্থা কী ?

বাড়ির অবস্থা শোচনীয়।

ছেলের নামকরা আত্মীয়স্বজন কে আছেন ?

কেউ নেই। সবাই হতদরিদ্র। তবে ছেলের বাবা উলা পাস। বড় মৌলানা—অতি সজ্জন ব্যক্তি।

অতি সজ্জন ব্যক্তি দিয়ে কাজ হবে না। ছেলের মধ্যে তো তেমন কিছু দেখছি না। রাতদিন যে-ছেলে বই পড়ে সে আবার কেমন ছেলে ? বই পড়লে তো সংসার চলে না।

দুদু মিয়া খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, এত ভালো ছেলে আমি আমার জীবনে দেখিনি এইটুকু বলতে পারি।

দেখতে কেমন ?

রাজপুত্র!

কী বললে ?

রাজপুত্র!

ছেলে দেখতে রাজপুত্রের মতো শুধু এই কারণেই নানাজান ছেলের বাবার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন। কথা বলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

আমার দাদা মৌলানা আজিমুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরবি-ফারসিতে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। অতি বিনয়ী মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি হাত তুলে যে-প্রার্থনা করেন তার থেকে মানুষটির চরিত্র স্পষ্ট হবে বলে আমার ধারণা। তিনি বলেন—

হে পরম করুণাময়, আমার পুত্রকন্যা এবং তাদের পুত্রকন্যাদের তুমি কখনো অর্থবিত্ত দিও না। তাদের জীবনে যেন অর্থকষ্ট লেগেই থাকে। কারণ টাকাপয়সা মানুষকে ছোট করে। আমি আমার সন্তানসন্ততিদের মধ্যে 'ছোট মানুষ' চাই না। বড় মানুষ চাই।

আমার দাদার চরিত্র আরো স্পষ্ট করার জন্যে আমি আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। কেমন করে যেন পরীক্ষায় খুব ভালো করে ফেলি। পাঁচটি লেটার নিয়ে বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে যাই। টেলিগ্রামে দাদাকে এই খবর পাঠানো হয়। যে-পিওন দাদাকে টেলিগ্রামটি দেন দাদা তাঁকে বসতে বলেন।

পিওন বসে আছেন। দাদা ভেতরবাড়ি চলে গেছেন। বেশ খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, শোকরানা নামাজ পড়ার জন্যে খানিক বিলম্ব হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। ভাই, আমি অতি দরিদ্র একজন মানুষ, এই মুহূর্তে আমার কাছে যা টাকাপয়সা ছিল সবই আমি নিয়ে এসেছি। আপনি এই টাকা গ্রহণ করলে আমি মনে শান্তি পাব। কারণ আজ যে-খবর আপনি আমাকে দিলেন এত ভালো খবর এই জীবনে আমি পাই নাই।

এই বলে দাদা নগদ টাকা এবং ভাংতি পয়সায় প্রায় চল্লিশ টাকা একটা রুমালে বেঁধে বিস্মিত পিওনের হাতে দিলেন। শুধু তা-ই না, বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, আমি খুব খুশি হব আপনি যদি দুপুরে চারটা ডালভাত আমার সঙ্গে খান।

তার কিছুদিন পরেই আমি দাদার একটা চিঠি পাই। তাতে তিনি লিখলেন—"তোমাকে ছোটবেলায় একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তুমি জবাব দিতে পার নাই। আমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমার ধারণা ছিল তোমার বুদ্ধি তেমন নাই। আজ তুমি তা ভুল প্রমাণিত করিয়াছ। আমি জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই সময়ে তোমার কারণে মনে প্রবল সুখ পাইলাম। মৃত্যুপথযাত্রী একজন বৃদ্ধকে তুমি সুখী করিয়াছ— আল্লাহ তোমাকে তার প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ সবাইকে সবার প্রাপ্য দেন।"

যে-প্রশ্নটির জবাব শৈশবে দিতে পারিনি সেটা বলি। তখন ক্লাস টুতে পড়ি। সিলেটের বাসায় দাদা বেড়াতে এসেছেন। অসহ্য গরম। হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছেন।

হঠাৎ আমাকে বললেন, এই শোন, পাখার ভেতর তো বাতাস ভরা নেই। তবু পাখা নাড়লেই আমরা বাতাস পাই কীভাবে ? বাতাসটা আসে কোত্থেকে ?

আমি সেই কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

দাদা দুঃখিত গলায় বললেন, আমার ধারণা ছিল— তুই পারবি। তুই তো আমার মনটাই খারাপ করে দিলি।

প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি— আবার প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

ছেলের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা না বলে শুধুমাত্র ছেলের বাবার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পরই নানাজান একজন বেকার ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবার প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন।

মেয়েকে বিবাহিত জীবন কী তা বোঝানোর জন্য বর্ষীয়ান মহিলারা দূর দূর থেকে নাইওর চলে এলেন। নকশি পিঠা তৈরি হয়ে টিনবন্দি হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলায় হাতে গড়া সেমাই তৈরি করতে করতে পাড়ার বৌরা মিহি গলায় বিয়ের গীত গাইতে লাগল।

নানাজান কী মনে করে চলে গেলেন মৈমনসিংহ। ছেলে নাটক-নভেল পড়ে, মেয়েকেও তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। দু'একটা নাটক-নভেল পড়া থাকলে মেয়ের সুবিধা হবে।

লাইব্রেরিতে গিয়ে বললেন, ভালো একটা নভেল দিন তো। আমার মেয়ের জন্যে— বুঝেশুনে দেবেন।

লাইব্রেরিয়ান গম্ভীর মুখে বললেন, মেয়েছেলেকে নাটক-নভেল বই দেওয়া ঠিক না, একটা ধর্মের বই নিয়ে যান— তাপসী রাবেয়া।

জি না, একটা নভেলই দেন।

দোকানদার একটা বই কাগজে মুড়ে দিয়ে দিল। নানাজান মা'র হাতে সেই বই তুলে দিলেন। মা'র জীবনে এটাই প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের নাম— 'নৌকাডুবি'। লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম উপন্যাস পড়েই মা মোহিত। একবার, দুবার, তিনবার পড়া হলো, তবু যেন ভালো লাগা শেষ হয় না।

বাসররাতে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো বইটই পড়েছ ? এই ধরো, গল্প-উপন্যাস।

মা লাজুক ভঙ্গিতে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

দুই-একটা বইয়ের নাম বলতে পারবে ?

মা ক্ষীণ স্বরে বললেন, নৌকাডুবি।

গভীর বিস্ময়ে বাবা দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারলেন না। এই অজ পাড়াগাঁয়ের একটি মেয়ে কিনা রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' পড়ে ফেলেছে!

সেই রাতে বাবা-মা'র মধ্যে আর কী কথা হয়েছে আমি জানি না। জানার কথাও নয়। তাঁরা আমাকে বলেননি। কিন্তু আমি কল্পনা করে নিতে পারি, কারণ আমি এবং আমার অন্য পাঁচ ভাইবোন তো তাঁদের সঙ্গেই ছিলাম। লুকিয়ে ছিলাম তাঁদের ভালোবাসায়।

গ্রামের যে-বোকা ধরনের মেয়ে বিয়ের পর শহরে চলে এল, আমার ধারণা সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী মেয়েদেরই একজন। আমি এখনো তাঁর বুদ্ধির ঝলকে চমকে চমকে উঠি। মা শুধু যে বুদ্ধিমতী তা-ই না, অসম্ভব সাহসী এবং স্বাধীন ধরনের মহিলা।

১৬ই ডিসেম্বরের পর মা আমাদের ভাইবোন সবাইকে নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন। হাতে একটি পয়সাও নেই। এই অবস্থায় পুরানা পল্টনে বাড়ি ভাড়া করলেন। আমাদের সবাইকে একত্র করে বললেন, তোরা তোদের পড়াশোনা চালিয়ে যা। সংসার নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। আমি দেখব।

পুরানা পল্টনের ঐ বাড়িতে আমাদের কোনো আসবাবপত্র ছিল না। আমরা মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে ঘুমুতাম। কেউ বেড়াতে এলে তাকে মেঝেতেই বসতে হতো।

মা নানান সমিতিতে ঘুরে ঘুরে সেলাইয়ের কাজ জোগাড় করলেন। দিনরাত মেশিন চালান। জামাকাপড় তৈরি করেন। সেলাইয়ের রোজগারের সঙ্গে বাবার পেনশনের নগণ্য টাকা যুক্ত হয়ে সংসার চলত। তিনি শুধু যে ঢাকার সংসার চালাতেন তা-ই না, মোহনগঞ্জে তাঁর বাবার বাড়ির সংসারও এখান থেকেই দেখাশোনা করতেন। অনেক কাল আগে গ্রামের এই বোকা-বোকা ধরনের লাজুক কিশোরী মেয়েটি কখনো কল্পনাও করতে পারেনি কী কঠিন সংগ্রামময় জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্যে। যুদ্ধক্লান্ত এই বৃদ্ধা এখন কী ভাবেন আমি জানি না। তাঁর পুত্রকন্যারা নানানভাবে তাঁকে খুশি করতে চেষ্টা করে। তিনি তাদের সে সুযোগ দিতে চান না। আমার ছোট ভাই ড. জাফর ইকবাল আমেরিকা থেকে টিকিট পাঠিয়ে দিয়ে লিখল— মা, আপনি আসুন, আপনাকে আমেরিকা এবং ইউরোপ ঘুরিয়ে দেখাব। আপনার ভালো লাগবে।

মা বললেন, যে-জিনিস তোমার বাবা দেখে যেতে পারেননি, আমি তা দেখব না।

আমি বললাম, আম্মা, আপনি কি হজ্বে যেতে চান ? যেতে চাইলে বলুন, ব্যবস্থা করি।

না।

ছোটবেলায় দেখেছি আপনি জরি দিয়ে তাজমহলের ছবি এঁকেছিলেন। তাজমহল দেখতে ইচ্ছা করে ?

না। আমি একা একা কিছু দেখব না।

বাবা যেসব জিনিস খেতে পছন্দ করতেন তাঁর মৃত্যুর পর কোনোদিন সেই খাবার বাসায় রান্না করে নি। সেইসব খাবারের একটি হচ্ছে বুটের ডাল দিয়ে গোরুর

গোশত। আর একটি— বরবটির চচ্চড়ি। আহামরি কোনো খাবার নয়।

আমি একবার বললাম আমাদের জন্যে আপনার কি কোনো উপদেশ আছে?

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, উপদেশ নয়, একটি আদেশ আছে। আদেশটি হচ্ছে— কেউ যদি কখনো তোমাদের কাছে টাকা ধার চায় তোমরা 'না' বলবে না। আমাকে অসংখ্যবার মানুষের কাছে ধারের জন্যে হাত পাততে হয়েছে। ধার চাওয়ার লজ্জা এবং অপমান আমি জানি।

(অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলি) মা'র অসাধারণ ইএসপি বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ছিল। প্রায় সময়ই ভবিষ্যতে কী ঘটনা ঘটবে তা হুবহু বলে দিতে পারতেন। মা'র এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পর্কে বাবা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। মা'কে তিনি ঠাট্টা করে ডাকতেন 'মহিলা পীর'। মা'র এই ক্ষমতা বাবার মৃত্যুর পরপরই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।*

জোছনার ফুল

আমাদের বাসা ছিল সিলেটের মীরাবাজারে।

সাদা রঙের একতলা দালান। চারদিকে সুপারিগাছের সারি। ভেতরের উঠোনে একটি কুয়া। কুয়ার চারপাশ বাঁধানো। বাড়ির ডানদিকে প্রাচীন কয়েকটা কাঁঠালগাছ। কাঁঠালগাছের পাতায় আলো-আঁধারের খেলা। কুয়ার ভেতর উঁকি মারছে নীল আকাশ। একটু দূরে দুটো আতাফল গাছ। সোনালি রঙের আতাফলে পুরো গাছ সোনালি হয়ে আছে। পাকা আতার লোভে ভিড় করেছে রাজ্যের পাখি। তাদের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেছে কাকদের। কান পাতা দায়। এমন একটা রহস্যময় পরিবেশে আমার শৈশবের শুরু। শুরুটা খুব খারাপ না। তবু শৈশবের কথা মনে হলেই প্রথমে কিছু দুঃখময় স্মৃতি ভিড় করে। কিছুতেই তাদের তাড়াতে পারি না। সেগুলো দিয়েই শুরু করি।

একদিন কী যেন একটা অপরাধ করেছি। কাপ ভেঙে ফেলেছি কিংবা পাশের বাড়ির জানালায় ঢিল মেরেছি। অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে। মা শাস্তির ভার দিলেন আমার মেজো চাচাকে। তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। সিলেটে এম. সি. কলেজে আই. এ. পড়তেন এবং প্রতি বছর ফেল করতেন। মেজো চাচা আমাকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আমাকে একহাতে শূন্যে ঝুলিয়ে কুয়ার মুখে ধরে বললেন, দিলাম ছেড়ে।

---

* 'আমার ছেলেবেলা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর কী মনে করে জানি মা আমেরিকা যেতে রাজি হলেন। ছ'মাস সেখানে কাটিয়ে এসেছেন। কিছুদিন আগে আমাকে বললেন হজ করতে চান।

আমার সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সত্যি যদি ছেড়ে দেন! নিচে গহিন কুয়া। একটা হাত ধরে আমাকে কুয়ার ভেতর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মেজো চাচা মাঝে মাঝে এমন ভঙ্গি করছেন যেন আমাকে সত্যি সত্যি ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আর কোনোদিন করব না। আর কোনোদিন না।

আমার বয়স তখন কত ? পাঁচ কিংবা ছয়। নিতান্তই শিশু। এরকম একটা শিশুকে কুয়ায় ঝুলিয়ে যে-ভয়ঙ্কর মানসিক শাস্তি মেজো চাচা দিলেন তা ভাবলে আমি আজও আতঙ্কে নীল হয়ে যাই। লিখতে লিখতে চোখের সামনে সেই অতলস্পর্শী কুয়া ভেসে উঠছে। বুক ধড়ফড় করা শুরু হয়েছে।

আমার মেজো চাচা কিংবা আমার মা দুজনের কেউই বুঝলেন না একটি শিশুকে এইভাবে মানসিক শাস্তি দেয়া যায় না। এটা অমানবিক। এ-ধরনের শাস্তিতে শিশুর মনোজগতে বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। বরং তাঁরা দুজনই দেখলেন— আমি একটিমাত্র জিনিসকেই ভয় পাই, সেটা কুয়ায় ঝুলিয়ে ধরা। কাজেই বারবার আমাকে এই শাস্তি দেয়া হতে লাগল।

অসম্ভব দুষ্ট ছিলাম। নানানভাবে সবাইকে জ্বালাতন করতাম। শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু এত কঠিন শাস্তি না, যে-শাস্তি চিরকালের মতো আমার মনে ছাপ ফেলে যাবে।

আমাকে এই অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে আমার ছোট বোন শেফু। তাকেও একদিন এই শাস্তি দেয়া হলো। মেজো চাচা তাকে কুয়ার ভেতর ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, দিলাম ছেড়ে।

সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, দেন ছেড়ে।

চাচা বললেন, সত্যি সত্যি ছেড়ে দেব ?

সে থমথমে গলায় বলল, ছাড়েন। আপনাকে ছাড়তে হবে।

শেফুর কথাবার্তায় আমার চাচা এবং মা দুজনই খুব মজা পেলেন। বাবা অফিস থেকে ফেরামাত্র তাঁকে এই ঘটনা বলা হলো। বাবা অবাক হয়ে বললেন, এদের এইভাবে শাস্তি দেয়া হয় ? কই, আমি তো জানি না! কী ভয়ঙ্কর কথা! এই জাতীয় শাস্তির কথা আর যেন কোনোদিন না শুনি।

মা বললেন, এরা বড় যন্ত্রণা করে। তুমি তো বাসায় থাকো না। তুমি জানো না।

বাবা কঠিন গলায় বললেন, এ-ধরনের শাস্তির কথা আর যেন না শুনি।

শাস্তি বন্ধ হলো, কিন্তু মন থেকে স্মৃতি মুছল না। কতদিন পার হয়েছে, অথচ এখনো দুঃস্বপ্নের মতো গহিন কুয়াটার কথা মনে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, আমার এই চাচা শুধু শাস্তিদাতাই ছিলেন না, প্রচুর আদরও তাঁর কাছে পেয়েছি। আমার অক্ষরজ্ঞানও হয়েছে তাঁর কাছে।

কুয়ার হাত থেকে বাঁচলেও মাকড়সার হাত থেকে বাঁচলাম না। মাকড়সার ব্যাপারটি বলি। কোনো এক বিচিত্র এবং জটিল কারণে আমাদের ছ'ভাইবোনেরই

ভয়ঙ্কর মাকড়সাভীতি আছে। নিরীহ ধরনের এই পোকাটিকে দেখামাত্রই আমাদের সবার মনোজগতে একধরনের বিপ্লব ঘটে যায়। আমরা আতঙ্কে ঘৃণায় শিউরে উঠি, বমিভাব হয়, চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মনোবিজ্ঞানীরা এই ভীতির নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা দেবেন। আমার কাছে কোনো ব্যাখা নেই।

মাকড়সাভীতির মাত্রা বোঝানোর জন্যে আমি আমাদের তিন ভাইবোনের তিনটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

আমার ছোট বোন শেফু কলেজে অধ্যাপনা করে। একদিন রিকশা করে ক্লাসে যাচ্ছে, হঠাৎ রিকশা থেকে একটা মাকড়সা তার শাড়িতে উঠে পড়ল। সে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শাড়ি খুলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, মাকড়সা! আমার শাড়িতে মাকড়সা! লোকজন হৃদয়হীন নয়। তারা শাড়ি থেকে মাকড়সা সরিয়ে হাতে শাড়ি তুলে দিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার ছোট ভাই ড. জাফর ইকবালকে নিয়ে। সে শিকাগো বাস-স্টেশনের টয়লেটে গেছে। হঠাৎ লক্ষ করল ইউরিন্যালে সবুজ রঙের একটা বড়সড় মাকড়সা। সে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে বের হয়ে এল। লোকজন দৌড়ে এল, পুলিশ ছুটে এল, সবার ধারণা কোনো খুনটুন হয়ে গেছে।

এবার আমার নিজের কথা বলি। ঢাকা থেকে বরিশাল যাচ্ছি বি এম কলেজে রসায়নশাস্ত্রের এম. এস-সি. পরীক্ষার এক্সটারন্যাল হয়ে। প্রথম শ্রেণীর একটি কেবিন রিজার্ভ করা। রাত দশটার মতো বাজে। হঠাৎ দেখি কেবিনের ছাদে বিশাল এক মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আমি ছিটকে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। দশ টাকা কবুল করে একজন ঝাড়ুদার নিয়ে এলাম। সে অনেক খুঁজেও মাকড়সা পেল না, কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। কেবিনে আর ঢুকলাম না। যদি মাকড়সা আবার কোনো অন্ধকার কোণ থেকে বের হয়ে আসে! প্রচণ্ড শীতের রাত পার করে দিলাম ডেকে হাঁটাহাঁটি করে। যতবার মাকড়সার কথা মনে পড়ল ততবারই শিউরে উঠতে লাগলাম।

এই ভীতি আমরা ভাইবোনেরা জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছি। হয়তো বা আমাদের জিনের ছেচল্লিশটির ক্রমোজমের কোনো-একটিতে কোনো গণ্ডগোল আছে যার কারণে এই অস্বাভাবিক ভীতি।

শৈশবে আমাকে ঘুম-পাড়ানোর জন্যে এই মাকড়সাভীতিও কাজে লাগানো হতো।

অধিকাংশ শিশুর মতো আমারও রাতে ঘুম আসত না। মা বিরক্ত হয়ে মেজো চাচাকে বলতেন, ওকে ঘুম পাড়িয়ে আনো।

মেজো চাচা আমাকে কোলে নিয়ে চলে যেতেন বাড়ির দক্ষিণে কাঁঠালগাছের কাছে। সেই কাঁঠালগাছে বিকটাকার মাকড়সা জাল পেতে চুপচাপ বসে থাকত। আমাকে সেইসব মাকড়সার কাছে নিয়ে গিয়ে বলা হতো— ঘুমাও। না ঘুমালে

মাকড়সা গায়ে দিয়ে দেব। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম। এখন আমার ধারণা, ঘুম না, ভয়ে হয়তোবা অচেতনের মতো হয়ে যেতাম। কেউ তা বুঝতে পারত না। ভাবত ঘুম-পাড়ানোর চমৎকার ওষুধ তাঁদের কাছে আছে।

এখন ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। না বুঝে বয়স্ক মানুষরা নিতান্তই অবোধ একটি শিশুর উপর কী ভয়াবহ নির্যাতনই-না চালিয়েছেন!

আমি ছেলেবেলার কথা লিখব বলে স্থির করার পর আমার সব আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখে জানালাম— আমার ছেলেবেলা সম্পর্কে কেউ যদি কোনোকিছু জানেন আমাকে যেন লিখে জানান। আমার এই আহ্বানের জবাবে ছোট চাচা ময়মনসিংহ থেকে যে-চিঠি লিখলেন তার অংশবিশেষ এইরকম— হুমায়ূন শৈশবে বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। রাত্রিতে কিছুতেই ঘুমাইত না। তখন তাহাকে মাকড়সার কাছে নিয়া গেলে দুই হাতে গলা জড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচেতন হইয়া যাইত। ইহার কী যে কারণ কে জানে।

কুয়া এবং মাকড়সা এ দুটি জিনিস বাদ দিলে আমার শৈশবকে অসাধারণ আনন্দময় সময় বলা যায়। আমার ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। আজকালকার মায়েরা সন্তান চোখের আড়াল হলেই চোখ কপালে তুলে হৈচৈ শুরু করে দেন। আমাদের সময় অবস্থা ভিন্ন ছিল। শিশুদের খোঁজ পড়ত শুধু খাওয়ানোর সময়। তাদের পড়াশোনা নিয়েও বাবা-মা'দের খুব দুশ্চিন্তা ছিল না। একটি শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাতের চটি একটা বই এবং স্লেট-পেনসিল কিনে দিলেই বাবা-মা'রা মনে করতেন অনেক করা হলো। বাকি পড়াশোনা ধীরেসুস্থে হবে, এমন তাড়া কিসের ? ক্লাস ওয়ান-টু'র পরীক্ষাগুলোতে ফার্স্ট হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পাস করে পরের ধাপে উঠতে পারলেই হলো। না পারলেও ক্ষতি নেই, পরের বার উঠবে। স্কুল তো পালিয়ে যাচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটায় একধরনের ঢিলেঢালা ভাব।

এমনিতেই নাচুনি বুড়ি তার উপর ঢাকের বাড়ি। বাবা আদেশ জারি করলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের যেন পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো চাপ না দেয়া হয়। পড়াশোনার জন্যে সারাজীবন তো পড়েই রইল, শিশুকালটা আনন্দে কাটুক। মহানন্দে সময় কাটতে লাগল। শিশুদের আনন্দের উপকরণ চারদিকে ছড়ানো। অতি তুচ্ছ বিষয় থেকেও তারা আনন্দ আহরণ করে। আমিও তা-ই করছি। আমার মা'র কোলে তখন আমার ভাই ইকবাল। মা তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। আমার দিকে তাকানোর সময় নেই। আমি মনের আনন্দে একা একা ঘুরি। যা দেখি তা-ই ভালো লাগে। ক্লান্তিহীন হাঁটা। মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলি। তখন একে-তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, মীরাবাজার কোনদিকে ?

আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতেও বাসায় কাউকে কখনো চিন্তিত হতে দেখিনি। দুপুরে খাবার সময় উপস্থিত থাকলেই হলো। দুপুরের খাবার শেষ হবার পর আরো আনন্দ। মা দিবানিদ্রায়। ঝিম-ধরা দুপুর। আমি রছি নিজের মনের আনন্দে। এই

পর্যায়ে একজন আইসক্রিমওয়ালার সঙ্গে আমার খাতির হয়ে গেল। তখনকার আইসক্রিমওয়ালারা দুহাতে দুটা আইসক্রিমের বাক্স নিয়ে মধুর গলায় ডাকত— দুধমালাই আইসক্রিম, দুধমালাই।

দুরকম আইসক্রিম ছিল। দুপয়সা দামের সাধারণ আর এক আনা দামের অসাধারণ। আইসক্রিম খাবার পরম সৌভাগ্য মাসে দু'একবারের বেশি হতো না। হবার কথাও নয়। যা-ই হোক, এমনি এক ঝিম-ধরা দুপুরে 'চাই দুধমালাই আইসক্রিম' শুনে ছুটে ঘর থেকে বের হলাম। আইসক্রিমওয়ালা বলল, আইসক্রিম কিনবে?

আমি মনের দুঃখ মনে চেপে বললাম, না। পয়সা নাই। আইসক্রিমওয়ালা কিছুক্ষণ কী জানি ভেবে বলল, খাও একটা আইসক্রিম, পয়সা লাগবে না।

আমার তখন বিস্মিত হবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে। কী বলে এই লোক? না চাইতেই দিয়ে দিচ্ছে কোহিনূর হীরা! লোকটি একটা আইসক্রিম বের করে হাতে দিয়ে বলল, আরাম করে খাও। আমি বসে বসে দেখি।

সে উবু হয়ে বসল। আমি অতি দ্রুত আইসক্রিম শেষ করলাম। কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হতে পারে। দেখল না। রোজ এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। ঠিক দুপুরবেলা সমস্ত মীরাবাজারের মায়েরা যখন ঘুমে অচেতন তখন সে আসে। চাপা গলায় ডাকে, এই খোকা, এই!

আমি ছুটে বের হয়ে আসি। সে আইসক্রিম বের করে দেয়। আমি মহানন্দে খাই। খেতে খেতে মনে হয় আমার মানবজন্ম সার্থক হলো। পুরো এক মাস ধরে এই ব্যাপার চলল। তারপর মা কী করে জানি টের পেলেন। তিনি আঁতকে উঠলেন, তাঁর ধারণা এ ছেলেধরা। বাসার সবারই ভয়— আমাকে নিয়ে যাবে। বাবাকে খবর দিলেন। তিনিও চিন্তিত হলেন এবং অফিস বাদ দিয়ে এক দুপুরে বাসায় বসে রইলেন— আইসক্রিমওয়ালাকে ধরতে হবে। বেচারা ধরা পড়ল।

বাবা তাঁর পুলিশি গলায় কঠিন ধমক দিলেন। মেঘস্বরে বললেন, তুমি একে রোজ আইসক্রিম খাওয়াও, কারণটা কী?

এমনি খাওয়াই স্যার, কোনো কারণ নাই।

বিনা কারণে কিছুই হয় না— তুমি কারণ বলো।

আইসক্রিমওয়ালা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবার হাজারো প্রশ্নের জবাব দিল না। বাবা পুরো মাসে ত্রিশটি আইসক্রিম হিসাব করে তাকে দাম দিয়ে দিলেন এবং বললেন, আর কখনো যেন সে না আসে। সে টাকা নিয়ে চলে গেল, কিন্তু পরদিনই আবার এল। একটা দুধমালাই আইসক্রিম বের করে নিচুগলায় বলল, খোকা তুমি খাও। আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি আইসক্রিম বেচা ছেড়ে দেব।

আমি চিন্তিত স্বরে বললাম, কেন?

সে তার জবাব না দিয়ে কোমল গলায় বলল, খোকা, আমার কথা মনে থাকবে?

আমি বললাম, হুঁ থাকবে।

মানুষকে দেয়া বেশির ভাগ কথাই আমি রাখতে পারিনি। কিন্তু হতদরিদ্র আইসক্রিমওয়ালার কথা আমি মনে রেখেছি। এখনো মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি কী জন্যে সে বিনাপয়সায় আমাকে আইসক্রিম খাওয়াত ? আমার বয়েসি কোনো ছেলে কি তার ছিল যে অল্পবয়সে মারা গেছে ? দরিদ্র পিতা তার স্নেহ ঢেলে দিয়েছে অচেনা একটি শিশুকে ? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে ?

রহস্যময় এই পৃথিবীতে কিছু-কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। প্রায় তিরিশ বছর পর আইসক্রিম খাওয়ার ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হলো। তখন শ্যামলীতে থাকি। আইসক্রিমওয়ালা এসেছে। আমার বড় মেয়ে নোভা আমার কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে ছুটে গেল আইসক্রিম কিনতে। আইসক্রিম-হাতে হাসিমুখে ফিরে এসে বলল, আইসক্রিমওয়ালা আমার কাছ থেকে টাকা নেয়নি। বিনা টাকায় আইসক্রিম দিল। বলল, টাকা দিতে হবে না।

আমার স্ত্রী চমকে উঠে বলল, নির্ঘাত ছেলেধরা! তুমি এক্ষুনি নিচে যাও।

আমি নিচে গেলাম না। ছেলেবেলার সেই আইসক্রিমওয়ালার কথা ভেবে বড়ই মন কেমন করতে লাগল।

শীতের শুরুতে আমার আনন্দময় আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা যেতে লাগল। শুনলাম আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পুরোপুরি বাঁদর হয়ে গেছি। প্যান্ট পরা বলে লেজটা দেখা যায় না। প্যান্ট খুলে ফেললে লেজও দেখা যাবে। আমার বাঁদরজীবনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্যই আমাকে নাকি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হবে। আমার প্রথম স্কুলে যাওয়া উপলক্ষে একটা নতুন খাকি প্যান্ট কিনে দেয়া হলো। সেই প্যান্টের কোনো জীপার নেই। সারাক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে। অবশ্যি তা নিয়ে আমি খুব-একটা উদ্বিগ্ন হলাম না। নতুন প্যান্ট পরছি— এই আনন্দেই আমি আত্মহারা।

মেজো চাচা আমাকে কিশোরীমোহন পাঠশালায় ভরতি করিয়ে দিয়ে এলেন এবং হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন চোখে-চোখে রাখতে হবে। বড়ই দুষ্ট।

আমি অতি সুবোধ বালকের মতো ক্লাসে গিয়ে বসলাম। মেঝেতে পাটি পাতা। সেই পাটির উপর বসে পড়াশোনা। ছেলেমেয়ে সবাই পড়ে। মেয়েরা বসে প্রথম দিকে, তাদের পেছনে ছেলেরা। আমি খানিকক্ষণ বিচার-বিবেচনা করে সবচে' রূপবতী বালিকার পাশে ঠেলেঠুলে জায়গা করে বসে পড়লাম। রূপবতী বালিকা অত্যন্ত হৃদয়হীন ভঙ্গিতে তুই তুই করে সিলেটি ভাষায় বলল, এই, তোর প্যান্টের ভেতরের সবকিছু দেখা যায়।

ক্লাসের সবক'টা ছেলেমেয়ে একসঙ্গে হেসে উঠল। মেয়েদের আক্রমণ করা অনুচিত বিবেচনা করে সবচে' উচ্চস্বরে যে-ছেলেটি হেসেছে, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হাতের কনুইয়ের প্রবল আঘাতে রক্তারক্তি ঘটে গেল। দেখা গেল ছেলেটির

সামনের একটি দাঁত ভেঙে গেছে। হেডমাস্টার সাহেব আমাকে কান ধরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দিলেন— এ মহাগুণ্ডা, তোমরা সাবধানে থাকবে। খুব সাবধান। পুলিশের ছেলে গুণ্ডা হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্লাস ওয়ান বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যায়। এই দুই ঘণ্টা আমি কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার সময়টা যে খুব খারাপ কাটল তা নয়। স্কুলের পাশেই আনসার ট্রেনিং ক্যাম্প। তাদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। লেফট রাইট, লেফট রাইট। দেখতে বড়ই ভালো লাগছে। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, বড় হয়ে আনসার হব।

ক্লাসে দ্বিতীয় দিনেও শাস্তি পেতে হলো। মাস্টারসাহেব অকারণেই আমাকে শাস্তি দিলেন। সম্ভবত প্রথম দিনের কারণে আমার উপর রেগে ছিলেন। তিনি মেঘস্বরে বললেন, গাধাটা মেয়েদের সঙ্গে বসে আছে কেন? এই, তুই কান ধরে দাঁড়া।

দ্বিতীয় দিনেও সারাক্ষণ কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, তৃতীয় দিনেও একই শাস্তি। তবে এই শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল। আমি একটা ছেলের স্লেট ভেঙে ফেললাম। ভাঙা স্লেটের টুকরায় তার হাত কেটে গেল। আবার রক্তপাত, আবার কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি।

আমি ভাগ্যকে স্বীকার করে নিলাম। ধরেই নিলাম যে স্কুলের দুঘণ্টা আমাকে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মাস্টারসাহেবেরও ধারণা হলো যে আমাকে কানে ধরে সারাক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে আমি অন্যদের বিরক্ত করার সুযোগ পাব না।

আজকের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি সত্যি আমাকে পাঠশালার প্রথম শ্রেণীটি কান ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটাতে হয়েছে। তবে আমি একা ছিলাম না, বেশির ভাগ সময় আমার সঙ্গী ছিল শংকর।* সে খানিকটা নির্বোধ প্রকৃতির ছিল। ক্লাসে দুইজন শংকর ছিল। আমি যার কথা বলছি তার নাম মাথামোটা শংকর। মোটা বুদ্ধি অর্থে মাথামোটা নয়, আসলেই শরীরের তুলনায় তার মাথা অস্বাভাবিক বড় ছিল। ক্লাস ওয়ানে সে যতখানি লম্বা ছিল, ক্লাস ফাইভে ওঠার পরও সে ততখানি লম্বাই রইল, শুধু মাথাটা বড় হতে শুরু করল।

ক্লাসে শংকর ছাড়া আমার আর-কোনো বন্ধু জুটল না। সে আমার সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে রইল। আমি যেখানে যাই সে আমার সঙ্গে আছে। মারামারিতে সে আমার মতো দক্ষ নয়, তবে মারামারির সময় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আঁ-আঁ ধরনের গরিলার মতো শব্দ করে প্রতিপক্ষের দিকে ছুটে যেত। এতেই অনেকের পিলে চমকে যেত।

শংকরকে নিয়ে শিশুমহলে আমি বেশ ত্রাসের সঞ্চার করে ফেলি।

এই সময় স্কুলে কিছুদিনের জন্যে কয়েকজন ট্রেনিং-স্যার এলেন। ট্রেনিং-স্যার ব্যাপারটা কী আমরা কিছুই জানি না। হেডস্যার শুধু বলে গেছেন, নতুন স্যাররা আমাদের কিছুদিন পড়াবেন। দেখা গেল নতুন স্যাররা বড়ই ভালো। পড়া না

---

* এই শংকর বর্তমানে বাংলাদেশের ছবিতে অভিনয় করে বলে শুনেছি।

পারলেও শাস্তি দেবার বদলে মিষ্টি করে হাসেন। হৈচৈ করলেও ধমকের বদলে করুণ গলায় চুপ করতে বলেন। আমরা মজা পেয়ে আরো হৈচৈ করি। একজন ট্রেনিং-স্যার কেন জানি না সব ছাত্রছাত্রীদের বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে পড়লেন। অদ্ভুত সব প্রশ্ন করেন। আমার যা মনে আসে বলি আর উনি গম্ভীর মুখে বলেন, তোর এত বুদ্ধি হলো কী করে ? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার! তোর ঠিকমতো যত্ন হওয়া দরকার। তোকে নিয়ে কী করা যায় তা-ই ভাবছি। কিছু-একটা করা দরকার।

কিছু করার আগেই স্যারের ট্রেনিংকাল শেষ হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন। তবে কেন জানি কিছুদিন পরপরই আমাকে দেখতে আসেন। গভীর আগ্রহে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে তার খোঁজ নেন। সব বিষয়ে সবচে' কম নম্বর পেয়ে ক্লাস টু'তে ওঠার সংবাদ পাবার পর স্যারের উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। শুধু যে উৎসাহে ভাটা পড়ে তা-ই না, উনি এতই মন-খারাপ করেন যে আমার নিজেরও খারাপ লাগতে থাকে।

ক্লাস টু'তে উঠে আমি আরেকটি অপকর্ম করি। যে-রূপবতী বালিকা আমার হৃদয় হরণ করেছিল, তাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলি। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করি, বড় হয়ে সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছে কি না ? প্রকৃতির কোনো-এক অদ্ভুত নিয়মে রূপবতীরা শুধু যে হৃদয়হীন হয় তা-ই না, খানিকটা হিংস্র স্বভাবেরও হয়। সে আমার প্রস্তাবে খুশি হবার বদলে বাঘিনীর মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খামচি দিয়ে হাতের দুতিন জায়গার চামড়া তুলে ফেলে। স্যারের কাছে নালিশ করে। শাস্তি হিসেবে দুই হাতে দুটি ইট নিয়ে আমাকে নীলডাউন হয়ে বসে থাকতে হয়।

প্রেমিকপুরুষদের প্রেমের কারণে কঠিন শাস্তি ভোগ করা নতুন কোনো ব্যাপার নয়, তবে আমার মতো এত কম বয়সে প্রেমের এমন শাস্তির নজির বোধহয় খুব বেশি নেই।

স্কুল আমার ভালো লাগত না। মাস্টাররা অকারণে কঠিন শাস্তি দিতেন। পাঠশালা ছুটির পর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি যাচ্ছে, এ ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। আমাদের পাঠশালায় প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা। কিন্তু একটা ক্লাস থেকে অন্য ক্লাস আলাদা করা নয়, অর্থাৎ কোথাও কোনো পার্টিশনের ব্যবস্থা নেই। কোনো ক্লাসে একজন শাস্তি পেলে পাঠশালার সবাই তা দেখে বিমলানন্দ ভোগ করত। শিক্ষকরাও যে মমতা নিয়ে পড়াতেন, তাও না। তাঁদের বেশির ভাগ সময় কাটত ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি দেয়ার কলাকৌশল বের করার কাজে। পড়ানোর সময় কোথায় ? আমার পরিষ্কার মনে আছে, একজন শিক্ষক ক্লাস ফোর-এর একজন ছাত্রের দিকে একবার প্রচণ্ড জোরে ডাস্টার ছুড়ে মারেন। ছাত্রটির মাথা ফেটে যায়। অজ্ঞান হয়ে-যাওয়া ছাত্রের মাথায় প্রচুর পানি ঢালাঢালি করে তার জ্ঞান ফেরানো হয়। জ্ঞান ফেরার পর প্রথম যে-প্রশ্নটি তাকে করা হয় তা হচ্ছে, আর এই রকম করবি কোনোদিন ?

স্কুলজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলি।

একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি চারদিকে চাপা উত্তেজনা। পড়াশোনা এবং শাস্তি দুটোই বন্ধ। শিক্ষকদের মুখ হাসিহাসি। আমাদের জানানো হলো, আমেরিকা নামের এক ধনী দেশ আমাদের দরিদ্র দেশের ছেলেমেয়েদের কিছু সাহায্য দিয়েছে। সেই সাহায্য আমাদের দেয়া হবে।

সাহায্য হিসেবে আমরা সবাই এক টিন গুঁড়া দুধ এবং এক টিন মাখন পেলাম। দুই হাতে দুই টিন নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে গেলাম। মা বিস্মিত হয়ে বললেন, সবাইকে দিয়েছে?

আমি বললাম, হুঁ। স্যার বলেছেন, পাকিস্তানের সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দুই টিন করে দিয়েছে। মা অবাক বিস্ময়ে বললেন, একটা দেশ কত ধনী হলে এমন সাহায্য দিতে পারে! মা আমেরিকার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হলেন। আমরা সকালের নাশতায় রুটি-মাখন খেতে শুরু করলাম।

টিন দুটি শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় দফায় আবার পাওয়া গেল। এবং জানা গেল প্রতি মাসে দুবার করে দেয়া হবে। স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের ঘর দুধ এবং মাখনের টিনে ভরতি হয়ে গেল। মা'র মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হলো। আমেরিকা নামের সোনার দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে তিনি সম্ভবত শোকরানা নামাজও আদায় করলেন।

যদিও হেডস্যারের ঘর ভরতি ছিল দুধ এবং মাখনের টিনে, আমরা আর পেলাম না। হেডমাস্টার সাহেব ঠিক করলেন, ছাত্রদের স্কুলেই দুধ বানিয়ে খাওয়ানো হবে। দুধ বানানোর আনুষঙ্গিক খরচ আছে। চুলা কিনতে হবে, ছাত্রদের জন্যে মগ কিনতে হবে, জ্বালানির খরচ আছে। এইসব খরচ মেটানো হবে মাখনের টিন বিক্রি করে।

দুই-তিনদিন তা-ই হলো। বিশাল কড়াইয়ে দুধ জ্বাল দেয়া হলো। অতি অখাদ্য সেই দুধ জোর করে আমাদের খাওয়ানো হলো। শারীরিক শাস্তির চেয়েও সেই শাস্তি ভয়াবহ ছিল। আমরা প্রতিটি ছাত্রছাত্রী মনেপ্রাণে প্রার্থনা করলাম, আল্লাহ, তুমি আমাদের এই দুধের হাত থেকে বাঁচাও।

আল্লাহ শিশুদের প্রার্থনা শুনলেন। শাস্তি বন্ধ হলো। দুধ খাওয়ানো শেষ হলো। আমাদের শিক্ষকরা সবাই রিকশা ভরতি করে দুধ ও মাখনের টিন বাড়ি নিয়ে গেলেন। আমার বয়স তখন খুবই কম। এই বয়সে দুর্নীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা হবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরাই সেই ধারণা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। আমার জীবনে শিক্ষকেরা এসেছেন দুষ্টগ্রহের মতো। আমি সারাজীবনে অনেক কিছু হতে চেয়েছি— আইসক্রিমওয়ালা, জুতা পালিশওয়ালা থেকে ডাক্তার, ব্যারিস্টার— কিন্তু কখনো শিক্ষক হতে চাইনি। চাইনি বলেই বোধহয় এখন জীবন কাটাচ্ছি শিক্ষকতায়।

থ্রি থেকে ফোরে উঠব।

বার্ষিক পরীক্ষা এসে গেছে। বাড়িতে বাড়িতে পড়াশোনার ধুম। আমি নির্বিকার। বই নিয়ে বসতে ভালো লাগে না, যদিও পড়তে বসতে হয়। সেই বসাটা পুরোপুরিই ভান। সবাই দেখল, আমি বই নিয়ে বসে আছি, এই পর্যন্তই। তখন প্রতি সন্ধ্যায় সিলেট শহরে মজাদার ব্যাপার হতো— তার নাম 'লেমটন লেচকার'। কথাটা বোধহয় 'লণ্ঠন লেকচার'-এর বিকৃত রূপ। ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে জায়গায় জায়গায় সিনেমা দেখানো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ম্যালেরিয়া এইসব ভালো ভালো জিনিস। আমাদের কাজের ছেলে রফিক খোঁজ নিয়ে আসে আজ কোথায় লেমটন লেকচার হচ্ছে— মুহূর্তে আমরা দুজন হাওয়া। রফিক তখন আমার বন্ধুস্থানীয়। তার কাছ থেকে বিড়ি খাওয়ার উপর কোর্স নিচ্ছি। বিড়ি খেলে কচি পেয়ারা পাতা চিবিয়ে মুখের গন্ধ নষ্ট করতে হয় এসব গুহ্যবিদ্যা শিখে নিচ্ছি। এই জাতীয় শিক্ষায় আমার আগ্রহের কোনো অভাব দেখা যাচ্ছে না।

লেমটন লেকচারের ভূত আমার ঘাড় থেকে নামানোর অনেক চেষ্টা করা হলো। নামানো গেল না। মা হাল ছেড়ে দিলেন। এখন আর সন্ধ্যা হলে পড়তে বসতেও বলেন না। আমি মোটামুটি সুখে আছি বলা চলে।

এমন এক সুখের সময়ে মাথামোটা শংকর খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, তার মা তাকে বলেছেন সে যদি ক্লাস থ্রি থেকে পাস করে ফোর-এ উঠতে পারে তা হলে তাকে ফুটবল কিনে দেবেন।

সে আমার কাছে এসেছে সাহায্যের জন্য, কী করে এক ধাক্কায় পরের ক্লাসে ওঠা যায়। একটা চামড়ার ফুটবলের আমাদের খুবই শখ। সেই ফুটবল এখন মনে হচ্ছে খুব দূরের ব্যাপার নয়। সেইদিনই পরম উৎসাহে শংকরকে পড়াতে বসলাম। যে-করেই হোক তাকে পাস করাতে হবে। দুজন একই ক্লাসে পড়ি। এখন সে ছাত্র, আমি শিক্ষক। ওকে পড়ানোর জন্যে নিজেকে প্রথম পড়তে হয়, বুঝতে হয়। যা পড়াই কিছুই শংকরের মাথায় ঢোকে না। মনে হয় তার দুই কানে রিফ্লেক্টর লাগানো। যা বলা হয় সেই রিফ্লেক্টরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, ভেতরে ঢুকতে পারে না। যাই-হোক, প্রাণপণ পরিশ্রমে ছাত্র তৈরি হলো। দুজন পরীক্ষা দিলাম। ফল বের হলে দেখা গেল, আমার ছাত্র ফেল করেছে এবং আমি স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের স্তম্ভিত করে প্রথম হয়ে গেছি। ফুটবল পাওয়া যাবে না এই দুঃখে রিপোর্ট কার্ড হাতে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরলাম।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা বাবাকে খুব মুগ্ধ করল। বাসায় যে-ই আসে বলেন, আমার এই ছেলের কাণ্ড শুনুন। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরেছে। কারণ হলো...

এই ঘটনার আরেকটি সুফল হলো বাবা মা'কে ডেকে বলে দিলেন— কাজলকে পড়াশোনা নিয়ে কখনো কিছু বলার দরকার নেই। ও ইচ্ছা হলে পড়বে, ইচ্ছা না হলে না। তাকে নিজের মতো থাকতে দাও।

আমি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম।

এই আনন্দের চেয়েও বড় আনন্দ, বিশেষ বিবেচনায় মাথামোটা শংকরকে প্রমোশন দিয়ে দেয়া হলো। তার মা সেই খুশিতে তাকে একটা একনম্বরি ফুটবল এবং পাম্পার কিনে দিলেন।

গ্রীন বয়েজ ফুটবল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হলো। আমি ক্লাবের প্রধান এবং শংকর আমার অ্যাসিসটেন্ট। আমাদের বাসার কাজের ছেলে রফিক আমাদের ফুলব্যাক। অসাধারণ খেলোয়াড়।

নানার বাড়ি দাদার বাড়ি

একদিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে দেখি— মা'কে আজ অন্যরকম লাগছে। তাঁর চেহারায় খুকি-খুকি ভাব চলে এসেছে। কথা বলছেন অনেকটা সুরেলা গলায়। ব্যাপারটা কী ?

অসাধারণ ব্যাপার একটা ঘটেছে— আমরা নানার বাড়ি এবং দাদার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। আমার শৈশবের সবচে' আনন্দময় সময় হচ্ছে এই দুজায়গায় বেড়াতে যাওয়া। প্রতি দুবছর পরপর একবার তা ঘটত। আমার মনে হতো, এত আনন্দ এত উত্তেজনা সহ্য করতে পারব না। অজ্ঞান হয়ে যাব। আমরা ছুটিতে যাচ্ছি। ছুটিতে যাচ্ছি। ছুটিতে যাচ্ছি।

ছুটি!

সিলেট মেলে রাতে চড়ব। গভীর রাতে সেই ট্রেন ভৈরবের ব্রিজে উঠবে। আমরা যদি ঘুমিয়ে পড়ি আমাদের ডেকে তোলা হবে। গভীর বিস্ময়ে দেখব ভৈরবের ব্রিজ। ভোরবেলায় ট্রেন পৌঁছবে গৌরীপুর জংশন। ঘুম ভাঙবে চাওয়ালাদের অদ্ভুত গলা 'চা-গ্রাম চা-গ্রাম' শব্দে। মিষ্টিলুচি দিয়ে সকালের নাশতা। চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা গৌরীপুর জংশনে যাত্রাবিরতি। কী আনন্দ! কী আনন্দ! স্টেশনের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ঘুরে বেড়াও। ওভারব্রিজে উঠে তাকিয়ে দ্যাখো পিপীলিকার সারির মতো ট্রেনের সারি। দূরের দিগন্তে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। সেই ক্ষেতে নেমেছে সাদা বকের দল। তারা উড়ে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। আরো অনেক দূরে মেঘের কোলে নীলরঙা গারো পাহাড়। এগুলো কি এই পৃথিবীর দৃশ্য ? না, এই পৃথিবীর দৃশ্য নয়— ধুলোমাটির এই পৃথিবী এত সুন্দর হতে পারে ?

নানার বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে নিশুতিরাত। কিন্তু স্টেশন গমগম করছে। নানার বাড়ির এবং তাদের আশেপাশের বাড়ির সব পুরুষ চলে এসেছেন। মহিলারাও এসেছেন। তাঁরা স্টেশনে ঢোকেননি, একটু দূরে হিন্দুবাড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

দরজা দিয়ে নামার সুযোগ নেই। তার আগেই আমাকে কেউ হাত বাড়িয়ে জানালা দিয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন। একজনের কোল থেকে আরেকজনের কোলে ঘুরছি। মা খুশিতে ক্রমাগত কাঁদছেন। আহা কী আনন্দময় দৃশ্য!

দুটি হ্যাজাকবাতিতে রাস্তা আলো করে আমরা রওনা হলাম। দুপাশে অন্ধকার-করা গাছপালায় রাজ্যের জোনাকি জ্বলছে, নিভছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে কালীবাড়ি। মা কালী জিভ বের করে শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নানার বাড়ি পৌঁছতে তা হলে দেরি নেই। অসংখ্য শিয়াল একসঙ্গে ডাকছে— রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হলো বোধহয়।

একবার বলেছি, আবার বলি, আমার জীবনের সবচে' আনন্দময় সময় কেটেছে নানার বাড়িতে। বাড়িটার তিনটা ভাগ— মূল বসতবাড়ি, মাঝের ঘর, বাংলাঘর।

বাংলাঘরের সামনে প্রকাণ্ড খাল। বর্ষায় সেই খাল কানায়-কানায় ভরা থাকে। ঘাটে বাঁধা থাকে নৌকা। কাউকে বললেই নৌকা নিয়ে খানিকটা ঘুরিয়ে আনে।

মূল বাড়ির পেছনে ঘন জঙ্গল। এমনই ঘন যে গাছের পাতা ভেদ করে আলো আসে না। সেই জঙ্গলের ভেতর 'সার দেয়াল'। সার দেয়াল হলো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নানাদের শক্তিমান পূর্বপুরুষদের কবরস্থান। জঙ্গলে কত বিচিত্র ফলের গাছ— লটকান, ডেউয়া, কামরাঙা...।

চারপাশে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। আমাদের মন-ভুলানোর জন্যে সবার সে কী চেষ্টা! আমার এক মামা (নজরুল মামা) কোত্থেকে ভাড়া করে ধোপাদের এক গাধা নিয়ে এলেন। গাধা যে আসলেই গাধা সেটা বোঝা গেল— সাত চড়ে রা নেই। পিঠে চড়ে বসো, পিঠ থেকে নামো— কিছু বলবে না। শুধু পেছনের দিকে যাওয়া নিষেধ। হঠাৎ লাথি বসাতে পারে।

বাচ্চাদের আনন্দ দেয়ার জন্যে ঘুড়ি উড়ানো হবে। সেই ঘুড়ি নৌকার পালের চেয়েও বড়। একবার আকাশে উঠলে প্লেনের মতো আওয়াজ হতে থাকে। ঘুড়ি বেঁধে রাখতে হয় গাছের সঙ্গে, নয়তো উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা লাটিম খেলা। প্রকাণ্ড এক লাটিম। লাটিম ঘোরানোর জন্যে লোক লাগে দুজন। লাটিম ঘুরতে থাকে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজে। আওয়াজে কানে তালা ধরে যায়।

একটু রাত বাড়লে ফাডার টাক্কর (পাঁঠার টক্কর)। দুটি হিংস্র ধরনের বাঁকা শিংয়ের পাঁঠার মধ্যে যুদ্ধ। দুপ্রান্ত থেকে এরা ঘাড় বাঁকিয়ে ছুটে আসবে। প্রচণ্ড শব্দে একজনের শিং-এ অন্যজন আঘাত করবে। আগুনের ফুলকি বের হবে শিং থেকে। শুরু হবে মরণপণ যুদ্ধ, ভয়াবহ দৃশ্য।

মামাদের কেউ গভীর রাতে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলবেন। তারা 'আউল্লা'

দিতে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাব কি না। ব্যাপারটা হলো আলো দিয়ে মাছ মারা। অল্প পানিতে হ্যাজাকের তীব্র আলো ফেলা হয়। সেই আলোয় দেখা যায় শিং, মাগুর শুয়ে আছে। আলোতে এদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়— নড়তেচড়তে পারে না। তখন খোর দিয়ে তাদের গেঁথে ফেলা হয়।

খুব ভোরে নানাজানের সঙ্গে ভ্রমণ। নানাজানের হাতে দুনলা বন্দুক। তিনি যাচ্ছেন বিলের দিকে, আমরা পেছনে পেছনে আছি। ছররা গুলিতে তিন-চারটা বক একসঙ্গে মারা পড়ল। মৃত পাখিদের ঝুলিয়ে আমরা এগুচ্ছি— নাকে আসছে মাটির গন্ধ, মৃত পাখিদের রক্তের গন্ধ, বারুদের গন্ধ।

সারাদিন পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি, নিশুতিরাতে ঘুম ভেঙে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনা— এই আনন্দের যেমন শুরু নেই, তেমনি শেষও নেই। ছোটদের শোবার ব্যবস্থা মাঝের ঘরে। ঢালাও বিছানা। বিছানার একপ্রান্তে মা বসে আছেন, পরিচিতজনরা আসছে। গল্প হচ্ছে, পান খাওয়া হচ্ছে, রাত বাড়ছে। কী চমৎকার সব রাত!

নানার বাড়ি ঘিরে আমার অদ্ভুত সব স্মৃতি। মাঝে মাঝে স্বপ্নদৃশ্যের মতো এরা উঠে আসে। জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারি না। কয়েকটি স্মৃতি উল্লেখ করছি :

ক) সাপে-কাটা রুগীকে ওঝা চিকিৎসা করছে— এই দৃশ্য নানার বাড়িতেই প্রথম দেখি। রুগী জলচৌকিতে বসে আসে, ওঝা মন্ত্র পড়তে পড়তে হাত ঘোরাচ্ছে। সেই ঘুরন্ত হাত অতি দ্রুত নেমে আসছে রুগীর গায়ে। চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে কাঁইক্যা মাছের কাঁটা দিয়ে রুগীর পা থেকে দূষিত রক্ত বের করা হচ্ছে।

খ) মেঘের ডাক শুনে ঝাঁক বেঁধে কইমাছ পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করছে শুকনো দিয়ে কোনো-এক গন্তব্যে যেতে। কেন তারা বর্ষার প্রথম মেঘগর্জনে এমন পাগল হয়, কে বলবে!

গ) ভূতে-পাওয়া রুগীর চিকিৎসা করতেও দেখলাম। ভূতের ওঝা এসে রুগীর সামনে ঘর কেটে সেই ঘরে সরিষা ছুড়ে ছুড়ে মারছে। রুগী যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলছে— আর মারিস না। আর মারিস না।

ঘ) এক হিন্দুবাড়িতে নপুংসক শিশুর জন্ম হলো। কোত্থেকে খবর পেয়ে একদল হিজড়া উপস্থিত। শুরু হলো নাচানাচি। নাচানাচির এক পর্যায়ে এরা গা থেকে সব কাপড় খুলে ফেলল। ঝুড়ি ভরতি করে ডিম নিয়ে এসেছিল, সেইসব ডিম ছুড়ে মারতে লাগল বাড়িতে। একসময় শিশুটি তাদেরকে দিয়ে দেয়া হলো। মহানন্দে তারা চলে যাচ্ছে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে শিশুটির মা। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় এমন একটি দৃশ্য। আমার নিজের চোখে দেখা।

ঙ) এক সন্ধ্যায় নানার বাড়িতে ঢিল পড়তে লাগল। ছোট ছোট ঢিল নয়— ক্ষেত থেকে উঠিয়ে আনা বিশাল মাটির চাঙড়। নানিজান বললেন, কয়েকটা দুষ্ট জিন আছে। মাঝে মাঝে এরা উপদ্রব করে। তবে ভয়ের কিছু নাই, এইসব ঢিল কখনো

গায়ে লাগে না।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করবার জন্যে উঠোনে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করলাম। আশেপাশে ঢিল পড়ছে, গায়ে পড়ছে না— বেশ মজার ব্যাপার।

নিশ্চয় এর লৌকিক কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা থাকলেও আমার জানা নেই। জানতেও চাই না। নানার বাড়ির অনেক রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে এটিও থাকুক। সব রহস্য ভেদ করে ফেলার প্রয়োজনই-বা কী?

এবার দাদার বাড়ি সম্পর্কে বলি।

দাদার বাড়ির এক বিশেষ পরিচিতি ঐ অঞ্চলে ছিল এবং খুব সম্ভব এখনো আছে— 'মৌলবিবাড়ি'। এই বাড়ির নিয়মকানুন অন্যসব বাড়ি থেকে শুধু যে আলাদা তা-ই না— ভীষণ রকম আলাদা। মৌলবিবাড়ির মেয়েদের কেউ কোনোদিন দেখেনি, তাদের গলার স্বর পর্যন্ত শোনেনি। এই বাড়িতে গানবাজনা নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, ভেতরের বাড়িতেও বড় বড় পর্দা। একই বাড়িতে পুরুষদেরও মেয়েদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে হতো। ভাবের আদানপ্রদান হতো ইশারায় কিংবা হাততালিতে। যেমন, পর্দার এপাশ থেকে দাদাজান একবার হাততালি দিলেন, তার মানে তিনি পানি চান। দুবার হাততালি— পান-সুপারি। তিনবার হাততালি— মেয়েদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, আরো নিঃশব্দ হতে হবে।

আমাদের হলো পিরবংশ। দাদার বাবা জাঙ্গির মুনশি ছিলেন এই অঞ্চলের নামি পিরসাহেব। তাঁকে নিয়ে প্রচলিত অনেক গল্পগাথার একটি গল্প বলি : জাঙ্গির মুনশি তাঁর মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। সেই আমলে যানবাহন ছিল না। দশ মাইল পথ হেঁটে যেতে হলো। দুপুরে পৌঁছলেন। মেয়ের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে ফেরার পথে বললেন, মা, আমার পাঞ্জাবির একটা বোতাম খুলে গেছে। তুমি সুই-সুতা দিয়ে একটা বোতাম লাগিয়ে দাও। বোতাম ঘরে আছে তো?

মেয়ে বোতাম লাগিয়ে দিল। তিনি দশ মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে পা দেয়ামাত্র মনে হলো, বিরাট ভুল হয়েছে। তাঁর কন্যা যে বোতাম লাগাল সে কি স্বামীর অনুমতি নিয়েছে? স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর সংসারের জিনিস ব্যবহার করা তো ঠিক না। তিনি আবার রওনা হলেন, অনুমতি নিয়ে আসা যাক। আবার কুড়ি মাইল হাঁটা।

অমি নিজে অবিশ্যি এই গল্প অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি। আমার ধারণা, মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এসে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আবার মেয়েকে দেখার ইচ্ছা হলো। একটা অজুহাত তৈরি করে রওনা হলেন।

দাদার বাড়ির কঠিন সব অনুশাসনের নমুনা হিসেবে একটা গল্প বলি। আমার ফুফুরা খুব সুন্দরী। পির পরিবারের বংশধররা সচরাচর রূপবান হয়। তাঁরাও ব্যতিক্রম নন। দুজন ফুফুই পরীর মতো। বড় ফুফুর বিয়ের বয়স হলে বাবা তাঁর জন্যে একজন

ছেলে পছন্দ করলেন। ছেলে বাবার বন্ধু। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। ছেলেও অত্যন্ত রূপবান। বাবা তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে করে গ্রামের বাড়িতে এলেন। দাদাজানের ছেলে পছন্দ হলো। মেয়ে দেখানো হলো। কারণ ধর্মে নাকি বিধান আছে, বিয়ের আগে ছেলে মেয়েকে এবং মেয়ে ছেলেকে অন্তত একবার দেখতে পারবে। ছেলে মেয়ে দেখে মুগ্ধ। সেই রাতের কথা,— বাবা তাঁর বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছেন। খোলা প্রান্তরে বাবার বন্ধু গান ধরল। রবীন্দ্রনাথের গান তখন শিক্ষিতমহলে গাওয়া শুরু হয়েছে।

গানটি হলো— 'আজি এ বসন্তে.....'

গান গাওয়ার খবর দাদাজানের কানে পৌঁছল। তিনি বাবাকে ডেকে নিয়ে বললেন, এই ছেলে যে গান জানে তা তো তুমি বলো নাই।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, সে গান জানে।

এইখানে মেয়ে বিয়ে দিব না। তুমি জেনেশুনে গান-জানা ছেলে এ-বাড়িতে আনলে কেন ?

গান গাওয়া ক্ষতি কী ?

লাভ-ক্ষতির ব্যাপার না! আমরা কয়েক পুরুষ ধরে যে-নিয়ম মানছি আমার জীবিত অবস্থায় তার কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তুমি যদি রাগ করো আমার কিছুই বলার নাই। রাগ করে বাড়িতে আসা বন্ধ করলেও করতে পারো।

দাদাজান তাঁর মেয়েকে নিজে দেখেশুনে পৃথিবী থেকে দূরে সরে থাকা একটি পরিবারে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

আমরা যখন দাদার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, খবর পেয়ে বড় ফুফু আসতেন পালকি করে। পালকি অনেক দূরে অপেক্ষা করত। ফুফুর স্বামী খোঁজ নিতে আসতেন— আমরা যে এসেছি আমাদের সঙ্গে কলের গান আছে কি না। যদি জানতেন কলের গান আছে— সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যেতেন।

ধীরে ধীরে দাদার বাড়ির মানসিকতার পরিবর্তন হয়। যে-গান এই বাড়িতে নিষিদ্ধ ছিল সেই গানও চালু হয়। দাদার নির্দেশেই হয়। আমার ছোট বোন শেফুর গলায়— 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' গান শোনার পর দাদাজান নির্দেশ দেন— গান চলতে পারে।

দাদার বাড়ি প্রসঙ্গে অদ্ভুত একটা কথা বলি। দাদার বাবা জাঙ্গির মুনশির ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল। দাদাজানেরও ইচ্ছামৃত্যু হয়। মৃত্যুর সাতদিন আগে সবাইকে ডেকে তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় বলেন, কেউ মনে কোনো আফসোস রাখবে না। মন শান্ত করো। আমাকে কেউ যদি বিশেষ কোনো সেবাযত্ন করতে চাও করতে পারো।

দাদাজানের বলা সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয় সজ্ঞানে। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে আমার ছোট চাচাকে ডেকে বলেন, আমি তা হলে যাই।

পৃথিবী বড়ই রহস্যময়।

দাদাজানদের বাড়িঘর অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, গোছানো। মানুষগুলো হৈচৈ করে কম, কাজ করে বেশি। দাদার বাড়িতে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল না। দাদাজান আমাদের চোখে-চোখে রাখতেন। আদব-কায়দা, ভদ্রতা শেখাতেন। সন্ধ্যাবেলা নামাজ শেষ করেই গল্প করতে বসতেন। সবই ঈশপের গল্পের মতো। গল্পের শেষে একটা মোরাল থাকত। মোরাল আছে এমন গল্প ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু দাদাজানের গল্প ভালো লাগত। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

নানার বাড়ি থেকে দাদার বাড়িতে এলে শুরুতে খানিকটা দমবন্ধ দমবন্ধ লাগত। তবে দাদার বাড়িরও আলাদা মজা ছিল। বাড়ির বাংলাঘরে দুটি কাঠের আলমিরায় ছিল অসংখ্য বই। আসলে এই দুটি আলমিরা নিয়েই একটা পাবলিক লাইব্রেরি। আজিমুদ্দিন আহমেদ পাবলিক লাইব্রেরি। আজিমুদ্দিন আহমেদ আমার দাদার নাম। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে বাবা এই লাইব্রেরি করেন। লাইব্রেরির চাঁদা মাসে এক আনা। এই লাইব্রেরি থেকে কেউ কোনোদিন বই নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমরা দাদার বাড়িতে উপস্থিত হলেই শুধু চাবি খুলে বই বের করা হতো। চাবি চলে আসত আমার হাতে। দাদার বাড়িতে পুকুরপাড়ে বটগাছের মতো বিশাল এক কামরাঙা গাছ ছিল। সেই কামরাঙা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বই পড়ার আনন্দের কোনো তুলনা হয় না।

বাবা জায়গায় জায়গায় লোক পাঠিয়ে গ্রাম্য গায়কদের আনতেন। তাঁরা তাঁদের বাদ্যযন্ত্র-হাতে উপস্থিত হতেন— রোগাভোগা, অনাহারক্লিষ্ট মানুষ, কিন্তু তাঁদের চোখ বড়ই স্বপ্নময়।

দাদার বাড়িতে গানবাজনা হবার কোনো উপায় নেই। অনেকটা দূরে বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে উঠোনে গানের আসর বসত। হাত উঁচু করে যখন গাতক ঢেউ-খেলানো সুরে, মাথার লম্বা বাবড়ি ঝাঁকিয়ে গানে টান দিতেন—

'আমার মনে বড় দুষ্ক
বড় দুষ্ক আমার মনে গো।'

তখন তাঁর মনের 'দুষ্ক' ছড়িয়ে যেত শ্রোতাদের মনে। চোখ ভরে জল আসত। গান চলত গভীর রাত পর্যন্ত। রাত যত গভীর হতো গানে ততই আধ্যাত্মিক ভাব প্রাধান্য পেতে থাকত। শেষের দিকে সেগুলো আর গান থাকত না— হয়ে উঠত প্রার্থনা-সঙ্গীত। আমরা ছোটরা অবিশ্যি তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাদের কোলে করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে কোনো-এক অদ্ভুত উপায়ে গান শুনতে পাচ্ছি।

পারুল আপা

স্কুল আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। স্কুলের বাইরের জীবনটা ছিল আনন্দময়। সেই আনন্দের মাঝখানে দুঃস্বপ্নের মতোই উদয় হলেন পারুল আপা। লম্বা বিষাদময় চেহারার একটি মেয়ে। চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড়। থাকেন আমাদের একটি বাসার পরের বাসায়।

তাঁর বাবা ওভারশিয়ার। রোগা একজন মানুষ। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন। চিকন গলায় কথা বলেন। নিজের মেয়েদের অকারণে হিংস্র ভঙ্গিতে মারেন। সেই মার ভয়াবহ মার। যে-কোনো অপরাধে পারুল আপাদের দুবার শাস্তি হয়। প্রথমে বাবার হাতে, পরেরবার মায়ের হাতে। শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা ধারণা দিই। পারুল আপা একবার একটা প্লেট ভেঙে ফেললেন। সেই প্লেট ভাঙার শাস্তি হলো, চুলের মুঠি ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা। পারুল আপা পরিবারের সবচেয়ে বড় মেয়ে। তাঁরা অনেকগুলো বোন, কোনো ভাই নেই। নিয়ম করে প্রতিবছর পারুল আপাদের একটি করে বোন হয়। তাঁর বাবা-মা দুজনেরই মুখ অন্ধকার হয়ে যায়।

যে-সময়ের কথা বলছি তখন পারুল আপার বয়স বারো-তেরো, বয়ঃসন্ধিকাল। বাবা-মা'র অত্যাচারে বেচারি জর্জরিত। তাঁর মা তাঁকে ডাকেন হাবা নামে। অথচ তিনি মোটেই হাবা ছিলেন না। তাঁর অসম্ভব বুদ্ধি ছিল। হৃদয় ছিল আবেগ ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। কোনো-এক বিচিত্র কারণে তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও ভালোবাসা আমার উপর উজাড় করে দিলেন। যে-ভালোবাসা না চাইতেই পাওয়া যায়, তার প্রতি কোনো মোহ থাকে না। পারুল আপার ভালোবাসা আমার অসহ্য বোধ হতো। অসহ্য বোধ হবার আরো একটি কারণ ছিল। তাঁর চেহারা তেমন ভালো ছিল না। আমার চরিত্রের বড় রকমের দুর্বল দিকের একটি হচ্ছে, মেয়েদের দৈহিক রূপের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ। যে দেখতে ভালো না, সে হাজারো ভালো হলেও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রূপবতীদের বেলায় আমি অন্ধ। তাদের কোনো ত্রুটি আমার চোখে পড়ে না। তাদের দৈহিক সৌন্দর্যই আমার সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বলতে ইচ্ছে করে, আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

থাক সে কথা, পারুল আপার কথা বলি। তিনি ভালোবাসার কঠিন শিকলে আমাকে বাঁধতে চাইলেন। আমাকে ভুলানোর জন্যে তাঁর সে কী চেষ্টা! বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে আমাকে দিতেন। স্কুলের টিফিনের জন্যে তাঁকে সামান্য পয়সা দেয়া হতো। তিনি না খেয়ে সেই পয়সা জমিয়ে রাখতেন আমার জন্যে। এর প্রতিদানে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে স্কুলে যেতে হতো। সেটা অতি বিরক্তিকর ব্যাপার। তিনি ক্লাস করছেন, আমি বেজার মুখে তাঁর পাশে বসে। তিনি একটা হাতে আমার গলা জড়িয়ে আছেন।

সে-সময় অধিকাংশ মেয়েই ছোট ভাইদের স্কুলে নিয়ে আসত। ছোট ভাইরা অনেক সময় অভিভাবকের মতো কাজ করত। বাবা-মা'রা নিশ্চিন্ত থাকতেন মেয়ের সঙ্গে পুরুষ-প্রতিভূ একজন-কেউ আছে। পারুল আপার সঙ্গে স্কুলে গিয়ে একবার বিরাট সমস্যায় পড়লাম। স্কুল কম্পাউন্ডের ভেতর একজন পাগল ঢুকে গেছে। মেয়েমহলে আতঙ্ক, ছোটাছুটি। আমি পারুল আপার নজর এড়িয়ে পাগল দেখতে গেলাম। কী আশ্চর্য, পাগল আমার চেনা! শুধু চেনা নয়, খুবই চেনা। উনি হচ্ছেন সুরসাগর প্রাণেশ দাস, বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। প্রায়ই বাসায় আসেন। তখন গানের জলসা বসে। আমাদের বাসায় হারমোনিয়াম নেই, আমরা ছুটে গিয়ে লায়লা আপাদের বাসা থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি গানবাজনা করেন। গায়ক প্রাণেশ দাস, শ্রোতা আমার বাবা। এইসব ওস্তাদি ধরনের গান আমাদের ভালো লাগে না, শুধু বাবা একাই আহা আহা করেন।

প্রাণেশ কাকু পাগল হয়ে গেছেন আমার জানা ছিল না। এখন অবাক হয়ে দেখি তিনি বিচিত্র ভঙ্গি করে মেয়েদের দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছেন। মেয়েরা দিগ্বিদিক— জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। একে অন্যের উপর গড়িয়ে পড়ছে। আমি অসীম সাহসী। এগিয়ে গেলাম পাগলের দিকে। প্রাণেশ কাকু আমাকে চিনতে পারলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, কী রে বাবু, ভালো ?

আমি বললাম, জি ভালো। আপনি এরকম করছেন কেন ?

প্রাণেশ কাকু লজ্জিত গলায় বললেন, মেয়েগুলোকে ভয় দেখাচ্ছি।

ভয় দেখাচ্ছেন কেন ?

মেয়েগুলো বড় বজ্জাত। তোর বাবা ভালো আছেন ?

জি।

হারমোনিয়াম কিনতে বলেছিলাম, কিনেছে ?

জি না।

শ'খানেক টাকা হলে সিঙ্গেল রীড হারমোনিয়াম পাওয়া যায়। কিনে ফেললে হয়। রোজ-রোজ অন্যের বাসা থেকে আনা— তুই তোর বাবাকে বলবি।

জি আচ্ছা।

আর আমার মাথা যে খারাপ হয়ে গেছে এই খবরটাও দিস। বাড়িতে বেঁধে রাখে। তুই এখানে চুপচাপ দাঁড়া, আমি মেয়েগুলোকে আরেকটু ভয় দেখিয়ে আসি। তারপর তোকে নিয়ে তোদের বাসায় যাব।

জি আচ্ছা।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রাণেশ কাকু আরো কয়েকবার প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে ফিরে এসে আমার হাত ধরে গেটের দিকে রওনা হলেন। আর তখনই হাতে লম্বা একটা লাঠি নিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন পারুল আপা। তাঁর মূর্তি প্রাণসংহারক। তিনি তীব্র গলায় বললেন, একে ছাড়েন। একে না ছাড়লে লাঠি দিয়ে

এক বাড়িতে আপনার মাথা ফাটিয়ে দেব। ছাড়েন বলছি! পাগলের সিক্সথ সেন্স খুব ডেভেলপ্‌ড্ হয় বলে আমার ধারণা। প্রাণেশ কাকু সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, আমার হাত না ছাড়লে এই মেয়ে সত্যি সত্যি তার ছোট শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করবে। তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। পারুল আপা ছুটে এসে ছোঁ মেরে আমাকে কোলে করে নিয়ে গেলেন। এত প্রবল উত্তেজনা সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না— পারুল আপা হাত-পা এলিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পারুল আপা ছিলেন যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়ে আমার জ্ঞানদাত্রী। পুরুষ এবং রমণীর ভেতর ব্যাহ্যিক সম্পর্ক ছাড়াও যে অন্য একধরনের সম্পর্ক আছে তা প্রথম জানলাম তাঁর কাছে। তখন আমার বয়স আট। ক্লাস থ্রিতে উঠেছি। জটিল সম্পর্কের বিষয় জানার জন্যে বয়সটা খুবই অল্প। খুবই হকচকিয়ে গেলাম— এসব কী বলছে পারুল আপা! কী অদ্ভুত কথা!

পারুল আপার কথা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ দেখলাম না। কিন্তু উনিই-বা বানিয়ে বানিয়ে এমন অদ্ভুত কথা বলবেন কেন ?

নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা ব্যাখ্যা করার পেছনে পারুল আপার একটা কারণ ছিল। কারণ হচ্ছে, আমাদের পাশের বাসার ভদ্রলোক। ওঁদের বাড়িতে পনেরো-ষোলো বছরের সুন্দরমতো একটি কাজের মেয়ে ছিল। মেয়েটি ভদ্রলোককে বাবা ডাকত। হঠাৎ শুনি, তিনি এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোকের দুটি বড় মেয়ে কলেজে পড়ে। তারা খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘনঘন ফিট হতে লাগলেন। ঘটনাটা চারপাশে বড় ধরনের আলোড়ন তৈরি করল। বড়রা সবাই এই ঘটনা নিয়ে আলাপ করে। সেই আলাপে আমি উপস্থিত হলে চোখ বড় বড় করে বলে— এই ভাগ!

কাজেই আমি নিজেই পারুল আপার কাছে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কী। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, বিয়ে না করে উপায় কী— ঐ মেয়ের পেটে বাচ্চা।

পেটে বাচ্চা হলে বিয়ে করতে হয় কেন ?

তোকে বলা যাবে না। খুব লজ্জার কথা।

না, আমাকে বলতে হবে।

কাউকে বলবি না তো ?

না, বলব না।

কসম খা।

কিসের কসম ?

বল, বিদ্যা।

বিদ্যা।

বল, কোরান।

কোরান।

বল, টিকটিকি।

টিকটিকি বলব কেন ? টিকটিকি আবার কীরকম কসম ?

টিকটিকির যেমন লেজ খসে যায়— তুইও যদি এই কথা কাউকে বলিস তা হলে তোর জিভও খুলে পড়ে যাবে।

আমি ভয়ে ভয়ে টিকটিকির নামেও কসম করলাম— আর পারুল আপা গন্ধম ফলের সেই বিশেষ জ্ঞান আমাকে দিয়ে দিলেন। আমার মনে আছে, মনে খুব বড় ধরনের আঘাত পেলাম। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হলো, না, এসব মিথ্যা। এসব হতেই পারে না। ব্যাপারটা নিয়ে আমি যে কারো সঙ্গে আলাপ করব সেই উপায় নেই। টিকটিকির কসম খেয়েছি। জিহ্বা খুলে পড়ে যেতে পারে।

এই সময় পাশের বাড়ির ঐ ভদ্রলোকের বড় মেয়েটির হাসিরোগ হলো। সারাক্ষণ হাসে। খিলখিল করে হাসে। গভীর রাতেও ঘুম ভেঙে শুনি পাশের বাড়ি থেকে হাসির শব্দ আসছে। গভীর রাতে সেই হাসি শুনে বড় ভয় লাগত। গা শিরশির করত। মেয়েটির কোথায় যেন বিয়ে ঠিক হয়েছিল— বাবার এই কাণ্ডে তার বিয়ে ভেঙে যাবার পরই হাসিরোগ হয়। তার কয়েকদিন পরই তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে আমি নানু ডাকতাম। মেয়ে দুটিকে খালা। তারা আমাকে খুবই স্নেহ করত। প্রায়ই ডেকে নিয়ে বড়দের মতো কাপে করে চা খেতে দিত। দুনম্বর বোনটি আমাকে সব সময় জিজ্ঞেস করত— তার মতো সুন্দরী কোনো মেয়ে আমি দেখেছি কি না ? এর উত্তরে আমি তৎক্ষণাৎ বলতাম, না।

সত্যিই তো ?

হ্যাঁ সত্যি।

আমি বেশি সুন্দর, না আপা ?

আপনি।

সত্যি-বিদ্যা-কোরান বল।

সত্যি-বিদ্যা-কোরান।

তাঁরা চলে যাবার পর পাশের বাড়ি অনেক দিন খালি পড়ে রইল। আমার বেশ কিছুদিন খুব মন-খারাপ গেল। অল্প বয়সের মন-খারাপ ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার বেলায়ও হলো না। তাছাড়া মন-খারাপ ভাব কাটানোর মতো একটা রহস্যময় ঘটনাও ঘটল। একদিন খুব ভোরে দুজন বিচিত্রদর্শন লোক কোদাল নিয়ে পারুল আপাদের ঘরে ঢুকল। তারা নাকি কবর খোঁড়ার লোক। ভেতরের দিকের উঠানে তারা কবর খুঁড়তে শুরু করল। এই ঘটনা শুধু যে শিশুদের মনেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল তা নয়, বড়রাও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আমার মা'র ধারণা হলো ভদ্রলোক তাঁর কোনো-এক মেয়েকে মেরে ফেলেছেন। এখন গোপনে কবর দিয়ে দেয়া হচ্ছে। বাবা মা'কে ধমক দিলেন— এইসব অদ্ভুত ধারণা তুমি পাও কোথায় ? নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার।

আসলেই অন্য ব্যাপার, তবে কম রোমাঞ্চকর না। ওভারশিয়ার কাকুর পকেট থেকে একশো টাকা চুরি করেছে তাঁর পিওন। অথচ সে তা স্বীকার করছে না। কবর খোঁড়া হচ্ছে সেই কারণেই। পিওন একটা কোরান শরিফ হাতে নিয়ে কবরে নামবে এবং কোরান শরিফ হাতে নিয়ে বলবে— সে টাকা নেয়নি। যদি সে মিথ্যা কথা বলে তা হলে আর কবর থেকে উঠতে পারবে না। কবর তাকে আটকে ফেলবে।

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার জন্য আমরা দল বেঁধে কবরের চারপাশে দাঁড়ালাম। দরিদ্র পিওন হাতে কোরান শরিফ নিয়ে কবরে নামল। সে থরথর করে কাঁপছে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। তাকে দেখাচ্ছে পাগলের মতো। ওভারশিয়ার কাকু বললেন— এই, তুই টাকা চুরি করেছিস?

জে না।

সত্যি কথা বল। মিথ্যা বললে কবরে আটকে যাবি।

টাকা চুরি করি নাই স্যার।

তোর হাতে কোরান শরিফ, তুই কবরে দাঁড়িয়ে আছিস— মিথ্যা বললে আর উঠতে পারবি না।

তখন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হলো। পিওনের হাত থেকে কোরান শরিফ পড়ে গেল। সে জ্ঞান হারিয়ে কবরের ভেতর পড়ে গেল।

ওভারশিয়ার কাকু বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, বলছিলাম না, টাকা এই হারামজাদাই নিয়েছে!

কবর বন্ধ করা হলো, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করা হলো না। বিশাল একটা গর্তের মতো হয়ে রইল, যে-গর্তের দিকে তাকালেই ভয় ভয় লাগত। এছাড়াও আরো সব ভয়াবহ খবর কানে আসতে লাগল— যেমন, গভীর রাতে নাকি এই কবরের ভেতর থেকে ভারি গলায় কে ডাকে— আয় আয়। একবার কবর খোঁড়া হয়ে গেলে কাউকে-না-কাউকে সেখানে যেতে হয়। কবর তার উদর পূর্ণ করবার জন্য মানুষকে ডাকে।

আমি পারুল আপাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলাম। কী দরকার ঐ ভুতুড়ে বাড়িতে যাবার? পারুল আপার সঙ্গে যোগাযোগও কমে গেল, কারণ তাঁর স্কুলের খাতায় একটি প্রেমপত্র পাওয়া গেছে। সম্বোধনহীন সেই প্রেমপত্রে তিনি একজনকে অনুরোধ করেছেন তাঁকে চুমু খাবার জন্যে। কেন জানি আমার মনে হয়, ঐ প্রেমপত্রটি তিনি আমাকেই লিখেছিলেন। কারণ আমি ছাড়া অন্যকোনো ছেলের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। এবং একবার তাকে চুমু খাবার জন্যে লাজুক গলায় আমাকে অনুরোধও করেছিলেন। আমি এই অদ্ভুত প্রস্তাবে হেসে ওঠায় খুব লজ্জাও পেয়েছিলেন। তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। জানালার শিক ধরে মাঝে মাঝে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আমাকে দেখলেই তিনি চিকন গলায় ডাকেন। আমি পালিয়ে যাই। তাঁর বাবা-মা তাঁকে বন্দি করে রাখায় আমি একধরনের স্বস্তি বোধ করি। এখন

আমাকে বিরক্ত করার সুযোগ তাঁর নেই। পারুল আপার বন্দিজীবন আমাকে বেশিদিন দেখতে হয়নি। তাঁরা মীরাবাজারের বাসা বদলে কোথায় যেন চলে গেলেন। হারিয়ে গেলেন পুরোপুরি।

মানুষ দ্বিতীয়বার শৈশবে ফিরে যেতে পারে না। পারা গেলে আমি অবশ্যই এই অসহায় অভিমানী, দুখি কিশোরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। আজ তিনি কোথায় আছেন, কীভাবে আছেন, আমি জানি না। শুধু প্রার্থনা করি— যেখানেই থাকুন যেন সুখ তাঁকে ঘিরে থাকে। পৃথিবী ও মানুষের কাছে সুখ তাঁর প্রাপ্য।

স্বপ্নলোকের চাবি

পারুল আপা নেই, কাজেই স্কুলের দুঃসহ দুঘণ্টা কোনোক্রমে পার করে দেবার পরের সময়টা মহানন্দের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা।' সাজানো-গোছানো সুন্দর বাড়ি দেখলেই হুট করে ঢুকে পড়ি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তৎক্ষণাৎ বের করে দেয়া হয়। এর মধ্যে একটি বাড়িতে ভিন্ন ব্যাপার হলো। এই বাড়িটিও মীরাবাজারেই। আমাদের বাসার কাছে। বিশাল কম্পাউন্ড, গাছগাছালিতে ছাওয়া ধবধবে সাদা রঙের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। এই বাড়িতে কে থাকেন তাও আমরা জানি, সিলেট এম. সি. কলেজের অধ্যাপক। আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় হচ্ছে প্রফেসর সাব, অতি অতি অতি জ্ঞানী লোক— যাঁকে দূর থেকে দেখলেই পুণ্য হয়। তবে এই প্রফেসর সাহেব নাকি পাকিস্তানে থাকবেন না, দেশ ছেড়ে কলকাতা চলে যাবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নাকি চাকরিও হয়েছে। তিনি চেষ্টা করছেন বাড়ি বিক্রির।

এক দুপুরে গেট খোলা পেয়ে হুট করে সেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম। গাছপালার কী শান্ত-শান্ত ভাব। মনে হয় ভুল করে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এক বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়েছি। আনন্দে মন ভরে গেল। একা একা অনেকক্ষণ হাঁটলাম। হঠাৎ দেখি কোনার দিকের একটি গাছের নিচে পাটি পেতে একটি মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার হাতে একটা বই। সে বই পড়ছে না— তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি আমার জীবনে এত সুন্দর মেয়ে আর দেখিনি। মনে হলো তার শরীর সাদা মোমের তৈরি। পিঠভরতি ঘন কালো চুল। ষোলো-সতেরো বছর বয়স। দৈত্যের হাতে বন্দিনী রাজকন্যারাও এত সুন্দর হয় না। মেয়েটি হাত-ইশারায় ডাকল। প্রথমে ভাবলাম দৌড়ে পালিয়ে যাই। পরমুহূর্তেই সেই ভাবনা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

কী নাম তোমার খোকা?

কাজল।

কী সুন্দর নাম! কাজল। তোমাকে মাখতে হয় চোখে। তা-ই না?

কিছু না-বুঝেই আমি মাথা নাড়লাম।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি, তুমি একা একা হাঁটছো। কী ব্যাপার?

আমি চুপ করে রইলাম।

কীজন্যে এসেছ এ-বাড়িতে?

বেড়াতে।

ও আচ্ছা— বেড়াতে? তুমি তা হলে অতিথি। অতিথি নারায়ণ। তা-ই না?

আবারও না-বুঝে আমি মাথা নাড়লাম। সে বলল, তুমি এখানে চুপচাপ দাঁড়াও। নড়বে না। আমি আসছি।

মেয়েটি চলে গেল। ভেবে পেলাম না সে অনধিকার প্রবেশের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করতে গেল কি না। দাঁড়িয়ে থাকাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে? পালিয়ে যাওয়াই উচিত। অথচ পালাতে পারছি না।

মেয়েটি ফিরে এসে বলল, চোখ বন্ধ করে হাত পাতো।

আমি তা-ই করলাম। কী যেন দেয়া হলো আমার হাতে। তাকিয়ে দেখি কদমফুলের মতো দেখতে একটা মিষ্টি।

খাও, মিষ্টি খাও। মিষ্টি খেয়ে চলে যাও। আমি এখন পড়াশোনা করছি। পড়াশোনার সময় কেউ হাঁটাহাঁটি করলে বড় বিরক্তি লাগে। মন বসাতে পারি না। আমি চলে এলাম এবং দ্বিতীয় দিনে আবার উপস্থিত হলাম।

আবার মেয়েটি মিষ্টি এনে দিল। কোনো সৌভাগ্যই একা একা ভোগ করা যায় না। আমি তৃতীয় দিনে আমার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত। মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, এ কে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, এ আমার ছোট বোন। এ-ও মিষ্টি খুব পছন্দ করে।

মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। সে হাসতে হাসতে বলল, খুকি, তোমার নাম কী?

আমার বোন উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকাল। নাম বলাটা ঠিক হবে কি না সে বুঝতে পারছে না। আমি ইশারায় তাকে অভয় দিতেই সে বলল, আমার নাম শেফু।

শেফু? অর্থাৎ শেফালি। কী সুন্দর নাম! তোমরা দুজন চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

আমরা চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি। আজ অন্যদিনের চেয়ে বেশি সময় লাগছে। একসময় চোখ মেললাম। মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ বিষণ্ণ। সে দুঃখিত গলায় বলল, আজ ঘরে কোনো মিষ্টি নেই। তোমাদের জন্যে একটা বই নিয়ে এসেছি। খুব ভালো বই। বইটা নিয়ে যাও। দাঁড়াও, আমার নাম লিখে দিই।

সে মুক্তার মতো হরফে লিখল, দুজন দেবশিশুকে ভালোবাসা ও আদরে— শুক্লাদি।

বই নিয়ে বাসায় ফিরলাম। বইটার নাম 'ক্ষীরের পুতুল'। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাতায় পাতায় ছবি।

'ক্ষীরের পুতুল' হচ্ছে আমার প্রথম-পড়া 'সাহিত্য'। সাহিত্যের প্রথম পাঠ আমি আমার বাবা-মা'র কাছ থেকে পাইনি। বাবার বিশাল লাইব্রেরি ছিল। সেই লাইব্রেরির পুস্তকসংখ্যা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। সমস্ত বই তিনি তালাবদ্ধ করে রাখতেন। বাবার লাইব্রেরির বই আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নাগালের বাইরে ছিল। বাবা হয়তো ভেবেছিলেন, এইসব বই পড়ার সময় এখনো হয়নি।

শুক্লাদি তা ভাবেননি। তিনি অসাধারণ একটি বই একটি বাচ্চা-ছেলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তার স্বপ্নজগতের দরজা খুলে দিলেন। স্বপ্নজগতের দরজা সবাই খুলতে পারে না। দরজা খুলতে সোনার চাবির দরকার। ঈশ্বর যার-তার হাতে সেই চাবি দেন না। সে-চাবি থাকে অল্পকিছু মানুষের কাছে। শুক্লাদি সেই অল্পকিছু মানুষদের একজন।

শুক্লাদির সঙ্গে আমার ঐ বই পাওয়ার পর আর দেখা হয়নি। তিনি কলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশোনা করতেন। ছুটি শেষ হবার পর কলকাতা চলে গেলেন। তার কিছুদিন পর প্রফেসর সাহেব বাড়ি বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে গেলেন। যিনি বাড়ি কিনলেন তিনি প্রথমে গাছগুলো সব কাটিয়ে ফেললেন। বাড়িটিকে ঘিরে যে-স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন।

কত-না নিঝুম দুপুরে এই শ্রীহীন বাড়ির গেটের কাছে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি। গভীর দুঃখে আমার চোখ ভেঙে জল এসেছে।

বাসায় এসেই বসেছি 'ক্ষীরের পুতুল' নিয়ে। এই বই নিয়ে বসলেই ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন ফিরে আসত। মুহূর্তে চলে যেতাম অন্যকোনো পৃথিবীতে। কী অদ্ভুত পৃথিবীই-না ছিল সেটি!

শুক্লাদির দেয়া 'ক্ষীরের পুতুল' বইটি উনিশশো একাত্তর পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিল। একাত্তরের অনেক প্রিয় জিনিসের সঙ্গে বইটিও হারিয়েছি। কিন্তু সত্যি কি হারিয়েছি? হৃদয়ের নরম ঘরে যাদের স্থান দেয়া হয় তারা কি কখনো হারায়? কখনো হারায় না। শুক্লাদির কথা যখনই মনে হয় তখনই বলতে ইচ্ছা করে, 'জনম জনম তব তরে কাঁদিব।'

'ক্ষীরের পুতুল' বইটি আমার জীবনধারা অনেকখানি পালটে দিল। এখন আর দুপুরে ঘুরতে ভালো লাগে না। শুধু গল্পের বই পড়তে ইচ্ছে করে। কুয়োতলার লাগোয়া একটা ঘর, দুপুরের দিকে একেবারে নিরিবিলি হয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে জানালায় হেলান দিয়ে গল্পের বই নিয়ে বসি। জানালার ওপাশে কাঁঠালগাছের গুচ্ছ। সেই

কাঁঠালগাছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাক ডাকে। এছাড়া চারদিকে কোনো শব্দ নেই। অদ্ভুত নৈঃশব্দের জগৎ। এটা যেন চেনা-জানা পৃথিবী নয়, অন্য কোনো ভুবন।

বই-এ পাতার পর পাতা অতি দ্রুত উলটে যাচ্ছি। এইসব বই বাবার আলমিরা থেকে চুরি করা। মা জেগে ওঠার আগে রেখে দিতে হবে। ধরা পড়লে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। একদিন ধরা পড়লাম। বাবার হাতেই ধরা পড়লাম। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী বই পড়ছিস ? দেখি, দেখি বইটা।

তিনি বই হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বইয়ের নাম— 'প্রেমের গল্প'। তিনি থমথমে গলায় বললেন, পড়েছিস এই বই ?

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, হুঁ।

বুঝেছিস কিছু ?

হুঁ।

কী বুঝেছিস ?

কী বুঝেছি ব্যাখ্যা করতে পারলাম না। বাবা বই নিয়ে আলমিরায় তালাবদ্ধ করে রাখলেন। আমি ভয়ে অস্থির। নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো শাস্তির ব্যবস্থা হবে। সন্ধ্যাবেলা তিনি বললেন, কাপড় পরে আমার সঙ্গে চল।

আমি কোনো কথা না বলে কাপড় পরলাম। কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। তিনি রিকশা করে আমাকে নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। বই-এর এক বিশাল সংগ্রহ। যে-দিকে চোখ যায় শুধু বই, বই আর বই। আমাকে লাইব্রেরির মেম্বার করে দিলেন। শান্ত গলায় বললেন, এখানে অনেক ছোটদের বই আছে, আগে এইগুলো পড়ে শেষ কর। তারপর বড়দের বই পড়বি।

প্রথমদিনের দুটি বই নিজে পছন্দ করে দিলেন। দুটি বইয়ের একটির নাম মনে আছে— 'টম কাকার কুটির'। কী অপূর্ব বই! এই বইটি পড়বার আনন্দময় স্মৃতি এখনো চোখে ভাসে। ঝুমঝুম করে বৃষ্টি পড়ছে। সিলেটের বৃষ্টি— ঢালাও বর্ষণ। আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে বই নিয়ে বসেছি। টম কাকার গল্প পড়তে পড়তে চোখে নেমেছে অশ্রুর বন্যা। সমস্ত হৃদয় জুড়ে একধরনের শূন্যতা অনুভব করছি। হঠাৎ করে মহৎ সাহিত্যকর্মের মুখোমুখি হলে যা হয়, তা-ই হচ্ছে— প্রবল আবেগে চেতনা আলোড়িত হচ্ছে।

আমার বই পড়ার অভ্যাস মা খুব সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। প্রায়ই বিরক্ত হয়ে বলেন, এই ছেলে দিনরাত আউট বই পড়ে। যখন সবাই খেলাধুলা করছে সে অন্ধকারে বই নিয়ে বসেছে। চোখ নষ্ট হবে তো!

চোখ আমার সত্যি সত্যি খারাপ হলো। যদিও তা বুঝতে পারলাম না। বাইরের পৃথিবী আবছা দেখি। আমার ধারণা, অন্য সবাইও তা-ই দেখে। ক্লাস ফাইভে উঠে প্রথম চশমা নিই। চোখের ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করে আঁতকে উঠে বললেন, এই ছেলে তো অন্ধের কাছাকাছি! এতদিন সে চালিয়েছে কীভাবে ? প্রথম চশমা পরে

আমিও হতভম্ব হয়ে ভাবি— চারদিকের জগৎ এত স্পষ্ট! কী আশ্চর্য! দূরের জিনিসও তা হলে দেখা যায়!

আগের কথায় ফিরে আসি।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সদস্য হওয়ায় সবচে' কষ্টে পড়ল আমার ছোট দুই ভাইবোন— শেফু এবং ইকবাল। মীরাবাজার থেকে একা এতদূরে হেঁটে যেতে ভালো লাগে না। আমি এদের সঙ্গে নিয়ে যাই। পথ আর ফুরাতে চায় না। পথে দুতিন জায়গায় ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে বসি। আমার সব ক্লান্তি, সব কষ্ট দূর হয়ে যায় যখন দুটি বই হাতে পাই। আনন্দে ঝলমল করতে থাকি। শেফু এবং ইকবাল আমার এই আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে না। শুধুমাত্র আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে তাদের দিনের পর দিন কষ্ট করতে হয়।

আমাকে রোজ দুটি করে বই দিতে গিয়ে একদিন লাইব্রেরিয়ানেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, এখন থেকে একটি করে বই নেবে, দুটো না। আর এইসব আজেবাজে গল্পের বই পড়ে কোনো লাভ নেই। এখন থেকে পড়বে জ্ঞানের কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এইসব শিখতে হবে। না, আজকে এই বইটা নিয়ে যাও।

আমি খুব মন-খারাপ করে বইটা হাতে নিলাম। বইয়ের নাম 'জানবার কথা'। বাসায় এনে দুতিন পাতা পড়লাম। এতটুকুও আকর্ষণ করল না। পরদিন ফেরত দিতে গেছি। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক বললেন, পড়েছ ?

আমি বললাম, হুঁ।

তিনি হাত থেকে বই নিয়ে কয়েকটা পাতা উলটে বললেন, আচ্ছা বলো, গ্লেসিয়ার কী ?

আমি বলতে পারলাম না। তিনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বাঁদর ছেলে— যাও, এই বই ভালোমতো পড়ে তারপর আসো।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে আমি আর কখনো যাইনি। 'জানবার কথা' বইটিও ফেরত দেয়া হয়নি। বাসায় ফিরে 'জানবার কথা' কুটিকুটি করলাম, কিছুক্ষণ কাঁদলাম। আমি প্রচণ্ড অভিমানী হয়ে জন্মেছি। অভিমান নামক ব্যাপারটি কম নিয়ে জন্মানো ভালো। এই জিনিসটি আমাদের বড়ই কষ্ট দেয়।

বই পড়ার আগ্রহে সাময়িক ভাটা দেখা দিল। আগের জগতে ফিরে গেলাম— ঘুরে বেড়ানো। ইতোমধ্যে চুরিবিদ্যা খানিকটা রপ্ত হয়েছে। লক্ষ করেছি, মা ভাংতি পয়সা রাখেন তোশকের নিচে। সিকি, আধুলি, আনি-দুআনি— ঠিক কত আছে, সেই হিসেব তাঁর নেই। ভাংতি পয়সার মধ্যে সবচে' ছোট হচ্ছে— সিকি। এবার একটা সিকি সরিয়ে সমস্ত দিন আতঙ্কে নীল হয়ে রইলাম। সারাক্ষণ মনে হলো, এই বোধহয় মা বলবেন, সিকি কে নিয়েছে ? মা তেমন কিছু করলেন না। পরদিন সেই সিকি নিয়ে এবং সঙ্গে ছোট বোনকে নিয়ে চায়ের স্টলে চা খেতে গেলাম। আমার

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বড়রা যেমন দোকানে চা খায়, আমরাও তেমনি খাব। দোকানদার নিশ্চয়ই দুই খুদে কাস্টমার পেয়ে বিস্মিত হয়েছিল। সে যত্ন করে আমাদের দুজনকে গ্লাসে করে দুকাপ চা দিল। একটা পরোটা ছিঁড়ে দুভাগ করে দুজনের হাতে দিল এবং কোনো পয়সা রাখল না। হাতের সিকি হাতেই রয়ে গেল। অতঃপর দুজনে একটা রিকশায় উঠে পড়লাম। কোনো গন্তব্য নেই— যতদূর রিকশা যায়। তখন রিকশাভাড়া ছিল বাঁধা। শহরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাওয়া যেত এক সিকিতে। রিকশাওয়ালা আমাদের জল্লারপাড়ের কাছে নামিয়ে দিল। সেখান থেকে মহানন্দে হেঁটে বাসায় ফিরলাম। মনে হলো, চুরিবিদ্যা খুব খারাপ কিছু নয়।

মা'র তোশকের নিচ থেকে প্রায়ই পয়সা উধাও হতে লাগল। একদিন কাজের ছেলে রফিক চুরির জন্যে প্রচণ্ড বকা খেল। তোশকের নিচে পয়সা রাখাও বন্ধ হয়ে গেল। বড় কষ্টে পড়লাম। এখন একমাত্র ভরসা দেশের বাড়ি থেকে বেড়াতে-আসা মেহমানরা।

আমাদের বাসায় মেহমান লেগেই থাকত। দাদার বাড়ির দিকের মেহমান, মা'র বাড়ির দিকের মেহমান। কেউ আসত শহর দেখতে, কেউ শাহজালাল সাহেবের মাজার দেখতে, কেউবা চিকিৎসা করাতে। মেহমানরা দয়াপরবশ হয়ে এক আনা বা দুপয়সা বাড়িয়ে দিতেন— পৃথিবীটাকে বড়ই সুন্দর মনে হতো। ছুটে যেতাম দোকানে। কত অপূর্ব সব খাবার— হজমি! দুপয়সায় অনেকখানি পাওয়া যেত, টক টক ঝাঁঝালো স্বাদ। খানিকটা মুখে দিলেই জিভ কালো কুচকুচে হয়ে যেত। এক আনায় পাওয়া যেত দুগোল্লা সরষে তেল মাখানো বিচি-ছাড়ানো তেঁতুল। বাদামভাজা আছে, বুটভাজা আছে। যদুমিয়ার দোকানে পাওয়া যেত দুধ-চকলেট। এক আনায় চারটা, তবে আমার জন্যে একটা ফাউ। পাঁচটা।

মিষ্টি পানের একটা দোকান ছিল, তার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই দোকানি ছোট একটা পান বানিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলত, ভাগ। কী সুস্বাদু ছিল সেই মিষ্টি পান!

গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম দেশের বাড়ির মেহমানদের জন্যে। মেহমান আসা মানেই আনন্দ। শহর দেখানোর জন্যে আমি চমৎকার গাইড। একদিন-না-একদিন তাঁরা রঙমহল সিনেমাহলে ছবি দেখতে যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে। আমাকে নেয়ার ব্যাপারে তাঁরা তেমন আপত্তিও করবেন না। কারণ আমার জন্যে আলাদা করে টিকিট করতে হবে না। আমি ছবি দেখব কোলে বসে, কিংবা দাঁড়িয়ে। বাড়িতে মেহমান থাকার আরেকটি বড় সুবিধা হচ্ছে, সেই সময় মা'র শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যেত। বড় ধরনের অপরাধেও মা কঠিন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার শাস্তি ছাড়া অন্য শাস্তি দিতেন না।

মেহমানদের মধ্যে একজনের কথা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি মায়ের দিকের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। ভাটিঅঞ্চলের মানুষ। খুনের দায়ে হাজতে

আছেন। জামিনে ছাড়া পেয়ে কয়েকদিন থাকতে এলেন আমাদের এখানে। অসম্ভব রকমের রুগ্‌ণ একজন মানুষ। যক্ষ্মা নামের কালব্যাধিতে ধরেছে। সারাক্ষণ কাশছেন। কাশির সঙ্গে টাটকা রক্ত পড়ছে।

তিনি বাসায় এসেই মাকে ডেকে বললেন, রাজরোগে ধরেছে গো মা। এই ব্যাধি ছোঁয়াচে। তোমার ছেলেপুলের সংসার। ভেবেচিন্তে বলো, আমাকে রাখবে ? তিন-চার দিন থাকতে হবে। হোটেলে থাকতে পারি, কিন্তু হোটেলে থাকতে ইচ্ছা করছে না। তুমি ভেবেচিন্তে বলো।

মা বললেন, আপনি অবশ্যই আমার এখানে থাকবেন।

খুব ভালো কথা। তা-ই থাকব। বেশিদিন বাঁচব না। যে-কয়টা দিন আছি পরিচিত মানুষদের মধ্যে থাকতে চাই। তবে মা আমি যে থাকব, আমার কিছু শর্ত আছে।

কী শর্ত ?

নিজের মতো বাজার-সদাই করব। এর জন্যে মনে কষ্ট নিও না। আমার অনেক জিনিসের অভাব আছে, টাকাপয়সার অভাব নাই। কী মা, রাজি ?

মাকে রাজি হতে হলো। আমরা পরম বিস্ময়ে দেখলাম— মাত্র চারদিন যে-লোকটি থাকবে তার জন্যে বস্তাভরতি পোলায়ের চাল আসছে, টিনভরতি ঘি, চিনি। দুপুরে প্রকাণ্ড একটা চিতলমাছ চলে এল, ঝাঁকাভরতি মুরগি।

তিনি নিজে এতসব খাবারদাবারের কিছুই খেলেন না। মাকে বললেন, আমাকে তিন চামুচ আলোচালের ভাত আর এক চামুচ ঘি দাও। এর বেশি আমি কিছু খেতে পারি না। আল্লাহ আমার রিজিক তুলে নিয়েছেন।

শৈশবে যে অল্পকিছু মানুষ আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল উনি ছিলেন তাদের একজন। ভাটিঅঞ্চলের জমিদারবংশের মানুষ। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় মানুষ একযোগে এঁদের বসতবাড়ি আক্রমণ করে। এঁরা তখন আত্মরক্ষার জন্যে কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে বন্দুক নিয়ে দোতলা থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকেন। পঞ্চাশের মতো মানুষ আহত হয়, মারা যায় ছ'জন। জমিদারবাড়ির সকল পুরুষের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ আসামি হিসেবে সবাইকেই বেঁধে নিয়ে আসে। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত যে-মানুষটির কথা বলছি তিনিও আসামিদেরই একজন। পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে বলেছেন— বাড়ি যখন আক্রান্ত হয় তখন আমিই বন্দুক নিয়ে বের হই। আমি একাই গুলি করি— হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার। শাস্তি হলে আমার শাস্তি হবে। অন্য কারো নয়।

মজার ব্যাপার হলো, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনোই যোগ ছিল না। এই ধরনের স্বীকারোক্তি তিনি করেছেন অন্যদের বাঁচাবার জন্যে। তাঁর যুক্তি হলো— আমার যক্ষ্মা হয়েছে, আমি তো দুদিন পর এম্নিতেই মারা যাচ্ছি। ফাঁসিতেই না হয়

মরলাম। অন্যরা রক্ষা পাক। তাছাড়া বাকি সবারই বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। আমি চিরকুমার মানুষ, আমি বেঁচে থাকলেই কী, মরলেই কী ?

যক্ষ্মা রুগীর চোখ এম্নিতে উজ্জ্বল হয়। ওঁর চোখ আমার কাছে মনে হলো ঝিকমিক করে জ্বলে। সারাক্ষণ ধবধবে সাদা বিছানায়, সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে মূর্তির মতো বসে থাকেন। আমি বড়ই বিস্ময় অনুভব করি। একদিন হাত-ইশারা করে আমাকে ডাকলেন, আমি এগিয়ে যেতেই তীব্র গলায় বললেন, তুই সব সময় আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করিস কেন ? খবরদার, আর আসবি না। ছোট পুলাপান আমি পছন্দ করি না।

আহত ও অপমানিত হয়ে তাঁর ঘর থেকে আমি বের হয়ে আসি, কিন্তু তাঁর প্রতি যে-গভীর ভালোবাসা লালন করি তার হেরফের হয়নি। মামলা চলাকালে জেল-হাজতে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার মনে আছে, তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি বালিশে মুখ গুঁজে দীর্ঘ সময় কাঁদি।

সাহিত্য বাসর

বাবার অসংখ্য বাতিকের একটি হলো— সাহিত্য-বাতিক। মাসে অন্তত দুবার বাসায় 'সাহিত্য বাসর' নামে কী যেন হতো। কী যেন হতো বলছি এই কারণে যে, আমরা ছোটরা জানতাম না কী হতো। আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সাহিত্য চলাকালীন আমরা হৈচৈ করতে পারতাম না, উঁচু গলায় কথা বলতে পারতাম না, শব্দ করে হাসতেও পারতাম না। এর থেকে ধারণা হতো, বসার ঘরে তাঁরা যা করছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে একদিন খানিকটা শুনলাম। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হলো। একজন খুব গম্ভীর মুখে একটা কবিতা পড়ল। অন্যরা তার চেয়েও গম্ভীর মুখে শুনল। তারপর কেউ বলল, ভালো হয়েছে, কেউ বলল মন্দ, এই নিয়ে তর্ক বেধে গেল। নিতান্তই ছেলেমানুষি ব্যাপার। একদিন একজনকে দেখলাম রাগ করে তার লেখা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অম্নি দুজন ছুটে গেল তাকে ধরে আনতে। ধরে আনা হলো। বয়স্ক একজন মানুষ অথচ হাউমাউ করে কাঁদছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! কাণ্ড এখানে শেষ না। ছিঁড়ে কুচি কুচি করা কাগজ এরপর আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো হতে লাগল। সেই লেখা পড়া হলো, সবাই বলল, অসাধারণ। এই হচ্ছে বাবার প্রাণপ্রিয় সাহিত্য বাসর।

সারাটা জীবন তিনি সাহিত্য সাহিত্য করে গেলেন। কতবার যে তিনি ঘোষণা করেছেন, এবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যে মনোনিবেশ করবেন! চাকরি

এবং সাহিত্য দুটো একসঙ্গে হয় না।

ট্রাংকে বোঝাই ছিল তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ। থরেথরে সাজানো। বাবার সাহিত্যপ্রেমের স্বীকৃতি হিসেবে আমাদের বসার ঘরে বড় একটা বাঁধানো সার্টিফিকেট ঝোলানো, যাতে লেখা— 'ফয়জুর রহমান আহমেদকে সাহিত্য সুধাকর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।'

এই উপাধি তাঁকে কারা দিয়েছে, কেন দিয়েছে কিছুই এখন মনে করতে পারছি না। শুধু মনে আছে বাঁধানো সার্টিফিকেটটির প্রতি বাবার মমতার অন্ত ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিফলকে আমি এই উপাধি এবং শোকগাথায় রবীন্দ্রনাথের দুলাইন কবিতা ব্যবহার করি।

দূরদূরান্ত থেকে কবি-সাহিত্যিকদের হঠাৎ আমাদের বাসায় উপস্থিত হওয়া ছিল আরেক ধরনের ঘটনা। বাবা এঁদের কাউকে নিমন্ত্রণ করে আনতেন না। তাঁর সামর্থ্য ছিল না, তিনি যা করতেন তা হচ্ছে মানিঅর্ডার করে তাঁদের নামে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা পাঠিয়ে কুপনে লিখতেন—

জনাব,

আপনার....কবিতাটি পত্রিকার.... সংখ্যায় পড়িয়া মনে বড় তৃপ্তি পাইয়াছি। উপহার হিসেবে আপনাকে সামান্য কিছু অর্থ পাঠাইলাম। উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

ইতি প্রতিভামুগ্ধ—
ফয়জুর রহমান আহমেদ
(সাহিত্য সুধাকর)

ঐ কবি নিশ্চয়ই তাঁর কাব্যের জন্যে নানান প্রশংসাবাক্য শুনেছেন, কিন্তু মানিঅর্ডারে টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা না ঘটারই কথা। প্রায় সময়ই দেখা যেত, আবেগে অভিভূত হয়ে যশোহর বা ফরিদপুরের কোনো কবি বাসায় উপস্থিত হয়েছেন।

এমনিভাবে উপস্থিত হলেন কবি রওশন ইজদানী। পরবর্তীকালে তিনি খাতেমুন নবীউন গ্রন্থ লিখে আদমজী পুরস্কার পান। যখনকার কথা বলছি তখন তাঁর কবিখ্যাতি তেমন ছিল না।

আমার পরিষ্কার মনে আছে, লুঙ্গি-পরা ছাতা-হাতে এক লোক রিকশা থেকে নেমে ভাড়া নিয়ে রিকশাওয়ালার সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। জানলাম, ইনি বিখ্যাত কবি রওশন ইজদানী। আমাদের বলে দেয়া হলো যেন হৈচৈ না করি, চিৎকার না করি। ঘরে একজন কবি বাস করছেন। কবিতা লেখার মুডে থাকলে সেই মুডের ক্ষতি হবে।

দেখা গেল, কবি সারা গায়ে সরিষার তেল মেখে রোদে গা মেলে পড়ে রইলেন। আমাকে ডেকে বললেন— এই, মাথা থেকে পাকা চুল তুলে দে।

কবি-সাহিত্যিকরা আলাদা জগতে বাস করেন, মানুষ হিসেবে তাঁরা অন্যরকম বলে যে প্রচলিত ধারণা আছে কবি রওশন ইজদানীকে দেখে আমার মনে হলো ঐ ধারণা ঠিক না। তাঁরা আর দশটা মানুষের মতোই, আলাদা কিছু না।

আমার আদর-যত্নে, খুব সম্ভব পাকা চুল তোলার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে একদিন ডেকে বললেন, খাতা-কলম নিয়ে আয়, তোকে কবিতা লেখা শিখিয়ে দিই।

আমি কঠিন গলায় বললাম, আমি কবিতা লেখা শিখতে চাই না।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তাহলে কী শিখতে চাস ?

কিছুই শিখতে চাই না।

আসলেই তা-ই। শৈশবে কারো কাছ থেকে আমি কিছুই শিখতে চাইনি। এখনো চাই না। অথচ আশ্চর্য, আমার চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁরা ক্রমাগত আমাকে শেখাতে চান। অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ভাষা এবং বাংলা বানানের শিক্ষকরা আমার চারপাশে আছেন। পণ্ডিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে আঠারো-উনিশ বছরের তরুণী সবাই আমার শিক্ষক। সবাই আমাকে শেখাতে চান। হয়তো ভালোবাসা থেকেই চান, কিন্তু আমার কিছুই শিখতে ইচ্ছা করে না। জানতে ইচ্ছা করে না। ‘জানবার কথা’ নামের একটি বই শৈশবেই ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলেছিলাম এই কারণেই।

পদ্মপাতার জল

আমাদের পাশের বাসায় থাকত নাদু-দিলুরা।

তারাও আমাদেরই মতোই অল্পআয়ের বাবা-মা'র পুত্রকন্যা। সবাই একসঙ্গে ধুলোমাটিতে গড়াগড়ি করে বড় হচ্ছি। ওমা একদিন শুনি, ওরা বড়লোক হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে ওদের কাপড়চোপড় পালটে গেল। কথাবার্তার ধরন-ধারণও বদলে গেল। এখন আর ওরা দাঁড়িয়াবান্দা কিংবা চি-বুড়ি খেলার জন্যে আমাদের কাছে আসে না।

ঈদ উপলক্ষে ওরা নতুন কাপড় তো পেলই সেইসঙ্গে পেল ট্রাই সাইকেল। ট্রাই সাইকেলটি শিশুমহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। আমিও এর আগে এই জিনিস দেখিনি। কী চমৎকার ছোট্ট একটা রিকশা! এর মধ্যে আবার বেলও আছে। টুং টুং করে

বাজে। এই বিস্ময়কর বাহনটিতে একবার শুধু চড়তে পারার দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্যে আমি তখন আমার সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারি। চেষ্টা করে বিফল হলাম। সব সময় নাদু-দিলুর সঙ্গে একজন কাজের মেয়ে থাকে। আমি কাছে গেলেই সে খ্যাঁক করে ওঠে। হাত দিয়ে একটু দেখার অনুমতি চাইলাম, সেই অনুমতিও পাওয়া গেল না। আমরা শিশুরা সমস্ত কাজকর্ম ভুলে ট্রাই সাইকেল ঘিরে গোল হয়ে বসে রইলাম। অনেক চিন্তা করে দেখলাম ট্রাই সাইকেল কেনার কথা বাবাকে কি বলা যায়? মনে হলো সেটা ঠিক হবে না। বাবার তখন চরম আর্থিক সমস্যা যাচ্ছে। তাঁর সবচে' আদরের ছোট বোন অসুস্থ। সেই বোনের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁর বহন করতে হচ্ছে। ঈদে আমরা ভাইবোনেরা কোনো কাপড়চোপড় পাইনি। শেষ মুহূর্তে বাবা আমাদের তিন ভাইবোনকে তিনটা প্লাস্টিকের চশমা কিনে দিলেন, যা চোখে দিলে আশেপাশের জগৎ নীলবর্ণ ধারণ করে। কাপড় না পাওয়ার দুঃখ রঙিন চশমায় ভুললাম। তারচেও বড় কথা, দিলু এই চশমার বিনিময়ে আমাকে তার ট্রাই সাইকেল খানিকটা স্পর্শ করার দুর্লভ সুযোগ দিল। সে বড়ই আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

যতই দিন যেতে লাগল এদের রমরমা সমসমা বাড়তেই লাগল। শুনলাম, তাদের জন্যে বিশাল দুতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কোনোরকম কষ্টেসৃষ্টে এখানেই থাকবে। এর মধ্যে এই দুই ভাইবোনের জন্মদিন হলো। জন্মদিন বলে যে একটা ব্যাপার আছে আমার তা জানা ছিল না। এই দিনে উৎসব হয়। খানাদানা হয়— উপহার নিয়ে লোকজন আসে, কে জানত! আমরা অভিভূত।

শেফু একদিন বাবাকে গিয়ে বলল, আমার জন্মদিন করতে হবে।

বাবা খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছে মা, করা হবে। কিন্তু শুধুই একবার। এই উৎসব আমি দ্বিতীয়বার করব না। তোমরা বড় হবার চেষ্টা করো। অনেক বড়, যাতে সারা দেশের মানুষ তোমাদের জন্মদিনের উৎসব করে। বাবা-মা'র করতে না হয়।

শেফু বলল সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে বড় হবার।

আমি দেখলাম সুযোগ ফসকে যাচ্ছে। শুধু শেফুর জন্মদিন হবে আমার হবে না, এ কেমন কথা! আমি গম্ভীর গলায় বললাম, বাবা, আমিও খুব বড় হবার চেষ্টা করব। আমারও জন্মদিন করতে হবে। বাবা বললেন, আচ্ছা তোমারও হবে।

শুধু ইকবাল ঘোষণা করল সে বড় হতে চায় না। ছোটই থাকতে চায়। তার জন্মদিন লাগবে না।

আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। নভেম্বরের ৯ তারিখ শেফুর জন্মদিন। দেখতে দেখতে ৯ তারিখ এসে পড়ল। আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ করলাম, এই উপলক্ষে কাউকে বলা হলো না। বাবা বললেন, আমরা নিজেরা নিজেরা উৎসব করব। কাউকে বলব না।

পায়েস ছাড়া অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য তৈরি হলো না। আমাদের মন ভেঙে গেল। সন্ধ্যার পর জন্মদিনের উৎসব শুরু হলো। বাবা 'বীরপুরুষ' কবিতা আবৃত্তি করলেন। প্রাণেশ কাকু তিনটা গান গাইলেন। পায়েস খাওয়া হলো। তারপর বাবা ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে শেফুর হাতে একটা উপহারের প্যাকেট তুলে দিলেন। সেই উপহার দেখে আমাদের সবার বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমার দরিদ্র বাবা খুবই দামি উপহার কিনেছেন। চীনেমাটির চমৎকার খেলনা 'টি সেট', যা দেখলে একালের শিশুদেরও চোখ কপালে উঠে যাবার কথা।

বাবা বললেন, পছন্দ হয়েছে মা ?

শেফু কাঁদতে কাঁদতে বলল, এত সুন্দর জিনিস সে তার জীবনে দেখেনি। আনন্দে সারারাত সে ঘুমাতে পারল না। বারবার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দেখে আসে টি সেট ঠিকঠাক আছে কি না। সেই রাতে আমি নিজেও উদ্বেগে ঘুমুতে পারলাম না। আর মাত্র তিনদিন পর আমার জন্মদিন। না জানি কী অপেক্ষা করছে আমার জন্যে! গোপনসূত্রে খবর পেলাম, আমার জন্যে দশগুণ ভালো উপহার অপেক্ষা করছে। খবর দিলেন মা। মা'র খবর খুবই নির্ভরযোগ্য।

জন্মদিন এসে গেল। গান, কবিতা আবৃত্তির পালা শেষ হবার পর আমার হাতে উপহারের প্যাকেট তুলে দেয়া হলো। প্যাকেট খুলে দেখি একটা বাঁধানো ফ্রেমে দীর্ঘ একটি কবিতা। বাবা ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছেন। কবিতার প্রথম দুটি চরণ—

> সাতটি বছর গেল পরপর আজিকে পরেছো আটে,
> তব জন্মদিন নয়তো মলিন ভয়াল বিশ্ব হাটে...

বাবা খুবই আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, উপহার পছন্দ হয়েছে ? অনেক কষ্টে কান্না চাপা দিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে পছন্দ হয় নাই।

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা খানিকক্ষণ শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, এই উপহার এখন তোর কাছে সামান্য মনে হচ্ছে। এমন একদিন আসবে যখন আর সামান্য মনে হবে না।

বাবা কবি ছিলেন না। হৃদয়ের তীব্র আবেগ-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর অতি আদরের ছোট বোনের মৃত্যুর খবর পাবার পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে কবিতা লিখতে বসেছেন। চোখের জলে লেখা দীর্ঘ কবিতা হয়তো শুদ্ধতম কবিতা হয়নি। কিন্তু যে-আবেগের তাড়নায় কলম হাতে নিয়েছিলেন সেই আবেগে কোনো খাদ ছিল না। বাবার কাছ থেকে প্রথম শিখলাম, মনে তীব্র ব্যথা কমানোর একটি উপায় হচ্ছে কিছু লেখা, যে-লেখা ব্যক্তিগত দুঃখকে ছড়িয়ে

দেয় চারদিকে।

বাবা হচ্ছেন আমার দেখা প্রথম কবি।

আমার দেখা দ্বিতীয় কবি হচ্ছেন আমাদের বড়মামা ফজলুল করিম। তিনিও আমাদের বাসায় থাকতেন এবং এম. সি. কলেজে আই. এ. পড়তেন। আমার মেজো চাচা যেমন প্রতি বছর পরীক্ষা দিয়ে ফেল করতেন, বড়মামা ফেল করতেন পরীক্ষা না দিয়ে। পরীক্ষা না দেবার চমৎকার সব যুক্তি বের করতেন। এইসব যুক্তিতে অতি সহজেই মা'কে কাবু করে ফেলতেন।

পরীক্ষার আগের দিন মুখ গম্ভীর করে বলতেন, বুবু, এই বছরও পরীক্ষা দেব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কেন ? এই বছর আবার কী হলো ?

গত বৎসর পাসের হার বেশি ছিল, কাজেই এই বৎসর কম হবে। পরীক্ষা দিলে ফেল করতে হবে। আগামী বৎসর চেষ্টা চালাব ইনশাল্লাহ।

এই বৎসর পরীক্ষাটা দে, পাস-ফেল পরের ব্যাপার।

আরে না! পরীক্ষা দিয়ে এনার্জি লস করার কোনো মানে হয় না।

বলাই বাহুল্য, পরের বৎসর তিনি পরীক্ষা দেন না। কারণ রুটিন খুব খারাপ হয়েছে। গ্যাপ কম। তবুও দিতেন, কিন্তু এনার্জি লসের ভয়ে দিচ্ছেন না। বড় মামা সব এনার্জি জমা করে রাখলেন এবং শুভক্ষণে পুরো এনার্জি নিয়ে জনৈকা তরুণীর প্রেমে পড়ে গেলেন। প্রেমের আবেগে কবিতার পর কবিতা বের হতে লাগল। আমার উপর দায়িত্ব পড়ল এইসব কবিতা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগলাম।

তরুণীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় প্রেমে ভাটার টান ধরল। গোটা পঞ্চাশেক বিরহের কবিতা লিখে বড়মামা হৃদয়যাতনা কমালেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বড়মামার সেইসব কবিতা কিন্তু বেশ ভালো ছিল বলে আমার ধারণা। তিনি এইসব কবিতা প্রকাশ করার ব্যাপারে কোনোরকম আগ্রহ দেখাননি কিংবা পরবর্তী সময়ে কবিতা লেখার চেষ্টাও করেননি। তাঁর ভাবটা এরকম, এইসব কবিতা তিনি শুধু দুজনের জন্যেই লিখেছেন— তৃতীয় কারো জন্যে নয়।

আমি নিজে নানাভাবে বড়মামার কাছে ঋণী। গল্প বলে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর এই ক্ষমতা আমাকে বারবার বিস্মিত করত। একই গল্প যখন বড়মামার কাছে শুনতাম, তখন অন্যরকম হয়ে যেত। এর কারণ বুঝতে পারতাম না, তবে কারণ নিয়ে ভাবতাম এটা মনে আছে। জীবনের প্রথম ছবি আঁকা তাঁর কাছ থেকেই শিখি। তিনি হাতি আঁকার চমৎকার একটা সহজ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। এই কৌশলে আমি তিন হাজারের মতো হাতি এক মাসের মধ্যে এঁকে ফেলি। বাড়ির সাদা দেয়াল পেনসিলে-আঁকা হাতিতে হাতিময় হয়ে যায়।

তাঁর একটা সাইকেল ছিল। সারাদিন সাইকেলে করে ঘুরতেন। মাঝে মাঝে আমাকে পেছনে বসিয়ে বেড়াতে বের হতেন। সাইকেল চলত ঝড়ের গতিতে। এই সাইকেল বড়মামার প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে একদিন মোটরসাইকেল হয়ে গেল। যখনই সাইকেল চলে ভটভট শব্দ হয়। লোকজন অবাক হয়ে তাকায়। দেখতে সাইকেল অথচ শব্দ হচ্ছে মোটরসাইকেলের, ব্যাপারটা কী? ব্যাপার কিছুই না, দু'টুকরা শক্ত পিসবোর্ড সাইকেলের সঙ্গে এমনভাবে লাগানো যে চাকা ঘোরামাত্র স্পোকের সঙ্গে পিসবোর্ডের ধাক্কা লেগে ভটভট শব্দ হয়। শিশুরা প্রতিভার সবচেয়ে বড় সমঝদার। আমরা বড়মামার প্রতিভার দীপ্তি দেখে বিস্মিত। আমাদের বিস্ময় আকাশ স্পর্শ করল যখন তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করলেন। হাঙ্গার স্ট্রাইকের কারণ মনে নেই, শুধু মনে আছে দরজার গায়ে বড় বড় করে লেখা— 'আমরণ অনশন। নীরবতা কাম্য।' তিনি একটা খাটে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। বাবা পুরো ব্যাপারটায় মজা পেয়ে খুব হাসিহাসি করছেন। বড়মামা তাতে মোটেই বিচলিত হচ্ছেন না। তাঁর হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙানোর কোনো উদ্‌যোগ নেয়া হলো না। একদিন কাটল, দুদিন কাটল, তৃতীয় দিনও পার হলো। তখন সবার টনক নড়ল। মা কান্নাকাটি শুরু করলেন। বাড়িতে টেলিগ্রাম গেল। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় বড়মামা এক গ্লাস শরবত খেয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন এবং গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন— এদেশে থাকবেন না। কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এদেশে থাকা সম্ভব নয়। তিনি বিলেত যাবেন।

তখন বিলেত যাওয়া খুব সহজ ছিল। দলে দলে সিলেটিরা বিলেতে যাচ্ছে। মামারও পাসপোর্ট হয়ে গেল। তিনটি নতুন স্যুট বানানো হলো। মামা স্যুট পরে ঘোরাফেরা করেন। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। কাঁটাচামচ দিয়ে ভাত-মাছ খান। দেখতে বড় ভালো লাগে।

শেষ পর্যন্ত বিলেত যাওয়া হলো না। মামা বললেন— আরে ধুর ধুর, দেশের উপর জিনিস নাই। বিদেশ গিয়ে আমি ঘাস কাটব নাকি? আমি ভালোই আছি। বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি তা হলে যাচ্ছ না?

জি না।

কী করবে কিছু ঠিক করেছ?

আই. এ. পরীক্ষা দেব। এইবার উড়া-উড়া শুনেছি ম্যাক্সিমাম পাস করবে। পরীক্ষা অবশ্য দিলেন না, কারণ পরীক্ষার আগে-আগে খবর পেলেন, এইবার কোশ্চেন খুব টাফ হবে। গতবার ইজি হয়েছিল, এইবার টাফ। টাফ কোশ্চেনে পরীক্ষা দেয়ার কোনো মানে হয় না।

তিনি একটা ক্যারামবোর্ড কিনে ফেললেন। মামা এবং চাচা দুজনে মিলে গভীর রাত পর্যন্ত টুকুস টুকুস করে ক্যারাম খেলেন। বড় সুখের জীবন তাঁদের।

আমার জীবনও সুখের, কারণ বাসার প্রধান শাসক বাবা অনুপস্থিত। তিনি প্রমোশন পেয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছেন। তাঁকে বদলি করা হয়েছে দিনাজপুরের

জগদলে। সেই সময় বর্ডার রক্ষার দায়িত্ব ছিল পুলিশের উপর। বাবা চলে গেলেন বর্ডারে। আমার পূর্ণ স্বাধীনতা। কারোই কিছু বলার নেই।

সেই সময় দেশে বড় ধরনের খাদ্যাভাব দেখা দিল। ভয়াবহ অবস্থা। হাজার হাজার মানুষ খাবারের সন্ধানে শহরে জড়ো হয়েছে। থালা-হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে।

সিলেট শহরে অনেকগুলো লঙ্গরখানা খোলা হলো। লঙ্গরখানায় বিরাট ডেকচিতে খিচুড়ি রান্না করা হয়। ক্ষুধার্ত মানুষদের একবেলা খিচুড়ি খাওয়ানো হয়।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওদের খাওয়া দেখি। কলার পাতা কেটে লাইন ধরে সবাই বসে। প্রত্যেকের পাতায় দুহাতা করে খিচুড়ি দেয়া হয়। কত আনন্দে, কত আগ্রহ নিয়েই-না তারা সেই খিচুড়ি খায়! ওদের আনন্দে ভাগ বসানোর জন্যই হয়তোবা এক দুপুরে কলার পাতা নিয়ে ওদের সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। সেই খিচুড়ি অমৃতের মতো লাগল। এর পর থেকে রোজই দুপুরবেলায় লঙ্গরখানায় খেতে যাই। একদিন বোনকেও নিয়ে গেলাম। সেও মহানন্দে কলার পাতা নিয়ে আমার সঙ্গে বসে গেল। খাওয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে এক ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে আমাদের দু-ভাইবোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বললেন, এরা কারা ?

ধরা পড়ে গেলাম। কানে ধরে আমাদের দুজনকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। আমার মা ক্রমাগত কাঁদতে লাগলেন। লঙ্গরখানায় খাওয়ার অপমানে তাঁর নাকি মাথা কাটা যাচ্ছে। লঙ্গরখানায় আমি পাতা পেতে খেয়েছি— এতে লজ্জিত বা অপমানিত বোধ করার কী আছে তা আমি ঐদিন বুঝতে পারিনি। আজও পারি না।

নিঃসন্তান গনি চাচার জীবনে এই সময় একটি বড় ঘটনা ঘটল। এক ভিখিরি-মা ছেলে কোলে নিয়ে এসেছে ভিক্ষা করতে। ফুটফুটে ছেলে। গনি চাচার ছেলেটাকে বড়ই পছন্দ হলো। তিনি প্রস্তাব দিলেই ছেলেটাকে তিনি আদরযত্নে বড় করবেন, তার বিনিময়ে ভিখিরি-মা দশ টাকা পাবে। কিন্তু কোনোদিন এই ছেলেকে তার ছেলে বলে দাবি করতে পারবে না। মা রাজি হয়ে গেল।

এই ঘটনা আমার মনে বড় ধরনের ছাপ ফেলে।

এখনো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখি, ভিখিরি-মা মুখ কালো করে ঘরের বারান্দাতে বসে আছে। গনি চাচার স্ত্রী তার ছেলে-কোলে বারান্দায় এসে ধমকাচ্ছেন— কী চাও তুমি ? তোমাকে না বলেছি, কখনো আসবে না! কেন এসেছ ?

ব্যথিত মা করুণচোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে উঠে চলে যাচ্ছে।

ভিখিরিণীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে গনি চাচা কয়েকবার বাড়ি বদল করলেন। কোনো লাভ হলো না। যেখানেই যান সেখানেই মা উপস্থিত হয়— সারাদিন বারান্দায় বসে থাকে।

শেষটায় গনি চাচা চেষ্টা-চরিত্র করে সিলেট থেকে বদলি হয়ে গেলেন। মৌলভীবাজার। হতদরিদ্র মা'র হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন একটি শিশু। আমার তখন

বয়স অল্প, খুবই অল্প। পৃথিবীর জটিলতা বোঝার বয়স নয়, তবুও মনে হলো— এটা অন্যায়। খুব বড় ধরনের অন্যায়। ঐ ভিখিরিণী-মা'র সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা হতো। আমি তার পেছনে পেছনে হাঁটতাম। বিড়বিড় করে সে নিজের মনে কথা বলত। নিজের দুপাশে থুথু ফেলতে ফেলতে এগুত। হয়তো তার মাথা-খারাপ হয়েছিল। একজন ভিখিরিণীর মাথা-খারাপ হওয়া এমন কোনো বড় ঘটনা নয়। জগৎসংসারের তাতে কিছুই যায় আসে না। পৃথিবী চলে তার নিজস্ব নিয়মে। সেইসব নিয়ম জানার জন্য একধরনের ব্যাকুলতা আমার মধ্যে হয়তো তৈরি হয়েছিল। অনেক ধরনের প্রশ্ন মনে আসত। কাউকে করতে পারতাম না। প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজের মনেই খুঁজতে হতো।

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়— এই প্রশ্নটা একদিন মনে এল। ভালো মানুষেরা বেহেশতে, খারাপ মানুষেরা দোজখে— এ সহজ উত্তর মনে ধরল না। মনে হলো— উত্তর এত সহজ নয়। মৃত্যু-সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নটি মনে আসার কারণ আছে। কারণটা বলি।

একদিন সিলেট সরকারি হাসপাতালের সামনে দিয়ে আসছি। হঠাৎ দেখি নর্দমায় একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকজন ভিড় করে দেখছে। কৌতূহল মিটে গেলে চলে যাচ্ছে। আমিও দেখতে লাগলাম। মৃতদেহ দেখে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। কারণ মৃত মানুষটির ঠোঁটে হাসি। তার চোখ বন্ধ, কিন্তু হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে আছে। দেখেই মনে হয় কোনো-একটা মজার ঘটনায় চোখ বন্ধ করে সে হাসছে। আমার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগল।

দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

মৃতদেহটির হাসিহাসি-মুখের ছবি নিজের মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারলাম না। বিকেলে আবার দেখতে গেলাম। মৃতদেহ আগের জায়গাতেই আছে। তার মুখের হাসিরও কোনো হেরফের হয়নি।

• পরদিন আবার গেলাম। লাশ সরানো হয়নি। তবে মুখের হাসি আর চোখে পড়ল না। অসংখ্য লাল পিঁপড়ায় সারা শরীর ঢাকা। লোকটির গায়ে যেন লাল রঙের একটা চাদর। খুব ইচ্ছা করল চাদর সরিয়ে তার মুখটি আরেকবার দেখি। দেখি, এখনো কি সেই মুখে হাসি লেগে আছে?

আমি বাসায় ফিরলাম কাঁদতে কাঁদতে। বাসায় ফিরেই শুনি, বাবার চিঠি এসেছে— আমরা সিলেটে আর থাকব না। চলে যাব দিনাজপুর, জায়গাটার নাম জগদল। মৃত মানুষটির কথা আর মনে রইল না। আনন্দে লাফাতে লাগলাম।

'মৃত লোকটির কথা আর মনে রইল না'— বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। মনে ঠিকই রইল, তবে চাপা পড়ে গেল। একমাত্র শিশুরাই পারে সব ঘটনা সহজ ভঙ্গিতে গ্রহণ করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে। তারা একটি স্মৃতি থেকে অতি দ্রুত চলে যেতে পারে অন্য স্মৃতিতে। সব আলাদা আলাদা রাখা। ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। মাঝে মাঝে

ঢাকনার মুখ তুলে দেখে নেয় সব ঠিকঠাক আছে কি না। কোনোকিছুই সে নষ্ট করতে বা ফেলে দিতে রাজি না।

কষ্টকর স্মৃতি মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা আমি শুধু বড়দের মধ্যেই দেখি। শিশুদের মধ্যে দেখি না।

আমার বন্ধু উনু

উনুর সঙ্গে আমার পরিচয় ফুটবল খেলার মাঠে। রোগা টিঙটিঙে একটা ছেলে— বড় বড় চোখ, খাদা নাক, মাথাভরতি ঝাঁকড়া চুল।

দুদলে তুমুল খেলা চলছে। আমি মাঠের বাইরে। গায়ে জ্বর বলে খেলতে পারছি না। জ্বর এমন বাড়াবাড়ি যে বসে থাকতে পারছি না আবার উঠে চলে যেতেও পারছি না। এমন সময় উনুকে লক্ষ করলাম। যে খুব মন দিয়ে ঘাস খাচ্ছে।

সত্যি সত্যি ঘাস খাচ্ছে। দু'আঙুলে ঘাসের কচি পাতা দ্রুত তুলে চপচপ শব্দে চিবিয়ে খাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, ঘাস খাচ্ছ কেন?

সে গম্ভীর গলায় বলল, আমার ইচ্ছা।

বলে পুরো সুফি-সাধকদের নির্লিপ্ততা নিয়ে ঘাস চিবুতে লাগল। এমনভাবে চিবুচ্ছে যেন অতি উপাদেয় কোনো খাবার। তার খাওয়া দেখে জিভে পানি চলে আসে। আমি কৌতূহল সামলাতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, ঘাস খাচ্ছ কেন?

সে উদাস গলায় বলল, ভাইটামিন আছে।

এরকম একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব না হওয়ার কোনো কারণই নেই। দশ মিনিটের মাথায় আমরা জন্মের বন্ধু হয়ে গেলাম। সে শিখিয়ে দিল ঘাসের কোন অংশ খেতে হয়, কোন অংশ খেতে হয় না। দুটা পাতার মাঝখানে সুতার মতো যে-ঘাসটা বের হয় সেটাই খাদ্য, তবে ডগার খানিকটা বাদ দিতে হবে। ডগাটা বিষ।

উনু আমার চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়ে। আমাদের স্কুলে না, অন্য কী-একটা স্কুলে। তার মা নেই, বাবার সঙ্গে থাকে। বাবা প্রতিদিন রুটিন করে উনুকে দুবেলা মারেন। স্কুল থেকে ফিরে আসার পর একবার, সন্ধ্যাবেলা খেলার মাঠ থেকে ফিরে আসার পর একবার। সেই মারও দর্শনীয় মার। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মারপর্ব শেষ হবার পরই দুজনই অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যেন কিছুই হয়নি।

উনুর বাবা ছোট চাকরি করতেন। বাসার সাজসজ্জা অতি দরিদ্র। বাঁশের বেড়ার ঘর। পাশেই ডোবা। ময়লা নোংরা পানি। খেলা শেষ করে বাসায় ফিরে উনু সেই

নোংরা পানিতে দিব্বি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলে।

উনুর বাবাকে মানুষ হিসেবে আমার খুব পছন্দ হলো। ছোটদের সঙ্গে কথা বলেন এমনভাবে যেন তারা ছোট না। তাঁর সমবয়স্ক মানুষ। আমাকে একদিন বললেন, এই যে আই আই চুন্দ্রীগর সাহেব দেশের ভার নিল, লোকটা কেমন ? তোমার কি মনে হয় উনিশ-বিশ কিছু হবে ?

আই আই চুন্দ্রীগর কে, সে কবেই-বা দেশের ভার নিল কিছুই জানি না। তবু খুব বুঝদার মানুষের মতো মাথা নাড়লাম। মুখে বললাম, হবে।

উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মনে হয় না। সব এক। দেয়াশলাইয়ের কাঠি। ফুস কইরা একবার জ্বলল, তারপর শেষ। চমৎকার সব উপমা আমি ওঁর কাছে শুনেছি। যেমন মেয়েমানুষ সম্পর্কে তাঁর একটা ছড়া—

'মায়ে পুরা
ভইনে থুরা
কন্যায় পাই,
স্ত্রীর কপালে
কিছুই নাই।'

এই ছড়ার অর্থ জানি না। অসংখ্যবার তাঁর কাছে শুনেছি বলে এখনো মনে আছে।

উনু একবার আমাকে চিতইপিঠা খাওয়াবার দাওয়াত দিল। তার বাবা চিতইপিঠা বানাবেন। যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। উঠোনে চুলায় পিঠা সেকা হচ্ছে। পিতা এবং পুত্র মিলে পিঠা বানাচ্ছে। গল্পগুজব করতে করতে পিঠা খাওয়া হচ্ছে। ওদের দুজনকে দেখে যা হিংসা লাগল! মনে হলো ওরা কত সুখী। আমার যদি মা না থাকত কী চমৎকার হতো!

উনুর কপালে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। তার বাবা বিয়ে করে ফেললেন। উনু গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, সৎমার সংসারে থাকব না। দেশান্তর হব।

আমি বললাম, কোথায় যাবে ?

এখনো ঠিক করি নাই। ত্রিপুরা, আসাম এক জায়গায় গেলেই হয়।

প্রাণের বন্ধুকে একা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক করলাম আমিও সঙ্গে যাব। বন্ধু শোকে আমার ভেতরেও খানিকটা বৈরাগ্য এসে গেছে।

এক সকালে সিলেট রেলস্টেশন থেকে ছাড়ছে এমন একটি ট্রেনের কামরায় দুজন উঠে বসলাম। ট্রেন কোথায় যাচ্ছে কিছুই জানি না। ট্রেন ছাড়ার পরপরই আমার মন থেকে দেশান্তরি হবার যাবতীয় আগ্রহ কর্পূরের মতো উবে গেল। বাসার জন্য খুব যে মন-খারাপ হলো তা না। প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির হলাম এই ভেবে যদি টিকিট চেকার ওঠে তখন কী হবে! কান্না শুরু করলাম। ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে

কান্নার শব্দও বাড়তে লাগল। কেন জানি বাকি ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে নেই। আবছা আবছা মনে আছে। পরের স্টেশনে আমাদের নামিয়ে দেয়া হলো। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক বাসে করে আমাদের সিলেট শহরে পৌঁছে দেন। আমার ভেতর থেকে দেশান্তরি হবার আগ্রহ পুরোপুরি চলে গেলেও উনুর ভেতর সেটা থেকেই যায়। প্রতি মাসে অন্তত একবার হলেও সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তিন-চারদিন কোথায় কোথায় কাটিয়ে আবার ফিরে আসে।

উনু শুধু যে আমার বন্ধু ছিল তা-ই না, শিক্ষকও ছিল। জগতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি। যেমন আকাশে প্লেন দেখলেই দৌড়ে গাছের নিচে কিংবা বাড়ির ভেতর ঢোকা উচিত। কারণ প্লেনের যাত্রীরা পেসাব-পায়খানা করলে তা মাথায় এসে পড়তে পারে।

নানান ওষুধপত্রের টোটকা দাওয়াইও তার জানা ছিল। যেমন মুখে ডিম নিয়ে যেসব লাল লাল পিঁপড়া হেঁটে যায় ঐসব পিঁপড়া দৈনিক পাঁচটা করে খেলে অর্শরোগ সেরে যায়।

যেহেতু আমার অর্শরোগ ছিল না কাজেই সেই মহৌষধ পরীক্ষা করে দেখা হয়ে ওঠেনি।

উনুকে আমি কখনো হাসিখুশি দেখিনি। সারাক্ষণ সে চিন্তিত ও বিষণ্ন। শুধু একদিন হাসতে হাসতে দৌড়ে তাকে আমাদের বাসার দিকে আসতে দেখা গেল। জানলাম তার একটা বোন হয়েছে। দেখতে সে নাকি পরীর মতো সুন্দর। জন্মের পরপর সে হাসতে শিখে গেছে। সারাক্ষণ নাকি হাসছে।

আমি পরদিন সদাহাস্যময়ী উনুর ভগিনীকে দেখতে গেলাম। উনুর মা শাড়ির আঁচল ফাঁক করে লাল টুকটুকে শিশুটিকে দেখিয়ে খুশি-খুশি গলায় বললেন, নজর লাগাইও না। মাটিতে থুক দেও। যাতে শিশুটির উপর নজর না লাগে সেজন্যেই আমি এবং উনু দুজনই মাটিতে একগাদা থুথু ফেললাম। এই ঘটনার খুব সম্ভব এক সপ্তাহের ভেতর উনুর বাবা সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন।

অন্যের দুঃখে অভিভূত হবার মতো বয়স বা মানসিকতা কোনোটাই তখন ছিল না। কাজেই এই ঘটনা আমার মনে কোনো ছাপ ফেলল না। আমাদের বাসায়ও তখন বড় ধরনের সমস্যা। গনি চাচার চাকরি চলে গেছে। অ্যান্টিকরাপশনের মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। জেল হয়ে যাবে, মোটামুটি নিশ্চিত। তিনি কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাঁর স্ত্রী এবং পালক-পুত্রকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসে উঠেছেন। গনি চাচার স্ত্রী রাতদিন কাঁদেন। সেই কান্নাও ভয়াবহ কান্না। চিৎকার, মাটিতে গড়াগড়ি। আমরা ছোটরা অবাক হয়ে দেখি।

গনি চাচা উঠোনে পাটি পেতে সারাদিন শুয়ে থাকেন এবং তালপাতার পাখায় হাওয়া খান। দীর্ঘদিন তাঁরা আমাদের বাসায় রইলেন। দুটি সংসার টানতে গিয়ে মা হিমশিম খেয়ে গেলেন। তাঁর অতি সামান্য যেসব সোনার গয়না ছিল সব বিক্রি হয়ে

গেল। সেবার ঈদে আমরা কেউ কোনো কাপড় পেলাম না। আমাদের বলা হলো, অল্পদিন পরেই বড় ঈদ আসছে। বড় ঈদে সবাই ডাবল ডাবল কাপড় পাব।

যেহেতু খানিকটা বড় হয়েছি চারপাশের জগৎ কিছুটা হলেও বুঝতে শিখেছি, সে-কারণে মনের কষ্ট পুরোপুরি দূর করতে পারছি না। মন-খারাপ করে ঘুরে বেড়াই। আশেপাশের বাচ্চারা বাবাদের হাত ধরে দোকানে যায়। কলরব করতে করতে ফিরে আসে।

মনের কষ্ট দূর করতে উনুর চেয়ে ভালো কেউ নেই। মুহূর্তের মধ্যে সে অন্যের মন-খারাপ ভাব দূর করে দিতে পারে, যদিও সে নিজে আগের চেয়েও বিষণ্ন হয়ে যায়।

উনুকে বাসায় পেলাম না, উনুর মা'কেও না। তারা সবাই কোথায় নাকি চলে গেছে। খুব খারাপ লাগল। উনুদের পাশের বাসার এক ছেলে বলল, উনু জল্লারপাড়ের এক চায়ের দোকানে কাজ করে। বাবাবিহীন সংসারের দায়িত্ব এই বয়সেই সে মাথায় নিয়ে নিয়েছে।

খুঁজে খুঁজে একদিন তাকে বের করলাম। ময়লা হাফপ্যান্ট পরা। টেবিলে-টেবিলে চা দিচ্ছে। আমি বাইরে থেকে ডাকলাম— এই উনু! সে তাকাল কিন্তু দোকান থেকে বেরিয়ে এল না।

বাসায় ফিরে এলাম।

বাসায় খুব আনন্দ। খুব উত্তেজনা। বাবা জগদল থেকে আমাদের নিতে এসেছেন। এবং ঘোষণা করেছেন এই ঈদেই আমাদের সবাইকে কাপড় এবং জুতা দেয়া হবে। কেনাও হবে আজ।

আনন্দে লাফাতে লাগলাম।

উনুর কথা মনে রইল না।

জগদলের দিন

আমার শৈশবের অদ্ভুত স্বপ্নময় কিছুদিন কেটেছে জগদলে। জগদলের দিন আনন্দময় হবার অনেকগুলো কারণের প্রধান কারণ স্কুলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। সেখানে কোনো স্কুল নেই। কাজেই পড়াশোনার যন্ত্রণা নেই। মুক্তির মহানন্দ।

আমরা থাকি এক মহারাজার বসতবাড়িতে, যে-বাড়ির মালিক অল্প কিছুদিন আগেই দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে চলে গেছেন। বাড়ি চলে এসেছে পাকিস্তান সরকারের হাতে। মহারাজার বিশাল এবং প্রাচীন বাড়ির একতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা।

দুতলাটা তালাবদ্ধ। শুধু দুতলা নয়, কয়েকটা ঘর ছাড়া বাকি সবটা তালাবদ্ধ। কারণ মহারাজা জিনিসপত্র কিছুই নিয়ে যাননি। ঐসব ঘরে তাঁর জিনিসপত্র রাখা।

ঐ মহারাজার নাম আমার জানা নেই। মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনিও বলতে পারলেন না। তবে তিনি যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ এই বাড়িতে ছড়ানো। জঙ্গলের ভেতর বাড়ি। সেই বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর ছিল নিজস্ব জেনারেটর। দাওয়াতের চিঠি ছেপে পাঠানোর জন্যে মিনি সাইজের একটা ছাপাখানা।

বাবাকে অসংখ্যবার বলতে শুনেছি— মহারাজার রুচি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। আহা, কত বই! কত বিচিত্র ধরনের বই।

বাবা অনেক লেখালেখি করলেন, যাতে বইগুলো অন্তত সরকারি পর্যায়ে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। তাঁর লেখালেখিতে কোনো কাজ হলো না। বাবা কতবার যে গভীর বেদনায় বললেন— আহা, চোখের সামনে বইগুলো নষ্ট হচ্ছে, কিছু করতে পারছি না! তিনি ইচ্ছা করলেই সমস্ত বই নিজের সংগ্রহে যুক্ত করতে পারতেন। তাতে বইগুলো রক্ষা পেত। তিনি তা করলেন না। পরের জিনিস নিজের মনে করার প্রশ্নই আসে না। তিনি হাহুতাশ করতে লাগলেন। চোখের সামনে বই নষ্ট হতে লাগল। হোক নষ্ট, তাতে আমাদের অর্থাৎ ছোটদের তেমন কিছুই যায় আসে না। কারণ আমাদের সামনে অন্য একটি জগৎ খুলে গেছে।

বাড়ির সামনে বিশাল বন। একটু দূরেই নদী, যে-নদীর পানি কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। নদীর তীরে বালি ঝিকমিক করে জ্বলে। নদীটিই পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার সীমানা। সারাক্ষণ অপেক্ষা করতাম কখন দুপুর হবে— নদীতে যাব গোসল করতে। একবার নদীতে নামলে ওঠার নাম নেই। তিন ভাইবোন নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি, বড়রা হয়তো একজনকে জোর করে ধরে পাড়ে নিয়ে রাখল। আনতে গেল অন্যজনকে। এই ফাঁকে পাড়ে যে আছে সে লাফিয়ে নামল।

বিকেলগুলোও কম রোমাঞ্চকর ছিল না। প্রতিদিনই বাবা কাঁধে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে বলতেন— চল বনে বেড়াতে যাই। কাঁধে বন্দুক নেয়ার কারণ হচ্ছে প্রায়ই বাঘ বের হয়। বিশেষ করে চিতাবাঘ।

বাবার সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত বনে ঘুরতাম। ক্লান্ত হয়ে ফিরতাম রাতে। ভাত খাওয়ার আগেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত। কত বিচিত্র শব্দ আসত বন থেকে। আনন্দে এবং আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠতাম।

সবাই ঘুমুতাম একটা ঘরে। বিশাল তিনটা খাট একত্র করে ফুটবলের মাঠের আকৃতির একটা বিছানা তৈরি করা হতো। বিছানার উপরে সেই মাপে তৈরি এক মশারি। রাতে বাথরুম পেলে মশারির ভেতর থেকে নামা নিষিদ্ধ ছিল, কারণ খুব কাঁকড়াবিছা এবং সাপের উপদ্রপ।

কাঁকড়াবিছাগুলো সাপের মতোই মারাত্মক। একবার কামড়ালে বাঁচার আশা নেই, এমনি তার বিষ। মৃত্যু সঙ্গে নিয়ে কাঁকড়াবিছা মেঝেতে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, আমি বিছানায় বসে মুগ্ধ হয়ে দেখছি— এই ছবি এখনো চোখে ভাসে।

আমাদের আশেপাশে কোনো জনমানব ছিল না। অনেক দূরে বনের ভেতর একজন কম্পাউন্ডার থাকতেন। সভ্য মানুষ বলতে তিনিই। তাঁর বড় মেয়েটির নাম আরতি। আমার বয়সী, বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে। দেবী প্রতিমার মতো শান্ত মুখশ্রী, কিন্তু সেই শ্রীময়ী চেহারার সঙ্গে স্বভাবের কোনো মিল নেই। একদিন সকালে আমাদের বাসার সামনে এসে মিহি সুরে ডাকতে লাগল— কাজল, এই কাজল!

আমি বের হয়ে এলাম। যেন কত দীর্ঘদিনের চেনা সেই ভঙ্গিতে বলল, বনে বেড়াতে যাবে ? উচ্চারণ বিশুদ্ধ শান্তিপুরী। গলার স্বরটিও ভারি মিষ্টি। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, হ্যাঁ।

সে আমাকে নিয়ে বনে ঢুকে গেল। ক্রমেই সে ভেতরের দিকে যাচ্ছে। আমি একসময় শঙ্কিত হয়ে বললাম, ফেরার পথ মনে আছে ? সে আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যেন এরকম অদ্ভুত কথা কখনো শোনেনি। তারপরই হঠাৎ একটা দৌড় দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আমি ভাবলাম, নিশ্চয় লুকোচুরি জাতীয় কোনো খেলা। আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা। আমি খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে করতে কাতর গলায় ডাকতে লাগলাম— আরতি, এই আরতি!

তার কোনো খোঁজ নেই। এই অদ্ভুত মেয়ে আমাকে বনে রেখে বাসায় চলে গেছে।

আমি পথ খুঁজে বের করতে গিয়ে আরো গভীর বনে ঢুকে পড়লাম। একসময় দিশাহারা হয়ে কাঁদতে বসলাম। জনৈক কাঠকুড়ানো সাঁওতাল যুবক এই অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

এর দিন পাঁচেক পর আরতি আবার এসে ডাকতে লাগল— এই কাজল, এই— আমি বের হওয়ামাত্র বলল, বনে যাবে ?

আমি খুব ভালো করে জানি, এই মেয়ে আমাকে আবার আগের দিনের মতো গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে আসবে। তবু তার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না। পরে যা হবার হবে। আপাতত খানিকক্ষণ এই রূপবতী পাগলি মেয়ের সঙ্গে থাকা যাক। সেদিনও সে তা-ই করল। এর জন্যে তার উপর আমার কোনোরকম রাগ হলো না। বরং মনে হলো, এই মেয়েটির পাশাপাশি থাকার বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারি। এই মোহকে কী বলা যায় ? প্রেম ? প্রেম সম্পর্কে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা তো এখানে খাটে না। তা হলে এই প্রচণ্ড মোহের জন্ম কোথায় ? আমি জানি না। শুধু জানি, মেয়েটির বাবা একদিন তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে ইন্ডিয়া চলে যান। এই খবর পেয়ে

গভীর শোকে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকি। মা যখন জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে ? আমি বললাম, পেটে ব্যথা। বলে আরো উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলাম। পেটব্যথার ওষুধ হিসেবে পেটের নিচে বালিশ দিয়ে আমাকে সারাদিন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হলো। বাবা আমাকে দুফোঁটা বায়োকেমিক ওষুধ দিলেন। তখন তিনি বায়োকেমিক ওষুধ নিয়ে খুব মেতেছেন। চমৎকার একটা ব্যাগে তাঁর ওষুধ থাকে। বারোটা শিশির বারো রকমের ওষুধ। পৃথিবীর সব রোগব্যাধি এই শিশির ঔষধে আরোগ্য হয়। অনেকটা হোমিওপ্যাথির মতো। তবে হোমিওপ্যাথিতে যেমন ওষুধের সংখ্যা অনেক, এখানে মাত্র বারোটা।

বাবার বায়োকেমিক চিকিৎসায় আমার বিরহব্যথা অনেকটা দূর হলো। এই পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়— এমন মনোভাব নিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। কিছুক্ষণের ভেতরই আবার বিছানায় উঠতে হলো। কারণ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। বাবা-মা দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল— লক্ষণ ভালো নয়। নিশ্চয় ম্যালেরিয়া। সেই সময়ে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া কুখ্যাত ছিল। একবার কাউকে ধরলে তার জীবনীশক্তি পুরোপুরি নিঃশেষ করে দিত। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমরা প্রতিষেধক হিসেবে বায়োকেমিক ওষুধ ছাড়াও প্রতি রবিবারে পাঁচ গ্রেন করে কুইনাইন খাচ্ছি। তার পরও ম্যালেরিয়া ধরবে কেন ?

বাবা এই ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে বদলির জন্য চেষ্টা-তদবির করতে লাগলেন। শুনে আমার মন ভেঙে গেল। এত সুন্দর জায়গা, এমন চমৎকার জীবন— এসব ছেড়ে কোথায় যাব ? ম্যালেরিয়ায় মরতে হলেও এখানেই মরব। তাছাড়া ম্যালেরিয়া অসুখটা আমার বেশ পছন্দ হলো। যখন জ্বর আসে তখন কী প্রচণ্ড শীতই-না লাগে! শীতের জন্যেই বোধহয় শরীরে একধরনের আবেশ সৃষ্টি হয়। জ্বর যখন বাড়তে থাকে তখন চোখের সামনের প্রতিটি জিনিস আকৃতিতে ছোট হতে থাকে। দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে। একসময় নিজেকে বিশাল দৈত্যের মতো মনে হয়। কী আশ্চর্য অনুভূতি!

শুধু আমি একা নই, পালা করে আমরা সব ভাইবোন জ্বরে পড়তে লাগলাম। একজন জ্বর থেকে উঠতেই অন্যজন জ্বরে পড়ে। জ্বর আসেও খুব নিয়মিত। আমরা সবাই জানি কখন জ্বর আসবে। সেই সময়ে লেপ-কাঁথা গায়ে জড়িয়ে আগেভাগেই বিছানায় শুয়ে পড়ি।

প্রতিদিন ভোরে তিন ভাইবোন রাজবাড়ির মন্দিরের চাতালে বসে রোদ গায়ে মাখি। এই সময় আমাদের সঙ্গ দেয় বেঙ্গল টাইগার। বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে আমাদের কুকুরের নাম। না, আমাদের কুকুর নয়, মহারাজার কুকুর। তাঁর নাকি অনেকগুলো কুকুর ছিল। তিনি সবক'টাকে নিয়ে যান, কিন্তু এই কুকুরটিকে নিতে পারেননি। সে কিছুতেই রাজবাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি।

মা তাকে দুবেলা খাবার দেন। মাটিতে খাবার ঢেলে দিলে সে খায় না। থালায় করে দিতে হয়। শুধু তাই না, খাবার দেবার পর তাকে মুখে বলতে হয়— খাও।

খানদানি কুকুর। আদব-কায়দা খুব ভালো। তবে বয়সের ভারে সে কাবু। সারাদিন বাড়ির সামনে শুয়ে থাকে। হাই তোলে, ঝিমুতে ঝিমুতে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে।

এক ভোরবেলার কথা। আমার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। আমি কম্বল গায়ে দিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে আছি। আমার সঙ্গে শেফু এবং ইকবাল। মা এসে আমাদের মাঝখানে শাহীনকে [আমার ছোট ভাই] বসিয়ে দিয়ে গেলেন। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তার দিকে নজর রাখা, সে যেন হামাগুড়ি দিয়ে চাতাল থেকে পড়ে না যায়।

মা চলে যাবার পরপরই হিসহিস শব্দে পেছনে ফিরে তাকালাম। যে-দৃশ্য দেখলাম সে-দৃশ্য দেখার জন্য মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। মন্দিরের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে প্রকাণ্ড একটি কেউটে সাপ বের হয়ে আসছে। মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে। ফণা তুলে এদিক-ওদিক দেখছে, আবার মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে, আবার ফণা তোলে। আমরা তিন ভাইবোন ছিটকে সরে গেলাম। শাহীন একা বসে রইল, সাপ দেখে তার আনন্দের সীমা নেই। সে চেষ্টা করছে সাপটির দিকে এগিয়ে যেতে। আর তখনই বেঙ্গল টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপটির উপর। ঘটনা এত দ্রুত ঘটল যে আমরা কয়েক মুহূর্ত বুঝতেই পারলাম না কী হচ্ছে। একসময় শুধু দেখলাম কুকুরটা সাপের ফণা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। বেঙ্গল টাইগার ফিরে যাচ্ছে নিজের জায়গায়। যেন কিছুই হয়নি। নিজের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড সে শেষ করল।

সাপ কুকুরটিকে কামড়াবার সুযোগ পেয়েছিল কি না জানি না। সম্ভবত কামড়ায়নি। কারণ কুকুরটি বেঁচে রইল, তবে নড়াচড়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। দ্বিতীয় দিনে তার চামড়া খসে পড়ল এবং দগদগে ঘা দেখা দিল। এই থেকে মনে হয় সাপ সম্ভবত কামড়েছে। সাপের বিষ কুকুরের ক্ষেত্রে হয়তো তেমন ভয়াবহ নয়।

আরো দুদিন কাটল। কুকুরটি চোখের সামনে পচেগলে যাচ্ছে। তার কাতরধ্বনি সহ্য করা মুশকিল। গা থেকে গলিত মাংসের দুর্গন্ধ আসছে।

বাবা মাকে ডেকে বললেন, আমি এর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। তুমি বন্দুক বের করে আমাকে দাও।

বাবা আমাদের চোখের সামনে পরপর দুটি গুলি করে কুকুরটিকে মারলেন। শান্ত গলায় বললেন, যে আমার ছেলের জীবন রক্ষা করেছে তাকে আমি গুলি করে মারলাম। একে বলে নিয়তি।

আমার কাছে বাবাকে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম মানুষদের একজন বলে মনে হলো। নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না এমন একটি কাজ তিনি কী করে করতে পারলেন। রাগে, দুঃখে ও অভিমানে রাতে ভাত না খেয়ে শুয়ে পড়েছি। বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে বারান্দায় বসালেন।

দুজন চুপচাপ বসে আছি। চারদিকে ঘন অন্ধকার। তক্ষক ডাকছে। বাড়ির চারপাশের আমের বনে হাওয়া লেগে বিচিত্র শব্দ উঠছে।

বাবা কিছুই বললেন না। হয়তো অনেক কিছুই তাঁর মনে ছিল। মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলেন না। একসময় বললেন, যাও ঘুমিয়ে পড়ো।

কুকুরটি আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

আমার মনে আছে— এই নিয়ে আমি কিছু-একটা লিখতে চেষ্টাও করেছিলাম। রচনাটির নাম দিয়েছিলাম 'বেঙ্গল টাইগার' কিংবা 'আমাদের বেঙ্গল টাইগার'। সম্ভবত এই রচনাই আমার প্রথম সাহিত্য। বলাই বাহুল্য, অতি তুচ্ছ রচনা। কিন্তু হৃদয়ের গভীর যাতনায় যার জন্ম তাকে তুচ্ছই-বা করি কী করে ?

জগদলে বেশিদিন থাকা হলো না। বাবা বদলি হলেন দিনাজপুরের পচাগড়ে [পঞ্চগড়]। এই জায়গা সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে ভোরবেলা বাসার সামনে এসে দাঁড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল চূড়া দেখা যেত। মনে হতো পাহাড়টা রুপার পাতে মোড়া। সূর্যের আলো পড়ে সেই রুপা চকচক করছে। বাবা আমাদের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করবার জন্যেই হয়তো এক ভোরবেলায় ঘোষণা করলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে যে একটা কবিতা লিখতে পারবে সে চার আনা পয়সা পাবে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো কবিতা দাঁড় করাতে পারলাম না। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আরো মন-খারাপ হলো যখন আমাদের তিন ভাইবোনকে স্কুলে ভরতি করিয়ে দেয়া হলো।

স্কুলে ভরতি করতে নিয়ে গেলেন বড়মামা। তিনজনই কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছি। এই পৃথিবীর হৃদয়হীনতা কেউই সহ্য করতে পারছি না। বড়মামা উপদেশ দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছেন— বিদ্যা অমূল্য ধন, পড়াশোনা করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে— এইসব।

অমূল্য ধন বা গাড়ি-ঘোড়া কোনোকিছুরই প্রতি আকর্ষণ বোধ করছি না।

বড়মামা আমাদের চোখের জল অগ্রাহ্য করে স্কুলে ভরতি করিয়ে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আমি বিনা বেতনে আপনাদের স্কুলে পড়াব। আপাতত আমার কিছু করার নেই। হাতে প্রচুর অবসর।

হেডমাস্টার রাজি হলেন। আমি খানিকটা আশার আলো দেখতে পেলাম। যা-ই হোক, একজন স্যার হলেন আমাদের নিজেদের লোক এবং অতি প্রিয় মানুষ। স্কুলের দিনগুলো হয়তো খারাপ যাবে না। দ্বিতীয় দিনেই বড়মামা আমাদের ক্লাসে অঙ্ক করাতে এলেন। আমি হাসিমুখে চেঁচিয়ে উঠলাম— বড়মামা।

মামার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। হুঙ্কার দিয়ে বললেন— মামা ? মামা মানে ? চড় দিয়ে সব দাঁত খুলে ফেলব। স্কুলে আমি তোমাকে চিনি না। তুমিও আমাকে চেন না। বলো, ৬-এর ঘরের নামতা বলো। পাঁচ ছয় কত ?

আমি হতভম্ব।

একী বিপদ! ছয়ের ঘরের নামতা যে জানি না— এটা বড়মামা খুব ভালো করেই জানেন। কারণ তিনি আমাদের পড়ান।

তিনি দুনিয়া-কাঁপানো হুঙ্কার দিলেন, কী, পারবে না?

না।

না আবার কী? বলো, জি না।

জি না।

বলো, জি না স্যার।

জি না স্যার।

না পারার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আত্মীয় বলে আমার কাছ থেকে পার পাওয়া যাবে না। আমার চোখে সব সমান। সবাই ছাত্র। ক্লাস-ক্যাপ্টেন কোথায়? যাও, বেত নিয়ে আসো।

বেত আনা হলো। এবং সত্যি সত্যি বড়মামা ছয়টি বেতের বাড়ি দিলেন— যেহেতু ছয়ের ঘরের নামতা।

স্কুলে মোটামুটি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে গেল। ছাত্রমহলে রটে গেল ভয়ঙ্কর রাগী একজন স্যার এসেছেন। অতি কড়া, তার ক্লাসে নিশ্বাস ফেলা যায় না।

বড়মামার চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। স্থানীয় এস.ডি.ও. সাহেবের ছোট ভাইকে কানে ধরে উঠবস করাবার কারণে তাঁর চাকরি চলে গেল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বড়মামা আবার আগের মূর্তিতে ফিরে এসেছেন। গল্প করছেন, আমাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায় গেলে নাকি রাতেরবেলা দার্জিলিং শহরের বাতি দেখা যায়, নিয়ে গেলেন।

গভীর রাত পর্যন্ত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছি। দার্জিলিং শহরের বাতি আর দেখছি না। উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। কিছুই দেখা গেল না। বড় মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, ওদের আজ বোধহয় ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে। আরেকদিন আসতে হবে। অসাধারণ দৃশ্য! না দেখলে জীবন বৃথা।

একদিন সাইকেলের সামনে বসিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন পাহাড়ি নদী দেখাতে। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে নালার মতো একটা জলধারা পাওয়া গেল। মামা বললেন, তুমি ঘুরে বেড়াও। আমি এই ফাঁকে একটা কবিতা লিখে ফেলি। মামা নদীর পাড়ে বসে রুলটানা খাতায় কবিতা লিখতে বসলেন। দীর্ঘ কবিতা লেখা হল। কবিতার নামটা মনে আছে।

'হে পাহাড়ী নদী'।

বড়মামার এই কবিতা স্থানীয় একটি পত্রিকায় ছাপাও হলো। পচাগড়ের দিনগুলো আমাদের কাছে একসময় সহনীয় হয়ে উঠল এবং ভালো লাগতে লাগল। আমার একজন বন্ধু জুটে গেল যে নর্দমার পানিতে মাছ মারার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। দুজনেই বড়শি-হাতে নর্দমায় নর্দমায় ঘুরে বেড়াই। নর্দমায় ট্যাংরা, লাটি

এবং পুঁটিমাছ পাওয়া যায়। আমার বন্ধুর পকেটে নারিকেলের মালায় থাকে কেঁচো। সে পকেটে হাতে ঢুকিয়ে এক টুকরা কেঁচো নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বড়শিতে গেঁথে পানিতে ফেলে দেয়। দেখতে বড় ভালো লাগে।

শেষ পর্বে শঙ্খনদী

পচাগড় থেকে বাবা বদলি হলেন রাঙ্গামাটিতে।

দেশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। ভাগ্য ভালো হলে দেখা যাবে রাঙ্গামাটি খুব জঙ্গলি জায়গা— স্কুল নেই। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, স্কুল আছে নাকি ?

তিনি বললেন, অবশ্যই আছে। স্কুল থাকবে না কেন ? রাঙ্গামাটি বেশ বড় শহর। খুব সুন্দর শহর!

স্কুল আছে শুনে একটু মনমরা হয়ে গেলাম। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছুই নেই। কাবাবে হাড্ডি থাকে, চাঁদে থাকে কলঙ্ক। স্কুলের যন্ত্রণা সহ্য করতেই হবে বলে মনে হচ্ছে।

চিটাগাং থেকে রাঙ্গামাটি যেতে হয় লক্কর-মার্কা বাসে। রাস্তা অসম্ভব খারাপ। পাহাড়ের গা-ঘেঁসে বাস যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন বাসের হেল্পার চেঁচিয়ে বলে, আল্লাহর নাম নেন। ইসটার্ট বন্ধ হইতে পারে।

সত্যি সত্যি স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ভবিষ্যদ্বাণী এমন ফলে গেছে দেখে কন্ডাকটারের মুখে বিমলানন্দের হাসি। ড্রাইভার বাস থেকে বের হয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিড়ি খাচ্ছে। তার নির্বিকার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রায়ই ঘটে।

বাস কখন ছাড়বে জিজ্ঞেস করতেই সে সুফি-সাধকের মতো নির্লিপ্ত গলায় বলল, আল্লাহর হুকুম হইলেই ছাড়ব। আমরা বাসযাত্রীরা বাস থেকে নেমে আল্লাহর হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মা আমাদের সর্বকনিষ্ঠ বোনটির কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ ভ্রমণে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ক্রমাগত কাঁদছে। বাবা আমাদের নিয়ে বের হয়েছেন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগুচ্ছি— এ কোথায় এসে পড়লাম ? স্বপ্নপুরীর মতো সুন্দর দেশ। চারদিকে পাহাড়ের সারি ঢেউয়ের মতো দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। মাথার উপর ঘন নীল আকাশ। বাতাসে কেমন যেন বুনো বুনো গন্ধ। রাস্তার পাশ ঘেঁসে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। কী পরিষ্কার তার পানি! বাসযাত্রীরা আঁজলা ভরে সেই পানি খাচ্ছে।

কিছুদূর এগুতেই যে-দৃশ্য দেখলাম তা দেখার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। হাতির খেদা থেকে ধরে-আনা একপাল হাতি। প্রতিটি হাতির পা দড়ি এবং শিকল দিয়ে বাঁধা। রুগ্‌ণ ভয়ার্ত চেহারা। সবমিলিয়ে সাত থেকে আটটা হাতি। দুটি হাতির বাচ্চাও আছে। এরা বাঁধা নয়, ছোটাছুটি করছে। দেখতে অবিকল পুতুলের মতো। বাচ্চা দুটি দেখে মনে হলো তারা সময়টা কাটাচ্ছে খুব আনন্দে।

খেদার মালিক এগিয়ে এলেন। বাবাকে বললেন— সর্বমোট একুশটা হাতি ধরা পড়েছে। দশটা বিক্রি হয়েছে, তিনটা মারা গেছে। এখানে যে-ক'টা আছে সে-ক'টাও মারা যাবে। কোনো হাতি কিছু খাচ্ছে না। খেদার মালিক বলল, হাতির বাচ্চা একটা নেবেন নাকি স্যার ?

বাবা কিছু বলবার আগেই আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, নেব নেব।

বাবার মুখ দেখে মনে হলো প্রস্তাবটা তিনি একেবারে ফেলে দিচ্ছেন না।

বিবেচনাধীন আছে। তিনি নিচু গলায় বললেন, দাম কত ?

দাম নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। বলতে গেলে বিনা দামে বিক্রি হবে। আপনি চান কি না বলেন। নিলে আমার উপকার হয়। বাচ্চা দুটা এখন সমস্যা। ডিসি সাহেব একটা নিবেন বলেছিলেন, এখন বলছেন— না।

হাতির বাচ্চা শেষ পর্যন্ত কেনা হলো না। কারণ এরা এখনো দুগ্ধপোষ্য। প্রতিদিন আধমণ দুধ এদের খাওয়াতে হবে। আমরা মন-খারাপ করে বাসে ফিরে এলাম। বাবা বললেন, পাহাড়ি জায়গায় আছি— হাতির বাচ্চা জোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না। একটা হাতির বাচ্চা কেনা যেতে পারে। আগে একটু গুছিয়ে বসি। তোমাদের মন-খারাপ করার কোনো কারণ নাই। এই বলে তিনি নিজেই সবচে' বেশি মন-খারাপ করলেন। বাস ঠিকঠাক হতে অনেক সময় লাগল। আমরা রাঙ্গামাটি পৌঁছলাম দুপুর-রাতে। আমাদের বাসা মূল শহর থেকে অনেকখানি দূরে। একটা পাহাড়ের মাথা কেটে ছ'টা বাড়ি বানানো হয়েছে। ঐ ছ'টা বাড়ির একটা আমাদের। অতি নির্জন জায়গা। চারদিকে ঘন বন। অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছে বন থেকে। মা ভীতগলায় বললেন, এ কোথায় এনে ফেললে ? বাবার মুখও শুকিয়ে গেল। এরকম বিরানভূমিতে বাসা, তা বোধহয় তিনিও ভাবেননি।

বাসা আমাদের খুব পছন্দ হলো। পাহাড়ের উপর বাসায় আমরা থাকব এরকম তো কখনো ভাবিনি। এরকম বাসায় থাকা মানে আকাশের কাছাকাছি থাকা। কী সৌভাগ্য আমাদের! তারপর যখন শুনলাম আশেপাশে কোনো স্কুল নেই, আমাদের স্কুলে যেতে হবে না, তখন মনে হলো আনন্দে পাগল হয়ে যাব।

সারাদিন খেলা। নতুন একটা খেলা বের করেছি। পাখি-পাখি খেলা। দুহাত পাখির ডানার মতো উঁচু করে এক দৌড়ে পাহাড় থেকে নিচে নামা। একসময় আপনা-আপনি গতি বাড়তে থাকে— মনে হয় সত্যি উড়ে চলেছি— পাখি হয়ে গেছি।

সন্ধ্যার পর বই নিয়ে বসি। সেটাও একধরনের খেলা। পড়া-পড়া খেলা। কারণ পড়া দেখিয়ে দেবার কেউ নেই। শাসন করার কেউ নেই।

বাবা প্রায় সারা মাস ট্যুরে থাকেন। মা সবচে' ছোট বোনটিকে নিয়ে ব্যস্ত। বড় মামাও সঙ্গে নেই। এই প্রথম উনি ঠিক করেছেন আমাদের সঙ্গে আসবেন না। বড় বোনের পরিবারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জীবন নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। নিজের পায়ে দাঁড়াবেন।

ছোট ছোট এতগুলো বাচ্চা সামলিয়ে মা'কে একা সংসার দেখতে হয়। তার উপর ভৌতিক সমস্যা দেখা দিল। আমাদের রান্নাঘর অনেকখানি দূরে। মা রান্না করার সময় প্রায়ই দেখতে পান— একটা ছায়ামূর্তি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। তিনি আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা মেলাবার পরই সবাইকে একটা ঘরে বন্ধ করে হারিকেন জ্বালিয়ে বসে থাকেন। ঘুমুতে পারেন না। ঐ ছায়ামূর্তিকে অনেক দেখার চেষ্টা করলাম, সে দেখা দিল না। মা ছাড়া তাকে আর কেউ দেখে না। তবে এক সন্ধ্যায় তার খড়মের খটখট শুনলাম। কে যেন খড়ম পায়ে বারান্দায় হাঁটছে। মা ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন। উঁচু গলায় আয়াতুল কুরশি পড়তে লাগলেন। সারারাত ঘুমুলেন না, আমাদেরও ঘুমুতে দিলেন না। পরদিন একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটল। বড় মামা এসে উপস্থিত। তিনি খুব সিরিয়াস গলায় বললেন, বুবু ভাববেন না যে আপনাদের সঙ্গে থাকব। দুদিনের জন্যে এসেছি। আমাকে রাখার জন্য শত অনুরোধ করলেও লাভ হবে না। আমার নিজের একটা জীবন আছে। আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে ঘোরাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

মা বললেন, ঠিক আছে, দুদিন পরে চলে যাস।

আগেভাগে বলে রাখছি যাতে পরে যন্ত্রণা না করেন।

যন্ত্রণা করব না।

দুদিন থাকব। মাত্র দুদিন। দুই দিন এবং দুই রাত।

আচ্ছা ঠিক আছে।

মামার সেই দুদিন পরবর্তী আট বছরেও শেষ হলো না। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে লাগলেন।

রাঙ্গামাটি এসে তিনি সঙ্গীতের দিকে মন দিলেন। জারিগান। নিজেই গান লেখেন— সুর দেন। জারিগান একা একা হয় না। তাল দিতে হয়। তাল দেবার জন্যে একদল শিশু জুটে গেল। মামা মাথায় গামছা বেঁধে একটা লাইন বলেন, আমরা হাততালি দিতে দিতে বলি— আহা বেশ বেশ বেশ।

শুধু বেশ বেশ বললে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও নাড়তে হয়। মাথা নাড়া এবং হাততালির মধ্যে একধরনের সমন্বয় থাকতে হয়। ভুল করলে বড়মামা রাগ করেন।

রাতেরবেলা গল্পের আসর। লেপের নিচে বসে তুলারাশি রাজকন্যার গল্প শোনার আনন্দের সঙ্গে কোনো আনন্দেরই তুলনা হয় না।

এক রাতে এরকম গল্প শুনছি। হঠাৎ শুনি মটমট শব্দ। তারপর মনে হলো চারদিক যেন আলো হয়ে উঠেছে। 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার উঠল। আমাদের ঠিক সামনের বাসায় আগুন ধরে গেছে। বাড়ি কাঠের। টিনের ছাদ। পুরো বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। পাহাড়ের উপর পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। আগুনে বাড়ি পুড়ে ছাই হবে— কিছুই করা যাবে না। অবস্থা এমন যে আশেপাশের সবগুলো বাড়িতেই আগুন ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। বড়মামা আমাদের কোলে করে আগুন থেকে যতটা সম্ভব দূরে রেখে আসলেন। আমাদের মাথার উপর ভেজা কম্বল— কারণ আগুনের ফুলকি উড়ে উড়ে আসছে। চোখ বড় বড় করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখলাম। ভয়ঙ্করেরও একধরনের সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য থেকেও চোখ ফেরানো যায় না। একসময় অবাক হয়ে দেখি, জ্বলন্ত বাড়ির টিনের চালগুলো আকাশে উড়তে শুরু করেছে। প্লেনের মতো ভোঁভোঁ শব্দ করতে করতে একেকটা টিন একেক দিকে উড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বাড়িতে আগুন লেগে গেল, সেখান থেকে তৃতীয় বাড়ি। চারদিকে আগুন নিয়ে ভেজা কম্বল মাথায় দিয়ে আমরা বসে আছি। মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে আগুন আমাদের গ্রাস করবে।

আমাদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। কী ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!

রাঙ্গামাটিতে আমরা ছিলাম পাঁচ মাসের মতো। অগ্নিপর্বের কিছুদিন পরই বাবা আবার বদলি হলেন বান্দরবানে। দোহাজারী পর্যন্ত ট্রেনে। সেখান থেকে নৌকায়। সারারাত নৌকা চলল শঙ্খনদীতে। ভোরবেলা এসে পৌঁছলাম বান্দরবান। ঘন অরণ্যঘেরা ছোট্ট শহরতলি। অল্পকিছু বাড়িঘর। ইট-বিছানো ছোট্ট একটা রাস্তা। রাস্তার দুপাশে কয়েকটি দোকানপাট।

গ্রামে যেমন সাপ্তাহিক হাট বসে এখানেও তা-ই। বুধবারের সাপ্তাহিক হাট। পাহাড়ি লোকজন বুধবারে এসে উপস্থিত হয়। কত বিচিত্র জিনিসই তারা বিক্রি করতে আনে! বাঁদরের মাংস, সাপের মাংস। মুরং মেয়েরাও আসে। তাদের কোমরে এক চিলতে কাপড় ছাড়া সারা গা উদোম। কী বিচিত্র জায়গা! বান্দরবান অনেকটা উপত্যকার মতো। চারপাশেই পাহাড়। এইসব পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে ঝুম চাষ হয়। প্রতি সন্ধ্যায় একটা-না-একটা পাহাড় জ্বলতে থাকে।

বান্দরবানের বাসায় প্রথম দিনেই এক কাণ্ড হলো। রাত ন'টার মতো বাজে। বাইরে 'হুম হাম হিউ'— বিকট শব্দ। একসঙ্গে সবাই জানালার কাছে ছুটে এলাম। কী সর্বনাশ! একটা রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে। রাক্ষসের হাতে কেরোসিনের কুপি। সে কেরোসিনের কুপিতে ফুঁ দিতেই তার মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হলো। আমরা সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমার মা পর্যন্ত ভয় পেয়ে বললেন— এইটা কী?

রাক্ষস তখন মানুষের মতো গলায় বলল, ভয় পাবেন না। ছোট খোকাখুকিরা ভয় পাবেন না। আমি বহুরূপী। ভয় পাবেন না।

বান্দরবানেই আমার প্রথম এবং শেষ বহুরূপী দেখা। এই জিনিস আর কোথাও দেখিনি। সে প্রতিমাসে দুতিনবার সাজ-পোশাক পরে বের হতো। কোনো রাতে সাজত ভালুক, কোনো রাতে জলদস্যু। ভোরবেলা দীনহীন মুখে বাসায় এসে বলত, খোকাখুকিরা আম্মাকে বলেন, আমি বহুরূপী। কিছু সাহায্য দিতে বলেন।

তখন আমার খুব কষ্ট লাগত। মনে হতো সমস্ত পৃথিবীর রহস্য যার হাতের মুঠোয়— সে কিনা দিনে এসে মলিনমুখে ভিক্ষা করে! এত অবিচার কেন এই পৃথিবীতে ?

এরকম বুনো এবং জংলা জায়গায়ও রাজপ্রাসাদ আছে। মুরং রাজার বাড়ি। দূর থেকে দেখি। কাছে যেতে ভয়-ভয় লাগে। মুরংরা রাজাকে দেখে দেবতার মতো। রাজবাড়ির দিকে চোখ তুলে তাকায় না— এতে নাকি পাপ হয়।

বান্দরবানের সবই ভালো— শুধু মন্দ দিকটা হলো— এখানে একটা স্কুল আছে।

আমাদের স্কুলে ভরতি করিয়ে দেয়া হলো।

মন পুরোপুরি ভেঙে গেল। স্কুলে আমার একমাত্র আনন্দের ব্যাপার হলো মুরং রাজার এক মেয়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে। গায়ের রং শঙ্খের মতো সাদা। চুল হাঁটু ছাড়িয়েও অনেকদূর নেমে গেছে। আমরা ক্লাস সিক্সে পড়ি, কিন্তু তাকে দেখায় একজন তরুণীর মতো। তার চোখ দুটি ছোট ছোট, গালের হনু খানিকটা উঁচু। আমার মনে হলো চোখ দুটি আরেকটু বড় হলে তাকে মানাত না। গালের হনু উঁচু হওয়ায় যেন তার রূপ আরো খুলেছে।

ক্লাসে আমি স্যারদের দিকেও তাকাই না। বোর্ডে কী লেখা হচ্ছে তাও পড়তে চেষ্টা করি না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি রাজকন্যার দিকে। সত্যিকার রাজকন্যা।

আমার এই অস্বাভাবিক আচরণ রাজকন্যার চোখে পড়ল কি না জানি না, তবে একজন স্যারের চোখে পড়ল। তিনি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। প্রতিটি ক্লাসেই তিনি আমাকে প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত করেন, কিন্তু আমাকে আটকাতে পারেন না। কারণ ইতোমধ্যে আমি একটা জিনিস বুঝে ফেলেছি— আমার স্মৃতিশক্তি অসম্ভব ভালো। যে-কোনো পড়া একবার পড়লেই মনে থাকে। সব পড়াই একবার অন্তত পড়ে আসি। স্যার আমাকে কিছুতেই কায়দা করতে পারেন না। বারবার জাল কেটে বের হয়ে আসি।

কোনো অধ্যবসায়ই বৃথা যায় না। স্যারের অধ্যবসায়ও বৃথা গেল না, আমাকে আটকে ফেললেন। সমকোণ কাকে বলে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বলতে পারলাম না।

রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে-ও পারল না। না পারারই কথা। রাজকন্যারা সব সময়েই খানিকটা হাবা ধরনের হয়। স্যার রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন— পড়া পারোনি কেন ?

রাজকন্যা জবাব দিল না। তার ছোট ছোট চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়লে লাগল। সেই অশ্রুবর্ষণ-দৃশ্যে যে-কোনো পাষাণ দ্রবীভূত হবে। স্যার দ্রবীভূত হলেন। রাজকন্যাকে বসতে বললেন। আমার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা হলো। বিচিত্র শাস্তি। বড় একটা কাগজে লেখা হলো—

'আমি পড়া পারি নাই।
আমি গাধা।'

সেই কাগজ গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হলো। স্যার একজন দপ্তরিকে ডেকে আনলেন এবং কঠিন গলায় বললেন, এই ছেলেকে সবক'টা ক্লাসে নিয়ে যাও। ছাত্ররা দেখুক।

আমি অপমানে নীল হয়ে গেলাম। টান দিয়ে গলার কাগজ ছিঁড়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বললাম, আপনি গাধা। তারপর এক দৌড় দিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলাম। বাসায় ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আমি শঙ্খনদীর তীর ঘেঁসে দৌড়াচ্ছি। আমাকে যেতে হবে অনেক অনেক দূরে। লোকালয়ে আমার থাকা চলবে না। কেউ যেন কোনোদিন আমাকে আর না দেখে।

সন্ধ্যাবেলা লোক পাঠিয়ে শঙ্খনদীর তীর থেকে বাবা আমাকে ধরিয়ে আনলেন। আমি আতঙ্কে কাঁপছি। না জানি কী শাস্তি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে!

বাবা শান্ত গলায় বললেন, তুমি তোমার স্যারকে যা বলেছ তার জন্যে কি তুমি লজ্জিত ?

আমি বললাম,— না।

বাবা দ্বিতীয়বার বললেন, তুমি আবার ভেবেচিন্তে বলো, তুমি কি লজ্জিত ?

না।

লজ্জিত হওয়া উচিত। স্যারেরা তোমাকে পড়ান। তোমাদের শাস্তি দেয়ার অধিকার তাঁদের আছে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। স্যারের কাছে ক্ষমা চাইবে।

আমি বাবার সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে রওনা হলাম। স্যারের কাছে ক্ষমা চাইলাম। আমার ক্ষমা প্রার্থনার পর বাবা বললেন, মাস্টারসাহেব, আমার এই ছেলেটা খুব অভিমানী। সে বড় ধরনের কষ্ট পেয়েছে। অপমানিত বোধ করেছে। তাকে আমি কোনোদিন এই স্কুলে পাঠাব না। সে বাসায় থাকবে।

কী বলছেন আপনি!

আমার ছেলের অপমান আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। বাবা আমাকে কোলে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। পরদিন হেডমাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের সব শিক্ষক বাসায় উপস্থিত। তাঁরা বাবাকে রাজি করাতে এসেছেন যাতে আমি আবার স্কুলে

যাই। বাবা রাজি হলেন না। তাঁর এক কথা, আমি তাকে স্কুলে পাঠাব না।

সারাদিন একা একা বাসায় থাকি। কিছুতেই সময় কাটে না। ছোট দুই ভাইবোন স্কুলে। মা ব্যস্ত। আমার কিছু করার নেই। আমি স্কুলের সময়টা শঙ্খনদীর তীর ঘেঁসে হেঁটে হেঁটে কাটাই।

বাবা মাঝে মাঝে আমাকে ট্যুরে নিয়ে যান। কখনো রামু, কখনো থানছি, কখনো নাইক্ষ্যংছড়ি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার পেছনে বাবার যে-উদ্দেশ্য কাজ করছিল তা হলো প্রকৃতির রূপের দিকে আমার চোখ ফেরানো। তিনি আমাকে মোটা একটা খাতা এবং কলম দিলেন যাতে আমি কী কী দেখছি তা গুছিয়ে লিখি। একদিন খাতা দেখতে চাইলেন।

যা যা লেখা হয়েছে তা পড়ে বড়ই বিরক্ত হলেন। প্রকৃতি সম্পর্কে খাতায় কিছুই লেখা নেই। যা লেখা তা পড়ে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। একটি উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে।

মঙ্গলবার

আজ আমরা রামু থানায় পৌছিয়াছি।

দুপুরে ভাত খাইয়াছি। মুরগির গোশত এবং আলু।

ডাল ছিল। ডাল খাই নাই।

বাবা বললেন, তুই কী দিয়ে ভাত খেলি তা বিতং করে লেখার কী দরকার ? অন্যরা এই খবর জেনে কী করবে ?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, অন্যদের জন্যে তো আমি লিখি নাই। আমি লিখেছি আমার জন্য।

কোনদিন কী খেয়েছিস তার খোঁজেই-বা তোর কী দরকার ? এই যে এত সুন্দর জলপ্রপাত তোকে দেখিয়ে আনলাম সেই প্রপাতটার কথা লিখলি না কেন ?

জলপ্রপাতের কথা লিখলে কী হবে ?

যারা জলপ্রপাতটা দেখেনি তারা তোর লেখা পড়ে বুঝবে জিনিসটা কেমন। যা, লিখে নিয়ে আয়। দেখি পারিস কি না।

সেই জলপ্রপাত আমাকে মোটেই আকর্ষণ করেনি। ছোট্ট পানির ধারা উপর থেকে নিচে পড়ছে। নিচে গর্তমতো হয়েছে। গর্তভরতি ঘোলা পানি। জলপ্রপাতের একটি জিনিস আমার ভালো লাগল— পানির ধারার চারদিকে সূক্ষ্ম জলচূর্ণের জন্যে অসংখ্য রামধনু দেখা যায়। আমি রামধনু সম্পর্কেই লিখলাম। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে— ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি বালকের সেই লেখা পড়ে আমার সাহিত্যিক বাবা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শুধু মুগ্ধ না— প্রায় অভিভূত হবার মতো অবস্থা।

জলপ্রপাতবিষয়ক রচনার কারণে উপহার পেলাম— রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। গল্পগুচ্ছের প্রথম যে-গল্পটি পড়ি তার নাম 'মেঘ ও রৌদ্র'। পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ

কাঁদলাম। তারপর চোখ মুছে আবার গোড়া থেকে পড়া শুরু করলাম। আমার নেশা ধরে গেল।

বান্দরবান পুলিশ লাইব্রেরিতে অনেক বই।

বাবা সেই লাইব্রেরির সেক্রেটারি। রোজ বই নিয়ে আসেন। আমি সারাদিন পড়ি। মাঝে মাঝে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হয়। সেই যন্ত্রণা নিয়েও পড়ি। বিকেলে শঙ্খনদীর তীরে বেড়াতে যাই।

নদীর তীরেই আমার পরিচয় হলো নিশাদাদার সঙ্গে। তাঁর ভালো নাম নিশানাথ ভট্টাচার্য, তাঁর বাবা পুলিশের এ.এস.আই.। নিশাদাদা বিরাট জোয়ান। কয়েকবার ম্যাট্রিক দিয়েছেন— পাস করতে পারেননি। পড়াশোনায় তাঁর কোনো মন নেই, তাঁর মন শরীরচর্চায়। নদীর তীরে তিনি ঘণ্টাখানিক দৌড়ান। ডন-বৈঠক করেন। শেষ পর্যায়ে সারা গায়ে ভেজা বালি মেখে নদীর তীরে শুয়ে থাকেন। এতে নাকি রক্ত ঠান্ডা হয়। রক্ত ঠান্ডা হওয়া শরীরের জন্য ভালো।

স্বাস্থ্যরক্ষার নানান উপদেশ তিনি আমাকেও দেন। কথায়-কথায় বলেন— Health is wealth. বুঝলে হুমায়ূন, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাঁর সঙ্গে যে-কোনো গল্প করলেই তিনি কীভাবে জানি সেই গল্প স্বাস্থ্যরক্ষায় নিয়ে যান। আমার বড় মজা লাগে।

তখন ঘোর বর্ষা।

বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত। নিশাদাদা ভিজতে ভিজতে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। আমার মাকে ডেকে বললেন, মাসিমা, মাছ ধরতে যাচ্ছি। খেপজালে মাছ ধরব। হুমায়ূনকে নিয়ে যাচ্ছি। একা একা মাছ ধরতে ভালো লাগে না। দর্শক ছাড়া মাছ ধরা যায় না। ছাতা দিয়ে দিন। ছাতা থাকলে বৃষ্টিতে ভিজবে না।

নিশাদাদার সঙ্গে ছাতা-মাথায় আমিও রওনা হলাম। নদীর তীরে এসে মুখ শুকিয়ে গেল। বর্ষার পানিতে শঙ্খনদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। তীব্র স্রোত। বড় বড় গাছের গুঁড়ি ভেসে আসছে। এই শঙ্খনদী আগের ছোট্ট পাহাড়ি নদী না— এই নদী মূর্তিমতী রাক্ষুসী।

নিশাদাদা জাল ফেললেন। কী যেন ঘটে গেল। শঙ্খনদী যেন তার হাত বাড়িয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে নিল। একবারের জন্যও তার মাথা ভেসে উঠল না। আমি ছুটতে ছুটতে চিৎকার করতে করতে বাসায় ফিরলাম।

নিশাদাদার লাশ পাওয়া গেল সন্ধ্যায়। সাত মাইল ভাটিতে। আমার সমস্ত পৃথিবী উলটপালট হয়ে গেল। পরের অবিশ্বাস্য ঘটনাটি লিখতে সংকোচ লাগছে, না লিখেও পারছি না।

সেই রাতের ঘটনা।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাবা মাত্র শশ্মান থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে বসেছেন। মা জেগে আছেন। পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা দুজনই আচ্ছন্ন। হঠাৎ তাঁদের কাছে মনে হলো কে যেন বারান্দায় হেঁটে হেঁটে আসছে। আমাদের ঘরের সামনে এসে পদশব্দ থেমে গেল। অবিকল নিশাদাদার গলায় কে যেন বলল, হুমায়ূনের খোঁজে এসেছি। হুমায়ূন কি ফিরেছে ?

বাবা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বের হলেন। চারদিকে ফকফকা জোছনা। কোথাও কেউ নেই।

এই ঘটনার নিশ্চয়ই কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা আছে। বাবা-মা দুজনেই ঐ রাতে একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। অবচেতন মনে ছিল মৃত ছেলেটি। তাঁরা একধরনের অডিটরি হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়েছেন। এই তো ব্যাখ্যা।

আমি নিজেও এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছি। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্য ব্যাখ্যাটিই-বা খারাপ কী ? একজন মৃত মানুষ আমার প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে ছুটে এসেছেন অশরীরী জগৎ থেকে। উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করছে— হুমায়ূন কি ফিরেছে ?

আমার শৈশব কেটে গেল মানুষের ভালোবাসা পেয়ে পেয়ে।
কী অসীম সৌভাগ্য নিয়েই-না আমি এই পৃথিবীতে জন্মেছি!

নিশাদাদার মৃত্যুর পরপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শিশুমন মৃত্যুর এই চাপ সহ্য করতে পারল না। প্রচণ্ড জ্বরে আচ্ছন্ন থেকে কয়েকদিন কেটে গেল। মাঝে মাঝে মনে হতো আমি শূন্যে ভাসছি। শরীরটা হয়ে গেছে পাখির পালকের মতো। সারাক্ষণ একটা ঘোর-ঘোর অবস্থা। এই ঘোরের মধ্যেই আমাকে দেখতে এল মুরং রাজার মেয়ে। সহপাঠী রাজকন্যা। আচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে সেদিন আরো সুন্দর মনে হলো। পৃথিবীর সমস্ত রূপ যেন সে তার শরীরে ধারণ করেছে।

সে অনেক কথাই বলল। তার কিছুই আমার মনে নেই, শুধু মনে আছে, একসময় মাথা দোলাতে দোলাতে বলছে— তুমি এত পাগল কেন ?

তার এই সামান্য কথা— কী যে ভালো লাগল! সেই ভালো লাগায় একধরনের কষ্টও মিশে ছিল। যে কষ্টের জন্ম এই পৃথিবীতে নয়— অন্যকোনো অজানা ভুবনে।

আমার শৈশবটা কেটে গেছে দুঃখমেশানো আনন্দে-আনন্দে। যতই দিন যাচ্ছে সেই আনন্দের পরিমাণ কমে আসছে। আমি জানি, একসময় আমার সমস্ত পৃথিবী দুঃখময় হয়ে উঠবে। তখন যাত্রা করব অন্য ভুবনে, যেখানে যাবতীয় আনন্দ-বেদনার জন্ম।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সিলেটের মীরাবাজারের বাসায় এক গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, দেখি মশারির ভেতর ঠিক আমার চোখের সামনে আলোর

একটা ফুল ফুটে আছে। বিস্ময়, ভয় ও আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম— এটা কী ?

বাবা জেগে উঠলেন, মা জাগলেন, ভাইবোনেরা জাগল। বাবা আমার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, জোছনার আলো ঘরের ভেন্টিলেটর দিয়ে মশারির গায়ে পড়েছে। ভেন্টিলেটরটা ফুলের মতো নকশা-কাটা। কাজেই তোমার কাছে মনে হচ্ছে মশারির ভেতর আলোর ফুল। ভয়ের কিছুই নেই, হাত বাড়িয়ে ফুলটা ধরো।

আমি হাত বাড়াতেই সেই আলোর ফুল আমার হাতে উঠে এল, কিন্তু ধরা পড়ল না। বাকি রাতটা আমার নির্ঘুম কাটল। কতবার সেই ফুল ধরতে চেষ্টা করলাম— পারলাম না। সৌন্দর্যকে ধরতে না-পারার বেদনায় কাটল আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। আমি জানি সম্ভব না, তবু এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি একবার জোছনার ফুল ধরতে পারি— মাত্র একবার। এই পৃথিবীর কাছে আমার এর চেয়ে বেশি কিছু চাইবার নেই।

নাটক

নৃপতি

প্রথম দৃশ্য

[অন্ধকার মঞ্চ। বেদির মতো একটি স্থান। কেউ একজন গর্বিত ভঙ্গিতে বসে আছে সেখানে। মঞ্চ ক্রমে ক্রমে আলোকিত হচ্ছে। ভারি ও গম্ভীর গলায় নেপথ্য থেকে কেউ একজন কথা বলবে।]

নেপথ্য কণ্ঠ মহিমগড়ের মহামান্য রাজা প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে পথে নেমেছিলেন। সন্ধ্যার আগেই তাঁর রাজপ্রাসাদে ফেরার কথা— তিনি ফিরলেন না। পথ হারিয়ে ভূষণ্ডি মাঠে বসে রইলেন। রাত বাড়তে লাগল। আমাদের আজকের গল্প মহিমগড়ের নৃপতির গল্প। গল্প শুরু করছি এইভাবে— এক দেশে এক রাজা ছিল।

[কয়েকজন ছেলে ও দু'টি মেয়ে সমবেত কণ্ঠে গাইতে থাকবে। সম্মিলিত কণ্ঠের বিলম্বিত সুরের গান ক্রমে উচ্চগ্রামে উঠবে। দেখা যাবে মঞ্চ আলোকিত হচ্ছে।]

একদেশে এক রাজা ছিল।
রাজার অনেক সৈন্য ছিল।
হাতিশালে হাতি ছিল।
ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল।
টাকশালেতে টাকা ছিল।
একদেশে এক রাজা ছিল।
একদেশে এক রাজা ছিল।

[মঞ্চ আলোকিত। উপবিষ্ট রাজাকে দেখা যাচ্ছে বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে আছেন। মঞ্চের অন্য প্রান্ত থেকে একজন বেরিয়ে এসে বেদিতে উপবিষ্ট রাজাকে অবাক হয়ে দেখবে।]

[প্রায় অন্ধকার মঞ্চে প্রবেশ করছে চোর। তার গায়ে কাঁথা, এক হাতে একটি পুঁটলি। অন্য হাতে বিড়ি। হাতে কিছু থাকবে না কিন্তু বিড়ি টেনে টেনে আসছে এমন একটি ভঙ্গি করবে। হঠাৎ সে রাজাকে দেখে থমকে দাঁড়াবে। দু'পা পিছিয়ে আসবে।]

রাজা তোমার নাম, তোমার পরিচয়?

প্রজা হুজুর আমারে জিগাইতেছেন? আমার নাম হইল গিয়া...

রাজা তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো?

প্রজা আপনেরে চিনুম না! কন কী আপনে? হে-হে-হে-।

রাজা তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। আমাকে চিনতে পেরেও কুর্নিশ করোনি! আবার দাঁত বের করে হাসছো। রাজার সামনে হাসতে হলে তাঁর অনুমতি লাগে তাও জানো না?

প্রজা আপনেরে চিনতে পারি নাই। আল্লাহর কসম হুজুর এট্টুও চিনি নাই। বড় আন্ধাইর।

রাজা চিনতে পারোনি?

প্রজা জে না। আন্ধাইরে রাজার চেহারা যেমুন, চোরের চেহারাও তেমুন।

রাজা তুমি কী করো?

প্রজা রাজা সাব, আমি একজন চোর।

রাজা [স্তম্ভিত] চোর?

প্রজা জে হুজুর। আমার বাপও চোর ছিল আর হুজুর আমার দাদা...

রাজা যাও যাও—। আমার সামনে থেকে চলে যাও। একজন চোর কথা বলছে আমার সঙ্গে! [চোর পায়ে পায়ে সরে যাচ্ছে। রাজা হঠাৎ মত বদলাবেন] এই চোর।

চোর রাজা সাব ডাকলেন?

রাজা আমি ভেবে দেখলাম চোর হলেও তুমি আমার প্রজা। এবং প্রজা হচ্ছে সন্তানতুল্য। কাজেই তুমি আমার সন্তান। ঠিক বলেছি কিনা বলো?

চোর এক্কেবারে খাঁটি কথা কইছেন। হুজুর আপনে আমার পিতা।

রাজা তুমি আমাকে মহিমগড়ের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে পারবে?

চোর তা পারুম কিন্তু হুজুর আপনি এই মাঠের মইধ্যে ক্যামনে আইলেন? আপনের সৈন্য সামন্ত কই? মুকুট কই? হাতি, ঘোড়া কই? মন্ত্রী সাবরা কই?

রাজা তোমার সঙ্গে খোশগল্প করার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।

চোর হুজুরের কাছে অস্ত্রপাতি কিছু আছে? তলোয়ার, ছুরি, চাক্কু?

রাজা প্রজারা আমার সন্তানের মতো। ওদের কাছে আমি নিরস্ত্র অবস্থায় যেতে পছন্দ করি।

[চোর তার ঝুলি হাতড়ে ভয়াল-দর্শন একটা ছোরা বের করবে।] আমাকে ঠিকমতো রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিলে প্রচুর ইনাম পাবে। তোমার হাতে ওটা কী? [চোর ছোরার ধার পরীক্ষা করবে] হাতের এই জিনিসটা ফেলে দাও।

চোর [হেসে উঠবে]

রাজা হাসছো কেন?

চোর জিনিসটার মইধ্যে জবর ধার। আর এইটা বার করছি হুজুর আপনার জইন্যে। সেরেফ আপনার জইন্যে।

রাজা [রাজা স্তম্ভিত ও ভীত।] আমার জন্যে ?

চোর জে হুজুর। যদি কেউ আপনেরে আক্রমণ করে। দুষ্টু লোকের তো হুজুর দেশে অভাব নাই। দেশভর্তি দুষ্টু লোক— এই জইন্যে এই জিনিস।

রাজা ও তাই বলো। ওটা তাহলে সঙ্গেই রাখো— ফেলার প্রয়োজন দেখি না। তোমার নাম কী যেন বলছিলে ?

চোর মজনু। মাইনসে ডাকে মজনু চোরা।

রাজা তোমাকে কিন্তু ভদ্রলোকের মতোই দেখাচ্ছে, চোর বলে মনে হচ্ছে না।

চোর [হেসে উঠবে।]

রাজা হাসছো কেন ?

চোর বেয়াদবি মাপ করেন হুজুর। এই কান ধরলাম আর যদি হাসি।

রাজা না না, ঠিক আছে। হাসতে ইচ্ছে হলে হাসবে। আমার অনুমতি লাগবে না।

চোর হুজুরের দয়ার শরীর।

রাজা রাজপ্রাসাদে পৌঁছেই তোমার জন্যে জায়গিরের ব্যবস্থা করব। পঞ্চাশ একর লাখেরাজ জমি। এতে চলবে ?

চোর হুজুরের অসীম দয়া।

রাজা ঠিক আছে, ওটাকে একশ' একর করে দিচ্ছি। একশ' বিঘা লাখেরাজ জমি।

চোর গোস্তাকি মাপ হয়। হুজুর কিন্তু বিঘার কথা বলেন নাই। হুজুর বলেছিলেন একশ' একর।

রাজা ও আচ্ছা। আমার কাছে বিঘাও যা একরও তা। তোমার যা পছন্দ তাই হবে। একশ' একর।

চোর হুজুর তাহলে চলেন, রওনা দেই। মেলা দূরের পথ।

রাজা আমার পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। জুতো হারিয়ে গেছে। কী করা যায় বলো তো ? এ তো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

চোর হুজুর কি আমার পিঠে উঠতে চান ?

রাজা তোমার যদি কষ্ট না হয়। কষ্ট হবে ? তোমার শরীরও তো খুব মজবুত মনে হচ্ছে না। অকারণে কষ্ট দিতে চাই না।

চোর জে না। কোনো কষ্ট নাই। উঠেন হুজুর। [রাজা পিঠে চড়বেন] মাবুদে এলাহি, ওজন তো কম না।

রাজা কষ্ট হচ্ছে ?

চোর না হুজুর। আরাম লাগতাছে। হুজুরের শইলডা মাখনের মতো নরম। বড় আরাম হুজুর।

রাজা আস্তে আস্তে যাবে। কোনো তাড়া নেই। ঝাঁকুনি দেবে না। আমার ঝাঁকুনি সহ্য হয় না।

চোর জে আইচ্ছা। খুব আস্তে যামু।

রাজা তোমার যেন কী নাম বললে ?

চোর মজনু।

রাজা মজনু, বেশ সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। এটা কি বসন্তকাল ?

চোর এইডা হুজুর শীতকাল।

রাজা না, না, না। শীতকাল হতেই পারে না। আমি ফুলের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ না ?

চোর জে না হুজুর, আমার সর্দি। [নাক ঝাড়বে]

রাজা তোমার নামটা যেন কী ?

চোর মজনু।

রাজা মজনু, তুমি গান জানো ?

চোর [হাঁপাতে হাঁপাতে] জি না হুজুর।

রাজা আমার কবিতা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে মজনু।

মজনু হুজুর, এট্টু নামেন পিঠ থাইক্যা।

রাজা কষ্ট হচ্ছে ?

মজনু কোনো কষ্ট না, তয় হুজুর দমটা বন্ধ হইয়া আসতাছে। এট্টু নামেন।

[রাজা নামবেন। মজনু বড় করে শ্বাস নিতে থাকবে। জামা খুলে সে নিজেকে প্রবল বেগে বাতাস করতে থাকবে। মঞ্চে একজনের পেছনে একজন দল বেঁধে প্রবেশ করবে। তাদের দলপতি এক বৃদ্ধ]

রাজা ওরা কারা ? মজনু, জিজ্ঞেস করো ওরা কারা ?

মজনু [উচ্চস্বরে] তোমরা কে ?

বৃদ্ধ আমরা হেতমপুরের প্রজা।

রাজা তোমরা কোথায় যাও ?

মজনু [উচ্চস্বরে] তোমরা কোথায় যাও ?

বৃদ্ধ আমরার পেটে ভাত নাই,
এই কথাটাই—
রাজা সাবরে নিজের মুখে বলতে চাই।

তরুণী রাজা সাবরে বলতে চাই।

আমরার পেটে ভাত নাই
শীত পড়ছে আকাশ-পাতাল
শীতে কষ্ট পাই।

রাজা হেতমপুর কতদূর ?

সকলে হেতমপুর— অনেকদূর!

রাজা এই সামান্য কথা বলবার জন্যে এতদূর থেকে এসেছ ?

সকলে ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট
এর উপরে কষ্ট নাই।

বৃদ্ধ এই কথাটাই রাজা সাবরে
নিজের মুখে বলতে চাই।

মজনু অত কথা শুনবার সময়
রাজা সাবের নাই।

সকলে কথা বলতে চাই
আমরা কথা বলতে চাই।

তরুণী রাজা সাবরে বলতে চাই
আমরার পেটে ভাত নাই
ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট এর উপরে কষ্ট নাই।
এই কথাটা রাজা সাবরে নিজের মুখে বলতে চাই।

সকলে কথা বলতে চাই
আমরা কথা বলতে চাই।

[এই সুরে গান গাইতে গাইতে তারা এগিয়ে যাবে। মজনু পিঠ বাঁকা করে দাঁড়াবে। রাজা চিন্তিত মুখে তার পিঠে চড়বেন। তাঁরা রওনা হবেন। মঞ্চের আলো কমে আসবে। রাজার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। দূর থেকে গম্ভীর গলায় একক কণ্ঠে শোনা যাবে—]

'এক দেশে এক রাজা ছিল
রাজার অনেক সৈন্য ছিল।
ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল।
।'

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে রানি ঢুকছেন। রানির পেছনে ফুলের সাজি হাতে দুইজন সহচরী। রানি ঘুরছেন অস্থির হয়ে। রানির পেছনে পেছনে সহচরীরা ঘুরছে।]

রানি মহারাজা প্রাসাদে এখনো এসে পৌঁছেননি ?

সহচরী [না সূচক মাথা নাড়বে।]

রানি এত সময় তো লাগার কথা নয় ? আমার ভালো লাগছে না।

১ম সহচরী: সুরশিল্পী আসমত আলী খাঁ সাহেবকে আসতে বলব ? গান শুনিয়ে তিনি আপনাকে তুষ্ট করবেন।

রানি প্রথম প্রহর পার হয়েছে, আমার খুব অস্থির লাগছে। কিছুতেই মন বসছে না। প্রজাদের দেখতে বেরিয়েছেন। ওদের দেখার কী আছে ?

১ম সহচরী ওস্তাদজিকে আসতে বলি ?

রানি প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন দেশের অবস্থা ভালো নয়। প্রজারা অসন্তুষ্ট। চারদিকে অভাব। এইসব বলে বলে তারা মহারাজাকে বিরক্ত করেছে। নয়তো তিনি বের হতেন না। আমার ভালো লাগছে না।

১ম সহচরী: ওস্তাদজিকে বলি আপনার প্রিয় গান গেয়ে শুনাবার জন্যে ? এতে মহারানির মন প্রফুল্ল হবে। বলব ?

রানি না, না। আমার কিছুতেই মন বসছে না। তোমরা আমাকে বিরক্ত করবে না।

২য় সহচরী: চলে যাব ?

রানি যাও, চলে যাও।

১ম সহচরী: আপনি একা থাকবেন ?

রানি চলে যেতে বলছি, চলে যাও, কেন কথা বাড়াচ্ছ ? আমি একা একা খানিকক্ষণ বাগানে হাঁটব। মহারাজা এসে পৌঁছানমাত্র আমাকে খবর দেবে।

[সহচরী দু'জন চলে যাওয়ার পর ওস্তাদজি ঢুকবেন।]

ওস্তাদজি মহারানি, আমাকে স্মরণ করেছেন ?

রানি আমি কাউকে স্মরণ করিনি।

ওস্তাদ ওরা বলছিল আপনার মন বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করবার জন্যে সঙ্গীতের মতো আর কিছুই নেই। আপনি চাইলে মালকোষ রাগে... ।

রানি আমি কিছুই চাই না। আচ্ছা, আপনি বলুন তো প্রজাদের দেখতে যাবার এই খেয়াল মহারাজার কেন হলো ? কী মানে থাকতে পারে এর ?

ওস্তাদ রাজাদের কিছু অদ্ভুত খেয়াল থাকতে হয়। তা না থাকলে সবাই ওদের সাধারণ মনে করবে। নৃপতিরা অসাধারণ থাকতে পছন্দ করেন।

রানি তারে মানে ?

ওস্তাদ দেশ জুড়ে অভাব! ঘরে ঘরে হাহাকার! এবং মধ্যে দেখার কিছুই নেই। মন প্রফুল্ল করার মতো কোনো দৃশ্য নয়। তবে, রাজারা মাঝে

মাঝে মানুষের কষ্ট দেখতে ভালোবাসেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখার মধ্যেও আনন্দ আছে।

রানি এসব আপনি কী বলছেন ?

ওস্তাদ প্রজারা যখন রাজপ্রাসাদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়াবে, তখন আপনি ছাদে দাঁড়িয়ে তাকাবেন ওদের দিকে। আপনার ভালোই লাগবে। দুঃখী মানুষদের দেখতে বড় ভালো লাগে। অন্যের দুঃখকে খুব কাছ থেকে না দেখতে পেলে নিজের সুখ ঠিক বোঝা যায় না মহারানি।

রানি প্রজারা রাজপ্রাসাদ ঘিরে দাঁড়াবে ? [ওস্তাদ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়বেন।] কবে ?

ওস্তাদ তা তো বলতে পারব না। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ওদের পায়ের শব্দ শুনি। ওরা আসতে শুরু করেছে মহারানি।

রানি আপনি চলে যান আমার সামনে থেকে। [ওস্তাদ কুর্নিশ করে চলে যেতেই রানি হাততালি দেবেন। সহচরী দু'জন এসে ঢুকবে।] মহারাজার কোনো খবর পাওয়া গেছে ?

সহচরী [না-সূচক মাথা নাড়বে।]

রানি মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে তোমরা কি কোনো পায়ের আওয়াজ পাও ?

সহচরী [না-সূচক মাথা নাড়বে।

ঠিক তখন নকিবের গলার আওয়াজ।]

নকিব মহিমগড়ের মাহামান্য রাজা, অজাতশত্রু, ভীমবাহু, মহাবল বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজা রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছেছেন।

[সহচরী দু'জন বের হয়ে যাবে, মহারাজার প্রবেশ।]

রানি আপনার ফিরতে দেরি দেখে বড় ভয় পেয়েছিলাম।

রাজা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এক বিশাল মাঠের মাঝখানে বসে বসে আকাশের তারা দেখছিলাম।

রানি প্রজাদের অবস্থা কেমন দেখলেন ?

রাজা মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা নামল। ক্রমে ক্রমে চারদিকে অন্ধকার হচ্ছে। চারদিকে পাখি ডাকছে। কী চমৎকার দৃশ্য! মনে বড় আনন্দ হলো রানি।

রানি প্রজাদের তাহলে দেখতে যাননি ?

রাজা এত চমৎকার বাতাস বইছিল— এত আনন্দ চারদিকে— তোমাকে একদিন নিয়ে যাব সেখানে। দু'জনে পাশাপাশি বসে সন্ধ্যা-হওয়া দেখব। সেই মাঠে আমরা ছোটখাট উৎসবের মতো করতে পারি।

রানি কবে ? কবে নিয়ে যাবেন ? আমার এক্ষুনি যেতে ইচ্ছা করছে। আমরা

কি কাল যেতে পারি ?

রাজা নিশ্চয়ই পারি।

রানি প্রজাদের কথা যেসব শুনছি সেসব তাহলে ঠিক নয়। ওরা সুখেই আছে, তাই না মহারাজ ?

রাজা দুঃখ নিয়ে মাতামাতি করা আমার পছন্দ নয়। দুঃখ থাকবেই। সেই দুঃখ থেকে ওদের মন ফিরিয়ে নেব। ওদের জন্যে একটা উৎসব করব।

রানি উৎসব ?

রাজা চমৎকার একটি উৎসব। আনন্দ-উল্লাস-গান। আকাশ ভরা থাকবে জ্যোৎস্না। পুরনারীরা হাত ধরাধরি করে নাচবে।

রানি চমৎকার। কিন্তু...। শুনছি হাজার হাজার মানুষ রাজপ্রাসাদের দিকে আসছে।

রাজা কোথায় শুনেছ ?

রানি সত্যি নয় তাহলে ?

রাজা না, সত্যি না। তাছাড়া সত্যি হলে কিছু যায় আসে না। ওদের আসতে দাও। ওরা আসুক, যোগ দিক আমাদের উৎসবে। এ উৎসব শুধু তোমার আমার উৎসব নয়, এ উৎসব আমাদের সবার। আমরা সবাই মিলে নাচব, সবাই মিলে গাইব। ফুলে ফুলে রাজ্য ঢেকে দেব। রানি...।

রানি বলুন!

রাজা যাও, ফুল-সাজে সেজে আস। আজ আমার মনে বড় আনন্দ। বড় সুখের সময় আজ। তুমি অপরূপ সাজে সেজে দাঁড়াও আমার সামনে। সভাসদদেরও আসতে বলো। আজ আমি সবাইকে পুরস্কৃত করব।

রানি আমি আসছি। আমি এক্ষুনি আসছি। [প্রস্থান।
মন্ত্রী প্রবেশ করবেন]

মন্ত্রী মহারাজা আমাকে স্মরণ করেছেন ?

রাজা আমি আজ সবাইকে স্মরণ করেছি। আজ আমার মনে গভীর আনন্দ। আজ আমি সবাইকে পুরস্কৃত করব। কিন্তু তোমাকে আজ এত মলিন দেখাচ্ছে কেন ?

মন্ত্রী আমার গায়ের রঙটাই ময়লা মহারাজ।

রাজা তোমার ঘোর কৃষ্ণবর্ণেও আনন্দের জ্যোতি ছিল। আজ তা দেখছি না।

মন্ত্রী হেতমপুর থেকে হাজার হাজার প্রজা এসেছে, তারা আপনার দর্শনপ্রার্থী। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

রাজা এখন তো আমার কথা বলার সময় নেই মন্ত্রী।

মন্ত্রী অপেক্ষা করতে বলব ?

রাজা হ্যাঁ, অপেক্ষা করুক। ভূষণ্ডির মাঠে বসে অপেক্ষা করুক। সময় হলেই আমি ওদের দর্শন দেব। কিংবা আমার বার্তা নিয়ে লোক যাবে। সে বার্তা হবে আনন্দের বার্তা। সুখের বার্তা।

মন্ত্রী এই শীতের রাতে মাঠে বসে থাকবে ?

রাজা [চমকে] এটা কি শীতকাল ?

মন্ত্রী [হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়বেন।]

রাজা শীত হলেও ভূষণ্ডির মাঠের দৃশ্য বড় চমৎকার। আকাশে চাঁদ আছে। ফুলে সৌরভ আছে। পাখির গান আছে। চারদিকে আনন্দ চিকমিক করছে। ওদের সময় ভালোই কাটবে।

[নেপথ্য থেকে শোনা যাবে— কথা বলতে চাই। আমরা কথা বলতে চাই। মহারাজা কান পেতে শুনবেন ও বিরক্ত হয়ে মঞ্চ ত্যাগ করবেন। মন্ত্রীও যাবেন। গ্রামবাসীর দল 'কথা বলতে চাই, আমরা কথা বলতে চাই'— বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ করবে। রাজার নকিব এসে দাঁড়াবে। গর্বিত ভঙ্গিতে।]

তরুণী টুপিওয়ালা ভাই—
রাজা সাবের সাথে আমরা কথা বলতে চাই।

নকিব রাজা সাব ব্যস্ত মানুষ
এত সময় নাই।

বৃদ্ধ টুপিওয়ালা ভাই—
রাজা সাবের সাথে দুইটা কথা বলতে চাই।
সময় আমরার অনেক আছে—
সময়ের অভাব নাই। [দলের সবার দিকে তাকিয়ে]
ওরে তোরা বস।
[সবাই বসে পড়বে।]
[নকিব রেগে গিয়ে একজনকে টেনে তুলে এক চড় বসিয়ে দেবে।]

নকিব মনে নাই ডর ভয়
পা ছড়াইয়া ক্যামনে বয় [সবাই উঠে দাঁড়াবে]
এই কথাটা মনে রাখন চাই
রাজাবাড়ির সামনে কারুর বসার হুকুম নাই।
হেতমপুরের বেকার দল,
আইন জানা নাই ?

তরুণী টুপিওয়ালা ভাই,
কোন জায়গাতে বইসা থাকম্ এইটা জানতে চাই ?

নকিব ভূষণ্ডির মাঠে যাও। জায়গাটা ভালো। ফুলের গন্ধ আছে। পাখির গান আছে। চান্দের আলো ভি আছে। যখন সময় হবে, খবর নিয়ে সেইখানেতে মোদের লোক যাবে।

তরুণী টুপিওয়ালা ভাই।
খবরটা একটু যেন তাড়াতাড়ি পাই।

নকিব রাজা সাবের অত তাড়া নাই।

সকলে কথা বলতে চাই।

[বলতে বলতে ভূষণ্ডির মাঠের দিকে রওনা হবে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজা সিংহাসনে বসে আছেন। চোখ আধ-বোজা। সিংহাসনের পাশে একজন ওস্তাদ দরবারি কানাড়া গাইছেন। দরবারে রাজার মেজাজ আনার জন্যে। ওস্তাদের গলা অদ্ভুত সুন্দর, তিনি গাইছেনও চমৎকার। সরগমের মাঝখানে রাজা হাততালি দিয়ে গান থামিয়ে দেবেন। ওস্তাদ তাকাবেন রাজার দিকে]

রাজা এটা কি বসন্তকাল ?

ওস্তাদ জি না।

রাজা এটা কোন কাল ?

ওস্তাদ শীত শুরু হচ্ছে হুজুর।

রাজা তাই নাকি ? কাল রাতে আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এটা বসন্তকাল।

ওস্তাদ কারো কারো এরকম ভুল হয় জনাব। শীতকালকে বসন্তকাল ভাবে। এই ভুল অবশ্যি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

রাজা আমার স্পষ্ট মনে হলো এটা বসন্তকাল। ফুলের গন্ধ পেলাম। মিষ্টি বাতাস বইছিল। আমি তখন কী ঠিক করলাম জানো ? ঠিক করলাম একটা বসন্ত উৎসব করব। একটা বসন্ত উৎসব করলে কেমন হয় ? আনন্দ-গান-উল্লাস।

ওস্তাদ ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করাই ভালো। এটাকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। বসন্ত উৎসব হবে বসন্তকালে।

রাজা ইদানীং তুমি বেশি-বেশি কথা বলছো।

ওস্তাদ [চুপ করে থাকবেন।]

রাজা এবং তোমার গলাও খারাপ হয়ে গেছে।

ওস্তাদ বয়েস হয়ে গেছে।

রাজা দেখি একটা বসন্তের গান শুনি।

ওস্তাদ শীতের সময় আমি বসন্তের গান গাইতে পারি না।

রাজা কেন ?

ওস্তাদ নিয়ম নেই।

রাজা নিয়ম! কার নিয়ম ?

ওস্তাদ শীতের সময় বসন্তের গান কেউ গাইবে না।

[রাজা হাততালি দিতেই মন্ত্রীর প্রবেশ]

রাজা আমি একটি বসন্ত উৎসব করতে চাই। [মন্ত্রী তাকিয়ে থাকবে] বসন্ত উৎসব!

ওস্তাদ হুজুরের অনুমতি পেলে আমি উঠি ?

রাজা নাচ হবে। গান হবে, আনন্দ-উল্লাস হবে।

ওস্তাদ প্রজারা কেউ রাজি হবে না। এখন ওদের দুঃসময়। শীত হচ্ছে দুঃখ ও কষ্টের সময়।

মন্ত্রী দুঃখ-কষ্ট থেকে ওদের মন ফেরাবার জন্যেই উৎসব দরকার। উৎসব হবে।

রাজা বসন্ত উৎসব!

মন্ত্রী বসন্ত উৎসবই হবে।

রাজা নাচ হবে। গান হবে। আনন্দ-উল্লাস হবে। ফুল দিয়ে আমি রাজ্য ঢেকে দেব।

ওস্তাদ শীতের সময় ফুল পাওয়া যাবে না।

মন্ত্রী রাজবাড়ির কারিগর কাগজের ফুল তৈরি করবে। তার সৌরভ হবে আসল ফুলের চেয়ে বেশি, তার বর্ণ হবে...

[পিঠ বাঁকা করে মজনু চোরা লাঠিতে ভর দিয়ে ঢুকবে।]

রাজা [চমকে উঠে] এ কে ?

মজনু হুজুর, আমারে চিনলেন না ? কাইল রাইতে আপনেরে পিঠে কইরা আনলাম। আমার নাম মজনু।

রাজা মজনু, তুমি ভালো আছো ?

মজনু হুজুরের দয়া। পিঠের মইধ্যে এট্টুখানি দরদ। সোজা হইতে পারি না। কিন্তু আছি ভালো।

রাজা রাতটা খুব আনন্দের ছিল মজনু। বাতাস ছিল মধুর। পাখি ডাকছিল। মজনু, পাখি ডাকছিল না ?

মজনু কাউয়া ডাকতেছিল। আর কোনো পাখির ডাক শুনি নাই।

রাজা কিন্তু সেই কাকের ডাকও মধুর ছিল। ছিল না ?

মজনু জে ছিল। কী সুন্দর কা-কা কইরা ডাকল! বড় মধুর!

রাজা আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। মন্ত্রী একে একশ’ বিঘা নিষ্কর জমির ব্যবস্থা করে দিন।

মজনু হুজুর একরের কথা বলেছিলেন। হুজুরের বোধহয় স্মরণ নাই।

রাজা একশ’ একর নিষ্কর জমি। শোনো মজনু, তোমার উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।

মজনু হুজুরের দয়া। হুজুর দয়ার সাগর।

রাজা এখন তুমি আমার পদচুম্বনেরও সুযোগ পাবে।

মজনু হুজুর দয়ার মহাসাগর।

রাজা বৎসরে দু’বার তোমাকে এই সম্মান দেয়া হবে।

মজনু হুজুর হচ্ছেন দয়ার মহা-মহা-সাগর।

[রাজা তার পা বাড়িয়ে দেবেন। মজনু পায়ে চুমু খাবে। তার চোখে-মুখে স্বর্গীয় ভাব।]

মন্ত্রী জাহাঁপনা, বাইরে অনেকেই আপনার পদচুম্বনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

রাজা আজ আমার মন উৎফুল্ল। আজ আমি সবাইকে সুখী করতে চাই। ওদের নিয়ে এসো। [মন্ত্রী হাততালি দিতেই ২য় প্রজা এসে ঢুকবে। তারও হাতে লাঠি এবং পিঠ বাঁকা।] এ কে ?

মন্ত্রী একবার মৃগয়াতে আপনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন সে আপনাকে পিঠে করে নিয়ে এসেছিল। এর নাম বশির।

রাজা বশির, ভালো আছ ?

[বশিরের মুখভর্তি হাসি। রাজা পা বাড়িয়ে দেবেন। বশির মহানন্দে তাঁর পায়ে চুমু খাবে এবং মজনুর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। মন্ত্রী দ্বিতীয়বার হাততালি দিবেন। ৩য় প্রজা এসে ঢুকবে। তারও পিঠ বাঁকা।]

মন্ত্রী এ হচ্ছে নিয়ামত। সেও একবার আপনাকে পিঠে করে এনেছিল।

রাজা ভালো আছ নিয়ামত ?

[নিয়ামতের মুখে হাসি। রাজা পা বাড়িয়ে দেবেন। নিয়ামত পায়ে চুমু খাবে এবং বাকি দু’জনের পাশে দাঁড়াবে।]

মন্ত্রী জাহাঁপনা, অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা থাকুক। মুখের লালায় আমার পা ভিজে গেছে। আমার গা ঘিনঘিন করছে।

[রাজা হাততালি দিতেই একটা বড় গামলা এনে একজন পানি দিয়ে রাজার পা ধুইয়ে দেবে।]

রাজা তোমরা কেউ বসন্তের গান জানো ? গাও, বসন্তের গান গাও।

[পিঠ-বাঁকারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে।]

তিনজনে হুজুর! আমরা গান জানি না।

রাজা গাইতে বলছি গাও [রাগতস্বরে]

তিনজনে গান কী করে গাইতে হয় জানি না, হুজুর।

[রাজা কড়া চোখে তাকাবেন।]

মন্ত্রী রাজা সাহেব রেগে যাচ্ছেন। তাঁকে রাগিও না।

[তিনজনে ভয়ে জড়সড় হয়ে কাছাকাছি চলে আসবে।]

ওস্তাদ ঠিক আছে, তোমরা আমার সঙ্গে গাও।

[ওস্তাদ গাইবেন। ওরা তাঁর সঙ্গে ঠোঁট মেলাতে চেষ্টা করবে। 'আজি এ বসন্তে' এই গানটি দেয়া যেতে পারে।]

রাজা মধু, মধু। মধুময় সঙ্গীত। আমার মন প্রফুল্ল হয়েছে। মন্ত্রী, কেমন লাগল আপনার ?

মন্ত্রী [কাশতে থাকবেন।]

রাজা ওস্তাদ, আপনার কেমন লাগল ?

ওস্তাদ রাজা-মহারাজাদের কখন কী ভালো লাগে বোঝা মুশকিল।

রাজা আপনি বলতে চাচ্ছেন ওদের কণ্ঠ মধুময় নয় ?

ওস্তাদ আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না। ওদের গান আপনার ভালো লাগলেই হলো।

রাজা আমার ভালো লেগেছে।

বৃদ্ধ আমরা রাজা সাবের জইন্যে সকাল-বিকাল-সইন্ধ্যা তিন বেলা গান গাইতে চাই।

বাকি সবাই গাইতে চাই।

তিন বেলা গান গাইতে চাই।

রাজা গাইবে, দিনরাত তোমরা মন খুলে গাইবে। তোমাদের জন্যে আমি গান রচনা করব। সেই গান তোমরা ছড়িয়ে দেবে দেশে দেশান্তরে।

তিনজনে দেশে দেশান্তরে।

রাজা পৃথিবীর মানুষেরা জানবে এই মহান নৃপতি শুধু প্রজাবৎসল নৃপতিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি এবং একজন মহান সুরকার।

তিনজনে একজন মহান সুরকার।

রাজা [বিরক্ত হয়ে] এরা বারবার আমার কথার পিঠে কথা বলছে কেন ? ওদের ঘাড় ধরে বের করে দিন।

[তিনজনেই তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে একজন চিৎ হয়ে পড়ে যাবে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[খোলা মাঠ। শো শো করে শীতের হাওয়া বইছে। তিনটি শিশু গায়ে চট জড়িয়ে বসে বসে শীতে কাঁপছে। বাচ্চাগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু গ্রামবাসী আছে। তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। এদের মধ্যে আছে ওসমান নামের অতি বৃদ্ধ এক ব্যক্তি। কাদের নামের এক তরুণ। লতিফা নাম্নী এক তরুণী। মঞ্চের এক কোনায় মাটির মালসায় আগুন। অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আগুন তাপাচ্ছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ দূরাগত ধ্বনি শোনা যাবে। আনন্দের বাজনা বাজছে ও তা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। গ্রামবাসীরা উৎকীর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করবে। দেখা যাবে লাঠিতে ভর দিয়ে মজনু আসছে। সে একবারও না থেমে একই গতিতে মঞ্চ অতিক্রম করবে। কথাবার্তা যা হবে চলার মধ্যেই হবে।]

বৃদ্ধ বড় কষ্ট! বড় কষ্ট! শীত জবর পড়ছে। বুড়া-মরণের শীত পড়ছে। এই শীতে সব বুড়া শেষ হবে রে। বুড়ার দল সব শেষ।

তরুণ শেষ হইলেই ভালো। বুড়া দিয়া কী হয় ? কিছু না।

তরুণী এইটা কেমুন কথা ? ও বুড়ো চাচা, আপনে আগুনের কাছে গিয়া বসেন। হাত দুইটা মেলেন আগুনের উপরে।

বৃদ্ধ দুই দিকে আগুন জ্বলে রে বেটি। পেটের মইধ্যেও আগুন। খিদার আগুন। সেই আগুনের কষ্ট আরো বেশি।

তরুণ এক কাজ করেন চাচা মিয়া, হা কইরা এট্টু আগুন খাইয়া ফেলেন। আগুনে আগুনে শান্তি। পেট ঠান্ডা হইব। হা-হা-হা।

তরুণী চুপ করো। লজ্জা নাই ? কেমন কথা কও ?

তরুণ মজাক করি রে, মজাক করি। রাইতটা তো কাটান দেওন লাগব। হাসি- মজাক কইরা রাইত পার করি। ও চাচা মিয়া, গোসা হইছেন ?

বৃদ্ধ [কথা বলবে না]

তরুণ গোসা কইরেন না চাচা মিয়া। শীতের মইধ্যে মাথার ঠিক থাকে না। একটা কিচ্ছা কন দেখি।

বৃদ্ধ [চুপ করে থাকে]

অন্য একজন: কন গো, একটা কিচ্ছা কন। কিচ্ছা হুনতে হুনতে রাইতটা পার করি।

বৃদ্ধ [চুপ।]

সবাই কনগো কন, একটা কিচ্ছা কন।

বৃদ্ধ এক দেশে আছিল এক রাজা।

তরুণ রাজার গল্প বাদ দেন। একটা গরিব মাইনষের গল্প কন দেহি।

বৃদ্ধ গরিব মাইনষের কোনো গল্প হয় না। খামকা কথা কইও না। গপ্পটা হুন মন দিয়া। শুনতে মনে না চায় দূরে গিয়ে বইসা থাক। একদেশে আছিল এক রাজা। [তরুণ উঠে দূরে চলে যায়।] সেই রাজার বড় শান-শওকত। বেশুমার খানা-খাদ্য।

অন্য একজন: কী খানা-খাদ্য এট্টু কন শুনি।

বৃদ্ধ কী কমু কও? রাজবাড়ির খানা-খাইদ্যের হিসাব-নিকাশ নাই। সেই রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। লোক-লস্কর, পাইক বরকন্দাজ। কিন্তু রাজার মনে সুখ নাই।

তরুণী তবু সুখ নাই? কন কী? ক্যান? সুখ নাই ক্যান?

বৃদ্ধ রাজা হইল আটকুড়া, তার পুত্রসন্তান নাই।

তরুণী আহা রে!

বৃদ্ধ পুত্রসন্তানের কারণে রাজা শুধু বিয়া করে। যেখানে যত সুন্দর কন্যা পায় বিয়া করে। কিন্তু পুত্রসন্তান হয় না। [তরুণ শব্দ করে হেসে উঠবে।]

হাসো ক্যান?

তরুণ আটকুড়া রাজা হইতে মনে চায়।

[সবাই হেসে উঠবে। এবং হাসি থেমে যাবে।]

তরুণী এর পরে কী হইল কন? পুত্রসন্তান হইল?

বৃদ্ধ কিচ্ছা আইজ থাউক। মন ভালো লাগতাছে না। বড় কষ্ট রে, বড় কষ্ট! শীতের কষ্ট। খিদার কষ্ট।

তরুণী একটা খিদার কিচ্ছা কন্ তো চাচা মিয়া? জানা আছে?

অন্য একজন: চুপ, চুপ, চুপ। পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। রাজার লোক আসতাছে।

[সবাই চুপ]

তরুণ পায়ের শব্দ না গো, বাতাসের শব্দ। ঠান্ডা বাতাস। বড় ঠান্ডা বাতাস।

বৃদ্ধ সমস্ত দিন গেল। সইন্ধ্যা গেল। চাইরদিক অন্ধকার। ঠান্ডা শীতের বাতাস। রাজার খবর নিয়া তো এখনো কেউ আইল না।

সকলে আসে না।

কেউ আসে না।

তরুণী পায়ের শব্দ শোনা যায়।
ভালো কইরা চাইয়া দেখেন।
কাউরে দেখা যায় ?

সকলে না। কেউ নাই।

বৃদ্ধ শীতের বাতাস বয়,
শরীর দুর্বল হইছে, বড় কষ্ট হয়।

তরুণী পায়ের শব্দ শোনা যায়
চারদিকে চউখ ফেলেন
রাজা সাবের লোকজন কাউরে দেখা যায় ?

সকলে না, কেউ নাই।

বৃদ্ধ শীতের বাতাস বয়
শরীর দুর্বল হইছে, বড় কষ্ট হয়।

অন্য একজন চুপ করেন, চুপ করেন,
কোনো কথা নাই।
কে যেন আসতে ধরছে লাঠির শব্দ পাই।

ওসমান তুমি কেডা ?

মজনু আমি মজনু।

ওসমান বাদ্য-বাজনা শোনা যায়। আসে কেডা ?

মজনু রাজার পয়গাম আসতেছে। বড় সুসংবাদ।
[দ্বিতীয় প্রজা নিয়ামত পিঠ বাঁকা করে ঢুকবে। সেও প্রথমজনের মতো মঞ্চে অতিক্রম করবে]

তরুণ আপনে কেডা ?

বশির আমার নাম বশির।

তরুণ বেঁকা হইয়া হাঁটেন ক্যান ?

বশির রাজার পয়গাম আসতাছে। বড় সুসংবাদ।
[তৃতীয়জনের প্রবেশ। প্রথম দু'জনের মতো মঞ্চ অতিক্রম করবে।]

তরুণী আপনি কেডা গো ?

নিয়ামত আমি নিয়ামত।

তরুণী জোয়ান বয়সে অমুন বেঁকা হইয়া হাঁটেন ক্যান ? [নিয়ামত দাঁড়াবে]
কমরটা ভাঙলেন ক্যামনে ? ঘটনাটা কন।

বৃদ্ধ নিয়ামত, শীত লাগলে আগুনের কাছে আইসা এট্টু খাড়াও।

নিয়ামত [হাঁটতে শুরু করবে] বাদ্য-বাজনা শোনা যায়

রাজার পয়গাম আয়।

বড় সুসংবাদ।

[দেখতে দেখতে রাজার সংবাদ বহনকারী দল এসে পড়বে। ঢোল আছে, রামসিংগা আছে। একজন ঘোষক আছে।]

ঘোষক গ্রামবাসী, মন দিয়া শুনেন। রাজা সাবের হুকুমে এই বৎসর বসন্তের উৎসব আগে আগে হইবার কথা। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত বলেন।

গ্রামবাসী [মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে। গুনগুন কথা হবে।]

ঘোষক হ্যাঁ কিংবা না। স্পষ্ট করে বলেন।

ওসমান পেটে ভাত নাই। রাজা সাবরে ভাত দিতে কন। শীতের মইধ্যে আবার বসন্ত উৎসব কী?

ঘোষক এত কথা না রে ভাই, হ্যাঁ কিংবা না স্পষ্ট করে বলেন।

ওসমান না।

ঘোষক একজন শুধু না বললেন আর সব হ্যাঁ।

[বলতে বলতে বাজনা শুরু হবে।]

গ্রামবাসী [মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে।]

ঘোষক ভাই আপনের নাম?

ওসমান ওসমান।

ঘোষক আসেন আমাদের সাথে।

ওসমান কই?

ঘোষক এত কথা বলবার সময় নাই। আসতে বলছি আসেন। চলেন এইবার যাই। [ওসমান উঠে দাঁড়াবে।]

গ্রামবাসী কই যান?

[ঘোষক তার দলবল নিয়ে চলে যাবে। শোঁশোঁ করে বইবে শীতের বাতাস। শুকনো পাতা পড়ছে। তিন পিঠ-বাঁকাকে আবার মঞ্চ অতিক্রম করতে দেখা যাবে। এবার একজনের পিছনে একজন। গ্রামবাসী তাকিয়ে দেখবে, কিছু বলবে না। দূরাগত ধ্বনি। গ্রামবাসী সচকিত। ঘোষকের প্রবেশ।]

ঘোষক সুসংবাদ ভাই, সুসংবাদ! রাজ্যের সব লোক বসন্তের উৎসব চায় তাই— উৎসবের সময়টা আপনাদের জানাই— মাঘ মাসের নয় তারিখে খুব শুভক্ষণ— এই দিনে উৎসব হবে শুনেন দিয়া মন।

[এ পর্যন্ত বলতেই তরুণটি থু করে থুথু ফেলবে।]

গ্রামবাসী [থু করে থুথু ফেলবে]

ঘোষক মাঘ মাসের নয় তারিখে শুভ দিনক্ষণ।

তরুণ ভাই আপনে রাজা সাবরে ভাত দিতে কন।

ঘোষক গ্রামবাসী বৃদ্ধ-যুবা শুনেন দিয়া মন।

তরুণ ভাই আপনে রাজা সাবরে কাপড় দিতে কন।

গ্রামবাসী ভাত দিতে কন।
কাপড় দিতে কন।
ভাত দিতে কন।
কাপড় দিতে কন।

[ঘোষকের লোকজন তরুণটিকে ধরবে এবং নিয়ে যেতে শুরু করবে]

তরুণী একটা কথা শুনেন— আপনে কথার জবাব দেন। আপনে আমার ঘরের মানুষ কোন জাগাতে নেন ?

ঘোষক চুপ।

তরুণ তুই চুপ।

ঘোষক মনে নাই ডর ভয়— বড় বেশি কথা কয়।

তরুণী [গ্রামবাসীদের উদ্দেশে] ঘরের মানুষ লইয়া যায়, চাইয়া থাকেন ক্যান ? আমার মানুষ আমার কাছে কাইড়া আইন্যা দেন। [গ্রামবাসী সব একত্রে দাঁড়িয়ে যাবে।]

ঘোষক খবরদার, চুপ।

[সবাই যে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় ফ্রিজ হয়ে যাবে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। মন্ত্রী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে]

রাজা বসন্ত উৎসবের আয়োজন কি সুসম্পন্ন ?

মন্ত্রী প্রায় !

রাজা প্রায় কেন ? মনে হচ্ছে কাজ এগুচ্ছে না ?

মন্ত্রী যে রকম ভাবা গিয়েছিল তেমন উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না। শীতকালটা উৎসবের জন্যে ভালো নয়।

রাজা এই মতামত কি তোমার ?

মন্ত্রী আমার নয় মহারাজ। মন্ত্রীর নিজস্ব কোনো মতামত থাকে না। যারা উৎসবের ব্যাপারে আপত্তি করছে তাদের মতামত।

রাজা তারা সংখ্যায় খুব বেশি নয় আশা করি।

মন্ত্রী খুব কমও নয়। আমি ওদের আপনার সামনে উপস্থিত করছি।

রাজা কেন ?

মন্ত্রী ওদের কথা আপনার শোনা দরকার।

রাজা আমাকেই যদি ওদের কথা শুনতে হয়, তাহলে আপনারা কী জন্যে আছেন ?

মন্ত্রী বয়স হয়ে গিয়েছে। এখন আর ওদের সব কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি না।

রাজা কেন ? ওরা কি নতুন কোনো ভাষায় কথা বলছে ?

মন্ত্রী হুঁ।

রাজা বেশ তো, ওদের নিয়ে আসুন।

[বৃদ্ধ ওসমান ও তরুণটি প্রবেশ করবে। এদের দু'জনের কোমরে দড়ি বাঁধা। খালি গা]

রাজা তোমরা ভালো আছ ? [বন্দি দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে।] ওদের বেঁধে রেখেছেন কেন ? বাঁধন খুলে দিন।

[বাঁধন খুলে দিতেই বৃদ্ধটি নত হয়ে কুর্নিশ করবে।]

শুনলাম তুমি চাও না বসন্ত উৎসব হোক ?

বৃদ্ধ [ইতস্তত করে] বড় অভাব হুজুর! বড় কষ্ট!

রাজা অভাব থাকবে, কষ্ট থাকবে। আবার সুখও থাকবে। আনন্দ-উল্লাসও থাকবে। বসন্ত উৎসবও হবে।

বৃদ্ধ হুজুর, এটা শীতকাল।

রাজা শীত ভাবলেই শীত, বসন্ত ভাবলেই বসন্ত। তুমি যদি ভাবো এটা বসন্তকাল তাহলে এটা বসন্তকাল। ঠিক না ?

বৃদ্ধ তা তো ঠিকই।

রাজা তুমি জ্ঞানীর মতো কথা বলছো। তুমি বৃদ্ধ, কাজেই তুমি জ্ঞানী। বৃদ্ধরা জ্ঞানী হয়।

বৃদ্ধ তা তো ঠিকই।

রাজা মন্ত্রী, আপনি একে একটি উপাধি দেবার ব্যবস্থা করুন।

বৃদ্ধ হুজুরের দয়া।

রাজা তোমার উপাধি হবে জ্ঞানবৃদ্ধ।

বৃদ্ধ হুজুরের অসীম দয়া।

রাজা আমার পদচুম্বনের দুর্লভ সম্মানও তুমি পাবে।

তরুণ [থু করে থুথু ফেলবে

সবাই তাকাবে। রাজা হাসিমুখে তার পা বাড়িয়ে দেবেন। বৃদ্ধ ইতস্তত

করবে। তরুণটির দিকে কয়েকবার তাকাবে। তারপর এগুবে রাজার দিকে।]

মন্ত্রী তোমার মুখ পরিষ্কার আছে তো?

বৃদ্ধ [থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যাবে]

মন্ত্রী মুখ ধুয়ে নাও।

[একজন প্রতিহারী পানি এগিয়ে দেবে। বৃদ্ধ বারবার তাকাবে তরুণটির দিকে। তারপর মুখ ধুয়ে এগিয়ে গিয়ে পদচুম্বন করবেন।]

রাজা খুশি হয়েছো?

বৃদ্ধ জে। বড় মোলায়েম পা হুজুরের।

[মন্ত্রী হাততালি দিতেই একজন একটি প্রকাণ্ড কাঠের টুকরো এনে বৃদ্ধের গলায় ঝুলিয়ে দেবে। বৃদ্ধ বাঁকা হয়ে যাবে। তার হাতে একটি লাঠি ধরিয়ে দেয়া হবে। কাঠের টুকরোটিতে লেখা 'জ্ঞানবৃদ্ধ'।]

তরুণ [থুথু করে থুথু ফেলবে।

ঐ তিন-বাঁকা লোক লাঠি হাতে একে একে ঢুকবে। মুখ ধুয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে এনায়েত।]

রাজা তোমাকে জ্ঞানবৃদ্ধ উপাধি দেয়া হয়েছে, তুমি এখন একজন জ্ঞানী। কাজেই জ্ঞানীর মতো কিছু কথা বলো।

বৃদ্ধ [কাশতে থাকবে এবং এদিক-ওদিক তাকাবে।]

রাজা তুমি জ্ঞানীর মতো কথা বলতে জানো না?

বৃদ্ধ জে না হুজুর।

রাজা জ্ঞানের কথা হবে দুর্বোধ্য। কোনো অর্থ থাকবে না। অথচ মনে হবে অর্থ আছে। এরকম কিছু তুমি কি জানো না?

বৃদ্ধ জে না হুজুর।

রাজা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে কখনো দেখোনি?

বৃদ্ধ এই জীবনে কুল্লে একজনরে দেখছি। আপনেরে দেখছি। আর কেউরে দেখি নাই হুজুর।

রাজা সাধু সাধু! তুমি শুধু জ্ঞানীই নও, তুমি মহাজ্ঞানী।

[রাজার কথা শেষ হতেই একজন প্রতিহারী এসে বৃদ্ধের গলায় 'মহাজ্ঞানী' পদক পরিয়ে দেবে। বৃদ্ধের মাথা অনেকখানি নেমে যাবে। বৃদ্ধ হাঁপাতে থাকবে।]

বৃদ্ধ ওজন বড় বেশি জনাব।

রাজা পদকের ওজন তো বেশি হবেই। কষ্ট হচ্ছে? খুলে ফেলতে চাও?

বৃদ্ধ জে না। দুই-একদিন গলায় ঝুললে সহ্য হইব। আর ওজনও তেমন বেশি না। রাজা সাব সেলাম, মন্ত্রী সাব সেলাম। [এগিয়ে আসবে চান্দ মিয়ার দিকে।] ও চাঁদ মিঞা, আমার কথা শোন— চুমা দে একটা রাজা সাবের পাওডাত। পাও ধোয়া আছে। আমার কথাডা শোন।

তরুণ আপনে আপনের কামে যান। আমার কথা চিন্তা করনের দরকার নাই।

বৃদ্ধ বেকুবি করিস না চাঁন। জোয়ান বয়স হইল বেকুবির বয়স। জোয়ান বয়সে খালি বেকুবি করতে মন চায়।

রাজা ও সত্যি সত্যি জ্ঞানীর মতো কথা বলছে। ও সত্যি জ্ঞানী হয়ে গেছে। বুঝলে মন্ত্রী, জ্ঞান মানুষকে জ্ঞানী করে না—

মন্ত্রী পদক জ্ঞানী করে।

রাজা শোনো জ্ঞানবৃদ্ধ তুমি এখন যাও, একে একা থাকতে দাও।

[বৃদ্ধ চলে যাবে। তিন-বাঁকা ঢুকবে এবং কুলি করে চলে যাবে।]

রাজা তুমি আমার কথা শোনো। তাকাও আমার দিকে।

তরুণ [মাথা ঝাঁকাবে।]

রাজা দুর্বল শরীরে এত জোরে মাথা ঝাঁকি দেয়া ঠিক না। এতে মাথা খুলে পড়ে যেতে পারে।

মন্ত্রী রাজার পদচুম্বন করতে কি তোমার অহঙ্কারে লাগছে ? অহঙ্কার ভালো নয়। দুর্বলের অহঙ্কার থাকতে নেই।

[তরুণটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে পদচুম্বন করবে]

রাজা তোমার শুভবুদ্ধির উদয় হচ্ছে দেখে খুশি হচ্ছি। এসো, এসো।

[তরুণটি এগিয়ে এসে গোঁ গোঁ করতে করতে রাজার পা কামড়ে ধরবে। তীব্র বাজনা বেজে উঠবে। রাজার মুখ হাসি-হাসি থাকবে।]

তোমার সাহস দেখে চমৎকৃত হয়েছি। কী নাম তোমার ?

তরুণ [তাকিয়ে থাকবে।]

রাজা সাহসী মানুষদের আমি সব সময়ই পছন্দ করি। শুধু পছন্দ নয়, পুরস্কৃতও করি। মন্ত্রী, ওকে কী পুরস্কার দেয়া যায় ?

মন্ত্রী মহারাজ, ওকে সাহসী তরুণ উপাধি দিয়ে দিন।

তরুণ [থু করে থুথু ফেলবে।]

রাজা একে আমি মূল্যহীন উপাধি কী করে দেই ? অন্য কিছু দিতে হবে।

মন্ত্রী পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিন।

তরুণ [থু করে থুথু ফেলবে।]

[রাজা তরুণকে লক্ষ করছেন।]

মন্ত্রী পঞ্চাশটি দিন।

তরুণ [থুথু ফেলবে]

মন্ত্রী পাঁচশ' দিন।

তরুণ [এইবার আর থুথু ফেলবে না।]

রাজা পাঁচশ' নয়, এই সাহসী তরুণকে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিন।

[সভাসদের হাততালি— একটি স্বর্ণমুদ্রাভর্তি থলে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সে অন্যদের মতো বাঁকা হয়ে যাবে।]

হ্যাঁ, তুমি এখন যেতে পারো।

[তরুণটি ইতস্তত করে দরজা পর্যন্ত যাবে। আবার ফিরে আসবে। রাজা পা বাড়িয়ে দেবেন। তরুণটি চুম্বনের জন্য মাথা নিচু করতেই।]

মন্ত্রী মুখ ধুয়ে নাও। ভালো করে মুখ ধুয়ে নাও।

[মুখ ধুয়ে চুম্বন করামাত্রই অসংখ্য কাক কা-কা করে ডাকতে থাকবে।]

রাজা একদিনে অনেক কাজ হলো মন্ত্রী। আজ তাহলে সভা ভঙ্গ হোক।

মন্ত্রী আর অল্প কিছু সময় কি দিতে পারবেন না মহারাজা?

রাজা নিশ্চয় পারব। একশবার পারব। হাজারবার পারব। আজ আমার বড় আনন্দ মন্ত্রী। বড় আনন্দ!

মন্ত্রী আপনার আনন্দে আমাদেরও আনন্দ। আপনার সুখেই আমাদের সুখ।

রাজা আহ্, এসব কথা অনেকবার শুনেছি। আর কী বলবে বলো। নতুন কিছু বলো।

মন্ত্রী নগরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি আপনাকে ফুলের মালা দিতে চান।

রাজা ফুলের মালা?

মন্ত্রী জি, ফুলের মালা। এরা সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন।

রাজা আহা, সকাল থেকে অপেক্ষা করছে! ওদের তো বড় কষ্ট হয়েছে মন্ত্রী। আমি কারো কষ্ট সহ্য করতে পারি না। যাও যাও, এক এক করে নিয়ে এসো।

[ফুলের মালা হাতে একজন প্রবেশ করবে। মালা পরাবে।]

ভালো আছ তুমি?

১ম লোক ভালো আছি। খুব ভালো আছি।

রাজা সুখে আছ?

১ম লোক মহাসুখে আছি, মহানন্দে আছি।

[১ম লোক চলে যাবে। ২য় লোক ঢুকবে, মালা দেবে।]

রাজা তুমি ভালো তো?

২য় লোক: জি জনাব, ভালো। আমি সুখী-মহাসুখী।

রাজা কেন তুমি মহাসুখী ?

২য় লোক আপনাকে দেখতে পেয়েছি, তাই। রাজদর্শনে পুণ্য আছে। শাস্ত্রের কথা। পুণ্যতেই সুখ— মহাসুখ। [প্রস্থান।]

[৩য় ব্যক্তির প্রবেশ]

৩য় লোক : হুজুর, এই মালাটি আমার কন্যা রাত জেগে নিজ হাতে গেঁথেছে আপনার জন্যে।

রাজা রাত জেগে গেঁথেছে ? আহা, আহা বড় কষ্ট হয়েছে তো !

৩য় লোক : আপনার জন্যে মালা গাঁথায় কোনো কষ্ট নেই।

রাজা [মালা শুঁকে] এত কষ্টের মালা কিন্তু কোনো গন্ধ পাচ্ছি না কেন ?

৩য় লোক: ফুলগুলো কাগজের, তাই গন্ধ নেই। রাজ্যে ফুলের বড় অভাব জনাব।

রাজা হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক ঠিক। আমার মনে ছিল না। গন্ধের কোনো প্রয়োজন নেই। এর সৌন্দর্য তার গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে। আমি তোমার কন্যার প্রতি প্রীত হয়েছি। ওকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই।

৩য় লোক: হুজুরের অসীম দয়া! প্রজাদের প্রতি আপনার মমতার কোনো সীমা নেই।

রাজা চুপ, সব চুপ। আমি এর কন্যার জন্যে একটি কবিতা লিখে দেব। আমার ভাব এসে গেছে। কাগজ, কলম। আলো, আলো কমিয়ে দাও। গোধূলির পরিবেশ তৈরি করো। কলম, কলম।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রানি একাকী হাঁটছেন। ওস্তাদের প্রবেশ]

রানি আপনি এসেছেন কেন ? আপনাকে তো ডাকিনি ! তাছাড়া আপনি এমন নিঃশব্দে কেন হাঁটেন ? আমি চমকে উঠেছিলাম। এখনো আমার বুক কাঁপছে।

ওস্তাদ মাঝে মাঝে চমকে ওঠা ভালো। এতে শরীর সুস্থ থাকে।

রানি আপনি কী চান আমার কাছে ?

ওস্তাদ শুনলাম কয়েক রাত ধরে আপনার ঘুম হচ্ছে না। আপনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

রানি কোত্থেকে শুনলেন আমার ঘুম হচ্ছে না ?

ওস্তাদ রাজপ্রাসাদের সবাই আপনার দুঃস্বপ্নের কথা বলাবলি করছিল। অনেকেই মনে করছে যেহেতু মহারানি দুঃস্বপ্ন দেখছেন কাজেই তাদেরও দেখা উচিত। কাজেই তারাও দেখছে। কয়েক রাত ধরে

অনেকেই ঘুমুতে পারছে না, মহারানি।

রানি আপনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন ?

ওস্তাদ হ্যাঁ।

রানি কী দেখছেন ?

ওস্তাদ দেখলাম, মহানন্দে রাজ্যে বসন্ত উৎসব হচ্ছে, গান-বাজনা, আনন্দ-উল্লাস। রূপসী নর্তকীরা মহারাজাকে ঘিরে ঘিরে নাচছে। প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে মহারানি স্বয়ং প্রজাদের মধ্যে ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। একটি-দু'টি ফুল নয়, লক্ষ লক্ষ ফুলের অযুত নিযুত পাপড়ি। কী অপূর্ব তার সৌরভ!

রানি এ-তো চমৎকার একটি স্বপ্ন। একে দুঃস্বপ্ন বলছেন কেন ?

ওস্তাদ দুঃস্বপ্ন বলছি কারণ ফুলের পাপড়ি আপনি যাদের দিচ্ছেন তারা ফুল চায় না।

রানি তারা কী চায় ?

ওস্তাদ ভাত চায়।

[রানি তাকিয়ে থাকবেন। এবং দ্রুত চলে যাবেন। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকবে। একজনের পেছনে একজন করে পিঠ-বাঁকার দল মঞ্চ অতিক্রম করবে। তারা পা ফেলছে তালে তালে।]

মজনু জয়! মহারাজার জয়! [চলতে চলতে বলবে।]

বাকি সবাই: জয়! মহারাজার জয়!

ওস্তাদ তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?

মজনু বসন্ত উৎসবের কথা দশজনেরে বলতে যাই, জনাব। মহারাজার দয়ার কথা সবারে বলতে যাই। মহারাজা দয়ার সাগর।

সবাই দয়ার সাগর!

মজনু আনন্দের সমুদ্র।

সবাই আনন্দের সমুদ্র!

ওস্তাদ বাঁকা হয়ে কি উৎসবের সংবাদ দিতে আছে ? উৎসবের সংবাদ দিতে হয় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। বুক টান করে দাঁড়ান না সবাই।

মজনু আমাদের অত সময় নাই। [চলে যাবে।]

বশির আমাদের অত সময় নাই। [প্রস্থান।]

নেয়ামত আমাদের অত সময় নাই। [চলে যাবে।]

সবাই আমাদের অত সময় নাই। [চলে যাবে।]

[মঞ্চে শুধু বৃদ্ধ ও তরুণটি থাকবে। দু'জনেরই পিঠ বাঁকা।]

ওস্তাদ বুক টান করে দাঁড়ান। মানুষের মতো দাঁড়ান।

[দু'জনেই চেষ্টা করবে, পারবে না।]

বৃদ্ধ এর ওজন বড় বেশি জনাব। সোজা হওন যায় না। অল্প কয়টা দিন বাঁচুম, বেঁকা হইয়া থাকলে অসুবিধা নাই। আচ্ছা ভাই, যাই। সেলাম।

[চলে যেতে ধরবে।

তরুণটি দাঁড়িয়ে আছে একা।]

ওস্তাদ অল্প ক'টা দিন বাঁচবে, এই ক'টা দিন না হয় সোজা হয়েই বাঁচো।

বৃদ্ধ লাভ তো কিছু নাই ওস্তাদজি।

ওস্তাদ লাভ থাকবে না কেন ? এই বয়সে এত বড় একটা বোঝা! তোমার কোমর তো ভেঙে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ কিন্তু জনাব, এই বোঝাটার একটা ইজ্জত আছে। এর কারণে পাঁচজনে আমারে সালাম দেয়। দুই-একটা জ্ঞানের কথা শুনতে চায়। রাজাসাবও আমারে পেয়ার করেন।

ওস্তাদ তোমার লোকজন তো একসময় তোমাকে ভালোবাসত, তারা কি এখনো বাসে ?

বৃদ্ধ ছোড লোকের ভালোবাসার কি কোনো দাম আছে জনাব ? কোনো দাম নেই। একটা ময়ূরপক্ষী এক হাজার কাকের সমান।

ওস্তাদ বাহ্, তুমি তো সত্যি সত্যি জ্ঞানের কথা বলতে শুরু করেছ!

বৃদ্ধ আরো একটা কথা আছে, জনাব।

ওস্তাদ বলো, সেই কথাটাও শুনি।

বৃদ্ধ আমি হইলাম মরণকালের বুড়া। আমার পিঠ বেঁকা থাকলেই কি, সোজা হইলেই কি ? [তরুণকে ইঙ্গিত করে।] যারার পিঠ সোজা থাকনের কথা তারাই বেঁকা হইয়া ঘুরতাছে। আচ্ছা ওস্তাদজি, যাই। সেলাম।

[বৃদ্ধ চলে যাবে।]

ওস্তাদ তোমার জোয়ান বয়স। তোমার বাঁকা হয়ে থাকা তো ঠিক না। নাম কী তোমার ?

তরুণ চাঁন মিয়া।

ওস্তাদ বাহ্, কী চমৎকার একটা নাম! এত সুন্দর নামের একটি ছেলে সারাজীবন বাঁকা হয়ে থাকবে ? দেশের বাড়িতে কে আছে তোমার ?

তরুণ আমার বউ আছে।

ওস্তাদ তার কী নাম ?

তরুণ ফুলি।

ওস্তাদ বাহ্ বাহ্ বাহ্, কী সুন্দর নাম! ফুল থেকে ফুলি। শোনো চাঁন মিয়া—ফুলি না ডেকে এখন থেকে তুমি তাকে ডাকবে ফুলকুমারী।

তরুণ জি আচ্ছা।

ওস্তাদ এখন তুমি এক কাজ করো, বস্তাটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর ফিরে যাও ফুলকুমারীর কাছে।

[তরুণ গলা থেকে বস্তা নামিয়ে রাখবে। সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।]

যাও, এখন ফুলকুমারীর কাছে যাও। সে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। অনেক দিন তো তার সঙ্গে তোমার দেখা হচ্ছে না, ঠিক না?

তরুণ [হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়বে। তরুণ সোজা হয়ে উল্টো দিকে চলে যাবে। আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গীত বেজে উঠবে। হঠাৎ সমস্ত সঙ্গীত থেমে যাবে। দেখা যাবে তরুণটি চোরের মতো আবার ঢুকছে। স্বর্ণমুদ্রাভর্তি ব্যাগ গলায় ঝুলিয়ে পিঠ বাঁকা করে সে অন্যরা যেদিকে গেছে সেদিকে রওনা হবে। একবারও তাকাবে না ওস্তাদজির দিকে। ওস্তাদজি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটি দেখবেন।

মঞ্চের অন্যপ্রান্ত থেকে ঢুকবেন রাজা। তাঁর মুখ হাসি-হাসি]

রাজা যদি দশটি স্বর্ণমুদ্রা থাকতো তাহলে সে হয়তো তোমার কথা শুনত। বিশটি বা ত্রিশটি থাকলেও শুনত। কিন্তু ওখানে আছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

ওস্তাদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তুচ্ছ করতে পারে এমন মানুষও তো এ রাজ্যে আছে মহারাজা। আছে না?

রাজা হয়তো আছে। কিন্তু তাদের জন্যে আছে দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রার থলে। যারা দু'হাজারকে তুচ্ছ করবে তাদের জন্যে তিন হাজারের ব্যবস্থা আছে। [রাজা হাসতে থাকবেন।] রাজ্য চালনা কঠিন কাজ ওস্তাদজি।

ওস্তাদ হ্যাঁ খুবই কঠিন।

রাজা আমি দূর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা খুব আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছিলাম। এত আগ্রহ নিয়ে এর আগে কোনোকিছু লক্ষ করিনি।

ওস্তাদ মহারাজার আগ্রহের কারণ ঘটাতে পেরেছি। তার জন্যে বড় আনন্দবোধ করছি।

রাজা আনন্দবোধ করাই উচিত। আমি তোমার উপর খুব খুশি হয়েছি।

ওস্তাদ আপনার সুখের কারণ ঘটাতে পেরেছি। তাতেই আমার আনন্দ।

রাজা ওস্তাদজি!

ওস্তাদ বলুন জনাব।

রাজা শুনলাম, তুমি না-কি আজকাল দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ ? ভয়াবহ সব দুঃস্বপ্ন!

ওস্তাদ [চুপ করে আছে।]

রাজা এবং তুমি তোমার দুঃস্বপ্নের কথা বলে বেড়াচ্ছ সবাইকে ?

ওস্তাদ স্বপ্ন খুব রহস্যময় বস্তু জনাব। এতে থাকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, কাজেই স্বপ্নের কথা বলতে হয়।

রাজা ঠিক ঠিক। খুব ঠিক। বলাই উচিত। বলে তুমি ভালোই করেছ। আমি তোমার উপর খুশি। খুব খুশি। নাও, তুমি এই মালাটা নাও। এটা তোমার জন্য।

ওস্তাদ মহারাজার মালা গলায় পরার যোগ্যতা কি আমার আছে ?

রাজা ওস্তাদজি, মহারাজার মালা অযোগ্য লোকদের গলাতেই বেশি ঝুলে। আমি কি ঠিক বলেছি ?

ওস্তাদ বলেছেন। ঠিক বলেছেন। আপনি মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন যে, আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাই।

রাজা [হাসি] বিভ্রান্ত হয়ে যাও। খুব ভালো বলেছ। একজন বুদ্ধিমান নৃপতির কাজই হচ্ছে আশেপাশের সবাইকে বিভ্রান্ত করে রাখা। দশটি মিথ্যা কথার সঙ্গে তিনটি সত্যি কথা মিশিয়ে দেয়া। দশটি ভুল সিদ্ধান্তের সঙ্গে দু'টি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া।

ওস্তাদ আপনি বুদ্ধিমান ।

রাজা ধন্যবাদ।

ওস্তাদ আমি কি যেতে পারি, মহারাজা ?

রাজা নিশ্চয়ই যেতে পারো। তবে শোনো, একটি কথা তোমাকে বলা প্রয়োজন মনে করছি— তোমার গান এখন আর আমাকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। তোমার গলা নষ্ট হয়ে গেছে। এমন একটি সুন্দর কণ্ঠ তো নষ্ট হতে দেয়া ঠিক না। কী করে তোমার গলা ঠিক করা যায় বলো তো ? [রাজা হাততালি দেবেন, মন্ত্রী এসে ঢুকবেন।] এর গলা নষ্ট হয়ে গেছে। কী করে এর [রাজা আবার হাততালি দেবেন, দুজন সভাসদ এসে ঢুকবেন।] গলা ঠিক করা যায় বলো তো ? আমি তার কণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীত আবার শুনতে চাই। [সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে। আপন মনে] অন্ধ গায়ক-গায়িকারা খুব সুকণ্ঠ হয়। কী, হয় না ? [সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে।] ওকে নিয়ে যাও। নষ্ট করে দাও ওর চোখ। আমি আবার তার কণ্ঠে অপূর্ব সুরধ্বনি শুনতে চাই। আমি আবার আবেগে উদ্বেলিত হতে চাই। যাও ওকে নিয়ে যাও।

মন্ত্রী [অবাক] মহারাজা!

রাজা আহা, কেন প্রশ্ন করছো? ও তো করছে না। সে তো তার কণ্ঠে যৌবন ফিরে পেতে চায়। তাই না?

ওস্তাদ [তাকিয়ে আছেন।]

রাজা যাও, ওকে নিয়ে যাও।

[ওস্তাদ চলে যাবেন। তার পেছনে মন্ত্রী ও সভাসদরাও যাবে। আলো কমে আসবে। রাজা নিজ মনে পায়চারি করবেন ও হাসতে শুরু করবেন। অট্টহাসি শুনে রানি ঢুকবেন।]

রানি [আতঙ্কিত হয়ে।] কী হয়েছে?

রাজা কিছুই হয় নি। সব ঠিক আছে এবং দীর্ঘ দিন ধরে ঠিক থাকবে। এসো, তুমি আমার কাছে এসো!

[রাজা ও রানির প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য

[রাজার সিংহাসন। রাজা নেই। মন্ত্রী ও সভাসদরা আছেন।]

মন্ত্রী মহিমগড়ের মহারাজা আজ প্রজাদের দর্শন দিতে পারছেন না। আসন্ন উৎসব নিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ কাব্য রচনা করবেন বলে ঠিক করেছেন।

নকিব মহারাজার জয় হোক।

সবাই মহারাজার জয় হোক।

মন্ত্রী বসন্ত উৎসব উপলক্ষে আমাদের প্রিয় নৃপতি এই রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের জন্যে একটি বিশেষ উপহারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সবাইকে সুখী দেখতে চান, আনন্দিত দেখতে চান।

মজনু মহারাজার জয় হোক।

সবাই মহারাজার জয় হোক।

মন্ত্রী মহারাজার উপহার হচ্ছে, রাজ্যের সমস্ত প্রজা উৎসবের দশদিন রাজার পদচুম্বনের সুযোগ পাবে। ধনী-নির্ধন, আমীর-ফকির সবার জন্যেই এই উপহার। মহারাজার চোখে সবাই সমান।

সবাই জয়, মহারাজার জয়!

[ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজবে। রাজার প্রবেশ।]

রাজা তুমি কি উপহারের ঘোষণাটি পড়ে ফেলেছ?

মন্ত্রী এইমাত্র পড়লাম।

রাজা কিন্তু ব্যাপারটা এখন আর আমার পছন্দ হচ্ছে না। সারাক্ষণ আমার পায়ে থুথু লেগে থাকবে ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। তারচেয়ে বড় কথা— সবাই অল্পে তুষ্ট নয়। কেউ কেউ পা চাটতে শুরু করবে। অসহ্য, অসহ্য! ঘোষণা বাতিল করে দাও। উৎসবের দশদিন আমি ওদের দেখতে চাই না। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।

মন্ত্রী তা হয় না মহারাজ। ঘোষণা বাতিল হলে প্রজাদের আশাভঙ্গের কারণ ঘটবে। ওদের সমস্ত আনন্দই মাটি হবে। সেটা ঠিক হবে না। তবে মহারাজা, আমি দু'দিক বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছি। প্রজারা আপনার পায়ে চুমু খাবে কিন্তু তা আপনাকে স্পর্শ করবে না।

রাজা বলো কী!

মন্ত্রী [হাততালি।] রাজমিস্ত্রিকে দিয়ে অবিকল আপনার পায়ের মতো একটি কাঠের পা তৈরি করা হয়েছে। [প্রকাণ্ড একটি ট্রেতে প্লাস্টার অব প্যারিসের তৈরি ধবধবে একটি পা এনে মঞ্চে রাখবে।] প্রজারা চুমু খাবে এই পায়ে।

রাজা চমৎকার!

সবাই চমৎকার! চমৎকার!

রাজা আমি অত্যন্ত প্রফুল্ল বোধ করছি। সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান তুমি বের করেছ। বলো, তুমি আমার কাছে কী চাও?

মন্ত্রী আপনার অনুগ্রহ চাই। আর কিছুই চাই না।

রাজা না না, শুধু অনুগ্রহ নয়। আমি এর বাইরেও তোমাকে কিছু দিতে চাই। কী দেয়া যায়? আমার এই রাজকীয় পা বহন করার দুর্লভ সম্মান আমি তোমাকে দিতে চাই।

মন্ত্রী এ আমার পরম সৌভাগ্য।

[রাজার ইঙ্গিতে ঐ পা মন্ত্রীর গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। পা গলায় ঝুলানোর পর মন্ত্রী খুব ধীরে ধীরে বাঁকা হতে থাকবেন।]

রাজা [হাসতে থাকবেন।]

সবাই [রাজার দেখাদেখি হাসতে থাকবে।

টুং টুং করে ঘণ্টা বাজবে। পাঁচ পিঠ-বাঁকাকে ঢুকতে দেখা যাবে এবং মন্ত্রীর গলায় ঝুলানো পায়ে চুমু দিয়ে একে একে চলে যাবে। ওরা চলে যেতেই রাজা গম্ভীর গলায় ডাকবেন।]

রাজা ডাকো, ওদের ডাকো। [ওরা এসে ঢুকবে।] তোমরা এখানে কেন? তোমাদের তো বলেছিলাম— আনন্দের বার্তা নিয়ে দূর-দূরান্তে যাবে।

বসন্ত উৎসবের কথা বলবে। তোমরা কি যাওনি কোথাও ? বলো, বলো, কথা বলো। চুপ করে আছ কেন ?

মজনু রোজ একবার আপনেরে না দেখলে মনটা কান্দে।

সবাই মনটা কান্দে।

মজনু আমরা মহারাজের আশেপাশেই থাকতে চাই।

সবাই থাকতে চাই।

মজনু বেকুবগুলোর কাছে যাইতে চাই না হুজুর।

সবাই চাই না হুজুর।

রাজা আমার প্রতি তোমাদের প্রীতি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। বড় ভালো লাগছে।

সবাই আমাদেরও বড় ভালো লাগতাছে। বড় আনন্দ। [সবাই হাসবে]

রাজা হাসছো কেন ? তোমাদের তো হাসতে বলিনি। তোমাদের বলেছিলাম বসন্ত উৎসবের খবর পৌঁছাবে। তাও পৌঁছাওনি। রাজার আদেশ মাননি। রাজার আদেশ অমান্য করেছ।

মজনু ওদের কাছে যাইতে বড় ভয় লাগে হুজুর।

রাজা ভয়! কিসের ভয় ? আমাকে ভয় লাগে, না ওদের ভয় করে! এসব কী কথাবার্তা শুনছি ? ওদের পিঠে দশ ঘা করে চাবুক বসিয়ে দিন।

[বলার সঙ্গে সঙ্গে মজনু এক হাতে কাপড় গুছিয়ে শাস্তি গ্রহণ করবার জন্যে এগিয়ে আসবে। অন্যরাও পিঠের কাপড় তুলবে।]

রাজা আহ্, এরা আমার বড় অনুগত। এদের সঙ্গ বড় ভালো লাগছে। চাবুক মারা শেষ হবার পর পরই এদের একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। [ওরা পিঠের কাপড় আরো খোলার চেষ্টা করবে। সবার চোখে-মুখে স্বর্গীয় ভাব। চাবুক নিয়ে একজন ঢুকবে।] না না, এখানে নয়। আমার সামনে নয়। আমি মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারি না। ওদের এখান থেকে নিয়ে যাও। [ওরা চলে যাবে।] তোমরা কেন দাঁড়িয়ে আছ ? যাও, তোমরাও যাও। [সবাই চলে যাবে। মঞ্চ অন্ধকার হতেই দূরাগত ধ্বনি শোনা যাবে। ভাত দেন, কাপড় দেন, অনেকটা সঙ্গীতের মতো ধ্বনি। ধীর লয়ে সমুদ্রের গর্জন। রানি। ঢুকবেন।]

রানি কিসের শব্দ হচ্ছে ?

রাজা বাতাসের শব্দ। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপছে। চমৎকার ধ্বনি। তোমার ভালো লাগছে না ?

রানি না না, ওটা বাতাসের শব্দ নয়। আমি প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ প্রাসাদের দিকেই আসছে।

রাজা ওরা আমার ভক্ত প্রজা, ওরা আসছে উৎসব দেখতে।

রানি ওদের সবার হাতে মশাল।

রাজা অন্ধকার রাত। চারদিকে ভালো দেখা যাচ্ছে না, সে জন্যেই মশাল। মশালের আলোয় ওরা উৎসব ভালোমতো দেখতে পাবে।

রানি তুমি বুঝতে পারছ না। ব্যাপারটা সে রকম নয়। দূর-দূর থেকে সবাই আসছে। আমার ভালো লাগছে না। আমার একটুও ভালো লাগছে না।

রাজা [হাসতে হাসতে বলবেন] রাজপ্রাসাদের সদর দরজা বন্ধ করা আছে। ওরা কেউ এখানে আসবে না। তাছাড়া উৎসব যাতে সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে তার জন্যে হাজার হাজার সৈন্য আছে বাইরে। রানি, তোমার মন বিক্ষিপ্ত। দুঃস্বপ্ন দেখে দেখে এরকম হয়েছ। রাজা-রানিদের কখনো দুঃস্বপ্ন দেখতে নেই। ওস্তাদজিকে ডেকে এনে গান শোনো, মন ভালো হবে। [হাততালি দিতেই অন্ধ ওস্তাদ ঢুকবেন।]

রাজা তুমি ভালো আছ ?

ওস্তাদ ভালো আছি। বেশ ভালো।

রাজা বাহ্ বাহ্ বাহ্। তোমার গলা চমৎকার হয়েছে। কণ্ঠ খুলেছে। মহারানিকে চমৎকার একটি গান শুনাও তো। ওর মন বিক্ষিপ্ত, ওর মন ভালো করে দাও।

[ওস্তাদ বসবেন। গানের আয়োজন করবেন। নেপথ্য থেকে শোনা যাবে— ভাত দেন, কাপড় দেন, ভাত কাপড় দেন— ইত্যাদি স্লোগান।]

শেষ দৃশ্য

[মঞ্চে নকিব দাঁড়িয়ে আছে একা। তার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। হাতে একটি চোঙ। সে চোঙ মুখে নিয়ে কিছু বলতে যাবে— তখন দেখা যাবে জ্ঞানবৃদ্ধ এসে ঢুকছে। তার হাতে প্লাকার্ড লেখা 'বসন্ত উৎসব, আনন্দ করুন।']

বৃদ্ধ নকিব সাব, সেলাম। ভালো আছেন ?

[নকিব কোনো কথা বলবে না]

আমারে চিনছেন তো ? আমার নাম ওসমান। আমি খুব জ্ঞানী লোক। এই দেখেন, রাজা সাব আমারে উপাধি দিছে। আমি খুব জ্ঞানের কথা জানি। হে-হে-হে।

নকিব জানেন ভালো কথা, এখন যান কোথায় ?

বৃদ্ধ দেশ-দেশান্তরে। জ্ঞানের কথা কইব। বসন্ত উৎসবের কথা কইব।

নকিব ভালো কথা।

বৃদ্ধ মহারাজার কথাও কইব। মহারাজার কথা বলতে বড় ভালো লাগে।

নকিব সময়টা কিন্তু ভালো না বুড়া মিয়া। কারো ঘরে ভাত নাই। পুলাপান কান্দে। বুড়াবুড়ি কান্দে। আর জোয়ানগুলো কেমুন-কেমুন কইরা চায়। লক্ষণ কিন্তু ভালো না বুড়া মিয়া। সময়টা খারাপ। বড় খারাপ। কানে কিছু শুনেন না ?

বৃদ্ধ বয়স হইছে, কানে ভালো শুনি না।

নকিব কিছু দেখেন না ?

বৃদ্ধ বয়স হইছে, চউক্ষে ভালো দেখি না।

[দেখা যাবে দু'টি লোক খাটিয়া নিয়ে যাচ্ছে।]

নকিব কে যায় ?

লোক দু'টি: খাটিয়াতে হেতমপুরের খবিরুদ্দি যায়।

নকিব বিষয়ডা কী ?

লোক দু'টি: টুপিওয়ালা ভাই, বিষয়ডা রাজা সাবের কাছে বলতে চাই।

নকিব রাজা সাব রাজধানীতে নাই। রাজা সাব রাজধানীতে নাই।

[হাসতে হাসতে তারা এগুবে। বুড়া চোঙ নিয়ে হঠাৎ বলবে।]

বৃদ্ধ ও ভাই, ও আমার বন্ধু। আমার কথা শুনেন— আমি জ্ঞানীলোক, বসন্ত উৎসবের কথাডা বলি— আইজ সন্ধ্যা... । [হঠাৎ বৃদ্ধকে নকিব অবাক করে দিয়ে লাথি বসিয়ে দেবে।] লাথি দিলেন ক্যান ?

নকিব জানি না কেন।

বৃদ্ধ আমি রাজা সাবের আপনার লোক, আমারে লাথি দিলেন ক্যান ?

নকিব পায়ের মইধ্যে চুলকায়।

রাজা সাবের আপনার লোকরে লাথি দিবার মন চায়।

[বৃদ্ধ ভয়ে অনেকটা দূরে সরে যাবে এবং দ্রুত মঞ্চ ছেড়ে যাবে। নকিব হেসে উঠবে। রাজা ঢুকবেন, সঙ্গে রানি।]

রাজা কে হাসছিল ? অমন বিকট স্বরে কে হাসছিল ?

নকিব হুজুর আমি।

রাজা কেন হাসছিলে ?

নকিব আনন্দ করছিলাম হুজুর। আপনি সবাইকে আনন্দ করতে বলেছেন।

রানি না, না, আনন্দ নয়। এটা আনন্দের সময় নয়।

রাজা আহ্! কী বলছো তুমি! নিশ্চয় এটা আনন্দের সময়। উৎসবে আনন্দ করবে না তো কখন করবে ? তুমি হাসো। শব্দ করে হাসো। আমিও হাসব তোমার সঙ্গে। হাসো, হাসো।

[রাজা উচ্চস্বরে হাসতে গিয়েও থেমে যাবেন। দেখা যাবে বৃদ্ধ মঞ্চে ঢুকছে। তার গলায় কোনো পদক নেই, ছেঁড়া জুতা ঝুলছে। খালি গা।]

রাজা তোমার এই অবস্থা করল কে ?

বৃদ্ধ সময়টা খারাপ রাজা সাব।

রাজা ওর স্পর্ধা তো কম নয়, বলে— সময় খারাপ। লাথি দিয়ে ওকে বের করে দাও।

বৃদ্ধ হুজুর বহুত লোকজন আসতাছে। বড় ভয় লাগতাছে হুজুর।

রাজা [ক্ষিপ্ত] এই অপদার্থ ভীরুকে এক্ষুনি...। [বৃদ্ধ পালাবে] রানি, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

[রাজা রানির হাত ধরে চলে যাবেন। বৃদ্ধ আবার মঞ্চে ঢুকবে। ভাত দেন, কাপড় দেন— বলতে বলতে একটি দল এসে ঢুকবে। তাদের পুরোভাগে মজনু চোরা।]

নকিব চুপ! [সবাই থেমে যাবে। মজনুকে উদ্দেশ করে] তুমি এদের সঙ্গে ?

মজনু বাতাস উল্টা বইতাছে নকিব সাব। আমি আছি বাতাসের সাথে। বলেন ভাই— ভাত দেন, কাপড় দেন, ভাত কাপড় দেন।

সবাই ভাত দেন, ভাত কাপড় দেন।

ভাত কাপড় দেন।

মজনু আরো জোরে বলেন। গলায় শক্তি নাই ?

সবাই ভাত দেন কাপড় দেন।

ভাত কাপড় দেন।

নকিব মজনু!

মজনু বলেন।

নকিব রাজা সাব তার সৈন্য সামন্তরে বলেছে রাজধানী ঘিরে রাখতে। শুনেছেন ?

মজনু [ভীতস্বরে] জে না।

নকিব উৎসবের সময় যারা চেঁচামেচি করবে তাদের শহর থেকে বের করে দেবার হুকুম হয়েছে। শুনেছেন ?

মজনু [খুবই ভীত।] জে না, শুনি নাই। [দলের অন্যজনের দিকে তাকিয়ে] এই তোমরার ভাগ। চিৎকার কইরা মাথা ধরাইয়া দিছে। ভাগ, ভাগ। আরে, আবার চউখ ঘুরাইয়া চায়।

[সবাই চলে যাবে]

মজনু আমি হইলাম গিয়া রাজা সাবের আপনার লোক। কী কন নকিব ভাই ?

নকিব পায়ের মইধ্যে চুলকায়—

রাজা সাবের আপনার লোকরে লাথি দিবার মন চায়। [লাথি বসাবে।]

মজনু [অবাক! এগিয়ে যাবে বৃদ্ধের কাছে] বিষয়ডা কী কিছুই বুঝতেছি না। এই যে চাচা মিয়া।

বৃদ্ধ পায়ের মইধ্যে চুলকায়—

রাজা সাবের আপনার লোকরে লাথি দিবার মন চায়।

[সেও লাথি বসাবে। মজনু উল্টে পড়তে গিয়ে সামলিয়ে নিবে। দু'জনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দৌড়ে পালাবে। [নকিব ও বৃদ্ধ হেসে উঠবে।]

লাথি দিয়া পাওডার মইধ্যে আরাম পাইলাম, টুপিওয়ালা ভাই।

নকিব খবরদার! টুপিওয়ালা বলবে না।

[নকিব টুপি খুলে ফেলে দেবে এবং দু'জনেই হেসে উঠবে। দেখা যাবে অন্য পিঠ-বাঁকারা একে একে যাচ্ছে। এদের হাতে প্লাকার্ড। সেখানে লেখা— 'বসন্ত উৎসব। আনন্দ করুন।' ওদের দেখে নকিব হাসতে থাকবে।]

নকিব তোমরা কোথায় যাও ?

বাঁকাদের একজন আনন্দ করতে যাই, উৎসব করতে চাই।

নকিব মুখখান তো বড় শুকনা শুকনা লাগে।

বাঁকাদের একজন যাইতে ভয় লাগে। মন চায় না। তবু যাইতে হয়।

সবাই তবু যাইতে হয়।

তবু যাইতে হয়।

[ওরা এগিয়ে যাবে। রাজার প্রবেশ]

রাজা চারদিকে এমন নীরব কেন ? আনন্দ করো। গান করো। হাসো। প্রাণ খুলে হাসো। আজ থেকে উৎসবের শুরু। আনন্দের শুরু। হাসো, সবাই হাসো। [পিঠ-বাঁকারা ফিরে আসবে।]

গাও, গান গাও, হাসো। হাসো— হা-হা-হা সবাই হাসো আমার সঙ্গে। [শোনা যাবে দূরাগত ধ্বনি— ভাত দেন, কাপড় দেন, ভাত কাপড় দেন।]

হাসো, সবাই হাসো। হাসো।

[দর্শকদের মাঝখান থেকে স্লোগান শোনা যাবে। এবং নকিব নিজেও স্লোগান দেবে।

রাজা পাগলের মতো চারদিকে তাকাবেন। মঞ্চে সবাই উঠে আসছে।]

শিশুতোষ রচনা

নীলহাতি

নীলহাতি

নীলুর যে মামা আমেরিকা থাকেন তাকে সে কখনো দেখেনি। নীলুর জন্মের আগেই তিনি চলে গিয়েছিলেন। আর ফেরেননি। নীলুর এই মামার কথা বাসার সবাই বলাবলি করে। মা প্রায়ই বলেন, আহ্, সঞ্জুটা একবার যদি দেশে আসত !

কিন্তু নীলুর সেই মামা নাকি আর দেশে ফিরবেন না। কোনোদিন না। একবার নানিজানের খুব অসুখ হলো। টেলিগ্রাম করা হলো সঞ্জু মামাকে। সবাই ভাবল এবার বুঝি আসবে। তাও আসল না। নীলুর বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, মেমসাহেব বিয়ে করে ফেলেছে, এখন কি আর আসবে ?

নীলুর খুব ইচ্ছে করে সেই মামাকে আর তার মেমসাহেব বৌকে দেখতে। কিন্তু তার ইচ্ছে হলেই তো হবে না। মামা তো আর ফিরবেই না দেশে। কাজেই অনেক ভেবেটেবে নীলু এক কাণ্ড করল। চিঠি লিখে ফেলল মামাকে। চিঠিতে বড় বড় করে লিখল—

> মামা,
> আপনি কেমন আছেন, আমার নাম নীলু। আপনাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে আর মেমসাহেব মামিকে দেখতে ইচ্ছে করে।
>
> ইতি
> নীলু

সেই চিঠির উল্টো পিঠে সে আঁকল পাখি আর সূর্যের ছবি। আর আঁকল মস্ত বড় নদী। সেই নদীতে পাল তুলে নৌকা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর হলো ছবিটা। নীলু ভাবল, এইবার মামা নিশ্চয়ই আসবে।

মামা কিন্তু আসল না। একদিন দুদিন হয়ে গেল তবু না। মামা চিঠির জবাবও পর্যন্ত দিল না। অপেক্ষা করতে করতে নীলু ভুলেই গেল যে, সে মামাকে চিঠি লিখেছিল। তার পরেই এক কাণ্ড।

সেদিন নীলুর খুব দাঁত ব্যথা। সে স্কুলে যায়নি। গলায় মাফলার জড়িয়ে একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। এমন সময় ভিজতে ভিজতে পিয়ন এসে হাজির।

এই বাড়িতে নীলু নামে কেউ থাকে ?

নীলু আশ্চর্য হয়ে বলল, হ্যাঁ। আমার নাম নীলু।

পিয়নটি গম্ভীর হয়ে বলল, নিচে নেমে এসো খুকি। তোমার জন্য আমেরিকা থেকে কে একজন একটা উপহার পাঠিয়েছে। নাম সই করে নিয়ে যাও। নাম লিখতে

পারো খুকি ?

হ্যাঁ, পারি।

নীলু উপহারের প্যাকেটটি খুব সাবধানে খুলল। পিয়ন তখনো যায়নি, পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। প্যাকেটের ভেতর থেকে বেরুল নীল রঙের একটা হাতি। গলায় রুপোর ঘণ্টা বাজছে, টুন টুন করে। হাতির শুঁড় আপনা থেকেই দুলছে। মাঝে মাঝে আবার কান নাড়াচ্ছে।

এত সুন্দর হাতি নীলু এর আগে আর কখনো দেখেনি। শুধু নীলু নয়, তার আব্বাও এত সুন্দর হাতি দেখেনি। অফিস থেকে ফিরেই তিনি দেখলেন তাঁর টেবিলে নীল হাতি শুঁড় দোলাচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, আরে, কে আনল এটা ? বড় সুন্দর তো !

নীলু বলল, সঞ্জু মামা পাঠিয়েছেন। দেখেন আব্বা, আপনা আপনি ঘণ্টা বাজে।

তাইতো, তাইতো !

নীলুর মা নিজেও এত সুন্দর হাতি দেখেননি। তিনি কতবার যে বললেন, চাবি ছাড়াই শুঁড় দোলায় কী করে ? ভারি অদ্ভুত তো! নিশ্চয়ই খুব দামি জিনিস।

সন্ধ্যাবেলা নীলুর স্যার এলেন পড়াতে। মা বললেন, পড়তে যাও নীলু আর হাতি শো-কেসে তালাবদ্ধ করে রাখো। নয়তো আবার ভেঙে ফেলবে।

মার যে কথা, এত সুন্দর জিনিস বুঝি শো-কেসে তুলে রাখবে ? হাতি থাকবে তার নিজের কাছে। রাতে নীলুর পাশের বালিশে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। অনেক রাতে যদি তার ঘুম ভাঙে, তাহলে সে খেলবে হাতির সঙ্গে।

মা কিন্তু সত্যি সত্যি শো-কেসে হাতি তালাবদ্ধ করে রাখলেন। নীলুকে বললেন, সব সময় এটা হাতে করে রাখবার দরকার কী ? যখন বন্ধু-বান্ধব আসবে তখন বের করে দেখাবে। এখন যাও স্যারের কাছে পড়তে।

নীলু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, স্যারকে দেখাতে নিয়ে যাই মা ?

উঁহু, পড়া শেষ করে স্যারকে দেখাবে। এখন যাও বই নিয়ে।

হাতিকে রেখে যেতে নীলুর যে কী খারাপ লাগছিল। তার চোখ ছলছল করতে লাগল। একবার ইচ্ছে করল কেঁদে ফেলবে। কিন্তু বড় মেয়েদের তো কাঁদতে নেই, তাই কাঁদল না।

অনেকক্ষণ স্যার পড়ালেন নীলুকে। যখন তার যাবার সময় হলো তখন নীলু বলল, স্যার একটা জিনিস দেখবেন ?

কী জিনিস ?

একটা নীল হাতি ? আমার মামা পাঠিয়েছেন আমেরিকা থেকে।

কোথায় দেখি !

নীলু স্যারকে বসবার ঘরে নিয়ে এল। তিনি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। শেষে বললেন, এত সুন্দর !

জি স্যার, খুব সুন্দর। গলার ঘণ্টাটা রুপোর তৈরি।

তাই না-কি ?

জি।

স্যার চলে যাবার পরও নীলু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শো-কেসের সামনে। মা যখন ভাত খেতে ডাকলেন, তখন আবার বলল— দাও না মা, শুধু আজ রাতের জন্যে।

না নীলু। শুধু বিরক্ত করো তুমি।

নীলুর এত মন খারাপ হলো যে, ঘুমুতে গিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল একা একা। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখল।

যেন একটা বিরাট বড় বন। সেই বনে অসংখ্য পশু-পাখি। নীলু তাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটুও ভয় করছে না। তার নীল হাতিও আছে তার সঙ্গে। টুন টুন ঝুন ঝুন করে তার গলায় রুপোর ঘণ্টা বাজছে। বনের সব পশুপাখি অবাক হয়ে দেখছে তাদের। একটি সিংহ জিজ্ঞেস করল, তুমি কে ভাই ?

নীলু বলল, আমি এই বনের রানি। আমার নাম নীলাঞ্জনা। আর এই নীল হাতি আমার বন্ধু।

পরদিন স্কুল থেকে নীলুর বন্ধুরা আসল হাতি দেখতে। শায়লা, বীনু, আভা সবাই শুধু হাতির গায়ে হাত বুলোতে চায়।

বীনু বলল, এত সুন্দর হাতি শুধু আমেরিকায় পাওয়া যায়, তাই না নীলু ?

নীলু গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ।

শায়লার বড় ভাই থাকেন জাপানে। সে বলল, জাপানে পাওয়া গেলে আমার বড় ভাই নিশ্চয়ই পাঠাত।

আভা বলল, হাতিটাকে একটু কোলে নেব নীলু, তোমার মা বকবে না তো ?

না বকবে না, নাও।

সবাই তারা অনেকক্ষণ করে কোলে রাখল হাতি। আর হাতিটাও খুব শুঁড় দোলাতে লাগল, কান নাড়তে লাগল। ঝুন ঝুন টুন টুন করে ঘণ্টা বাজাতে লাগল।

হাতি দেখতে শুধু যে নীলুর বন্ধুরাই আসল, তাই নয়, নীলুর বড় খালা আসলেন, চাচারা আসলেন। আম্মার এক বান্ধবীও এসে হাতি দেখে গেলেন। নীলু স্কুলে গেলে অন্য ক্লাসের মেয়েরা এসে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার না-কি ভাই খুব চমৎকার একটা নীল হাতি আছে ?'

কিন্তু ঠিক দু'দিনের দিন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সেদিন নীলুর মার এক বান্ধবী এসেছেন বেড়াতে। তাঁর সঙ্গে এসেছে তাঁর ছোট্ট ছেলে টিটো। এসেই ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কান্না। কিছুতেই কান্না থামে না। নীলুর মা বললেন, যাও তো নীলু, টিটোকে তোমার ছবির বই দেখাও। নীলু ছবির বই আনতেই সে একটানে

ছবির বই-এর পাতা ছিঁড়ে ফেলল। এমন পাজি ছেলে।

নীলুর মা বললেন, মিষ্টি খাবে টিটো। চমচম খাবে ?

না।

শরবত খাবে ?

উঁহু—

এমন কাঁদুনে ছেলে নীলু সারা জীবনেও দেখেনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে আবার গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। শেষে নীলুর মা বললেন, হাতি দেখবে টিটো ? দেখো কী সুন্দর একটা হাতি।

ও মা কী কাণ্ড ! হাতি দেখেই কান্না থেমে গেল বাবুর। তখন তার সে কী হাসির ঘটা। নীলুর ভয় ভয় করতে লাগল যদি হাত থেকে ফেলে ভেঙে দেয় ! একবার ইচ্ছে হলো বলে, এত শক্ত করে ধরে না টিটো। টেবিলের উপর রেখে দেখো। এত শক্ত করে চেপে ধরলে ভেঙে যাবে যে !

কিন্তু নীলু কিছু বলল না।

মেহমানরা অনেকক্ষণ থাকলেন। চা খেলেন, টিভি. দেখলেন। আর টিটো সারাক্ষণ হাতি নিয়ে খেলতে লাগল। যখন তাদের যাবার সময় হলো তখন টিটো গম্ভীর হয়ে বলল, এই হাতিটা আমি নেব।

ধড়াস করে উঠল নীলুর বুক। টিটোর মা বললেন, ছিঃ টিটো, এটা তো নীলুর !

হোক নীলুর, আমি নেব। এই বলেই সে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করল। কিছুতেই কান্না থামানো যায় না। নীলুর মা বললেন, টিটো হাতিটা নীলুর খুব আদরের। তুমি এই জিরাফটা নাও। দেখো কী চমৎকার লম্বা গলা জিরাফের।

টিটো জিরাফের দিকে ফিরেও তাকাল না। হাতিটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল।

নীলুর মনে হলো তার গলার কাছে শক্ত একটা কী যেন জমাট বেঁধে আছে। সে যেন কেঁদে ফেলবে তক্ষুনি। নীলু দৌড়ে চলে গেল ছাদে। ছাদে একা একা কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি আমার নীল হাতি কিছুতেই দেব না, কিছুতেই দেব না।

অনেক পরে মা এসে নীলুকে ছাদ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। শান্ত স্বরে বললেন, এত সামান্য জিনিস নিয়ে এত কাঁদতে আছে নীলু, ছিঃ ! খেলনা কি কোনো বড় জিনিস নাকি ?

নীলু বলল, টিটো কি আমার হাতি নিয়ে গেছে ?

নীলুর মা চুপ করে রইলেন। নীলু বসবার ঘরে এসে দেখে শো-কেসের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে নীল হাতি শুঁড় দোলাত সেখানে কিছু নেই।

নীলু বলল, টিটো আমার হাতি নিয়ে গেছে মা ?

নীলুর মা বললেন, তোমার মামাকে চিঠি লিখব, দেখবে এরচে' অনেক সুন্দর

আরেকটা হাতি পাঠাবে।

নীলু কথা বলল না।

রাতেরবেলা অল্প চারটা ভাত মুখে দিয়েই উঠে পড়ল নীলু। বাবা বললেন, ভাত খেলে না যে মা ?

খিদে নেই বাবা।

সিনেমা দেখবে মা ? চলো একটা সিনেমা দেখে আসি।

না।

গল্পের বই কিনবে ? চলো বই কিনে দেই।

চাই না গল্পের বই।

লাল জুতো কিনতে চেয়েছিলে, চলো কিনে দেব।

আমার কিচ্ছু চাই না বাবা। নীলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সেই রাতে খুব জ্যোৎস্না হয়েছে। ছোট চাচা ছাদে মাদুর পেতে শুয়েছেন। নীলুও তার ছোট্ট বালিশ এনে শুয়েছে তার চাচার পাশে। চাচা নীলুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, হাতিটার জন্যে তোমার খুব খারাপ লাগছে মা ?

হ্যাঁ।

আমারো লাগছে। টিটোর শখ মিটে গেলে আমরা ঐ হাতি নিয়ে আসব, কেমন ?

নীলু চুপ করে রইল।

ছোট চাচা বললেন, গল্প শুনবে মা ?

বলো।

কিসের গল্প শুনবে ?

নীলু মৃদু স্বরে বলল, হাতির গল্প।

ছোট চাচা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গল্প শুরু করলেন।

আমাদের গ্রামের বাড়ি হিরণপুরে রহিম শেখ নামে একজন খুব ধনী লোক ছিলেন। তাঁর একটি মাদি হাতি ছিল।

সত্যিকারের হাতি চাচা ?

হ্যাঁ মা। প্রকাণ্ড হাতি। রহিম শেখ খুব ভালোবাসতো হাতিটাকে। ঠিক তোমার মতো ভালোবাসতো।

সেই হাতিটার গায়ের রঙ কি নীল ?

না মা, মেটে রঙের হাতি ছিল সেটি। তারপর একদিন হঠাৎ করে হাতিটা পালিয়ে গেল গারো পাহাড়ে। চার বছর আর কোনো খবর পাওয়া গেলো না। রহিম শেখ কত জায়গায় যে খোঁজ করল! কোনো খবর নেই। হাতির শোকে অস্থির হয়ে গিয়েছিল সে। রাতে ঘুমুত না। শুধু বলত, 'আমার হাতি যদি রাতে ফিরে আসে ?'

তারপর এক রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। বাতাসের গর্জনে কান পাতা দায়। এমন সময় রহিম শেখ শুনল, কে যেন তার ঘরের দরজা ঠেলছে। রহিম শেখ চেঁচিয়ে বলল, 'কে ?' ওমনি ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে হাতি ডেকে উঠল। রহিম শেখ হতভম্ব হয়ে দেখল, চার বছর পর হাতি ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে ছোট্ট একটা বাচ্চা। আশেপাশের গ্রামের কত লোক যে সেই হাতি দেখতে আসল।

তুমি গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ মা, গিয়েছিলাম। হাতির বাচ্চাটা ভীষণ দুষ্ট ছিল। পুকুরে নেমে খুব ঝাঁপাঝাঁপি করত। দরজা খোলা পেলেই মানুষের ঘরে ঢুকে চাল-ডাল ফেলে একাকার করত। কিন্তু কেউ কিচ্ছু বলত না। সবাই তার নাম দিয়েছিল 'পাগলা মিয়া।'

গল্প শুনে নীলুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে ফিসফিস করে বলল, সত্যিকার হাতি হলে আমারটাও ফিরে আসত তাই না, চাচা ?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসত। অনেক রাত হয়েছে, ঘুমুতে যাও মা।

নীলুর কিন্তু ঘুম আসল না। বাইরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে। বাগানে হাসনাহেনার গাছ থেকে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ। নীলুর মন কেমন করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে অনেক রাত হলো। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে সারা বাড়ি নিশ্চুপ হয়ে গেল। নীলু কিন্তু জেগেই রইল। তারপর সেই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটল। নীলু শুনতে পেল নিচের বাগানে টুনটুন ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে। রহিম শেখের হাতির মতো তার হাতিটাও ফিরে এসেছে নাকি ? হাতির গলার ঘণ্টার শব্দ বলেই তো মনে হয় !

জানালা দিয়ে কিছু দেখা যায় না। নীলু কি তার মাকে ডেকে তুলবে ? কিন্তু মা যদি রাগ করেন ? নীলু হয়তো ভুল শুনছে কানে। হয়তো এটা ঘণ্টার শব্দ নয়। ভুল হবার কথাও তো নয়। চারদিক চুপচাপ এর মধ্যে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে টুন টুন ঝুন ঝুন শব্দ।

নীলু পা টিপেটিপে নিচে নেমে এলো। দরজার উপরের ছিটকিনি লাগানো। সে চেয়ার এনে তার উপর দাঁড়িয়ে খুলে ফেলল দরজা। তার ভয় করছিল। তবু সে নেমে গেল বাগানে। আর নেমেই হতভম্ব হয়ে দেখল, তার নীল হাতি শুঁড় দুলিয়ে টুনটুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। হাতিটি নীলুকে দেখেই পরিষ্কার মানুষের মতো গলায় বলে উঠল, আমি এসেছি নীলু।

অনেকক্ষণ নীলুর মুখে কোনো কথা ফুটল না। হাতি বলল, আরো আগেই আসতাম। পথ-ঘাট চিনি না তাই দেরি হলো। তুমি খুশি হয়েছো তো বন্ধু ! নীলু গাঢ় স্বরে বলল, হ্যাঁ।

আমিও খুশি হয়েছি। টিটো যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি কেঁদেছি।

নীলু হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে চুমু খেল তার বন্ধুকে। আনন্দে হাতি টুন টুন ঝুন ঝুন করে অনবরত তার ঘণ্টা বাজাতে লাগল। নীলু গলা ফাটিয়ে ডাকল, মা আমার নীল হাতি এসেছে।

দুপুর রাতে জেগে উঠল বাড়ির লোকজন। বাবা বললেন, মনে হয় হাতিটা ঐ ছেলেটির হাত থেকে বাগানে পড়ে গিয়েছিল।

মা বললেন, আচ্ছা সাহস তো মেয়ের। এত রাতে একা বাগানে এসেছে।

নীলু মার কোলে মুখ গুঁজে বলল, মা আমার হাতি একা একা টিটোদের বাসা থেকে হেঁটে চলে এসেছে। আমাকে সে নিজে বলেছে। বাসার সবাই হেসে উঠল। বাবা বললেন, ছিঃ মা, আবার মিথ্যে কথা বলছো?

কিন্তু বাবা তো জানেন না নীলু একটুও মিথ্যে বলেনি।

একটি মামদো ভূতের গল্প

আজ নীলুর জন্মদিন।

জন্মদিনে খুব লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকতে হয়। তাই নীলু সারাদিন খুব লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকল। ছোটকাকু তাকে রাগাবার জন্যে কতবার বললেন :

নীলু বড় বোকা
খায় শুধু পোকা

তবু নীলু একটুও রাগ করল না। শুধু হাসল। বাবা যখন বললেন, নীলু মা টেবিল থেকে আমার চশমাটা এনে দাও তো। নীলু দৌড়ে চশমা এনে দিল। হাত থেকে ফেলে দিল না। কুলপি মালাইওয়ালা বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে হেঁকে ডাকল— চাই কুলপি মালাই। কিন্তু নীলু অন্যদিনের মতো বলল না, বাবা আমি কুলপি মালাই খাব— জন্মদিনে নিজ থেকে কিছু চাইতে নেই তো, তাই।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সবকিছু অন্যরকম হয়ে গেল। তখন নীলুর অংক স্যার এসেছেন। নীলু বই-খাতা নিয়ে বসেছে মাত্র। পড়া শুরু হয়নি। নীলুর ছোটকাকু এসে বললেন, আজ তোমার পড়তে হবে না নীলু।

কেন কাকু?

তোমার মার খুব অসুখ। তুমি দোতলায় যাও।

নীলু দোতলায় উঠে দেখে চারদিক কেমন চুপচাপ। কালো ব্যাগ হাতে একজন ডাক্তার বসে আছেন বারান্দায়। নীলুর বাবা গম্ভীর হয়ে শুধু সিগারেট খাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর মস্ত গাড়ি করে একজন বুড়ো ডাক্তার আসলেন। খুব রাগী চেহারা তাঁর। এইসব দেখে নীলুর ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। সে এখন বড় হয়েছে। বড় মেয়েদের কাঁদতে নেই, তবু সে কেঁদে ফেলল। বাবা বললেন, নীলু নিচে যাও তো মা। কাঁদছো কেন বোকা মেয়ে? কিন্তু নীলুর এত খারাপ লাগছে যে না কেঁদে কী করবে? আজ

ভোরবেলায়ও সে দেখেছে মার কিচ্ছু হয়নি। তাকে হাসতে হাসতে বলেছেন, জন্মদিনে এবার নীলুর কোনো উপহার কেনা হয়নি। কী মজা ! কিন্তু নীলু জানে মা মিথ্যে মিথ্যে বলছেন। সে দেখেছে বাবা সোনালি কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট এনে শেলফের উপর রেখেছেন। লাল ফিতে দিয়ে প্যাকেটটা বাঁধা। নীলু ছুঁয়ে দেখতে গেছে। বাবা চেঁচিয়ে বলেছেন, এখন নয়, এখন নয়। রাত্রিবেলা দেখবে। এর মধ্যে কী আছে বাবা ? বলবেন না কার জন্যে এনেছেন, আমার জন্যে ?

তাও বলব না।

এই বলেই বাবা হাসতে শুরু করেছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মাও। নীলু বুঝতে পেরেছে এখানেই লুকানো তার জন্মদিনের উপহার। মা যদি ভালো থাকতেন, তাহলে এতক্ষণে কী মজাটাই না হতো! ছাদে চেয়ার পেতে সবাই গোল হয়ে বসত। সবাই মিলে চা খেতো, নীলু এমনিতে চা খায় না। কিন্তু জন্মদিন এলে মা তাকেও চা দিতেন। তারপর মা একটি গান করতেন। (মা যা সুন্দর গান করেন !) নীলু একটা ছড়া বলত। সবশেষে বাবা বলতেন, আমাদের আদরের মা মৌটুসকী মা টুনটুনী মার জন্মদিনে এই উপহার। এই বলে চুমু খেতেন নীলুর কপালে। আর নীলু হয়তো তখন আনন্দে কেঁদেই ফেলত। সোনালি কাগজে মোড়া প্যাকেটটি খুলত ধীরে ধীরে। সেই প্যাকেটে দেখত ভারি চমৎকার কোনো জিনিস।

কিন্তু মার হঠাৎ এমন অসুখ করল। নীলুর কিচ্ছু ভালো লাগছে না। ছোটকাকু বললেন, এসো মা আমরা ছাদে বসে গল্প করি।

উঁহু।

লাল কমল নীল কমলের গল্প শুনবে না ?

উঁহু।

নীলু ফ্রকের হাতায় চোখ মুছতে লাগল।

একটু পরে আসলেন বড় ফুফু। নীলু যে একা একা দাঁড়িয়ে কাঁদছে তা দেখেও দেখলেন না। তরতর করে উঠে গেলেন দোতলায়। তখনি নীলু শুনল তার মা কাঁদছেন। খুব কাঁদছেন। মাকে এর আগে নীলু কখনো কাঁদতে শোনেনি। একবার মার হাত কেটে গেল বটিতে— কী রক্ত ! কিন্তু মা একটুও কাঁদেননি। নীলুকে বলেছেন, আমার হাত কেটেছে তুমি কেন কাঁদছো ? বোকা মেয়ে।

আজ হঠাৎ করে তার কান্না শুনে ভীষণ ভয় করতে লাগল তার। ছোটকাকু বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে ছিলেন, নীলু তার কাছে যেতেই নীলুকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, মার কী হয়েছে ছোটকাকু ?

কিচ্ছু হয়নি।

তবে মা কাঁদছে কেন ?

অসুখ করেছে। সেরে যাবে।

অসুখ করলে সবাই কাঁদে, তাই না ?

হ্যাঁ। আবার অসুখ

সেরে যায়। যায় না ?

যায়।

কাজেই অসুখ করলে মন খারাপ করতে নেই, বুঝলে পাগলি ?

হুঁ।

নীলুর কান্না থেমে গেল ছোটকাকুর কথা শুনে। কিন্তু ঠিক তক্ষুনি পোঁ পোঁ শব্দ করতে করতে হাসপাতালের গাড়ি এসে পড়ল। নীলু অবাক হয়ে দেখল, হাসপাতালের লোকেরা ধরাধরি করে তার মাকে নিয়ে তুলছে সেই গাড়িটিতে। ছোটকাকু শক্ত করে নীলুর হাত ধরে রেখেছেন। নইলে সে চলে যেত মার কাছে।

বাবাও যাচ্ছেন সেই গাড়িতে। যাবার আগে নীলুর মাথায় হাত রেখে বললেন, কাঁদে না লক্ষ্মী মা, ছোটকাকুর সঙ্গে থাক। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। নীলু বলল, মার কী হয়েছে ?

কিচ্ছু হয়নি।

মাকে গাড়িতে তুলে লোকগুলো দরজা বন্ধ করে দিল। পোঁ পোঁ শব্দ করতে লাগল গাড়ি। বাবা উঠলেন ফুফুর সাদা গাড়িটায়। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, তখন জানালা দিয়ে মুখ বের করে তিনি নীলুকে ডাকলেন।

নীলু, ওমা নীলু।

কী বাবা ?

আমার বইয়ের শেলফে তোমার জন্মদিনের উপহার।

নীলুর ইচ্ছা হলো চেঁচিয়ে বলে— চাই না উপহার। আমার কিছু লাগবে না। কিছু বলার আগেই ছোটকাকু নীলুকে কোলে করে নিয়ে আসলেন দোতলায়। তাকে সোফায় বসিয়ে নিয়ে আনলেন সোনালি রঙের প্যাকেটটি।

দেখি লক্ষ্মী মেয়ে, প্যাকেটটা খোলো দেখি।

না।

আহা খোলো নীলু, দেখি কী আছে।

নীলুর একটুও ভালো লাগছিল না। তবু সে খুলে ফেলল। আর অবাক হয়ে দেখল চমৎকার একটি পুতুল। ছোটকাকু চেঁচিয়ে উঠলেন, কী সুন্দর! কী সুন্দর !

ধবধবে সাদা মোমের মতো গা। লাল টুকটুকে ঠোঁট, কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। আর কী সুন্দর তার চোখ। নীল রঙের একটি ফ্রক তার গায়ে কী চমৎকার মানিয়েছে। নীলুর এত ভালো লাগল পুতুলটা। ছোটকাকু বললেন, কী নাম রাখবে পুতুলের ?

নাম রাখতে হবে একথা নীলুর মনেই ছিল না। তাইতো কী নাম রাখা যায় ?

তুমি একটা নাম বলো কাকু।

এ্যানি রাখবে নাকি ? মেম পুতুল তো কাজেই বিলিতি নাম।

এটা মেম পুতুল কাকু ?

হুঁ। দেখছো না নীল চোখ। মেমদের চোখ থাকে নীল।

আরে তাইতো এতক্ষণ লক্ষই করেনি নীলু। পুতুলটির চোখ দুটি ঘন নীল। সেই চোখে পুতুলটি আবার মিটমিট করে চায়।

ছোটকাকু আমি এর নাম রাখব সোনামনি।

এ্যা ছিঃ, সোনামনি তো বাজে নাম। তারচে' বরং সুস্মিতা রাখা যায়।

উঁহু, সোনামনি রাখব।

আচ্ছা বেশ বেশ। সোনামনিও মন্দ নয়।

নীলু সাবধানে সোনামনিকে বসাল টেবিলে। কী সুন্দর ! কী সুন্দর ! শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

রাতেরবেলা খেতে বসল তারা তিনজন। নীলু, ছোটকাকু আর সোনামনি। সোনামনি তো খাবে না শুধু শুধু বসেছে। ছোটকাকু খেতে খেতে মজার মজার গল্প করতে লাগলেন। বেকুব বামুনের গল্প শুনে নীলু হেসে বাঁচে না। ছোটকাকু যা হাসাতে পারেন। এক সময় নীলু বলল,

এবার একটা ভূতের গল্প বলো।

না ভূতের গল্প শুনে তুমি ভয়ে কেঁদে ফেলবে।

ইস, আমি বুঝি ছোট মেয়ে ? বলো কাকু।

মামদো ভূতের গল্প বলবো নাকি তবে ?

মামদো ভূত কি মানুষ খায় কাকু ?

খায় না আবার ! সুবিধামতো পেলেই কোঁৎ করে গিলে ফেলে।

ধড়াস করে উঠল নীলুর বুকটা। ছোটকাকু বললেন, তবে যে বলেছিলে ভয় পাবে না। এখন দেখি নীল হয়ে গেছ ভয়ে। কী সাহসী মেয়ে আমাদের নীলু !

একটুও ভয় পাইনি আমি। সত্যি বলছি।

নীলুর অবশ্য খুব ভয় লাগছিল। তবু সে এমন ভান করল যেন একটু ভয় পায়নি।

ছোটকাকু, দেখবে আমি একা একা বারান্দায় যাব ?

ছোটকাকু কিছু বলার আগেই ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠল। হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করেছে। ছোটকাকু নীলুকে কিছুই বললেন না। তবু নীলু বুঝল মায়ের অসুখ খুব বেড়েছে। সে ভয়ে ভয়ে বলল, গল্পটা বলবে না কাকু ?

কোন গল্প ?

ঐ যে মামদো ভূতের গল্প।

ছোটকাকু হাত নেড়ে বললেন, আরে পাগলি ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি ?

সব বাজে কথা।

বাজে কথা ?

হ্যাঁ, খুব বাজে কথা। ভূত-প্রেত বলে, কিছু নেই। সব মানুষের বানানো গল্প।

তুমি ভূত ভয় করো না কাকু ?

আরে ধুর। ভূত থাকলে তো ভয় করব ! এই বলেই ছোটকাকু আবার গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

নীলুকে সবাই বলে ছোট মেয়ে, ছোট মেয়ে'। কিন্তু সে সব বুঝতে পারে। ছোট কাকুর হঠাৎ গম্ভীর হওয়া দেখেই সে বুঝতে পারছে মায়ের খুব বেশি অসুখ। নীলুর খুব খারাপ লাগতে লাগল। এত খারাপ যে চোখে পানি এসে গেল। ছোটকাকু অবিশ্যি দেখতে পেলেন না— কারণ তার কাছে আবার টেলিফোন এসেছে। নীলু শুনতে পেল ছোটকাকু বললেন, হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ।

এ তো দারুণ ভয়ের ব্যাপার।

হ্যাঁ, নীলু ভাত খেয়েছে।

দিচ্ছি এক্ষুনি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

আচ্ছা, আচ্ছা।

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই ছোটকাকু বললেন,

ঘুমুতে যাও নীলু।

নীলু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, মার কী হয়েছে কাকু ?

কিছু হয়নিরে বেটি !

মা কখন আসবে ?

কাল ভোরে এসে যাবে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। ঘুম ভাঙতেই দেখবে মা এসে গেছেন।

নীলুর ঘরটি মার ঘরের মধ্যেই। শুধু পারটেক্সের দেয়াল দিয়ে আলাদা করা। নীলু এখন বড় হয়েছে, তাই একা শোয়। তার একটুও ভয় করে না। তাছাড়া সারারাত মা কতবার এসে খোঁজ নিয়ে যান। নীলুর গায়ের কম্বল টেনে দেন। কপালে চুমু খান। কিন্তু আজ নীলু একা। ছোটকাকু বললেন, ভয় লাগবে না তো মা ? মাথার কাছের জানালা বন্ধ করে দেব ?

দাও।

আমি টেলিফোনের কাছে বসি, কেমন ? তোমার মার কোনো খবর আসে যদি সেজন্যে। আচ্ছা ?

আচ্ছা।

তুমি পুতুল নিয়ে ঘুমুচ্ছ বুঝি নীলু ?

হ্যাঁ কাকু।

ভয় পেলে আমাকে ডাকবে। কেমন ?

ডাকব।

ছোটকাকু ঘরের পর্দা ফেলে চেলে গেলেন। নীলুর কিন্তু ঘুম আসল না। সে জেগে জেগে ঘড়ির শব্দ শুনতে লাগল। টিক টিক টিক টিক। কিছুক্ষণ পর শুনল ছোটকাকু রেডিও চালু করে কী যেন শুনছেন। বক্তৃতা টক্তৃতা হবে। তারপর আবার রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। বারান্দার বাতি জ্বলল একবার। আবার নিভে গেল। রাত বাড়তে লাগল। নীলুর এক ফোঁটাও ঘুম এলো না। এক সময় খুব পানির পিপাসা হলো তার। বিছানায় উঠে বসে ডাকল, ছোটকাকু, ছোটকাকু।

কেউ সাড়া দিল না। ছোটকাকুও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। নীলুর একটু ভয় ভয় করতে লাগল। আর ঠিক সেই সময় নীলুর মাথার জানালায় ঠক ঠক করে কে যেন শব্দ করল। আবার শব্দ হলো। সে সঙ্গে কে যেন ডাকল।

নীলু নী ী ী লু ূ ূ

নীলুর ভীষণ ভয় লাগলেও সে বলল, কে ?

আমি। জানালা খোলো।

নীলু দারুণ অবাক হয়ে গেল। জানালার ওপাশে কে থাকবে ? সেখানে তো দাঁড়াবার জায়গা নেই। নীলু বলল, কে আপনি ?

আমি ভূত। জানালা খোলো মেয়ে।

নীলুর একটু একটু ভয় করছিল। তবু সে জানালাটা খুলে ফেলল। বাইরে ফুটফুটে জোছনা। গাছের পাতা চিকমিক করছে। নীলু অবাক হয়ে দেখল, ফুটফুটে জোছনায় লম্বা মিশমিশে কালো কী একটা জিনিস যেন বাতাসে ভাসছে। ওমা ভূতের মতোই তো লাগছে ! ভূতটি বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি মা ?

নীলু কোনোমতে বলল, না পাচ্ছি না তো।

বেশ বেশ। বড় মানুষরা ভূত দেখলে যা ভয় পায়। এতক্ষণে হয়তো ফিট হয়ে উল্টে পড়ত। তুমি তো বাচ্চা মেয়ে। তাই ভয় পাওনি।

নীলু গম্ভীর হয়ে বলল, কে বলল আমি বাচ্চা মেয়ে ? আমি অনেক বড় হয়েছি।

ভূতটি খলবল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না।

এক সময় হাসি থামিয়ে বলল, অনেক বড় হয়েছ তুমি, হাঃ হাঃ।

নীলু বলল, ভেতরে আস তুমি। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

নীলুর এই কথায় ভূতটি রেগে গিয়ে বলল, তুমি করে বলছো কেন আমাকে ? বড়দের আপনি করে বলতে হয় না ?

নীলু লজ্জা পেয়ে বলল, ভেতরে আসুন আপনি।

ভূতটি সুঁট করে ঢুকে পড়ল ঘরে। ওমা কী লম্বা! আর কী মিশমিশে কালো রং। এত বড় বড় চোখ। দাঁত বের করে খুব খানিকক্ষণ হেসে সে বলল, আমাকে দেখে

ভয় পাচ্ছ না তো মা ?

নীলুর তখন একটুও ভয় লাগছে না। ভূতটি অবশ্যি দেখতে খুব বাজে। গল্পের বইয়ে যে সব ভূত-প্রেতের ছবি থাকে তার চেয়েও বাজে। তবু ভূতটি এমন আদর করে কথা বলতে লাগল যে নীলুর ভয়ের বদলে খুব মজা লাগল। নীলু বলল, আমি ভয় পাইনি। সত্যি বলছি একটুও না। আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন।

ভূতটা আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। পকেট থেকে কলাপাতার রুমাল বের করে ঘাড় মুছতে মুছতে বলল, খুব পরিশ্রম হয়েছে। বাতাসের উপর দাঁড়িয়েছিলাম কিনা তাই— তোমার ঘরে কোনো ফ্যান নেই মা ? যা গরম !

জি-না আমার ঘরে নেই। মার ঘরে আছে।

ভূতটি রুমাল দুলিয়ে হাওয়া খেতে লাগল। একটু ঠান্ডা হয়ে বলল, তোমার কাছে একটা জরুরি কাজে এসেছি গো মেয়ে।

কী কাজ ?

আর বলো না মা। আমার একটি বাচ্চা মেয়ে আছে, ঠিক তোমার বয়সী। কিন্তু তোমার মতো লক্ষ্মী মেয়ে নয় সে। ভীষণ দুষ্ট। দুদিন ধরে সে শুধু কান্নাকাটি করছে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।

নীলু অবাক হয়ে বলল, ওমা ! কী জন্যে ?

সে চায় মানুষের মেয়ের সাথে ভাব করতে। এমন কথা শুনেছ কখনো ? মেয়েটার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়।

ভূতটি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে লাগল। নীলু বলল, আহা ! তাকে নিয়ে আসলেন না কেন ? আমার সঙ্গে ভাব করতে পারত।

ভূতটি বিরক্ত হয়ে বলল, এনেছি তাকে। তার আবার ভীষণ লজ্জা। ভেতরে আসবে না।

কোথায় আছে সে ?

জানালার ওপাশে বাতাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই কখন থেকে।

ভূতটা গলা উঁচিয়ে ডাকল, হইয়ু হ-ই-য়ু।

জানালার ওপাশ থেকে কে একজন চিকন সুরে বলল, কী বাবা ?

ভেতরে আয় মা।

না, আমার লজ্জা লাগছে।

নীলু বলল, লজ্জা কী, এসো। আমার সাথে ভাব করবে।

জানালার ওপাশ থেকে ভূতের মেয়ে বলল, তুমি এসে নিয়ে যাও।

নীলু জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে, ছোট্ট ভূতের মেয়েটি একা একা বাতাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার এমন লজ্জা যে নীলুকে দেখেই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। নীলু হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে এসে মিষ্টি করে বলল,

তোমার নাম কী ভাই ভূতের মেয়ে ?

হইয়ু আমার নাম। তোমার নাম নীলু তাই না ?

উঁহু আমার নাম নীলাঞ্জনা। বাবা আদর করে ডাকেন নীলু।

হইয়ুর বাবা বললেন, কিরে পাগলি ভাব হলো নীলুর সঙ্গে ?

হ্যাঁ।

মানুষের মেয়েকে কেমন লাগলোরে বেটি ?

খুব ভালো। বাবা একটা কথা শোনো।

বলো

নীলুকে আমাদের বাসায় নিয়ে চলো বাবা।

বলিস কী ? কী আজগুবি কথাবার্তা!

না বাবা, নিয়ে চলো। আমাদের সঙ্গে তেঁতুল গাছে থাকবে।

কী রকম পাগলের মতো কথা বলে!

হইয়ু ফিচ ফিচ করে কাঁদতে শুরু করল। হইয়ুর বাবা রেগে গিয়ে বলল, আরে পাগলি মেয়ে মানুষের মেয়ে বুঝি আমাদের মতো তেঁতুল গাছে থাকতে পারে ? বৃষ্টি হইলে তো ভিজে সর্দি লেগে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।

হোক নিউমোনিয়া, ওকে নিতে হবে।

হইয়ুর কাঁদা আরো বেড়ে গেল। নীলু খুব মিষ্টি করে বলল,

আমি চলে গেলে আমার মা যে কাঁদবে ভাই।

এই কথায় মনে হলো হইয়ুর মন ভিজেছে। সে পিট পিট করে তাকাল নীলুর দিকে। হইয়ুর বাবা বললেন, আহলাদি করিস না হইয়ু। নীলুর সঙ্গে খেলা কর।

নীলু বলল, কী খেলবে ভাই ভূতের মেয়ে ? পুতুল খেলবে ?

নীলু তার জন্মদিনের পুতুল বের করে আনল। হইয়ুকে বলল, এর নাম সোনামনি, তুমি সোনামনিকে কোলে নিবে হইয়ু ?

হইয়ু হাত বাড়িয়ে পুতুল নিল। হইয়ু নিজে কখনো এত সুন্দর পুতুল দেখেনি। সে হা করে পুতুলের দিকে তাকিয়ে রইল। হইয়ুর বাবাও মাথা নেড়ে বারবার বললেন, বড় সুন্দর ! বড় সুন্দর ! দেখিস হইয়ু ভাঙবি না আবার।

এই কথায় হইয়ু জিভ বের করে তার বাবাকে ভেংচি কাটল। হইয়ুর বাবা বললেন, দেখলে নীলু কেমন বেয়াদব হয়েছে ? এই হইয়ু থাপ্পড় খাবি পাজি মেয়ে।

হইয়ু তার বাবার দিকে ফিরেও তাকাল না। পুতুল নিয়ে তার কী আনন্দ ! অন্যদিকে মন দেয়ার ফুরসত নেই। হইয়ুর বাবা বললেন, নীলু মা, তোমরা গল্পগুজব করো। আমি পাশের ঘরে একটু বসি। দারুণ ঘুম পাচ্ছে।

নীলু চমকে উঠে বলল, ওমা ওই ঘরে ছোটকাকু বসে আছে যে। আপনাকে দেখে ছোটকাকু ভয় পাবে।

ভয় পাবে নাকি ?

নীলু মাথা নেড়ে বলল, হুঁ পাবে। ছোটকাকু অবশ্য বলে ভূত-টূত কিছু নেই। সব মানুষের বানানো। তবু আমি জানি আপনাকে দেখে সে ভয় পাবে।

ভূত এই কথা শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইল। শেষে বলল, তোমার ছোটকাকু ভূত বিশ্বাস করে না ?

জি-না।

একটুও না ?

উঁহু।

আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা।

নীলু ভয় পেয়ে বলল, না না ছোটকাকু খুব ভালো। সত্যি বলছি।

ভূতটা হাসিমুখে বলল, বেশি ভয় দেখাব না নীলু। অল্প, খুব অল্প। দেখবে কেমন মজা হয়।

নীলু কী আর করে। খানিকক্ষণ ভেবেটেবে রাজি হয়ে গেল। ভূতটা হইয়ুকে বলল, হইয়ু মা নীলুর খাটের নিচে বসে থাক। নীলুর কাকা যদি ভয় পেয়ে এ ঘরে আসেন তবে তোকে দেখে আরো ভয় পাবেন।

এই বলে ভূত পর্দা সরিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। আর হইয়ু বলল, নীলু তোমার পুতুলটা নিয়ে যাই সঙ্গে ?

আচ্ছা, যাও।

নীলুর কথা শেষ হবার আগেই ওঘর থেকে একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হল। তারপর শোনা গেল ছোটকাকু চেঁচিয়ে বললেন, এটা কী ! আরে এটা কী ?

ধড়মড় করে শব্দ হলো একটা। আর ছোটকাকা হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এলেন নীলুর ঘরে। চেঁচিয়ে ডাকলেন, নীলু ও নীলু।

কী হয়েছে কাকা ?

না কিছু না। কিছু না।

ছোটকাকু রুমাল দিয়ে ঘনঘন ঘাড় মুছতে লাগলেন। তারপর পানির জগটা দিয়ে ঢকঢক করে একজগ পানি খেয়ে ফেললেন। নীলু খুব কষ্টে হাসি চেপে রেখে বলল, ভয় পেয়েছ কাকু ?

ছোটকাকু থতমত খেয়ে বললেন, ভয় ? হ্যাঁ তা । না না ভয় পাব কেন ?

নীলু খিলখিল করে হেসে ফেলল। ছোটকাকু গম্ভীর হয়ে বলল, হাসছো কেন নীলু ?

নীলু হাসি থামিয়ে বলল, কাকা তুমি কখনো ভূত দেখেছ ?

কাকা দারুণ চমকে বললেন, ভূতের কথা এখন থাক নীলু।

এই বলেই তিনি ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন। আর তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। কাকা বললেন, হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এসেছেরে নীলু। আমি যাই।

নীলু শুনল কাকা বলছেন, হ্যালো কী বললেন ? অবস্থা ভালো না ? তারপর ? ও আচ্ছা। এ-গ্রুপের রক্ত পাচ্ছেন না ? হ্যালো হ্যালো !

এতক্ষণ নীলুর মার কথা মনেই পড়েনি। এখন মনে পড়ে গেল। আর এমন কান্না পেল তার। হইয়ুর বাবা ঘরে ঢুকে দেখে নীলু বালিশে মুখ গুঁজে খুব কাঁদছে। হইয়ুর বাবা খুব নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে মা ?

নীলু কথা বলল না আরো বেশি কাঁদতে লাগল।

কী হয়েছে লক্ষ্মী মা ? হইয়ু তোমাকে খামচি দিয়েছে ?

নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,

ন্‌না।

পেট ব্যথা করছে ?

উঁহু।

তবে কী হয়েছে মা ? বলো লক্ষ্মী মা।

নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,

মার কাছে যেতে ইচ্ছা করছে।

কোথায় তোমার মা ?

হাসপাতালে।

নীলু তার মার অসুখের কথা বলল। ভূতটি নীলুর মাথায় হাত বুলাতে বারবার বলতে লাগল, আহা ! বড় মুশকিল তো। কী করা যায় !

সে রুমাল দিয়ে নীলুর চোখ মুছিয়ে দিল।

ব্যাপার দেখে হইয়ু খুব ভয় পেয়ে গেল। সে আর খাটের নিচ থেকে বেরুলই না। একবার মাথা বের করে নীলুকে কাঁদতে দেখে সুরুৎ করে মাথা নামিয়ে ফেলল নিচে। পুতুল নিয়ে খেলতে লাগল আপন মনে।

হইয়ুর বাবা কিছুতেই নীলুর কান্না থামাতে না পেরে বলল, এক কাজ করা যাক, আমি দেখে আসি তোমার মাকে। কেমন ?

আপনাকে দেখে যদি মা ভয় পায় ?

ভয় পাবে না। আমি বাতাস হয়ে থাকব কিনা। দেখতে পাবে না আমাকে। বলতে বলতেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। নীলু চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, হইয়ু আমার একা একা একটুও ভালো লাগছে না। তুমি আস।

হইয়ু হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচ থেকে বেরুল। নীলু অবাক হয়ে দেখে, তার সুন্দর পুতুলটা হইয়ুর হাতে। কিন্তু পুতুলটার মাথা নেই। শুধু শরীর আছে। নীলু

ভীষণ অবাক হয়ে বলল, হইয়ু ভাই, আমার পুতুলের মাথাটা কোথায় ?

হইয়ু কোনো কথা বলে না। এদিক-ওদিক চায়। নীলু বলল, হইয়ু, ভেঙে ফেলেছ ?

না।

তবে কী হয়েছে ?

হইয়ু লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলল। কোনোমতে ফিসফিস করে বলল, খুব ক্ষিধে লেগেছিল তাই খেয়ে ফেলেছি। তুমি রাগ করেছ নীলু ?

নীলুর অবশ্যি খুব রাগ লাগছিল। কিন্তু হইয়ুর মতো ভালো ভূতের মেয়ের উপর কতক্ষণ রাগ থাকে ? তার উপর নীলু দেখল, হইয়ুর চোখ ছলছল করছে। তাই বলল, বেশি রাগ করিনি, একটু করেছি।

ওমা এই কথাতেই হইয়ুর সে কী কান্না! নীলু তার হাত ধরে তাকে এনে বসালো তার পাশে। তারপর বলল, কী কাণ্ড হইয়ু ! বোকা মেয়ের মতো কাঁদে।

এই কথাতেই হেসে উঠল হইয়ু।

খুব ভাব হয়ে গেল তাদের, সেকী হাসাহাসি দুজনের ! আর হইয়ুর ডিগবাজি খাওয়ার ঘটা যদি তোমরা দেখতে ! নীলুকে খুশি করার জন্য সে বাতাসের মধ্যে হেঁটে বেড়াল খানিকক্ষণ। তারপর দুজন দুটি কোলবালিশ নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলল। কিন্তু নীলুর হল মুশকিল। সে কোলবালিশ দিয়ে হইয়ুকে মারতে যায় আর হইয়ু বাতাস হয়ে মিলিয়ে যায়। নীলু রাগ করে বলল, উঁহু বাতাস হওয়া চলবে না।

নীলু তাকে দেখাল তার ছবির বই। ফুফু তাকে যে রং পেন্সিল দিয়েছেন তা দিয়ে সে হইয়ুর চমৎকার একটি ছবি আঁকল। লাল কমল আর নীল কমলের গল্প বলল, তারপর বলল,

ভাব ভাব ভাব
ভাব ভাব ভাব
নীল রঙের সিন্ধু
আমি তুমি বন্ধু

অর্থাৎ দু'জন সারা জীবনের বন্ধু হয়ে গেল।

হইয়ুর বাবা যখন আসলেন তখন দু'জনে হাত ধরাধরি করে বসে আছে। হইয়ুর বাবা খুব খুশি হয়ে বললেন, নীলু আমার লক্ষ্মী মা কোথায় ?

এই তো এখানে।

খুব ভালো খবর এনেছি তোমার জন্য। তোমার মা ভালো হয়ে গেছেন। এখন ঘুমুচ্ছেন দেখে এসেছি।

নীলুর মনে হলো আনন্দে সে কেঁদে ফেলবে। হইয়ুর বাবা আপন মনে খানিকক্ষণ হেসে বললেন,

তোমার একটা ফুটফুটে ভাই হয়েছে নীলু। সেও শুয়ে আছে তোমার মার পাশে।

নীলুর কী যে ফুর্তি লাগল! এখন সে একা থাকবে না। এখন তার একটা ভাই হয়েছে। ভাইকে নিয়ে নীলু শুধু খেলবে।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে আসল। গাছে কাক ডাকতে শুরু করেছে।

হইয়ুর বাবা বললেন, ও হইয়ু, লক্ষ্মী মনা, ভোর হয়ে আসছে। চলো আমরা যাই।

কিন্তু হইয়ু কিছুতেই যাবে না। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলতে লাগল, আমি যাব না। আমি মানুষের সঙ্গে থাকব। আমি নীলুর সঙ্গে থাকব।

হইয়ুর বাবা দিলেন এক ধমক। হইয়ু কাঁদতে কাঁদতে বলল, তেঁতুল গাছে থাকতে আমার একটু ভালো লাগে না। আমি নীলুর সঙ্গে থাকব, আমি নীলুর সঙ্গে থাকব।

কিন্তু সকাল হয়ে আসছে। হইয়ুর বাবাকে চলে যেতেই হবে। তিনি হইয়ুকে কোলে করে নিয়ে গেলেন আর হইয়ুর সে কী হাত-পা ছোড়াছুড়ি! সে কী কান্না !

আমি নীলুর সঙ্গে থাকব।

আমি নীলুর সঙ্গে থাকব।

নীলুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কান্না পেতে লাগল।

তারপর কী হয়েছে শোনো। নীলুর মা কয়েকদিন পর একটি ছোট মতো খোকা কোলে করে বাসায় এসেছেন। মা হাসি মুখে বললেন, ভাইকে পছন্দ হয়েছে নীলু ?

হয়েছে।

বেশ। এবার ছোট ভাইকে দেখাও জন্মদিনে কী উপহার পেয়েছ। যাও নিয়ে এস।

নীলু কী আর করে, নিয়ে এল তার 'মাথা নেই পুতুল'। মা ভাঙা পুতুল দেখে খুব রাগ করলেন। নীলুকে খুব কড়া গলায় বললেন, নতুন পুতুলটির এই অবস্থা ? দু'দিনেই ভেঙে ফেলেছ ? ছিঃ ছিঃ বলো নীলু, কী করে ভেঙেছে বলো।

নীলু কিছুতেই বলল না। চুপ করে রইল। কারণ সে জানে হইয়ু আর হইয়ুর বাবার কথা বললে মা একটুও বিশ্বাস করবেন না। শুধু বলবেন, এইটুকু মেয়ে কেমন বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলছে !

বড়রা তো কখনো ছোটদের কোনো কথা বিশ্বাস করে না।

আকাশপরী

নীলুদের বাসায় মাঝে মাঝে একজন হেডমাস্টার সাহেব বেড়াতে আসেন। তিনি নীলুর বাবার বন্ধু আজীজ সাহেব। হেডমাস্টাররা সাধারণত যে রকম হন উনি কিন্তু মোটেই সে রকম নন। খুব হাসি-খুশি স্বভাব। আর এমন মজার মজার ধাঁধা জিজ্ঞেস করবেন নীলুকে যে নীলু হেসেই বাঁচে না। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, বলো দেখি মা, তিন আর এক যোগ করলে কখন পাঁচ হয় ?

নীলু ভেবেই পায় না। তিন আর এক যোগ করলে সব সময় চার হয়। পাঁচ আবার হবে কী করে ?

কী পারলে না ? ভেবে দেখো কখন তিন আর এক যোগ করলে পাঁচ হয়।

নীলু বলতে পারে না। শুধু মাথা চুলকায়। শেষে আজীজ চাচা হেসে বললেন, যখন অংকে ভুল হয় তখনি তিন আর একে পাঁচ হয়। এই সহজ জিনিসও পারলে না বোকা মেয়ে। ছিঃ ছিঃ।

আরেকদিন বললেন, বলো দেখি মা, কে 'ফর ফর করে উড়ে কুট কুট করে কামড়ায় ?'

নীলু বলতে পারে না। আজীজ চাচা হাঃ হাঃ করে হেসে বলেন,

পিপীলিকা ! পিপীলিকা !!

নীলু অবাক হয়ে বলে, পিঁপড়ার বুঝি পাখা থাকে ?

খুব থাকে। পড়নি কবিতায়, 'পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে।' তখন তারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেন ?

আজীজ চাচা গম্ভীর হয়ে বলেন, আগুন তখন তাদের ডেকে বলে, 'আমি কী সুন্দর ! আস তোমরা আমার কাছে। ভয় কী ভাই।'

আজীজ চাচাকে নীলুদের বাসার সবাই খুব ভালোবাসেন। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন নীলুর বাবা। আজীজ সাহেব এসেছেন শুনলেই তিনি চেঁচিয়ে উঠেন, 'হেডু এসেছে, হেডু এসেছে, ও নীলু তোর আজীজ চাচা এসেছে।' বাসায় একটি হুলস্থুল পড়ে যায়। মা একটা কেটলি চাপিয়ে দেন চুলায়। আজীজ চাচার আবার মিনিটে মিনিটে চা চাই কি-না।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আজীজ চাচা পা তুলে আরাম করে বসেন সোফায়। দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে শুরু করেন গল্প। নীলুতো ছোট, কাজেই তাকে ভূতের গল্প শুনতে দেয়া হয় না।

নীলু শুনতে চাইলেই মা বলেন, উঁহু উঁহু তুমি যাও নীলু। অল্প বয়সে এসব গল্প শুনলে ছেলেমেয়ে ভীতু হয়।

আজীজ চাচা তখন তর্ক করেন,

ভীতু হবে কেন ভাবি ? আমি যে ছেলেবেলায় এত ভূতের গল্প শুনেছি, আমি কি ভীতু ?

মা তবুও রাজি হন না। ঘাড় বাঁকিয়ে বলেন, না না, নীলুর এসব গল্প শুনে কাজ নেই।

নীলুর খুব ইচ্ছে করে ভূতের গল্প শুনতে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কে আর তাকে গল্প শুনতে দেবে ? এমন মন খারাপ লাগে তার। একেকবার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

গল্প বলা ছাড়াও আজীজ চাচা মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব জিনিস নিয়ে আসেন। একবার নিয়ে আসলেন হিজিবিজি লেখা কী একটা কাগজ। নীলুর মাকে বললেন, ভাবি এই তাবিজটি বালিশের নিচে রেখে ঘুমুলে স্বপ্নে দেখবেন আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। আর সেই পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় আকাশ পরীর দল নাচছে আর গান গাইছে।

মা শুনে হেসেই বাঁচেন না। আজীজ চাচা রেগে গিয়ে বললেন, আপনার বিশ্বাস না হলে আজ মাথার নিচে রেখে ঘুমান। পরীক্ষা হয়ে যাক।

মা আঁতকে উঠে বললেন, সর্বনাশ আমি নেই এর মধ্যে।

নীলু তখন থাকতে না পেরে বলল, আমাকে দিন চাচা। আমি পরী দেখব।

আজীজ চাচা নীলুকে দিতে যাচ্ছিলেন কাগজটা। কিন্তু মা তার আগেই ছোঁ মেরে কাগজটা নিয়ে ফেলে দিলেন বাইরে। নীলুকে ধমক দিয়ে বললেন, যা শুনবে তাই করতে চাইবে, কী যে বাজে স্বভাব হয়েছে নীলুর !

আজীজ চাচা আরেকবার নিয়ে আসলেন ছোট্ট একটা ফুলের গাছ। লম্বা লম্বা কালো তার পাতা। বাবাকে বললেন, এই নাও সেনচুরিয়ান ফ্লাওয়ারের চারা। একশ' বছর পর ফুল ফুটবে। অপূর্ব বেগুনি রঙের ফুল। অদ্ভুত সুন্দর !

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, তোমার ঐ বেগুনি ফুল দেখবার জন্যে একশ' বছর কে বেঁচে থাকবে ? উঠোনে দু'দিন ধরে অযত্নে পড়ে রইল সেই ফুলের গাছ। তারপর নীলু সেই গাছটি যত্ন করে লাগাল তার বাগানে। নীলু যদি একশ' বছরেরও বেশিদিন বাঁচে তাহলে সে দেখবে বেগুনি ফুল।

এই জন্যই আজীজ চাচাকে এত ভালো লাগে নীলুর। তাছাড়া মাঝে মাঝে তিনি শিকারের গল্পও করেন। সেইসব গল্প নীলুকে শুনতে দেয়া হয়। একটা গল্পের কথা নীলুর খুব মনে পড়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রামু পাহাড়ের কাছে একবার একটা ছাগল চড়ছিল। ছাগলটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা গাছ। জায়গাটা জংলা মতন। হঠাৎ দেখা গেল মস্ত একটা সাপ গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে দোল খেতে শুরু করেছে। সাপটিকে দেখেই ছাগলটি ছটফট করতে শুরু করল। দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাবার তার কী চেষ্টা। সাপটি দোল খেতে খেতে একেবার ছাগলটির খুব কাছে চলে

আসল। আর ওম্নি ছাগলটি চুপ। সাপ প্রকাণ্ড বড় হা করে তাকিয়ে রইল ছাগলটির দিকে। ছাগলটির নড়বার শক্তি যেন আর নেই। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল হা করা সাপের দিকে।

গল্প শুনে নীলু ভয়ে বাঁচে না। আজীজ চাচা বললেন, সাপ খুব সহজেই হিপ্‌নটাইজ করতে পারে।

আজীজ চাচার কথা শুনে বাবা বললেন, যত আজগুবি গল্প তোমার। সাপ আবার হিপ্‌নটাইজ করবে কি ?

আজীজ চাচা খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, এই গল্পে তোমার বিশ্বাস হলো না। বেশ আমার নিজের জীবনের গল্প বলি শোনো।

কিসের গল্প ভূতের নাকি ?

ঠিক ভূতের না হলেও ভূতের।

সঙ্গে সঙ্গে মা বললেন, নীলু, মা তোমার এসব গল্প শুনে কাজ নেই। যাও ঘুমুতে যাও।

নীলু মুখ কালো করে বলল, আমার শুনতে ইচ্ছে করছে মা।

না ভয়ের গল্প ছোটদের শুনতে নেই। তুমি ঘুমুতে যাও।

সেই গল্প শুনতে না পেয়ে নীলুর যে কী মন খারাপ হলো বলবার নয়। প্রায় কান্না পেয়ে গেল। সে অবশ্যি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে, যদি কিছু শোনা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের গলার আওয়াজ ছাড়া কিছু শোনা গেল না। মা বলছেন, বলেন কী সত্যি নাকি ?

ওমা গো !

কী সর্বনাশ ! আপনি কী করলেন ?

সেদিন থেকে নীলু কতবার যে ভেবেছে যেন আজীজ চাচা বেড়াতে এসেছেন। ঘরে আর কেউ নেই। শুধু সে একা। আর আজীজ চাচা এসেই শুরু করেছেন গল্প। কী দারুণ ভূতের গল্প!

ওমা নীলুর কী ভাগ্য ! সত্যি সত্যি একদিন এরকম হল। সেদিন ছিল সোমবার। সন্ধ্যাবেলা নীলুর বাবা আর মা গেলেন বেড়াতে, কোনো বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ। ফিরতে তাদের রাত হবে। নীলুর ছোটচাচা মাথাব্যথার জন্যে শুয়ে আছেন তার নিজের ঘরে। আর কী আশ্চর্য নীলুর স্যারও আসেননি তাকে পড়াতে। কিচ্ছু ভালো লাগছিল না। ভেবেই পাচ্ছিল না একা একা কী করে। তখনি আসলেন আজীজ চাচা। দরজার ওপাশ থেকে বললেন,

'হাউ মাউ খাঁউ
নীলুর গন্ধ পাঁউ।'

নীলু আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তার সেকী চিৎকার, 'আজীজ চাচা এসেছেন,

আজীজ চাচা এসেছেন!'

কী-রে নীলু বেটি, বাবা-মা কোথায় ?

বাবা নেই, মা নেই— কেউ নেই। কিন্তু আপনি যেতে পারবেন না।

নীলু ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফেলল।

আজীজ চাচা হেসে বললেন, আমাকে বন্দি করে ফেললে যে নীলুমা ? এখন বলো বন্দির প্রতি কী আদেশ ?

নীলু আজীজ চাচার হাত ধরে চেঁচাতে লাগল, গল্প বলুন। গল্প।

কিসের গল্প মা ?

সব রকম গল্প। ভূতের গল্প, পরীর গল্প, ডাকাতের গল্প, শিকারের গল্প।

কী সর্বনাশ এত গল্প !

নীলু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ বাবার সঙ্গে যেমন গল্প করেন সেইসব গল্প।

আজীজ চাচা হাসতে লাগলেন। নীলু বলল, তার আগে আপনার জন্যে চা বানিয়ে আনি।

ওমা ! নীলু বেটি আবার চা বানাতে পারে নাকি ?

হ্যাঁ খুব পারি।

নীলু দৌড়ে গেল রান্নাঘরে। তার চা অবশ্যি বেশি ভালো হলো না। দুধ হয়ে গেল খুব বেশি। মিষ্টি হলো তার চেয়ে বেশি। তবু আজীজ চাচা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চমৎকার ! এত ভালো চা আমি সারা জীবনেও খাইনি।

এই বলেই তিনি গম্ভীর হয়ে দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন। নীলু জানে এখন গল্প শুরু হবে। কারণ, আজীজ চাচা গল্প বলার আগে সব সময় গম্ভীর হয়ে দাড়িতে হাত বুলান।

বাংলাদেশের একজন অতি বড় লেখকের গল্প বলি শোনো। তাঁর নাম বিভূতিভূষণ।

সত্যি গল্প চাচা ?

হ্যাঁ মা, সত্যি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল খুব ঘুরে বেড়ানোর শখ। একদিন ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন এক পুরনো রাজবাড়িতে। ভাঙা বাড়ি, দরজা জানালা ভেঙে পড়েছে। জনশূন্য পুরী। বাড়ির সামনের বাগানে আগাছা আর কাঁটা ঝোপের জঙ্গল। অবশ্যি বাড়ির ডানপাশের পুকুরটি ভারি সুন্দর। টলটল করছে পানি। শ্বেতপাথরের বাঁধানো ঘাট। সব মিলিয়ে অপূর্ব। তিনি সেই বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসলেন। খুব জ্যোৎস্না হয়েছে— আলো হয়ে গেছে চারদিক। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। ক্রমে ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। তিনি বসেই রইলেন। এক সময় তাঁর তন্দ্রার মতো হলো। আর ঠিক তক্ষুনি তাঁর মনে হলো কে একটি মেয়ে যেন খিলখিল করে হেসে উঠেছে। তিনি চমকে চেয়ে দেখেন, রাজবাড়ির বাগানে যে মার্বেল পাথরের

পরী মূর্তিটি আছে সেটি নড়তে শুরু করছে। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন। মূর্তিটি সত্যি সত্যি ডানা ঝাপ্টে খিল খিল করে হেসে উঠল। তিনি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, কে, কে ওখানে ?

ওম্নি ডানা ঝাপটানো বন্ধ করে পরীটি আবার মার্বেল পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। তাঁর আর একা থাকার সাহস হলো না। তিনি চলে আসলেন গ্রামে। গ্রামের লোক সব কিছু শুনে বলল, এ তো আমরা সবাই জানি বাবু। প্রতি পূর্ণিমা রাতে ঐ পরীটি প্রাণ পায়। নাচে গান করে। তার সঙ্গে নাচবার জন্যে আকাশ থেকে নেমে আসে আকাশ পরীরা। আপনি আর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলে ওদের দেখতে পেতেন।

গল্প শেষ করে আজীজ চাচা বললেন, ভয় লাগছে নীলু ?

হ্যাঁ। অল্প অল্প লাগছে।

তবে থাক আজ।

নীলু বলল, আমার খুব আকাশ পরী দেখতে ইচ্ছে করছে। কী করলে আকাশ পরী দেখা যায় চাচা ?

আজীজ চাচা হাসিমুখে বললেন, খুব সহজ মা। পূর্ণিমা রাতে গলায় একটা ফুলের মালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় চাঁদের দিকে। আর মনে মনে বলতে হয়—

'আকাশ পরী আকাশ পরী
কাঁদছে আমার মন।
এসো তুমি আমার ঘরে
রইল নিমন্ত্রণ।'

শুধু এই ? আর কিছু না ?

না শুধু এই।

আকাশ পরীরা এসে কী করে চাচা ?

ফুলের বাগানে হাত ধরাধরি করে নাচে। আর গান গায়। সেই গান শুনে বাগানের সব গাছে ফুল ফুটতে থাকে।

নীলু অবাক হয়ে বলল, চাচা, ওরা যদি আমার বাগানে আসে তাহলে আমার বাগানেও ফুল ফুটবে ?

নিশ্চয়ই ফুটবে মা।

আর চাচা, আপনি যে গাছটি দিয়েছেন একশ' বছর পর ফুল ফুটে সে গাছেও বেগুনি ফুল ফুটবে ?

আজীজ চাচা ইতস্তত করে বললেন, ফোটাই তো উচিত।

নীলু আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেলল।

এরপর থেকে বাড়ির মানুষ অস্থির। নীলু সবাইকে জ্বালিয়ে মারছে, 'কবে পূর্ণিমা হবে ? কবে পূর্ণিমা হবে ? এত দেরি কেন পূর্ণিমার ?'

মা রেগে মেগে অস্থির। নীলুকে বললেন, কী মাথামুণ্ডু বলেছে তোমার আজীজ চাচা, তাই বিশ্বাস করে বসে আছ। পরী আবার আছে নাকি পৃথিবীতে ?

বাবারও একই কথা— ভূত, প্রেত, রাক্ষস, খোক্কোস এইসব মানুষের বানানো জিনিস। বুঝলে নীলু। শুধু বোকারাই এসব বিশ্বাস করে।

নীলু বলল, আজীজ চাচা কি বোকা ?

না, সে বোকা নয়, সে একটা পাগল।

নীলু কিন্তু কারো কথাই বিশ্বাস করল না। পূর্ণিমার রাতে সত্যি সত্যি একটি ফুলের মালা গলায় দিয়ে বসল জানালার পাশে। আর আপন মনে বলতে লাগল,

'আকাশ পরী আকাশ পরী
কাঁদছে আমার মন
এসো তুমি আমার ঘরে
রইল নিমন্ত্রণ।'

নীলুর কাণ্ড দেখে বাসার সবার সেকী হাসাহাসি! মা ঠাট্টা করে বললেন, ডিমের পুডিং আছে ফ্রিজে। পরীরা আসলে খেতে দিস মনে করে।

কিন্তু নীলুর ভাগ্যটাই খারাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন ঘুম পেতে লাগল তার যে বলার নয়। ঘুম ভাঙল ভোরবেলায়। রোদের আলোয় চিকমিক করছে চারদিক। এত মন খারাপ হলো নীলুর যে বলার নয়। মা এসে বললেন, কী রে নীলু কী কথাবার্তা হলো পরীদের সঙ্গে ?

নীলু চুপ করে রইল।

নাস্তা খাবার সময় বাবা বললেন, তারপর নীলু মা, তোমার পরী বন্ধুদের সঙ্গে কী আলাপ করলে তা তো বললে না।

ছোটচাচা বললেন, সম্ভবত নীলুর সঙ্গে তাদের ঝগড়া হয়েছে। দেখছেন না নীলুর মন ভালো নেই।

সবাই হেসে উঠল হাঃ হাঃ করে। নীলুর কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। সে চুপি চুপি চলে আসল তার বাগানে। আর বাগানে পা দিয়েই সে অবাক। কত যে ফুল ফুটেছে বাগানে। তাহলে কি সত্যি আকাশ পরীরা এসেছিল ?

সে দৌড়ে গেল আজীজ চাচা যে গাছটি দিয়েছিলেন সেখানে। কী কাণ্ড ! সেই গাছে বেগুনি আর নীল রঙে মেশানো অদ্ভুত একটি ফুল ফুটে রয়েছে। কী অপূর্ব তার গন্ধ। নীলুর নিমন্ত্রণে তাহলে এসেছিল তার আকাশ পরী বন্ধুরা। আনন্দে নীলুর চোখে জল এসে গেল।

পরিশিষ্ট-১

১৯৬৬ সালে সিলেট থেকে প্রকাশিত 'আল-ইসলাহ' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা হুমায়ূন আহমেদের পিতার একটি চিঠি

office
Bogra
18/8/66

জনাব সম্পাদক সাহেব, (আল ইসলাহ)

সালাম ও তসলিম নিন। দু একদিন হল আপনার কাছে আমার এক গল্পের পুকুরচুরি নিয়ে আপনাকে এক চিঠি লিখেছি। যদি ভাল মনে করেন আল-ইসলাহে ছাপাবেন।

আমার বইয়ের সমালোচনা পড়ে (আপনার পত্রিকায়) খুব দমে গেছি। বিশেষ করে কতকগুলো অহেতুক মন্তব্যে, যা না লিখলেও চলে বা চলত। যাক সে সব।

আমার বড় ছেলের কথা, আপনাকে লিখেছিলাম। শুনে সুখী হবেন যে 'বোর্ডের' প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম হয়েছে। সে বাংলায় এমনিতে ভালো। সে 'বই পড়ি কেন ?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিল যখন ক্লাস টেনে পড়ত। যদিও সেটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল— তাকে বহু বলেও কোনো পত্রিকায় দেওয়াতে পারি নি। তার এক কথা— বহুজনের সাহায্যে লিখায় এ প্রবন্ধে মৌলিকতা কোথায় ? তবু মনে হয় এটা ছাপা হলে যারা বই পড়েন তাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো মনে করেন আল-ইসলাহে ছাপাবেন।

ছোট ছেলে আল ইসলাহের "কিশোর মজলিসের" ৪৩ নং সভ্য। সে এবং তার বোন ছুফিয়া খাতুন— (সভ্য নং কিশোর মজলিস" গেল বৃত্তি পরীক্ষায় আবাসিক বৃত্তি পেয়েছে।

আপনাকে জানানো হয় নি, এই ছেলে মোঃ জাফর ইকবালও লিখে। আল-ইসলাহে "চড়ুই পাখীর কান্না" তারই লিখা। হালে নজরুল জয়ন্তিতে পঠিত এক প্রবন্ধ 'অলি ভাই'-কে শ্রীমানের চিঠিসহ পাঠালাম। শ্রীমান নবম শ্রেণীর ছাত্র। সে হিসেবে প্রবন্ধ খুবই ভালো হয়েছে। অবশ্য ছাপা-না-ছাপার দায়িত্ব 'অলি ভাইর।'

বহু কিছু লিখলাম। ডিসেম্বরে বদলির পালা আসা অসম্ভব নয়। খলিলুর রহমান সাহেব শীগগিরই ডি এস পি হচ্ছেন। তিনি এখন রাজশাহীতে D.I.O (1) মাঝে মাঝে টেলিফোনে আলাপ হয়।

বেগম সাহেবকে, আমাদের কথা বলবেন। খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এখন আপনাদের নেক দোয়ায় ভালোই আছি।

আপনার কথা এবং অক্লান্ত সাহিত্য সেবার কথা ভুলবার নয়।

ইতি
সখ্য ও গুণমুগ্ধ
স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

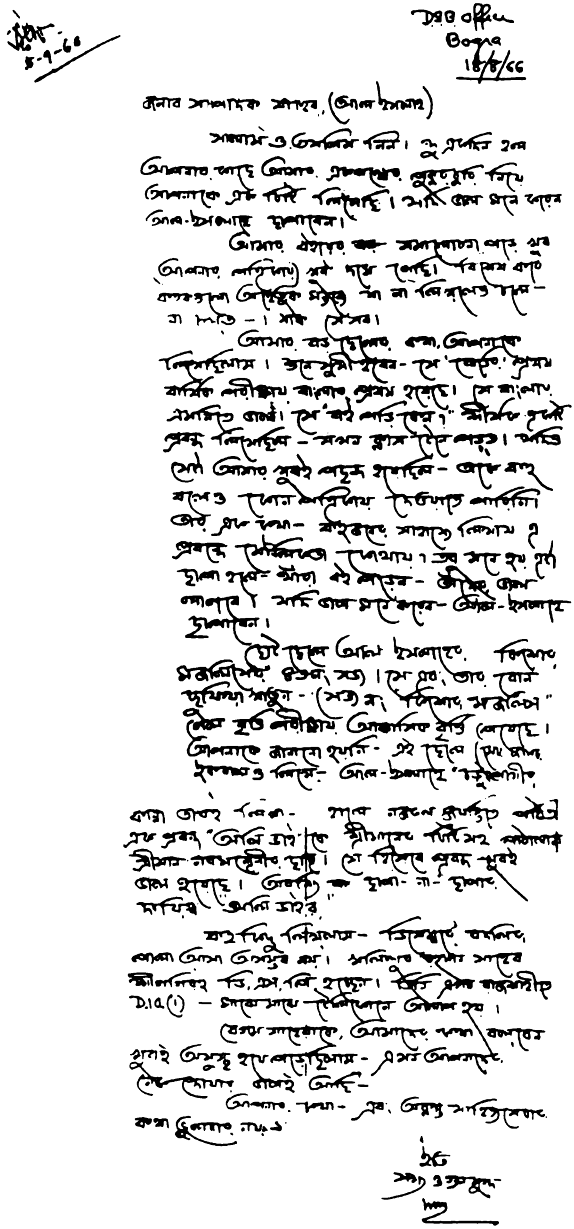

প্রাপ্ত ৫-৯-৬৬

DSB Office
Bogra
18/8/66

জনাব সম্পাদক সাহেব, (আল ইসলাহ)

সালাম ও তসলিম নিন। দু একদিন হল আপনার কাছে আমার [illegible] [illegible] দিয়ে আপনাকে এক চিঠি লিখেছি। আশা করি ভাল মনে করে আল-ইসলাহে ছাপাবেন।

আমার এইবার ~~[illegible]~~ সমালোচনা [illegible] আপনার পত্রিকায় সব [illegible] দেখেছি। বিশেষ করে [illegible] আধুনিক [illegible] যা না লিখলেও [illegible] — [illegible] —। [illegible] [illegible]।

আমার বড় ছেলের কথা আপনাকে লিখেছিলাম। জেনে খুশী হবেন— সে '[illegible]' প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম হয়েছে। সে বাংলায় এমনিতে ভাল। সে "[illegible]" শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ লিখেছিল— সমস্ত ক্লাস [illegible]। আমি সেটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]— [illegible] [illegible] লেখায় এ প্রবন্ধে [illegible] দেখায়। তবু মনে হয় [illegible] ছাপা হলে— [illegible] [illegible] [illegible]— [illegible] [illegible]। আশা করি ভাল মনে করে— আল-ইসলাহে ছাপাবেন।

যে ছেলে আল ইসলাহের [illegible] [illegible] [illegible]। সে [illegible], তার বোন সুফিয়া খাতুন - (৫ম) ম, "[illegible] [illegible]" [illegible] দুটি পরীক্ষায় [illegible] [illegible] দেখেছে। আপনাকে জানানো হয়নি - এই ছেলে [illegible] [illegible] ও লিখে- আল-ইসলাহে '[illegible]'

[illegible] তারা লিখে- [illegible] নতুন [illegible] [illegible] এক প্রবন্ধ 'আলি [illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সে হিসেবে প্রবন্ধ খুবই ভাল হয়েছে। [illegible] ~~[illegible]~~ ছাপা- না- ছাপার দায়িত্ব আপনার।

আর কিছু লিখলাম— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] সাহেব [illegible] বি.এস.সি. [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] D.I.G.(I) — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

বেগম সাহেবাকে, আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম - এখন আল্লাহর [illegible] [illegible] [illegible] আছি—

আপনার দোয়া- এবং আল্লাহ [illegible] [illegible] কথা ভুলবেন না।

ইতি
[illegible]

তৎকালীন আল ইসলাহ সম্পাদক বরাবরে হুমায়ুন আহমেদ-এর পিতার লেখা চিঠি

তরুণ বয়সে লেখা হুমায়ূন আহমেদের একটি প্রবন্ধ

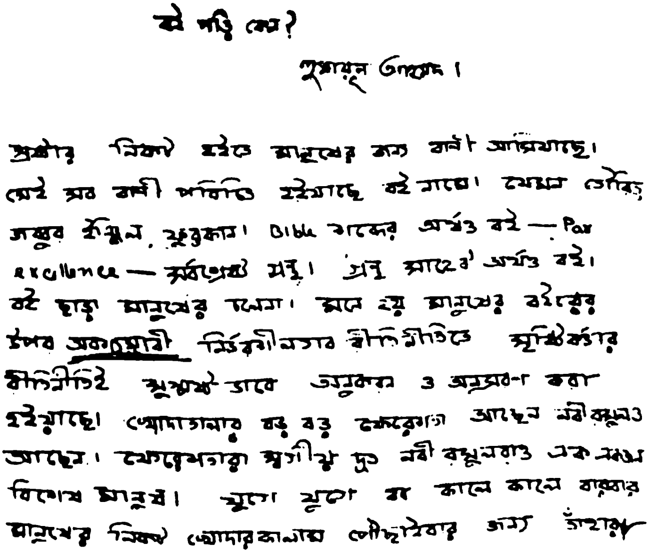
বই পড়ি কেন?
হুমায়ূন আহমেদ।

স্রষ্টার নিকট হইতে মানুষের জন্য বাণী আসিয়াছে।
সেই সব বাণী পরিচিত হইয়াছে বই নামে। যেমন তৌরিত,
জব্বুর ইঞ্জিল, ফুরকান। Bible শব্দের অর্থও বই — Par
excellence — সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 'গ্রন্থ সাহেব' অর্থও বই।
বই ছাড়া মানুষের চলে না। মনে হয় মানুষের বইয়ের
উপর অবশ্যম্ভাবী নির্ভরশীলতার রীতিনীতিতে সৃষ্টিকর্তার
রীতিনীতিই সুস্পষ্ট ভাবে অনুকরণ ও অনুসরণ করা
হইয়াছে। খোদাতালার বড় বড় ফেরেশতা আছেন নবী রসুলও
আছেন। ফেরেশতারা স্বর্গীয় দূত নবী রসুলরাও এক একজন
বিশেষ মানুষ। যুগে যুগে বা কালে কালে বারবার
মানুষের নিকট খোদার কালাম পৌঁছাইবার জন্য তাঁহারা

বই পড়ি কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ

স্রষ্টার নিকট হইতে মানুষের জন্য বাণী আসিয়াছে। সেইসব বাণী পরিচিত হইয়াছে বই নামে। যেমন তৌরিত, জব্বুর, ইঞ্জিল, ফুরকান। Bible শব্দের অর্থও বই— Par excellence— সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 'গ্রন্থ সাহেব' অর্থও বই। বই ছাড়া মানুষের চলে না। মনে হয় মানুষের বইয়ের উপর অবশ্যম্ভাবী নির্ভরশীলতার রীতিনীতিতে সৃষ্টিকর্তার রীতিনীতিই সুস্পষ্টভাবে অনুকরণ ও অনুসরণ করা হইয়াছে। খোদাতালার বড় বড় ফেরেশতা আছেন, নবী রসুলও আছেন। ফেরেশতারা স্বর্গীয় দূত, নবী রাসুলরাও এক একজন বিশেষ মানুষ। যুগে যুগে বা কালে কালে বারবার মানুষের নিকট খোদার কালাম পৌছাইবার জন্য তাঁহারা অর্থাৎ নবী রাসুলরা বইকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। ফেরেশতাদের দ্বারাই তা নাযেল করা হইয়াছে। নবী রাসুলরা তা প্রচার করিয়াছেন ও পড়িতে আদেশ দিয়াছেন। নবী রসুলরা আজ নক্ষত্রের দেশে। ফেরেশতাগণ স্বর্গীয় দূত, তাদের সন্ধান আমরা জানি না। কিন্তু খোদার দরবার হইতে যেসব বই তাঁহারা নিয়া আসিয়াছিলেন তাহা আমাদের জন্য রহিয়া গিয়াছে— অনাগত কালেও থাকিবে বংশ পরম্পরায় আমাদের সন্তান সন্ততির পাঠের জন্য।

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (দঃ) কে জিব্রাইল প্রথম যে বাণী শুনান হেরার গিরি গহ্বরে তাহা ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পড়। আরও ছিল 'আল্লামা বিল—কালাম অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন কলমের মাধ্যমে', যার আশ্রয় বই। পৃথিবীতে কেউই অর্জিত বিদ্যা, সঞ্চিত জ্ঞান ও

মার্জ্জিত বুদ্ধিসহ জন্মগ্রহণ করে না। এসবগুলিই অর্জন করিতে হয়। আর অর্জনের প্রধানতম মাধ্যম জ্ঞানার্জন যাহা বই পড়া ছাড়া অসম্ভব। সাধারণ শিক্ষার্থী হইতে শুরু করিয়া অন্য সকলের বই পড়ার মূল উদ্দেশ্য হইল ভবিষ্যতের জীবন-পাথেয় সংগ্রহ করা, জ্ঞানার্জন করা, তার পরিধি বৃদ্ধি করা। এবং সে জ্ঞানকে কাজে লাগানোর হেকমত আয়ত্ত করা। অধ্যাপক মুয়াযযম হুসায়ন বলেছেন, "মানুষ বই পড়ে তার পার্থিব উন্নতির জন্য, তার ব্যক্তিগত মনের বিকাশ সাধনের জন্য। তার জন্মগত উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে বড় করে তোলা, আনন্দ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের বিকাশ সাধন করা।"

কিন্তু আত্মবিকাশ ব্যতীতও বই পড়ার অনেক দিক আছে। মানুষ বাঁচিয়া থাকলেও তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রশ্ন ? এই বাঁচাইয়া রাখার কাজেও বইয়ের অবদান কম নয়। জীবনের চরম দুর্দিনে যখন অবস্থাটা দাঁড়ায় অনেকটা "দারা পুত্র পরিবার তুমি কার, কে তোমার" মতো তখন বইয়ের মতো পরম সুহৃদ আর পাওয়া যায় না। সুসাহিত্যিক সৈয়দ আব্দুস সুলতান এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "বই মনকে সরিয়ে নিয়ে যায় বহু দূরদেশে যেখানে দুঃখ নেই, বেদনা নেই, হিংসা নেই, কৃতঘ্নতা নেই— যেখানে জীবনের দুঃখের চেয়ে জীবনে বাঁচা মহত্তর— যেখানে নৈরাশ্য মিথ্যা, উৎসাহ সত্য, যেখানে দুঃখ মানে কাপুরুষতা আর জিহাদ মানে জীবন। যেখানে মৃত মিথ্যা, জীবনই বৃহত্তম সত্য।

বই পড়িয়া মানুষ আনন্দও পায়। অবশ্য আনন্দ ও মনের বিকাশকে আলাদা করিয়া দেখা যায় না। পাঠক পান অনাবিল আনন্দের সন্ধান, সাথে সাথে উৎকর্ষ লাভ করে তাহার ব্যক্তিত্ব। যে সকল বইয়ে পাঠকের নিজের জীবনের, তার প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব, সমশ্রেণীর লোকের জীবনালেখ্য দেখিতে পায় সেই সমস্ত বইই তাকে আনন্দ দিয়া থাকে। বইয়ে বর্ণিত জীবনের সাথে নিজের জীবনকে তুলনা করিয়া যখন অচেনা চরিত্রের সাথে মিল দেখে তখন এক স্বর্গীয় পুলকে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। "বইয়ের কথা যখন জীবনের সাথে মিলে যাবে লেখক যখন বইয়ের কোনো চরিত্রের মাধ্যমে পাঠকের মনটিকে খুলে ধরতে পারবেন যখন নায়কের মুখে পাঠক তার নিজের মনের কথা খুঁজে পাবে তখনি সে বইয়ে পাবে আনন্দ ও তৃপ্তি। যে কথা বলতে চেয়েও বলে নি, যে কথা সে উপলব্ধি করেছে অথচ তা প্রকাশ করতে পারে নি, সে কথা যখন সে কোনো উপন্যাসের নায়কের মুখে শুনতে পায়, তখনি সে উচ্ছ্বসিত আবেগে লাফিয়ে উঠে। বারবার করে সে কথাই সে পড়তে চায়। সে বইই তার কাছে ভালো লাগে।"

শুনা যায় মাছির সমস্ত মাথায় সারি সারি চোখ আছে বলিয়াই সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবী দেখিতে পায়। আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন "হায় আমার মাথায় চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকত তা হলে আচক্রবালে বিস্তৃত এই সুন্দর ধরনীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একই সঙ্গে দেখতে পেতুম। কিন্তু আমার মনের চোখও মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো তো সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে। নানা জ্ঞান বিজ্ঞানের যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে মনের চোখ ফুটতে থাকে।"

এই চোখ বাড়াবার পন্থাটাই বই পড়া অর্থাৎ জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা।

সৈয়দ মুজতবা আলী লিখিয়াছেন, "মনের চোখ ফুটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, সংসারে জ্বালাযন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া ও বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে সব যন্ত্রণা এড়াবার তার তত বেশি ক্ষমতা হয়। অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল আরো কত কি ! কিন্তু

প্রশ্ন এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে ? বই পড়ে ও দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই।” তাই ভেবে হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন—

এই খানে এই তরুর তলে
তোমার আমার কৌতূহলে
এ জীবনে যে কটি দিন
কাটিয়ে যাব প্রিয়ে।
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
অল্প কিছু আহারমাত্র
আর একখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা— যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তার বেহেশতের সরঞ্জামের বর্ণনা দিতে গিয়ে কিতাবের কথা ভুলেন নি।

জীবনে বৈচিত্র্যের অবধি নাই। কিন্তু এত সব বৈচিত্র্যের সর্বটুকু আকণ্ঠ পানের অবকাশ মানুষের নাই কারণ— “Life is short, but art is long.” সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই
ঐ সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।”

জীবনের আদি অন্ত বিস্তৃত এই বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য সম্ভার উপভোগ করিতে হইলে দেশ বিদেশে ভ্রমণের প্রয়োজন, সাজা প্রয়োজন কলম্বাস, ভাস্কোদা গামা, মার্কো পেলো, ফাহিয়ান, ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং, রমানাথ বিশ্বাস। কিন্তু এতে প্রয়োজন অর্থের, প্রয়োজন স্বাস্থ্যের, প্রয়োজন সময়ের। কিন্তু নিজ ঘরে বসিয়া শুধুমাত্র বই পড়িয়া সারা বিশ্বের অলিতে গলিতে ভ্রমণ করিতে পারি।

সামর্থ্য থাকিলে শুধু দেশ দেখা চলে। কিন্তু অতীতের মানুষের সাথে কথা বলা চলে না। তাদের চলমান জীবন-মিছিলে সামিল হওয়া যায় না। সৃষ্টির প্রথম অরুণ প্রভাত হইতে যে রোমাঞ্চকর উত্থান পতন ভাঙা গড়ার মাঝখান দিয়া অতিবাহিত হইয়া আসিয়াছে মানুষের সমাজ, সভ্যতা, কৃষ্টি, সেই বিচিত্র নাটকে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সাথে দেখা করিতে কথা বলিতে কার না ইচ্ছা হয় ? আর বইই হইতেছে একমাত্র টেলিভিশন যাহার মাঝে চাহিলে দেখা যাইবে অতীতের সেই মানুষেরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাতার বন্দি সেই সব মানুষেরা উন্মুখ হইয়া আছেন কথা কহিবার জন্য। ইংরেজ কবি Robert southy এদের কথাই বলিয়াছেন—

"My days among the deads are past
Around me I behold,
Where'er these casual eyes are cast,
The mighty minds of old;
My never failing friends are they
with whom I converse day by day."

বই মানুষের চির সুহৃদ। মানুষের সাথে মানুষ শত্রুতা করিতে পারে কিন্তু বইয়ের দ্বিতীয় রিপুর বালাই নাই। পৃথিবীতে বই ব্যতীত কেহই এত আপনার হইতে পারে না। সকলেই যখন

কর্ম কোলাহলে ব্যস্ত, কথামাত্র বলিবার অবসর নাই, তখনো বই নীরবে কথা বলে।

দ্বাদশ বৎসরের জন্য যখন ভিক্টর হিউগোকে পুত্রসহ সমুদ্রতীরে নির্বাসিত করা হইয়াছিল তখন পুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা আপনার এই দীর্ঘ সময় কি করে কাটবে ?” হিউগো তখন সহাস্যে উত্তর করিলেন “বই পড়ে্।”

আর তাই বইয়ের সংগ্রহশালাকে মৌচাকের সহিত তুলনা করা হয়। ইহার মধু সকলেই পান করিতে পারে। স্কুল কলেজের গণ্ডিবাঁধা পাঠ্য তালিকার বাহিরের মধু পান করিলে নূতন জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া উঠায় পাঠক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাইবে। জন্ম নিবে অনেক অনেক মরণজয়ী প্রতিভা।

*এ প্রবন্ধ লিখতে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের ‘বই কেনা’ প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে।

পরিশিষ্ট-২

‘নন্দিত নরকে’-র প্রথম পাঠ, মাসিক *মুখপত্র* (মার্চ ১৯৭২, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৯) থেকে

নন্দিত নরকে
হুমায়ূন আহমেদ

রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা ক'টিই বার বার বলছিলো।

রুনুর মাথা নীচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিলো। আমি দেখলাম তার ফর্সা কান লাল হয়ে উঠছে। সে তার জ্যামিতি খাতায় আঁকি ঝুকি করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ‘দাদা একটু পানি খেয়ে আসি’ বলে ছুটতে ছুটতেই বেড়িয়ে গেলো। রুনু বারো পেরিয়ে তেরোতে পড়েছে। রাবেয়ার অশ্লীল কদর্য কথা তার না বুঝার কিছু নেই। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠেছিল। হয়তো সে কেঁদেই ফেলতো। রুনু অল্পতেই কাঁদে। আমি রাবেয়াকে বললাম:

ছিঃ রাবেয়া, এসব বলতে আছে ? ছিঃ! এগুলি বড় বাজে কথা। তুই কত বড় হয়েছিস।

রাবেয়া আমার এক বৎসরের বড়। আমি তাকে তুই বলি। পিঠাপিঠি ভাই বোনেরা একজন আরেকজনকে তুই বলেই ডাকে। রাবেয়া আমাকে তুমি বলে। আমার প্রতি তার ব্যবহার ছোট বোন সুলভ। সে আমার কথা মন দিয়ে শুনলো। কিছুক্ষণ ধরেই বালিশের গায়ে চাদর জড়িয়ে সে একটা পুতুল তৈরি করছিল। আমার কথায় তার ভাবান্তর হলো না। পুতুল তৈরি বন্ধ রেখে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। পা নাচাতে নাচাতে সেই নোংরা কথাগুলি আগের চেয়েও উঁচু গলায় বললো। আমি চুপ করে রইলাম। বাধা পেলেই রাবেয়ার রাগ বাড়বে। গলার স্বর উঁচু পর্দায় উঠতে থাকবে। পাশের বাসার জানালা দিয়ে দু'একটি কৌতুহলী চোখ কি হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করবে।

রাবেয়া বললো

আমি আবার বলবো।

বেশ।

কি হয় বললে ?

আমি কাতর গলায় বললাম,

সে ভারী লজ্জা রাবেয়া। এটা খুব একটা লজ্জার কথা।

তবে যে ও আমাকে বললে।

কে ?

আমি বুঝতে পারছি রাবেয়া নিশ্চয়ই কথাগুলি বাইরে কোথায়ও শুনে এসেছে। কিন্তু রাবেয়াকে, যার বয়স গত আগস্ট মাসে বাইশ হয়েছে, তাকে সরাসরি এমন একটি কদর্য কথা কেউ বলতে পারে, ভাবিনি।

আমি বলালাম,

কে বলেছে ?

আজ সকালে বলেছে।

কে সে ?

ঐ যে লম্বা ফর্সা।

রাবেয়া সেই ছেলেটির আর কোনো পরিচয়ই দিতে পারবে না। আবারও রাবেয়া বেড়াতে বেরুবে, আবারো হয়তো কেউ এমনি একটি ইতর অশ্লীল কথা বলে বসবে তাকে।

খোকা তোর দুধ।

মা দুধের বাটি টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। কালরাতে তাঁর জ্বর এসেছিল। বেশ বাড়াবাড়ি রকমের জ্বর। বাবা মাঝ রাত্তিরে আমার দরজায় ঘা দিয়েছিলেন। আমার ঘুমের ঘোর না কাটতেই শুনলাম ‘তোর কাছে এ্যাসপিরিন আছে খোকা ?’

স্বপ্ন দেখছি এই ভেবে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই মায়ের কান্না শুনলাম। মা অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অল্প জ্বর, অল্প মাথা ব্যথা, এতেই কাহিল।

বাবা আবার ডাকলেন,

খোকা তোর কাছে এ্যাসপিরিন আছে ?

তোষকের নীচে আমার ডাক্তারখানা। এ্যাসপিরিন, ডিসপুটেব এই জাতীয় কিছু টেবলেট জমানো আছে। অন্ধকারেই আমি মাঝারি সাইজের টেবলেট খুঁজতে লাগলাম। এ ঘরে আলো নেই। কোথায় যেন তার জ্বলে গেছে। রাতে হারিকেন জ্বালানো হয়। ঘুমুবার সময় রুনু হারিকেন নিবিয়ে দেয়। আলোতে রুনুর ঘুম হয় না। বাবা বললেন,

খোকা পেয়েছিস ?

হুঁ, কি হয়েছে ?

তোর মার জ্বর।

জ্বরে এ্যাসপিরিন কি হবে ?

খুব মাথা ব্যথাও আছে।

অ।

তিনটি টেবলেট হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই বারান্দায় লাগানো ২৫ পাওয়ারের বালবের আলো এসে পড়লো। কি বাজে ব্যাপার। একটিও এ্যাসপিরিন নয়। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন,

ঘরে দেশলাই রাখতে পারিস না।

মনে পড়লো ড্রয়ারে একটি নতুন দেশলাই আর তিনটি বৃষ্টল সিগারেট রয়েছে। সারাদিনে পাঁচটার বেশী খাবো না ভেবেও সাতটা হয়ে গেছে। আর এখন এই মধ্যরাত্রে একটাতো জ্বালাতেই হবে। কিছুক্ষনের ভেতরই একটা সিগারেট ধরাবো, এতেই মনটা ভরে উঠলো। বাবা এ্যাসপিরিন নিয়ে চলে গেলেন। দেশলাই জ্বালাতেই চোখে পড়লো রাবেয়া বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। প্রায় সমস্তটা শাড়ী পাকিয়ে পুটলি বানিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছে। শীতের সময় মশা থাকে না, মশারীও থাকে না। মশারীর আব্রুও সেই কারণেই অনুপস্থিত। বাবার গলা শুনা গেল।

নাও শানু নাও খেয়ে ফেলো টেবলেটটা।

আশ্চর্য! বাবা এমন আদুরে গলায় ডাকতে পারেন। আমার লজ্জা করতে লাগলো। বাবা আবার ডাকলেন,

শানু, শানু।

শাহানা নামটাকে কি সুন্দর করে ভেঙ্গে শানু ডাকছেন বাবা। আমার আর বাবার ঘরের ব্যবধানটা একটা বাঁশের বেড়ার ব্যবধান। উপরের দিকে প্রায় দু'হাত খানিক ফাঁকা। সামান্যতম শব্দের কথাও আমার ঘরে ভেসে আসে। আমি একটা চুমুর শব্দও শুনলাম।

আমার মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া হয়। আমার তোষকের নীচে চারটা ভেলিয়াম টু টেবলেট আছে। কিন্তু আমি কখনো ভেলিয়াম খাই না। ঘুমের ওষুধ হার্ট দুর্বল করে। আমার বন্ধু সলিল ঘুমানোর জন্যে দু'টি মাত্র বড়ি খেয়ে মারা গিয়েছিল। তার হার্টের অসুখ ছিল। আমারো হয়তো আছে। আমার মাঝে মাঝে বুকের বাম পাশে চিন চিনে ব্যথা হয়।

আমি হাজার ইনসমনিয়াতেও ঘুমের ওষুধ খাই না। মাঝে মাঝে এ জন্যে আমার বেশ অসুবিধা হয়। মাঝরাতে বাবা যখন 'শানু শানু এই শাহানা, এই বলে ডাকতে থাকেন, তখন আমার কান গরম হয়ে উঠে। নাক ঘামতে থাকে। হার্টের স্পন্ধন দ্রুত ও স্পষ্ট হয়। রাতের নাটকের সব ক'টি কথা আমার জানা। মা বলেন, আহা করো কি ? ছিঃ!

বাবা ফিস ফিস করে কি বলেন। তাঁর গলা খাদে নেমে আসে। মা জড়িত কণ্ঠে হাসেন। আমি দু'হাতে আমার কান বন্ধ করে ফেলি। নিজের বুকের শব্দটা সে সময় বড় বেশী স্পষ্ট মনে হয়। কিছুক্ষণের ভিতরই আবার সব নীরব হয়। রুনু আর রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বিজ বিজ করে। টেবিল ঘড়ির টক টক টক টক শব্দ আবার ফিরে আসে। আমি টেবিলে রাখা জগে মুখ লাগিয়ে ঢক ঢগ করে পানি খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই।

বারেন্দার একপাশে দুটি হাস্নুহেনা গাছ আছে। মা বলেন হাছনাহেনা। দুটোই প্রকাণ্ড। রাতের বেলায় তার পাশে এসে দাঁড়ালে ফুলের গন্ধে নেশার মত হয়। হাস্নুহেনার গন্ধে নাকি সাপ আসে। মন্টু এই গাছের নীচেই একবার একটা মস্ত সাপ মেরেছিল। চন্দ্রবোড়া সাপ। মা দেখে আঁৎকে উঠে বলেছিলেন, 'কি করলিরে মন্টু এর জোড়াটা যে এবার তোকে খুঁজে বেড়াবে ? আমি যদিও এসব বিশ্বাস করতামনা তবু আমারো ভয় লাগছিলো। আমি তন্ন তন্ন করে অন্য সাপটাকে খুঁজলাম। বাড়ীর চার পাশে কার্বলিক এসিড দেয়া হলো। মাস্টার চাচা বললেন 'যে সাপটা রয়ে গেছে সেটা পুরুষ সাপ।' সাপ দেখে তিনি স্ত্রী পুরুষ বলতে পারতেন। কদিন সবাই খুব ভয়ে ভয়ে কাটালাম। যদিও সেই পুরুষ সাপটিকে কখনো দেখা যায়নি।

রাবেয়া বললো, 'মা আমি দুধ খাবো'।

মার কাল রাতে জ্বর এসেছিল। তাঁর মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। রাবেয়ার কথা শুনে মার মুখ আরো শুকিয়ে গেল। তাঁকে বাচ্চা খুকীর মত দেখাতো লাগলো। আমি জানি আমরা কেউ যখন কোন একটা জিনিসের জন্যে আব্দার করি এবং মা যখন সেটি দিতে পারেন না তখন তাঁর মুখ এম্নি লম্বাটে হয়ে বাচ্চা খুকীদের মত দেখাতে থাকে। তাঁর নাকের পাতলা চামড়া তির তির করে কাঁপতে থাকে। ছোট বয়সে মার এই ভঙ্গিটাকে আবার খুব খারাপ লাগতো। আমি একটি জিনিষ চেয়েছি মা সেটি দিতে পারছেন না। তাঁর মুখ বাচ্চা খুকীদের মুখের মত হয়ে গিয়েছে। নাকের ফর্সা পাতলা পাতা তির তির করে কাঁপছে। মায়ের এই ভঙ্গীটাকে আমার অপরাধীর ভঙ্গি বলে মনে হোত। আমি মাকে কি করে কষ্ট দেয়া যায় তা ভাবতে থাকতাম। মার গায়ে একটি টিকটিকি ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে হোত। মা টিকটিকি বড় ভয় পান। মুখে বলেন ঘৃণা কিন্তু আমি জানি এ তাঁর ভয়। একবার মা ভাত খেতে বসেছেন হঠাৎ ছাদ থেকে একটা ছোট টিকটিকির বাচ্চা এসে পড়লো তাঁর মাথায়। তিনি হড় হড় করে বমি করে ফেললেন। মার উপর রাগ হলেই আমি টিকটিকি খুঁজতাম। কিন্তু টিকটিকি খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। পেলেও ধরা যেত না। কাপড়ের বল বানিয়ে ছুড়ে ছুড়ে মারতাম দেয়ালে টিকটিকির গায়। চুপ করে তার ল্যাজ খসে পড়তো। সেই ল্যাজও মা ঘেন্না করতেন। মা কখনো আমাদের কিছু বলতেন না। মা বড় বেশী ভালোমানুষ। বাবা মারতেন প্রায়ই। ভীষণ মার। বা বলতেন, 'আহা কি কর। আহা ব্যথা পায়না।' বাবা বলতেন, 'যাও, সরে যাও সামনে থেকে। আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ তুমি।' মাকে তখন বড় বেশী অসহায় মনে হোত। আর আমার ইচ্ছে হোত কাল ভোরেই বাড়ী থেকে পালাব। আর কখনো আসবো না।

মা আমাকে দুধ দাও।

রাবেয়া জিদ করতে লাগলো। আমি বাটিটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মা মৃদু কণ্ঠে বললেন,

আহা খা না তুই, তোর পরীক্ষা।

দুধের বিলাসীতাটুকু আমার জন্যেই। সামনেই এম, এস-সি ফাইনাল রাত জেগে পড়ি। ৯টার দিকে মা দুধ নিয়ে আসেন। আমি দুধে চুমুক দিতেই মা নীরবে রাবেয়ার শাড়ী থেকে একটি একটি করে সেফটি পিন খুলতে থাকেন। রাবেয়ার শাড়ীতে গোটা দশেক সেফটি পিন সারাদিন লাগানো থাকে। সমস্ত দিন সে ঘুরে বেড়ায়। তার অনাবৃত শরীর ভুলেও যেন কারুর চোখে না পড়ে এই ভয়েই মা এ করেন। রাবেয়াকে ঘরে আটকে রাখা যাবে না– তাকে সালোয়ার-কামিজও পরানো যাবে না। তার সে বয়স নেই। অথচ সবাই রাবেয়ার দিকে অসংকোচে তাকাবে। বয়স হলেই ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকায়। সেই তাকানোয় লজ্জা থাকে, দৃষ্টিতে সংকোচ থাকে। কিন্তু রাবেয়ার ব্যাপারে সংকোচ বা লজ্জার কোন কারণ নেই। রাবেয়াকে যে কেউ অতি কুৎসিত কথা বললেও সে হাসি মুখে সে কথা শুনবে। বাড়ী এসে অনায়াসে সবাইকে বলে বেড়াবে।

মা রাবেয়ার পাশে বসে রাবেয়ার মাথায় হাত রাখলেন। আমি একটি ছোট কিন্তু স্পষ্ট দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনলাম। রাবেয়া ঢক ঢক করে দুধ খাচ্ছে। রাবেয়া হয়তো ঠিক রূপসী নয়। কিংবা কে জানে হয়তো রূপসী। রং হালকা কালো। বড় বড় চোখ, স্বচ্ছ দৃষ্টি ? সুন্দর ঠোঁট। হাসলেই চিবুক আর গালে টোল পরে। যে সমস্ত মেয়ে হাসলে টোল পড়ে তারা কারণে অকারণে হাসে। তারা জানে হাসলে তাদের ভালো দেখায়। রাবেয়া তা জানে না তবু সে হাসে। কারণে অকারণে হাসে। রাবেয়ার কপালে ঠিক মাঝখানে একটা কাটা দাগ আছে। ছোটবেলায় চৌকাঠে

পড়ে গিয়েছিল। দুধ শেষ করে রাবেয়া বলল

বাজে দুধ। ছিঃ।

মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন 'শুভাপুরের পীর সাহেবের কাছে যাবি একবার ?' শুভাপুরে এক পীর সাহেব থাকেন। পাগল ভালো করতে পারেন বলে খ্যাতি। শুভাপুর এখান থেকে আট মাইল। সাইকেলে ঘণ্টা খানেক লাগে। কিন্তু আমি জানি পীর ফকিরে কিছু হবে না। বড় ডাক্তার যদি কিছু করতে পারে। কিন্তু আমাদের পয়সা নেই। আমার ছোট হয়ে যাওয়া সার্ট মণ্টু পরে। আমরা কাপড় কিনি বৎসরে একবার, রোজার ঈদে।

রুনা আসলো একটু পরেই। আড়চোখে দু'তিন বার তাকালো রাবেয়ার দিকে। না রাবেয়া সেই কুৎসিত কথাগুলি আর বলছে না। রুনু হাই তুললো। তার ঘুম পাচ্ছে। চোখ ফুলে উঠেছে। রাবেয়ার নোংরা কথা শুনে রুনুর কেমন লেগেছিল কে জানে। রুনুর বয়স এখন তেরো। আগামী নবেম্বরে চোদ্দোয় পড়বে। রুনুর বৃশ্চিক রাশি। আমার যখন এমন বয়স ছিল তখন এ ধরনের কথা শুনে বেশ লাগতো। সেই বয়সে মেয়েদের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগতো। টগর ভাই-এর বাসায় সন্ধ্যাবেলা অংক বুঝতে যেতাম। লিলু বলে তার একটা ছোট বোন ছিল। বড় হয়ে এই মেয়েটিকে বিয়ে করব ভেবে বেশ আনন্দ হোত আমার। লিলুর সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা লাগতো, কথা বেধে যেত মুখে। লিলু যখন আমার হাত ধরে টেনে বলতো, 'আসুন না দাদুভাই লুডু খেলি ? তখন অকারণেই আমার কান লাল হয়ে উঠতো। গলার কাছটায় ভার ভার লাগতো।

রুনুরও কি কোন ছেলেকে ভালো লাগে ? রুনুরও কি কখনো ভাবে বড় হয়ে আমি এই ছেলেটিকে বিয়ে করবো। কে জানে। হয়তো ভাবে, হয়তো ভাবে না। রুনু বড় লক্ষ্মী মেয়ে। এত লক্ষ্মী আর এত কোমল যে আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কেন জানিনা আমার মনে হয় এ ধরনের মেয়েরা সুখ পায়না জীবনে। আমি রুনুকে অনেক বড় করবো। রুনু ডাক্তার হবে বড় হলে। স্টেথোসকোপ গলায়, কালো ব্যাগ হাতে মেয়েডাক্তাদের বড় সুন্দর দেখায়। রুনু অংক ভালো পারে না। আমি তাকে নিজের পড়া বন্ধ রেখে, এ্যালজেবরা বুঝাই। ডাক্তারী পড়তে অবশ্যি অংক লাগে না।

সেদিন রুনুর অংক খাতা উল্টে চমকে গিয়েছিলাম। বেশ গোটা গোটা করে লেখা 'আমি ভালবাসি'। পরের কথা গুলি পড়ে অবশ্যি আমি লজ্জাই পেলাম। সেটি একটি ছেলেমানুষি কবিতা। আমি পৃথিবীর এই সৌন্দর্য ভালবাসি, গাছ-পালা-গান ভালবাসি এই জাতীয়। আমি বললাম

সুন্দর কবিতা হয়েছে রুনু।

রুনু লজ্জায় গলদা চিংড়ির মত লাল হয়ে বললো 'যাও ভারীতো। এটা মোটেই ভাল হয়নি।' আমি বললাম

তা হলোতো মনে হয় অনেক কবিতা লিখেছিস।

উঁহু।

রুনু মাথা নীচু করে হাসতে লাগলো। আমি বললাম–

দেখা রুনু, লক্ষ্মী মেয়ে তুই।

রুনু আরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে আমার ট্রাঙ্ক খুললো। তার যাবতীয় গোপন সম্পত্তি আমার ট্রাঙ্কে থাকে। এই বয়সে কত তুচ্ছ জিনিস অন্যের চোখের আড়াল করে রাখতে হয়। কিন্তু রুনুর নিজস্ব কোনো বাক্স নেই। আমার ট্রাঙ্কের একপাশে তার দুটি বড় বড় চারকোনা বিস্কিটের বাক্স

থাকে। আর কিছু খাতা পত্রও থাকে দেখেছি। রুনু হাতীর ছবি আঁকা একটা দু নম্বরী খাতা নিয়ে এসে লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেলো।

আমি বললাম

তুই পড়ে শুনা আমাকে।

না তুমি পড়।

দে তাহলে আমার হাতে।

রুনু খাতাটা হাতে গুঁজে দিয়ে দৌড়ে পালাল। দেখলাম সব মিলিয়ে বারোখানা কবিতা। দুটি মায়ের উপর, একটি পলার উপর। [পলা আমাদের পোষা কুকুর। এক দুপুরে কোথায় যে চলে গেল] একটি মণ্টুর সাপ মারা উপলক্ষ্যে—

'মণ্টু ভাইতো মারলেন মস্ত সাপ
চার হাত লম্বা সেটি কি তার প্রতাপ।'

মনে মনে ভাবলাম, রুনুকে একটি ভালো খাতা কিনে দেবো। রুনু খাতা ভর্তি করে ফেলবে কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে বাচ্চা মেয়ের একটি চরিত্র আছে। মেয়েটি লিখতে শিখে অবধি ঘরের দেয়াল, বইয়ের পাতা, মার হিসেবের খাতায় যা মনে আসতো তাই লিখে বেড়াতো। মেয়েটির দাদা তাকে একটি চমৎকার খাতা দিয়েছিল। যা তার জীবনে পরম শখের সামগ্রী হয়ে ছিল। কিন্তু আমার হাতে টাকা ছিল না। তবু আমি মনস্থির করে ফেললাম রুনুকে একটা খুব ভালো খাতা কিনে দেব। আমার মনে পড়ল হাতী মার্কা যে খাতাটায় রুনু কবিতা লিখছে। রুনু সেটি আমার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছিল। সেখানে আমার নাম ছিল সেটি কেটে রুনু বড় বড় করে নিজের নাম লিখেছে। দিনে ক' ঘণ্টা পড়ছি তার হিসেব রাখার জন্যে খাতাটি কিনেছিলাম। সপ্তাহ দুয়েক যাবার পরও যখন কিছু লেখা হয়নি তখন একদিন রুনু সংকোচিত ভাবে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। সাপের মত একে বেকে বললো

দাদা খাতাটা আমাকে দাওনা।

কোন খাতা ?

এইটে।

যা নিয়ে যা।

রুনু খাতা হাতে চলে গেল। তার মুখে সেদিন যে খুশীর আভা দেখেছি আমি আবার তা দেখবো। সাড়ে তিন টাকা দিয়ে প্লাষ্টিকের সুদৃশ্য কাভারের চমৎকার একটি খাতা কিনে দেবে তাকে।

আমার হাতে যদিও টাকা ছিল না তবু আমি রুনুকে খাতা কিনে দিয়েছিলাম। রুনুকে বড় ভালবাসি আমি। বড় ভালবাসি। রুনুকে দেখলেই আমার আদর করতে ইচ্ছে হয়। রুনু বড় লক্ষ্মী মেয়ে। রুনুর ভাল নাম সালেহা। রুনু নামটা আমারই দেয়া। রুনুর জন্যে রুনু নামটাই মানান সই। রুনু নামে কেমন একটা বাজনার আমেজ আছে। আবার যখন দীর্ঘ স্বরে ডাকা হয় রু. . নু . . . তখন কেমন একটা আমেজ আসে। রুনু বলল, দাদা আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

মা মশারি খাটিয়ে দিয়ে গেছেন। বেশ মশা এখন। রাতের সঙ্গে সঙ্গে মশাও বাড়তে থাকবে। আমার কানের কাছে গুন গুন করবে তারা। পড়ায় মন দিতে পারছিনা। এম, এস-সি তে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে আমার। একটা ভদ্র ভালো বেতনের চাকরীর আমার বড় প্রয়োজন। রুনু গুটি গুটি মেরে রাবেয়ার পাশে শুয়ে পড়েছে। অবশ্যি সে এখন ঘুমুবে না।

যতক্ষণ ঘরে আলো জ্বলে ততক্ষণ রুনু ঘুমুতে পারে না।

আমার পাশেই শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে। এক একবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাঁদে। সে কান্না বিলম্বিত দীর্ঘ সুরের কান্না। পলাও মাঝে মাঝে এমন কাঁদতো। মা বলতেন 'দুর! দুর!' কুকুরের কান্না নাকি অমঙ্গলের চিহ্ন। গৃহস্থের বিপদ দেখলেই কুকুর বেড়াল এই জাতীয় পোষা জীবগুলি কাঁদে। রাবেয়ার কান্নার উৎস আমরা জানি না। হয়তো সারা দিনের অবরুদ্ধ কান্না রাতে অঝোর ধারার মতই নেমে আসে। রাবেয়ার কান্নায় রুনু ভয় পায়। বলে দাদা আপা কাঁদছে কেমন দেখো।

আমি বলি 'ভয়কি রুনু।' উঁচু গলায় ডাকি, 'এই এই রাবেয়া কাঁদে কেন। কি হয়েছে ?

কোন কোন রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। জানালা গলে নরোম আলো এসে পরে আমাদের গায়। জোছনায় নাকি হাস্নুহেনা খুব ভালো ফুটে। নেশা ধরানো ফুলের গন্ধে ঘর ভরে যায়। আমি ডাকি।

'রুনু ঘুমিয়েছিস ?'

'উঁহু'।

'গল্প শুনবি ?'

'বল'।

কি গল্প বলবো ভেবে পাই না। গল্পের মাঝখানে থেমে গিয়ে বলি 'এটা নয় আরেকটা বলি'। রুনু বলে– 'বল'। সে গল্পও শেষ হয়না। আচমকা মাঝ পথে থেমে গিয়ে বলি তুই একটা গল্প বল রুনু।

আমি বুঝি জানি।

যা জানিস তাই বল। বলনা।

উহুঁ তুমি বল দাদা।

রুনুকে আমার টমাস হার্ডির এ পেয়ার অব ব্লু আইস এর গল্প বলতে ইচ্ছে হয়। আমার মনে হয় রুনুই যেন এ পেয়ার অব ব্লু আইসের নায়িকা। কিন্তু রুনু আমার ছোট বোন। সামনের নভেম্বরে সে চৌদ্দ বৎসরে পড়বে। এমন প্রেমের গল্প তাকে কি করে বলি। রুনু বলে

থেমে গেলে কেন দাদা ? শেষ করো না।

আমি গল্প বন্ধ রেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করি।

রুনু তোর কাকে সবচে ভাল লাগে ?

তোমাকে।

হয়তো আমাকে তার সত্যিই ভাল লাগে। বাইরের তীব্র জোছনা, ফুলের অপরূপ সৌরভ মশারী উড়িয়ে যাবার মত বাতাস। বুকের কাছটায় গভীর বেদনা অনুভব করি।

এই আপা এই।

কি হয়েছে রুনু ?

দাদা, আপা আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিয়েছে।

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে ঠ্যাং তুলে দিয়েছে রুনুর গায়ে। বেশ স্বাস্থ্য রাবেয়ার। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদেরই হয়তো ভরা যৌবনের মেয়ে বলে। ভরা যৌবন কথাটায় কেমন একটা অশ্লীতার ছোঁয়া আছে। আমার কাছে যুবতী কথাটা তরুণীর চেয়ে অনেক অশ্লীল মনে হয়। কে জানে কেন ?

পাশের বাসার লোকজনের শব্দ শুনা যাচ্ছে। রাত যত গভীর হয় আশে পাশের শব্দ ততই স্পষ্ট হয়। দিনে কখনো থানার ঘড়ির ঘণ্টা শুনিনা। রাত ৯টার পর থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। পাশের বাসায় কে যে কাশলো। কিছুক্ষণ পরই খিল খিল করে হাসির শব্দ শুনলাম। হাসির স্বরগ্রাম বেশ উচু। নিশ্চয়ই নাহার ভাবী। নাহার ভাবী খুব উচু গলায় কথা বলেন। 'বিধি ডাগর আঁখি যবে দিয়েছিলে' নাহার ভাবী রেকর্ড চড়িয়েছেন। প্রায় রাতেই তিনি গান শুনেন। এই গানটি তার ফেবারিট। আমার রবীন্দ্র সংগীতের 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়' সবচে ভালো লাগে। এই রেকর্ডটি তাঁরা খুব কম বাজান। 'বিধি ডাগর আঁখি' বড় করুন। নাহার ভাবীতো খুব হাসি খুশী। অথচ এমন একটি করুন গান তাঁর পছন্দ কেন কে জানে। 'যারা খুব হাসি-খুশী করুণসুর তাদের খুব মুগ্ধ করে' কোথায় যেন পড়েছি। রুনু হঠাৎ ডাকলো দাদা ঘুমিয়েছো ?

না।

নাহার ভাবী গান বাজাচ্ছে।

হুঁ।

এরপর কোন গানটা বাজাবে জান ?

না, কোনটা ?

আধুনিক, 'জোনাকী ঝিকিমিকি জ্বালো আলো।'

সত্যি সত্যি তাই বাজলো। রুনু শব্দ করে হাসলো। আমি বললাম, তুই জানলি কি করে ?

আমিইত আজ দুপুরে সাজিয়ে রেখেছি। তোমার গান সবার শেষে।

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বললো, 'না না বললামতো যাবো না।' হারুন ভাই যদি সত্যি সত্যি নাহার ভাবীকে (মুদ্রণ প্রমাদ ? 'রাবেয়াকে' হবে।) বিয়ে করে ফেলতো তবে আর মাঝ রাতে গান শুনা হতো না। রাবেয়ার গান ভালো লাগে না। কে জানে কি তার ভালো লাগে। হারুন ভাইদের বাসার সবাই রাজী হলেও এ বিয়ে হতো না।

রাবেয়া যদি কোনদিন ভালো হয়ে উঠে তবে তাকে খুব একজন হৃদয়বান ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো। হারুন ভাই এর মতো একটি নিখুঁত ভালো ছেলে। সেও গভীর রাতে রেকর্ড বাজাবে। চাঁদের আলো এসে পড়বে তাদের দুজনার গায়। ভদ্রলোক রাবেয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলবেন।

তোমার কপালে কিসের দাগ রাবেয়া ?

পড়ে গিয়েছিলাম চৌকাঠে।

তিনি সেই কাটাদাগের উপর অনেকক্ষণ হাত রাখবেন। তারপর চুমু খাবেন সেখানটায়। রুনু আমায় ডাকলো।

দাদা তোমার গান হচ্ছে।

আমি শুনলাম 'প্রাঙ্গণে যোর শিরিষ শাখায় নিত্য হাতে কি উচ্ছ্বাসে'। আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠলো। গানটি আমার বড় ভালো লাগে।

গান শুনতে শুনতে আমি নাহার ভাবীর মুখ মনে আনতে চেষ্টা করলাম। মাঝে মাঝে খুব পরিচিত লোকদের মুখও আমি কিছুতেই মনে আনতে পারি না। নাহার ভাবীর মুখটা ত্রিভুজ আকৃতির। হারুন ভাইদের বাসার সবাইর মুখ আবার লম্বাটে ডিমের মতো। তারা সবাই ভারী সুন্দর। কয় পুরুষ ধনী থাকলে চেহারায় একটা আলগা লালিত্য আসে কে জানে। ভাবতে ভালো লাগে এই পরিবারটিতে কোন দুঃখ নেই। মাসের ১৫ তারিখের পর থেকে খরচ বাঁচানোর

আপ্রাণ চেষ্টা এ পরিবারের মায়ের করতে হয় না। ইচ্ছে হলেই ইংরেজী ছবির মতো মোটরে করে এরা আউটিংএ চলে যায়। স্বাধীনতা দিবসে এ পরিবারের মেয়েরা রাইফেল শুটিং-এ ফার্ষ্ট সেকেন্ড হয়।

তারা কবে এসেছিল শান্তি কটেজে আমার মনে নেই। তবে খুব বৃষ্টি সেদিন। আমি, রাবেয়া আর রুনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। জীপ থেকে ভিজতে ভিজতে নামলো সবাই। প্রথমেই রুনুর বয়সী একটি মেয়ে। নাম শীলা। বাবা আদর করে ডাকেন শীলু মা, মা শুধু বলেন শীলু। তারপর বড়ো ভাই, চোখে বুড়ো মানুষের মত চশমা হলেও একেবারে ছেলেমানুষী চেহারা। গাড়ী থেকে নেমেই চেচিয়ে উঠলো 'কি চমৎকার বাড়ী শীলু।' বাবা নামলেন, মা নামলেন, চাকর বাকর নামলো। আজীজ সাহেবদের চলে যাওয়ার অনেকদিন পর বাড়ীটা ভরলো। বর্ষা গিয়ে শীত আসলো। ব্যাডমিনটন কোর্ট কেটে হৈ হৈ করে দুই ভাইবোন লাভ ইলেভেন, লাভ টুয়েলভ করে খেলতে লাগলো।

রুনু বড় লাজুক। নয়তো সে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারতো। আমার খুব ইচ্ছে হোত শীলু মেয়েটির সঙ্গে রুনুর ভাব হোক। আমি দেখতাম সন্ধ্যা হলেই শীলু তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কবুতর উড়াতো। তাদের দুটি লোটন পায়রা ছিল। কারণে অকারণে যেত র‍্যাবেয়া। তাকে আমরা বাঁধা দিতাম না। বাধা পেলেই রাবেয়ার মেজাজ বিগড়ে যেত। চিটাগাংএ বড় খালার ভাসুর মস্ত ডাক্তার। তিনি বলেছিলেন, 'যা ইচ্ছে হয় তাই করতে দেবেন একে। দেখবেন যা এবনরমালিটি আছে তা আপনি সেরে যাবে'। আমাদের চিকিৎসার টাকা ছিল না। নিখরচার এ চিকিৎসা তাই আমরা প্রাণপণে করতাম। একদিন মা কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার টেবিলে একটি কি যেন নামিয়ে রাখলেন। দেখি চমৎকার একটি কলমদান। ধবধবে সাদা দুটি পেঙ্গুইন পাখী কলমদানের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পেঙ্গুইন দুটোর মাঝামাঝি একটি বাচ্চা পেঙ্গুইন মুখ হা করে শুন্যে তাকিয়ে। সেই হা-করা মুখেই কলম রাখার জায়গা। আমার এ জাতীয় জিনিসের দাম সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবু মনে হল এ অনেক দামী। মা কাঁপা গলায় বললেন,

রাবেয়া এনেছে ও বাড়ী থেকে।

আমার প্রথমেই যা মনে হলো তা হল রাবেয়া না বলেই এনেছে। কিন্তু রাবেয়া পেনি ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বলতে লাগলো 'আমি আনিনি ওরা আপনি দিয়েছে।'

মিথ্যা রাবেয়া বলে না। কিন্তু ওরাইবা কেন দেবে। এমন একটা সৌখিন জিনিস হঠাৎ করে দিয়ে দিতে হলে যে দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় প্রয়োজন তা কি আমাদের আছে ? খবরের কাগজে কলমদানিটি মুড়ে রুনু প্রথম বারের মত ওবাড়ী গেল। রাবেয়া নাকি সুরে বলতে লাগলো 'আমার জিনিস রুনু যে বড় নিয়ে চললো, ভেঙ্গে ফেললে আমি মজা না দেখিয়ে ছাড়ব ?'

জানা গেল রাবেয়া আনেনি ওরাই দিয়েছে। না ঠিক ওরা নয়, হারুন বলে যে ছেলেটি শিগ্‌গীরই বিদেশ যাবে শুধু একটি পাশপোর্ট এর অপেক্ষা– সেই দিয়েছে। শীলু আর তার মাও ঠিক জানতো না ব্যাপারটা। তারাও একটু অবাক হয়েছে। শীলুর সঙ্গে এই অল্প সময়েই খুব ভাব হয়ে গেলো রুনুর। একটি লম্বাটে মিমি চকলেট আর বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টিপ্রদীপ' সে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম

ওরা কেমন লোক রুনু ?

খুব ভালো।

চকলেট পেয়ে গলে গেছিস না ?

যাও, শীলু কিন্তু সত্যি ভাল। জান শীলু মোটর চালাতে পারে।

যাহ! এতটুকু বাচ্চা মেয়ে।

সত্যি। ওদের মোটর সারাতে দিয়েছে। যখন আসবে তখন সে দেখাবে চালিয়ে।

আর কি গল্প হোল ?

কত গল্প, ওদের অনেক রেকর্ড আছে।

অনেক ?

হুঁ হিসেব নেই এত। আমাকে রোজ যেতে বলেছে।

শুধু তুই যাবি। ও আসবে না ?

আসবে না কেন। নিশ্চই আসবে।

শীলু অবশ্যি এসেছে কালে ভদ্রে। যখনি তার রুনুর সঙ্গে দরকার পড়তো তখনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো, 'রুনু রুনু।' রুনু সব কাজ ফেলে ছুটে যেত। আমি মনে মনে চাইতাম মেয়েটা ঘন ঘন আসুক আমাদের কাছে। তার সাথে গল্প করার খুব ইচ্ছে হোত আমার। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম তার সঙ্গে যদি আলাপ হয় তবে কি বলবো। দু'রাতে তাকে স্বপ্নেও দেখেছি।

একটি স্বপ্নে সে শাড়ী পরে এসে খুব পরিচিত ভঙ্গীতে বসেছে আমার টেবিলে। আমি বললাম

টেবিলে কেন শীলু চেয়ারে বসো।

শীলু হাসতে হাসতে বললো– টেবিলে বসতেই যে আমার ভাল লাগে। হাতে একটা চামুচ নিয়ে টুং টাং করে চায়ের কাপে জলতরঙ্গের মতো একটা বাজনা বাজাতে লাগল সে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখেছি দিনে দুপুরে। অনুরোধের আসর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখলাম শীলু আসলো। আগের মতই শাড়ী পরা। আমি বলছি

'শীলু এত দেরী কেন, কি চমৎকার গান হচ্ছিল।

আমার নামতো শীলা আপনি শীলু ডাকেন কেন।

শীলুর সঙ্গে আমার কথা হোত এই ধরনের, হয়তো বিকেলে বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ শীলু ডাকলো।

শুনুন, একটু রুনুকে ডেকে দেবেন।

বাবা পেঙ্গুইন পাখীর কলমদান দেখে খুব রাগ করলেন। বাবার পয়সা ছিল না বলেই হয়তো অহংকার ছিল। শীলুদের পরিবারকে তাঁর একটুও পছন্দ হোত না। নিজে আজীবন কষ্ট পেয়েছেন অন্যের সুখ সেই কারণেই সহজভাবে নেয়ার মানসিকতা তাঁর ছিল না। প্রথম জীবনে ছিলেন স্কুল মাস্টার। প্রাইভেট স্কুল। মাইনের ঠিক ছিলো না। আমরা সব তার মাইনের উপর নির্ভর করে আছি। মাষ্টারী ছেড়ে ঢুকলেন ফার্মে। বারো বছরে ক্যাশিয়ার থেকে একাউন্টেন্ড হলেন ? মাইনে সাড়ে তিনশ। কলমদানিটা ফিরিয়ে দেবার জন্য বাবা পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু রুনু বা মা কেউ সে নিয়ে আর আগালো না। কলমদানীর পেঙ্গুইন পাখা দুটি ধ্যাণী মূর্তির মত বসে রইল আমার টেবিলে। রাবেয়া শুধু মাঝে মাঝে আমায় বলে 'তোমার টেবিলে রেখেছি বলে এটা তোমার মনে করো না খোকা। আচ্ছা, ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে কলম রেখো।'

ঘুমের ঘোরে রুনু বললো 'না পানি খাবো না।' তারপর আরো খানিকক্ষণ উহুঁ উহুঁ করলো। থানার ঘড়িতে ঢং কলে শব্দ হল একটা। সাড়ে বারো এক কিংবা দেড় যে কোনটা হতে পারে। আমার আরেকটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে। কে যেন বলেছিল সিগারেটের আনন্দটা আসলে সাইকোলজিকেল। তুমি একটা কিছু পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছ তার আনন্দ। অনেকে আবার বলেন, নিঃসঙ্গের সঙ্গী। এই মধ্য রাতে আমি একা জেগে আছি, নিঃসঙ্গত বটেই। সিগারেটের একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম সিনেমায়। সমস্ত পর্দা অন্ধকার। আবছা আলো হলে দেখা গেল বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে কে একজন। চার পাশে কেউ নেই। ভুতুড়ে আবহাওয়া, থম থম করছে অন্ধকার। পর্দায় লেখা হলো 'সেকি নিঃসঙ্গ ? লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো। পর্দায় লেখা হলো 'না নিঃসঙ্গ নয়, এইত তার সঙ্গী' চমৎকার বিজ্ঞাপণ। আমার মনে হয় সিগারেটের নেশার মূল্যের চেয়ে বন্ধুত্বের মূল্য বেশি।

খুট করে দরজা খোলার শব্দ হোল। আমি কান পেতে রইলাম। কে হতে পারে ? বাবা নিশ্চয়ই নন তিনি উঠেন সাড়াশব্দ করে, দরজা খোলেন ধুম-ধাম শব্দ করে। মণ্টু অথবা মাষ্টার চাচা হবেন। টিউবওয়েলে পানি তোলার শব্দ হলো অনেকক্ষণ। ছড় ছড় করে পানি পড়ার আওয়াজ। কুলি করে পানি ছিটাতে ছিটাতে এদিকেই যেন কে আসছে। হ্যাঁ মাষ্টার চাচাই। তাঁর মাঝে মাঝে অনেক রাতে ফুল গাছের কাছে চেয়ার পেতে গুণ গুণ করে গান গাওয়ার শখ আছে। পলা বেঁচে থাকলে প্রথমটায় অপরিচিত জন ভেবে ঘেউ ঘেউ করতো তারপর গরগর করে পরিচিত জনের অভ্যর্থনা। মাষ্টার চাচা বলতেন, 'কিরে পলু তোরও বুঝি ঘুম নেই।' আমি বললাম, 'কে ? মাষ্টার চাচা বললেন,

আমি খোকা।

কি করেন ?

এই বসেছি একটু; যা গরম। তুই ঘুমসনি এখনো ?

জি না।

আসবি না কি বাইরে।

দরজা খুলে বেরুতেই চোখে পড়ল কাকা বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। বললাম, চেয়ারে বসেন। চেয়ার নিয়ে আসি।

না থাক।

আমি তাঁর পাশে বসলাম। গরম কোথায় ? আশ্বিনের শেষাশেষি একটু শীতই করছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। মাষ্টার চাচারও বোধ করি মাঝে মাঝে ইনসমানিয়া হয়। কাকা বললেন,

ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলো। তারপর আর হাজার চেষ্টাতেও ঘুম আসে না।

আমি বললাম,

প্রথম রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গলে এরকম হয়।

কাকা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা মৃদু দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। চাচা খুব নীচু গলায় বললেন,

কি মিষ্টি গন্ধ দেখেছিস ?

জি, ভীষণ গন্ধ।

আমি যখন শিউরিতলা থাকতাম তখন স্কুলে যাওয়ার পথে একটা কাঁঠাল-চাঁপার গাছ পড়তো ভারী গন্ধ।

আমার কাকার কাঁঠাল-চাঁপার গন্ধ বাজে লাগে। বড় বেশী কড়া। কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি। এখন প্রায় দুটো।

আমিও আকাশের দিকে তাকালাম। খুব পরিষ্কার আকাশ। ঝক্ ঝক্ করছে তারা। কাকা বললেন,

দেখেছিস কত তারা ? খুব যখন তারা উঠে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয় শুনেছি।

আমার শীত করছে। তবু বেশ লাগছে বসে থাকতে। মাষ্টার কাকাকে খুব ভালো লাগে আমার। অদ্ভুত মানুষ। বয়সে বাবার সমান। বিয়ে টিয়ে করেননি। এক যুগের বেশী আমাদের সঙ্গে আছেন। যখন পড়তে শিখেছি তখন থেকেই দেখছি তাঁকে। প্রথমে আমাকে পড়াতেন। রাবেয়ার তো পড়াই হলো না। রুনু এখন পড়ে তাঁর কাছে। বাড়ীতে তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন নেই তাঁর। থাকলেও যাবার উৎসাহ পান না। বহুদিন এক সঙ্গে থেকে পরিবার ভুক্তই হয়ে গেছেন। অবসর সময় কাটে এষ্ট্রলজীর বই পড়ে। অংকের মাষ্টার হিসেবে এসট্রলজী হয়তো ভালই বুঝেন। মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে বই এনে পড়ি আমি। বিশ্বাস হয়তো করি না কিন্তু পড়তে ভালো লাগে। আমি জেনেছি মীন রাশিতে আমার জন্ম। মীন রাশির লোক দার্শনিক আর ভাগ্যবান হয়। তাদের জীবন চমৎকার অভিজ্ঞতার জীবন। প্রচুর সুখ, সম্পদ বৈভব। বেশ লাগে ভাবতে। কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

ঐযে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখছো না ? ওর ডান দিকের ছোট্ট তারাটি হোল কেতু। বড় মারাত্মক গ্রহ। আমার জন্মলগ্নে কেতুর দশা চলছিল।

জানিনা হয়তো জন্মলগ্নে কেতুর দশা থাকলেই আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়। গভীর রাতে অনিদ্র তপ্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাগ্য নিয়ন্তা গ্রহগুলি পরখ করতে হয়। কাকাকে আমার ভাল লাগে। তার ভিতরের প্রচণ্ড জানবার আগ্রহটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সামান্য বেতনের সবটা দিয়ে এসট্রলজীর বই কিনে আনেন। দেশ বিদেশের কথা পড়েন। মাঝে মাঝে বেড়াতে যান অপরিচিত সব জায়গায়। কোথায় কোন জঙ্গলে পড়ে আছে ভাঙ্গা মন্দির একটি, কোথায় বাদশা বাবরের আমলে তৈরী গেটের ধ্বংসাবশেষ। সামান্য স্কুল মাষ্টারের পড়াশুনার গণ্ডী আর উৎসাহ এত বহুমুখী হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি মানুষ হিসেবে তত মিশুক নন। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি রকমের। কোনদিন মায়ের সঙ্গে মুখ তোলে কথা বলতে দেখিনি। খালি গায় ঘরোয়া ভাবে ঘরে বসে রয়েছেন এমনও নজরে আসেনি।

স্কুলে কাকা আমাদের ইতিহাস আর পাটীগণিত পড়াতেন। ইতিহাস আমার একটুও ভালো লাগতো না। নিজের নাম হুমায়ুন বলেই বাদশা হুমায়ুনের প্রতি আমার বাড়াবাড়ি রকমের দরদ ছিল। অথচ আমাদের ইতিহাস বই-এ ফলাও করে শেরশাহর সঙ্গে তাঁর পরাজয়ের কথা লেখা। শেরশাহ আবার এমনি লোক যে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড করিয়েছে, ঘোড়ার পিঠে ডাক চালু করিয়েছে কিন্তু এত করেও ক্লাস সেভেনের একটি বাচ্চা ছেলের মন জয় করতে পারেনি। পরীক্ষার খাতায় তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে আমার বড় রকমের গ্লানি বোধ হতো। সেই থেকেই সমস্ত ইতিহাসের উপরই আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কাকা তা জানতেন। একদিন আমায় বললেন, 'খোকা, তোর প্রিয় বাদশা হুমায়ুনের কথা বলবো তোকে, বিকেলে ঘরে আসিস।'

সেই দিনটি আমার খুব মনে আছে। কাকা আধশোয়া হয়ে তাঁর বিছানায়, আমি পাশে বসে, রুনু আর মণ্টু সেই ঘরেই বসে বসে লুডু খেলছে। কাকা বলে চলেছেন, 'হুমায়ুন সম্পর্কে কে একজন ছোট একটি বই লিখেছিলেন 'হুমায়ুন নামা'। বইটিতে হুমায়ুনকে তিনি বলেছেন

দুর্ভাগ্যের অসহায় বাদশা। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্যবান বাদশা হতে পারলে আমি বিশ্ববিজয়ী সিজার কিংবা মহাযোদ্ধা নেপোলীয়ানও হতে চাই না। যুদ্ধ বন্ধ রেখে চিতোরের রাণীর ডাকে তাঁর চিতোর অভিমুখে যাত্রা, ভিসতিওয়ালাকে সিংহাসনে বসানোর পিছনে কৃতজ্ঞতার অপরূপ প্রকাশ। গান, বই আর ধর্মের প্রতি কি আকর্ষণ।' আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। যেখানে আযান শুনে হুমায়ুন লাইব্রেরী থেকে দ্রুত নেমে আসছেন নামাজে সামিল হতে, নামতে গিয়া পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন, সে জায়গায় আমার চোখ ছল ছল করে উঠলো। কাকা বললেন বড় হৃদয়বান বাদশা, সত্যিকার কবি হৃদয় তাঁর। আমার মনে হোল আমিই যেন সেই বাদশা। আর আমাকে বাদশা বানানোর কৃতিত্বটা কাকার একার।

আজ এই আশ্বিনের মধ্যরাত্রি কাকা বসে আছেন ঠাণ্ডা মেঝেতে অল্প অল্প শীতের বাতাস বইছে। জোছনা ফিকে হয়ে এসেছে। এখনি হয়তো চাঁদ ডুবে চারিদিক অন্ধকার হবে। আমার সেই পুরানো কথা মনে পড়লো। আমি ডাকলাম।

চাচা, চাচা।

কি ?

অনেক রাত হয়েছে ঘুমুতে যান।

যাই।

কাকা মন্থর পায়ে চলে গেলেন। আমি এসে শুয়ে পড়লাম। রাবেয়া ঘুমের মধ্যেই চ্যাচাল, 'আম্মি আম্মি'

আমার মনে পড়ল রাবেয়া একদিন হারিয়ে গিয়েছিল। চৈত্র মাস। দারুন গরম। কলেজ থেকে এসে শুনি রাবেয়া নেই। তার যাবার জায়গা সীমিত। অল্প কয়েকটি ঘর বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায় সে। দুপুরের খাবারের আগে আসে। খেয়ে দেয়ে অল্প কিছুক্ষণের ঘুম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়া। যেদিন সন্ধ্যা উৎরেছে রাবেয়া আসেনি। মার কান্না প্রায় বিলাপে পৌঁছেছে। মণ্টু দুপুর থেকেই খুঁজছে। বাবা হতবুদ্ধি। একটি অপ্রকৃতিস্থ সুন্দরী যুবতী মেয়ের হারিয়ে যাওয়াটা অনেক কারণেই বেদানাদায়ক। আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাকে কি আবার ফিরে পাওয়া যাবে ? রুনু চুপচাপ শুয়ে আছে তার বিছানায়। তার দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিটা বড় নীরব। এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা রুনুর ছোট্ট শরীরটা একটা অসহায়তারই প্রতীক। আমায় দেখে রুনু উঠে বসলো। বললো

কি হবে দাদা ?

তার চোখের কোণে চব্বিশ ঘণ্টাতেই কালি পড়েছে। আমি বলাম পাওয়া যাবে রুনু, ভয় কি ?

কিন্তু ওযে ঠিকানা জানে না। কেউ যদি ওকে খুঁজে পায় ওকি কিছু বলতে পারবে ?

সে কিছুই বলতে পারবে না। তার বড় বড় চোখে সে হয়তো অসহায়ের মত তাকাবে। মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট খুকীর মত শুধুই বলবে, 'আমি বাড়ী যাব। আমি বাড়ী যাব। সে বাড়ী যে কোথায় তা তার জানা নেই। রুনু আবার বললো দাদা ও যদি কোন বাজে লোকের হাতে পড়ে ?

রুনু বুঝতে শিখেছে। মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয় ছেলেদেরও আগে। তারা তাদের কচি চোখেও পৃথিবীর নোংরামী দেখতে পার। সে নোংরামীর বড় শিকার তারাই তাই প্রকৃতি তাদের কাছে অন্ধকারের খবর পাঠায় অনেক আগেই।

রাবেয়া ফিরে এলো রাত আটটায়। সঙ্গে মাষ্টার চাচা। বুকের উপর চেপে বসা দুশ্চিন্তা নিমিষেই দুর হলো। মাষ্টার কাকা বললেন 'ওকে আমি স্কুলের কাছে পাই, হারিয়ে গেছে তা আমি জানতাম না। এসব শুনবার উৎসাহ আমার ছিল না। পাওয়া গেছে এই যথেষ্ট। স্কুল ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। মাষ্টারচাচাকে দেখে দৌড়ে রাস্তা পার হলো, আরেকটু হলেই গাড়ী চাপা পড়ত— এসবে এখন আর আমাদের উৎসাহ নেই। বাবা পর পর দুদিন রোজা রাখলেন। তিনি রোজা মানত করেছিলেন।

খোকা ও খোকা।

কি ?

বাতি জ্বালো

কেন ?

আমার বাথরুম পেয়েছে ?

রাবেয়া মশারীর ভেতর থেকে বেড়িয়ে এলো। আমি বললাম বাতি জ্বালাতে হবে না আয় বারান্দায় আলো আছে।

না জ্বালো।

দেশলাই খুঁজে হারিকেন জ্বালালাম। দরজা খুলতেই ও ঘর থেকে মা বললে 'কে ?' শেষ রাতের দিকে মায়ের ঘুম পাতলা হয়ে আসে।

আমরা মা, রাবেয়া বাথরুমে যাবে।

বারান্দায় এসে রাবেয়া হাই তুললো। বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বললো

কি চনমনে গন্ধ ফুলের, না ?

হুঁ। ফুলের গন্ধ তোর ভাল লাগে রাবেয়া ?

না বাজে।

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললো

পলা কবে আসবে খোকা ?

পলার সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। মাঝে মাঝেই পলার কথা জানতে চায়। কে জানে কুকুরটা যে কিসের দুঃখে বিবাগী হলো।

আজ রাতেও এক ফোটা ঘুম হবে না। দু'মাস পরেই পরীক্ষা। এক রাত্রি ঘুম না হলে পর পর দুদিন পড়া হয় না। বুঝতে পারছি কোন ফাঁকে মশা ঢুকেছে কয়েকটা। কেবলি গুন গুন করছে কানের কাছে। কান অথবা মুখের নরোম মাংস থেকে এক ঢোক করে রক্ত না খাওয়া পর্যন্ত এ চলতেই থাকবে। পাখা করে মশা তাড়াবার ইচ্ছে হচ্ছে না। বালিশে মাথা গুজে ঘুমের জন্যে প্রাণপনে আমার সমস্ত ভাবনা গুলিয়ে ফেলতে চাইলাম।

হঠাৎ করেই অনেকটা আলো এসে পড়লো ঘরে। শিলুদের বারান্দার একশ' ওয়াটের বালবটা জ্বালিয়েছে কেউ। কে হতে পারে ? শিলুর বাবা না নাহার ভাবী ? শীলু কিংবা তার মাও হতে পারে। শীলুর মা চমৎকার মেয়ে। একবার এসেছিলেন আমাদের ঘরে।

শীলুর মা যিনি সন্ধ্যায় লনে বসে শীলুর বাবার সঙ্গে হেসে হেসে চা খান, বিকেলে প্রায়ই হারুন ভাই-এর পার্টনার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যাডমিনটন খেলেন, যার একটি গাঢ় সবুজ শাড়ী আছে, যেটি পড়লে তাঁর বয়স দশ বৎসর কম মনে হয়, তিনি একদিন এসেছিলেন আমাদের

বাসায়। সেদিন ছিল শুক্রবার। রুনুর স্কুল বন্ধ ছিল, বাবা ছিলেন অফিসে। শীলুর মা লাল বুটি দেয়া হালকা নীল শাড়ী পড়েছিলেন। সোনালি ফ্রেমের চশমায় তাকে কলেজের মেয়ে-প্রফেসরের মতো দেখাচ্ছিল। আমার মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কি করে যত্ন করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আর শিলুর মা ? তিনি মুর্তির মতো অনেকক্ষণ বসে থেকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি থেমে থেমে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বসেছিলেন,

হারুনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে রাবেয়াকে বিয়ে করতে চায়।

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। তিনি বলে চল্লেন, আপনার মেয়েকে পাঠাবেন না আমার ওখানে। কি করে সে ছেলের মন ভুলিয়েছে। মাথার ঠিক নেই একটা মেয়ে। ছিঃ।

মা লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন।

রাবেয়া অকারণে মার খেলো সে দিন। সব শুনে বাবার মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। কেন সে যাবে হ্যাংলার মতো ? রাগলে বাবার মাথার ঠিক থাকে না। বয়স্ক আধপাগল একটা মেয়েকে তিনি উন্মাদের মতই মারলেন। রাবেয়া শুধু বলছিলো,

আমি আর করবো না। মারছো কেন ? বললামতো আর করবো না।

কি জন্যে মার খাচ্ছিল তা সে নিশ্চয়ই বুঝছিলো না। বার বার তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। মা নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। আর আশ্চর্য, কান্না শুনে প্রথম বারের মতো হারুন ভাই আসলেন আমাদের বাসায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অল্প অল্প কাঁপছিলেন।

তাঁর চোখ লাল। তিনি থেমে থেমে বললেন,

ওকে মারছেন কেন ?

বাবা তাকালেন হারুন ভাই-এর দিকে। আমিও ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম। হঠাৎ তাঁর আমাদের এখানে আসা আমাদের ঠাট্টা করার মতই মনে হলো। রাবেয়া বললো,

দেখুন না আমাকে মারছে শুধু শুধু।

হারুন ভাই-এর ফ্যাকাসে মুখে আমি স্পষ্ট গভীর বেদনার ছায়া দেখেছিলাম। তবু কঠিন গলায় বললাম,

আপনি বাসায় যান। আপনি এসেছেন কেন ?

শীলুদের বাসার জানালায় শীলু আর তার মা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন।

রাবেয়াকে ক'দিন চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হলো। তার দরকার ছিলো না। হারুন ভাই-এর বিয়ে হলো নাহার ভাবীর সঙ্গে। তার খালাতো বোন, হোম ইকনমিক্সে বি, এ, পড়তেন। হারুন ভাই জার্মানী চলে গেলেন কেমিকেল ইনজিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী নিতে। আগেই সব ঠিক হয়েছিল।

নাহার ভাবী সমস্তই জেনেছিলেন। বিয়ের সাত দিন না পেরুতেই তিনি আমাদের বাসায় এসে সবার সঙ্গে গল্প করলেন। রাবেয়াকে নিয়ে গেলেন তাদের বাসায়। রাবেয়া হাতে হলুদ রঙের একটা প্যাকেট নিয়ে হাসতে হাসতে বাসায় ফিরলো।

মা দ্যাখো এই মেয়েটি আমায় কি সুন্দর একটা শাড়ী দিয়েছে। আমি চাইনি ও আপনি দিলে।

রাবেয়া নীল রঙের একটা শাড়ী আমাদের সামনে মেলে ধরলো। চমৎকার রং। অদ্ভুত সুন্দর।

কাক ডাকলো। ভোর হচ্ছে বুঝি। কোমল একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আযান হলো। মাঠের ওপারে ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছের জমাট বাঁধা অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। বাঁশের বেড়ার উপর হাত রেখে নাহার ভাবী খালি পায়ে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। খুব সকালে ঘুম ভাঙ্গতো তার! আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন অল্প, বললেন, 'আজ দেখি খুব ভোরে উঠেছেন।

আমি চুপ করে রইলাম, হ্যাঁ বাচক মাথা নাড়লাম একটু।

নাহার ভাবী বললেন,

রাতে আপনার গান বাজিয়েছিলাম। শুনেছেন ?

জি শুনেছি।

রুনুর পছন্দ করা গান। সেই সাজিয়ে দিয়েছিল। রুনু ঘুমুচ্ছে এখনো ?

জি।

ডেকে দিন একটু খালি পায়ে বেড়াবে শিশিরের উপর। চোখ ভালো থাকে।

রুনু রাবেয়ার গলা জড়িয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আমি ডাকলাম, রুনু রুনু।

কদিন ধরেই দেখছি মা কেমন যেন বিমর্ষ। বড় ধরনের কোন রোগ সারবার পর যেমন সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছায়া পড়ে তেমনি। বয়স হয়েছে ভাঙ্গা চাকার সংসার টেনে নিতে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন দেহ মন শ্রান্ত তো হবেই। তবু তাঁর এমন অসহায় ভাবটা আমার ভালো লাগে না। খুব শীগগীরই হয়তো আমি একটি ভালো চাকরি পাবো। আমি সবাইকে পরিপূর্ণ সুখী দেখতে চাই। মাকে নিয়ে একবার সীতাকুণ্ড বেড়াতে যাবো। কলেজে যখন পড়ি তখন ক'বন্ধুকে নিয়ে একবার গিয়েছিলাম। এত সুন্দর এত আশ্চর্য। চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে দূরের সমুদ্র দেখা যায়। মা নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠতে পারবেন না। মা আর বাবাকে নীচে রেখে আমরা সবাই উপরে উঠবো। বাবাও হয়তো উঠতে চাইবেন। ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে উঠতে পারলে সূর্যাস্ত দেখা যাবে। রেকর্ড প্লেয়ার নেবো অনেক রেকর্ডও নিয়ে যাবো।

খোকা ও খোকা।

কি মা ?

কিছু না গল্প করি তোর সাথে, আয়।

বসেন, সারাদিন তো কাজ নিয়েই থাকেন।

কই আর কাজ।

আপনার স্বাস্থ্য খুব ভেঙ্গে গেছে মা।

আর স্বাস্থ্য।

মা বসলেন আমার সামনে। তাঁর চোখের কোণে গাঢ় কালি পড়েছে। তিনি থেমে থেমে বললেন, কাল রাতেও আমার ঘুম হয় নি খোকা।

আমায় ডাকলেন না কেন ওষুধ ছিলো তো আমার কাছে।

দুবার ডেকেছি, তুই ঘুমুচ্ছিলি।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আমার খুব ঘুম বেড়েছে দেখছি। সকাল নটা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ি, উঠি পরদিন আটটায়। মা বললেন, রাবেয়াকে নিয়ে তোর বড় খালার কাছে একবার যাবো।

হঠাৎ কি ব্যাপার ?

এম্নি ঘুরে আসি একটু।

কোন পীরের খোঁজ পেয়েছেন বুঝি ?

মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আমি দেখলাম মার নাকের পাতলা চামড়া তির তির করে কাঁপছে। মাকে আমার হঠাৎ খুব ছেলে মানুষ মনে হলো। বললাম,

রাত দিন কি এতো ভাবেন ?

কই কিছু ভাবি না তো। চা খাবি এক কাপ ?

এই দুপুরে ?

খা না। আগেতো খুব চা চাইতি।

মা উঠে চলে গেলেন। মার ভিতর একটা স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। শরীর সুস্থ নয় নিশ্চয়। মাকে একজন বড় ডাক্তার দেখালে হতো।

রুনুর স্কুল ছুটি হয় সাড়ে চারটায়। আজ সে দুপুরেই হাযির। হাসতে হাসতে বললো, স্কুল ছুটি হয়ে গেলো দাদা।

সকাল সকাল যে ? কি ব্যাপার ?

মর্নিং স্কুল আজ থেকে। সকাল সাতটায় স্কুলে গেলাম। তুমি তো তখন ঘুমে। বাব্বাহ্ এত ঘুমুতেও পারো।

মা চা নিয়ে ঢুকলেন। রুনু বললো,

আমার এককাপ দাওনা মা।

আরেকটা কাপ এনে ভাগ করে নে।

না তা হলে থাক। দাদা খাক।

আহা নে না।

রুনু চা নিয়ে বসলো একপাশে। চুমুক দিতে দিতে কি ভেবে হাসলো খানিকক্ষণ। বললো মা ক্ষিধে পেয়েছে, কি রান্না মা আজকে ?

মাছ। ক্ষিধে নিয়ে চা খেতে আছে ?

ওতে কিছু হয় না মা। আচ্ছা আপাকে দেখলাম বাবার সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছে। কোথায় ?

কি জানি কোথায়। তোর আম কাঁঠালের বন্ধ কবে রুনু ?

দেরী আছে সামনের মাসের পনেরো তারিখ থেকে।

আমি তোর খালার বাসায় যাবো বেড়াতে। তুই তাহলে থাকবি।

সে কি তোমার সঙ্গে কে কে যাবে মা ?

আমি, রাবেয়া আর তোর আব্বা।

বেশতো। আমি বুঝি বাতিল ?

রুনুর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম সবাই। রুনু আমার দিকে তাকিয়ে বললো, দাদা তোমার চাকরি হলে আমায় নিয়ে বেড়াতে যাবে ?

নিশ্চয়ই।

আমি কিন্তু কক্সবাজার যাবো। শীলুরা গিয়েছিলো গতবার।

বেশতো।

আর যে দিন প্রথম বেতন পাবে সেদিন।

সেদিন কি রুনু ?

সেদিন আমাকে দশটা টাকা দিতে হবে। দেবে তো ?

হ্যাঁ, কি করবি ?

এখন বলবো না।

রুনু লম্বা হয়েছে একটু, চোখের তারাও যেন মনে হয় আরো গভীর কালো। চাঞ্চল্যও এসেছে একটু। সেদিন দেখলাম অনেকক্ষণ ধরেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল। সেকি বুঝতে পারছে তার চোখের পাতায়, তার হলুদ গালে, বরফি কাটা মসৃন চিবুকে রূপের বন্যা নামছে। প্রথম বেতন পেলে রুনুকে একটা চমৎকার শাড়ী কিনে দেবো আমি। সবুজ জমিনের উপর সাদা ফুলের নকশা। রোল নাম্বার থার্টিন পরতো দেখতাম।

বাবা নামলেন রিকশা থেকে। রাবেয়া ধীরে সুস্থে নামলো। মুখ কালো করে বললো, মা ডাক্তার আমাকে বেশী পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন শুধু বিশ্রাম। তাই না বাবা ?

বাবা মার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, এখন কি করবে ?

ব্যাপারটা আমি জানলাম, রুনু জানলো, মন্টু, ফুটবল ম্যাচ খেলতে বাইরে গেছে শুধু সেই জানলো না। রাবেয়ার নির্বিকার ঘুরে বেড়ানোর ফল ফলেছে। ডাক্তার তাকে পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন রাবেয়ার প্রয়োজন শুধু বিশ্রাম।

রাবেয়ার মাথার ঠিক নেই। ছোটবেলা থেকেই সে ঘুরে বেড়াতো চারিদিকে। সব বাড়ী ঘরই তার চেনা। চাচা খালু দাদা বলে ডাকে আশে পাশের মানুষদের। তাদের ভিতর থেকেই কেউ তাকে ডেকে নিয়েছে। এমন একটি মেয়েকে প্রলুব্ধ করতে কি লাগে ? মার রাত্রে ঘুম হয় না। তাঁর চোখের নীচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। রুনু আর শীলুদের বাসায় গান শুনতে যায় না। নাহার ভাবী বেড়াতে এসে বলেন, 'কি ব্যাপার তোমরা কেউ দেখি আমাদের এখানে যাও না, রাবেয়া পর্যন্ত না।

রুনু কথা বলে না। মা নীচু গলায় বলেন, 'রাবেয়ার অসুখ করেছে মা।'

কি অসুখ, কই জানি না তো!

এম্নি শরীর খারাপ।

বলতে গিয়ে মায়ের কথা বেঁধে যায়। অসহায়ের মতো তাকান।

ব্যাপারটার উৎস রাবেয়ার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করলাম আমি। সন্ধ্যায় যখন রুনু মাষ্টার চাচার কাছে পড়তে যায়, ঘরে থাকি আমি আর রাবেয়া তখনই আমি কথা শুরু করি।

রাবেয়া।

কি ?

কোথায় কোথায় বেড়াতে যাস তুই ?

কত জায়গায়। চেনা বাড়িতে।

খুব ভালো লাগে ?

হুঁ!

কাকে কাকে ভালো লাগে ?

সবাইকে।

ছেলেদের ভালো লাগে ?

হুঁ।

নাম বল তাদের।

এক ধারসে নাম বলে চলে সে। তাদের কাউকেই সন্দেহভাজন মনে হয় না আমার। সবাই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে। রাবেয়াকে বড় আপা ডাকে।

তারা তোকে আদর করে রাবেয়া ?

হুঁ।

কি করে আদর করে ?

আমার সঙ্গে খেলে, আর

আর কি ?

গল্প করে।

কিসের গল্প ?

ভূতের।

ইতস্ততঃ করে বলি, 'তোকে কেউ চুমু খেয়েছে রাবেয়া ?'

যাহ! তাই বুঝি খায় ?

মার কথাগুলি হয় আরো স্পষ্ট, আরো খোলামেলা। আমার লজ্জা করে। মা আদুরে গলায় বলেন,

রাবেয়া কে তোর শাড়ী খুলেছিলো ? বলতো নাম।

ধাও মা, তুমি তো ভারী।

মা রেগে যান। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'তাহলে এমন হলো কেন ? বল তুই হারামজাদী ?

রাবেয়া বলে না কিছু, মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। রাবেয়া বড় বড় চোখে তাকায়। বলে, কাঁদো কেন মা ?

বল কার সঙ্গে তুই শুয়েছিলি ?

রাবেয়া চুপ করে থাকে। কথাই হয়তো বুঝতে পারে না। বাবা পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন। মেজাজ হয়েছে খিট খিটে। অল্পতেই রেগে বাড়ী মাথায় তুলছেন। রুনু স্কুল থেকে ফিরতে দেরী করেছে বলে মার খেলো সেদিন। একদিন দেখি বাবা এক গণক নিয়ে এসেছেন। পাড়ার সব যুবকদের নাম লিখে কি সব মন্ত্র পড়ছে সে।

রাবেয়ার অসুখের প্রত্যক্ষ চিহ্ন ধরা পড়ল একদিন ভোরে। চা খেয়েই ওয়াক ওয়াক করে বমি করলো সে। যদিও তার শারীরীক অস্বাভাবিকতা নজরে আসার সময় এখনো হয়নি তবু তার শরীরে আলগা শ্রী আসছিলো। একটু চাপা গাল ভরাট হয়ে উঠেছে, চোখের ভুরু মনে হচ্ছে আরো কালো, চোখ হয়েছে উজ্জ্বল চলা-ফেরায় এসেছে এক স্বাভাবিক মন্থরতা। স্কুলের হেডমাষ্টারের বউ একদিন বেড়াতে এসে বললেন,

দেখো ও বউ, তোমার মেয়ে হাঁটছে, ঠিক যেন পোয়াতী। কথাগুলি আমার বুকে ধ্বক করে বিঁধেছে। কিছু একটা করতে হবে এবং খুব শিগগীরই। সবার জানবার ও বুঝবার আগে। একটি

করে দিন যাচ্ছে, অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সবাই। কিন্তু কি করা যায় ? বাবা নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছেন। একবার ইচ্ছে হয় তাঁকে জিজ্ঞেস করি কিন্তু সাহসে কুলোয় না। বাবাকে বড় ভয় করি আমরা।

সেদিন রাতে শুনলাম বাবা চাপা কণ্ঠে বলছেন, 'বিষ খাইয়ে মেরে ফেলো মেয়েকে।' মা বললেন 'ছিঃ ছিঃ বাপ হয়ে এই কথা বললে ?' বাবা বিড় বিড় করে বললেন, 'আমার মাথার ঠিক নেই শানু, তুমি কিছু মনে করো না, পাগল মেয়ে আমার।' বাবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনলাম।

অনেক রাত অবধি ঘুম হলো না আমার। এক সময় রাবেয়া ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো। কাতর গলায় বললো,

খোকা ?

কি ? বাথরুমে যাবি ?

উহুঁ।

কি হয়েছে ? খারাপ লাগছে ?

হ্যাঁ।

বমি করবি ?

না।

স্বপ্ন দেখেছিস ?

হুঁ।

কি স্বপ্ন ?

মনে নেই।

ঘুমিয়ে পড়, ভালো লাগবে।

আচ্ছা।

রাবেয়া শুয়ে পড়লো আবার। মুহূর্তেই উঠে বসে বললো,

খোকা।

কি ?

পলা এসেছে।

কে এসেছে ?

পলা, দোর খোলে দ্যাখ। বারান্দায় বসে আছে। আমি ডাক শুনলাম!

দরজা খুলে বেড়িয়ে আসলাম দু'জনেই। কোথায় কি ? খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক। রাবেয়া ডাকলো, পলা, পলা।

মা বললেন, 'কে কথা বলে ?'

আমি রাবেয়া মা।

বাবা ধমকে উঠলেন 'যাও যাও ঘুমুতে যাও। কি কর এত রাত্রে ?'

শব্দ শুনে মাষ্টার চাচা বাইরে আসেন।

কি হয়েছে খোকা ?

রাবেয়া বলে, 'পলাকে ডাকছিলাম কাকা।'

যাও শুয়ে পড়, পলা কোত্থেকে আসবে এত রাত্তিরে ?

শুতে শুতে রাবেয়া বললো, 'খোকা পলাকে একটা চামড়ার ব্যাল্ট কিনে দিবে ? গলায় বেঁধে দেবো।

আচ্ছা।

আর একটা লম্বা শিকল কিনে দেবে ?

দোব।

আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেবে ?

কি জিনিস ?

নাম মনে নেই আমার। দেবে তো ?

আচ্ছা দোব।

কবে ? কাল ?

না চাকরী হোক আগে।

বাবা বলে উঠলেন, 'কি ভ্যাজর ভ্যাজর করছিস তোরা ? ঘুমো। সারাদিন খেটে এসে শুই তাও যদি শান্তি পাওয়া যায়।

বহু আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটি আসলো। সরকারি সিল থাকা সত্ত্বেও কিছুই বুঝতে পারিনি। আর দশটা খাম যেমন খুলি তেমনি আড়াআড়ি খুলে ফেললাম। আমাকে তারা ডাকছেন। রসায়নশাস্ত্রের লেকচারারশীপ পেয়েছি একটি কলেজে। প্রাথমিক বেতন ৪৫০ টাকা ইয়ারলি ২৫ টাকা ইনক্রিমেন্ট। লেখাগুলি কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছিল। খুব খুশী হয়েছি এমন একটা অনুভূতি আসছিলো না। অথচ আমি সত্যি খুশী হয়েছি এবং আমি সবাইকে সুখী করতে চাই। সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাই, রুনুকে গাঢ় সবুজ একটি শাড়ী দিতে চাই, রোলনং তেরো এর গায়ে যেমন দেখেছি। এখন হয়তো সমস্তই আমার মুঠোয় তবু সেই অগাধ সুখ, সমস্ত শরীর জুড়ে উন্মাদ আনন্দ কই ? আমরা বহু কষ্ট পেয়ে মানুষ হয়েছি। আমাদের ছেলেমানুষি কোন সাধ কোন বাসনা আমার বাবা মা মিটাতে পারেন নি। আমাদের বাসনা তাদের দুঃখই দিয়েছে। আজ আমি সমস্ত বেদনায় সমস্ত দুঃখে শান্তির প্রলেপ জুড়োব। আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছি, শক্তিমান দৈত্যটা হাতের মুঠোয়। মা আমার চাকরি হয়েছে।

মা দৌড়ে এলেন। বহুদিন পর তাঁর চোখ আনন্দে ছল ছল করে উঠলো। বললেন, দেখি। আমি চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম। মা পড়তে জানেন না তবু উল্টে পাল্টে দেখলেন সেটি। এমন ভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন যেন খুব একটা দামী জিনিস হাতে। মা বললেন,

বেতন কতরে ?

সাড়ে চারশ।

বলিস কি এতো ?

আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললাম 'বেশী আর কোথায় ?' বলেই আমি লজ্জা পেলাম। ভালো করেই জানি টাকাটা আমার কাছে অনেক বেশী। মা বললেন,

এবার বিয়ে করাবো তোকে।

কি যে বলেন।

বেশ একটি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে আনতে হবে। রূপবতী কিন্তু সাধাসিধা নাহার মেয়েটির মতো।

মা কল্পনায় সুখের সাগরে ডুব দিলেন।

শহরে তুই বাসা করবি ?

তাতো করতেই হবে।

বেশ হবে মাঝে মাঝে তোর কাছে গিয়ে থাকবো।

মাঝে মাঝে কেন সব সময় থাকবেন।

নারে বাপু সংসার ফেলে যাবো না।

মা ছেলে মানুষের মতো হাসলেন। আমি বললাম,

প্রথম বেতনের টাকায় আপনাকে কি দেবো মা ?

তোর বাবাকে একটা কোট কিনে দিস, আগেরটি পোকায় নষ্ট করেছে।

বাবারটাতো বাবাকেই দেবো, আপনাকে কি ?

মা রহস্য করে বললেন,

আমায় একটা টুকটুকে বউ এনে দে।

মাষ্টার চাচাও খবর শুনে খুব খুশী হলেন। তার খুশী সব সময়ই মৌন। এবার একটু বাড়াবাড়ি ধরণের আনন্দ করলেন। নিজের টাকায় প্রচুর মিষ্টি কিনে আনলেন। অনেক মিষ্টি যার যত ইচ্ছে খাও। কাকা বললেন, 'সুখ আসতে শুরু করলে সুখের বান ডেকে যায়। দেখো খোকা কত সুখ হবে তোমার।

রুনু স্কুল থেকে এসে বললো,

দাদা তোমার নাকি বিয়ে ?

কে বলেছে রে ?

মা, হি হি।

খুব হি হি না ? তোকে বিয়ে দিয়ে দি যদি ?

যাও খালি ঠাট্টা। কাকে তুমি বিয়ে করবে দাদা ?

দেখি ভেবে।

আমি জানি কার কথা ভাবছো।

কার কথা ?

শীলার কথা নয় ?

পাগল তুই।

অবহেলায় উড়িয়ে দিলেও বুঝতে পারছি আমার কান লাল হয়ে উঠেছে। অস্বস্তি বাধ করছি। শীলুকে কেন যে হঠাৎ ভালো লাগলো। যতবার তাকে দেখি ততবার বুক ধ্বক করে উঠে। একটা আশ্চর্য সুখের মতো ব্যথা অনুভব করি। সমস্ত শরীর জুড়ে শীলু শীলু বলে কারা বুঝি চ্যাচায়। আমি একটু হেসে বলি,

কে ভাবে তোর শীলুর কথা ?

না এমনি বলছিলাম, বড় ভালো মেয়ে শীলু।

হুঁ। তুই কাকে বিয়ে করবি রুনু ?

যাও দাদা ভাল হবে না বলছি।

আমার একজন বন্ধু আছে, খুব ভালো ছেলে...

দাদা আমি কিন্তু কেঁদে ফেলবো এবার।

আনন্দ অনুষ্ঠান থেকে মণ্টু বাদ পড়লো। বড় নানার বাড়ি গিয়েছে সে আগামী কাল আসবে। বাবা আসলেন রাত ন'টার দিকে। মা খবরটা না দিয়ে মিষ্টি খেতে দিলেন বাবাকে। মিষ্টি কিসের?

আছে একটা ব্যাপার।

বাবা আধখানা মিষ্টি খেলেন ব্যাপার জানার জন্যে উৎসাহ দেখালেন না। মা নিজের থেকেই বললেন, 'খোকার চাকুরি হয়েছে সাড়ে চারশ' টাকা মাইনে।' বাবা খুশী হলেন। থেমে থেমে বললেন,

ভালো হয়েছে। আমি চাকরি ছেড়ে দেবো এবার। বয়স হয়েছে আর পারি না। রাবেয়া, রাবেয়া কোথায়?

ঘুমিয়েছে শরীর খারাপ।

ভাত খায় নি তো?

না একটা মিষ্টি খেয়েছে শুধু।

আহ্ বললাম খালিপেটে রাখতে মিষ্টিইবা কেন দিলে।

সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম সেদিন। রাত ১টার দিকে মা পাগলের মত ডাকলেন, 'খোকা ও খোকা শীগগীর উঠ। ও খোকা খোকা।' খুব ছোটবেলায় গভীর রাতে একবার মা এমন ব্যাকুল হয়ে ডাকছিলেন। ভূমিকম্প হচ্ছিল তখন। আমাদের বাসা থেকে চল্লিশ গজের ভিতর নন্দী সাহেবদের ছেড়ে যাওয়া পুরানো বাড়ী ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল। আজকের এই গভীর রাতে মায়ের আতঙ্কিত ডাক আমাকে ভূমিকম্পের কথা মনে করিয়ে দিল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাড়াতেই মা বললেন,

আয় আমার ঘরে, আয় তাড়াতাড়ি।

কি হয়েছে?

মা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। দরোজা খোলা, চোখে পড়লো মায়ের বিছানায় রাবেয়া শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে বাবা গরুর মতো চোখে তাকিয়ে আছেন। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। এবোরশন নাকি? কাকে দিয়ে কি করালেন? নাকি নিজে নিজেই কিছু খাইয়ে দিয়েছেন? বাবা ধরা ধরা গলায় বললেন, 'খোকা তুই মাথায় একটু হাওয়া কর আমি একজন বড় ডাক্তার নিয়ে আসি। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।'

ডাক্তার আসলেন একজন! গম্ভীর হয়ে ইনজেকশন করলেন। বললেন, 'আপনার মেয়েকে আমি চিনি। এরকম হয়েছিল আমাকে বলেন নি কেন? হাতুড়ে ওষুধ দিয়ে মেয়েকে মেরে ফেলতে চান? বাবা ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'বড় দুঃখী মেয়ে, মেয়েটাকে আপনি বাঁচান ডাক্তার।'

ডাক্তার সেন্টিমেন্টের ধার দিয়েও গেলেন না। এক গাদা অষুধ দিয়ে গেলেন। সকালে আরো দুটো ইনজেকশন করতে বললেন। দশটার দিকে তিনি আসবেন।

বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কেউ জানবে নাতো ডাক্তার? ডাক্তার বললেন, 'মান ইজ্জত পরের ব্যাপার আগে মেয়ে বাঁচুক।

রাবেয়া চিঁ চিঁ করে বললো,

মা আমার কি হয়েছে ?

কিছু হয়নি সেরে যাবে চুপ করে শুয়ে থাকো।

বুকটা খালি খালি লাগছে কেন ?

সেরে যাবে মা, দুধ খাবে একটু ?

না।

আমি আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়েছিলাম। ঘরে লম্বা লম্বি একটা ছায়া পড়লো। তাকিয়ে দেখি মাষ্টার চাচা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। একটু কাশলেন তিনি। বাবা হাউ মাউ করে কেঁদে বললেন, 'শরীফ মিয়া আমার মেয়েটাকে বাঁচান'। মাষ্টার কাকা মৃদু গলায় বললেন 'শহর থেকে খুব বড় ডাক্তার আনবো আমি। খোকা তোর সাইকেলটা বের করে দে।' আমি বললাম,

আমি যাই চাচা ?

না তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে না। তুমি থাকো।

বাবা ধমকে উঠলেন,

ওর কথা শুনো না। ও একটা পাগল ছাগল। তুমি যাও। নিজেই যাও।

রুনু কখন বা এসেছে। আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থর থর থর করে কাঁপছে সে। ঘরময় নষ্ট রক্তের একটা দম আটকানো অস্বস্তিকর গন্ধ। রাবেয়া চোখ বুঁজে শুয়ে। তার মুখটা কি ফর্সাইনা দেখাচ্ছে। বাবা বললেন,

মা রাবু একটু দুধ খাও।

না।

মাথায় পানি দেবো মা ?

না বাবা।

রাবেয়া চোখ মেলে বাবার দিকে তাকালো। বললো,

বাবা।

কি মা ?

আমার বুকটা খালি খালি লাগছে কেন ?

সেরে যাবে মা।

তুমি আমার বুকে হাত রাখবে একটু ? এইখানে।

এমনি করেই ভোর হলো। মণ্টু এলো ছুটায়।

সে হতভম্ব হয়ে গেলো। বাবা গিয়েছেন ইনজেকশন দেবার লোক আনতে। রাবেয়া মণ্টুর দিকে তাকিয়ে বললো, মণ্টু আমার অসুখ করেছে।

মণ্টু বিস্মিত হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। রাবেয়া আবার বললো মণ্টু আমার বুকটা খালি খালি লাগছে।

মণ্টু রাবেয়ার মাথায় হাত রাখলো। মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। রুনু আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে জমাট বাঁধা কালো রক্তে। রাবেয়া আমাকে ডাকলো, খোকা ও খোকা।

আমি তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। নীল রঙের চাদরে ঢাকা রাবেয়ার শরীর নিস্পন্দ পড়ে

আছে। একটা মাছি রাবেয়ার নাকের কাছে ভন ভন করছে। রাবেয়া হঠাৎ করেই বলে উঠলো ‘পলাকেতো দেখছিনা। ও খোকা পলা কোথায় রে।’ আমাদের চারদিকে উদ্বিগ্ন হয়ে পলাকে খুঁজলো সে। আর কি আশ্চর্য বেলা ন’টায় চুপচাপ মরে গেল রাবেয়া। তখন চারিদিকে শীতের ভোরের কি ঝক ঝকে আলো।

গত বৎসর আমরা বড় খালার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম বড় খালার মেয়ে নিনাও এসেছিলে মায়ের কাছে। প্রথম পোয়াতী মেয়ে। মা নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। নিনা আপা কি প্রসন্ন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারর্দিকে। প্রথম সন্তান জন্মাবে তার কি প্রগাঢ় আনন্দ চোখে মুখে। ‘যদি ছেলে হয় তবে তার নাম দেবো কিংশুক। মেয়ে হলে রাখী।’ হেসে হেসে বলে উঠেছিলেন নীনা আপা। আর তাতেই উৎসাহিত হয়ে রাবেয়া বলেছিলো ‘আমিও আমার ছেলের নাম কিংশুক রাখবো।’ আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রাবেয়া, নীল রঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে তুই শুয়ে আছিস। হলুদ রোদ এসে পড়ছে তোর মুখে। কিংশুক নামের সেই ছেলেটি তোর বুকের সঙ্গে মিশে গেছে! যে বুক একটু আগেই খালি খালি লাগছিলো।

বারোটার দিকে ফিরে এলেন মাষ্টার চাচা। সঙ্গে শহর থেকে বড় ডাক্তার। আর মণ্টু, দিনে দুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালা ফালা করে ফেললো মাষ্টার চাচাকে। একটা মাছ কাটা বটি দিয়ে। পানের দোকান থেকে দৌড়ে এলো দুতিন জন। একজন রিকশাওয়ালা রিকশা ফেলে ছুটে এলো। ওভারশীয়ার কাকুর বড় ছেলে জসীম দৌড়ে এলো। ডাক্তার সাহেব চ্যাঁচাতে লাগলেন হেল্প হেল্প। চিৎকার শুনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমি দেখলাম, বটি হাতে মণ্টু দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকে তাকে ঝাপ্টে ধরে আছে কজন মিলে। রক্তের একটা মোটা ধারা গড়িয়ে চলছে নালায়। মণ্টু আমার দিকে তাকিয়ে বললো ‘দাদা ওকে আমি মেরে ফেলেছি।’ আমার মনে পড়লো হাস্নুহেনা গাছের নীচে মণ্টু একদিন পিটিয়ে একটা মস্ত সাপ মেরেছিল।

রাবেয়াকে ঘিরে সবাই বসে ছিলো। আমি ঢুকতেই নাহার ভাবী বললেন, বাইরে এত গোলমাল কিসের ?

আমি মায়ের দিকে তাকালাম।

মা এইমাত্র মণ্টু মাষ্টার চাচাকে খুন করেছে। আপনি বাইরে আসেন। মণ্টুকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে সবাই।

হাস্নুহেনা গাছের নীচে মণ্টু একটা মস্ত চন্দ্রবোড়া সাপ মেরেছিলো। সাপের মাথায় গোল বেগুনী রং-এর চক্র, তার হাতের উপর লম্বা। মণ্টু মরা সাপটাকে কাঠির আগায় নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ছোট ছোট বাচ্চারা উল্লাসে লাফাতে লাগলো। রাবেয়া খুশীতে হেসে ফেলে বললো,

মণ্টু কাঠিটা আমার হাতে দে।

পলা আনন্দে ঘেউ ঘেউ করছিলো। মাঝে মাঝে লাফিয়ে সাপটাকে কামড়াতে গিয়ে ফিরে ফিরে আসছিলো। রাবেয়া পলার দিকে তাকিয়ে শাসাল,

এই পলা এই, মারবো থাপ্‌পর।

সাপটাকে সবাই মিলে পুকুর পাড়ে কবর দিতে নিয়ে গেলো ? মিছিলের পুরোভাগে রাবেয়া। তার হাতের কাঠিতে সাপটা আড়াআড়ি ঝুলছে। মণ্টু পলাকে নিয়ে দলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলো। সাপের জন্যে লম্বা করে কবর খোড়া হলো। মণ্টু পুকুর পাড়ে বিষন্নভাবে বসেছিলো।

কাকাকে মেরে ফেলবার পর মণ্টুকে সবাই ঝাপ্টে ধরে রেখেছিলো। জসীম মণ্টুর হাত শক্ত

করে ধরে চ্যাঁচাচ্ছিস, 'পুলিশে খবর দিন। পুলিশে খবর দিন।' মাছ কাটার বটিটা কাত হয়ে ঘাসের উপর পড়ে। সেখানে একটুও রক্তের দাগ নেই। কাকা যেখানে পড়েছিলেন সেখান থেকে একটা মোটা রক্তের ধারা ধীরে ধীরে নালার দিকে নেমে যাচ্ছিল। মন্টু আমায় দেখে বললো, 'দাদা ওকে আমি মেরে ফেলেছি।' মন্টু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। আশে-পাশে প্রচুর লোক জমা হয়ে গিজ গিজ করছিলো। মোটা ডাক্তার ভাঙ্গা গলায় প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছিলেন 'হেল্প হেল্প।' একটা পাঁংশুটে রঙের কুকুর মরা লাশটার কাছে ভিড়বার চেষ্টা করছিলো।

মন্টুর কুকুরের রং ছিলো সাদা। গলার কাছে কালো একটা ফুটকি। মন্টু কাঞ্চনপুর থেকে এনেছিলো কুকুরটাকে। অল্প দিনেই ভীষণ পোষ মেনেছিলো। মন্টু তাকে টুলকাঠ দিয়ে একটি চমৎকার ঘর বানিয়ে দিয়েছিলো। আমি কুকুরটার নাম দিয়েছিলাম পলা। রাবেয়া মন্টুর কাছ থেকে কুকুরটা আট আনা দিয়ে কিনে নিয়েছিলো। মন্টুর বিক্রির ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু রাবেয়া পীড়াপীড়ি করছিলো,

মন্টু পলাকে আমি কিনব।

না আপা আমি পলাকে বেচবো না।

আহা দেনা মন্টু। আট আনা পয়সা দেবো আমি। দে না?

বললাম তো আমি বেচবো না।

মন্টু দিয়ে দে, এমন করছিস কেন?

রাবেয়া সব সময় পলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। পরিচিত ঘর বাড়ীতে গিয়ে বলতো, খালাম্মা আমার পলাকে একটু দুধ দিন। আহা চিনি দিয়ে দিন। শুধু শুধু দুধ বুঝি কেউ খায়?

মন্টু একদিন একটা টিয়া পাখীর বাচ্চা আনলো কোথা থেকে। সেটি বাচ্চা হলেও খুব চমৎকার ছিল দেখতে। বারান্দায় খাঁচা ঝুলিয়ে পাখীটিকে রাখা হোত। ঠাণ্ডা লেগে একদিন এটি মারা গেল। মন্টু পাখীর শোকে একবেলা ভাত খেলো না।

মন্টু আর মাষ্টার চাচা সবচে' ছোট ঘরটায় থাকতেন। ঘরটায় আলো আসতো না ভালো। গরমের সময় গুমোট গরম। বাতাস আসার পথ নেই। মন্টুর হাজত বাসের দিনগুলি এখন কেমন কাটছে? মন্টুর বয়স তখন উনিশ, সাত বাদ দিলে হয় বারো। বারো বৎসর সে আর মাষ্টার চাচা এক সঙ্গে একটি ঘরে কাটিয়েছে। মাষ্টার চাচার অভাব আজ সে অনুভব করছে কি? খুনের পর শুনেছি অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। দিন রাত্তির খুন করা লোকের চেহারা, খুনের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে। মন্টু সে রকম হবে না। তার বড় শক্ত নার্ভ। মন্টুর মা, আমাদের বড় মা যেদিন মারা গেলেন মন্টু সেদিন নিতান্ত সহজভাবেই কাটালো। পরদিন শিমুলতলা গাঁয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেলো বাসায় কাউকে না বলে। বয়স অল্প ছিল। শোক বুঝবার বুদ্ধিই হয়ত হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় কম বয়সের জন্যে নয়। বড় মার মতো তারও ইস্পাতের মতো শক্ত নার্ভ ছিলো। মন্টু দেখতে অনেকটা বড় মার মতো। তার চাইবার ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, সমস্তই বড় মায়ের মতো। বাবার শোবার ঘরে বড় মা আর বাবার একটা যৌথ ছবি আছে। বিয়ের ছবি। সেই ছবির দিকে তাকালেই মন্টুকে চেনা যায়। ছবির কাঁচে ময়লা জমে ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু বড় মার বালিকা বয়সের ছবি আমাদের আকর্ষণ করে। ৪ঠা আগষ্ট আমাদের বাসায় একটা উৎসব হয়। ভুল বললাম, শোকের আসর হয়। বাদ মাগরেব মিলাদ পড়ানো হয়। বাবা মায়ের কবর জিয়ারত করেন। দু'একটি ফকির মিসকিনকে খাওয়ানো হয়। হাউ মাউ করে বাবা মায়ের মৃত্যু দিন স্মরণ করে কিছুক্ষণ কাঁদেন। তার শোকটা নিশ্চয়ই আন্তরিক তবু সমস্ত

ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর লাগে। বিশেষ করে এই দিনটিতে মা মুখ কালো করে ভয়ে ভয়ে ঘুরে বেড়ান। তার ভাব দেখে মনে হয় ৪ঠা আগষ্টের এই শোকের দিনটির জন্যে মা নিজেই দায়ী। বাবা সেদিন অতি সামান্যতম অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও মায়ের উপর ক্ষেপে যান। আমার কষ্ট হয়। বড় মা আমাদের সবারই অতি শ্রদ্ধার মানুষ। রাবেয়া আর আমি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমুতে পারিনি। যখন বয়স হয়েছে, তাঁর কোলে এসেছে মণ্টু। আমি আর রাবেয়া দক্ষিণের ঘরে নির্বাসিত হয়েছি তখনো তিনি মাঝে মাঝে এসে বলতেন, খোকা আজ তুই শুবি আমার সাথে। আগে আমার সঙ্গে ঘুমুবার জন্যে এত হৈ চৈ করতিস এখন যে বড় চুপচাপ।

বড় হয়েছি যে।

ওহ কি মস্ত বড় ছেলে।

বড় মার গলা জড়িয়ে তাঁর বরফি কাটা ছাপের ব্লাউজে নাক ডুবিয়ে প্রতি সন্ধ্যার আবদার, 'গল্প বলেন বড় মা। ভূতের গল্প।'

বড় মা কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে গল্প বলে চলতেন, 'আমরা তখন ছোট। বারো তেরো বৎসরের বেশী বড় নয়। নানার বাড়ী যাচ্ছি সবাই। ভাদ্র মাস, নদী কানায় কানায় ভরা। সারাদিন নৌকা চললো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাঝিরা পুরানো এক তাল গাছের সঙ্গে নৌকা বেঁধে রান্না বসিয়েছে। এমন সময় রুস্তম বলে যে বুড়ো মাঝিটা ছিল তার সে কি বিকট চিৎকার, 'কর্তা তাল গাছে একটি কি?' আমি শুনেই ভয়ে বাবাকে ঝাপ্টে ধরেছি। তাল গাছের দিকে চাইবার সাহস নেই। বলতে বলতে মা থামতেন আমরা ফুসে উঠতাম, থামলে কেন, বল শিগগীর।

গল্প শুনে আতঙ্কে জমে যেতাম। কি অদ্ভুত তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি। বড় মার মৃত্যুর দিনটিতে বাবার হৈ চৈ আমার তাই ভালো লাগতো না। আমার মনে হোত আড়ম্বরের চেয়ে মৌন দুঃখানুভূতিই হয়তো ভালো হোত। আমি মনে মনে বললাম, 'বড় মা তোমার ছেলের আজ বড় বিপদ।'

হ্যাঁ, আজ মণ্টুর বড় বিপদ। বড় ভয়ংকর বিপদ। মণ্টু কি বড় মাকে ডাকছে? ফুটবলের খুব নেশা ছিল মণ্টুর। খেলতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ছেলেদের কাঁধে চড়ে বাসায় এলো। হাঁটুর নীচে আধ হাত খানেক জায়গা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। হৈ চৈ শুনে বড় মা বেরিয়ে আসতেই মণ্টু বললো,

মা আমি পা ভেঙ্গে ফেলেছি।

বড় মা বললেন, 'সেরে যাবে।'

মণ্টুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। এক্সরে করে দেখা গেল ভেতরে হাড়ের একটা ছোট্ট ছোঁছালো কণা ভেঙ্গে রয়ে গেছে। কেটে বের করতে হবে।

মণ্টুকে সাদা বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। এনেসথেসিয়া করার বড় চৌকা ধরণের যন্ত্রটা ডাক্তার মণ্টুর মুখের কাছে নামিয়ে আনলেন। ছোট্ট মণ্টু আতঙ্কে নীল হয়ে গেলো। ডাক্তার বললেন, বলো খোকা বলো এক দুই তিন চার...। মণ্টু বললো মা, মা, মা, মা।

আজ মণ্টুর বড় বিপদ। দুর্গন্ধ কম্বলে মাথা চাপা দিয়ে আজো কি সে মা মা জপছে। না, মণ্টু বড় শক্ত ছেলে। ইস্পাতের মতো তার নার্ভ। দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,

তুমি আকন্দকে খুন করেছো?

জি।

কি দিয়ে? ——

বটি দিয়ে, মাছ কাটা বটি।

ক'টা কোপ দিয়েছিলে ?

মনে নেই।

মরবার সময় তিনি কিছু বলেছিলেন ?

জি ?

কি বলেছিলেন ?

'বাবা মন্টু।'

আর কিছু বলেন নি ?

না।

তিনি কি তোমাদের খুব শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন ?

জি ছিলেন।

তুমি কি কর ?

বি. এ, পড়ছিলাম।

দারোগা সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। এবার শুরু করলেন আপনি করে।

কি জন্যে খুন করেছেন তাকে ?

মন্টু চুপ করে রইলো। দারোগা সাহেব বললেন, আমাকে বলতে কোন অসুবিধা নেই। কোর্টে অন্যকথা বললেই হলো। বাঁচার অধিকারতো সবারই আছে ?

ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক কোন স্ক্যান্ডাল...

ছিঃ।

আমার মনে হয় আপনি মিথ্যা বলছেন।

আমি মিথ্যা বলি না।

মন্টু খুব স্পর্ধার সঙ্গে বললো আমি মিথ্যা বলি না। বলতে গিয়ে বুক টান করে দাঁড়াল।

দারোগা সাহেবের মাথার উপর একটা ফ্যান ঘুরছিলো। ফ্যানের বাতাসে মন্টুর চুল কাঁপছিলো। আমি কাঁচু মাচু হয়ে ভদ্রলোকের সামনে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। মন্টু কি কখনো মিথ্যা বলে না ? মন্টুর সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ হয় না। যেন জন্ম থেকেই নীরব। তাকে বুঝা হয়ে উঠে নি আমার। রুনু সম্বন্ধে আমি যেমন বলতে পারি রুনুর একটু মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে। যখন সে মিথ্যা বলে তখন যে মাথা নীচু করে অল্প অল্প হাসে। মন্টু সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে পারছি না আমি।

আপনি কি খুব ভেবে চিন্তে খুন করেছেন ?

না খুব ভাবি নি।

আমার মনে হয় আপনি অনুতপ্ত।

না।

তাকে খুন করার ইচ্ছা কি হঠাৎ আপনার মনে জেগেছে না আগে থেকেই ছিলো ?

হঠাৎ জেগেছে।

তিনি কোন ধরণের লোক ছিলেন ?

ভালো লোক। বিদ্যান, অনেক জানতেন।

আপনাদের সঙ্গে তাঁর কি ধরণের সম্পর্ক ছিল ?

ভালো। আমাদের খুব স্নেহ করতেন।

তাকে খুন করা কি খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো ?

জানি না। আমার রাগ খুব বেশী।

হ্যাঁ মন্টুর রাগ বেশী। ভয়ঙ্কর উন্মাদ রাগ। আমি জানি এ সম্বন্ধে ভালো করেই জানি। দু' বৎসর হয়নি এখনো। অনার্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেছি, সময়ও মনে আছে পৌষ মাস। দারুণ শীত।

আমাদের সামনের বাসায় থাকতেন এক ওভারশীয়ার সাহেব। তাঁর মেয়ে এবং ছেলে সব মিলিয়েই একজন নীনা। বয়স আমার সমান কিংবা আমার চেয়ে দু'এক বৎসরের বড়। ওভারশীয়ার ভদ্রলোকের ভারী আদরের মেয়ে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। মেয়েটি বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতো বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে। ওভারশীয়ার ভদ্রলোক একদিন হাতে একটি চিঠি নিয়ে চড়াও হলেন আমাদের বাসায়। আমি বাইরেই বসেছিলাম, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

এই চিঠি তুমি লিখেছ ?

নামহীন একটা চিঠি তিনি আমার সামনে ফেলে দিলেন।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

কি বলছেন আপনি ?

নিশ্চয়ই তুমি, এত বড় সাহস তোমার এমন নোংরা কথা আমার মেয়েকে লিখেছ ?

ভদ্রলোক গর্জাতে লাগলেন। আমি হতভম্ব এবং ভীষণ লজ্জিত। এমনিতেই আমি একটু লাজুক ধরনের ছেলে। এ ধরনের অভিযোগে একেবারে বোকা বনে গেলাম।

তুমি কি মনে করেছ আমি ছেড়ে দেব ? হ্যাঁ। ভদ্রলোকের মেয়েছেলের মান-ইজ্জত...

কথা শেষ হবার আগেই মন্টু ঘর থেকে বেড়িয়ে এলো। শান্ত গলায় বললো,

যান আপনি বাড়ী যান।

বললেই হোল, যা ইচ্ছে তা লিখে বেড়াবে আর আমি বসে বসে কলা চুষবো ?

মন্টু নিমিষের মধ্যে আমার কিছু বুঝবার আগেই ভদ্রলোকের কলার চেপে ধরলো। হুংকার দিয়ে বললো, 'চুপরাও ছোটলোক।' মা বেড়িয়ে এলেন। আশে পাশে লোক জমে গেলো। আমি তটস্থ। মন্টু চ্যাঁচাতে লাগলো, দুনিয়া শুদ্ধ লোক জানে তোমার মেয়ের কারবার আর তুমি এসেছো দাদার কাছে ?

ওভারশীয়ার ভদ্রলোক বদলী হয়ে চলে গেছেন রাজশাহী। মেয়েকে নিশ্চয়ই কোথায়ও বিয়ে দিয়েছেন। তিনি এখানে থাকলে মন্টুর উন্মাদ রাগের পরিণতি দেখে খুশী হতেন হয়তো।

মাষ্টার চাচার বাড়ী থেকে লোক এলো একজন। দড়ি পাকানো চেহারা। পায়ে কাম্বিসের জুতা, ছুঁছালো দাড়ি। চোখে নিকেলের চশমা।

রশীদ আকন্দের ভাই আমি। বড় ভাই। তার জিনিস পত্র টাকা পয়সা যা আছে নিতে এসেছি।

আমি বললাম, জিনিসপত্র বিশেষ নেই তবে অনেক বই আছে।

টাকা পয়সা কি আন্দাজ আছে ?

দুশ পনেরো টাকা ছিল।

মাত্র। তবে যে শুনলাম বহু টাকা! টাকার জন্যেই খুন করা হয়েছে।

লোকটি কুঁত কুঁতে চোখে তাকাচ্ছিল। পান চিবানোয় ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়া লালা টেনে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে। গলা খাকারি দিয়ে সে বললোঃ আপনারা যা বলবেন এখন তো তাই সত্য। তা সে টাকা কটাই দেন। আসতেই আমার পঁচিশ টাকা খরচ।

তাঁর সব কিছুই থানায়। আপনি সেখানেই যান।

কই ?

থানায়।

ও।

ভদ্রলোক বিমর্ষ হয়ে চলে গেলেন। রুনু বললো 'দাদা ওকি সত্যি মাষ্টার চাচার ভাই ?'

হুঁ।

কি করে বুঝলে ?

এক রকম চেহারা।

মাষ্টার চাচার চেহারা আমার মনে আছে। গত পরশু শেষ রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। বড়মাকেও দেখেছি। বড় মা অবাক হয়ে বলছেন, তুই এই হলুদ রঙের শাড়ী আনলি আমার জন্যে খোকা ? এই শাড়ী পরার বয়স কি আছে রে বোকা ?'

বেতন পেয়ে সবার জন্যেই কিছু না কিছু কিনেছি। আপনি নেন এটা।

সবার জন্যেই কিনেছিস ?

জি।

কি কি কিনলি ?

আমি নাম বলে চললাম। বড় মা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন,

সবার জন্যেই কিনলি, মাষ্টারের জন্যে কিনলি না। সে বাদ পড়লো বুঝি ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'জানেন না, মাষ্টার চাচা তো মারা গেছেন ?'

আহা কি করে মারা গেল ? বড় ভালো লোক ছিল।

বড় মা মাষ্টার চাচাকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। প্রায়ই আলাপ করতেন তাঁর সাথে। মাষ্টার চাচা বড় মাকে বড় বোনের মত দেখতেন। আমার মাকে ভাবী বলে ডাকলেও বড় মাকে ডাকতেন বড় বুবু বলে। বড় মা প্রায়ই বলতেন ও মাষ্টার আমার ভাগ্যটা গুণে দিলে না।

বড় বুবু আপনার সবার ভাগ্যই আমি গুণে রেখেছি।

ছাই গুণেছেন। বলুন আমার ভাগ্য।

আপনার জন্ম লগ্নে আছে মঙ্গল আর রবির প্রভাব। সৌভাগ্যবান আপনি। ভাগ্যবান ছেলে হবে আপনার।

বড় মা হু হু করে হেসে উঠতেন।

মাথার ঠিক নাই তোমার। এই তোমার ভাগ্য গণনা ? এই সব বুঝি লেখে বই এ। পুড়িয়ে ফেলো তোমার বই। না হয় আমাকে দিও আমি আগুন করে তোমাকে চা বানিয়ে দেব।

কাকা বিমর্ষ হয়ে বইএর পাতা ওল্টাতেন। এই খানেই তাঁর গণনা মিলতো না। বাবা বড় মার ছেলে হওয়ার কোন আশা না দেখেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন।

আশ্চর্যভাবে কাকার গণনা মিলে গেলো এক সময়। রুনুর জন্মের পাঁচ বৎসর আগেই বড় মার কোলে এল মণ্টু। বড় মা ভীষণ অবাক হয়েছিলেন কাকার নির্ভুল গণনা দেখে।

কাকাকে ডেকে বলেছিলেন,

আমার ছেলের ভাগ্যটা একটু দেখো মাস্টার। আশ্চর্য এ সব শিখলে কি করে ? আমার খুব শিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মাষ্টার চাচা হেসে বলেছিলেন,

এও এক ধরনের বিজ্ঞান বুবু। অন্ধকার বিজ্ঞান। আপনি যদি সত্যি শিখতে চান...

বড় মা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিলেন,

আগে আমার ছেলের ভাগ্য বলো। তারপর তোমার অন্ধকার বিজ্ঞান।

কাকা বললেন, জন্ম হয়েছে মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে। জন্ম সময় আকাশে কুম্ভলান। জাতক শনির ক্ষেত্রে রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে শুক্রের সপ্তমাংশে...'

আহা কি আবোল তাবোল শুরু করলে ফলাফলটা বলো।

ছেলে বুদ্ধিমান, সাহসী শক্তিমান আর প্রেমিক। সৌভাগ্যবান ছেলে আপনার। তাকে একটা গোমেদ পাথর দেবেন বুবু, খুব কাজে লাগবে।

বড় মা মণ্টুকে সাত মাসের রেখে মারা গেলেন। মণ্টুর জন্যে গোমেদ পাথর আর নেওয়া হলো না। সেই পাথর যদি থাকতো তবে কি এই বিপদ এড়াতে পারতো মণ্টু ?

চারদিকে বড় বেশী নির্জনতা। বড় বেশি নীরবতা। মণ্টুর ঘরে বাবা একটা তালা লাগিয়েছেন। রুনুর বিছানায় রুনু একা একা অনেক রাত অবধি জেগে থাকে। বাতি জ্বালানো থাকলে আগে ঘুমুতে পারতো না সে। এখন সারারাত বাতি জ্বলে। হারিকেনের আবছাআলোয় সমস্তই কেমন দেখায়। ঘরের দেয়ালে আমার মাথার একটা প্রচণ্ড কালো ছায়া পড়ে। মাঝে মাঝে বাবা গোঙ্গানীর মত শব্দ করে কাঁদেন। রুনু আৎকে উঠে বলে, 'কি হয়েছে দাদা ?'

বাবা কাঁদছেন।

বাবা গোংগানীর মত শব্দ করে কাঁদেন। বারান্দায় কি অপরূপ জ্যোস্না হয়। হাস্নুহেনার সুবাস ভেসে আসে। রুনু বলে 'মরার পর কি হয় দাদা ?

আমি উত্তর দেই না। মনে মনে বলি কিছুই হয় না। সব শেষ। সে জীবন দোয়েলের হরিণের হয়নিকো দেখা। অসংলগ্ন কত কথাই মনে আসে।

দাদা মন্টু ভাইএর কি হবে ?

জানি না।

ঘরের দেয়ালের লম্বা ছায়াগুলির দিকে তাকিয়ে আমার বুক হু হু করে। নাহার ভাবী মৃদু ভ্যলুমে গান শুনেন, বিধি ডাগর আঁখি যবে দিয়েছিলে, মোর পানে কেন পড়িল না। কান পেতে শুনি।

মাঝে মাঝে নাহার ভাবী আসেন আমার ঘরে। বিষণ্ন হয়ে বসে থাকেন। সেদিনও এসেছিলেন। আমি জানালা বন্ধ করে বসেছিলাম। বাইরে কি তুমুল বৃষ্টি। বিকেলের আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে আগে ভাগে। নাহার ভাবী রুনুর বিছানায় এসে বসলেন।

আমি পরশু চলে যাচ্ছি।

আমি চমকে বললাম, 'কোথায় ?'।

প্রথমে বাবার কাছে যাব। সেখান থেকে বাইরেও যেতে পারি দাদার সঙ্গে, ও চিঠি লিখেছে যেতে।

আমি চুপ করে র'লাম। নাহার বাবী বললেন, আপনাদের কথা খুব মনে থাকবে আমার। আপনাদের সবাইকে আমার বড় ভালো লেগেছে। রাবেয়ার কথা খুব মনে হয় আমার।

নাহার ভাবি চোখ মুছলেন। রুনু চা নিয়ে আসলো দু কাপ। নাহার ভাবী চায়ে চুমুক দিয়ে ধরা গলায় হঠাৎ করেই বললেন, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, মণ্টু এমন কাজ কেন করলো বলবেন ? অনেকে অনেক কথা বলে। আমার খারাপ লাগে শুনে। আপনাদের আমি বড্ড ভালবাসি।

আমি বললাম,

রাবেয়ার মৃত্যুর কারণটাতো আপনি জানেন ভাবী।

জানি।

কাকাই হয়তো দায়ী ছিলেন, মণ্টু জেনেছিল। অবশ্যি মণ্টু বলে নি কিছুই।

মণ্টুর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, আমি সব সময় তার জন্যে দোয়া করব। তাকে আমি ভালো করে দেখিওনি কোনদিন।

ভাবী, মণ্টু বড় চুপচাপ ছেলে।

আমার দোয়ায় কিছু হবে না। তবু আমি তার জন্যে দোয়া করবো।

নাহার ভাবী মাথা নীচু করে বসেছিলেন। আমার মনে হলো নাহার ভাবী আমাদের বড় আপন। বড় পরিচিত।

রাবেয়ার একটা ছবি দেবেন আমাকে ?

ছবি ?

জি আমি সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ও খুশী হোত দেখলে। রাবেয়াকে তার খুব ভালো লেগেছিল।

ওরতো কোন ছবি নেই। আমাদের সবার শুধু একটা গ্রুপ ছবি আছে, মণ্টুর জন্মের পর তোলা।

ও।

নাহার ভাবী চলে গেলেন। ট্রাঙ্ক খুলে ছবি বের করলাম আমি। পুরনো ছবি। হলুদ হয়ে গেছে। তবু কি জীবন্তই না মনে হচ্ছে। রাবেয়া হাসি মুখে বসে আছে মেঝেতে। রুনু বাবার কোলে। মণ্টু চোখ বুঁজে বড়মার কোলে শুয়ে। বুকে গভীর বেদনা অনুভব করছি। স্মৃতি সে সুখেরই হোক বেদনারই হোক সব সময়ই করুণ।

সারা রাত ধরে বৃষ্টি হলো। আষাঢ়ের আগমনী বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। রুনু বসলো, মনে আছে দাদা, এক রাতে এমনি বৃষ্টি হয়েছিলো, তুমি একটা ভুতের গল্প বলেছিলে।' আমি কথা বললাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে হারিকেনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবা হঠাৎ করে বিকৃত গলায় ডাকলেন, খোকা ও খোকা।

কি বাবা।

আয়। তুই আমার কাছে আয়। মণ্টুর জন্যে বুকটা বড় কাঁদে রে।

তিমিরময়ী দুঃখ ; প্রগাঢ় বেদনার অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। বাইরে গাছের পাতায় বাতাস লেগে হা হা হা হা শব্দ উঠলো।

১৭ই আগষ্ট মণ্টুর ফাঁসির হুকুম হলো। মণ্টু, যার জন্ম হয়েছিল মঘা নক্ষত্র যুক্ত সিংহ রাশিতে, রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কানে। চাচা বলেছিলেন এ ছেলে হবে সাহসী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক।

মণ্টুর জীবন ভিক্ষা চেয়ে আমরা মার্সি পিটিশন করলাম। আমার মনে পড়লো ফাঁসির হুকুম হওয়ার আগের দিনটিতে রোগা, শ্যামলা রঙের একটি মেয়ে আমাদের বাসায় এসেছিলো। তার মুখটা নিতান্তই সাদাসিদা, ছেলে মানুষি চাহনী। মেয়েটি রিকশা থেকে নেমে থতমত খেয়ে বাসার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমায় দেখে ঢোক গিলল। বললাম, কার খোঁজ করছেন ?

মেয়েটি মাথা নীচু করে কি ভাবছিলো। হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে বললো,

আমার নাম ইয়াসমীন। আমি আপনার ভাই-এর সাথে পড়ি।

মণ্টুর সঙ্গে ?

জি।

আস ভিতরে আস। তুমি করে বললাম কিছু মনে করো না।

মেয়েটি হেসে বললো,

আমি কত ছোট আপনার, তুমি করেইতো বলবেন।

বাবা, মা আর রুনু মণ্টুকে দেখতে গিয়েছেন। আমি মেয়েটিকে আমার ঘরে এনে বসালাম।

বসো।

এখানে কে শোয় ?

আমি আর রুনু।

রুনু কোথায় ?

মণ্টুকে দেখতে গিয়েছে। বাবা আর মাও গিয়েছেন।

আরো আগে আসলে আমিও রুনুর সঙ্গে যেতে পারতাম না ?

তুমি যেতে চাও ?

জি না। ওর খারাপ লাগবে।

মেয়েটি চুপ করে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘর দেখতে লাগল। আমি বললাম,

চা খাবে ?

জি না।

কোথায় থাকো তুমি ?

'উই খানে'।

মেয়েটি হয়তো বলতে চায় না সে কোথায় থাকে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সে বললো আমি সব জানতাম অনেকবার ভেবেছি আসি। কিন্তু সাহস হয় নি।

এসে কি করতে ?

না কি আর করতাম। তবু হঠাৎ ইচ্ছে হোত। আমি আপনাদের সবাইকে চিনি। ও আমাকে বলেছে।

কি বলেছে?

মেয়েটি মুখ নীচু করে হাসলো। বললো,

আপনাদের একটা কুকুর ছিল পলা।

হ্যাঁ শুধু পলাতক হোত তাই তার নাম পলা।

আচ্ছা ওর কি সাজা হবে?

বারো তেরো বৎসরের সাজা হবে হয়তো।

ফাঁসি হবে নাতো?

না উকিল বলেছেন কম বয়স, আর রাগের মাথায় খুন।

ওর বুঝি খুব রাগ।

তোমার কি মনে হয়?

মেয়েটি হাসলো কথা শুনে। বললো,

জানি না। আমি যাই।

আবার এসো।

আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো আমার।

কেন?

ও আপনাকে খুব ভালোবাসতো। আমার কাছে সব সময় বলতো আপনার কথা।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ আর ও তো মিথ্যে বলে না।

মেয়েটি চলে গেলো। মণ্টু আমাকে হয়তো খুব শ্রদ্ধা করতো। বড় চাপা ছেলে বুঝবার উপায় নেই তবে শ্রদ্ধা করতো ঠিকই। না শ্রদ্ধা নয় ভালোবাসা বলা যেতে পারে।

মনে পড়লো একদিন সন্ধ্যায় রুনু এসে আমায় বললো, দাদা মণ্টু ভাই আজ বাসায় আসবে না। আমায় বলে দিয়েছে। সে কাঁঠাল গাছে বসে আছে।

কেন রে?

ও সার্ট ছিড়ে ফেলেছে মারামারি করে। তাই। আমায় বলেছে তুমি যদি ওকে আনতে যাও তবেই আসবে। প্রবল ভালোবাসা না থাকলে সন্ধ্যাবেলা গাছে বসে কেউ প্রতীক্ষা করে না কখন বড় ভাই এসে গাছ থেকে নামিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে।

সতেরো তারিখ মণ্টুর ফাঁসির হুকুম হলো। ঠাণ্ডা মাথায় খুন; অনেক আই উইটনেস। কলেজে পড়া বিবেক বুদ্ধির ছেলে। জজ সাহেব অবলীলায় হুকুম করলেন।

সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ মার্সি পিটিশন অগ্রাহ্য হলো। আমি জানলাম আঠারো তারিখ ভোর রাত্রে তার ফাঁসি হবে। তার লাশ নিতে হলে সেই সময় জেল গেটের সামনে জেলারের চিঠি হাতে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

বাবা, মা আর রুনুকে নিয়ে মণ্টুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

রোগা হয়ে গিয়েছে মণ্টু। আমাদের দেখে অপ্রকৃতস্থের মতো হাসলো। বললো, দাদা মার্সি পিটিশনটার কোন জবাব এসেছে?

ওকে বুঝি সে কথা জানানো হয়নি ? ভালই হয়েছে। আমি বললাম, নারে এখনো আসে নি।

মা, রুনু আর বাবা কাঁদছিলেন। মণ্টু বললো,

কাঁদেন কেন আপনারা ? আমি জানি আমার ফাঁসি হবে না। কাল রাতে মাকে স্বপ্নে দেখেছি। মা বলছেন খোকা ভয় পাস কেন ? তোর ফাঁসি হবে না।

আমি বললাম, মণ্টু তোর কাছে একটি মেয়ে এসেছিলো। রোগা লম্বামতো।

মণ্টু বললো, ও ইয়াসমীন, আমার সঙ্গে পড়ে।

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। মণ্টু নীরবতা ভঙ্গ করে রুনুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, রুনু মিয়া মরতে ইচ্ছে হয় না।

বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, তোকে কি খেতে দেয়রে ?

ভালোই দেয় বাবা।

আগে আজে বাজে দিত। কদিন ধরে রোজ জানতে চায় আজ কি দিয়ে খেতে চান। এ জেলের জেলার খুব ভাল মানুষ বাবা, আমাকে শিবরামের একটা বই পাঠিয়েছেন, যা হাসির।

মা বললেন, মণ্টু বাসার কোন জিনিস খেতে ইচ্ছে হয় তোর ?

না মা এখানে এরা বেশ রাঁধে।

সেপাই এসে বললো, অনেক্ষণ হয়েছে তো। আরো কথা বলবেন ?' বাবা বললেন, 'না'। বাবা মণ্টুর হাতে চুমু খেলেন কয়েকবার। মণ্টু কাশলো বারকয়। সে মনে হলো একটু লজ্জা পাচ্ছে।

গাছের নীচে ঘন অন্ধকার। কি গাছ এটা ? বেশ ঝাঁকড়া। অসংখ্য পাখী বাসা বেঁধেছে। তাদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি। পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠে ম্লান জোৎস্নার আলো। কিছুক্ষণের ভিতরেই চাঁদ ডুবে যাবে। জেলখানার সেনট্রি দুজন সিগারেট খাচ্ছে। দুটি আগুনের ফুলকি উঠা নামা করছে দেখতে পাচ্ছি। তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ছায়া ছায়া মূর্তি মনে হয়। জেলখানার মাথায় যেন গেটের ঠিক উপরে একশো পাওয়ারের বাতি জ্বলছে একটা। বাতির চারপাশে অনেক পোকা ভীড় করেছে। বাবা বললেন, খোকা কটা বাজে ?

বলতে বলতে বাবা বুকে হাত রাখলেন। তাঁর বুক পকেটে জেলারের চিঠি রয়েছে। সেটি দেখালেই তারা মণ্টুকে আমাদের হাতে তুলে দেবে। মণ্টুকে আমরা ঘরে ফিরিয়ে নেবো। ঘরে, যেখানে মা আজ সারারাত ধরে কোরান শরীফ পড়ছেন।

বাইরে ম্লান জোৎস্না হয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতর চাঁদ ডুবে যাবে। আমি আর বাবা ঘেঁসা-ঘেঁসি করে বসে আছি সিমেন্টের ঠাণ্ডা বেঞ্চিতে। মাথার উপর ঝাঁকড়া অন্ধকার গাছ। বাবা নড়ে চড়ে বসলেন। তাঁর দ্রুত শ্বাস নেওয়ার শব্দ পাচ্ছি। তিনি একটু আগেই জানতে চাচ্ছিলেন কটা বাজে।

আমরা সবাই মাঝে মাঝে এমনি ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে বাইরের জ্যোৎস্না দেখতাম। হাস্নুহেনা গাছে কি ফুলই না ফুটতো। আমাদের বাসার সামনের মাঠে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। সেখানে অসংখ্যা জোনাকী জ্বলতো আর নিবতো। 'জোনাকী ঝিকিমিকি জ্বালো আলো' গান বাজিয়েছিলেন নাহার ভাবী।

আমাদের পলার নাকটা ছিল সিমেন্টের মেঝের মতই ঠাণ্ডা। মন্টু বলেছিল, 'দাদা কুকুরের নাক এত ঠাণ্ডা কেন ?'

মাষ্টার চাচা বাইরে বসে বসে আকাশের তারা দেখতেন। বলতেন 'খোকা, আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি।'

রাবেয়া একদিন রাগ হয়ে বলেছিলো, 'মা, আমি সবার বড় কিন্তু কেউ ঈদের দিনে আমাকে সালাম করে না।'

আমি আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে আছি। আমার শীত করছে। বাবা ভারী গলায় ডাকলেন।

খোকা, খোকা।

কি বাবা ?

কটা বাজেরে ?

আমি বাবার হাত ধরলাম। কি শীতল হাত। বাবা থর থর করে কাঁপছেন। আমাদের মাথার উপরের ঝাঁকড়া গাছ থেকে আচমকা অসংখ্য কাক কা কা করে ডেকে জেলখানার উপর দিয়ে উড়ে গেলো।

ভোর হয়ে আসছে। দেখলাম চাঁদ ডুবে গেছে। বিস্তীর্ণ মাঠের উপরে চাদরের মতো পড়ে থাকা ম্লান জ্যোৎস্নাটা আর নেই।

পরিশিষ্ট-৩

গ্রন্থপঞ্জি

১। নন্দিত নরকে

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৭২, প্রকাশক খান ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পী মুহম্মদ জাফর ইকবাল, দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। ২০০৫ থেকে প্রকাশক দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষ। দাম ৫৫ টাকা।

উৎসর্গ নন্দিত নরকবাসী বাবা, মা ও ভাইবোনদের।

প্রথম সংস্করণে ভূমিকা লিখেছিলেন অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ, একসময় বর্জিত হলেও আবার তা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক এ ভূমিকাটি এ সঙ্গে পরিবেশিত হলো।

নন্দিত নরকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। অন্য একটি অনুবাদ '*বাংলা একাডেমী জার্নাল*'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

ড. আহমদ শরীফ লিখিত ভূমিকা

মাসিক 'মুখপত্রে'র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় গল্পের নাম 'নন্দিত নরকে' দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেননা ঐ নামের মধ্যেই যেন একটি নতুন জীবনদৃষ্টি, একটি অভিনব রুচি, চেতনার একটি নতুন আকাশ উঁকি দিচ্ছিল। লেখক তো বটেই, তাঁর নামটিও ছিল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু পড়তে শুরু করলাম ঐ নামের মোহেই।

পড়ে আমি অভিভূত হলাম। গল্পে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি একজন সূক্ষ্মাদর্শী শিল্পীর; একজন কুশলী স্রষ্টার পাকা হাত। বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর, এক দক্ষ রূপকারের, এক প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টার জন্মলগ্ন যেন অনুভব করলাম।

জীবনের প্রাত্যহিকতার ও তুচ্ছতার মধ্যেই যে ভিন্নমুখী প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির জটাজটিল জীবনকাব্য তার মাধুর্য, তার ঐশ্বর্য, তার মহিমা, তার গ্লানি, তার দুর্বলতা, তার বঞ্চনা ও বিড়ম্বনা, তার শূন্যতার যন্ত্রণা ও আনন্দিত স্বপ্ন নিয়ে কলেবরে ও বৈচিত্র্যে স্ফীত হতে থাকে, এত অল্প বয়সেও লেখক তাঁর চিন্তা-চেতনায় তা ধারণ করতে পেরেছেন দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত।

বিচিত্র বৈষয়িক ও বহুমুখী মানবিক সম্পর্কের মধ্যেই যে জীবনের সামগ্রিক স্বরূপ নিহিত, সে উপলব্ধিও লেখকের রয়েছে। তাই এ গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে অনেক মানুষের ভিড়, বহুজনের বিদ্যুৎ-দীপ্তি এবং খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। আপাতনিস্তরঙ্গ ঘরোয়া জীবনের বহুমুখী সম্পর্কের বর্ণালি কিন্তু অসংলগ্ন ও বিচিত্র আলেখ্যর মাধ্যমে লেখক বহুতে ঐক্যের সুষমা দান করেছেন। তাঁর দক্ষতা ঐ নৈপুণ্যেই নিহিত। বিড়ম্বিত জীবনে প্রীতি ও করুণার আশ্বাসই সম্বল।

হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবন-রসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবনশিল্পী হবেন— এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহমদ শরীফ
১৬/৬/৭২

২। শঙ্খনীল কারাগার

প্রকাশনার দিক থেকে দ্বিতীয় হলেও হুমায়ূন আহমেদ রচিত প্রথম উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, খান ব্রাদার্স, ঢাকা। ২০০৫ থেকে প্রকাশক দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রচ্ছদশিল্পী : ধ্রুব এষ; দাম ৭০ টাকা।

নন্দিত নরকে এবং *শঙ্খনীল কারাগার* দুইই আত্মকথন রীতিতে রচিত। *শঙ্খনীল কারাগার* হুমায়ূন আহমেদের প্রথম চলচ্চিত্রায়িত উপন্যাস। প্রথম প্রকাশের ভূমিকা লিখেছিলেন লেখক নিজে। নিচে তা সন্নিবেশিত হলো। উপন্যাসের শুরুতে তার নিজের লেখা কবিতার এ দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত আছে

'দিতে পার একশ' ফানুস এনে
আজন্ম সলজ্জ সাধ, একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই।'

উৎসর্গ আহমদ ছফা, আনিস সাবেত শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

সোমেন চন্দের লেখা অসাধারণ ছোটগল্প 'ইঁদুর' পড়ার পরই নিম্নমধ্যবিত্তদের নিয়ে গল্প লেখার একটা সুতীব্র ইচ্ছা হয়। 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার' ও 'মনসুবিজন' নামে তিনটি আলাদা গল্প প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেলি। নিজের উপর বিশ্বাসের অভাবের জন্যেই লেখাগুলি দীর্ঘদিন আড়ালে পড়ে থাকে। যাই হোক, জনাব আহমদ ছফা ও বন্ধু রফিক কায়সারের আগ্রহে 'নন্দিত নরকে' প্রকাশিত হয় মাস ছয়েক আগে। এবারে প্রকাশিত হলো 'শঙ্খনীল কারাগার।'

'নন্দিত নরকে'র সঙ্গে এই গল্পের কোনো মিল নেই। দু'টি গল্প উত্তম পুরুষে বলা এবং নিম্নমধ্যবিত্তের গল্প এই মিলটুকু ছাড়া। নামধাম দু'টি বইতেই প্রায় একই রেখেছি। প্রথমত নতুন নাম খুঁজে পাই নি বলে, দ্বিতীয়ত, এই নামগুলির প্রতি আমি ভয়ানক দুর্বল বলে। কার্যকারণ ছাড়াই যেমন কারো কারো কিছু কিছু দুর্বলতা থাকে, এও সেরকম।

আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেছে। ভুলগুলি অন্যমনস্ক পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাবে এইটুকুই যা ক্ষীণ আশা।

বৈশাখ ১৩৮০ হুমায়ূন আহমেদ

৩। শ্যামল ছায়া

হুমায়ূন আহমেদের তৃতীয় উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। প্রকাশক স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী আবুল বারক আলভী।

শ্যামল ছায়ার বিষয় মুক্তিযুদ্ধ। একটি অভিযানকে অবলম্বন করে একজন তরুণের তীব্র প্রতিরোধ স্পৃহার প্রতিচ্ছবি। হুমায়ূন নির্মিত চলচ্চিত্র শ্যামল ছায়ার কাহিনী কিন্তু ভিন্ন।

উৎসর্গ ফয়জুর রহমান আহমেদ, সাহিত্য সুধাকর, পবিত্র স্মৃতিতে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন। উনিশশ' একাত্তর সনের পাঁচই মে তাকে দেশপ্রেমের অপরাধে পাক আর্মি গুলি করে হত্যা করে। সে সময় আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বরিশালের এক গ্রামে লুকিয়ে আছি। কী দুঃসহ দিনই না গিয়েছে! বুকের ভেতর কিলবিল করছে ঘৃণা, লকলক করছে প্রতিশোধের আগুন। স্বাধীনতা-টাধীনতা কিছু নয়, শুধু ভেবেছি, যদি একবার রাইফেলের কালো নলের সামনে ওদের দাঁড় করাতে পারতাম। ঠিক একই রকম ঘৃণা, প্রতিশোধ গ্রহণের একই রকম তীব্র আকাঙ্ক্ষা সেই অন্ধকার দিনের অসংখ্য ছেলেকে দুঃসাহসী করে তুলেছিল। তাদের যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কোনো সহায় সম্বল ছিল না, কিন্তু শ্যামল ছায়ার জন্যে গাঢ় ভালোবাসা ছিল। আমার 'শ্যামল ছায়া' সেইসব বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ।

৪। নির্বাসন

হুমায়ূন আহমেদের এই চতুর্থ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। প্রকাশক খান ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী আবুল বারক আলভী। ২০০৫ থেকে প্রকাশক দিব্যপ্রকাশ। প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষ। দাম ৫০ টাকা।

মুক্তিযুদ্ধে আহত একজন তরুণ চিকিৎসার জন্যে বাইরে যাবেন। অন্যদিকে এই পরিবারেই একটি মেয়ের বিয়ে। একদিনের পারিবারিক আলেখ্য রচনা করছে প্রেমঘন জীবনের অনুপম কাব্য, মানবিক সুখ-দুঃখের অনন্য দলিল।

উৎসর্গ : জরীকে।

৫। অচিনপুর

হুমায়ূন আহমেদের পঞ্চম উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা বিচিত্রায়, ১৯৭৩ সালে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে, প্রকাশক প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণের

প্রচ্ছদশিল্পী কালাম মাহমুদ। ২০০২ সন থেকে প্রকাশক অন্যপ্রকাশ। প্রচ্ছদশিল্পী মাসুম রহমান। দাম ৫০ টাকা।

নতুন সংস্করণের উৎসর্গ দ্বিতীয় মাতা— স্বর্ণা। এই মেয়েটির বয়স মাত্র বাইশ। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে আমাকে দেখে সন্তানের মতো। নিজের মা ছাড়া কাউকে মা ডাকা আমার জন্য অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কী আশ্চর্য কাণ্ড! ডাকতে পারছি।

৬। সৌরভ

হুমায়ূন আহমেদের ষষ্ঠ উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। প্রকাশক স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী কাজী হাসান হাবিব।

একাত্তরের অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর জীবনচিত্র। একটি পরিবার মাত্র কতিপয় পরিচিত মানুষের ভয়-হতাশা আর একই সঙ্গে সংকল্পবদ্ধতার দ্যুতি মহান মুক্তিযুদ্ধকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

উৎসর্গ : সালেহ চৌধুরী, শ্রদ্ধাস্পদেষু। সূচনায় কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা 'জোছনার ছাদ ভেঙে/পাখীরা যাচ্ছে উড়ে যাক/বাতাসে বারুদ স্মৃতি থাক অনুভবে।'

৭। নীল হাতি

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম শিশুতোষ রচনা। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। প্রকাশক খান ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী আবদুর রব সরকার।

উৎসর্গ মা মনি শর্মিকে।

৮। তোমাদের জন্যে ভালোবাসা

এটি হুমায়ূন আহমেদ রচিত প্রথম সায়েন্স ফিকশন। 'বিজ্ঞান সাময়িকী'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করে খান ব্রাদার্স, ১৯৭৩ সালে। প্রচ্ছদশিল্পী কালাম মাহমুদ।

'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, বইটির একটি বুলেটবিদ্ধ কপি বঙ্গবন্ধু যাদুঘরে রক্ষিত আছে। অনুমান করতে অসুবিধে নেই, বইটি বঙ্গবন্ধু কিংবা তার পরিবারের কারো সংগ্রহে ঠাঁই পেয়েছিল।

উৎসর্গ প্রফেসর ড. আলী নওয়াব শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম জনাব ভূঁইয়া ইকবালের আগ্রহে আমি ওই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীটি 'বিজ্ঞান সাময়িকী'-তে ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করি। বই হিসেবে বের হওয়ার সময় কৃতজ্ঞচিত্তে তার কথা স্মরণ করছি।

হুমায়ূন আহমেদ
১১/৯/৭৩

৯। নিশিকাব্য

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম গল্পসংকলন। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। প্রকাশক অনিন্দ্য প্রকাশনী। ১৯৯২ সাল থেকে প্রকাশক জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। প্রচ্ছদশিল্পী টিংকু আহমেদ। মূল্য ৪০ টাকা।

উৎসর্গ : ড. আবু জাফর মাহমুদ, শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই গল্প সংকলনে ১১টি গল্প রয়েছে– নিশিকাব্য, শ্যামল ছায়া, কল্যাণীয়াসু, একজন ক্রীতদাস, নন্দিনী, শঙ্খমালা, ফেরা, সৌরভ, ভালোবাসার গল্প, অসময় এবং বান।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

নিশিকাব্যের সব গল্পই পূর্বপ্রকাশিত। উত্তরাধিকার, জনান্তিক, বিচিত্রা, দৈনিক বাংলা ও রোববারে গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ
রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০। নৃপতি

হুমায়ূন আহমেদ রচিত প্রথম মঞ্চনাটক। এটি প্রথম মঞ্চস্থ করে ঢাকার নান্দনিক নাট্যগোষ্ঠী, ১৯৮৬ সালে মহিলা সমিতি মঞ্চে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। প্রকাশক অনিন্দ্য প্রকাশনী। ১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশক জ্ঞানঘোষ। প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষ। দাম ৩০ টাকা।

স্মরণীয় যে, নৃপতির খামখেয়াল ও উদ্ভট আচরণ নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক এ নাটকটি এরশাদ আমলে রচিত এবং মঞ্চস্থ হয়েছিল।

উৎসর্গ   মামুনুর রশীদ।

১১। আমার ছেলেবেলা

হুমায়ূন আহমেদের আত্মজীবনীমূলক প্রথম গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে, প্রকাশক কাকলী প্রকাশনী। প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষ।

উৎসর্গ   বড় মামা শেখ ফজলুল করিম, যিনি এই পৃথিবীতে খুব অল্প আয়ু নিয়ে এসেছিলেন, সেই অল্প আয়ুর সবটাই খরচ করে গেলেন আমাদের পেছনে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এক দুপুরে ভাত খেতে বসেছি। আমার মেজো মেয়ে কী-একটা দুষ্টুমি করায় মা'র কাছে বকা খেয়েছে। মুখ অন্ধকার করে ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে আছে। অনেক সাধাসাধি করেও তাকে খাওয়ানো যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, মা, তোমাকে আমি আমার ছেলেবেলার একটা গল্প বলব। গল্প শুনে তুমি যদি হেসে ফেলো তা হলে কিন্তু ভাত খেতে হবে।

আমি গল্প শুরু করলাম। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল না হাসার। শেষ পর্যন্ত খিলখিল করে হেসে ফেলে বলল, তুমি যদি তোমার ছেলেবেলার আরেকটা গল্প বলো তা হলে ভাত খাব।

আমি যে একসময় তাদের মতো ছোট ছিলাম এবং খুব দুষ্ট ছিলাম এই বিস্ময়ই তাদের জন্যে মজার। তার সঙ্গে যুক্ত হলো মজার মজার ঘটনা। ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হলো ছেলেবেলাটা লিখে ফেললে কেমন হয়। বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠা লিখেও ফেললাম। আমার বড় মেয়ে

খুব উৎসাহ নিয়ে সেই পাণ্ডুলিপি আমার মাকে পড়াল। মা'র মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় আমাকে বললেন, এইসব কী লিখেছিস ? নিজের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে রসিকতা ?

আমার ছোট বোনও পাণ্ডুলিপি পড়ল। সে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, আমাকে নিয়ে মাকড়সা প্রসঙ্গে যে গল্পটা লিখেছ ঐটা কেটে দাও। লোকে কী ভাববে ? পাণ্ডুলিপির খবর ছড়িয়ে পড়ল। আমার ছোটমামা খুলনা থেকে চলে এলেন পড়ার জন্যে। তিনি পড়লেন এবং কোনো কথা না বলে খুলনা চলে গেলেন। বুঝলাম তাঁরও পছন্দ হয় নি। তবু একসময় শেষ করলাম এবং কোথাও কোনো ভুলটুল আছে কি না তা যাচাই করবার জন্য নিজেই নানিজানকে পড়ে শোনালাম।

নানিজান বললেন, অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। এই ধর, তুই লিখলি তোর মা পাগল হয়ে গিয়েছিল। পাগল হবে কীজন্যে ? মানুষ চিনত না। উলটাপালটা কথা বলত—এর বেশি তো কিছু না। এটাকে পাগল বলে ?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। আমার মেজো মেয়ে বলল, তুমি মন-খারাপ করছ কেন ? লেখাটা তো মোটামুটি ভালোই হয়েছে। তবে তুমি একটা জিনিস লিখতে ভুলে গেছ।

কোন জিনিস মা ?

ছেলেবেলায় দুধ আর ডিম খেতে তোমার কেমন খারাপ লাগত তা তো লেখ নি।

দুধ ডিম তো মা তোমরা খাচ্ছ। আমরা খেতে পারি নি। এত পয়সা আমার বাবা-মা'র ছিল না।

মেজো মেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আহা কী সুখের ছিল তোমাদের ছেলেবেলা!

হ্যাঁ, সুখেরই ছিল।

সেই সুখের খানিকটা ভাগ আজকের পাঠক-পাঠিকাদের দেয়ার জন্যেই এই লেখা। ছেলেবেলা লেখার সময় শৈশবে ফিরে গিয়েছিলাম। যতক্ষণ লিখেছি গভীর আনন্দে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। পেছনে ফিরে তাকানো যে এত আনন্দময় হবে কে জানত ?

হুমায়ূন আহমেদ

য় আসবে। [illegible] কোই

বইকে দেখতে ইচ্ছা করে।

র্তিতে নিয়ে আসবে। তারপরে

র কাম না কাটা ভাবাব- তে

চ খাপচাপে হাঁটতে থেকে

পাবেহ আসবে নিকরণ চালি

।

রাতে ভাত খেতে

। মানুষ নিজস্ব মতো?

র কেবিন পছন্দ করে।

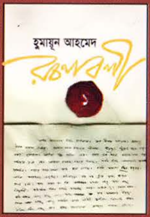

Humayun Ahmed
Rachanabali [Vol. I]

price Bdt 500.00
US $ 25.00
cover design :: Masum Rahman
anyaprokash<< dhaka<< bangladesh
www.anyaprokash.com

an ANYAPROKASH publication

ISBN 984 868 503 0

security
hologram